Cover Engraved & Printed by
Bharat Phototype Studio

হিন্দুস্থান
রেকর্ড
ও
গ্রামোফোন
আপনার
নিত্য সহচর
পূজার
আনন্দে
হিন্দুস্থান
গ্রামোফোন ও রেকর্ড
সকল দোকানেই
কিনিতে পাইবেন
শারদীয়ার নূতন রেকর্ড
অদ্যই
শ্রবণ
করুন!

## 'অলকা'র পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

'অলকা' পড়িয়া যদি আপনার ভাল লাগে,
তাহা হইলে অন্তত পাঁচজন বন্ধুর নিকট
'অলকা'র কথা বলিবেন।

# সূচী

## আশ্বিন ১৩৪৫



## চিত্রসূচী

# ষাণ্মাসিক সূচী

## বিষয়-সূচী

## লেখক-সূচী

## চিত্র-সূচী

বীণাবাদিনী

শ্রীনন্দলাল বসু

*Engraved & Printed by*
BHARAT PHOTOTYPE STUDIO

ইণ্ডিয়ান স্কুল অব অরিয়েণ্টাল আর্টস-এর সৌজন্যে
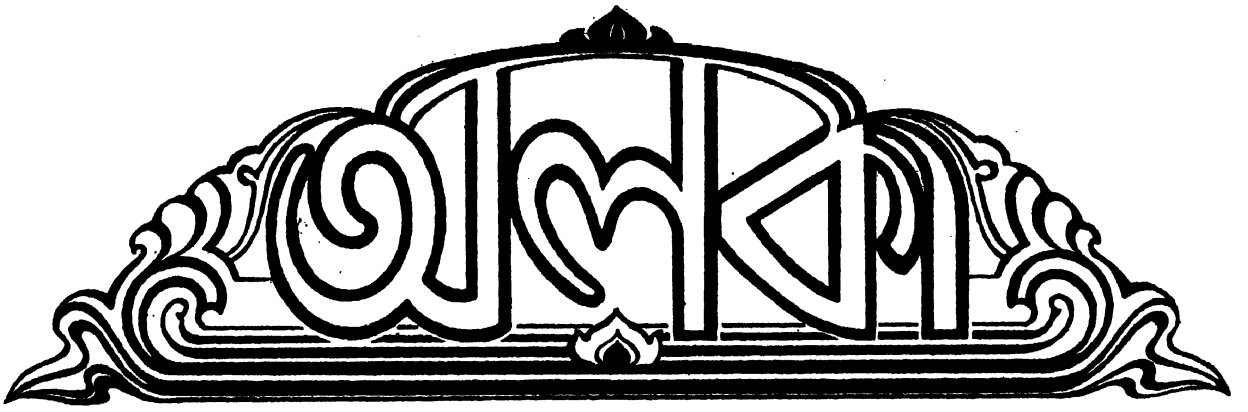
প্রথম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৫ | প্রথম সংখ্যা

# যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য

সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার, এম. এ., ডি. লিট.

আজকাল কোন বড় কাব্য, গদ্যেই হউক আর পদ্যেই হউক, কোন অমর মৌলিক গ্রন্থ কেন রচিত হইতেছে না? বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা একটু ভাবেন তাঁহারাই এই কথা মনে মনে আলোচনা করেন। বাগ্দেবীর এই অভিসম্পাত শুধু বঙ্গদেশেই নহে, ভারতের অন্য প্রদেশের এবং সমস্ত জগতের উপর। এই দীর্ঘশ্বাস আজ বিশ্বব্যাপী। তবে কি কাব্য-সৃজন-শক্তির এই বন্ধ্যতাকে আধুনিক সভ্যজীবনের অনিবার্য্য ফল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? সকলেই বলেন যে, বর্ত্তমান জগৎ বড়ই হুটপাট করিয়া চলে, নানা দিক্ হইতে গোলমাল আসিয়া মনকে ঝালাপালা করিয়া দেয়, লোকের বসিয়া ভাবিবার, নীরবে দীর্ঘকাল প্রকৃতির শোভা দেখিবার সময় ও সুযোগ নাই; সর্ব্বত্রই মোটরের পেচকধ্বনি, রাজনৈতিক বক্তার হ্রেষারব, বিজ্ঞাপনের ভেরীনাদ—আর কলিকাতা হইতে মফস্বল পর্য্যন্ত রেডিওর "গ্রাহকে"র সঙ্গে "উগ্রকণ্ঠ" (লাউড্ স্পীকার) লাগান,—ইহাতে বুড়া "জীর্ণ পীত বৈষয়িক" লোকদেরও বিরহী যক্ষের মত বিনিদ্র রজনী কাটাইতে হইতেছে। শেলী ও মিল্টন রাত্রি জাগিয়াই অমর কবিতা লিখিতেন, কিন্তু আজ যদি তাঁহারা জীবিত থাকিতেন, তবে কানে তূলা না গুঁজিলে এই কাজটি সম্ভব হইত না। বর্ত্তমান সভ্যজগতে জীবনের সদা-জ্বর অকাল-জরা আনিয়া দিতেছে; ব্লড্ প্রেশার্ ও হার্টফেল্ আর নভেলে আবদ্ধ নহে, ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। আহা! সেকালে জীবন কত সরল, কত শান্ত ছিল; লোকে কাব্য রচনা করিবার, কাব্য উপভোগ করিবার কত সময় পাইত। এখন হোটেলে খাইয়া যেমন গৃহিণীর রন্ধন-বিদ্যা লোপ পাইয়াছে, তেমনি ক্লাবে সন্ধ্যাটা কাটাইয়া (নচেৎ ভদ্রলোক হওয়া যায় না) এবং টকি শুনিয়া কাব্য কল্পনা করিবার, উপভোগ করিবার শক্তিও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

সত্তর বৎসর আগে মার্কিন ভাবুক অলিভর ওয়েণ্ডেল হোমস্ তাঁহার নিজ মহাদেশে কেন উচ্চ সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে না এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, মার্কিনবাসী সাহেবদের স্থায়ী বাড়ি নাই ; আজ এ গ্রামে, কাল ও শহরে এইরূপ বৎসর বৎসর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এরূপ যাযাবর সভ্য জাতি কাব্য রচনা করিতে পারে না। তাঁহারই উপমা, "যে গাছটিকে মাসে মাসে টানিয়া তুলিয়া এক একটি ভিন্ন স্থানে পোঁতা হয়, তাহাতে ফুল ফুটিতে পারে না।" বাঙ্গালী ঠিক ততটা যাযাবর হয় নাই, তবে আমাদেরও গ্রামের সঙ্গে দীর্ঘ সম্বন্ধ এবং জীবনে শান্তি ঘুচিয়াছে। এইটিই বিপদের কারণ।

কারণ, কবির মস্তিষ্কে যে পরিমাণে ও যে শ্রেণীর চিন্তা, তাঁহার হৃদয়ে যে পরিমাণে ও যে শ্রেণীর ভাব স্থান পায়, তাঁহার কাব্যের পরিমাণ ও শ্রেণী তাহারই অনুযায়ী হয়। যেমন কৃষক জমিতে যে পরিমাণে এবং যেরূপ গুণশালী সার দেয়, ঠিক সেই পরিমাণে এবং সেই উচ্চ বা নীচ দরের ফসল তাহা হইতে লাভ করে ; মানুষ জমিতে যে রাসায়নিক পদার্থ ঢালিয়া দেয়, তাহাই উদ্ভিদ আকারে ফিরাইয়া পায়,—তাহার বেশী নহে। অতএব সমাজে যে-সব চিন্তা চলিতেছে, বাহিরের বাতাস হইতে যে-সব ভাবপ্রবাহ আসিয়া সকলের হৃদয় অধিকার করিতেছে, সেই যুগের কাব্যে তাহারই ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে। দুই একজন ক্ষণজন্মা মনীষী মাত্র ইহার ব্যতিক্রম ; তাঁহারা প্রকৃতই বিদ্রোহী, অর্থাৎ পিতা-পিতামহদের চলিত পথ হইতে, সর্ব্বজনসম্মত বিশ্বাস হইতে নিজ প্রতিভার জোরে লোককে টানিয়া লইয়া নূতন পথের পথিক করেন ; অনেক স্থলে তাঁহারা জীবনে নির্যাতিত, বিফল হন, এবং পরবর্ত্তী যুগেই তাঁহাদের বাণী বিজয়ী হয়, জগৎকে জাগাইয়া দেয়। কিন্তু এরূপ কবি মানব-ইতিহাসে চার পাঁচটি মাত্র জন্মিয়াছেন, যেমন যুগপ্রবর্ত্তক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা চার পাঁচ জন মাত্র আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা আজ বলিব না।

দেশময়, জগৎময়, বাহিরের বাতাসে যখন প্রবল বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, তাহারই প্রতিঘাত প্রথমে হয় কবির হৃদয়ে। এই জন্য ঐতিহাসিক প্রত্যেক মহা হৃদয়াবেগের যুগে, ভাবের প্রবল ঝড়ের যুগে এক একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

পারসিক শাহানশাহের অক্ষৌহিণী সেনাকে পরাজয় করিবার, নূতন প্রজাতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি চালাইবার ফলে এথেনীয় জনমণ্ডলীর মধ্যে যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, তাহার ফলেই পেরিক্লীয় যুগের গ্রীক সাহিত্য গ্রীক কলা প্রভৃতি অপূর্ব্ব সামগ্রীর সৃষ্টি হয়। উত্তর-ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ছায়ায় সমস্ত দেশ এক হইল, হিন্দুধর্ম্ম নব জাগরণ পাইল, নব কলেবর ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, শান্তি ও অর্থ বাড়িতে লাগিল, ইহার ফলে কালিদাসের কাব্য ও "গুপ্ত-আর্ট" ফুটিয়া উঠিল। মধ্য-যুগের অবসাদ ও অন্ধকার হঠাৎ ঘুচিয়া গিয়া গ্রীক সাহিত্য পুনরাবিষ্কৃত হইল, ইউরোপে আলোক ঢুকিল, প্রাচীন চিরন্তন প্রণালীর উপর আঘাত পড়িল, ইহাই হইল ইউরোপের নব-জন্ম, রেনেসাঁ। ইহার ফল সাহিত্য ও শিল্পকলায় অমর হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ড রাবণ-সদৃশ স্পেনের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া, পোপের বন্ধন হইতে দেশের ধর্ম্মকে মুক্ত করিয়া, নব-জগৎ-আবিষ্কারে অংশীদার হইয়া হৃদয়ে যে নব শক্তি পাইল তাহার ফলই এলিজাবেথীয় সাহিত্য। তেমনি ফরাসী দেশে চতুর্দ্দশ

লুইএর রাজত্বকালে দেশময় একতালাভের ফলে, ইউরোপ-বিজয়ের ফলে, দেশপ্রাণ জাগিয়া উঠিল, সাহিত্যে "সুবর্ণ যুগ" আরম্ভ হইল, ফ্রান্স সমস্ত সভ্য ইউরোপের শিক্ষক ও দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিল। আর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ও ততোধিক বেগে ফরাসী প্রতিভা জাগিয়া উঠিল, কারণ ফরাসী জাতির হৃদয়তন্ত্রী নবীন সুরে প্রবল বেগে কাঁপিতে লাগিল। তাহার কথাই কবি সত্য বর্ণনা করিয়াছেন :—

Bliss it was in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven.

বঙ্গদেশ সেইরূপ নবজীবন পায়, জাগ্রত হইয়া উঠে, মাইকেলের যুগে ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে। তাহার কথা সকলেই জানেন। আবার বাঙ্গলা জাগে বঙ্গ-ভঙ্গের সময়, কিন্তু এটি বড় বেশী শোকের, বড় বেশী নির্য্যাতনের সময়, কাজেই সেই কণ্টকময় মরুক্ষেত্রে তত বেশী ও বড় কাব্যফুল ফুটিতে পারে নাই, দু-একটি অমর পদ্য মাত্র জন্মিয়াছিল।

ফলতঃ হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে, ভাবের প্রবাহে দীর্ঘকাল ধরিয়া মানবচিত্ত তোলপাড় না হইলে, মহাকাব্য সৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু যেমন বরফের প্রকাণ্ড চাপে জীবনী-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণীমাত্রই আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সেইমত মহা দুঃখ, মহা দৈন্যও হৃদয়-প্রবাহকে স্তব্ধ গতিহীন করিতে পারে, সৃজন-শক্তিকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে। তাহা জাতীয় জীবনের উপর এমন একটা অবসাদ আনিয়া দেয় যে, মানুষ নিশ্চেষ্টতার গভীর অন্ধকার-হিমে ডুবিয়া যায়, অথবা অন্ন-চেষ্টায় এবং তুচ্ছ হীন সুখভোগের খোঁজে সব সময় কাটায়। ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান যুদ্ধের পর ( ১৮৭১ ) ফ্রান্স এইরূপ মোহমায়ায় অভিভূত হইয়া পড়ে, গত মহাযুদ্ধের পর ( ১৯১৯ ) ইংলণ্ড এবং সমস্ত ইউরোপের উপর এইরূপ একটি গভীর ছায়া ও বিষাক্ত ঝড় আসিয়া পড়িয়াছে। সে সময় সমস্ত দেশময় আন্দোলন হইল, জাতীয় জীবনে এত বেশী ও গভীর পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে সাহিত্য সৃষ্ট হইল কই ?

বাঙ্গলার পক্ষে এই বন্ধ্যাতার কারণ অর্থাভাব। আর, অর্থাভাবের কারণ জীবনে সরলতার অভাব। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত চাল বাড়িয়াছে, এখন আর আগেকার মত মোটা ভাত-কাপড়ে বাঁচিয়া থাকা যায় না, সাদাসিধাভাবে জীবন কাটানো সকলের পক্ষেই অসম্ভব। কাজেই সব আবশ্যক জিনিসের দাম অসম্ভব বাড়িয়াছে, এবং আবশ্যক জিনিসের তালিকাও সেকাল অপেক্ষা চারি গুণ লম্বা হইয়াছে। এরূপ জগতে গরিব লোকের স্থান নাই, অর্থাৎ সে সংসার করিতে পারে না, চিরকুমার থাকিয়া ভিখারী বা সন্ন্যাসী রূপে বাঁচিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন সামাজিক শ্রেণীর জীব হইলে তাহাকে অকালমৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

প্রাচ্য হিন্দু-সমাজে বিবাহ একটি অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার ; মুসলমানদের ধর্ম্মেও তাহাই সত্য, There is no monachism in Islam ( আরবীর অনুবাদ )। অতএব আমাদের হইলে-ও-হইতে পারিতেন কবিকে টাকার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। কিন্তু যে পক্ষীটি প্রত্যূষে উঠিয়া সমস্ত দিন এই ছাইগাঁশের গাদায়, ঐ বিষ্ঠাস্তূপে ঠোকর মারিতেছে, সে কুহু কুহু সুরে গাহিতে পারে না। যে পাখী কুহু কুহু গায়, সে বাচ্চা-প্রতিপালনের ভার পর্য্যন্ত প্রতিবাসীর উপর ফেলিয়া দিয়া খালাস

হইয়াছে,—লোকটা বেশ স্বাধীন, অনাসক্ত, বাবু। যে-সমাজে মস্তিষ্কবান্ প্রতিভাশালী শিক্ষিত ব্যক্তিকেও মহাপুরুষের পায়ে তেল দিবার সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার জনপূর্ণ দরবারে তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকিতে হয়, অথবা মহাপুরুষের জয়ঢাক বাজাইবার সুযোগ পাইবার জন্য দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের দরজায় ধর্ণা দিতে হয়, সে-সমাজে মহাকাব্য সৃষ্ট হওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ।

নিয়ত বিষয়াঃ হেতে, ন যান্তি বিপর্য্যয়ং।

কাঁটা-খুড়োর গাছে কাল্‌নার ডাঁটা জন্মে না।

জন্মে শুধু চুটকি লেখা আর সখের কবিতা, বড়লোকের মজলিসের সৌখিন রচনা যাহা ড্রয়িংরুমে হাসির তরঙ্গ ফুটায়, বাহিরে যাইতে পারে না, এবং দু-এক দিনের বেশী বাঁচে না। মাসিক-পত্রিকার মালিকগণের অনুগ্রহে—মালিক বলিলেই সত্য রক্ষা হইবে, কারণ সম্পাদক বেচারা বেতন-ভোগী পুত্তলিকা মাত্র—কবিতা এখনও ছাপা হয়, কিন্তু তাহা ইঞ্চির মাপে রচিত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ গদ্য প্রবন্ধ—না, না, গল্পটি শেষ হইবার পর সেই পৃষ্ঠায় যতটুকু স্থান বাঁচিল তাহা পূরণ করিতে পারে, এতটুকু মাত্র মধুচক্র বিরচন করা চাই, গৌড়-বাসী ( ততোধিক গৌড়বাসিনী ) ইহার অধিক পান করিবেন না। রাড্‌ইয়ার্ড কিপ্‌লিং প্রথম বয়সে 'সিভিল মিলিটারি গেজেট' নামক দৈনিকের আফিসে কাজ করিতেন, পকেটে দুটা একটা পদ্য-রচনা থাকিত, অথবা দশ মিনিটে একটা ছোটখাট রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী ছিল ঐ প্রেসের হেডম্যান ( মুসলমান মিস্ত্রি ) সে সহকারী সম্পাদকদের ঘরে ঢুকিয়া বলিত, "আজ কাগজ বাহির হইতে পারিতেছে না, চৌদ্দ ইঞ্চি কপি কম পড়িয়াছে।" কিপ্‌লিং অমনি একটি পদ্য তাহাকে দিতেন এবং সে বলিত, "এটা ভাল পদ্য নয়, এটা বিশ ইঞ্চি হইবে" অথবা "কি চমৎকার পদ্য, ঠিক চৌদ্দ ইঞ্চিতে ধরিবে।"

এই মহাকাব্যের তিরোধানের যুগে, সাহিত্যক্ষেত্রে বনস্পতি লোপ পাইবার ফলে, আগাছা মাত্র জন্মিতেছে এবং তাহাও প্রচুর পরিমাণে। অধিকাংশই "কামায়ন", অথচ সেগুলি রামায়ণের শতাংশ প্রতিভার দ্বারাও আলোকিত নহে; এগুলি শুধু ভোগ, শুধু বাসনা উত্তেজন, শুধু মানব ও পশুর মধ্যে পার্থক্য ঘুচাইয়া দিবার মন্ত্র প্রচার করে। ফরাসী দেশেও ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান যুদ্ধের যুগের অবসাদের ফলে এই শ্রেণীর সাহিত্য রাজত্ব করিয়াছিল।

কবিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে হয় ঘরে পৈত্রিক বিত্ত থাকা চাই, না হয় পাঠক চাই। পৈত্রিক বিত্তটা ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী আবশ্যক জোগাড়যন্ত্রের বেশ সাহায্য করে, কিন্তু কাব্যরচনায় অর্থ প্রায় সর্ব্বত্রই অনর্থ হয়। ( আমি এখানে নিষ্পেষণকারী দৈন্যকে মাথায় তুলিতেছি না, সেটা কবির পক্ষেও মারাত্মক )। বর্ত্তমান সমাজে বিত্তের অবস্থা আগেই বলিয়াছি। আর পাঠক? পপুলার সাহিত্য রচনা না করিলে পাঠক পাইবেন না। যাহা ইংরাজীতে বলে—Board School mentality, তাহা এ দেশকেও ছাইয়া ফেলিয়াছে; যে লেখক mass suggestion না করিতে পারিবেন তিনি মুদ্রক ও কাগজবিক্রেতার নালিসে ছোট আদালতের বিচারে জেলে গিয়া অন্ন পাইবেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব কেণ্ট অল্পদিন হইল বলিয়াছেন—

"What impresses me is the very small proportion of the total output which is worth reading. I feel that every year literature as an art is faced with an increasing danger of being swamped by commercialism." (June 2.)

এ হেন দুঃসময়ে সমালোচক কি সাহায্য করিতে পারে না? St. Beuve এবং Matthew Arnold-এর মত ক্ষণজন্মা সমালোচকগণ কত কত ফুটন্ত অজ্ঞাত লাজুক কবির প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের জগতে পরিচিত করিয়া দিয়া উৎসাহ দিয়াছেন, জীবিকার উপায় করিয়াছেন। আর, আমাদের আজকালকার সমালোচকগণ? কবি নিজেই নিজগ্রন্থের সমালোচনা লেখাইয়া—অথবা লিখিয়া—পকেটে তাহা এবং হাতে এক ভাণ্ড তৈল লইয়া গিয়া পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হন এবং তৈলভাণ্ডটি চরণকমলেষু (বহুবচনটা চতুষ্পদ অর্থে—আমার শত্রুরা যেন এমন ব্যাখ্যা না করেন) শেষ করিয়া ঐ সমালোচনাটি ছাপান!

"The standards have been destroyed and the values adulterated; freedom has perished and the republic of letters has been taken over by the dictatorships, commercial and ideological."

আমি অনেক বৎসর ধরিয়া আমাদের সাহিত্যের এই দৈন্যের কথা, এই যে ছাপাখানার কল হইতে দিন দিন বর্দ্ধিত সংখ্যায় গ্রন্থরাশি বাহির হইতেছে, খবরের কাগজে তাহাদের নামে প্রচণ্ড ঢক্কানাদ হইতেছে, অথচ তাহাদের মধ্যে একখানিও সারবান্ বা স্থায়ী হইবার উপযুক্ত দেখ যাইতেছে না, সরস্বতীর এই কঠোর পরিহাসের কথা ভাবিয়াছি, বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রবন্ধ লিখিবার পর, ঠিক গত সপ্তাহে আগত 'টাইম্‌স' (লিটেরারি সাপ্লিমেণ্ট) পত্রিকায় দেখি যে বিলাতে এবং ফ্রান্সেও জ্ঞানীরা এই প্রশ্ন লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, আমাদের দেশের মত তাঁহাদেরও মনে জাতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় ও হতাশা জন্মিয়াছে। উহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"It is a great pity that this increased mechanical efficiency should so seldom be put at the service of mature thought and continuous reflection. It has been used instead to pour forth flood upon flood of "popular" periodicals, all conducted on the same principle which rules the cinemas and...the theatres—the principle [namely] that what is "popular" is what will please the idlest and feeblest minds among the people.

There has always been as much trash as the public could absorb; and the vastly increased appetite of a vastly increased public that can read is fed everyday by "masterpieces" in scores, every one of them too "masterly" to be announced in anything narrower than a couple of columns and anything smaller than very large capitals. That is sad, and silly.

If all this commercial mass-production of ephemeral books—"masterpieces" one week, dead rubbish the next,—does indeed prevent the makers of literature from saying their say and lovers of literature from reading and pondering, then indeed the spiritual life of the whole lump is in danger...from the powers of darkness and untruth."

# স্মৃতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তিমিররাত্রি প্রভাত হইল শ্রাবণের শর্ব্বরী,
জাগিয়া বসিনু ব্যাকুল প্রতীক্ষায়—
ঝড়-বৃষ্টির আঘাতে ছিন্ন আমার ফুলের বনে
ফুটেছে কখন রজনীগন্ধা একটি শুভ্রশুচি।
আমার মনের গোপন বাসনা নিশীথ অন্ধকারে
ঝঞ্ঝা-আঘাত-ক্লিষ্ট কঠোর নিদারুণ সাধনায়
ধীরে ধীরে ত্যজি বিকারের বিভীষিকা,
তপস্যাশেষে কখন লভিল দেবতার কৃপাকণা—
উঠিল ফুটিয়া একটি কুসুম রূপে।
বিস্ময়ে জাগি তিমিররাত্রি শেষে
ফুলের গরবে নিজেরে ধন্য মানি।

প্রভাত তখনো স্বর্ণবরণ, নভে বালারুণ রবি
মেদুর মেঘের আড়ালে কিরণ হানে;
কাননে আমার কামনার ফুল দোলে বায়ু-হিল্লোলে—
মুগ্ধ ছিলাম শিশু-চপলতা হেরি।

সহসা কখন আকাশ ব্যাপিয়া ঘনাল প্রাবৃট্-মেঘ,
অকালসন্ধ্যা নামিল আমার বনে।
ঝড় ছুটে এল অন্ধ আবেগে উড়াইয়া এলোচুল,
বিদ্যুৎ-ফণা বিস্তারি চৌদিকে।
কোরক-কুসুম মম
বজ্র আঘাতে ছিন্নভিন্ন খসিয়া পড়িল ভূমে;
মূর্চ্ছাভঙ্গে নয়ন মেলিয়া শান্ত দ্বিপ্রহরে
অনুভব হ'ল আপনি দেবতা নামি ফুলবনে মম।
আপনি চয়ন করিয়া গেছেন আপন পূজার ফুল।

আমার ক্ষুদ্র কুসুমের বনে আরো ফুটিয়াছে ফুল,
বায়ু-তরঙ্গে দুলিছে বৃন্ত 'পরে;
শারদ আকাশে মেঘ ভেসে ভেসে যায়,
নীলের অগাধে ঘুরে ঘুরে উড়ে নামহীন কত পাখী,
অলস-শয়নে নয়ন মেলিয়া দূরে পাঠাইয়া আঁখি
মন শুধু চায় তুলিয়া ধরিতে রহস্য-যবনিকা—

জীবনে ঢাকিয়া জীবনাতীতের ইঙ্গিতভরা নিবিড় সে আবরণ,
পরপারে তার লুকাইয়া আছে হাজারো যুগান্তের
পলাতকাদের যত কিছু সন্ধান।
নীল যবনিকা তুলেছে কি কেউ, প্রাণমৃত্যুর ছিঁড়িয়াছে ব্যবধান,
এপারে বসিয়া ওপারের ভাষা চকিতে কখনো নিজে করি অনুভব
আশ্বাসবাণী শুনায়েছে মানুষেরে ?

মনে পড়িতেছে, ঋষির তনয় বালক সে নচিকেতা
মৃত্যুর গৃহে আতিথ্য যাচি স্বয়ং যমের মুখে
লভিয়াছিলেন মৃত্যু-বিজয়ী অমৃতের পরিচয়—
প্রাচীন তত্ত্ব ; শ্লোকে শ্লোকে তার মহৎজনের সুবৃহৎ সান্ত্বনা।
আমার ক্ষুদ্র শোক খুঁজে মরে অজানা আঁধারে হারানো বুকের ধন,
ব্যাকুল হস্তে যদি বা চকিতে লাগে পরিচিত ছোঁওয়া,
পশে যদি কানে অস্ফুট আধ-ভাষা।
জানি শুনিব না, জানি জানি মোর ছিন্ন ফুলের স্মৃতি
বর্ত্তমানের ভবিষ্যতের অসংখ্য ফুল মাঝে
অক্ষয় হয়ে বাজিবে বক্ষে অলস দ্বিপ্রহরে।
সেই সান্ত্বনা, মর-জীবনের সুগভীর আশ্বাস—
কাঁটার ব্যথায় জাগ্রত রয় কুসুমের ইতিহাস।

বিরহব্যাকুল অশ্রুঅন্ধ ব্যথাতুর মানবেরা
যুগ যুগ ধরি সৃষ্টির সেই অনাদি প্রভাত হ'তে
স্বর্গে চাহিয়া চেয়েছে ভুলিতে মর্ত্ত্যের বিভীষিকা।
প্রিয়-প্রিয়তর-প্রিয়তমজনে পথের প্রান্তে ফেলি
সম্মুখপানে অবিরাম চলা মুছি নয়নের জল,
বক্ষে বহিয়া বেদনা-স্মৃতির অসহ কঠিন ভার।
ট্র্যাজেডি-কমেডি সমান এ অভিনয়ে
জীবন-নাট্যে যতদিন নাহি পড়িতেছে যবনিকা।
করতালি দেয় স্বর্গের দেবতারা,
শুনিতে না পাই, শুনিবার লোভে ঊর্দ্ধে চাহিয়া থাকি।

চেয়ে চেয়ে চেয়ে অসীম শূন্যে আঁখি পরাজয় মানে,
ফিরে ফিরে আসে মর্ত্ত্যের ধরণীতে—
যে মাটি মোদের একান্ত আশ্রয়।

# গোপীপ্রেম

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন ঃ—

গোপী প্রেমকী ধ্বজা
জিন ঘনশ্যাম কিয়ে বশ
আপনে উর ধরি শ্যামভুজা !

'গোপী প্রেমের ধ্বজা—সাকার মূর্তি—নহিলে তার প্রেমে ঘনশ্যাম বশ হইবেন কেন ?' রাসপঞ্চাধ্যায়ে দেখি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥—ভাগবত, ১০।৩২।২২

'সখিগণ ! তোমাদের ঋণ আমি কোন দিনও শোধ দিতে পারিব না—ব্রহ্মার আয়ু পাইলেও নয়। কেন না, তোমরা আমার অনুরাগে লোকধর্ম-বেদধর্ম-আত্মীয়স্বজন সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছ।' অর্থাৎ, গোপীরা 'ত্যক্ত-লোক-বেদ-স্বা' (ভাগবত); তাঁহারা 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ' (গীতা); তাঁহারা—

যা দুস্ত্যজং স্বজনম্ আর্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

'দুস্ত্যজ নিজজন ও আর্যপথ ত্যাগ করিয়া—সমস্ত শ্রুতি যাঁর অন্বেষণ করে—সেই শ্রীকৃষ্ণপদবী ভজনা করিয়াছিলেন।'

তাই কবি বলিয়াছেন—

নির্মৎসর যে সন্ত—তিন্হি চূড়ামণি গোপী
নিরমল প্রেম-প্রবাহ সকল-মর্যাদা-লোপী।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের মর্যাদা বুঝিতেন। তাই দেখিতে পাই, কংস-বধের পর তিনি মথুরাবাসী হইলে তাঁহার পরম ভক্ত উদ্ধবকে গোপীদিগের তত্ত্ব লইবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। 'হে উদ্ধব !

গোপীনাং মদ্‌বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়।'

উদ্ধব হয়তো গোপীদের নামমাত্র শ্রুত ছিলেন—তাঁহাদের স্বভাব জানিতেন না। সে জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্ত-দৈহিকাঃ।
যে ত্যক্ত-লোক-ধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥

'তাহারা দেহ গেহ বিসর্জন দিয়া, লোকধর্ম-বেদধর্ম উপেক্ষা করিয়া আমাতে প্রাণ মন সমর্পণ করতঃ 'মদাত্মিকা' হইয়াছে। আজ তাহাদিগের প্রিয়তম, 'প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' আমি দূরগত হইয়াছি—সুতরাং বিরহের উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া তাহারা আমাকেই স্মরণ করিয়া বিমোহিত হইয়াছে—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ ভক্তির যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—যে ভক্তি (তাঁহার মতে) 'তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা'—সেই প্রেমভক্তি গোপীতে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ভক্তি কি?

"তদর্পিতাখিলাচারিতা, তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা"—নারদ-ভক্তিসূত্র, ১৯

অর্থাৎ, তাঁহাতে সমস্ত আচার সমর্পণ এবং পরম ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ। গোপীরা কিরূপে আত্মীয়স্বজন বিস্মৃত হইয়া, আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত লোকধর্ম বেদধর্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন—তাহা আমরা জানিয়াছি। আমরা আরও জানিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা কিরূপে 'কিবা স্বপ্ন জাগরণে' তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্না থাকিতেন—এবং 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর' এই গীতা-বাক্যের সার্থকতা করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ভাগবত বলিতেছেন—

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনম্ অনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্ত-যানাঃ॥—১০।৪৪।১৫

(প্রেঙ্খেঙ্খনং = দোলাদোলনং; উক্ষণম্ = সেচনম্)

অর্থাৎ, ব্রজগোপীরা দোহন, কুট্টন, মন্থন, লেপন, সেচন, মার্জন, শিশুর দোলা-দোলন ও রোদন-বারণ প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্যের মধ্যে অনুরক্ত চিত্তে অশ্রুকণ্ঠী হইয়া সর্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম গান করিতেন। তাঁহারা 'উরুক্রম-চিত্তযানা'—তাঁহাদের ধন্যবাদ!

সেই জন্য ভক্ত কবি সুরদাস গোপীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

নাহিন রহো হিয় মহঁ ঠৌর।
নন্দনন্দন অছত কৈসে আনিয়ে উর ঔর॥

'নন্দনন্দন হৃদয়ের সমস্তটা জুড়িয়া আছেন—একটুকু স্থান নাই—অন্য কিছু কোথায় ধরিবে?'

শ্যাম-গাত সরোজ-আনন, ললিত গতি মৃদু হাস।
'সুর' ঐসে রূপ কারণ মরত লোচন প্যাস॥

'যিনি শ্যামবপু, সরোজ-আনন, যাঁহার ললিত গতি, মৃদুল হাস—সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-কারণে আমাদের চক্ষু চিরপিপাসিত—আমরা কি করিতে পারি?'

চলত, চিতবত, দিবস জাগত, স্বপন শোবত রাত।
হৃদয়তে উহ শ্যাম মুরতি ছিন ন ইত-উত যাত॥

'দিবসে জাগ্রতে চলনে বলনে, রাত্রিতে শয্যায় শয়নে স্বপনে—সদাসর্বদা হৃদয়ে সেই শ্যাম-মূরতি—একক্ষণও মন ইতি-উতি যায় না—আমরা নিরুপায়। লোকে লোকলাজ আর কত না কি বলে কিন্তু

করিব কি ? আমাদের তনমন সেই শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ—সিন্ধু আসিয়া ঘটে প্রবেশ করিয়াছে—ঘট তাহাকে সামলাইবে কিরূপে ?'

কহত কথা অনেক উধো। লোকলাজ দিখাত
কহা করোঁ তন প্রেম-পূরণ, ঘট না সিন্ধু সমাত। *

কবি জ্ঞানদাসও গোপীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

শ্যাম-রূপ দেখি আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেলিনু হাতে।
ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি! কি আর লোকের ভয়!
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আন মনে নাহি লয়॥

ইহাই গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য—তদর্পিতাখিলাচারিতা তদ্-বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা। প্রেম ভক্তির এই লক্ষণ নির্দেশ করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—ঐরূপ ভক্তি একটা রূপকাদর্শ (Ideal) মাত্র নহে—'অস্ত্যেব এবম্'—ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কোথায় ? ব্রজগোপীতে—

যথা ব্রজগোপিকানাম্—২১ সূত্র

গোপীদিগের ভগবানে সেই অনুত্তমা ভক্তি, সেই অহৈতুকী রতি—যাহা 'মুনীনাম্ অপি দুর্লভা'—

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনাম্ অপি দুর্লভা॥—ভাগবত, ১০।৪৭।২৫

কেন ?

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি বদ্ধভাবাঃ।

গোপাদিগেরই দেহধারণ সার্থক—কারণ, ইহারা সেই অখিলাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে 'বদ্ধভাবা', সেই উরুক্রমে 'চিত্তযানা' অর্থাৎ ( গীতার ভাষায় ) 'ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ'।

শ্রীরাধা 'গোপী-বর্যা' প্রধানা গোপী—তাঁহার প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত—তিনি কেবল 'বদ্ধ-ভাবা' নন—'মহা ভাবময়ী'। তথাপি তাঁহার কথা এখানে বিশেষ করিয়া কিছু বলিব না—কারণ, গোপীদিগের মধ্যে রাধার নাম মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে নাই।

কিন্তু সে কথা যাক। আসুন আমরা ভক্তবর উদ্ধবের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে গোপীদিগের অনুসন্ধানে যাই।

উদ্ধব রথারোহণে গোকুলে উপস্থিত হইলেন—তখন সূর্য প্রায় অস্তোন্মুখ—

আদায় রথম্ আরুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্।
প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ॥

---

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হিন্দী কবিতা ও কোন কোন কথা "কল্যাণকল্পতরু" ( ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ) প্রকাশিত 'The Philosophy of Love' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

উদ্ধব প্রথমেই নন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নন্দ প্রেমবিহ্বল হইয়া সাশ্রুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজং চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥

উদ্ধব নন্দযশোদাকে কোন মতে সান্ত্বনা করিয়া প্রত্যুষে গোপীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গোপীরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—ওঃ, জেনেছি আপনি যদুপতির পার্ষদ—পিতা মাতার তত্ত্ব লইতে এসেছেন। তবু ভাল! আমাদের অবশ্য তাহার মনে নাই—না থাকিবারই কথা—

পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ

—রমণী তো ফুল—পুরুষভ্রমর মধুপান শেষ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে—ইহাই তো সনাতন বিধি!' এই বলিয়া গোপীরা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে লাগিল ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বলীলা গান করিতে লাগিল। উদ্ধব মহা বিপন্ন হইলেন—নানাভাবে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের পরাভক্তির প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনারা ধন্য! পুত্র-পতি, দেহ-গেহ, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত বর্জন করিয়া সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছেন—

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাহবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৪৭।২৬

ইহার পর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের যে বার্ত্তা তিনি বহন করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহা গোপীদিগকে শুনাইলেন। উহার মধ্যে সংযম, যম, নিয়ম, সাংখ্য যোগ প্রভৃতির উপদেশ ছিল।

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৩৩

এই বিষয় লইয়া ভক্ত সুরদাস বেশ একটু মধুর বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন উদ্ধবের পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত বক্তৃতার উত্তরে গোপীরা বলিলেন—

উধো! যোগ জাগ হম নাহীঁ
অবলা জ্ঞানসার কহা জানে কৈসে ধ্যান ধরাহীঁ।

'উদ্ধবজী! আমরা অবলা জ্ঞানহীনা নারী—যোগ-যাগের আমরা কি বুঝিব—কিরূপেই বা ধ্যান করিব?'

তে যে মূঁদন নইন কহত হো হরি মূরতি জিন মাহী
ঐসী কথা কপট কী মধুকর! হম তে শুনী না জাহী।

'আপনি আমাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেন—সেই চক্ষু যাহাতে শ্রীহরির মূর্ত্তি অনুদিন বিরাজিত আছে! হে মধুভাষী দূত! তোমার ও কপট কথা শ্রবণের যোগ্য নয়।'

শ্রবণ চীর অরু জটা বাঁধাবহু, যে দুখ কোন সমাহী
চন্দন ত্যজি অঙ্গ ভসম বাতাবত, বিরহ অনল অতি দাহী।

'আপনি কর্ণ বেধ করিয়া আমাদিগকে জটাধারণ করিতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু ও দুঃখ আমরা সহিব কেন? আপনার উপদেশ চন্দন ত্যজিয়া অঙ্গে ভস্ম বিলেপন। আপনি কি জানেন না আমরা অনুক্ষণ বিরহানলে জ্বলিতেছি?'

যোগী ভ্রমত জেহি লগি ভূলে সো তা হৈ হম পাহী
সূরদাস সো ন্যারো ন পল-ছিন, যে ঘটতে পরছায়ী।

'যাঁহার অন্বেষণে যোগী দেশে দেশে ভ্রমণ করে তিনি তো সর্ব্বদা আমাদের নিকটে রহিয়াছেন, এক পল-ক্ষণও তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ নাই—যেমন বৃক্ষ ও তাহার ছায়া।'

গোপীর কথা শুনিয়া জ্ঞানী ভক্ত উদ্ধবের ভ্রম বিদূরিত হইল। তিনি

সুনি গোপীকে বৈন নেম উধোকে ভূলে।
গাবত গুণ গোপাল ফিরত কুঞ্জনমেঁ ফূলে॥
খিন গোপিনকে পগ পরৈ, ধন্য সাই হৈ নেম।
ধাই ধাই দ্রুম ভেঁটহীঁ উধো ছাকে প্রেম॥

অর্থাৎ গোপীর বচন শুনিয়া উদ্ধব 'নেম' (decorum) ভুলিয়া গেলেন এবং আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গোবিন্দের গুণগান করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরিতে লাগিলেন। কখনও গোপীপ্রেমের স্তুতি করিয়া তাহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন—কখনও বা প্রেমোন্মত্ত ভাবে ধাইয়া ধাইয়া বনতরুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এ সম্পর্কে শুকদেব উদ্ধবের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

আসাম্ অহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।—ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

'এই বৃন্দাবনে তরুগুল্মাদি গোপীদিগের যে চরণরেণু ধারণ করিতেছে, সেই রেণু শিরে ধারণ করিবার আমার যেন সৌভাগ্য হয়!' উদ্ধব আরও বলিলেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুম্ অভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথাগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥—১০।৪৭।৬০

'আমি সেই ব্রজগোপীর পাদরেণু অনুদিন বন্দনা করি—যাঁহাদের হরিকথা-সঙ্গীত এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়াছে।'

উদ্ধবের এ উক্তি অত্যুক্তি নহে। তাঁহার সাক্ষ্য বেশ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, উদ্ধব শিব-বিরিঞ্চির অপেক্ষাও তাঁহার প্রিয়তম।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

সেই জন্য কবি বলিয়াছেন—( গোপীর )

গণত গুণগণ মতি হোতি পঙ্গী ( পঙ্গু )

অর্থাৎ, গোপীদিগের গুণগণ গণনা করিতে বুদ্ধি পঙ্গু (crippled) হইয়া যায়।

ইহা খুব উচ্চ প্রশংসা। অতএব অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মুখেও আমরা অনুরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা গোপীদিগের সম্বন্ধে ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি শ্রুত হইত।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্য-সারম্ অসমোর্দ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্।

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্‌
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥—১০।৪৪।১৪

চরিতামৃতকার এই শ্লোকের শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া এইরূপ ভাবানুবাদ করিয়াছেন—

সখি হে ! কোন তপঃ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী
পিবি পিবি নেত্রভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন
নাহি যার সমান,
পর ব্যোম স্বরূপের গণে
যিঁহো সব অবতারী
পর ব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা,
নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এ মাধুর্য্যলোভে
ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥

মহাপ্রভু বলিতেন, গোপীদিগের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে ? নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও যে প্রসাদ কোন দিন লাভ করিতে পারেন নাই, গোপবধূরা রাসোৎসবে সেই প্রসাদ অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন।

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ ব্রজসুন্দরীণাম্‌ ॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৬০

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোকে কহে বেদব্যাস ॥—চরিতামৃত

উদ্ধৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এই—'রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া গোপবধূরা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, পদ্মগন্ধী সুরাঙ্গনাদিগের কথা দূরে থাক, ভগবানে একান্ত অনুরক্তা লক্ষ্মীও কোন দিন সেই আশিস্‌ লাভ করেন নাই।'

এ প্রসঙ্গে রাসের কথা উঠে।

অঙ্গনাম্ অঙ্গনাম্ অন্তরা মাধবঃ,
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।

অর্থাৎ,

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥—ভাগবত, ১০।৩৩।৩

এই রাসই গোপীর শ্রেষ্ঠ সাধনা—এই সাধনা দ্বারাই তাঁহারা চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই রাস সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ—কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। (অন্য রমণীর পক্ষে যাহা হউক, গোপীরা নিজেই বলিয়াছেন 'অবলা জ্ঞানসার কছা জানে?') স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি কথিত হইয়াছে—'পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম-সুবাসিত কুঞ্জ-বিহঙ্গম-কূজিত বৃন্দাবন বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান—যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য—তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।"

'ধর্মতত্ত্বে'র সপ্তদশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই আর একটু সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"আদৌ রাস ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি, 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই—অপরের হউক বা না হউক—স্ত্রীজাতির জীবন-সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম-সুবাসিত, কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন বনস্থলী, জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীর বিকাশ।

তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল। আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল।

কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহম্ এতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্।
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলা-সর্ব্বস্বম্ আদদে॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥ ইত্যাদি

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান—জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া, ( অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্বোচ্চ সোপান উঠিয়া ) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।"

এক কথায়, ব্রজগোপীর সাধনা প্রেমভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা-প্রাপ্তি, এবং ঐ সাধনার সোপান কৃষ্ণের অনন্য সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার পাদমূলে সর্বস্ব-সমর্পণ—সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান্ তব পাদমূলম্ ( ভাগবত )। ব্রজগোপী তো কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই চাহেন নাই—

মর্য্যপিতাত্মা নেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ

এবং তাহার ফলে পরানির্বৃতি, বিপুল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—যে আনন্দ অন্যের সুদুর্লভ।

সংপশ্যে বিপুলং সুখং
তৎ নৈরপেক্ষং ন বিদুঃ সুখং মম—ভাগবত, ১১।১৪।১৭

আমরা দেখিলাম উদ্ধবের মত উচ্চ সাধকও গোপীদিগের চরণরেণু প্রার্থনা করিলেন—

আসাম্ অহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাম্।

ইহা বিচিত্র নয়—কারণ, শ্রীভগবানের মুখে আমরা শুনিয়াছি তিনি স্বয়ং ঐরূপ প্রেমিক ভক্তের অনুগমন করেন। কেন? 'পূয়েয় ইত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ' (in order to sanctify Himself with the dust of their feet.)

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥—ভাগবত, ১১।১৪।১৫

তাই বলিতেছিলাম—ব্রজগোপী সুধন্য—'গোপী প্রেমকী ধ্বজা'।

## রূপকথা

শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম. এ.

তারকাবিহীন অন্ধ রাতের পঞ্জরে
পথহারা ঝড় কাঁদিছে কোথায়,—শুনতে পাও!
জমেছে আঁধার দিশাহারা ধূ ধূ প্রান্তরে,
কদম-কেয়ার বন একটিও নাই সেথাও?
সাতটি সাগর, তেরোটি নদীর ওপারে পথ,
রাজার তুলাল আঁকিছে সে পথে ভবিষ্যৎ;
—জ্যোৎস্না-হারানো মৌন নিশার পায়ের ধ্বনি
পূরব আকাশে এখনো যেখানে হয় নি শেষ,
…যাবে বধূ সেই দেশ?

কোথা নিশি-পাওয়া যূথিকা-বনের নিশ্বাসে
চারিপাশে আজ চুপি চুপি কাঁদে অন্ধকার;
কালো মেঘভরা কালো চোখে কার নিদ্ আসে,
কে যেন খুলেছে হারানো যুগের বন্ধ দ্বার।
তবু রূপকথা বলিতে হবে যে তাহারি কাছে,
—কোথা দূর পুরী আকাশের নীচে মিশিয়া আছে,
শিয়রে কাহার সোনার প্রদীপ নেভে নি আজো,
পূবের হাওয়ায় কে দিয়েছে মেলি কাজল কেশ;
…যাবে বধূ সেই দেশ?

গভীর রাত্রে রূপকথা বলে চাঁপার বন,
অতন্দ্র পথ সে কাহিনী তার নীরবে শোনে;
তার সাথে আজ শুনি সে কাহিনী মোরা তু'জন,
—আর শোনে চাঁদ কালো আকাশের গোপন কোণে।
পাষাণপুরীতে জেগে আছে কোথা রূপসী মেয়ে,
মালতীমালার গন্ধ কাঁদিছে অঙ্গ ছেয়ে,
—অভিমানে কার কুসুম-মেখলা গিয়েছে ছিঁড়ে,
শিথিল হয়েছে তন্দ্রা-অলস বাসকবেশ;
…যাবে বধূ সেই দেশ?

ঐ শোনো বধূ, কে কাঁদে কানন মর্ম্মরে,
হাজার যুগের রাজার দুলালী সুন্দরী ;
নিশীথ বাতাসে সোনার নূপুর গুঞ্জরে,
পথের চিহ্ন ফেলে যায় নীপমঞ্জরী।
নয়ন-কাজলে এঁকে যায় লিপি পথের ধারে,
যদি কোনদিন রাজার দুলাল চিনিতে পারে,
যদি সে একেলা আসে অভিসারে শুক্লারাতে,
যদি কানে বাজে স্বপনমদির নূপুর-রেশ ;
...যাবে বধূ সেই দেশ ?

পড়ে আছে পথ অতীত যুগের চেতনাহারা,
তুমি আর আমি চলেছি যাত্রী অসীমকাল ;
তোমারি নিবিড় কালো কুন্তলে জ্বলিছে তারা,
আঁকা আছে চোখে কত কাহিনীর ইন্দ্রজাল।
পাতালপুরীর প্রবাল দুয়ার কে রাখে খুলে,
ঘুমভরা চোখে কে জাগে প্রহর এলানো চুলে,
অযুত নাগিনী ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া আগলি রাখে,
—নয়ন প্রহরী জানে না ক্ষণিক তন্দ্রালেশ ;
...যাবে বধূ সেই দেশ ?

হিমপাণ্ডুর আকাশের নীচে কাঁপিছে রাত,
চাঁদ ডুবে গেছে দূরে দেবদারু সরল বনে ;
আমারে ঘিরিয়া কামনাতপ্ত ও দুটি হাত—
রহুক জাগিয়া নিবিড় মদির আলিঙ্গনে।
রূপকথা আজি মুখর হয়েছে কাহার চোখে,
কে যেন দাঁড়ায়ে মায়াবী নিশার স্বপ্নলোকে,
বিদায়ের ক্ষণে উষাতারকার অস্তপথে
কে আছে চাহিয়া কুটির দুয়ারে নির্নিমেষ—
...যাবে বধূ সেই দেশ ?

# বিপনের সংসার

### শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপিন সকালে উঠিয়া কলাই-চটা পেয়ালাটায় সবে এক পেয়ালা চা লইয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে দেখা গেল তেঁতুলতলার পথে লাঠি হাতে লম্বা চেহারার কে যেন হনহন করিয়া ওদের বাড়ির দিকেই চলিয়া আসিতেছে।

বিপিনের স্ত্রী মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, দেখ তো কে একটা মিন্সে এদিকে আসছে? বিপিন বলিল, জমিদার-বাড়ির দরওয়ান গো—আমি বুঝতে পেরেছি—ডাকের ওপর ডাক, চিঠি দিয়ে ডাক, আবার লোক পাঠিয়ে ডাক।

মনোরমা বলিল, তা এসেছ তো ধর আজ দিন কুড়ি। ডাক দেওয়ার আর দোষ কি? বিপিনের বড় ভ্রাতৃবধূ এই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, পলাশপুর থেকে বোধ হয় লোক আসছে—এগিয়ে যাও তো ঠাকুরপো।

বিপিন বিরক্তমুখে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল এবং আগন্তুক লোকটির সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া একখানি চিঠি হাতে সোজা রান্নাঘরে গিয়া মাকে বলিল, এই দেখ মা, ওরা আবার চিঠি লিখেছে—দুদিন যে জিরোব তার উপায় নেই।

বিপিনের মা বলিলেন, তা তো এয়েছ বাপু, কুড়ি বাইশ দিন কি তার বেশি। তাদের কাজের সুবিধের জন্যেই তো তোমায় রেখেছে? এখানে তুমি ব'সে থাকলে তাদের চলে?

সকলের মুখেই ওই এক কথা। যেমনই মা, তেমনই স্ত্রী। কাহারও নিকটে একটু সহানুভূতি পাইবার উপায় নাই। কেবল 'যাও—যাও' শব্দ, টাকা রোজগার করিতে পার—সবাই খুশি। তোমার সুখ-দুঃখ কেহই দেখিবে না।

বিরক্তির মাথায় বিপিন স্ত্রীকে বলিল, আর একটু চা দাও দিকি!

মনোরমা বলিল, চা আর হবে কি দিয়ে? দুধ যা ছিল সবটুকু দিয়ে দিলাম।

বিপিন বলিল, র চা খাব। তাই ক'রে দাও।

—চিনিও তো নেই, র চা-ই বা কেমন ক'রে খাবে?

—মাকে বল, ওঁর গুড়ের নাগরি থেকে একটু গুড় বের ক'রে দিতে—তাই দিয়ে কর।

মনোরমা ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, মাকে তুমি বল গিয়ে। বুড়ো মানুষ, দশমী আছে, দোয়াদশী আছে—ঐ তো একখানা গুড়ের নাগরি, তাও চা খেয়ে খেয়ে আদ্ধেক খালি হয়ে গিয়েছে। এখনও তিন মাস চললে তবে নতুন গুড় উঠবে—ওঁর চলবে কিসে? এদিকে তো নতুন এক নাগরি আখের গুড় কিনে দেবার কড়ি জুটবে না সংসারে। মায়ের কাছ থেকে রোজ রোজ গুড় চাইতে লজ্জা করে না?

বিপিন আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার মনটা আজ কয়দিন হইতেই ভাল নয়। প্রথম তো সংসারে দারুণ অনটন, তার উপর স্ত্রীর যা মিষ্টি বুলি। বেশ সে পলাশপুরই যাইবে। আজই যাইবে আর বাড়ি থাকিয়া লাভ কি? বাড়ির কেহই তেমন পছন্দ করে না যে, সে বাড়ি থাকে।

এমন সময়ে বাহির হইতে গ্রামের কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন, বাড়ি আছ হে?

বিপিন পাশের ঘরের উদ্দেশে বলিল, কেষ্ট কাকা আসছেন, স'রে যাও। পরে অপেক্ষাকৃত সুর চড়াইয়া বলিল, আসুন কাকা আসুন, এই ঘরেই আসুন।

কৃষ্ণলালের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু চুল বেশি পাকিয়া যাওয়ায় ও অর্দ্ধেক দাঁত পড়িয়া যাওয়ার দরুন, দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন, ও কে এসেছিল হে, তোমার বাড়ি একজন খোট্টা মত?

—ও পলাশপুর থেকে এসেছিল। আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

—বেশ তো, যাও না। এখানে ব'সে মিছে কষ্ট পাওয়া—

—আহা, সে জন্যে না কেষ্টকাকা। পলাশপুরে বাবা যখন চাকরি করতেন, সে এক দিন গিয়েছে। এখন প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করার দিন নেই। অথচ টাকা না আদায় করতে পারলে জমিদারদের মুখ ভার। আমি ধোপাখালির কাছারিতে থাকি; আর পলাশপুর থেকে ক্লাপ্ত লোক আসছে, ক্লাপ্ত লোক আসছে—ক্লাপ্ত টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও—এই বুলি। বলুন দিকি, আদায় না হ'লে আমি বাপের বিষয় বন্ধক দিয়ে এনে তোমাদের টাকা যোগাব মশায়?

কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, তোমার বাবার আমলের সেই পুরোনো মনিবই আছে তো? তারা তো জানে তুমি বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে—তোমার বাপের দাপটে—

—জানে ব'লেই তো আরও মুস্কিল। বাবা যে ভাবে খাজনা আদায় করতেন, এখনকার আমলে তা চলে না, কাকা,—অসম্ভব। দিনের হাওয়া বদলেছে, এখন চোখ কান ফুটেছে সবারই। সত্যি কথা বলছি, আমার ও কাজ ভাল লাগে না। প্রজা ঠেঙাবার জন্যেও না—তাতে আমার তত ইয়ে হয় না, কিন্তু জমিদার আর জমিদারগিন্নী ঘুন একেবারে। কেবল 'দাও দাও' বুলি। না দিলেই মুখ ভার।

—তা আর কি করবে বল! পরের চাকরি করার তো কোন দরকার ছিল না তোমার, বিনোদদাদা যা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন—পায়ের ওপরে পা দিয়ে ব'সে খেতে পারতে—সবই যে উড়িয়ে দিলে! বিনোদদাদাও চোখ বুজলেন, তোমরাও ওড়াতে সুরু করলে! এখন আর হা-হুতাশ করলে কি হবে, বল?

এ সব কথা বিপিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। স্পষ্ট কথা কাহারও ভাল লাগে না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে যাক কাকা, আমায় একটা শসার চারা দিতে পারেন? আছে বাড়িতে?

এই সময় বিপিনের বিধবা বোন বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দাদা, মা ডাকছে, একবার রান্নাঘরের দিকে শুনে যাও।

ইহার অর্থ সে বোঝে। সংসারে হেন নাই, তেন নাই—লম্বা ফর্দ্দ শুনিতে হইবে—মা নয়, স্ত্রীর নিকট হইতে। কৃষ্ণলাল বসিয়া থাকার দরুন মায়ের নাম দিয়া ডাক আসিতেছে।

বিপিন বলিল, বসুন কাকা, আসছি।

কৃষ্ণলাল উঠিয়া পড়িলেন, সকালবেলা বসিয়া থাকিলে তাঁর চলিবে না, অনেক কাজ তাঁর।

মনোরমা দালানের দোরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কেষ্টকাকার সঙ্গে গল্প করলে চলবে তোমার?

—ঘুরিয়ে না ব'লে সোজা ভাবেই কথাটা বল না কেন? কি নেই?

—কিচ্ছু নেই। এক দানা চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, একটি আলু নেই। হাঁড়ি চড়বে না এ বেলা।

বিপিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, না চড়ে না চড়ুক, রোজ রোজ পারি নে। এক বেলা উপোস ক'রে সব প'ড়ে থাক।

মনোরমা কড়াসুরে জবাব দিল, লজ্জা করে না এ কথা বলতে? আমি আমার নিজের জন্যে বলি নি। মা কাল একাদশীর উপোস ক'রে রয়েছেন, উনিও কি আজও উপোস ক'রে প'ড়ে থাকবেন? সব কি আমার জন্যে সংসারে আসে? ওই বীণারও গিয়েছে কাল একাদশী—ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায় নি তা ব'লে?

মনোরমার যুক্তি নিষ্ঠুর বটে কিন্তু অকাট্য।

বিপিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তেমাথার মোড়ের বড় তেঁতুলতলায় ছায়ায় একখানা যে কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে, তাহারই উপর আসিয়া বসিল।

চাল নাই, ডাল নাই, এ নাই, ও নাই—সে তো চুরি করিতে পারে না? একটি পয়সা নাই হাতে। বাজারের কোন দোকানে ধার দিবে না। বহু জায়গায় দেনা। উপায় কি এখন?

না, পলাশপুরেই যাওয়া স্থির। সেখানকার জীবন নরকযন্ত্রণার মত ঠেকে নানা কারণে, কিন্তু বাড়ির এ নরকযন্ত্রণার চেয়ে সে ভাল, তবুও তো দিন রাত মনোরমার মধুর বাক্যি আর কেবল 'নাই নাই' বুলি শুনিতে হইবে না? প্রজা ঠেঙানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি বাজে ওজর, ও কিছু না, সে বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে, প্রজা ঠেঙাইতে পিছপাও না; কিন্তু আর একটা কথাও আছে তাহার সেখানে যাইবার অনিচ্ছার মূলে।

ধোপাখালি কাছারির তহবিল হইতে সে জমিদারদের না জানাইয়া চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা আর শোধ দেওয়া হয় নাই। বিপিনের ভয় আছে, হয়তো এই ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই জমিদারের এত ঘন ঘন তাগাদা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য।

বিপিনের ছোট ভাই বলাই আজ চার পাঁচ মাস অসুস্থ। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যই টাকা কয়টির নিতান্ত দরকার ছিল। বলাইকে রাণাঘাটে লইয়া গিয়া বড় ডাক্তারকে দেখানো

হইয়াছে এবং এখন আগের চেয়ে সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন। বলাই বর্ত্তমানে রাণাঘাটেই মিশনারি হাসপাতালে আছে।

পরদিন পলাশপুরে যাওয়ার পথে বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে গেল। স্টেশন থেকে হাসপাতাল প্রায় মাইল খানেক দূরে। বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বলাই দাদাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—দাদা, আমায় এখানে এরা না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে, আমায় বাড়ি নিয়ে যাবে কবে? আমি তো সেরে গেছি, না খেয়ে মলাম; তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বাড়ি কবে নিয়ে যাবে বল।

—খেতে দেয় না তোর অসুখ ব'লেই তো। আচ্ছা, আচ্ছা, পলাশপুর থেকে ফিরবার পথে তোকে নিয়ে যাব ঠিক। কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—মাংস খাই নি কতদিন। মাংস খেতে ইচ্ছে হয়—বৌদিদির হাতে রান্না মাংস—

—আচ্ছা হবে হবে। এই মাসেই নিয়ে যাব।

বিপিন আড়ালে নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাই মাংস খেতে চাইছে—একটু আধটু—

নার্স এদেশী খ্রীষ্টান, পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত ছিল, গোলগাল, দোহারা, বেশি বয়েস নয়—ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, মাংস খেয়ে মরবে যে! নেফ্রাইটিসের রুগী, অত্যন্ত ধরপাকড়ের মধ্যে না রাখলে যা একটু সেরে আসছে, তাও যাবে। মাংস!

বৈকালের দিকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বিপিনের বাবা ৺ বিনোদ চাটুজ্জে এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিপিনের জমিদার বাড়ির সর্ব্বত্র অবাধগতি। সে অন্দরে ঢুকিতেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আরে এস এস বিপিন, কখন এলে? তারপর তোমার ভাই এখনও সেই হাসপাতালেই রয়েছে? কেমন আছে আজকাল?

জমিদার অনাদি চৌধুরী বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া দোতলা হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, ও কে? বিপিন না? এলে এতদিন পরে? দশ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে করলে দুমাস। এ রকম ক'রে কাজ চলবে? দাঁড়াও, আমি আসছি—

বিপিন জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণীর বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, রং ফর্সা, মোটাসোটা চেহারা, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, হাতে দুই গাছা সোনার বালা ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। তিনি বলিলেন, এস এস, বেঁচে থাক। তোমাকে ডাকার আরও বিশেষ দরকার, খুকীকে নিয়ে জামাই আসছেন বুধবারে। ঘরে একটা পয়সা নেই। ধোপাখালির কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। তাগাদাপত্র না করলে জামাই এলে একেবারে মুস্কিলে প'ড়ে যেতে হবে। সেই জন্যে কর্ত্তা তোমার ওখানে কাল লোক পাঠিয়েছিলেন তোমায় নিয়ে আসতে।

অনাদি চৌধুরী ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ষাটের উপর, বর্ত্তমান গৃহিণী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। বাতের রোগী বলিয়া খুব বেশি নড়াচড়া করিতে পারেন না, যদিও শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ। এক সময়ে দুর্দ্দান্ত জমিদার বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অনাদি চৌধুরী বলিলেন, খুকী আসছে বুধবারে। এদিকে ধোপাখালি কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। একটি পয়সা আদায়-তশিল নেই। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা যে কি, তাও তো বুঝি নে। তোমার বাবার আমলে এই মহল থেকে তিনশো টাকা ফি মাসে আদায় ছিল আর এখন সেই জায়গায় পঞ্চাশ ষাট টাকা আদায় হয় না। তুমি কাল সকালেই চ'লে যাও কাছারিতে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে আমার চল্লিশটা টাকা চাইই, নইলে মান যাবে, জামাই আসছে এতকাল পরে, কি মনে করবে? আদর যত্ন করব কি দিয়ে?

জমিদার-গৃহিণী বলিলেন, আর আসবার সময় কিছু কুমড়ো, বেগুন, থোড় কিম্বা মোচা আর যদি পার ভাল মাছ একটা রঘুদের পুকুর থেকে, আর কিছু শাকশব্জি আনবে। ঘানি-ভাঙানো সর্ষে তেল এন আড়াই সের, আর এক ভাঁড় আখের গুড় যদি পাও—

বিপিন মনে মনে হাসিল। জমিদার-গৃহিণী যে এ সমস্ত আনিতে বলিতেছেন, সবই বিনামূল্যে প্রজা ঠেঙাইয়া। নতুবা পয়সা ফেলিলে জিনিসের অভাব কি? 'যদি পাও' কথার মানেই হইল 'যদি বিনামূল্যে পাও'—এমন ছোট নজর, আর এমন কৃপণ স্বভাব! পরের জিনিস এমনই যোগাইতে পার, খুব খুশি। দায় পড়িয়াছে বিপিনের পরের শাপমন্যি কুড়াইয়া তাঁহাদের জন্যে বেসাতি আনিবার, এমনই তো ছোট ভাইটা হাসপাতালে পড়িয়া শুকিতেছে! এই সব জন্যেই এখানকার চাকুরির অন্ন তাহার গলা দিয়া নামে না।

পলাশপুর হইতে ধোপাখালির কাছারি আট ক্রোশ। নায়েবের জন্য গাড়ি ব্যবস্থা করিবেন তেমন পাত্র নন অনাদি চৌধুরী—সুতরাং সারা পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিপিন কাছারি পৌঁছিল। কাছারি-ঘরে কানেস্ত্রা-কাটা টিনের দেওয়াল, চাল খড়ের। স্থানীয় জনৈক নাপিতের পুত্র মাসিক বারো আনা বেতনে কাছারিতে ঝাঁটপাটের কাজকর্ম্ম করে। বিপিন তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল, সে ঘর খুলিয়া ঝাঁট দিয়া কাছারি-ঘরটাকে রাত্রিবাসের কতকটা উপযোগী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু বিপিনের ভয় হইতেছিল, মেঝেতে যে রকম বড় বড় চার পাঁচটা ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছে রাত্রিবেলা সাপখোপ না বাহির হয়।

চাকর ছোকরা একটি কাচভাঙ্গা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিয়া বলিল, নায়েববাবু, রাত্রে কি খাবা?

—কিছু খাব না। তুই যা।

—সে কি বাবু! তা কখনও হ'তে পারে? খাবা না কিছু, রাত কাটাবা কেমন ক'রে? একটু দুধ দেখে আসি পাড়ার মধ্যে, আপনি বসেন বাবু।

এই ছোকরা চাকর যে যত্ন করে, দরদ দেখায় বিপিন অনেক আপনার লোকের কাছেও তেমন ব্যবহার পায় নাই, একথা তাহার মনে হইল।

অন্ধকার রাত্রি।

কাছারির সামনে একটু ফাঁকা মাঠ, অন্য সব দিকে ঘন বাঁশবন, এক কোণে একটা বড় বাদামগাছ। অনাদি চৌধুরীর বাবা ৺হরিনাথ চৌধুরী কাছারি-বাড়িতে এটি সখ করিয়া পুঁতিয়া-

ছিলেন, ফলের জন্য নয়, বাহার ও ছায়ার জন্য। বাঁশবনে অন্ধকার রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে, মশা বিনবিন করিতেছে কানের কাছে—কাছারির কাছাকাছি লোকজনের বাস নাই—ভারী নির্জ্জন।

বিপিন একা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কথাই মনে আসে! বাড়ি হইতে আসিয়া মন ভাল নয়, কাল হাসপাতালে ছোট ভাইটার রোগশীর্ণ মুখ মনে পড়িল। মনোরমার ঝাঁঝালো টক্ টক্ কথাবার্ত্তা। সংসারের ঘোর অনটন। বাজারে হেন দোকান নাই, যেখানে দেনা নাই। আজ শনিবার, সামনের বুধবারে মহল হইতে চল্লিশটা টাকা ও একগাদা ফল তরকারিপত্র, মাছ, দই জমিদার-বাড়ি লইয়া যাইতে হইবে জামাইয়ের অভ্যর্থনা যোগাড় করিতে। তিন দিনের মধ্যে এ গরীব গাঁয়ে চল্লিশ টাকা হওয়া দূরের কথা, দশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ জমিদার বা জমিদার-গিন্নী তা বুঝিবেন না—দিতে না পারিলেই মুখ ভারী হইবে তাঁদের! কি বিষম মুস্কিলেই সে পড়িয়াছে। অথচ চিরকাল তাহাদের এমন অবস্থা ছিল না। বিপিনের বাবা এই কাছারিতে এক কলমে উনিশ বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, এই জমিদারদের কাজে। যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতেন, বাড়িতে লাঙল রাখিয়া চাষবাস করাইতেন, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট নামডাক, প্রতিপত্তি ছিল।

বাবা চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল। কতক গেল দেনার দায়ে, কতক গেল তাহারই বদ্খেয়ালিতে। অল্প বয়সে কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া কুসঙ্গীর দলে ভিড়িয়া স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়া টাকা তো উড়িলই, ক্রমে জমিজমা বাঁধা পড়িতে লাগিল।

তারপর বিবাহ। সে এক মজার ব্যাপার।

তখনও পর্য্যন্ত যতটুকু নামডাক ছিল পৈতৃক আমলের, তাহারই ফলে এক অবস্থাপন্ন বড় গৃহস্থের ঘরের মেয়ের সহিত হইল বিবাহ। মেয়ের বাবা নাই, কাকা বড় চাকুরি করেন, শালাশালীরা সব কলেজে-পড়া, বিপিন ইংরেজীতে কোনও রকমে নাম সই করিতে পারে মাত্র। মনোরমা শ্বশুর-বাড়ি আসিয়াই বুঝিল বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক, এখানকার ভিতরের অবস্থা অন্তঃসারশূন্য। সে বড় বংশের মেয়ে, মন গেল তার সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া, স্বামীর সহিত সদ্ভাব জমিতে পাইল না যে, ইহাতে বিপিন মনে প্রাণে স্ত্রীকে অপরাধিনী করিতে পারে কই?

—এই যে নায়েববাবু, কখন এলেন? দণ্ডবৎ হই।

বিপিনের চমক ভাঙিল, আগন্তুক এই গ্রামেরই একজন বড় প্রজা, নরহরি দাশ জাতিতে মুচি, শূওরের ব্যবসা করিয়া হাতে দুপয়সা করিয়াছে।

বিপিন বলিল, এস নরহরি, বড় মুস্কিলে পড়েছি, বুধবারের মধ্যে চল্লিশটি টাকার যোগাড় কি ক'রে করি বল তো? বাবুর জামাই মেয়ে আসবেন, টাকার বড্ড দরকার। আমি তো এলাম দুমাস পরে। টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার তো মান থাকে না—কি করি, ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম যে!

নরহরি বলিল, এসব কথা এখন নয় বাবু। খাওয়া দাওয়া করুন, কাল বেলবেলা আমি

আসপো কাছারিতে—তখন হবে। ইতিমধ্যে কাছারির ছোকরা চাকর একটা ঘটিতে কিছু দুধ ও কোঁচড়ে কিছু মুড়ি লইয়া ফিরিল।

নরহরি বলিল, আপনি সেবা করুন নায়েববাবু, আজ আসি। কাল কথাবার্ত্তা হবে। কাছারি-ঘরের দোরটা একটু ভাল ক'রে আগড় বন্ধ ক'রে শোবেন রাতে—বড্ড বাঘের ভয় হয়েছে আজ কড়া দিন।

বিপিন সকালে উঠিয়া একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তহবিলের টাকার ঘাটতি ইহারা টের পায় নাই। তবুও টাকাটা এবার তহবিলে শোধ করিয়া দিতে হইবে, জমিদার হিসাব তলব করিতে পারেন, এত দিন পরে যখন সে আসিয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ আশি টাকার আপাততঃ দরকার, এই তিন দিনের মধ্যে।

সে ঘোর দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেল। তিনটি দিন বাকি মোটে। এখন কোন ফসলের সময় নয়, আশি টাকা আদায় হইবে কোথা হইতে? পাইক গিয়া প্রজাপত্র ডাকাইয়া আনিল, সকলের মুখেই এক বুলি, এখন টাকা তারা দেয় কি করিয়া?

নরহরি দাশ পনরটি টাকা দিল। ইহার বেশি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও হইবে না। বিপিন নিজে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া আরও দশটি টাকা আদায় করিল দুইদিনে। ইহার বেশি হওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব।

বিপিন একবার কামিনী গোয়ালিনীকে ডাকাইল।

এ অঞ্চলে অনেকে জানে যে, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে কামিনীর নাকি বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন কামিনীর বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন, একহারা, শ্যামবর্ণ—হাতে মোটা সোনার অনন্ত। সে বিপিনকে স্নেহের চক্ষে দেখে, বিপিন যখন দশ বারো বছরের বালক, বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসিত, তখন হইতেই সে বিপিনকে জানে। বিপিনও তাহাকে সমীহ করিয়া চলে।

কামিনী প্রথমে আসিয়াই বিপিনের ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

—বাবা, তারে তুমি কলকেতায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডাক্তার টাক্তার দেখাও—ওখানে বাঁচবে না। রাণাঘাটের হাসপাতালে কি হবে? ছোঁড়াডাকে তোমরা সবাই মেলে মেরে ফেলবা দেখছি।

—করি কি মাসীমা, জান তো অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে আগের মত জুত নেই। বাবার দেনা শোধ দিয়ে—

কামিনী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, কর্ত্তার দেনার জন্যে যায় নি—গিয়েছে তোমার উড়ুঙ্কুড়ে স্বভাবের জন্যে—আমি জানি নে কিছু? কর্ত্তা যা রেখে গিয়েছিলেন ক'রে, তাতে তোমাদের দুই ভায়ের ভাতের ভাবনা হ'ত না। বিষয়-আশয়, গোলাপালা, তোমার পৈতের সময় হাজার লোক পাত পেড়ে ব'সে খেয়েছিল। কম বিষয়ডা ক'রে গিয়েছিলেন কর্ত্তা? তোমরা বাবা সব ঘুচুলে। তাঁর মত লোক তোমরা হ'লে তো!

বিপিন দেখিল সে ভুল করিয়াছে। বাবার কোন ত্রুটীর উল্লেখ ইহার সামনে করা উচিত

হয় নাই—সে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে কামিনী মাসী তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কাছে কিছু টাকা আদায় করিতে হইবে, রাগাইয়া লাভ নাই। সুর বেশ মোলায়েম করিয়া বলিল, ও কথা যাক মাসীমা, কিছু টাকা দিতে পার, এই গোটা চল্লিশ টাকা। কিস্তির সময় আদায় ক'রে আবার দেব।

কামিনী পূর্ব্ববৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, টাকা, টাকা! টাকার গাছ দেখেছ কিনা আমার? সেবার এক কাঁড়ি টাকা যে নিলে আর উপুড় হাত করলে না; আর একবার দিলাম কুড়ি টাকা পুজোর সময়; তোমার কেবল টাকার দরকার হ'লেই—মাসী মাসী। বাতে যে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম কুড়ি পঁচিশ দিন—খোঁজ করেছিলে মাসীমা ব'লে?

বিপিন কামিনী মাসীকে কি করিয়া চালাইতে হয় জানে। তরুণ তরুণীদের কাছে প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়াদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাহারা জানে উহাদের কি করিয়া হাতে রাখিতে হয়। সুতরাং বিপিন হাসিয়া বলিল, খোকার ভাতের সময় তোমায় নিয়ে যাব ব'লে সব ঠিক মাসী, এমন সময় বলাইটা অসুখে পড়ল; তোমার টাকা কড়িও সব তো এতদিন শোধ হয়ে যেত, ওর অসুখটা যদি না হ'ত। [ ক্রমশ ]

## শারদীয়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম.এ.

কল্পনা-সমুদ্রে মোর বাড়ব-অনল
জ্বালিয়াছে বহ্নির বিলাস!
দিক-বলয়িত এই সুনীল দর্পণ
স্বপ্নে-মেলা আঁখি চেয়ে করিছে দর্শন
খাণ্ডবের নব সর্ব্বনাশ।

কল্পনার স্পর্শমণি অন্তিম উল্লাসে
যেথা সেথা ফিরি পরশিয়া;
মৃত্তিকার কালোরূপে কৃষ্ণা যেন হাসে,
ঘাসের শিশির-কণা মুক্তার আভাসে
মুহূর্ত্তেকে উঠে সুবর্ণিয়া।

আশ্বিনের ধান্যক্ষেত্রে যে মন্ত্র উচ্চারি
সোনা করে শরৎ চঞ্চল,
সে মন্ত্র কে দিল আজ আমাতে সঞ্চারি—
অকস্মাৎ হ'ল কেন নীলকান্ত বারি
হিরণ্ময় বহ্নির কমল।

# সমসাময়িক সাহিত্য

শ্রীগোপাল হালদার, এম.এ., বি.এল.

সমসাময়িক সাহিত্যের গোড়ার কথাই আজ সাহিত্য-সঙ্কট। যে সময়ে মানুষের ইতিহাসই এক কঠিন সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে সে সময়ের সাহিত্যেও যে তাহার ছাপ পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কারণ, সাহিত্য আকাশ-কুসুম নয়--মানুষের জীবন-বোধেরই এক পরিচয়। সে জীবনই যখন নানা প্রশ্ন, নানা চিন্তা ও চিন্তা-হীনতার কোলাহলে ভরিয়া উঠিয়াছে তখন সাহিত্যেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিবেই।

কিন্তু কথাটা এইখানেই শেষ হয় না—শত কোলাহল সত্ত্বেও জীবন কোলাহল মাত্র নয়, সে এক সন্ধান, এক অন্তহীন জিজ্ঞাসা। জীবন-বোধও তাই শুধু কোলাহলকেই চূড়ান্ত বা একান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না—সমগ্র জীবনকে একটি সমগ্রদৃষ্টিতে গ্রথিত করিয়া লইতে চায়—সাদা কথায়, একটা মানে খুঁজিয়া লয়। সাধারণ মানুষ যাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না,—জানে না, বুঝে না,—সাহিত্যিক সেই মানেই তাহার সম্মুখে ধরে; চকিতের মত জীবনের সঙ্গে এইভাবে মানুষের পরিচয় ঘটে—যে জীবনের ঘূর্ণাবর্তে সে পাক খাইয়াও তাহার রূপটি চিনিতে পারে নাই, এইবার তাহার রূপ ও রহস্য তাহার অন্তরের অনুভূতি-লোকে আসিয়া দেখা দেয়। সাহিত্য যেখানে সত্য হয়, সেখানে এমনই একটি স্পর্শ সে পাঠকের মনে দিতে পারে—দেয়ও;—পাঠকের মন তাহাতে একটি নূতন প্রসারতা ও নূতন গভীরতা লাভ করে—কারণ, জীবনকে সে দেখিতে পায়, দেখিবার মত একটি দৃষ্টিভঙ্গি তাহার আয়ত্ত হয়। এই হিসাবেই সাহিত্যকে বলা হয় নিত্যকালের জিনিস, সৃষ্টি;—জীবন-চিত্রের শুধু প্রতিচ্ছায়া নয়, জীবন-রহস্যের এক রূপময় প্রকাশ—আবিষ্কার ও উদ্ঘাটন।

এ সাহিত্য অবশ্য প্রতিদিন জন্মায় না, আর ইহাও অবশ্য সমসাময়িককালের আলো-জল-বাতাস হইতেই নিজের জীবনোপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়, তবু এতদিন পর্য্যন্ত মানুষ ইহাকেই সাহিত্যের আদর্শ, ইহার মানদণ্ডকেই সাহিত্যের খাঁটি মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। প্রতি চিত্তের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া জীবন যে অফুরন্ত রূপ ও গভীর রহস্যের ছায়াপাত করিয়া যায়—সাহিত্যিকের সৃষ্টি তাহারই এক-একটি দিকের সন্ধান বহন করিয়া আনে, একমাত্র তাহারই মনে আছে সেই দৃষ্টির ও সৃষ্টির শক্তি,—এই ছিল এতদিনকার জানা কথা। এই হিসাবেই সাহিত্যের দাবি ছিল কালাতীত ও দেশাতীত; সাহিত্যিকের দায়িত্ব ছিল একমাত্র সৃষ্টির দায়িত্ব, তাহার ধর্ম্ম ছিল তাহার নিজস্ব—অর্থাৎ সৃষ্টির ধর্ম্ম। সমসাময়িক জীবনের উচ্ছল অশান্ত স্রোত হইতে সে দূরে থাকিতে পারিত, দূরে থাকিতও—চিরকালের জীবন-পারাবারের উদাত্ত সঙ্গীত শুনিবার জন্য, আপনার কণ্ঠে সেই সুর ধ্বনিয়া তুলিবার জন্য।

কিন্তু এ যুগের সাহিত্যে আর সেই আদর্শ নাই, সেই মানদণ্ডই বর্জ্জিত হইতে চলিয়াছে, সেই দাবি ও দায়িত্ব, দুইই এই যুগের সাহিত্যিক সমাজ অস্বীকার করিতে বসিয়াছেন। সাহিত্যিকের নিজস্ব তেমন কোনও ধর্ম্ম আছে কিনা তাহাই তাঁহারা সন্দেহ করেন। এই সন্দেহ, এই অস্বীকৃতি,—শুধু থিওরি হিসাবে নয়,—এই যুগের সৃষ্টি-প্রয়াসের মধ্য দিয়াই এমনই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে,

আজ অনেক সাহিত্যিকেরই সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা মনে উঠিয়াছে, এই সাহিত্য-সঙ্কটের শেষ কোথায়, অনেকেই তাহা ভাবিতে সুরু করিয়াছেন। স্টর্ম জেমিসন 'বর্ত্তমান ইংরেজী উপন্যাসের গলদ কোথায়' তাহা বিচার করিতেছেন; কিন্তু সমস্ত সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা পরিস্ফুট হইয়াছে সুন্দররূপে মিসেস ভার্জিনিয়া উল্ফের 'থ্রী গিনিজ', হার্বার্ট রীডের 'পোয়েট্রি অ্যাণ্ড এনার্কিজম্', জর্জ দুহামেলের 'ইন ডিফেন্স অব লেটার্স' এবং লীগ অব নেশান্সের ইণ্টার্ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ ইণ্টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পল্ ভ্যালেরির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একটি অধিবেশনের (২০-২৪এ জুলাই, ১৯৩৭) বক্তৃতা-প্রবন্ধাদির বিবরণ 'ল্য দেশতাঁ প্রোশেঁ দ্য লেতর্স' নামীয় গ্রন্থাদিতে। এই সব গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আবার 'টাইম্‌স্ লিটররি সাপ্‌লিমেণ্ট' ও অন্যান্য সাহিত্যিক পত্রে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল লেখক নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। মোটের উপর, সাহিত্যে যে সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২

মিসেস ভার্জিনিয়া উল্ফ তাঁহার পুস্তিকাখানা উদ্দেশ করিয়াছেন এক কল্পিত শান্তিবাদী সমিতির সম্পাদককে, যেন তাঁহারই পত্রোত্তর। উহাতে 'শান্তি' ছাড়া আর দুইটি বিষয়েও তাঁহাকে আলোচনা করিতে হয়—মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কথা, ও মেয়েদের জীবিকার্জ্জনের কথা। এই তিন জিনিসকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি সমাজ ও সাহিত্যের অবস্থা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করেন, তাঁহার অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গিতে। তাঁহার মতে যুগটায় এক 'বুদ্ধির বেশ্যাবৃত্তি' (intellectual harlotry) দেখা দিয়াছে। বুদ্ধিজীবীর দল হয় ব্যবসায়বুদ্ধিতে সাধারণের মনস্তুষ্টি করিবার মত কৌশল খুঁজিতেছেন, নয় ভয়ে বা মূঢ় ভক্তিতে মার্কামারা 'ইডিয়লজি'র উপাসনা জুড়িয়া দিয়াছেন। দুহামেলও এই দুই জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন—"আশ্চর্য্য এই, যে সভ্যতা আমাদের স্নায়ুসমূহকে ক্ষয় করিয়া দিতেছে, আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্মের জন্ত ক্লেশ-কর প্রয়াস দাবি করিতেছে, তাহাই জনগণকে দিতেছে সকল প্রকার বুদ্ধি-প্রয়োগের হাত হইতে নিষ্কৃতি।" এবং "পলিটিক্‌স পেঁয়াজের মত, ওর ঝাঁঝ এত উগ্র যে না দিলে ভাল খাবারেও স্বাদ হয় না।" 'ল্য দেশতাঁ প্রোশেঁ দ্য লেতর্সে'র লেখক বহু—জাঁ রিশার ব্লক, জুল রোমে, দুহামেল আছেন ফ্রান্সের, সিঞর মাদারিয়েগা স্পেনের, গিল্‌বার্ট মারে, ই. এম. ফরস্টার প্রভৃতি ছাড়াও চার্লস মর্গ্যান ও হের ফ্রানংস ভেরফেল প্রভৃতির লেখা বাহির হইয়াছে—ভ্যালেরির পৌরোহিত্যে। ভ্যালেরি বলিতেছেন—"স্থির ও ভাব-গম্ভীর নিবন্ধ লোপ পাইতে বসিয়াছে। মোটরে, সিনেমায়, দৈনিকপত্রের খবরের তাড়নায় মানুষের চিত্তে এমনই এক অস্থিরতা আনিয়া দিয়াছে যে, তাহাতে রূপসৃষ্টি বা রূপবিচার আর সম্ভব নয়। কোন কিছুই আজ গভীর দৃষ্টিতে না দেখাই হইয়াছে নিয়ম।"

এই সমস্ত জিনিসের মধ্য দিয়া দুইটি লক্ষণই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে—এক, পাঠকসমাজ আজ মানসিক প্রয়াসে বিমুখ, দুই, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আজ বন্দী। লক্ষ্য করিবার মত এই যে, এই লেখকসম্প্রদায় নীতিহীনতার কথা বলেন নাই। আমাদের দেশে আধুনিক সাহিত্য বা অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিলে যে আপত্তি উঠে, তাহা অনেকাংশেই নৈতিক। কিন্তু সুনীতি বা দুর্নীতি সাহিত্যের পক্ষে আজ একেবারে অবান্তর কথা—এই লেখক-লেখিকাদের আলোচনায় তাহার উল্লেখও প্রায় নাই। লেখক মাত্রই জানেন সাহিত্যের বিচারে উহা নিতান্তই গৌণ বরং গৌণ না হইলেই বিপদ। 'আর্য্য সুনীতি' ও সমাজতান্ত্রিক গণনীতির দাবি মিটাইতে হয় বলিয়াই তো জার্মানি ও রুশিয়ার সাহিত্যের মধ্যে আজ প্রাণবান জিনিস দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। এই সব সাহিত্যিকরা বরং বলিতে চাহেন—সাহিত্যের একটি মাত্র নীতি আছে—সে সৃষ্টি-নীতি; আর যে সাহিত্য গভীরভাবে আমাদের স্পর্শ করে, তাহাতে একটি মাত্র বৃহত্তর ধর্ম্মের সন্ধান পাই—সে প্রাণধর্ম্ম—উহার সহিত সমাজের বিধি-নিয়মের বিরোধিতাই থাকিতে পারে বেশি।

অবশ্য সমাজধর্ম্মও প্রাণধর্ম্মকে না মানিয়া চলিতে পারে না, পারে না বলিয়াই সমাজ বারে বারে বদলায়,

আপনার নীতির আদর্শও সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া লয়। আমাদের সমাজে সেই পরিবর্ত্তনের ধারাটি অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রায় বন্ধ হইয়া ছিল, মধ্যযুগের বিধিব্যবস্থা ছাড়াইয়া বর্ত্তমানের মধ্যে তাই প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাই আমাদের নীতি-নিয়মও খুব দৃঢ়মূল হইয়া আছে। আজ হঠাৎ বাহিরের ধাক্কায় আমাদের সমাজের সেই মধ্যযুগীয় ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছে, কাজেই নীতির সেই সনাতন সৌধ-চূড়া যে ভাঙিয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু ব্যাপারটা সহজ নয়—অনেক দিনের অনেক ধারণা চুরমার হইতে চলিয়াছে, আপত্তি উঠিবে, কলহ উঠিবেই, নিতান্ত অহিংস জাত না হইলে রক্তপাতও হইতে পারিত। ইহা সহজ কথা, কিন্তু আমাদের দেশে এই পরিবর্ত্তনের স্রোতটি ঘোলাইয়া উঠিয়াছে কতকগুলি অনন্যসাধারণ কারণে। পশ্চিমের সংস্পর্শেই আমরা বাঁচিয়াছি। কিন্তু আমাদের জীবন উহার তাড়নায় এত রূপান্তরিত হয় নাই যে, পশ্চিমের প্রবর্দ্ধিত সভ্যতার উদ্দাম সমস্যাগুলি আমাদের আধা-সেকেলে আধা-একেলে সমাজে তেমন ভাবে এখনই দেখা দিবে। তাই, পশ্চিমী চিন্তা ও মানসিকতাও ঠিক তেমন ভাবে আমাদের এই আবেষ্টনীতে অঙ্কুরিত হইবার কথা নয়। অথচ, আমরা পশ্চিমেরই দাস, আমাদের সাহিত্য পশ্চিমের মানসপুত্র, পশ্চিমা কলমের চারা। তাই, পশ্চিমের-পূর্ব্বের দুই মানসিক আবহাওয়া মিলাইয়া এক অদ্ভুত জগতে আমাদের সাহিত্যিকরা নিজেদের বাস রচনা করেন। স্থানটি ত্রিশঙ্কুর উপযুক্ত, আমাদের দেশীয় আধুনিক সাহিত্যেরও এই ত্রিশঙ্কুর দশা। উহা নীতিহীন নয়—স্থিতিহীন। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যে সঙ্কট আছে, কারণ আমরা পৃথিবীর বাহিরে নই; কিন্তু উহার খানিকটা নকল সঙ্কট—subjective, objective নয়। যেটুকু জয়েসের পাউণ্ডের ইলিয়টের বই পড়িয়া আমরা আমাদের বলিয়া চালাইতে চাই। প্রেরণাটা বইয়ের—জীবনের নয়।

৩

'লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে'র লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অতৃপ্তি এই বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—"মাপকাঠি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মূল্যে ভেজাল চলিয়াছে; স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছে, সাহিত্যে সাধারণতন্ত্রের উপর পণ্যের ও রাষ্ট্রদর্শনের একনায়কত্ব চাপিয়া বসিয়াছে; লেখকের ব্যবসায়ে আজ যখন এত আর্থিক পুরস্কার জুটিতেছে যে, পূর্ব্বযুগের পক্ষে তাহা কল্পনাও করা চলিত না, লেখার পরিমাণও তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু লেখার আর্ট পুষ্টির অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে, প্রীতির অভাবে দিনে দিনে ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিয়াছে।"

এই সব উক্তির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের বিভ্রান্তির কতকগুলি কারণ দেখিতে পাই, তাহা সংক্ষেপে এই—পণ্যের অপরিমিত প্রসারে পৃথিবীব্যাপী একটা ব্যবসায়িক বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে ও দিনে দিনেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই, সাহিত্যও 'বিজ্‌নেস' হইয়া উঠিয়াছে, উহা আর্ট না থাকিয়া ক্রাফ্‌ট বা ইন্‌ডাস্ট্রিতে পরিণত হইতেছে, এই জিনিসটিকেই ডাক্তার গ্রেন্‌ভিল বার্কার তাহার 'ইংলিশ অ্যাসোসিয়েশানে'র বক্তৃতায় বলিয়াছেন "পালিশ করা বর্ব্বরতা" (veneered barbarism)। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে স্বরাজ্য নাই, স্বাধীনতা নাই—নানারূপ রাষ্ট্রমতের জবরদস্তিতে লেখকের মনের আকাশ ঢাকা পড়িতেছে। মিস্টার হার্বার্ট রীড এই প্রভুত্বপরায়ণতা বা ইডিয়লজিকে, ফাশিস্ত বা কম্যুনিস্ট দাবিকেই সাহিত্যের অবনতির বড় কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। মুখ্যত এই কারণগুলি হইতেই আরও কয়েকটি কারণ উদ্ভূত হইয়াছে বা উহাদের সঙ্গে জড়াইয়া আছে—যেমন বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্রিক আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্ত্তন এত দ্রুত সাধিত হইতেছে যে, উহাতে খাঁটি সাহিত্যের অপেক্ষা অন্যরূপ উত্তেজক বা আমোদদায়ক জিনিসের চাহিদা বাড়িয়াছে—সিনেমা, বেতারবার্ত্তা এই ভাবেই সাহিত্যকে হটাইয়া মানুষের মন দখল করিতেছে। আর তাই, সাধারণের মধ্যে লেখা-পড়া যেরূপ ছড়াইয়াছে তাহাদের রুচির তেমন উন্নতি ঘটে নাই। অথচ, ইহারাই এখন সাহিত্যিকের অন্নদাতা আগেকার দিনে সাহিত্যের সহায়ক ছিলেন দুই চারিজন রাজা-রাজড়া; তারপর দশ বিশজন অভিজাত মুরুব্বি; তারও পরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজ। তাঁহাদের রুচি ছিল; কিন্তু এখনকার দিনে সাহিত্যিক একদিকে যেমন কাহারও পারিষদ নন, কৃপার প্রার্থী নন, তেমনই রুচির

কদরও আর পাইবার আশা করেন না। এই যুগে কি আর ড্রাইডেনের প্রবন্ধাবলী, ডাক্তার জনসনের আলাপ-আলোচনা কিম্বা কোলরিজের বক্তৃতাদি শুনিবার মত তেমন রুচিবান্ আগ্রহশীল শ্রোতৃমণ্ডলী লাভ করা যাইত? সাহিত্য,—রস-সাহিত্য ও রসবিচার—এযুগের লেখক বলিতে পারেন, 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'।

এই লক্ষণটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—মানুষের অক্ষরজ্ঞান বাড়িতেছে, কিন্তু রুচিবোধ পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা নাই। রুচি-পরিমার্জ্জনা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। শ্রম কমানোই এই যুগের বিশেষ সাধনা—মানসিক শ্রমই বা কমাইবে না কেন? ব্যবসায়ী বুদ্ধি সেই প্রয়াস-পরিশ্রমটুকুও ফাঁকি দিবার মত যন্ত্র মানুষের জন্য বাহির করিয়া দিয়াছে।—অবসর-বিনোদন এখানে বিনা আয়াসেই করা যায়—সিনেমা, রেডিয়ো-ই তাই। আমোদ পাইবার জন্য সেখানে দর্শক বা শ্রোতার বিন্দুমাত্রও যত্ন করিতে হয় না—ল-সা-গু করা রুচির জন্যই ঐসব আয়োজন। কিন্তু সাহিত্য চায় গরিষ্ঠ রুচি, সাহিত্য চায় পাঠকের পক্ষেও মনঃসংযোগ, আত্মিক যোগস্থাপনা। এ যুগ চিত্তবিনোদনের যুগ, অথচ সাহিত্যের লক্ষ্য চিত্তের আনন্দ।

তাই, বামপন্থী গ্রন্থকারসমাজ বেশ সদর্পেই বলিয়াছেন—"সাহিত্য মরিয়াছে, জনসমাজ আর সাহিত্যে আগ্রহ (interest) বোধ করে না, করিবেও না।" কিন্তু যাহাতে জনসমাজের আগ্রহ নাই, তাহা কি বাঁচিবারও অযোগ্য? দক্ষিণপন্থী লেখকের দল নিশ্চয়ই উহাতে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিবেন—না কিছুতেই না। বরং জনসমাজেরই বাঁচিতে হইবে মুষ্টিমেয় তাহার নায়কের ইঙ্গিতে, অবশ্য লেখকসমাজকেও মানিতে হইবে সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই নির্দ্দেশ। এককালে লেখকসমাজ ফ্রেডারিক দি গ্রেট কি ক্যাথারিন দি গ্রেটের মুখাপেক্ষী ছিলেন বটে, কিন্তু সেখানেও এত আত্মবিক্রয় করিতে হইত না। তাহা ছাড়া—এ যুগের সর্ব্বনিয়ন্তাদের রসবোধ বা রুচি কি দরের তাহা বলা বিপজ্জনক, তবে বলা নিষ্প্রয়োজনও।

৪

বুদ্ধি যে আজ রূপোপজীবিনী, তাহার কারণ আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, আজিকার সভ্যতা পণ্যোপজীবিনী। এই পণ্য-সমৃদ্ধ সভ্যতার ভিতরে ভিতরে যে পচন ধরিয়াছে তাহা জীবনে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাই আবার জীবনের রসরূপেও প্রতিফলিত হইয়াছে—তাই, সাহিত্যিক সমাজে এত বিরোধ ও বিকৃতি, এত আত্মাবমাননা ও আত্মাস্বীকৃতি, এত দুর্ভাবনা ও নৈরাশ্য। স্টর্ম জেমিসন ইহারই লক্ষণ দেখিয়াছেন স্বয়ং ভার্জিনিয়া উল্‌ফের শেষ উপন্যাস 'দি ইয়ার্স'-এ। একটা প্রাণহীনতা, একটা অসত্যতা ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, মিসেস উল্‌ফের লেখা উপন্যাসেরও এই দশা! কিন্তু ইহার কারণ—এই উপন্যাসের চরিত্র-উপাদান নিষ্প্রাণ, সত্তাহীন, অন্তঃসারশূন্য। জেম্‌স জয়েসের 'ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস' নামে যে উপন্যাস লেখা এখনও চলিতেছে, তাহাতে যে কথা ও শব্দের নূতন প্যাটার্ন বোনাই আসল কথা; বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব নয়, রূপসৃষ্টিও নয়, শুধু কৌশলই বড়—ইহাও এই অসার্থকতারই আর এক প্রমাণ। অল্ডাস হাক্‌সলি বুদ্ধির আতসবাজিতে বিমুগ্ধ হইয়া এখন তাহার বিমূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন—নূতন শান্তিবাদিতা প্রচার করিয়া, নিকোলাস বীভার কি নূতন ফাশিস্তবাদেরই আশ্রয় খুঁজিতেছেন?—এই তো সমসাময়িক ইংরেজী উপন্যাসের দিক্‌পালগণের হাল। অবশ্য, অপেক্ষাকৃত নূতন যুগের যাঁহারা আবির্ভূত হইতেছেন, ডে লুই কি স্টিফেন স্পেণ্ডার—তাঁহারা তো সদর্পেই নিজেদের মতবাদের ঝাণ্ডা উচ্চ করিয়া ধরিয়াছেন। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রীয় সর্ব্বাধ্যক্ষতা এতই প্রবল যে, সেখানকার সাহিত্যে কোন স্বাধীনতা বা ব্যক্তিসত্তার অকুণ্ঠপ্রকাশ দেখিবার আশা করাই বৃথা। সাহিত্য প্রায় প্রচারপত্র।

যে সভ্যতা বা যে সমাজ ছিন্নমূল পাদপের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবনে আর সজীবতা আশা করা যায় না। তাই, এই সমসাময়িক সাহিত্যেও শুধুই কোলাহল বাড়িতেছে। কিন্তু সত্যকার কোন একটি বিশেষ বাণী ফুটিয়া উঠিতেছে না। মূল নাই বলিয়াই এই সাহিত্য মূল্যহীন।

এইবার নানা তত্ত্ব ও বাদ-বিশারদগণ অগ্রসর হইয়া বলিবেন—বাণী বলিতেছ কাহাকে? কাহাকে বলিতেছ জীবন ধর্ম্মের মূল? এমন কোন চিরন্তন মাপকাঠির অস্তিত্ব আছে কি না তাহাই সন্দেহ। মানুষের মন তো,

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহার পরিবেশের চাপে প্রতিনিয়ত নূতন হইয়া উঠিতেছে, নিজ পরিবেশকে ভাঙিয়া গড়িতে গড়িতে সে নিজেই লইতেছে নূতন রূপ, পাইতেছে নূতন গুণ ও বিস্তৃতির সন্ধান। মৌলিক তাহার কি? মূল তাহার কোথায়? কোন্ বিশেষ গুণাগুণকে আমরা **fundamentals of life** বলিয়া গ্রহণ করিব? এই তর্কের শেষ যেখানে, সেখানে সাহিত্য বস্তু-সর্ব্বস্ব, কল্পনার কোন অস্তিত্ব নাই, শুধুই তাহা মনে গাঁথা বস্তু-প্রতিলিপি, আর আর্ট মানেই কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিকের, বিশেষ শ্রেণীর ও শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ। অতএব—

কিন্তু অনেককাল পর্য্যন্ত আমরা শিল্প ও সাহিত্যের অন্য সূত্রই আওড়াইয়া আসিয়াছি, শিখিয়া আসিয়াছি, বিশ্বাসও করিয়া আসিয়াছি। সত্যকারের আর্টকে আমরা, শ্রেণী তো তুচ্ছ, দেশকালাতীত বলিয়াই জানি। খানিকটা অবশ্য আয়োজন আবশ্যক হয়—এ যুগের পাঠক তাহাই করিতে অস্বীকৃত—কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সেক্স্পীয়র ও বিংশ শতাব্দীর প্রুস্ত আমরা সমভাবে পড়িয়া রসোপভোগ করি, হোমরের মহাকাব্য ও আরব্য উপন্যাসের কুটিল তীব্র রজনী—দুইই আমাদের নিকট সমাদর লাভ করে। শুধু বিশেষ শ্রেণীর বা বিশেষ পরিবেশেরই সৃষ্টি হইলে ইহার রস আজ আমাদের নিকট নীরস হইয়া উঠিত না কি? ইহার উত্তরে হয়তো বস্তুতান্ত্বিক বলিবেন—সবই শ্রেণী-বৈষম্য-পীড়িত সমাজ হইতে সমুদ্ভূত, তাই আজিকার শ্রেণী-ক্লিষ্ট পাঠকের বোধশক্তিতে হোমর বা কালিদাস দুর্গম নয়। কিন্তু যে দিন শ্রেণী থাকিবে না, সে দিন এ সাহিত্যও বিলুপ্ত হইবে। এখনকার সাহিত্য-সঙ্কট তাহারই পূর্ব্বাভাষ। সমাজ-সঙ্কটে ডুবিয়া বিভ্রান্ত বলিয়াই সাহিত্যেও সঙ্কট—অরাজকতা।

সাহিত্যের রসবোধের উৎস কোথায়—হয়তো তাহা দুর্জ্ঞেয়। হয়তো ভাবীকালের বিজ্ঞান বিশেষ গ্রন্থিরস নিঃসরণের উপরই এই আশ্চর্য্য সৃষ্টিশক্তির দায়িত্ব আরোপ করিবে। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের দিকে তাকাইতে গিয়া যে কথাটি ভূমিকাতেই মনে হয় তাহা এই—বহুল উৎপাদনে, যান্ত্রিকতার প্রসারে আজ সাহিত্যেও সঙ্কট উপস্থিত।

# পরিবর্ত্তন

"বনফুল"

১

খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খাইয়া সমস্ত মুখটা তিক্ত হইয়া গেল। অথচ সন্দেশগুলা ভালই ছিল। গোড়া হইতেই শুনুন তাহা হইলে।

*       *       *       *

হরিমোহন বড়লোক ছিল। টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে না, ইহা জানিতাম। অর্থদ্বারা যতটা চিকিৎসা ক্রয় করা সম্ভব তাহা ক্রয় করা হইবে, হইতেও ছিল। দুইজন কৃতবিদ্য নামকরা ডাক্তার প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসিয়া হরিমোহনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দুইজন নার্স আসিয়া হয়তো তাহার শুশ্রূষার ভারও লইতেন, কিন্তু সরমা—হরিমোহনের স্ত্রী, তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি নিজেই সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেবা-নিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সেবার কোন ত্রুটি হইতেছে না। বেতনভোগী নার্স এতটা করিত কিনা সন্দেহ।

রোগটি কিন্তু সংঘাতিক,—যক্ষ্মা। মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, প্রত্যহ জ্বর হইতেছে। কফ পরীক্ষা করানো হইয়াছিল—যক্ষার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পয়সার জোরে সুচিকিৎসা হয়তো হইবে, কিন্তু সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বরং তাহার জীবননাট্যের যবনিকা-পতন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই কথাই বারম্বার মনে হইতেছিল।

হরিমোহন আমার বাল্যবন্ধু। ক্লাসে উভয়ে পাশাপাশি বসিতাম এবং সেইসূত্রে যে ঘনিষ্ঠতাটুকু বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, কেন জানি না, এখনও তাহা অটুট আছে। না থাকিবারই কথা। ধনী ও দরিদ্রের সখ্যতা বড় ভঙ্গুর। আমাদের কপালে কেন যে তাহা টিকিয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। যাই হোক, রোজ তাহার খবরটা লইতে যাইতাম। আরও বিশেষ করিয়া যাইতে হইত, এই জন্য যে অর্থ এবং পত্নী ব্যতীত হরিমোহনের আপন বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। গুড় থাকিলে অবশ্য পিপীলিকার অসদ্ভাব হয় না। উভয়লিঙ্গের বহু পিপীলিকা আনাগোনাও করিতেছিল, কিন্তু যেই ইহা নিঃসংশয়রূপে জানা গেল যে, হরিমোহনের ব্যাধিটি যক্ষ্মা, অমনই পিপীলিকার দল ক্রমশ অন্তর্দ্ধান করিলেন। সম্ভবত অন্য গুড়ের গুদামের সন্ধানে গেলেন। যাক সে কথা। মোটের উপর আমি একা পড়িলাম। সরমার সহিত বন্ধুপত্নী হিসাবে যে লৌকিক আলাপটুকু ছিল, এই সূত্রে তাহা গাঢ়তর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে, না হইলেই ভাল ছিল।

২

হরিমোহন বসিয়া কাসিতেছিল।

যক্ষ্মার বুক-ফাটা কাসি।

কাসিটা থামিলে বলিল, থ্রোটটা বড্ড খারাপ হয়েছে। ওষুধ লাগিয়ে লাগিয়ে আর গার্গল ক'রে ক'রে তো হয়রান হয়ে উঠলাম। কাসিটা কিছুতে কমছে না কেন বল্ দেখি।

বলিলাম, কমবে কমবে—এত ঘাবড়াস কেন ?

—ঘাবড়বার ছেলে আমি নই। তবে কি জানিস ক্রমাগত কাসাটা বিরক্তিকর।—দুইটা কথা বলিতে না বলিতেই আবার কাসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

হরিমোহন বলিল, স্পিউটাম একজামিন ক'রে কিছুই পাওয়া যায় নি, শুনেছিস তো ? যাবে না, তা আগেই জানতাম। একটা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অ্যাটাক হয়েছে আর কি।

এক পেয়ালা দুধ হাতে করিয়া সরমা প্রবেশ করিল।

কাসি শেষ করিয়া হরিমোহন বলিল, ও কি আবার ?

—দুধ।

—এখন আবার দুধ কেন ?

—ডাক্তারেরা ব'লে গেছেন দুধ দিতে যে।

—কি মুস্কিল, একটু বিশ্রাম দাও আমাকে তোমরা। এই তো—। আবার কাসি সুরু হইল।

সামলাইয়া সে বলিতে লাগিল, এই তো কিছুক্ষণ আগে ওষুধ খেলাম, তারপর গার্গল, তারপর স্প্রে, তারপর ফলের রস—আবার এখুনই দুধ !

—ডাক্তাররা বলেছেন, ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া করলেই শিগগির সেরে উঠবে। বেশি দুধ তো আনি নি। নাও।—সরমা পেয়ালাটা সম্মুখে ধরিল।

দুই চুমুক খাইয়া হরিমোহন বলিল, আর না, দোহাই তোমার, জায়গা নেই আর পেটে—

—না না, খেয়ে নাও এটুকু। বলুন না আপনি একটু !

আমিও অনুরোধ করিলাম।

—আচ্ছা, আর এক চুমুক খাচ্ছি তোর অনুরোধে।

আধ পেয়ালার বেশি সে কিছুতেই খাইল না।

সরমা পেয়ালাটা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম। রাত হইয়াছিল। সরমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতে হইবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, টেম্পারেচারের কথাটা হরিমোহনকে যেন জানানো না হয়। হরিমোহনকে বলিলাম, নটা বেজে গেছে। আজ উঠি ভাই। কাল আবার আসব।

—আচ্ছা।

হরিমোহন পাশ ফিরিয়া শুইল।

৩

পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধটা পান করিতেছে। বলিলাম, এ কি করছেন আপনি?

ধরা পড়িয়া গিয়া সরমা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরক্ত মুখে বলিল, ও কিছু নয়।

তারপর সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, দেখে যখন ফেলেছেন, উপায় নেই। কিন্তু বলবেন না কাউকে।

—তা না হয় বলব না। কিন্তু এঁটো দুধটা খাচ্ছেন কেন?

একটু হাসিয়া সরমা বলিল, স্বামীর এঁটো খেলে দোষ কি?

দোষ কি!

যক্ষ্মার সংক্রামকতা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল বিতরণ করিলাম। সরমা আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিল, তাহার পর সহসা প্রদীপ্ত এক জোড়া চোখ আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাকে? উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলে-মেয়েও একটা যদি থাকত তা হ'লেও বা কথা ছিল! অনেক হিতকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বলিলাম। আনতমস্তকে হাসিমুখে নীরবে সে সমস্ত শুনিয়া গেল। প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না।

৪

হরিমোহনের অসুখ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। তাহার যে যক্ষ্মা হইয়াছে, এ সংবাদ তাহার নিকট তো আর চাপা রহিল না। সে জানিতে পারিল এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যে দুই জন ডাক্তার দেখিতেছিলেন, তাঁহারাও ব্যস্ত হইলেন এবং আরও দুই জন ডাক্তারকে পরামর্শার্থে ডাকিলেন। চারি জনে মিলিয়া ঠিক হইল যে, কয়েকটি এক্সরে প্লেট লওয়া দরকার। তাহাও যথাসময়ে হইল। এক্সরে করিয়া দেখা গেল একটি ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অপরটি একেবারে নির্দ্দোষ আছে। স্যানাটোরিয়মে গিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করাইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

অর্থের অভাব ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে হরিমোহন ধরমপুর চলিয়া গেল। সুরমাও সঙ্গে গেল।

৫

ইহার পর অনেক দিন হরিমোহনের খবর পাই নাই। কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহাও কালক্রমে থামিয়া গেল। হরিমোহন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে, ইহাই শুনিয়াছিলাম। তাহার পর হরিমোহন সম্বন্ধে কৌতূহলও ক্রমশ কমিয়া গেল, হরিমোহনও বিশেষ খবর লইল না। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম হরিমোহন সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছে। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, টাকা আছে যাইবে না কেন।

নিয়মিতভাবে কেরানিগিরি করিতে লাগিলাম। আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের খবর লইবার অধিকার আমার নাই, সুযোগও ছিল না। হরিমোহন কোন ঠিকানা দিয়া যায় নাই।

৬

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

হরিমোহনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন তাহার পত্র পাইলাম। দুইছত্র চিঠি।—

ভাই নরেশ,

আগামী মঙ্গলবার কলিকাতায় পেঁাছিব। পার তো দেখা করিও।

হরিমোহন

দেখিলাম চিঠিখানা লিখিয়াছে দেশের ঠিকানা হইতে। কবে দেশে আসিল সে। কিছুই তো জানি না।

* * * * *

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যার পর আপিস ফেরত তাহার বাসায় গেলাম। সে বাড়িতেই ছিল। খুব ঘটা করিয়া আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। হরিমোহনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুস্থ সবল লম্বা চওড়া চেহারা। কে বলিবে ইহার যক্ষ্মা হইয়াছিল।

বলিলাম, বেশ সেরে গেছিস তো?

—হ্যাঁ, কমপ্লিট্‌লি।

যে যে ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে নিরাময় হইয়াছে, তাহাদের গল্প করিতে করিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

—সুইট্‌জারল্যাণ্ড গেছলি না কি?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগল?

—অতি চমৎকার। কেতাবে যা পড়া যায় তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর। চল চল, ওপরে চল।

উপরে গেলাম। উপরে গিয়াই হরিমোহন চীৎকার জুড়িয়া দিল, সরমা কই, নরেশ এসেছে—চা জলখাবার আন—ব'স ব'স। দামী সোফাটার উপর একটু সন্তর্পণেই বসিলাম।

হরিমোহন বলিতে লাগিল, তারপর তোর খবর কি বল। তুই তো অনেক বদলে গেছিস দেখছি। কানের কাছের চুলগুলো যে বেবাক পেকে গেছে রে। এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেলি। ওদেশে পঞ্চাশ বছরে যৌবন সুরু হয়—বুঝলি?

'সুরু' কথাটার উপর সে জোর দিল।

আমার যে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে এবং ডাক্তারে আমারও টি. বি. সন্দেহ করিতেছে, সে কথা আর তাহাকে বলিলাম না, বলিয়া লাভ নাই। কেবল বলিলাম, ওদেশে

এদেশে ঢের তফাৎ রে ভাই! তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলে যাস কেন? সেই বিশ বছর বয়স থেকে এক নাগাড়ে কেরানিগিরি ক'রে চলেছি—দম নেবার অবসর নেই।

—তাতে কি হয়েছে? খাটলে কি মানুষ রোগা হয়?—বলিয়া হরিমোহন হা হা হাসিয়া উঠিল। ঘর কাঁপানো হাসি হরিমোহনের বিশেষত্ব। হাসির জোর কিছুমাত্র কম হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।

সরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে জলখাবারের প্লেট।

সরমাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। দশ বৎসরে মানুষের এত পরিবর্ত্তন হইতে পারে!

আমার ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবত সরমা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

—চা-টা নিয়ে আসি!

জলখাবারের প্লেটটা সামনের তেপায়াটার উপর নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কে এ!

হরিমোহনকে বলিলাম, সরমাকে ত একদম চেনা যায় না! এই দশ বৎসরে ভীষণ বদলে গেছে দেখছি।

হরিমোহন স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, হ্যাঁ, বদলে গেছে। তুই যাকে দেখেছিলি এ সে নয়—এ আর এক সরমা। সে সরমা বহুকাল আগেই মারা গেছে। তারও টি. বি. হয়েছিল। দুটো লাংসেই! কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, শেষটা ইন্‌টেস্‌টাইনও খারাপ হয়ে গেল। অনেক খরচপত্তর করলাম, কিছুতেই বাঁচল না।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ চাপ। হরিমোহনই আবার কথা বলিল।

—থাকতে পারলাম না—দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে হ'ল। খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে বার করলাম শেষে। ও নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে। যে লোক গেছে সে আর ফিরবে না জানি, তবু নামটার—

থামিয়া গেল। সরমা দ্বারপথে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে। হরিমোহনের দিকে নানারূপ খাদ্যপূর্ণ এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল, অত আমি খাব না। কত দিয়েছ আমাকে!

শুনিলাম সরমা বলিতেছে, ডাক্তারে তোমাকে খেতে বলেছে ভাল ক'রে। আজকাল তুমি খাচ্ছ না মোটে। একটু ব'লে যান তো আপনার বন্ধুকে।

হরিমোহন বলিল, নরেশের জন্যে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ আনিয়েছ তো? ভারি ভালবাসে ও খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খেতে!

—হ্যাঁ, এই যে আনিয়েছি।

হাসিয়া এক প্লেট খেজুরে গুড়ের সন্দেশ সে আমার দিকে আগাইয়া দিল।

# বাংলা দেশের মাকড়সা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

( বসু বিজ্ঞান মন্দির )

মাকড়সা জাতীয় জীবকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'অ্যারাক্‌নিডা' বলে। 'অ্যারাক্‌নিডা' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রীক-পুরাণে একটি সুন্দর গল্প বর্ণিত আছে। গ্রীস দেশে অতি প্রাচীন কালে এক দরিদ্র গৃহস্থের দিব্যি ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম অ্যারাক্নি। সূচীশিল্পে অ্যারাক্নি এমনই দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল যে, দেশ-বিদেশের পদস্থ লোকেরা তাহার শিল্পকার্য্য অতি উচ্চমূল্যে ক্রয় করিত। এত অল্প বয়সে বিপুল খ্যাতি লাভের ফলে অ্যারাক্নি বড়ই গর্ব্বিতা হইয়া উঠিল। সে গর্ব্বভরে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইত আমি গরিবের ঘরের একটি তুচ্ছ মেয়ে হ'তে পারি, কিন্তু আমার কাজের কাছে স্বর্গের মিনার্ভা দেবীও এগুতে পারেন না। কথাটা মিনার্ভা দেবীর কানে উঠিল। তিনি এক বৃদ্ধা রমণীর বেশ ধারণ করিলেন এবং লাঠি ভর করিয়া অ্যারাক্নিদের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। অ্যারাক্নি তখন সেলাই করিতে ব্যস্ত আর বহুলোক ঘিরিয়া বসিয়া তাহার কাজ দেখিতেছে। দেবতাদের বিরুদ্ধে এরূপ গর্ব্বিত উক্তি করিতে নিষেধ করিয়া বৃদ্ধা রমণী অ্যারাক্নিকে নানা প্রকারে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অ্যারাক্নি কোন কথাই কানে তুলিল না। তখন বৃদ্ধারূপী মিনার্ভা দেবী তাহাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিলেন। মিনার্ভা দেবীই প্রথমে একখানা খালি তাঁতের কাছে দাঁড়াইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। কাপড়ের উপর তিনি বিবিধ চিত্র ফুটাইয়া তুলিলেন; তাহার বিষয়বস্তু ছিল—অদৃষ্টের পরিহাস, দেবতাদের সহিত মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল।

'মিছুসেনা ভাটিয়া' নামক কাকড়া-মাকড়সা। ইহারা শিকার ধরিবার জন্য ফুলের উপর নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে

তারপর অ্যারাক্নি তাঁত ধরিল, সে আঁকিল মানুষের দক্ষতা বিষয়ক বিবিধ চিত্র। অ্যারাক্নির কাজই যে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে এ কথা অবশেষে মিনার্ভা দেবীকে স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এই পরাজয়ে তাঁহার ক্রোধ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রোধবশে মাকু দিয়া অ্যারাক্নির মাথায় তিনবার আঘাত করিলেন। এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া অ্যারাক্নি আত্মহত্যা করিবার মানসে, সম্মুখে লম্বিত এক-গাছি রজ্জুর প্রান্তভাগ গলায় জড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িল। মিনার্ভা দেবী কিন্তু তাহাকে মরিতে দিলেন না—খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং অভিশাপ দিলেন যে, তুই যেমন দুষ্টু মেয়ে, দেবতাকে অপমান করিতে গিয়াছিলি, তার ফলে এখন মাকড়সা হইয়া ঝুলিয়া থাক। তোর বংশধরগণকেও আবহমান-কাল এই ভাবেই মাকড়সা হইয়া ঝুলিতে হইবে। দেখিতে দেখিতে অ্যারাক্নির রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং সে মাকড়সার আকৃতি পরিগ্রহ করিল।

গল্পানুসারে অ্যারাক্নির বংশধরদের ঠিক অ্যারাক্নির মতই হইবার কথা; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত এত বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিল কেমন করিয়া? অভিব্যক্তিবাদের আলোচনায় সে প্রশ্নের উত্তর মিলিতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

সমগ্র পৃথিবী তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও একমাত্র বাংলা দেশেই যে কত বিভিন্ন জাতীয় বিচিত্র মাকড়সা দেখিতে পওয়া যায়, তাহার সঠিক হিসাব নিরূপণ করা দুষ্কর। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে

পারা গিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সার বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মাকড়সা সাধারণ কীটপতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নহে। 'ইনসেক্ট' বা কীট বলিতে যাহাদিগকে বুঝি, তাহাদের শরীর মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট। তাহাদের বুকের সঙ্গে তিন জোড়া করিয়া পা সংলগ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত দুইটি করিয়া জটিল গঠনের চোখ ও একজোড়া শুঁড় থাকে। মাকড়সার কিন্তু মাথা ও বুক এক সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছে। কেবল-মাত্র পেটটি আলাদা। ইহাদের আটখানি পা, মুখের কাছে একজোড়া উপপদ ও চারজোড়া সরল গঠনের চোখ আছে। চোখের সংখ্যা আটটির বেশি হয় না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছয়টি বা আরও কম হইতে পারে। ইহাদের শ্বাসযন্ত্র পেটের নীচের দিকে বইয়ের পাতার মত ভাঁজ করা, ইহা ছাড়া প্রত্যেকেরই শরীরের প্রান্ত-ভাগে সুতা বুনিবার জন্য তিনজোড়া করিয়া উপাঙ্গ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উপাঙ্গের সংখ্যা আরও কম হইতে পারে, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের দুইটি করিয়া পুং-জননযন্ত্র আছে, তাহাও আবার ঠিক মুখের কাছে। যন্ত্র দুইটি হাতের কাজ ও প্রজনন এই উভয়বিধ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা খোলস বদলাইতে বদলাইতে ক্রমশ পরিণতি লাভ করে। কীটপতঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত না হইলে ইহারা তবে কোন্ জাতীয় প্রাণী? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, মাকড়সা মাকড়সা-জাতীয় প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নহে।

বাংলা দেশের মাকড়সাদের মধ্যে কতকগুলিকে দেখা যায়—যাহারা জাল বুনিয়া শিকার ধরে, কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার শিকারের অন্বেষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। ইহারা শিকার ধরিবার জন্য জাল বোনে না। এই শ্রেণীর মাকড়সাদের মধ্যে কতকগুলিকে দেখা যায়—জলচর। কাঁকড়ার মত কতকটা পাশাপাশি চলে—এই ধরণের বহু জাতীয় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার রাত্রিচর। রাত্রিবেলায় শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়। এই শ্রেণীর দিনচর মাকড়সাদের মধ্যে কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার ফল ফুল লতা পাতার সঙ্গে দেহের রং মিলাইয়া অথবা অনুকরণ করিয়া আত্ম-গোপনে অদ্ভুত দক্ষতা প্রদর্শন করে। কোন কোন জাতীয় মাকড়সা আছে, তাহারা মাটি দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে অথবা গর্ত্তের নীচে বাস করে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সর্ব্বদাই পিপীলিকার অনুকরণ করিয়া চলে এবং দেহের আকারও তাহাদের হুবহু পিঁপড়ার মত। পিঁপড়ার মত সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে, অথচ তাহাদিগকে অনুকরণ করে না—এই জাতীয় কয়েক প্রকার মাকড়সাও এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।
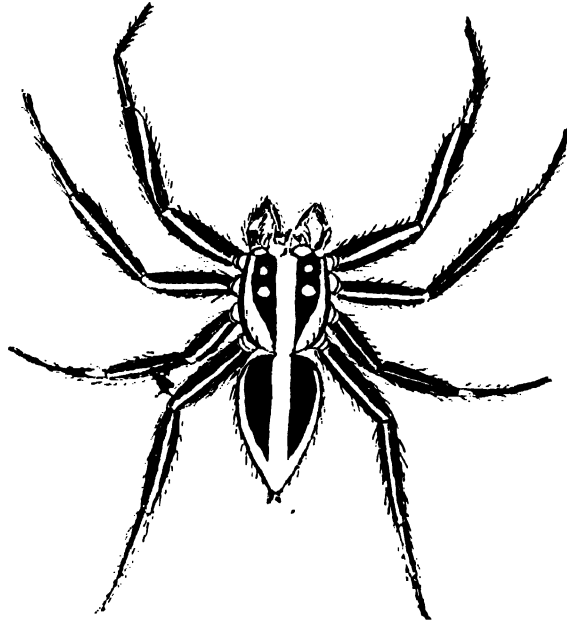
পুরুষ মেলানগ্নাথাস মাকড়সা

আমাদের দেশে জালবোনা-মাকড়সাদের মধ্যে 'আর্জিওপ', 'নেফিলা', 'এপিরা', 'টেট্রাগ্নাথা' প্রভৃতি বিভিন্ন গণভুক্ত কয়েক রকমের মাকড়সা প্রায়ই নজরে পড়িয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'আর্জিওপ' ও 'নেফিলা'ই আকারে খুব বড় হইয়া থাকে। 'আর্জিওপ' মাকড়সার পেটের আকৃতি ঈষৎ চেপ্টা এবং গোলাকার। তাহাদের গায়ে রং বেরঙের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। বনে জঙ্গলে সাদা সুতার প্রকাণ্ড জাল পাতিয়া রাখে। দুই রকমের বৃহদাকার 'নেফিলা' দেখা যায়। কতকগুলির গায়ের রং মিশ কালো, আবার কতকগুলির গায়ে সোনালী রঙের

ডোরা কাটা। ইহাদের আকৃতি কতকটা বড় বড় লঙ্কার মত। উঁচু গাছের ডাল হইতে ইহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হলদে সুতার জাল পাতিয়া তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে। 'এপিরা' মাকড়সা দেখিতে গোলাকার ও মধ্যমাকৃতি। ইহাদের গায়ের রং ধূসর বা কালো। পূর্ব্বোক্ত মাকড়সাগুলি সকলেই খাড়াভাবে জাল পাতে। কিন্তু 'টেট্রাগ্নাথা' গণভুক্ত মাকড়সারা জলের উপরে জলের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া খুব মোটা মোটা ফাঁকের জাল বোনে। ইহারা দেখিতে কতকটা কাঠি-ফড়িঙের মত। গায়ের রং খয়েরী বা বাদামী। চারিটি পা সামনের দিকে এবং চারিটি পা পিছনের দিকে লম্বালম্বিভাবে একত্রিত করিয়া ঠিক একটি শুষ্ক কাঠির মত জালের গায়ে লাগিয়া থাকে।

জাল পত্তন করিবার প্রারম্ভে এই মাকড়সারা একটি পাতার উপর বসিয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া রাখে এবং ক্রমাগত বাতাসের মধ্যে সুতা ছাড়িতে থাকে। দশ পনর হাত লম্বা সুতা বাহির হইবার পর ইহার প্রান্তভাগ হাওয়ায় উড়িতে উড়িতে কোন কিছুতে ঠেকিয়া যায়। তখন মাকড়সা সুতাটিকে গুটাইতে গুটাইতে বেশ টান করিয়া পাতার সঙ্গে আটকাইয়া দেয়। তারপর সেই সুতা ধরিয়া মধ্যস্থলে যায় এবং সেখানে নূতন সুতার প্রান্তভাগ জুড়িয়া নীচে ঝুলিয়া পড়ে। ঝুলিয়া পড়িবার সময় পিছনের এক পা দিয়া সুতাটাকে ধরিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিতে থাকে। মধ্যপথে আসিয়া থামিয়া যায় এবং সেই অবস্থাতেই আবার বাতাসের মধ্যে চতুর্দ্দিকে সুতা ছাড়িতে থাকে। প্রায় মিনিট পাঁচ সাতেকের মধ্যেই ছাতার শলার মত জালের একটা কাঠামো গড়িয়া উঠে। তখন এক সমতলস্থিত টানাগুলি রাখিয়া বাকি এলোমেলো টানাগুলি কাটিয়া দেয়, এবং প্রত্যেক টানার উপর ঘুরিয়া পিছনের পায়ের সাহায্যে বৃত্তাকারে জাল রচনা করে। প্রায় আধঘণ্টা সময়ের মধ্যেই একখানি জাল বুনিয়া শেষ করে। জাল বোনা হইয়া গেলে 'নেফিলা' ও 'আর্জিওপ' মাকড়সারা শিকার ধরিবার আশায় জালের মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে। কিন্তু 'এপিরা' ও 'টেট্রাগ্নাথা' মাকড়সারা জালের টানা বাহিয়া এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করে; শিকার জালে পড়িলেই সুতার কম্পনে বুঝিয়া ছুটিয়া আসে এবং শিকারকে সুতায় জড়াইয়া পুঁটুলির মত করিয়া ফেলে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ও পরেই ইহাদের শিকার ধরিবার প্রশস্ত সময়। এই সময়েই যথেষ্ট কীট-পতঙ্গ উড়িতে দেখা যায়। ইহারা সকলেই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জাল বুনিতে আরম্ভ করে। কোন কোন মাকড়সার জাল দুই তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে আবার অনেকেই প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বে নূতন জাল বুনিয়া থাকে। 'নেফিলা'র জাল এত শক্ত যে, ছোট ছোট পাখীও ইহাতে আটকা পড়িয়া যাইতে পারে। টুনটুনি পাখীরা তাহাদের বাসার মুখ সেলাই করিবার জন্য এই জালের সুতা সংগ্রহ করিয়া থাকে। 'আর্জিওপ' মাকড়সাকে জালের সাহায্যে টিকটিকি ধরিয়া খাইতে দেখিয়াছি। আমরা সচরাচর যেসব মাকড়সা দেখিতে পাই, তাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীজাতীয়। স্ত্রীজাতীয় মাকড়সারাই আকারে বড় হয়। উপরোক্ত মাকড়সাদের মধ্যে 'টেট্রাগ্নাথা' ছাড়া আর সকলেরই পুরুষগুলি এত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে যে, সহজে দৃষ্টিগোচরই হয় না। জালের মধ্যেই থলি বুনিয়া স্ত্রী-মাকড়সারা ডিম পাড়ে। বাচ্চা বাহির হইয়া কয়েকদিন সেই থলির মধ্যেই কাটায়। তারপর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের

স্ত্রী 'এপিরা' মাকড়সা

চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার কায়দা অদ্ভুত। বাচ্চাগুলিকে কোন স্থানে রাখিয়া দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহারা সকলেই তাহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া রহিয়াছে। পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া তাহারা বাতাসের মধ্যে সুতা ছাড়ে, যদি কিছুতে আটকাইয়া গেল তবে সুতা গুটাইতে গুটাইতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়। নচেৎ আরও সুতা ছাড়িতে থাকে। সুতার দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বড় হইলে হাওয়ার টানে মাকড়সা বাচ্চাটি সমেত বাতাসে উড়িয়া যায়। এইভাবে হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে সুতাটিকে ক্রমশ গুটাইয়া লইয়া প্যারা-সুটের মত যে কোন স্থানে ইচ্ছামত অবতরণ করিতে পারে। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহাদের এইরূপ উড়িবার কৌশল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

এতক্ষণ যেরূপ জালের কথা বলিলাম, ইহা ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সারা অন্যান্য বিভিন্ন রকমের জাল তৈয়ারি করিয়া থাকে। কতকগুলি মাকড়সার জাল হয় পাতলা, কাগজের মত। এগুলি চাঁদোয়ার মত টানা দিয়া ঝুলাইয়া রাখে আবার কোন কোন মাকড়সা জাল বুনে ঠিক তাঁবুর মত করিয়া, এই তাঁবুর বুনন হয় ঠিক আমাদের কাপড়ের টানা-পড়েনের মত, রেড ইণ্ডিয়ানরা যেরূপ 'উইগ ওয়াম' নামক এক জাতীয় তাঁবু ব্যবহার করে। এই মাকড়সার তাঁবুগুলিও দেখিতে সেইরূপ—অবশ্য আকারে ছোট

লাল পিঁপড়া অনুকরণকারী স্ত্রী 'প্ল্যাটালিয়ডস্' মাকড়সা

লম্বা-পাওয়ালা 'ফলসিডি' জাতীয় মাকড়সারা এলো-মেলোভাবে জাল পাতে। ঘরের নির্জ্জন অন্ধকার স্থানে প্রায়ই এই জাতীয় মাকড়সার জাল দেখিতে পাওয়া যায়। 'ড্যাডি-লং-লেগ' নামে এক প্রকার মশক জাতীয় প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেখানে সেখানে বসিয়া কেবল শরীরটাকে নাচাইতে থাকে। ইহাদের সঙ্গে এই 'ফলসিডি' জাতীয় মাকড়সার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জালের মধ্যে কিছু একটু নাড়াচাড়া হইলেই ইহারা শরীরটাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দ্রুত গতিতে কাঁপাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জালগুলিও ভীষণ ভাবে আন্দোলিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে ইহাদিগকে বলে কাঁপুনে পোকা। ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরিলে—এই পোকা ধরিয়া তাহারা কবচ করিয়া রাখে।

এপিরা জাতীয় কালো রঙের ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার মাকড়সা দেখা যায়, ইহারা পুরাতন দেওয়ালের ফাটলে বা অনুরূপ কোন স্থানে দলে দলে বাস করিয়া থাকে। ইহারা দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে; কিন্তু বাহিরে দেওয়ালের খানিকটা স্থান জুড়িয়া এলোমেলো ভাবে আঠালো সুতা বিছাইয়া রাখে। মাক-ড়সার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ও জালের মধ্যে একটি সুতার টানা থাকে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা যেমন 'ল্যাসো' নামক এক প্রকার লম্বা চামড়ার দড়ির মাথায় ফাঁস লাগাইয়া সুকৌশলে বন্য ঘোড়া গরু ধরিয়া থাকে, এই মাকড়সারাও তেমনই শিকার জালের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবামাত্রই টানার সাহায্যে টের পাইয়া ছুটিয়া আসে এবং তাহার গায়ে কতকগুলি সুতা এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া দিয়া ক্রমশ লাইনের মত সুতা ছাড়িতে থাকে এবং মাঝে মাঝে গুটাইয়া লইয়া শিকারকে ধীরে ধীরে হয়রান করিয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

আমাদের দেশে ছোট ছোট ডাঁট, কামিনী ফুল এমন

কি বটগাছেও পিঁপড়ার বাসার মত অসংখ্য বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাসাগুলির মধ্যে একসঙ্গে ৫০।৬০ এমন কি তাহারও বেশি কতকগুলি মাকড়সা বাস করে। ইহারা 'এপিরা' শ্রেণীর এক প্রকার সামাজিক মাকড়সা। বাসা এক হইলেও প্রত্যেকেরই ঘর আলাদা। প্রত্যেক ঘরেই গোলাকার ছিদ্রের মত দুইটি করিয়া দরজা আছে। বাসার উপর কোন কীটপতঙ্গ আসিয়া পড়িলেই আঠায় আটকাইয়া যায়, আর ইহারা সকলে একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। প্রত্যেক বাসাতেই দুই একটা ঘর খালি থাকে। শিকারকে সেখানে টানিয়া লইয়া গিয়া একসঙ্গে সকলে রস চুষিয়া খাইতে থাকে। শিকার ছোট হইলে খাওয়ার সময় ইহাদের মারামারি কামড়াকামড়িও হইয়া যায়।

যে সকল মাকড়সা শিকারান্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে 'মেলানগনেথাস' নামে এক জাতীয় মাকড়সা বোধ হয় অনেকেরই নজরে পড়িয়া থাকিবে। এই মাকড়সারা শিকার ধরিবার জন্য জাল বোনে না। ইহারা ঘরের দেওয়াল বা মেঝেতে প্রায়ই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাছি শিকার করিয়া থাকে। শরীরের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির কিছু কম, গায়ের রং ধূসর, পেটের উভয় পার্শ্বে কালো মোটা লাইন আছে। ইহারা ভয়ানক চটপটে এবং প্রায়ই লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। চলিবার সময় মাথা ঘুরাইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া লয়। সম্মুখের চোখ-জোড়া যেন মোটরের হেড-লাইটের মত জ্বল জ্বল করিতে থাকে। মাছি বসিতে দেখিলেই ইহারা দূর হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে; কিন্তু কাছে আসিয়া এক পা দুই পা করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রায় দুই তিন ইঞ্চি দূর হইতে বাঘের মত শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। যদি উভয়ে মুখোমুখি হইয়া যায়, তবে মাকড়সা মাছির দিকে মুখ রাখিয়া পাশের দিকে সরিতে সরিতে অবশেষে তার পিছনে উপস্থিত হইয়া ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। এবং শিকার মুখে করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া আহার করে। এক জাতীয়

কালো পিঁপড়া অনুকরণকারী মাকড়সা ( পুরুষ )

দুইটিতে একবার কাছাকাছি দেখা হইলেই হইল! সঙ্গে সঙ্গে লড়াই বাধিয়া যায়। এদের লড়াই ঠিক ষাঁড়ের লড়াইয়ের মত। উভয়েই সামনের দুই পা উঁচু করিয়া অগ্রসর হয়। উভয়ে পরস্পর মুখোমুখিভাবে কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষিয়া পায়ে পায়ে ঠেকাইয়া ঠেলাঠেলি করিতে থাকে। এই সময় কেহ একটু বেটাল হইলেই আর রক্ষা নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। প্রত্যেক লড়াইয়ের পর কেহই অক্ষত শরীরে ফিরিতে পারে না। দুই একখানা পা ফেলিয়া আসিতে হয়।

একটি ঘটনার কথা বলিতেছি, যাহা হইতে ইহাদের ঝগড়াটে স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। পরীক্ষাগারে নূতন আমদানি একটি ঝকঝকে যন্ত্র দেখিতে ছিলাম। হঠাৎ ছাদ হইতে এই জাতীয় একটা মাকড়সা নীচে পড়িল। মেঝের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে যন্ত্রটার উপর উঠিয়া পড়িল। যন্ত্রটার সেই স্থানে তাহার প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার-ভাবে দেখা যাইতেছিল। মাকড়সাটা তাহারই প্রতিচ্ছবিকে অন্য একটা মাকড়সা বলিয়া ভুল করিয়া তৎক্ষণাৎ পা উঠাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল। কিন্তু ধাক্কা খাইয়া পিছু হটিয়া গেল। আবার একটু দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে ঢুঁ মারিল। এবারও প্রতিহত হইয়া আবার যন্ত্রটার এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিল, পিছনে মাকড়সাটা লুকাইয়া আছে কি না! কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপর্য্যুপরি চার পাঁচবার কাল্পনিক শত্রুর দিকে লাফাইয়া পড়িল। বার বার আঘাত পাইয়া ক্লান্ত হইয়াই সে যন্ত্রটার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একদিকে চলিয়া গেল।

এই মাকড়সার বাচ্চাগুলি খাদ্য সংগ্রহের জন্য যেরূপ চাতুরি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সত্যসত্যই কৌতূহলোদ্দীপক। অনেক সময় দেখা যায়, হলদে রঙের ক্ষুদে পিঁপড়ারা লম্বা লাইন করিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে ডিম ও খাদ্যকণিকা স্থানান্তরিত করিতেছে। এই

বাচ্চা মাকড়সারা প্রায়ই এই পিঁপড়ার লাইনের সন্ধানে ঘুরিয়া থাকে। পিঁপড়ার লাইন দেখিতে পাইলেই বাচ্চা-মাকড়সারা তাহাদের আশেপাশে অতি সতর্কতার সহিত ঘোরাফেরা করিতে থাকে। কারণ পিঁপড়ারা দেখিতে পাইলেই তাহাদিগকে তাড়া করিয়া যায়। মাকড়সারা যদি দেখিতে পায় পিঁপড়ারা কিছু মুখে করিয়া যাইতেছে অমনই বাজপাখীর মত ছোঁ মারিয়া তাহা ছিনাইয়া লইয়া আসে এবং অনেক দূরে গিয়া তাহা খাইয়া ফেলিয়া পুনরায় লাইনের আশে-পাশে ওৎ পাতিয়া থাকে। ডিম ছিনাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই পিঁপড়ারা লাইন ছাড়িয়া লুণ্ঠন-কারীর পিছনে ছুটিয়া যায়, কিন্তু মাকড়সার মত অত দ্রুত গতিতে ছুটিতে পারে না বলিয়া হতাশ-ভাবে ফিরিয়া আসে। এরূপ ঘটনা একবার নয়, দুইবার নয়, বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কাঁকড়া বিছার সঙ্গে 'ভেনাটরিয়া' মাকড়সার লড়াই

এই মাকড়সাগুলি এতই ধূর্ত্ত ও চটপটে যে, ইহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু ইহাদের একটি অদ্ভুত স্বভাবের সুযোগ লইয়া জীবন্ত অবস্থায় ধরিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। সুমাত্রাদ্বীপের আদিম অধিবাসীরা নাকি বানরের মাংস খায়। কিন্তু বানরেরা প্রায় সর্ব্বদাই উঁচু নারিকেলগাছে চড়িয়া থাকে। নীচে নামিলেও তাহাদিগকে ধরা শক্ত। শুনা যায়, সুমাত্রাবাসীরা বানর ধরিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। নারিকেলের মুখ ছোট করিয়া কাটিয়া তাহার মধ্যে চিনি ভরিয়া সেগুলিকে একস্থানে বসাইয়া রাখে। চিনি খাইবার লোভে বানরেরা নারিকেলের খোলের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং মুঠা করিয়া চিনি বাহির করিতে চেষ্টা করে। লোকগুলি আড়ালে লুকাইয়া থাকে; যখন দেখে অনেক বানরই তাহাদের দুইটি হাত নারিকেলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে তখন সকলে সমবেতভাবে সোরগোল করিতে করিতে তাহাদিগকে তাড়া করে। বানরেরা ভয় পাইয়া ছুটিতে থাকে; কিন্তু নারিকেলের, ভিতরে হাতের মুঠা খোলে না—চিনি মুঠা করিয়াই থাকে। এ অবস্থায় দুই হাতে দুইটা নারিকেল লইয়া তাহারা না পারে ছুটিতে না পারে গাছে উঠিতে; কাজেই লোকের হাতে সহজেই বন্দী হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মাকড়সারা মাছি শিকার করে এবং শিকারকে মুখে করিয়া বহিয়া লইয়া যায়। মাছি ধরিয়া জোরে আছাড় মারিলেই সেটা অনেকটা নির্জ্জীব হইয়া পড়ে; তখন কোন মাক-ড়সার নজরে পড়িতে পারে এমন অবস্থায় সেটাকে মেঝে বা অন্য-স্থানে একটু আঠার উপর বসাইয়া দিলেই হইল। মাছিটা একটু সম্বিত পাইলেই অনবরত তাহার শরীর প্রসাধন করিতে সুরু করিয়া দেয়। এই নড়ন চড়ন দেখিয়া মাকড়সা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে; কিন্তু মাছিটা আঠার সহিত লাগিয়া থাকাতে লইয়া যাইতে না পারিয়া টানাটানি করিতে থাকে, শিকারকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে রাজী নহে। তখন তাহাকে ধরিতে বেগ পাইতে হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক, সকল প্রকার মাকড়সাই জীবন্ত পোকামাকড় ধরিয়া তাহাদের শরীরে বিষদাঁত ফুটাইয়া মারিয়া ফেলে এবং অবসর মত রস চুষিয়া খায়। তাহারা শিকার করে নাই এমন কোন মৃত কীটপতঙ্গ স্পর্শই করে না।

এই জাতীয় আর এক শ্রেণীর নেকড়ে মাকড়সাকে বড় বড় গাছের গুঁড়ির উপর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ছোট ছোট পিপীলিকা ধরিয়া খায়। অবশ্য পিপীলিকাই ইহাদের প্রধান খাদ্য নহে—অন্যান্য কীট-পতঙ্গও শিকার করিয়া থাকে। শিকার দেখিতে পাইলেই ইহারা দূর হইতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

এইরূপ নির্ব্বিচারে শিকার ধরিবার ফলে তাহাদিগকে মাঝে মাঝে বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। অনেকদিন আগে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া আছি। বেলা তখন নয়টা কি দশটা হইবে। বাড়িতে চূণকাম হইতেছিল। কিছু দূরে একটা কোঠার মধ্যে মাটির গামলায় ভিজানো কিছু চূণ ছিল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, চুণের পাত্রটা সেখান হইতে পরিষ্কার দেখা যায়। হঠাৎ একটা কালো রঙের হনুমান আস্তে আস্তে সে ঘরটায় ঢুকিয়াই এক খাবলা চূণ মুখে পুরিয়া দিল। বোধ হয় দই বলিয়া ভুল করিয়াছিল। মুখে দিয়াই সে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, কিন্তু কিছুক্ষণ কোনই প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইল না। গামলাটার পাশে সে যেন উদাস দৃষ্টিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রায় পাঁচ সাত মিনিট পর প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। ঘরটার ভিতরে সে এমন দাপাদাপি সুরু করিয়া দিল যে, বাড়ির এতগুলি লোক তামাসা দেখিতে জড়ো হওয়া সত্ত্বেও কেহ কাছে যাইতে ভরসা পাইল না। এ তাক হইতে লাফ মারিয়া ও তাকে যায়, আবার লাফাইয়া মাটিতে পড়ে। কখনও বা মুখ ঘষে, আবার কখনও মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে আবার তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিয়া দেয়, তাক ও দেওয়ালের জিনিসপত্র চুরমার করিয়া তচনচ করিয়া ফেলিল। এ অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটিবার পর সে ঘরের এককোণে চুপ করিয়া বসিল। আর নড়ে না। দূর হইতে লাঠিসোঁটা লইয়া ও ঢিল ছুঁড়িয়া ভয় দেখানো সত্ত্বেও এক পা নড়িল না। এইভাবে ঠায় বসিয়া থাকিয়া দিনটা তো কাটাইলই, রাত্রিও কাটাইল। তার পরের দিন রোদ উঠিবার কিছু পরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল।

'লাইকোসা' জাতীয় মৎস্যভুক জলচর মাকড়সা

হুবহু এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এই জাতীয় একটি মাকড়সার শিকার ধরিবার সময়। দেওয়ালের গায়ে মাকড়সাটা শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া করিতেছিল অনেকক্ষণ ধরিয়া। সে দিনটা বোধ হয় তার পক্ষে বড়ই অপয়া ছিল। শিকার ধর-ধর হয় এমন সময়ে সেটা উড়িয়া পলায়। অনেকবারই এইরূপে শিকার ফসকাইয়া গেল, হঠাৎ দেখি একটা সুড়সুড়ে জাতীয় পিঁপড়া, মাকড়সাটার প্রায় সম্মুখ দিয়াই ত্রস্ত ভাবে ছুটিয়া যাইতেছে। মাকড়সাটা যেন কিছু চিন্তা না করিয়াই পিঁপড়াটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু পিপীলিকাটাকে ধরিয়াও তৎক্ষণাৎ আবার ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখের উপপদ দুইখানির সাহায্যে কেবল মুখ ঘষিতে লাগিল। পিঁপড়াটার বোধ হয় একটা পা ভাঙিয়া গিয়াছিল, দেখিলাম সে কাৎরাইতে কাৎরাইতে প্রাণপণে ছুটিয়া যাইতেছে। এদিকে কিন্তু মাকড়সাটার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে। বোধ হয় যেন টাল সামলাইতে পারিতেছিল না ; এক একবার পা পিছলাইয়া পড়িবার উপক্রম হয়, কোন ক্রমে ধরিয়া থাকে। কিছুক্ষণ পর একটা স্থানে পিছনের পা আটকাইয়া কেবল ঘুরিতে লাগিল। প্রায় মিনিট দশেক পর চুপ করিয়া বসিয়া

রহিল। ঘণ্টা দেড়েক বাদে আসিয়া দেখি সে চলিয়া গিয়াছে। ছোট্ট বাসাটি তার কাছেই ছিল। যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেখানে চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছিলাম। আঠা দিয়া সে স্থলে জীবন্ত পোকা আটকাইয়া দুই দিন পর্য্যন্ত তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। সে পোকাটার একটু দূর দিয়া আনাগোনা করে বটে কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। চতুর্থ দিনে দেখিলাম তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। পোকাটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ঐ ঘটনার পরে দেখিয়াছিলাম—সেই জাতীয় পিপীলিকার শরীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বিষাক্ত রস নিস্থত হয়। বোধ হয় উহা মাকড়সাদের পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক।

যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে ধূসর-বর্ণের ছোট ছোট কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলচর। ইহাদের পুরুষ-মাকড়সাগুলির গায়ের রং কালো ভেলভেটের মত। আকারে স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ইহারা সারাদিন জলে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। স্ত্রী-মাকড়সা মটরের মত গোলাকার ডিমের থলিটি দেহের পশ্চাদ্দেশে আটকাইয়া ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চাগুলি বাহিরে আসিলেই কাঙ্গারু, মার্সুপিয়েল জাতীয় জানোয়ারদের মত মায়ের পিঠের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। মা তাহাদিগকে পিঠে করিয়াই ঘোরাফেরা করিয়া থাকে। পাঁচ সাত দিন মায়ের পিঠের উপর থাকিবার পর ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।
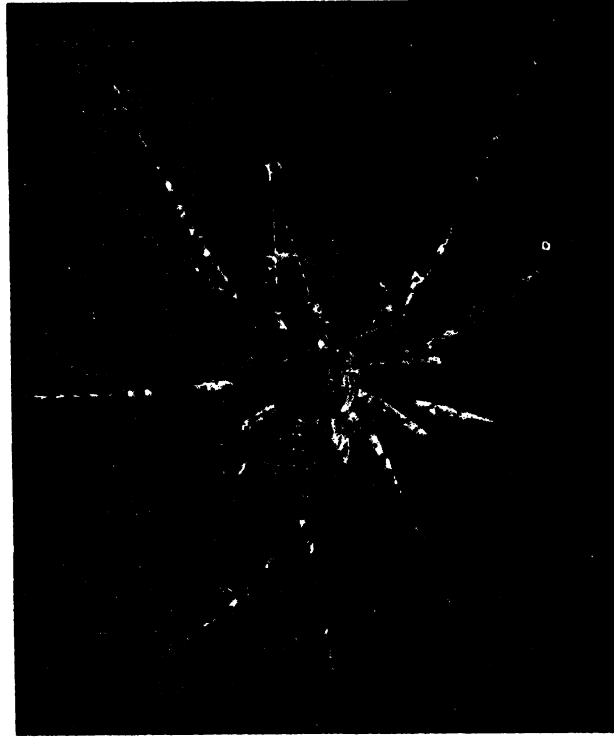
লাইকোসা মাকড়সার যৌন-সঙ্গম

একদিন দমদম বিমান-ঘাঁটির নিকট বিলের মধ্যে একটা লম্বা কাটি-মাকড়সা নজরে পড়িল। মাকড়সাটা শিকারটাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া কেমন করিয়া যেন জলের উপর নামিবামাত্রই ধূসররঙের আরেকটা মাকড়সা ঝোপের মধ্য হইতে জলের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। তারপর একটা জল-ঘাসের উপর বসিয়া শিকারের রস চুষিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহাকে ধরিবার জন্য কাছে অগ্রসর হইবামাত্র চক্ষের নিমেষে লাফ দিয়া জলের উপর পড়িয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আরেক দিন দমদমের একটা এঁদো পুকুরের ধারে বসিয়া আছি, দেখিলাম পুকুরের জলের উপর ওই জাতীয় অনেক মাকড়সা ঘোরাফেরা করিতেছে। সাজসরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল—দুই একটাকে ধরিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা একটুখানি ছুটিয়া গিয়া হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একটার উপর নজর রাখিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলাম। সেটা জলের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে অনেকটা তফাতে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু কোনই ফল হইল না। এবারেও কোথায় যেন গাঢাকা দিল। জলজ লতাপাতাগুলি ভাল করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম; কিছুতেই খোঁজ মিলিল না। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম—ব্যাপারটা কি? হঠাৎ আমার সম্মুখে একটা ছোট্ট শালুক-পাতার নীচ হইতে একটা মাকড়সা ভাসিয়া উঠিল, তখন

বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে উহারা জলের নীচে ডুব দিয়া জলজ ঘাসপাতা আঁকড়াইয়া লুকাইয়া থাকে। বিপদের সম্ভাবনা কাটিয়া গেলেই আবার উপরে উঠিয়া আসে।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়াই ঐ স্থানে তাহাদের আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। একদিন দেখি, একটা শালুক-পাতার কিনারায় জলচর মাকড়সা একটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। উদ্দেশ্য কিছু বুঝিতে পারা গেল না। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেই দেখিলাম—শালুক-পাতার একপাশে পাতাটা হইতে ইঞ্চিখানেক দূরে কতকগুলি তেচোকো-মাছ সাঁতার কাটিতেছে। কেহ কেহ একবার পাতার নীচে যাইতেছে আবার বাহির হইয়া আসিতেছে। তখন বুঝি নাই—মাকড়সাটা মাছগুলার গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছে। প্রায় দশ পনর মিনিট পরেই দেখিলাম, একটা মাছ যেইমাত্র পাতার ধারে মাকড়সাটার খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, অমনই মাকড়সা মুখ বাড়াইয়া ছোঁ মারিয়া মাছটাকে জল হইতে পাতার উপর টানিয়া তুলিল। মাছটা কিছুক্ষণ লেজ দিয়া ঝাপটাঝাপটি করিল, কিন্তু মাকড়সার কামড় ছাড়াইতে পারিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন সে বসিয়া বসিয়া তাহার রস চুষিয়া খাইতে লাগিল। এই মাকড়সা 'লাইকোসা' জাতীয়।

যৌন-মিলনের পূর্ব্বে এই জাতীয় পুরুষ-মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সাদের সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেরূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করে তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। স্ত্রী-মাকড়সা এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে আর পুরুষ-মাকড়সাটি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করে। যৌন-সম্মিলনের পর অধিকাংশক্ষেত্রেই স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষটাকে খাইয়া ফেলে।

আমাদের দেশে ঘরের ভিতরে দেওয়ালের গায়ে ধূসর-বর্ণের কয়েক জাতীয় বড় বড় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও পায়ে কালো কালো ডোরা কাটা থাকে। ইহাদের এক জাতীয় মাকড়সা পয়সার মত গোলাকার সাদা রঙের একটা ডিমের থলি বুকে লইয়া ঘোরে। কেহ আবার দেওয়ালের গায়ে ডিম পাড়িয়া একটা পাতলা পর্দ্দা দিয়া ঢাকিয়া রাখে এবং সর্ব্বক্ষণ সেখানে বসিয়া পাহারা দেয়। ইহারা কাঁকড়ার মত কতকটা পাশাপাশি চলে। যাহারা ডিম বুকে করিয়া ঘোরে তাহারা 'হেটারোপোডা ভেনাটরিয়া' নামে পরিচিত। ইহারা রাত্রিচর মাকড়সা, দিনের বেলায় একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাত্রিবেলায় শিকার করে। শিকার ধরিবার জন্য ইহারা অনবরত ঘোরাঘুরি করে না। একস্থানে চুপ করিয়া ওৎ পাতিয়া থাকে। উইচিংড়ি, আরসোলা প্রভৃতি কাছ দিয়া যাইবার সময় লাফাইয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর পড়ে। ভেনাটরিয়া মাকড়সা ভয়ানক কলহপ্রিয়। পরস্পর কাছাকাছি আসিলেই ঝগড়া বাধিয়া যায়। বিশেষত ডিম বুকে থাকিলে লড়াই চরমে উঠে। কামড়াকামড়ি করিতে করিতে উপর হইতে জড়াজড়ি করিয়া নীচে পড়িয়া যায়। বিজেতার বুকে ডিম থাকিলেও পরাজিতের ডিম লইয়া চলিয়া যায়। এই অতিরিক্ত ডিমটিকে বিজেতা পিছনের পা দিয়া ধরিয়া কাঁধে করিয়া বহন করে। একবার একটা কাঁকড়াবিছার সঙ্গে এই মাকড়সার লড়াই দেখিয়াছিলাম। কানা-উচু একটা পাত্রের মধ্যে কাঁকড়াবিছা পুষিয়াছিলাম। দৈবাৎ একদিন একটা 'ভেনাটরিয়া' মাকড়সা উপর হইতে সেই পাত্রের মধ্যে পড়ে। মাকড়সাটা পলাইবার জন্য ছুটাছুটি করিবার সময় কাঁকড়াবিছার সঙ্গে মারামারি লাগিয়া যায়। কাঁকড়াবিছা অনবরত হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছিল; মাকড়সাও তাহার ঘাড় কামড়াইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু কেহই সুবিধা পাইতেছিল না। হঠাৎ কেমন করিয়া একফাঁকে মাকড়সা কাঁকড়া-বিছাটার পিঠে চড়িয়া বসিল। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর, কাঁকড়াবিছা লেজ উল্টাইয়া একবার মাকড়সাকে হুল ফুটাইয়া দিল। মাকড়সাটা যন্ত্রণায় যেন ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণ পরেই হাত পা গুটাইয়া ক্রমশ অসাড় হইয়া পড়িল।

আরও যে কত রকমের অদ্ভুত মাকড়সা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপ আলোচনাও এস্থলে সম্ভব নহে। এখন আমাদের দেশীয় অতি-অদ্ভুত কয়েক জাতীয় অনুকরণকারী মাকড়সার বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই অনুকরণকারী মাকড়সাদের পিঁপড়া-মাকড়সা বলা

যাইতে পারে। এই জাতীয় যত প্রকারের মাকড়সা আছে—তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখিলেও এবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাদিগকে পিঁপড়া বলিয়াই ভুল করিবে। আমার মনে হয়, যত প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় পিঁপড়ে-মাকড়সা তত রকমেরই আছে, হয়তো বা বেশিও আছে। এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ৬৭ রকমের বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহারা বোধ হয় শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আবার কেহ কেহ পিঁপড়া খাইবার জন্য তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া থাকে। পিঁপড়া ও পিঁপড়ে-মাকড়সাতে প্রধান পার্থক্য এই যে, পিঁপড়াদের মাথার কাছে এক জোড়া শুঁড় থাকে, মাকড়সাদের তাহা নাই। কিন্তু পিঁপড়া মাকড়সারা আশ্চর্য্য উপায়ে এই অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে। মাথার সম্মুখের দুইখানা পা. মাথার কাছ ঘেঁষিয়া সর্ব্বদাই শুঁড়ের মত উপর দিকে উঠাইয়া রাখে এবং শুড়ের মতই নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। সহজে বুঝিবার জো নাই যে ইহা শুঁড় নয়—পা।

আমাদের দেশীয় নালসো বা লাল পিঁপড়াকে তিনটি বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা অনুকরণ করিয়াছে। 'প্ল্যাটালিয়ডস' নামক মাকড়সাকে কি গায়ের রঙে, কি চেহারায় দেখিতে হুবহু নালসোর মত। ইহারা নালসোদের দলের সঙ্গেই একটু তফাতে চলাফেরা করে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিকার অন্বেষণ করে। জাল বোনে না। ডিম পাড়িবার সময় গাছের পাতার নীচের দিকে সূতা দিয়া চ্যাপ্টা ডিম্বাকৃতি বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহারা এত চটপটে ও সতর্ক যে মনে হয় এই আছে, এই নাই আবছায়া মত কিছু দেখিবামাত্রই চক্ষের নিমিষে লতা-পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে। ইহাদের পুরুষ-মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা অনেক বড়। পুরুষ-মাকড়সাগুলিকে যৌবনোদ্গমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবিকল স্ত্রী-মাকড়সাদের মতই দেখায়, হঠাৎ একদিন শেষবারের জন্য খোলস বদলাইবার সময় এক অদ্ভুত বিকটাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া বাহির হয়। মুখের সামনে লম্বালম্বিভাবে থাকে দুইটি মুগুরের মত ঠোঁট, তার উপরে নীচে কুমীরের মত দাঁত; আর মুগুরের মাথার দিক হইতে বাহির হইয়া আসে—বাঁকানো লম্বা সূচের মত দুইটি তীক্ষাগ্র শলাকা। যাহারা ইহাদিগকে জানে না তাহারা বলে—ডবল-পিঁপড়ে, বাস্তবিকই কতকটা জোড়া-পিঁপড়ের মতই মনে হয়। এই অদ্ভুত আকৃতি লইয়া বাহিরে আসিবার দুই তিন দিন পরেই তাহারা সঙ্গিনীর খোঁজে বাহির হয়। এস্কিমো যুবকেরা যেমন সঙ্গিনীর খোঁজে পাড়া-প্রতিবেশীর 'ইগলু'র ভিতর ঢুকিয়া ঢুকিয়া আলাপ পরিচয় করে, এই মাকড়-সাদের দেখিয়াও কতকটা সেইরূপই মনে হয়। অনেক সময় একই 'ইগলু'র নিকট দুইজন পাণিপ্রার্থীর দেখা হইয়া যায়, তখন বাধিয়া যায় ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

জীবন্ত অবস্থায় ইহাদিগকে বন্দী করা বড়ই কষ্টকর; কিন্তু একটু কায়দা করিয়া সহজেই ইহাদিগকে ধরা যাইতে পারে। ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা নাকি এক অদ্ভুত উপায়ে বাঘ ধরিত। যে পথে বাঘ চলে, তাহার অনুসন্ধান লইয়া তাহারা পাতার গায়ে একোনাইটের আঠা মাখাইয়া সেই পাতাগুলিকে পথের উপর বিছাইয়া রাখিত। পায়ের নীচে আঠাসমেত পাতা লাগিয়া গেলেই বাঘ সেই বিরক্তিকর পদার্থটাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে অকৃত-কার্য্য হইয়া পা-টাকে মুখে ঘষে। তাহার ফলে মুখেও আঠা লাগিয়া যায়। ইতিমধ্যে আরও দুই একটা পাতা লাগিয়া গেলে বাঘ অনন্যোপায় হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে, তখন সর্ব্বাঙ্গে এমন কি চোখে মুখে পর্য্যন্ত পাতা লাগিয়া যায়; এ অবস্থায় ক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধের মত লাফালাফি করিতে থাকে, তখন লোকজন আসিয়া অতি সহজেই তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলে। এই মাকড়সা-দিগকেও অনুরূপ এক প্রকার কৌশলে ধরা যাইতে পারে। ইহারা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীকে দেখিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে পলাইয়া যায়; কিন্তু যদি একটি লম্বা লাঠির অগ্রভাগে জিলাটিন জাতীয় আঠায় ডুবাইয়া কয়েকটি সবুজ পাতা বাঁধিয়া সেটিকে মাকড়সাটির নিকটে ধরা হয় তবে নির্ব্বিচারে সে পাতার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং পায়ে জিলাটিন লাগিয়া গেলে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারে না। বিশেষত জিলাটিন-মাখানো পা দিয়া অনবরত চোখ মুছিতে মুছিতে অবশেষে চোখেও ভাল দেখিতে পায় না, তখন সহজেই ধরিয়া ফেলা যাইতে পারে।

# বন্দে মাতরম্

শ্রীমনোজ বসু

গ্রামের সীমানায় বিল। এখন অগ্রহায়ণ মাস, জল-কাদা নেই, যত দূর তাকাও ধানবনে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে। গহর আলির দাওয়া থেকে বিল দেখা যায়, কিন্তু সে আর কদিন বা! বড় পুকুরের ধার দিয়ে সারবন্দী আমের চারা পুঁতেছে, এই এবারের বর্ষাতেও আট দশটা পুঁতেছে—চারাগুলোর নধর সবুজশ্রী, পাল্লা দিয়ে ডাল পালা মেলছে, বছর কয়েকের মধ্যে সমস্ত জায়গা জুড়ে ওদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে।

ধান কাটা লেগেছে, দুবেলাই কাজ হয়। যতক্ষণ নজরে কুলোয়, গহর ক্ষেতে থাকে। উঠানে এসে দাঁড়াতেই পরী তামাক সেজে আনে। কাস্তে ফেলে গহর তখন হুঁকা নিয়ে বসে, আরও খানিক পরে হাত-পা ধুয়ে ভাত খায়। পরী ততক্ষণ মাদুর বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যে বিশ্রাম নেবে, তার উপায় আছে! মল বাজিয়ে বউ অমনই সঙ্গে সঙ্গে হাজির। বলে, একটা গীত গাও না, শুনি।

খঞ্জনী বাজে, গান আরম্ভ হয়। সখীসোনার বারমাসী—ঝিকর গাছার পুল ভাঙার গান—মুগ্ধ শ্রোতাটি ব'সে ব'সে শোনে। ঝিরঝিরে বাতাসে আমচারাগুলো নড়ছে, বড় পুকুরের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে, শীতের আমেজ লাগছে। গহর আলি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে জেগে ওঠে, বলে, বউ, অনেক রাত হ'ল, তোর এখনও খাওয়া হয় নি—আজ এই অবধি?

পরীর নেশা লেগে গেছে, উঠতে চায় না। মৃদু হেসে বলে, ক ঘড়ি বাজল? বারোটা—চোদ্দটা?

—তা বাজল বই কি। এখন তুই খেতে যা।

তাচ্ছিল্যের সুরে পরী বলে, বাজুকগে। যা বাজবার বেজে যাক, তারপর ধীরে সুস্থে খেতে বসব। তুমি আর একখানা ধর।

গহর গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবে। তারপর বলে, এই শেষ কিন্তু। এর পর আর গাইতে নেই।—ব'লেই গেয়ে উঠল—

সুজলাং সুফলাং মাতরম্

মাত্র তিনটি কথা, তার বেশি জানা নেই। বিশ্রী সুর, উচ্চারণ আরও বিশ্রী। পুণ্যনাম দেশসেবক যাঁরা, গহরের গান শুনলে তাঁরা ক্ষেপে যেতেন, বলতেন, জাতীয় সঙ্গীতের অপমান হচ্ছে। পরীও হেসে খুন; বলে, সং বং—কি রকম গীত হচ্ছে গো? ভাল দেখে কিছু গাও—

গহর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হাসিস নে বউ, এ আমাদের মাটির গান। বাপজান বড় পুকুর কেটে গিয়েছে, চাষীরা লাঙল ছেড়ে ঘাটে এসে বসে, আঁজলা ভ'রে জল খায়—ঐ হ'ল গিয়ে সুজলা। নতুন ধানে আমাদের বিল ঐ ভ'রে গেছে, এত যে আমগাছ লাগিয়েছি ওতেও কি রকম ফল

ফলবে দেখিস; চাষীরা এখন শুধু জল খায়, তখন আম খাবে; এই সব কথা দিয়ে গান বেঁধেছে—সুফলা। তারপর গহর প্রশ্ন করলে, আমার বীরু ভাইকে দেখিস নি বউ, নাম শুনেছিস তো ?

পরী নামটাও শোনে নি।

গহর বললে, শহরের ফাটকের মধ্যে এখন হয়তো সে ঘানি ঘুরিয়ে মরছে।—বলতে বলতে একটু উন্মনা হয়ে পড়ে। জেলের ভিতরকার ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা তার স্পষ্ট নয়। হয়তো বীরুকে তারা পেট ভ'রে খেতে দেয় না, এত যে লেখাপড়া শিখেছে তার কোন মর্য্যাদা দেয় না, হয়তো হাতে পায়ে শিকল বেঁধে রেখেছে। নিশ্বাস ফেলে গহর বলতে লাগল, বীরু ভাই 'বন্দে মাতরম্' গাইত, আমি হাসতাম। একদিন সে মানে বুঝিয়ে দিলে, আমার তাজ্জব লাগল। মাটিকে ওরা মা ব'লে জানে—গাছপালা, ধানবন, পুকুরের জল, বাড়ি ঘর দোর সমস্ত মিলে ওদের মা। সেই মাকে ওরা 'বন্দে মাতরম্' বলে ডাকে।

পরী জিজ্ঞাসা করলে, অমন লোকের ফাটক হ'ল ?

গহর বললে, ঐ তো মজা। আমরা চাষীর ছেলে মাটি মেখে দিন কাটে। আমার বীরু ভাই ভদ্দর হ'লেও মাটির 'পরে দরদ আমাদের চেয়ে বেশি। এমন মানুষকে মাটি থেকে সরিয়ে ইটের পাঁচিলে আটকে রেখেছে।

গহর আলি চুপ করল। পরী রান্নাঘরে গিয়েছে। দূরের জ্যোৎস্নামগ্ন বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে গহর তার বীরু ভাইয়ের কথা ভাবতে লাগল, চোখে জল এসে গেল। কেন মানুষের এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি হয় ? চাকরি-বাকরি করবি, ঘর-আলো করা বউ আসবে, মায়ের মুখে হাসি ফুটবে, পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে ! তা নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের দুঃখের কথা শুনে বেড়ানো, হেরিকেন জ্বেলে পাড়ার এখানে সেখানে সভা করা—

রান্নাঘরে শিকল টেনে দিয়ে পরী শুতে যাচ্ছিল। গহর বললে, কাল মা-ঠাকরুণকে দেখতে যাব। যাবি রে বউ ? আমার বীরু ভাইয়ের মা, দেখলে পুণ্যি হবে—

পরদিন মনে তাড়া রয়েছে, মা-ঠাকুরুণের ওখানে যেতে হবে, দুপুর না হ'তেই গহর আলি ক্ষেত থেকে ফিরে এল। খাওয়া দাওয়া সেরে পরীর হাত ধ'রে বললে, চল্।

চল্ বললেই অমনি যাওয়া যায় বুঝি ! পরীর এখনো কত কি বাকি ! কাঁসার মল সে তেঁতুল দিয়ে মাজতে বসল; কপালে কাঁচপোকার টিপ পরল; বিয়ের ঢাকাই শাড়িখানা ফেরতা দিয়ে প'রে ঝুমঝুম ক'রে সে আল বেয়ে গহরের পিছনে পিছনে চলল।

—মাগো !

—গহর ? ব'স বাবা, আসছি এক্ষুনি।

বয়স হয়েছে, কিন্তু মা দুপুরে ঘুমান না। কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছিলেন, সূচসুতো সাবধান ক'রে রেখে তিনি বাইরে এলেন। পরীকে দেখেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ওকি, ওকি !—গহর বাধা দিয়ে উঠল, ওকি করছ মা ?

বিস্মিত হয়ে মা প্রশ্ন করলেন, কি বলছিস, গহর ? এ আমার মালক্ষ্মী নয় ?

—হ্যাঁ মা, এদ্দিন ছোট ছিল, আজ দিন কুড়িক একে বাড়ি নিয়ে এসেছি।

মা চ'টে উঠলেন, তবে যে তুই হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলি ? আমার মাকে একটু আদর করছিলাম, তাতে তোর হিংসে হচ্ছিল বুঝি ! দেখ দিকি, ছেলে মানুষ—কি রকম জড়সড় হয়ে গেছে !

গহর আলি অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগল, মাগো, সে কথা নয়। আমরা হলাম মোছলমান, তোমরা বামুন ; এই অবেলায় ছোঁয়াছুয়ি হ'লে—

মা বললেন, ওঃ! গহরের আমার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, এ খবর তো জানতাম না! হ্যারে, বামুন মোছলমান তোরা কবে থেকে হ'লি ? তুই আর বীরু পাঠশালা থেকে কালিঝুলি মেখে আসতিস, মুড়ির মোয়া কাড়াকাড়ি ক'রে খেতিস, তখন তো এসব ছিল না। মনে পড়ে, পেয়ারাগাছ থেকে প'ড়ে পা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে এলি, তার উপর আমি আবার আচ্ছা ক'রে কান টেনে দিলাম ! এখন হ'লে বোধ হয় বলতিস—দেখ, মোছলমানের উপর হিন্দুদের অত্যাচারটা দেখ একবার !

এ কথার জবাবে গহর আলি একটুখানি মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে, খুব মনে পড়ে মা, কান টেনে দিয়ে তারপর সমস্ত ত্বপুর কোলের মধ্যে রেখে হাঁটুতে মলম মালিশ করলে। সে সব দিন কি আর আসবে ?

মা বলতে লাগলেন, আমার ছেলে যে এত দুঃখ সইছে, সে বুঝি মোছলমান বাদ দিয়ে কেবল বামুন জাতের জন্যে ?

এ কথায় গহরের চোখে জল এসে গেল। বললে, মাগো, দোষ হয়েছে—তোমার বীরুর মত তো বিদ্যে শিখি নি ; কথাবার্ত্তা বলতে জানি না। রাজপুত্র হয়ে কেন যে ওরা বনবাসে যায়, আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু মা, এটা জানি—যে মাটির জন্যে ওরা মরছে সে হিন্দুর মাটি মোছলমানেরও মাটি। ওরা মাটি দেখে, জাত দেখে না। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, বীরু ভাই আসবে কবে মা ?

মা বললেন, আসবে তো ভাদ্র মাসে। এসে আবার কদিন থাকে, তাই দেখ !

মা কিছুতে ছাড়লেন না, বললেন, গহর বাবা, ঐ দাওয়ার উপর পাতা পেতে তোরা দুই ভাই খেতিস, মনে আছে ? কতদিন কেউ মা বলে ডাকে না, ছেলের পাতে ভাত বেড়ে কতদিন দিই নি ! আজকে তোদের ছাড়ছি না, খেয়ে যেতে হবে। তোর ভাই নেই, তেমনই আমার মা-লক্ষ্মী রয়েছে ; দুটো পাতাই পাততে হবে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, চাঁদ উঠল। মা নিজের হাতে কি কি রান্না করলেন, দুজনের জায়গা পাশাপাশি ক'রে দিলেন। পরীর তো পুরুষমানুষের সামনে খাওয়া অভ্যাস নেই, আড়ষ্ট হয়ে হাত কোলে ক'রে ব'সে থাকে। মা বলেন, ও মেয়ে, খাচ্ছিস না কেন ? রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি ! বুড়ো মানুষ, তোদের মত কি পারি ?

গহর তাড়া দিয়ে ওঠে, কেন খাচ্ছিস না ? এ জিনিস বেশি জুটবে না—খেয়ে নে। যতদিন বাঁচবি, মুখে স্বাদ লেগে থাকবে।

নৈশোমার্গঃ সবিতুরুদয়েসূচ্যতে কামিনীনাম্।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে

*Engraved & Printed by*
BHARAT PHOTOTYPE STUDIO

আরও জ্যোৎস্না ফুটেছে, দিনের মত স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। মা রাঙচিতের বেড়া অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার আলপথে নয়, বাঁধের রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওদিক থেকে একখানা গরুর গাড়ি আসছে, তারই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছিল। খানিক পথ গিয়ে গহর কথা ব'লে উঠল, মা দেখলি, বউ ?

পরী জবাব দিল না। গহর বলতে লাগল, শোন্ আমার বীরু ভাইয়ের গল্প। সভা ভেঙে সবাই হুড়মুড় ক'রে পালাল। লাঠির পরে লাঠি পড়ছে। তেঁতুলগাছের উপর থেকে আমি চেঁচাচ্ছি—পালা ভাই, পালা। সে নড়ে না, চেঁচিয়ে বলে—বন্দে মাতরম্। তার পর থানার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আর্ত্তকণ্ঠে পরী ব'লে উঠল, আহা !

গহর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, আমরাই ব্যথা পাই, তার ওসব বালাই নেই। বুকের মধ্যে অত জোর কোত্থেকে আসে জানিস বউ ?—ঐ মা রয়েছে ব'লে। আমার মা যদি ছোট বয়সে না ম'রে যেত, আমি কি সেদিন ঐ রকম পালাতাম ? বীরু ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বলতাম—বন্দে মাতরম্।

তার পর গহর তার জানা সেই একটা মাত্র কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারম্বার গাইতে লাগল, সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্—

পরীরও বুক ভ'রে উঠল। গানের মধ্যে কেবলই তার মায়ের কথা মনে হচ্ছে ; কাল রাতে গহর যে মানে করেছিল সে তার মনে ধরে না। স্নিগ্ধ সুগৌর একখানি মুখ, পরনে সাদা থান—নিরলঙ্কার, দু-চারটে চুল পেকেছে—মার তাতে অপরূপ শ্রী খুলেছে, বন্দে মাতরম্—

গরুর গাড়ি নিকটে এসে পড়ল। গাড়ি থেকে হাঁক এল, হোই গো, যার ডাইনে সেই—

গলা শুনে গহর চিনতে পারল। বলে, মুন্সী সাহেব নাকি ? নবাবপুরের মক্তবে যাওয়া হচ্ছে ?

মুন্সী সাহেবও চিনলেন।—গীত গাচ্ছ গহর মিঞা ? তা একটা ভাল গীত গাইলে হয়—

গহর আলি লজ্জিত হয়ে বললে, গলাটা সুবিধের নয়। তা এই রকম মাঠে ঘাটে গাই, মানুষ-জন দেখলে চুপ করি।

মুন্সী সাহেব বললেন, গলার কথা হচ্ছে না তো ; গীতটাই ভাল নয়। ও হিঁদুর গান—মোছলমানের ছেলে গাইলে যে ধর্ম্মে পতিত হবে।

গহর আলি অবাক হয়ে বলে, সে কি কথা মুন্সী সাহেব ? মা কি কেবল হিঁদুর—মোছলমানের মা নেই ?

মুন্সী শ্লেষের হাসি হাসতে হাসতে বললেন, কোন্ মা সেটা ঠাহর ক'রে দেখেছ, মিঞা ? ও যে হিঁদুর ঠাকুরের গান, দশহাতওয়ালা—

গাড়ি এগিয়ে গেল। গহর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। বলে কি ! বিশ্বাসী সরল মানুষ, যত

গোলমালে থাকুক পাঁচ বার নমাজ করতে কোন দিন ভুল হয় না তার ; ধর্ম্মের হানি হবে, তার চেয়ে জীবন যাওয়াই যে ভাল।

পরী তার হাত ধ'রে টানে। বলে, দুত্তোর, বাজে কথা।

—সর্ব্বনেশে কথা রে বউ! তার পর গহর চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, মুন্সী সাহেব, আমি নবাবপুরে যাব একদিন ; সব কথা আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এরই প্রায় দিন-কুড়ি পরে, একদিন গঙ্গাচরণ সর্দ্দার বেড়াতে এল। গঙ্গার বাড়ি খালের ওপার, শেখহাটির আবাদে। ওরা এক গানের দল করছে, গহর তাতে ঢোলক বাজাতে পারবে কিনা, জানতে এসেছে। গহর মহা উৎসাহে বলে, পারব, খুব পারব। কিন্তু ভাই, এই কটা মাস। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে আর হবে না, লাঙল নিয়ে ভুঁয়ে নামতে হবে।

শেখহাটির আবাদ জুড়ে এখন নোনা জলের তরঙ্গ খেলে। আগে ধান হ'ত, এখন জলকর হয়েছে—দিন-ভোর মাছ ধরা হয়, শেষ রাতে ডিঙা বোঝাই হয়ে শহরে চালান যায়।

গঙ্গাচরণ এক নূতন খবর দিলে। বলে, শোনলি না বুঝি? সেগুড়ে বালি—লাঙল বেচে এবার খেপলা জাল কেনো গে যাও। তোমাদের বিলও ভাসিয়ে দেবে, শুনলাম। নীলমণি সাঁপুই সতর হাজার ডাক দিয়েছে। দেবে না? জলকরে লাভ কত?

এত বড় ভয়ানক কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। গহর অর্থহীন ভাবে খানিক তাকিয়ে থাকে।—বল কি!

গঙ্গাচরণ হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে বললে, তাতে ঘাবড়াবার কি আছে মিঞা? সে তো ভাল কথা। রোদে পুড়ে সমস্তটা দিন লাঙল ঠেলে বেড়াতে হবে না; রাত্তিরবেলায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। কপালে লেগে গেল তো এক দণ্ডের মধ্যে পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজগার। তার পর দিনমানটা ঘুমিয়ে তাড়ি খেয়ে যে রকম খুশি কাটিয়ে দাও।

গহর ব্যাকুলকণ্ঠে বলে, ছিলাম চাষা, শেষকালে কি চোর হ'তে হবে?

গঙ্গা বলে, কোন্ সুমুন্দি নয়, শুনি? বলি, পেটে খেতে হবে তো! আর চোরই বল যা-ই বল, আগের চেয়ে ভাল আছি ভাই। এখন পানে তাম্বুলবিহার, সকালবেলা মিছরির জল—নানা রকম বেয়াড়া অভ্যেস হয়ে গেছে।

চেহারা দেখেই সুখের অবস্থা অনুমান করা যায় বটে। এদের বাপ-দাদা শেখহাটির আবাদে একদিন সোনা ফলিয়ে গেছে ; এদের কাজ গভীর রাত্রে। চারিদিক একেবারে নিশুতি হয়ে যায়, দূরের খালায় টিমটিম ক'রে লণ্ঠন জ্বলে, সেই সময়ে আবছা আঁধারে বাগদীপাড়া থেকে একের পর এক প্রেতের মত সব বেরিয়ে আসে। বাদার খোলে ঝুপঝাপ শব্দে জাল পড়ে, হয়তো খালা থেকে কোন পাহারাদার শুয়ে শুয়ে হাঁক দেয়—হোই গো—ও—ও—! ছুটাছুটি ক'রে এরা আবার পাড়ার গহ্বরে ঢুকে পড়ে ; আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

গঙ্গাচরণের খবর মিথ্যা নয়, একদিন সকলের কাছারিতে ডাক পড়ল। নায়েব বললেন, ভুঁয়ে কেউ লাঙল দিও না, বাছারা। নীলমণি সাঁপুইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

বিশ কুড়ি জন যেন হাহাকার ক'রে উঠল, আমরা খাব কি হুজুর?

নায়েব বললেন, সে কথা বললে জমিদার শুনবে কেন, বাবা? জমি তাঁর; তোমরা বছর বছর কেবল ঠিকা চাষ ক'রে যাও বইতো নয়। এবারে সুবিধা হয়ে গেল, সাড়ে সাত হাজার টাকা বেশি মুনাফা—তার উপর টাকাটা একসঙ্গে এসে যাবে, কোন হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ নেই।

—জমিদার কেবল নিজেরটাই দেখলেন—

নায়েব শেষ করতে দিলেন না। বলতে লাগলেন, কেন, শুধু নিজেরটা হবে কেন? তোমার ঐ নীলমণিও লাল হয়ে যাবে, এই ব'লে দিলাম। শহর যে রকম জেঁকে উঠছে, মাছের দরকার খুব—মাছের সেখানে সোনার দাম।

—শহরের লোকে কি কেবল মাছই খায়? ভাত খায় না? ধানের তাদের দরকার নেই?

নায়েব বললেন, ধান তো কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে আসতে পারে। মাছ যে পথে যায়—

গহর আলি বললে, তাদের টাকা আছে, সোনার দামেও কিনে খেতে পারে। আমরা যে ক্ষেতের তলানি খেয়ে বাঁচি! নায়েব মশায়, তোমরা নিজের আর নীলমণি সাঁপুইয়ের দিকটাই দেখলে, ঘাট ঘর চাষার দিকে চেয়ে দেখলে না!

লক-গেট উঠে গেল, খালের মুখের বাঁধ কেটে দিলে, টুকরা টুকরা যত খাল ছিল, নোনা জলের ঢেউয়ে তাদের আর চিহ্ন রইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে গহরের দক্ষিণ ঘরের কানাচে দিন রাত জলের ধাক্কা লাগে। বড় পুকুরের কালো জল এরই মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আগে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও নৌকা ক'রে কলসী কলসী ভ'রে নিয়ে যেত, এখন পরীকেই বামুনপাড়া থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। সতেজ লাবণ্যভরা ধানগাছে যে সব জায়গা খাঁটা থাকত, মাছের নৌকা সেখানে খটাখট বৈঠা চালিয়ে বেড়ায়। গহর আলি বিলের ধারে ব'সে ব'সে দেখে, যখন-তখন এসে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে।

পরী হাত দুখানি ধ'রে বলে, তুমি অত কি ভাব বল তো?

—যা ভাবি, সে মুখে বলবার কথা নয়, বউ। বলতে বলতে গহর আলি গর্জ্জন ক'রে ওঠে, জানিস, তুই তখন আসিস নি,—এখানে পোড়ো জমি ছিল। নিজের হাতে কারকিত করেছি, জঙ্গল কেটেছি, ভুঁয়ে মাটি তুলেছি। আজ এক হুকুমে সেখানে নোনা জলের বন্যা বইয়ে দিলে। এ সব কি চোখ মেলে দেখা যায়?

পরী বললে, দেখো না, চল এখান থেকে, যদি কখনও এসে পড়, চোখ বুজে থেক।

—ইচ্ছে করে কি বউ, ওদের একটুখানি দেখিয়ে দিতে পারতাম!

বউ তাড়াতাড়ি গহরের মুখে হাত চাপা দিল। একটুখানি হেসে গহর বললে, জানিস রে, আর ভাত জুটবে না, নোনা জল খেয়ে থাকতে হবে। আর এমনই কপাল, বীরু ভাইও এ সময়টা বাইরে নেই। এত লোকের দুঃখ কখনও সে চুপ ক'রে সইত না, উপায় একটা কিছু করতই।

যাই হোক, আপাতত কোন চিন্তা নেই খালা বাঁধা হচ্ছে। এই উঁচু টিলাটা ছিল গহর আলির মামার বাড়ি, এখানে ধান তুলত। এখন সমান চৌরস ক'রে চোঙের মত বড় বড় খড়ের ঘর উঠেছে। মাটি কেটে চারি পাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যা চাষীরা সব কোদাল নিয়ে বেরোয়। এখন মাস দুই এক রকম নিশ্চিন্ত।

সন্ধ্যার সময় মাটির মাপ হয়। কারকুন গোলাম হোসেন মাপকাঠি নিয়ে মাপ করে; পূর্ণ গায়েন থলি-ভর্ত্তি পয়সা-সিকি-দুয়ানি নিয়ে বসে।

গোলাম হোসেন হাঁক দেয়, তিন—তিরিশ।

পূর্ণ বলে, তেরো পয়সা, নাও মিঞা, গুনে গেঁথে নাও।

গোলাম হাঁকে, চার—পুরো।

পূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব, সাড়ে চোদ্দ পয়সা, ধর।

একুনে কার কত হ'ল, রাস্তায় এসে সকলে হিসাব করতে করতে চলে। গহর আলি এত খাটে, তার চার কি পাঁচ আনার বেশি কোন দিন হয় না। অথচ আর সকলের কারও হয়েছে দশ আনা, কারও বারো আনা—এই রকম।

একদিন সে গোলামকে কথাটা বললে। গোলাম হি-হি ক'রে হাসে। বলে, তুই বড্ড ন্যাকা গহর মিঞা। পয়সা কামাই করতে হ'লে ইয়ের বন্দোবস্ত করতে হয়। জুড়ন মাঝি কত পার্ব্বণী দেয় জানিস? সিকিতে আনা হিসেবে।

গহর বলে, বন্দোবস্ত হয় নি ব'লে আজ তিন হপ্তা ধ'রে এই রকম ফাঁকি দিয়ে আসছিস? মাপ্‌ আবার, দেখব।

গোলাম হাসতে হাসতে বলে, খুব—খুব। একবার কেন—হাজার বার; মনে সন্দো রাখিস না।

সে মাপ করতে লাগল, এই এক কাঠিতে হ'ল ছ-ফুট, আর এক কাঠি হ'ল বারো, আর এক কাঠি পনর, আর এক কাঠি সতর, আর এক কাঠি—

মাপকাঠি গোলামের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গহর মারল তার চোয়ালে এক বাড়ি। আর্ত্তনাদ ক'রে গোলাম মাটিতে ব'সে পড়ল। বিশ-কুড়ি জন খালার দিক থেকে ছুটে এল, গহরকে এসে চেপে ধরল; কেউ ধরল হাত, কেউ কান, কেউ চুলের মুঠি।

প্রহরখানেক রাত্রে গহর ক্লান্ত দেহে বাড়ি এল। পরী কাঁদো-কাঁদো গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

—কিছু না, তুই তামাক সাজ।

পরী বললে, হুঁ, সাজতে যাচ্ছি—ব'য়ে গেছে আমার। কাঁদতে কাঁদতে সে তেলের বাটি নিয়ে এল। পিঠের উপর মুখের উপর দড়ির মত ফুলে ফুলে উঠেছে, পরী তেল মালিশ করতে লাগল। এক পশলা বৃষ্টির মত ঝরঝর ক'রে গহরের চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নেমে এল;

কি মনে হ'ল—চোখের জলের মধ্যে অতি অস্পষ্ট কণ্ঠে বারম্বার সে বলতে লাগল, মা, মা, বন্দে মাতরম্।

গভীর রাতে গহর টিপিটিপি বেরুচ্ছে। পরীর সজাগ ঘুম, সভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাও গো ?

গহর ফিসফিস ক'রে বলে, শেখহাটির আবাদে, একটা খেপলা জালের খোঁজে গো। আজ ওরা পিঠেই দিয়েছে, পেটের তো কিছু দেয় নি। কাল যে নিরম্বু উপোস, তা ঠাহর করেছিস ?

বাগদীপাড়ায় গিয়ে গহর প্রথমেই গঙ্গাচরণের দাওয়ায় উঠল। গঙ্গাচরণ শুনে লাফিয়ে উঠল—বল কি, মিঞা ? আট ঝুড়ি মাছ প'ড়ে রয়েছে আর বেটারা প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে ? পেটে জুত থাকলে ঘুম আসে ঐ রকম! চল চল, খাসা হবে—আমাদের যাত্রাদলের সাজের টাকাটা হয়ে যাবে এইবার।

খাল পেরিয়ে ছায়ামূর্ত্তিরা চলেছে টিপিটিপি। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে কেউ নেই; খালার উপর তীব্র একটা আলো জ্বলছে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বাগদীরা বিলের খোলে নেমে দাঁড়াল। মাছের ঝুড়ি রয়েছে বটে; কিন্তু ওরা সকলেই যে ঘুমিয়ে আছে তা নয়, ঝুড়িগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে জন দুই লোক সড়কি হাতে পাহারা দিচ্ছে।

গহর ফিসফিস ক'রে বললে, দেশলাই আছে রে ?

গঙ্গা বললে, উঁহু, এখন কি বিড়ি ধরাবার সময় ?

গহর বললে, বিড়ি নয় ভাই, খালায় আগুন ধরালে কেমন হয় ? ঐ জায়গাটায় আমি ধান তুলতাম, এখন খালা তুলেছে।

যুক্তিটা সকলেই ঘাড় নেড়ে অনুমোদন করল। সবাই আগুন নেবাতে ব্যস্ত থাকবে, মাছ নিয়ে সেই ফাঁকে স'রে পড়বার সুবিধা হবে।

দাউ দাউ ক'রে খালা জ্বলে উঠল। ঐ অত রাত্রে বিলের মধ্যে তখনও মাছ ধরা হচ্ছিল। আগুন দেখে আর চীৎকার শুনে যে যেখানে পারল, নৌকা রেখে বাঁধ ধ'রে ছুটল। নূতন জলকর হয়েছে, চাষীরা সব ক্ষেপে আছে, কখন কি ক'রে বসে বলা যায় না, জেলেদের সকলের সঙ্গে সড়কি রাখবার হুকুম আছে। সকালবেলা শোনা গেল, আলায় মাছ লুঠ করতে এসেছিল, সুবিধা করতে পারে নি, তিন চার জন ধরা পড়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে গহর আলি মিঞা।

সেই রাত্রেই গহরকে শহরের হাসপাতালে পাঠান হ'ল। সেখান থেকে আদালতে। একদিন হাজতের মধ্যে চুপিচুপি সে পরীকে বললে, তোর জন্যে ভাবি না বউ, ইচ্ছে হয় বাপের বাড়ি যাস, না হয় মা-ঠাকুরুণের ওখানে গিয়ে থাকিস। বীরু ভাই ভাদ্র মাসে বেরিয়ে আসছে, তবে আর কি! কিন্তু আমার দুঃখ, সমস্ত কথা শুনে ভাই আমার বলবে কি! চোর-ডাকাতকে ওরা ঘেন্না করে। ওরা যায় ফুলের মালা প'রে আর আমি চললাম ডাকাতি ক'রে! ফাটকের মধ্যে দেখা না হ'লে বাঁচি, কি ক'রে তার মুখের দিকে তাকাব!

গহর আলির দু-বছর জেল হয়ে গেল।

বছর-দুই পরে এক সকালে বীরনারায়ণ জেলের ফাটকের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। গহর বেরিয়ে এল। বীরু বলে, চিনতে পার গহর ভাই ?

—পারি বইকি ভাই ? এত বড় হয়েও আমাদের সকলের জন্য তোমার কত দুঃখ! চিনব না ? বন্দে মাতরম্।

বীরু প্রতিধ্বনি করলে, বন্দে মাতরম্। আরও জন-কয়েক লোক সেখানে ছিল, নানা দরকারে তারা জেলের ফটকে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও হেঁকে উঠল, বন্দে মাতরম্।

রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায়। একজনে বলে, কোন স্বদেশী বাবু বেরুল বুঝি! থাম, একটুখানি দেখে যাই।

তাদেরই পাশ দিয়ে গহরের হাত ধ'রে বীরনারায়ণ গরুর গাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বললে, হ্যাঁ ভাই, বড় স্বদেশী আমাদের গহর আলি। দু-বছর পরে এই বেরুচ্ছে। বল ভাই—বন্দে মাতরম্।

গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ ক'রে অসমান মেঠোপথে চলেছে। গহর ছলছল চোখে বললে, মিছে কথা কেন বললে, বীরু ভাই ?

বীরু বললে, কোন্‌টা মিছে ?

—এই যেমন আমি স্বদেশী ফাটক গিয়েছি। আমি তো ডাকাত ভাই, খালা লুট করতে গিয়েছিলাম।

বীরনারায়ণ বললে, ও তো একটা ছুতো। আসলে তোমার প্রাণ কাঁদছিল। সুজলা সুফলা আমাদের গাঁয়ের ঐ দশা তুমি দেখতে পারছিলে না। বড় পুকুরে নোনা জল উঠেছে, ধানবন হা হা করছে, একি তোমার সহ্য হয় ? খালা লুঠ ক'রে, যা হোক ক'রে তোমার প্রাণ কোথাও আড়ালে গিয়ে একটু জিরতে চাচ্ছিল, আমি কি বুঝি না গহর ভাই ?

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে গহর বললে, কিন্তু এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। এতে কি স্বদেশী হ'ল ?

বীরু বললে, স্বদেশ কি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে ?

দু-জনে পাশাপাশি চুপ ক'রে রইল। গাড়ি খালের ধারে ধারে চলেছে। গহর হঠাৎ বীরুর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরল। বললে, গাঁয়ে তো ফিরছি, একটা কথা বল ভাই—এদ্দিনে আপদ চুকে গেছে তো ? নীলমণি সাঁপুই বিদায় হয়েছে ? আবার ধান হচ্ছে ? ছেলেমেয়েরা বড় পুকুরে চান করতে আসে তেমনই ক'রে ? আমার আম-চারায় এবার আম হয়েছিল ? তুমি যখন ফিরে এসেছ সমস্ত আবার ঠিক হয়ে গেছে—নয় ?

বীরনারায়ণ ম্লানদৃষ্টিতে গহরের চোখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইল। বললে, হয়ে গেছে বইকি, ভাই ? তুমি ভেব না ভাই, সব ঠিক আছে।

গরুর গাড়ি বাড়ির সামনে আসতেই অনেকে এসে দাঁড়াল। সবাইকে সরিয়ে বীরু হাত ধ'রে তাকে দাওয়ায় নিয়ে বসাল। গহর ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করে, বীরু ভাই, মা এসেছে তো ?

তার পর জোর গলায় হাঁক দেয়, ও মা, মাগো, ছুটো মুড়ি দেবে না? কত দিন খাই নি তোমার হাতে! আমার বীরু ভাই আছে দু-জনে কাড়াকাড়ি ক'রে খাব।

মৃদু পায়ে পরী এসে দাঁড়ল। যত পালিয়ে আসুক, গহর তা টের পায়। হাসতে হাসতে বললে, কেমন আছিস বউ?

পরীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল; কথা বলতে পারে না, ভয় হয় বুঝি বা কেঁদে ফেলবে। তার পর বললে, তুমি কেমন ছিলে গো?

—ভাল। তবে কষ্ট হ'ত খুব; চারিদিকে ইট আর ইট! আহা-হা, আজ চোখ জুড়চ্ছে। আমরা হলাম চাষার ছেলে, ধানবন না দেখলে বাঁচি?

পরী চমকে উঠল। ও কি পাগল হয়ে গেছে! বললে, কি দেখছ?

ধানবন। কি রকম কালো হয়েছে, দেখ্! কত গাছপালা! আমার আমচারাগুলো কত বড় হয়েছে রে? এবারে আম হয়েছিল?

পরী ভাল ক'রে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। তার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হ'ল। হায় রে, নোনা জলের তুফান লেগে গহরের নিজের হাতে পোঁতা আমচারাগুলো যে কোন্ কালে ম'রে গেছে! গহর বললে, কি ভাবিস রে বউ? আমার কথার জবাব দিলি না?

ধরা গলায় পরী বললে, অনেক আম হয়েছিল, আমসত্ব ক'রে রেখেছি—তুমি খেয়ো—

—আর, বড় পুকুরের জল মিঠে হয়েছে তো রে? খেতে নোনা লাগে না? আমার জন্য এক গ্লাস নিয়ে আয় দিকি!

—আচ্ছা—ব'লে বউ ছুটে পালাল। গহর তখন বলছে, ও বউ, বলি সেই গীতটা মনে আছে—সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্? এখন ভাল লাগে? তার মানে বুঝিস?

পরী তখন ঘরের মেজেয় প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মার কাছে গিয়ে বলে, মা গো, ও অন্ধ হয়ে গেছে।

মা বললেন, সে তো শুনেছি, মা। তাই শুনে বীরু ওকে জেলে দেখতে গিয়েছিল। তুই দুঃখ পাবি ব'লে তোকে জানায় নি। সেই যে সড়কির খোঁচা লেগেছিল, তার পর ক্রমেই খারাপ হয়ে গেল। কাঁদিস না বেটি, ও এই বাড়ি ঘর দোর বিল বড় ভালবাসত কিনা, তাই তাদের এ দশা ভগবান ওকে আর দেখতে দিলেন না।

বীরু বললে, মা, অন্ধ হয়ে গেছে গহর ভাই, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে। ও দেখছে—বড় পুকুরে কাকের চোখের মত জল, বিল-ভরা সবুজ ধান, গাছে গাছে ফুল, মানুষের মুখে চোখে হাসি—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের মা। আমাদের চেয়ে ও ভালই দেখছে। আসতে আসতে গহর গাড়িতে সেই সব কত গল্প করলে! মাগো, ভাগ্যবান আমার গহর ভাই—আমরা সব ম'রে আছি যে, যদি বেঁচে থাকতাম সবাই ঐ রকম অন্ধ হ'তে চাইতাম।

বেলা প'ড়ে এল। কাজকর্ম্মের পর বাড়ি ফিরবার মুখে অনেকে গহরের উঠানে এসে বসেছে। নবাবপুরের মুন্সীসাহেব গহরকে খুব ভালবাসতেন, খবর পেয়ে তিনিও এসেছেন।

এসেই তর্ক সুরু হয়েছে। তিনি বলছেন, বেশ তো, বন্দে মাতরম্ বললে আমরা যখন চ'টে যাচ্ছি—জেদাজেদির কি দরকার? আর একটা নতুন কিছু বললেই তো হয়! অবশ্য দেবতা-টেবতা ওসব মানুষ-ক্ষেপানোর জন্যে বলে, দশভুজাকে কখন সুজলা ব'লে পুজো করে না, সেকথা সবাই বোঝে। কিন্তু আর কিছু না হোক—এই গান যিনি লিখেছেন, আমাদের জাতকে তিনি গালি দিয়েছেন, এটা তো মানতে হবে।

বীরনারায়ণ উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে উঠল, আমি চালেঞ্জ করছি, বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। স্বার্থবাদীরা মিথ্যে দোষারোপ করে। আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি—

শান্তকণ্ঠে মা বললেন, তার দরকার কি বাবা? আমরা তো কেউ বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ গাই না।

—বঙ্কিমের গান নয়?

মা বলতে লাগলেন, না, মুন্সীসাহেব। 'আনন্দমঠে'র সন্তানেরা বইয়ের পাতায় আছে, আমার এই সন্তানেরা রক্তে মাংসে চোখের সামনে বেড়াচ্ছে। এদের গান ভোলবার জো নেই। এই বন্দে মাতরম্ আমার বীরুর রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে, এই গান আবার অন্ধ গহরের চোখের জলে ভিজে গেছে। সত্যি যদি গানের জন্মগত দোষ কিছু থাকে, গঙ্গাজলে ধুয়ে ধুয়ে তাতে আর এক কণিকাও ময়লা নেই। আর একটা নতুন কিছু বলবার যে প্রস্তাব করছিলেন, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে কে? রাজি আছেন আপনারা?

গহর রুক্ষকণ্ঠে ব'লে উঠল, তুমি বলবে বইকি, মুন্সীসাহেব! তুমি যাও নবাবপুরে—সেখানে ধানবনে নোনা জলে তুফান বয় না, চোখ মেলে উঠানের উপর মরা আমচারাও দেখতে হয় না। তোমরা সুখের মানুষ—মাকে চিনবে কি! তুমি বাড়ি যাও, মুন্সীসাহেব, আমরা এখন বন্দে মাতরম্ গাইব।

সুরহীন কণ্ঠে বন্দে মাতরমের একটি কলি গাইতে গাইতে গহর আলির চোখ জলে ভ'রে গেল।

# মুক্তির উপায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
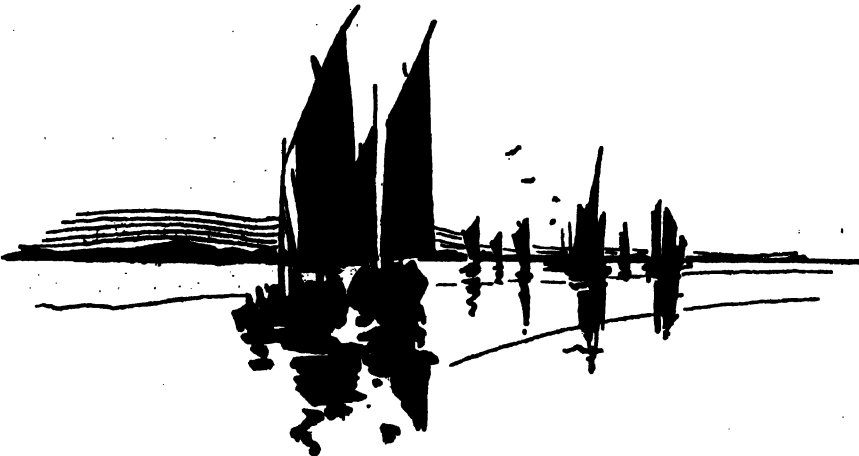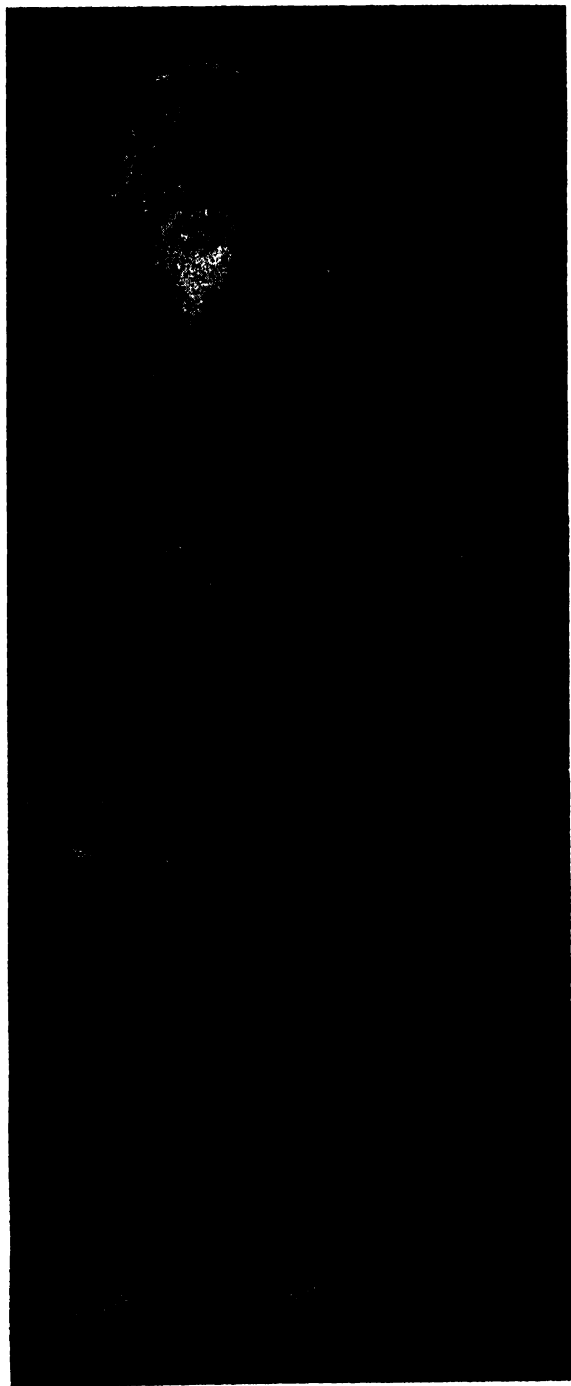
# ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফ দাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে, তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম-হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ ক'রে দেখছে কখনো নেপথ্যে কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরু জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খাণ্ডবদাহন করে। কাজ সুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ ক'রে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার ছেলে মাখন দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পুষ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ ক'রে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

## প্রথম দৃশ্য

ফকির। পুষ্পমালা। হৈমবতী।

ফকির

সোহং সোহং সোহং।

পুষ্প

ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী?

ফকির

গুরুমন্ত্র।

পুষ্প

কতদূর এগোলো?

ফকির

এই ইড়া নাড়িটার কাছ পর্যন্ত এসে গেল থেমে।

পুষ্প

হঠাৎ থামে কেন?

ফকির

ঐ আমার ছিঁচকাঁদুনি খুকিটার কীর্তি। মন্তরটা গুরগুর গুরগুর করতে করতে দিব্যি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইঞ্চি হ'লেই পিঙ্গলার মধ্যে ঢুকে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিস্সুরে চীৎকার ক'রে উঠল,—বাবা নচঞ্চুস্। দিলুম ঠাস ক'রে গালে এক চড়, ভ্যাঁ ক'রে উঠল কেঁদে, অমনি এক-চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভীগহ্বর পর্যন্ত। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

তোমার গুরুর মন্তরটা কি অজীর্ণ রোগের মতো? নাড়ির মধ্যে গিয়ে—

ফকির

হাঁ দিদি, নাড়ির মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই—ওটা বায়ু কিনা।

পুষ্প

বায়ু নাকি?

ফকির

তা না তো কী? শব্দ ব্রহ্ম—ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋষিরা যখন কেবলি বায়ু খেতেন তখন কেবলি বানাতেন মন্তর।

পুষ্প

বলো কি?

ফকির

নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ি যেত পটপট ক'রে ছিঁড়ে বিশখানা হয়ে।

পুষ্প

উঃ, তাই তো বটে—একেবারে চার বেদভরা মন্ত্র—কম হাওয়া তো লাগে নি।

ফকির

শুনলেই তো বুঝতে পার, ঐ যে ও—ম্, ওটা তো নিছক বায়ু উদ্গার। পুণ্য বায়ু, জগৎ পবিত্র করে।

পুষ্প

এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে ? আমরা হ'লে তো পাগল হয়ে যেতুম।

ফকির

সবই গুরুর মুখ থেকে। তিনি বলেন কলিতে গুরুর মুখই গোমুখী—মন্ত্রগঙ্গা বেরচ্ছে কল্‌কল্‌ ক'রে।

পুষ্প

বি. এ.তে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও ভুগেছি, সেটা কিন্তু পাকযন্ত্রের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির

এতেই বুঝে নাও—গুরুর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ির মধ্যে মন্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরু গুরু গুরু শব্দে।

পুষ্প

আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে ?

ফকির

তা বাড়ে বটে।

পুষ্প

গুরু কী বলেন ?

ফকির

তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থূলে সূক্ষ্মে লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাদ্যের সঙ্গে মন্ত্রের বেধে যায় যেন গোলাগুলি বর্ষণ, নাড়িগুলো উচ্চস্বরে গুরুকে স্মরণ করতে থাকে।

হৈম

দুঃখের কথা আর কী বলব দিদি! পেটের মধ্যে গুরুর স্মরণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পুষ্প

চুপ চুপ চুপ, পতিব্রতা তুমি। স্বামীর কণ্ঠ যখন চলে, সাধ্বীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি ?

হৈম

তোমরা দুজনে তত্ত্বকথা নিয়ে থাক। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চললুম।

( প্রস্থান )

ফকির

আমার কথাটা বুঝিয়ে বলি। গুরুর মন্ত্র, যাকে বলে, গুরুপাক। খুব বেশি যখন জমে ওঠে অন্তরে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে; নাচের ঘূর্ণি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর ঘানি ঘুরলে যে রকম আওয়াজ দিতে চায়, ভক্তির ঘোরে সেই রকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখ না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূলাধার থেকে, উঃ!

পুষ্প

কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব নাকি?

ফকির

কিছু করতে হবে না। একবার পেটভরে নেচে নিতে হবে। গুরু বলেছেন, গুরুর মন্ত্রটা হ'ল ধারক, আর নৃত্যটা হ'ল সারক, দুটোরই খুব দরকার। ( উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য )

গুরুচরণ করো শরণ-অ
ভবতরঙ্গ হবে তরণ-অ
সুধাক্ষরণ প্রাণ ভরণ-অ
মরণভয় হবে হরণ-অ।

পুষ্প

শুধু মরণভয় হরণ নয়, দাদা। গুরুদক্ষিণার চোটে স্ত্রীর গয়না, বাপের তহবিল হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির

ঐ দেখ, বাবা আসছেন বৌকে নিয়ে, বড় ব্যাঘাত, বড় ব্যাঘাত। গুরো।

পুষ্প

ব্যাঘাতটা কিসের?

ফকির

স্থূলরূপে ওঁরা আমাকে ফকির ব'লেই জানেন।

পুষ্প

আরো একটা রূপ আছে না কি?

ফকির

ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলি মিলে যাচ্ছে গুরুদেহের সূক্ষ্মরূপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ওঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পুষ্প

খোলসটা যে অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির

দৃষ্টিশুদ্ধি হ'তে দেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবৎকৃপায় এঁদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হ'লে গুরুদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন—তখন বাবা—

পুষ্প

তখন বাবা গয়ায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

( ফকিরের প্রস্থান )

( বিশ্বেশ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ )

বিশ্বেশ্বর

( হৈমর প্রতি ) বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে, তাই তো ওর কিছু হ'ল না।

পুষ্প

আর কী হ'লে আর কী হ'ত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধ'রে যায়।

বিশ্বেশ্বর

ম্যাকিননের হেড্‌বাবু আমার বন্ধুর শ্যালীপতি, সে বলেছিল ফকির যা হয় একটা কিছু পাস করলেই তাকে এসিস্টেন্ট স্টোরকীপার ক'রে দেবে। বাঁদরটা কেবল জেদ ক'রেই বারে বারে ফেল করতে লাগল।

পুষ্প

ফেল করবার বিশ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিত্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল, ম্যাট্রিকের এ পারের খোঁটা এমনি বিষম জেদ ক'রে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধ'রে ঝিঁকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিঁড়ে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়—স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেরে রাখবি চল্।

বিশ্বেশ্বর

যাও পড়তে, কিন্তু শোন মা, ফকির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন?

হৈম

কী করব বাবা, টাকা টাকা ক'রে উনি বড় অশান্তি বাধান।

বিশ্বেশ্বর

ঐ দেখ না, একটা রোঁওয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর ব'সে বিড়বিড় ক'রে বকছে।—এই ফকির, শুনে যা বাঁদর। শুনে যা বলছি।

পুষ্প

মেসোমশায়, তোমার বুঝি সাহস হয় না ওকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশ্বেশ্বর

সত্যি কথা বলি, মা, ভয় ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখ না ওখানটায় কী রকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশমের আসনে।

পুষ্প

ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগুলোর আলো কিছুতেই নেবে না, যার দিব্যদৃষ্টি আছে সে চোখ বুজলেই দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্মা চুরুটের প্যাকবাক্সে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভ'রে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়ালা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্যরূপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভ'রে যায় দার্জিলিং চায়ের গন্ধে।

বিশ্বেশ্বর

আচ্ছা মা, ঐ বড় বড় বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেখেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার মিক্শ্চারের অদৃশ্যরূপ ভ'রে রেখেছে না কি!

পুষ্প

বল্ না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্যে?

হৈম

দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধ্যে স্নান ক'রে তিন চুমুক ক'রে খান। ওঁর বিশ্বাস ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার সংসার খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বন্যায় গেছে ভেসে। যাই আমার কাজ আছে।

( প্রস্থান )

বিশ্বেশ্বর

ওরে ও ফক্‌রে!

পুষ্প

আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে আসছি। ( কাছের দিকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে ) ও ফকিরদা, করেছ কী!

ফকির

কেন, কী হয়েছে?

পুষ্প

গুরু হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন তার খোলাটা প'ড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফকির

( লাফ দিয়ে উঠে ) এঃ, ছি ছি করেছি কী !

পুষ্প

হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি ! সে তোমার পিছনে পিছনে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে যেত বৈকুণ্ঠধামে—সেখানে পাড়ত স্বর্গীয় ডিম ।

ফকির

( বেরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকালে )

ক্ষমা ক'রো গুরু, ক্ষমা ক'রো—এ অণ্ড জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডের বিগ্রহ—এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল দিকপালরা সবাই । গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে ।

পুষ্প

( চাদর চেপে ধ'রে ) এনো, এখন তোমার বাবার কথাটা শুনে নাও ।

( চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে )

বিশ্বেশ্বর

বাপু, ভক্তিটা খাটো ক'রে আমার উক্তিটা মানো ।

ফকির

কী আদেশ করেন ?

বিশ্বেশ্বর

আর একবার পাস করবার চেষ্টা ক'রে দেখ ।

ফকির

পারব না বাবা ।

বিশ্বেশ্বর

কী পারবি নে ? পাস করতে, না পাস করবার চেষ্টা করতে ?

ফকির

চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না ।

বিশ্বেশ্বর

কেন হবে না ?

ফকির

গুরুজি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন । প্রথমে পাস তার পরেই চাকরি ।

বিশ্বেশ্বর

লক্ষ্মীছাড়া ! কী ক'রে চলবে তোমার ! আমার পেন্সেনের উপর ? আমি কি তোমাকে খাওয়াবার জন্যে অমর হয়ে থাকব ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বৌমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না ? পুরুষমানুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা !

ফকির

আমি নিজের জন্যে এক পয়সা নিই নে।

বিশ্বেশ্বর

তবে নিস্ কার জন্যে ?

ফকির

ওঁরি সদগতির জন্যে।

বিশ্বেশ্বর

বটে ? তার মানে ?

ফকির

আমি তো সবই নিবেদন করি গুরুজির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর

অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁঠিসুদ্ধ। ছেলেপুলেরা মরবে শুকিয়ে।

ফকির

আমি কিছুই জানি নে। ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ) যা করেন গুরু।

বিশ্বেশ্বর

বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। তোর মুখ দেখতে চাই নে।

( প্রস্থান )

( হৈমবতীর প্রবেশ )

ফকির

কা তব কান্তা—।

হৈমবতী

কী বকছ ?

ফকির

কা তব কান্তা ? কোন্ কান্তা হ্যায় ?

হৈমবতী

হিন্দুস্থানী ধরেছ ? বাংলায় বল।

ফকির

বলি, কাঁদছে কে ?

হৈমবতী

তোমারি মেয়ে মিন্তু।

ফকির

হায় রে, একেই বলে সংসার। কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিলে।

হৈমবতী

কাকে বলে সংসার ?

ফকির

তোমাকে।

হৈমবতী

আর তুমি কী ! মুক্তির জাহাজ আমার ! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি !

ফকির

গুরু বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী

আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরু বেঁধেছেন সাতান্ন পাকে।

ফকির

মেয়েমানুষ—কী বুঝবে তুমি তত্ত্বকথা ! কামিনী কাঞ্চন—

হৈম

দেখ ভণ্ডামি ক'রো না। কাঞ্চনের দাম তোমার গুরুজি কতখানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর কামিনীর কথা বলছ ! ঐ মূর্খ কামিনীগুলোই পায়ের ধুলো নিয়ে পায়ে কাঞ্চন যদি না ঢালত তা হ'লে তোমার গুরুজির পেট অত মোটা হ'ত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমার কাটবে। কাঞ্চনের বাঁধন খসল তোমার। শ্বশুরমশায় আমাকে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

( পুষ্পর প্রবেশ )

পুষ্প

ফকিরদা ! মানে কী ? তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ! অনিদ্রার পাঁচন না কি ?

ফকির

( ঈষৎ হেসে ) তোমরা কী বুঝবে—মেয়েমানুষ !

পুষ্প

কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিতে দোষ কী !

( ফকির হাস্যমুখে নীরব )

হৈম

কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাত্তিরে ঘুমোন।

পুষ্প

বেদমন্ত্রগুলোকে তলিয়ে দেন ঘুমের তলায় ! এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির

গুরুকৃপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পুষ্প

ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির

এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জ্বলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢুকতে থাকে সুষুম্না নাড়ির পাকে পাকে।

পুষ্প

সে জন্যে ঘুমের দরকার?

ফকির

খুবই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুজিকে, দুপুরবেলা আহারের পর ভগবদ্গীতা পেটের উপর নিয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছেন বিছানায়—গভীর নিদ্রা। বারণ ক'রে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিঙ্গলার মধ্য দিয়ে শ্লোকগুলো অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে; তিনি হাসেন, বলেন, মূঢ়দের নাক ডাকে; ইড়াপিঙ্গলা ডাকে জ্ঞানীদের—নাসারন্ধ্র আর ব্রহ্মরন্ধ্র ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিৎপুর আর চৌরঙ্গী।

পুষ্প

ভাই হৈমি, ফকিরদার ইড়াপিঙ্গলা আজকাল কী রকম আওয়াজ দিচ্ছে?

হৈম

খুব জোরে। মনে হয় পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাং মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ফকির

ঐ দেখ, শুনলে পুষ্পদিদি? আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যি কথা না জেনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুজি ব'লে দিয়েছেন, মাণ্ডুক্য উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অন্তরাত্মা চরম অবস্থায় নাভীগহ্বরে প্রবেশ ক'রে হয়ে পড়েন কূপমণ্ডুক, চারদিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তখনি পেটের মধ্যে কেবলি শিবোহং শিবোহং শিবোহং ক'রে নাড়িগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুমেতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি—যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম

একদিন মিন্তু কেঁদে উঠে ওঁর সেই ব্যাং-ডাকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে খুন করেন আর কি।

পুষ্প

ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিলুম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ডুক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হ'ত। হাঁচির চোটে নিরেট ব্রহ্মজ্ঞানের বারো আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিঙ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি গুরুর ফুঁয়ের জোরে অজ্ঞান সমুদ্র পার হ'তে পারলেম না।

ফকির

( ঈষৎ হেসে ) অধিকার ভেদ আছে।

পুষ্প

আছে বই কি। দেখ না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্ এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলেছেন, সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ— এর আত্মাটা চারপাওয়ালা। অধিকার ভেদকেই তো বলে দুপা চারপায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনে জেগে থাকিস্, আর কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায় ?

হৈম

কী জানি ভাই, মিস্ত দৈবাৎ ওঁর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উল্‌টিয়ে দিতেই উনি যে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন, সেটা—

পুষ্প

হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শাস্ত্রের সঙ্গে।

ফকির

সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

ফকিরদা, তপস্যা যখন ভেঙেছিল, শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাত্রীর কাছে—তোমার তপস্যা এবার গুটিয়ে নাও, এই দেখ বরদাত্রী অপেক্ষা ক'রে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি প'রে।

হৈমবতী

পুষ্পদিদি, বরদাত্রীর জন্যে ভাবনা নেই, পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ বেরঙের।

পুষ্প

বুঝেছি, গেরুয়া রঙের ছটা বুঝি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে ?

হৈমবতী

এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি একটি ক'রে বরদাত্রী। গেরুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর কি! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ওঁর কাছে মুক্তিমন্ত্র নেবে ব'লে, হবি তো হ, আমারি ঘরে এসে পড়েছিল—দুটো একটা খাঁটি কথা শুনিয়েছিলুম, মুক্তিমন্ত্রেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির

দেখ, আমার মাণ্ডুক্যটা দাও।

পুষ্প

কী করবে ?

ফকির

নারীর হাত লেগেছে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প

সেই ভালো, বুদ্ধি দিয়ে ধোওয়াটা তো হ'ল না এ জন্মে।

ফকির

শুনে যাও হৈম। আজকে গুরুগৃহে নবরত্ন দান ব্রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

হৈমবতী

দিতে পারব না, শ্বশুর মশায় পা ছুঁইয়ে বারণ করেছেন।

পুষ্প

তোমার গুরুজির বুঝি কাঞ্চনে অরুচি নেই!

ফকির

তাঁর মহিমা কী বুঝবে তোমরা! কাঞ্চন পড়তে থাকে তাঁর ঝুলির মধ্যে আর তিনি চোখ বুজে বলেন—হুং ফট্। বাস্, একেবারে ছাই হয়ে যায়—যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা।

পুষ্প

ঝুলিতে যদি ছাই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন?

ফকির

হায় রে, এইটেই বুঝলে না! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসক্তি ছাই করতেই গুরুজির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থূল সোনার কামনা ভস্ম ক'রে কানে দেবেন সূক্ষ্ম শোনা, গুরুমন্ত্র।

পুষ্প

আর সহ্য হচ্ছে না, চল্ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকী আছে।

ফকির

সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

(খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে) ব'সো ভাই, একটা কথা আছে, ব'লে যাই। ফকিরদা, শুনেছি তোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির

হাঁ, তিনি শুনেছেন তুমি বেদান্ত পাস করেছ। তিনি আমাকে ব'লে রেখেছেন নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে! সময় প্রায় হয়ে এল।

পুষ্প

বুঝতে পারছি। ক'দিন ধ'রে কেবলি বাঁ চোখ নাচছে।

ফকির

নাচছে, বটে! ঐ দেখ অব্যর্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে।

পুষ্প

কিন্তু আগে থাকতে ব'লে রাখছি, ছাই ক'রে দেবার মতো মালমসলা আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে য়ুনিভার্সিটির আঁস্তাকুড়ে ভর্তি ক'রে দিয়েছি।

হৈমবতী

কী বলছ ভাই পুষ্পদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল?

পুষ্প

কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। বুদ্ধিতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুরুগুরুনি। মনে হচ্ছে রবি ঠাকুরের একটা গান শুনেছিলুম—

গেরুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির

পুষ্পদি, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর কি!

পুষ্প

নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবুদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠে—তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির

উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই—কী বলব!

পুষ্প

একেবারে শেষের দিক থেকেই সুরু করে। রবি ঠাকুর বলেছেন—

যখনি জাগিলে বিশ্বে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

ফকির

বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর—আমি তো কখনো পড়ি নি!

পুষ্প

ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোর সেই মটরদানার চুনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈম

কী বল দিদি! ও যে আমার শাশুড়ীর দেওয়া!

পুষ্প

এ মানুষটিও তো তোর শাশুড়ীর দেওয়া, এও যেখানে তলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে না হয়।

ফকির

অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ কর, গুরুচরণে নিবেদন কর যা কিছু আছে তোমার।

পুষ্প

হৈমি, বিশ্বাস ক'রে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির

আহা, বিশ্বাস—বিশ্বাসই সব! আমার ছোট ছেলেটার নাম দেব—অমূল্যধন বিশ্বাস।

পুষ্প

হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

গুরুধাম

( শিষ্যশিষ্যাপরিবৃত গুরু। জটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থূল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরণার মতো। ধূপ ধুনা। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে, গুরো। গুরুর চক্ষু মুদ্রিত, বুকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ। হঠাৎ চোখ খুলে )

গুরু

এই যে তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি। সিদ্ধিরস্তু সিদ্ধিরস্তু। এখন মন দিয়ে শোন আমার কথা।

সেবক

মন তো প'ড়েই আছে গুরুর চরণে।

( শিষ্যাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না )

গুরু

আজ তোমাদের বড় কঠিন পরীক্ষা। মুক্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হ'ল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফেঁপে উঠেছে উদুরি রুগির পেটের মতো, তারা এই সরু দরজায় যায় আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে

হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু

এইখেনে এসে মুক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ ব'সে পড়ে, কেউ ফিরে যায়। তারপরে এক-দুই-তিন, ঘণ্টা পড়ল, বাস্—হয়ে গেল, ডুবল নৌকো, আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং ক্রিং ক্রম্।

সকলে

হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু

এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হালকা হয়েছে যদি দেখি, তা হ'লে আর মার নেই। এইবার তবে শুরু হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধর।

গুরুপদে মন কর অর্পণ
ঢাল ধন তাঁর ঝুলিতে—
লঘু হবে ভার রবে নাকো আর
ভবের দোলায় দুলিতে।
হিসাবের খাতা নাড়ো ব'সে ব'সে,
মহাজনে নেয় সুদ ক'ষে ক'ষে,
খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে
কেন থাক হায় ভুলিতে,
দিন চ'লে যায় ট্যাঁকে টাকা হায়,
কেবলি খুলিতে তুলিতে।

গুরু

কী নিতাই, চুপ ক'রে ব'সে ব'সে মাথা চুলকচ্ছ যে? মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি! আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধুলো নে।

নিতাই

তা গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খুবই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধস্তাধস্তি ক'রে স্ত্রীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্দজোড়া এনেছি।

গুরু

এনেছ, তবে আর ভাবনা কী?

নিতাই

প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে ঝাঁটাপেটা ক'রে দূর ক'রে দেবে।

গুরু

সেজন্যে এত ভয় কেন?

নিতাই

এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গুরু

নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব—ঝগড়া দুদিনে যাবে মিটে।

নিতাই

ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা বরঞ্চ যদি অনুমতি পাই তা হ'লে দ্বিতীয় সংসার ক'রে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গুরু

দোষ কী। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকন্তু ন দোষায়, সেই রকম দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন—পুরুষের পক্ষে স্ত্রী গৌরবে বহুবচন।

মাধব

তার মানে একাই এক সহস্র।

গুরু

উল্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড় বড় সজ্জন কুলীন বহুকষ্টে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেই জন্যেই এ দেশকে বলে, পুণ্যভূমি—পুণ্য বিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

মাধব

আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর কখনো শুনি নি।

গুরু

কি গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে—সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই?

মাধব

জপেছি। মোহরটা আরো যেন তারার মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল মনের মধ্যে। ( গুরুর পা জড়িয়ে ধ'রে ) প্রভু, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ কর, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু

এই রে। মোলো, মোলো দেখছি। সর্বনাশ হ'ল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা। ( ঝুলি এগিয়ে দিয়ে ) ফেল্ ফেল্ বলছি, এখ্‌খনি ফেল্।

( মাধব বহুকষ্টে কম্পিতহস্তে রুমাল থেকে মোহর খুলে নিয়ে ঝুলিতে ফেলল )

গুরু

এইবার সবাই মিলে বলো দেখি—

সোনা ছাই সোনা ছাই সোনা ছাই।
নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই।
নয়ন মুদিলে পরে কিছু নাই কিছু নাই কিছু নাই।

( সকলের চীৎকার স্বরে আবৃত্তি )

গুরু

এই যে মা তারিণী। এস এস, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দূরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক্।

( তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল )

গুরু

( হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ) গুরুভার বটে—বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল মনটাকে। যাকগে এতদিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন—ঠিক কিনা মা ?

তারিণী

খুব ঠিক বাবা। মনে হচ্ছে খানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গুরু

মাংস নয় মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আলগা হ'তে শুরু করল, তারপরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী

না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জন্যে শাশুড়ীর আমলের গয়নাগুলি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি।

গুরু

( থলির মধ্যে বালা জোড়া ফেলে দিয়ে )

আচ্ছা আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক। তোমরা বলো সবাই—সোনা ছাই ইত্যাদি।

( সকলের আবৃত্তি )

গুরু

আরে বলদেও, ক্যা খবর ?

বলদেও

( পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে )

খবর আঁখসে দেখ্ লীজিয়ে হুজরৎ।

গুরু

ভালা ভালা, দিল তো খুশ হ্যায় ?

বলদেও

পহেলা তো বহুৎ ঘবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাত্মানেসে হাজারো দফে বাতায়া লিয়া কি, কুছ্ নেই, কুছ্ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ্ কাগজ হ্যায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগসে জ্বল জাতা, পানীমেসে গল জাতা, ইস্‌কো কিম্মৎ কৌড়িসে ভি কমতি হ্যায়। লিকেন আত্মারাম সারা বখৎ ঘড়বড় করতে থে। মেরে ঐসি বুদ্ধি লগি যে ইয়ে কাগজ তো গুরুজিকে পাঁও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই হ্যায়—ইস্‌সে দো এক রূপৈয়া ভি অচ্ছি হৈ। পিছে ফজিরমে দো লোটা ভর ভাং যব পী লিয়া, তব সব দুরস্ত হো গয়া। মেরে দিল হালকা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাফিক্।

গুরু

জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালা করে। বলো সবাই—

নোটগুলো সব ঝুটো সব ঝুটো সব ঝুটো—
ওরা সব খড়কুটো খড়কুটো খড়কুটো—
ছাই হয়ে উড়ে যাবে মুঠো মুঠো মুঠো মুঠো মুঠো মুঠো।

( সকলের আবৃত্তি )

গুরু

আজ ফকিরকে দেখছি নে বড়ো।

বলদেও

এক ঔরৎ ফকিরচাঁদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হৈ। নয়া আদমি, হমারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি—ইসবাস্তে দোনোকো বাহার খাড়া রখ্‌খা হয়। হুকুম মিলনেসে লে আয়গা।

গুরু

কি সর্বনাশ! ঔরৎ! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখ্‌খনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

( ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ )

গুরু

এস এস মা এস। মুখ দেখেই বুঝছি দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

পুষ্প

ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড় বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল—গুরুর আশীর্বাদে চিহ্নমাত্রই নেই।

গুরু

এ সব কথার অর্থ কী?

পুষ্প

অর্থ এই যে, এঁর বাপ এঁকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এঁর স্ত্রীকে। এক পয়সার সম্বল এঁর নেই। শুনেছি আপনার এখানে সকল রকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপদ্মে।

ফকির

অ্যাঁ, এ সব কথা কী বলছ পুষ্পদি? ঐ তো সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল—গুরুচরণে রাখবে না?

পুষ্প

রাখব বৈ কি। ( গুরুর হাতে দিয়ে ) তৃপ্ত হলেন তো?

গুরু

( হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে ) আমার অতি যৎসামান্যেই তৃপ্তি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং।

ফকির

ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পুষ্প

ভুল ভাঙানো জরুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ওঁর বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনি আসছে মথ্‌লুগঞ্জের বড় দারোগা দবিরুদ্দিন সাহেব।

গুরু

( দাঁড়িয়ে উঠে ) কী সর্বনাশ !

পুষ্প

কোনো ভয় নেই, এখ্‌খনি সোনাগুলোকে ভস্ম ক'রে ফেলুন, পুলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গুরু

( কাতরস্বরে ) বলদেও !

বলদেও

( লাঠি বাগিয়ে ) কুছ পরোয়া নেই ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হেঁ, আপকো হুকুমসে হম লড়াই করেঙ্গে।

মথুর

গুরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি এই নোটখানা পরমাৎমার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছে !

গুরু

অ্যাঁ, বল কি মথুর? পালাব কোথায়? ওরা যে আমার বাসার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে ?

সকলে

কেউ না, কেউ না।

তারিণী

আমার বালা জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গুরু

এখ্‌খনি, এখ্‌খনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও বাবা।

বলদেও

অব্‌ভিতো নেই সকেঙ্গে। পুলিস চলা জানেসে পিছে লেউঙ্গা।

পুষ্প

আচ্ছা, আমারি হাতে ঝুলিটা দিন। পুলিসের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস সবাইকে ফিরিয়ে দেব।

মথুর

ওরে বাস্ রে, স্পাই রে স্পাই। কারো রক্ষা নেই আজ।

গুরু

স্পাই! সর্বনাশ! ( ঊর্ধ্বশ্বাসে ) চললুম আমি। মোটরটা আছে?

একজন

আছে।

ফকির

( পায়ে ধ'রে ) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার সঙ্গ।

গুরু

দূর, দূর, দূর। ছাড়্, ছাড়্ বলছি। লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা!

ফকির

তা আমার কী দশা হবে? আমার কোথায় গতি?

গুরু

তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

( দ্রুত প্রস্থান )

বিপিন

মাগো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই

আর আমার আছে বাজুবন্দ।

পুষ্প

এই নাও তোমরা।

সকলে

তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও

মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিস্‌কে বখৎমে থোড়ি দের হয়।

পুষ্প

এই নাও, ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে তো?

বলদেও

জরুর। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, দুস্‌রা লেনেওয়ালা কোই হ্যায় নেই সওয়ায় মনিব ঔর ডাকু। মালুম থা কি নোট ভস্‌ম হো জায়গা, উস্‌কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা পুণ্য ঔর পুলিসকী ডাণ্ডা করক্ রহেগা। অভি দেখ্‌তা হুঁ কি হিসাবকি থোড়ি গলতি থী। হর হর বোম্ বোম্।

( প্রস্থান )

পুষ্প

ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী? গুরুর পদধূলি তো আঠারো আনা মিলেছে। এখন ঘরে চল।

ফকির

যাব না।

পুষ্প

কোথায় যাবে?

ফকির

রাস্তায়।

পুষ্প

আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে!

ফকির

সে আমার সঙ্গে আছে।

পুষ্প

কিন্তু তোমার গুরু?

ফকির

রইলেন আমার অন্তরে।

পুষ্প

আর ডিমের খোলাটা?

ফকির

সে ঝুলছে গামছায় বাঁধা বুকের কাছে।

( প্রস্থান )

পুষ্প

( পিছন থেকে ) সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

( হৈমর প্রবেশ )

বিশ্বাস করতে পারিস নে বুঝি? এই নে তোর হার।

হৈম

আর অন্যটি?

পুষ্প

এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম

তারপর?

পুষ্প

লম্বা দড়ি আছে।

হৈম

আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

পুষ্প

তুই হাঁউমাউ করিস নে তো। চতুষ্পদ একটু চ'রে বেড়াক না!

হৈম

উনি ছান্দোগ্য নিয়ে যখন বেরলেন তখনি বুঝলুম, ফিরবেন না। মণ্ডূক মানে ব্যাঙ বুঝি ভাই?

পুষ্প

হাঁ।

হৈম

উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। সেই পরম ব্যাঙ—যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর ক'রে ডাকে, তখনি বোঝা যায়, সে পরমানন্দে আছে।

পুষ্প

তাই হোক না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ডেকে বেড়াক, তোর আত্মা-ব্যাঙ এখন কিছুদিনের মতো ঘুমিয়ে নিক।

হৈম

মনটা যে হু হু করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো।

পুষ্প

ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ডুক্যকে ফিরিয়ে।

## তৃতীয় দৃশ্য

ষষ্ঠীচরণ। পুষ্প।

ষষ্ঠী

মা, শরণ নিলুম তোমার।

পুষ্প

খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে, আর দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে—শিরদাঁড়া যায় বেঁকে।

ষষ্ঠী

কী না জান তুমি মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে মখ্‌লুগঞ্জ পর্যন্ত সব কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর, তাই তোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পুষ্প

না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি—ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্‌পিস করতে থাকে মানুষের হাত ছুটো। এ না হ'লে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালবাসেন।

ষষ্ঠী

না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখ না! বড় বৌয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম পিতৃপুরুষ পিণ্ডি না পেয়ে শুকিয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধ'রে বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে ছুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পুষ্প

এবারে পিতৃপুরুষের অজীর্ণরোগের আশঙ্কা দেখছি।

ষষ্ঠী

মা তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড় খটকা লাগে, মনে হয় তুমি দেবতাব্রাহ্মণ মানই না।

পুষ্প

কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠী

কেন মা, ঐ খুঁৎটুকু কেন থেকে যায়!

পুষ্প

সংসারে দেবতাব্রাহ্মণের অবিচারের বিরুদ্ধেই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী

জান তো মা, ও কী রকম হো হো ক'রে বেড়াত, কেবল খেলাধুলো, কেবল ঠাট্টাতামাসা। ভয় হ'ত কোথায় কি ক'রে বসে। তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পুষ্প

নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির খবর নেবার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

ষষ্ঠী

হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলুম নামেই মামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হ'ল কী বলো তো! কন্‌গ্রেস-ওয়ালারা এর কিছু ক'রে উঠতে পারলে না?

পুষ্প

মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতা-বেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুতু ময়রার দোকানে তেলে ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে—ছুদিন বাদেই সিক্ লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী

ও সর্বনাশ!

পুষ্প

ভয় নেই, মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ রবি ঠাকুরকে ধরব যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

ষষ্ঠী

কিন্তু রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে? আমার শ্যালার কাছে—

পুষ্প

আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখন্দাজ ঢের জুটে গেছে। দ্বাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষষ্ঠী

বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি আজকাল মেয়েরা যে রকম—

পুষ্প

অসহ্য, অসহ্য। জামা শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জা সরম সব গেছে।

ষষ্ঠী

সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলুম, দেখি, মেয়েরা ট্র্যামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পুষ্প

যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না।—ওকথা যাক্‌গে—মাখনের জন্যে ভেব না।

ষষ্ঠী

সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

( ষষ্ঠীর প্রস্থান। হৈমর প্রবেশ )

হৈম

শুনলুম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এলুম।

পুষ্প

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারো সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তায়, স্ত্রী এল বেরিয়ে মামার বাড়িতে।

হৈম

মন টেঁকে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

পুষ্প

একটু সবুর কর—ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে—একটা ধরতে যাই, দুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম

আমার তো দুটোতে দরকার নেই।

পুষ্প

যে রকম দিনকাল পড়েছে দুটো একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্‌টা কখন ফস্‌কে যায়।

হৈম

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

পুষ্প

হাঁ, সেটা আমারি কীর্তি।

হৈম

তাতে লিখেছ প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই. হনুমানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়?

পুষ্প

এই তো চারদিকেই, চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।

হৈম

তা যেন বুঝলুম, এর মধ্যে হনুমানের অভাব ঘটল কবে থেকে?

পুষ্প

দল পুরু আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পালিয়েছে ল্যাজ তুলে, ডাক দিচ্ছি তাকে।

হৈম

সাড়া মিলেছে?

পুষ্প

মিলেছে।

হৈম

তারপরে?

পুষ্প

রহস্য এখন ভেদ করব না।

হৈম

যা খুশি ক'রো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা—ওকে তাড়িয়ে দিতে ব'লে দিই।

পুষ্প

না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

( হৈমর প্রস্থান। সেই লোকের প্রবেশ )

পুষ্প

তুমি কে?

সেই লোক

সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর সুনাম হয় নি।

পুষ্প

মন্দ তো লাগছে না।

সেই লোক

অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ গুণেই বেঁচে গেছি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

পুষ্প

কিন্তু সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক

খবর পেয়েছ দেখছি। তা হ'লে আর লুকিয়ে কী হবে? নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। বুঝতেই পারছ যাত্রার দলের সরকারী গোঁফ দাড়ি প'রে এসেছি কেন? এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানই অভ্যেস হয়ে গেছে।

পুষ্প

এলে যে বড়?

মাখন

চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিষমাছ ধরার দলে। ইস্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন হনুমানের দরকার। রইল প'ড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই—আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড় যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয়!

পুষ্প

খাওয়াপরার কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি ?

মাখন

নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ডিমওয়ালা কই মাছের ঝোলের গন্ধস্মৃতি অন্তরাত্মার মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভিরকুটি মিরকুটির তালে তালে দূর থেকে মন কেমন ধড়ফড় করতে থাকে।

পুষ্প

তাই বুঝি ধরা দিতে এসেছ।

মাখন

না, না, মনটা এখনো ততদূর পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে—তখন প্রথমটা ভাবলুম, বিজ্ঞাপনের নাম রক্ষা করব, দেবো এক লম্ফ। কিন্তু রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দিদি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে কোনো সূত্রে বুঝি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

পুষ্প

তোমার আঁচিলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মুখে মুখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দুবার তৈরি হ'তে পারে না—ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন

এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি দিদি। মটরুগঞ্জে চুরি হ'ল, সন্দেহ ক'রে আমাকে ধরলে চৌকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান, সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে—নাক লুকোবে কোথায় ? বুঝেছ দিদি, আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যবসা চলে, চোরের ব্যবসা একেবারে চলে না।

পুষ্প

কিন্তু তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার জুড়ি অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন

অনেকদিনের পেটের জ্বালায় ওদের ভাঁড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যেস আছে।

পুষ্প

এত বড় কাঁদি নিয়ে করবে কি ? হনুমানের পালার তালিম দেবে ?

মাখন

সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক ব্রহ্মচারী ব'সে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম—ঠোঁটের এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মন্তর আউড়েই

চলল। ভয় হ'ল বুঝি ব্রহ্মদত্যি হবে। কিন্তু মুখ দেখে বুঝলুম উপোষ করতে হতভাগা তিথি বিচার করছে না। ওর পাঁজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাবাজি, খাবে কিছু? কপালে চোখ তুলে বললে, গুরুর কৃপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শব্দে ও গাছের পাখী একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

পুষ্প

লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাখন

নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পুষ্প

ভালো হ'ল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি ক'রে নিতে হবে। শেওড়াফুলির হাট উজাড় ক'রে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

মাখন

শুধু কলার কাঁদির কর্ম নয়।

পুষ্প

তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার দুইচাকাওয়ালা যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাখন

দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

পুষ্প

ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেবো না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এস।

মাখন

আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সন্ন্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু ও লোকটা ভুল করেছে—বৈরাগীর ব্যবসা ওর নয়—ওর চেহারায় জলুষ নেই। নিতান্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানুষ মিলবে না।

পুষ্প

তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কি ক'রে?

মাখন

ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসী লুচি তেলে ভাজা, যার খদ্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মুড়কি আর পচা কলা। সুবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শুনিয়ে দিয়েছি যখন পুরুষরা কাজে চ'লে গেছে।—

ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন—

ওরে রে লক্ষ্মণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা জননীদের দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা ঝরেছে—দুচার দিনের সঞ্চয় নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি দুটো বিয়ে না দিত তা হ'লে চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অল্পেতেই মন গলে যায়। এই দেখ না, এখন তোমাকে মা অঞ্জনা বলতে ইচ্ছে করছে।

পুষ্প

সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড্ড বেশি ভারি হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি তোমার মনটা কী বলছে?

মাখন

তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেকদিন পরে এ পাড়ার কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গন্ধে। সে দিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল—সত্যি বলি, বড় বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস শুঁকে শুঁকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হ'ল। বারবার মনে পড়ছে কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচচ্চড়ি। একদিন দিব্যি গেলেছিলুম, এ বাড়িতে কোনদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পুষ্প

কিসে ভাঙাল?

মাখন

তালের বড়ার গন্ধে। দিনটা ছটফট ক'রে কাটালুম। রাত্তিরে যখন সব নিসুতি, বাইরে থেকে ছিট্‌কিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে। খুট ক'রে শব্দ হতেই আমার ছোটটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হাঁ ক'রে দাঁত খিঁচিয়ে হাঁউমাউ-খাঁউ ক'রে উঠতেই পতন ও মূর্চ্ছা। বড় বৌ একবার উঁকি মেরেই দিল দৌড়। আমি র'য়ে ব'সে পেট ভ'রে আহার ক'রে ধামাসুদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বেরিয়ে।

পুষ্প

কিছু প্রসাদ রেখে এলে না পতিব্রতাদের জন্যে?

মাখন

অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি দলবলকে খাইয়ে দিতে।

পুষ্প

আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে?

মাখন

দেখ মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথ্যে কথা কই নে।

পুষ্প

লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরো একটা বিয়ে করেছ।

মাখন

তা করেছি।

পুষ্প

পিঠ সুড়সুড় করছিল ?

মাখন

না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হ'ল একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

পুষ্প

জেনে নিয়েছ সেটা ?

মাখন

বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, পুণ্য ফলে মারা গেল সকাল সকাল, স্বামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খুলেছে মাত্র। কিন্তু ভালো ক'রে মুখ ফোটবার তখনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

পুষ্প

কার কপালে ?

মাখন

শক্ত কথা।

## তৃতীয় দৃশ্য

( নিদ্রামগ্ন ফকির। মুখের কাছে একছড়া কলা। জেগে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়ে চেড়ে দেখল। )

ফকির

আহা, গুরুদেবের কৃপা। ( ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে ) শিবোহং শিবোহং শিবোহং। ( একটা একটা ক'রে গোটা দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ) আঃ !

( মাখনের প্রবেশ )

মাখন

কী দাদা, ভালো তো ! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির

গুরুর চরণ ভরসা।

মাখন

গুরুই খুঁজে মরছি। সদগুরু মেলে না তো। দয়া হবে কি ? নেবে কি অভাজনকে ?

ফকির

ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন

( কান্নার সুরে ) সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল! বড় পাপী আমি। আমার কী গতি হবে?

ফকির

গুরুপদে মন স্থির কর—শিবোহং।

মাখন

এই পদেই ঠেকল আমার তরী; যম তা হ'লে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির

তোমার নিষ্ঠা দেখে বড় সন্তুষ্ট হলুম।

মাখন

শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা সুদ্ধ উদ্ধার পাক।

ফকির

( ব্যগ্রভাবে আহার ) আহা সুস্বাদ বটে। ভক্তির দান কিনা!

মাখন

সার্থক হ'ল আমার নিবেদন। বাড়ির এঁয়ারা খবর পেলে কী খুশিই হবেন! যাই ওঁদের সংবাদ পাঠিয়ে দিইগে, ওঁরা আরো কিছু হাতে নিয়ে আসবেন। প্রভু, গৃহাশ্রমে আর কি ফিরবেন না?

ফকির

আর কেন? গুরু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন

গৃহী আমি, ডাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়সানী জড়িয়েছে আপাদমস্তক। ধনদৌলতের সোনার কেল্লাটা কত বড় ফাঁকি সেটা খুব ক'রেই বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন ক'রে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাত্রির সাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাৎলিয়ে দাও।

ফকির

আছে উপায়।

মাখন

( পা জড়িয়ে ) ব'লে দাও, ব'লে দাও, বঞ্চিত ক'রো না।

ফকির

দিন ভোর উপোষ ক'রে থেকে—

মাখন

উপোষ! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার দুষ্টগ্রহ দিনে চারবার ক'রে আহার জুটিয়ে দিয়ে অন্তরটা একেবারে নিরেট ক'রে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির

আচ্ছা দুখানা রুটি—

মাখন

আরো একটু দয়া করেন যদি, দুবাটি ক্ষীর!

ফকির

ভালো তাই হবে।

মাখন

আহা, কী করুণা প্রভুর! তেমন ক'রে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হ'লে পাঁঠাটাও—

ফকির

না না, ওটা থাক্।

মাখন

আচ্ছা তবে থাক্, একটা দিন বইতো নয়। তা কী করতে হবে বলুন। দেখুন আমি মুখ্‌খু মানুষ, অনুস্বার বিসর্গওয়ালা মন্তর মুখ দিয়ে বেরবে না—কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফকির

ভয় নেই, তোমার জন্যে সহজ ক'রেই দিচ্ছি, গুরুর মূর্তি স্মরণ ক'রে সারারাত জপ করবে, সোনা তোমাকেই দিলুম, তোমাকেই দিলুম, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই—কোথাও নেই।

মাখন

হবে হবে প্রভু, এই অধমেরও হবে। বলব, সোনা নেই সোনা নেই, এ হাতে নেই ও হাতে নেই, ট্যাঁকে নেই থলিতে নেই, ব্যাঙ্কে নেই বাক্সোয় নেই। ঠিক সুরে বাজবে মন্ত্র। আচ্ছা গুরুজি, ওর সঙ্গে একটা অনুস্বার জুড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতান্ত বাংলার মতো শোনাচ্ছে। অনুস্বার দিলে জোর পাওয়া যায়—সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই।

ফকির

মন্দ শোনাচ্ছে না।

মাখন

আচ্ছা, তবে অনুমতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

(প্রস্থান)

ফকিরের গান

শোন্‌রে শোন, অবোধ মন,—
শোন্‌ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি মুক্তা কর অন্বেষণ।—
ওরে ও ভোলা মন।

( ষষ্ঠীচরণ ছুটে এসে )

ষষ্ঠী

দেখি দেখি, এই তো দাদু আমার—আমার মাখন। ( মুখে হাত বুলিয়ে ) অমন চাঁদ মুখখানা দাড়ি গোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে! একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বুড়ো বয়সের ঠুলি, ভাল দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাণ্ড করেছিস মাখন?

ফকির

সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম।

ষষ্ঠী

করেছিস কী দাদু, মন্তর প'ড়ে প'ড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পাড়িয়ে দিয়েছিস। সুর মোটা হয়ে গেছে!

ফকির

শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

( বামনদাসবাবুর প্রবেশ )

বামনদাস

আরে আরে, আমাদের মাখন না কি? খাঁটি তো? ও ষষ্ঠীদা, মানতেই হবে যোগবল—নাকের উপর থেকে আঁচিলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্‌চায, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মন্তর দেগেছিল গো! একটু চিহ্ন রেখে যায় নি! ষষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুঁক করেছিলে, একটু টলাতে পার নি। তপিস্যের মাহাত্মি বটে।

ষষ্ঠী

না ভাই, মাহাত্মি ভাল লাগছে না। তোরা যাকে বলতিস গণ্ডারী নাক, সে ছিল ভালো।

নিশি ঠাকুর

ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই, অমন সব বোল চাল, মুনি হয়ে সব ভুলেছে বুঝি!

ভজহরি

দেখি দেখি মাখ্‌না, মুখটা দেখি ( চিম্‌টি কেটে চামড়া টেনে ) না হে, এ মুখোষ নয়, ধাঁদা লাগিয়ে দিলে!

নিতাই

কিনু, দেখ তো টেনে ওর দাড়ি গোঁফ সত্যি কি না!

ফকির

উঃ উঃ!

চণ্ডী

( পিঠে কিল মেরে ) কেমন লাগল?

ফকির

উঃ!

চণ্ডী

ঐ তো সন্ন্যাসীর সুখদুঃখবোধ আছে তো? মাথায় হুঁকোর জল ঢালি তবে—মাথা ঠাণ্ডা হোক।

ষষ্ঠী

আহা, কেন ওকে বিরক্ত করছ ভাই? সাত বছর পরে ফিরে এল, সবাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর দুঃখু দিস নে—একটা কথা ক'—না হয় দুটো গাল দিলিই বা!

ফকির

আপনারা আমাকে মাখন ব'লে ডাকছেন কেন? পূর্ব আশ্রমে আমার যে নাম থাক্, আমার গুরুদত্ত নাম চিদানন্দ স্বামী।

( সকলের উচ্চহাস্য )

চিনু

ওরে বাবা, ত্রাণকর্তা এলেন আমাদের। দ্যাখ্ মাখ্না, ন্যাকামি করিস নে। ভাবছিস এমনি ক'রে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি! সেটি হচ্ছে না; তোর দুই বৌয়ের হাতে দুই কান জিম্মে ক'রে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফকির

গুরো, হায় গুরো!

( দুই স্ত্রীর প্রবেশ )

১

ঐ যে গো, মুখ চোখ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ফকির

মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া কর আমাকে।

সকলে

এই, এই করলে কী! প্রাণের ভয়ে মা ব'লে ফেললে?

১

ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বলিস্ কাকে?

২

চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস, তোর মরণ হয় না!

ফকির

একটু ভালো ক'রে আমাকে দেখে নিন।

১

তোমাকে দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেকদিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছ পাথর আছে? তোমায় যম ভুলেছে ব'লে কি আমরাও ভুলব?

২

( নাক মুচড়িয়ে দিয়ে ) সাক্ষীকে বিদায় করেছ নাকের ডগা থেকে। তাই ব'লে আমাদের ভোলাতে পারবে না—তোমার বিট্‌লেমি ঢের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ লো ছুট্‌কি—সেই তালের বড়ার ধামাটা।

১

তাই রাত্তিরে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া খেতে!

২

চক্কোত্তিমশায়, এই দেখে নাও—মিন্‌সে রান্নাঘরে ঢুকে এনেছে বড়াসুদ্ধ আমাদের ধামা চুরি ক'রে।

( সকলের হাস্য )

কানু মণ্ডল

সে কি হয়, যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে।

ষষ্ঠী

ওগো বৌদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচ্ছ? ঘরের বড়া ঘরের মানুষই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে?

১

ভালোমানুসের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না—মাগো সে কী দাঁতখিঁচুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী

ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি—গোপনে আমাকে জানালে না কেন? তালের বড়ার অভাব কী?

ফকির

গুরো।

২

( কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধ'রে ) এই দেখ তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিলুম ব্রাহ্মণ ভোজন করাব ব'লে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আমাদের এই মহাপুরুষের কীর্তি। কলা চুরি ক'রে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ

( মহাক্রোধে ) দেখ, এ আমি কিছুতেই সইব না। এই ডাইনি দুটোকে ঘর থেকে বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে টেঁকাতে পারব না। দেখছ তো মাখন, কেবল ভালোমান্‌সি ক'রে দুই বৌকে কী রকম ক'রে বিগড়িয়ে দিয়েছ!

ফকির

সর্বনাশ। আপনারা সাংঘাতিক ভুল করেছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি—আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি!

ষষ্ঠী

না ভাই, বেকবুল যেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি—তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন?

ফকির

দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের—আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি।

ষষ্ঠী

পষ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি, কেন এত জিদ করছ?

ফকির

খেয়েছি, কিন্তু—

বামনদাস

আবার কিন্তু কিসের!

ফকির

আমি আনি নি।

( সকলের হাস্য )

পাঁচু

তুমি খাও তালের বড়া, দেয় এনে আর এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেনো না?

ফকির

আজ্ঞে না।

সিধু

সে চেনে না তোমাকে?

ফকির

আজ্ঞে না।

নকুল

এ যে আরব্য উপন্যাস।

( সকলের হাস্য )

ষষ্ঠী

যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চল।

ফকির

কার ঘরে যাব ?

১

মরি মরি, ঘর চেনো না পোড়ারমুখো ! বলি, আমাদের হুটিকে চেনো তো ?

ফকির

সত্যি কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে

ঐ লোকটার ভণ্ডামি তো সইবে না। জোর ক'রে নিয়ে যাও ওকে ধ'রে, তালা বন্ধ ক'রে রাখ।

ফকির

গুরো।

( সকলে মিলে ঠেলাঠেলি )

ওঠো, ওঠো বলছি।

সুধীর

বৌ হুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুঝি ; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েগুলিকে ? তোমার চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ না কি ?

ফকির

ও সর্বনাশ ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। ( গাছের গুঁড়ি আঁকড়িয়ে ধ'রে ) কিছুতেই না।

হরিশ উকীল

জান আমি কে ? পূর্ব আশ্রমে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকীল। জান তোমার দুই স্ত্রী !

ফকির

এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ

আর তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে ?

ফকির

আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ

এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হ'লে মকদ্দমা চলবে ব'লে রাখলুম।

ফকির

বাপরে! মকদ্দমা! পায়ে ধরি একটু রাস্তা ছাড়ুন।

দুই স্ত্রী

যাবে কোথায়, কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে?

ফকির

গুরো। ( হতবুদ্ধি হয়ে ব'সে পড়ল )

( হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম )

ফকির

( লাফিয়ে উঠে ) এ কী, এ যে হৈমবতী! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

১

ওলো, ওর সেই কাশীর বৌ, এখনো মরে নি বুঝি!

( মাখনকে নিয়ে পুষ্পর প্রবেশ )

মাখন

ধরা দিলেম—বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কলসি। মা অঞ্জনা, কিষ্কিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

পুষ্প

ফকিরদা, তোমার মুক্তি কোথায় সে তো এখন বুঝেছ?

ফকির

খুব বুঝেছি—এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পুষ্প

বাছা মাখন, তোমার মস্ত সুবিধে আছে—তোমার যুক্তি কেউ মারতে পারবে না। এ দুটিও নয়।

দুই স্ত্রী

ছি ছি, আর একটু হ'লে তো সর্বনাশ হয়েছিল। ( গড় হয়ে প্রণাম ক'রে ) বাঁচালে এসে।
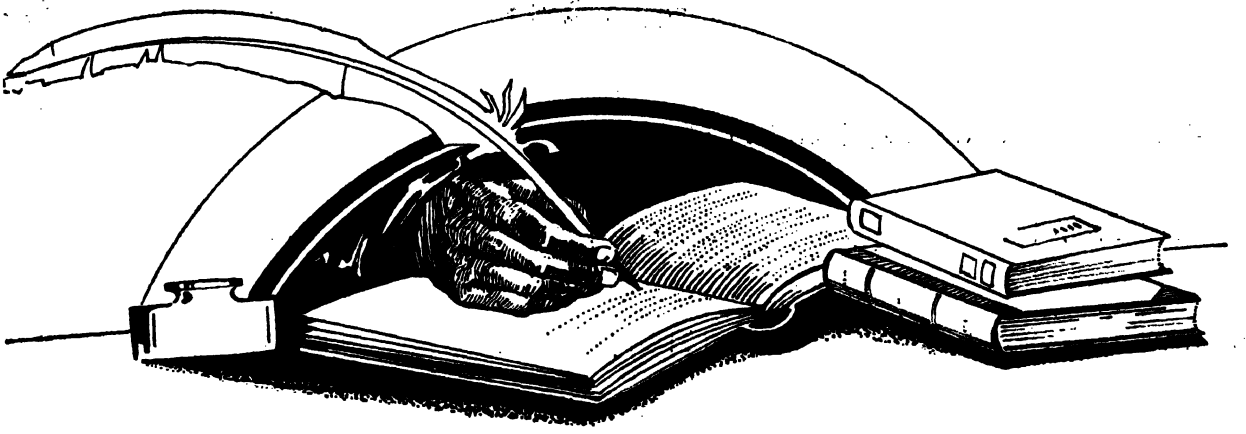
# সম্পাদকীয়

নূতন কোনও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের সময় অনির্দ্দিষ্ট পাঠক-সমাজের কাছে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার রীতি আছে। আমাদের কৈফিয়ৎ পত্রিকার নামের মধ্যেই লুক্কায়িত। ধনাধ্যক্ষ কুবেরের আদর্শে অলকাপুরী নির্ম্মাণের কামনা, প্রকাশ করিয়া বলিতে নাই। কিন্তু সাহিত্য-সেবা ও সাহিত্য-ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া তাহা যদি সম্ভব হয়, আমরা আনন্দিতই হইব। নেহাৎ ত্যাগের কারবার করিতে বসি নাই, এরূপ স্বীকারোক্তিতে লজ্জার কারণ থাকিলেও ইহাই আমাদের প্রথম কৈফিয়ৎ।

আমাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সহিত পূজা-সংখ্যা এক হইয়া যাওয়াতে ইহার বরাবরের চেহারাটা দাখিল করা গেল না; রবীন্দ্রনাথের নাটকটিই প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠা জায়গা জুড়িয়া, সাধারণ এবং মাসিক কতকগুলি বিভাগকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে যতদূর সম্ভব একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসৃত হইবে।

সাহিত্যিক কর্ত্তৃক পরিচালিত জাতিবর্ণ-'কোটেরি'-নির্ব্বিশেষে সকল সাহিত্যিকের প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন একটি সাময়িক পত্রিকার অভাব বাংলা দেশে আজকাল অনেকেই অনুভব করিতেছেন। 'অলকা' প্রকাশের দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ—'অলকা' এই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে। সম্পাদককে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট দলভুক্ত কল্পনা করিয়া, ব্যক্তিগত ক্ষোভপরবশ হইয়া যদি কেহ 'অলকা'কে বর্জ্জন করেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বাহ্লেই আমাদের এই নিবেদন যে, 'অলকা' সকল সাহিত্যিক দলাদলির ঊর্দ্ধে কি না তাহা স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া অকারণে তাহার প্রতি অবিচার করিবেন না। 'অলকা'র রচনা-বিচার নিঃসংশয়ে ব্যক্তি ও দল নিরপেক্ষ হইবে।

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সহিত আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্বীকার করিয়াও আমরা সকল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিব; ইহার প্রধান কারণ—রাষ্ট্রব্যাপারে আমাদের অনভিজ্ঞতা। আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে সমস্যার অভাব নাই; আমাদের আলোচনার গণ্ডি এই সকল সমস্যার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে।

আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা 'অলকা'র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

* * *

'অলকা'র ২য় সংখ্যা আগামী কার্ত্তিক মাসের ১৫ই তারিখে বাহির হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও

৩৩।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত

মেট্রোপলিটনের
পলিসি
সুখ ও শান্তির
উৎস
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ।
হেড অফিস:—২৮, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ ও সাব-অফিস:—ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, দিল্লী, ঢাকা, হাওড়া, লাহোর, মাদ্রাজ, পাটনা ও রেঙ্গুন।
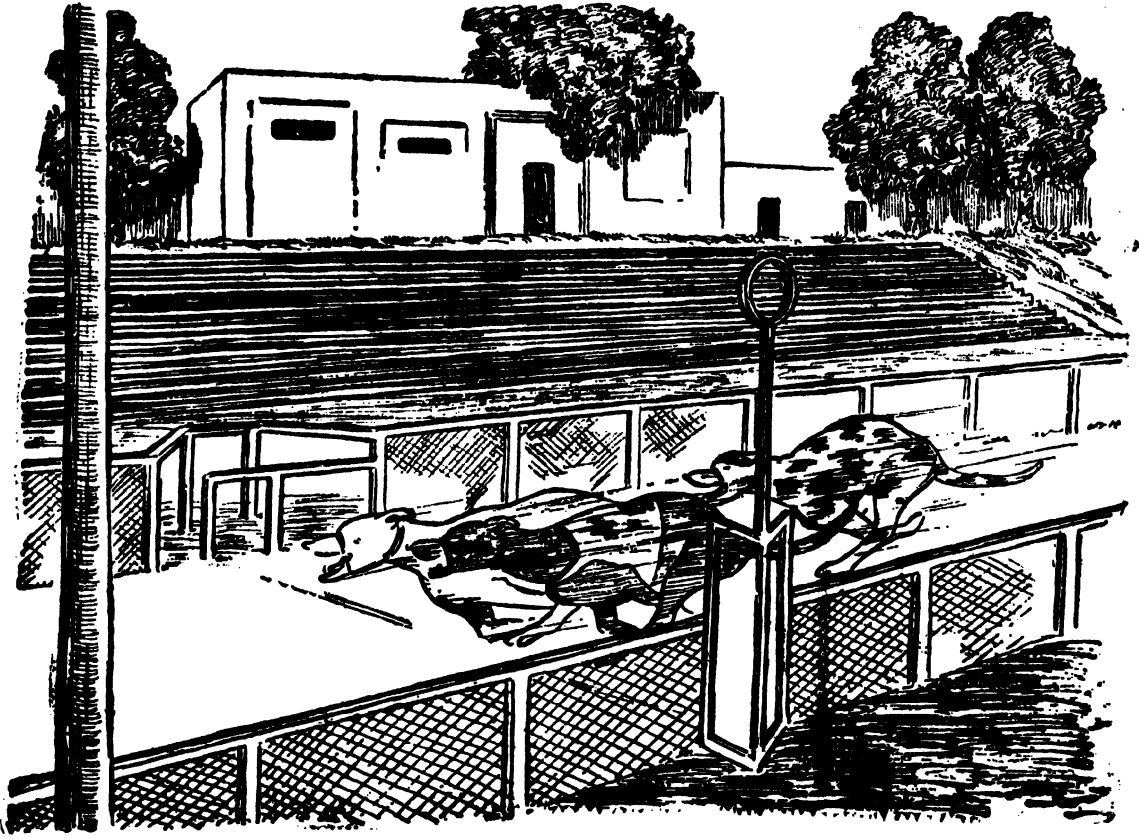
# গ্রেহাউণ্ড রেসিং এক্জিবিসন্

আজকালকার সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য আমোদ।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিবেন—তাঁরা আরও বেশী আনন্দ পাইবেন।

**রেস্ আরম্ভ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সোমবার হইতে শুক্রবার প্রত্যহ সন্ধ্যা | | | | ৬-৩০টায় |
| রবিবার | ... | ... | ... | ৫-৩০টায় |
| শনিবার | ... | ... | ... | রাত্র ৯টা |

**প্রবেশ মূল্য**

| | |
|---|---|
| এন্‌ক্লোজার "এ" | ১৷৵০ |
| " "বি" | ॥৵০ |
| স্পেশাল এন্‌ক্লোজার (বক্স) | ৪৲ |
| ঐ মহিলাদের জন্য | ২৲ |

## স্থান—বেহালা (ডায়মণ্ডহারবার রোড)

ট্রাম ও বাস পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধতায় ও গন্ধ-মাধুর্য্যে
অপরাজেয়।

ভারতের প্রিয়তম দন্তমঞ্জন

ক্যাল কেমিকোর
প্রসাধন সম্ভার।
রূপ-চর্চ্চায় - মার্গোসোপ,
রেণুকা টয়লেট পাউডার
কেশ-বিন্যাসে—
ক্যাষ্টরল, ভৃঙ্গল, কোকোনল,
সিলট্রেস্, ও লাইজু
অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত
মনোরম আধারে
পাওয়া যায়।
—ক্যালকাটা কেমিক্যাল—

বাসন্তী কটন মিলস লিমিটেড
সকলেই বলেন—
বাঙ্গালীর
সবচেয়ে সেরা—
নিজস্ব
বাসন্তী-কাপড়
পূজায়
সব জায়গায় পাবেন
মিল
পানিহাটি
৩নং লায়ন্স রেঞ্জ
কলিকাতা
ফোন—কলি ৩২১৬

## সূচী

কার্ত্তিক ১৩৪৫

## 'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষান্মাষিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষান্মাষিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

### বিজ্ঞাপনের হার

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ | ১ | পৃষ্ঠা | প্রতি মাসে | ২০৲ |
| " | ½ | " | " | ১১৲ |
| " | ¼ | " | " | ৬৲ |
| কভার | ৪র্থ | " | " | ৬০৲ |
| " | ২য় | " | " | ৫০৲ |
| " | ৩য় | " | " | ৪৫৲ |

( বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র )

**ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।**

৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

স্নানের ঘাট

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৫ | দ্বিতীয় সংখ্যা

# আধুনিক ইউরোপে সংস্কৃতি ও শিল্প

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তিন বছর পরে আবার এক সুযোগ ঘটায়, সম্প্রতি ইউরোপ ঘুরে এলুম। জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, এই তিন মাসের মধ্যে ইউরোপের চোদ্দটা দেশের ষোলটা রাজধানী আর অন্য শহর দেখে এসেছি। নেপল্‌স্, জেনোয়া, জেনেভা, পারিস, গেণ্ট্, ব্রুগেস্, লণ্ডন, কোপন্‌হাগন্, ওস্‌লো, স্টক্‌হোল্‌ম্, হেলসিংকি, তাল্লিন, ওয়ার্শ, বের্লিন, ব্র্যাসেল্‌স্, তারপরে আবার পারিস, শেষে রোম; বিদ্যুৎবেগে, সিনেমা দেখার মত যেন আমাদের ভ্রমণ হ'য়েছিল। তবে আমার নিজের উদ্দেশ্য স্থির ছিল, কোথায় কি দেখ্‌বো; বিভিন্ন দেশ আর শহরগুলির মধ্যে কতকগুলি পূর্বপরিচিত, বাকীগুলো দৃষ্টপূর্ব না হ'লেও, বই-টই প'ড়ে সেগুলির সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিব-হাল হ'য়েই গিয়েছিলুম। নানা দিক্ থেকে কোনও দেশের সংস্কৃতি বা সভ্যতা আলোচনা করা যায়। উপস্থিত ইউরোপের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সংকটই সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়—এরই চাপে অন্য সব-কিছু যেন চাপা প'ড়ে গিয়েছে। সব দেশেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ, কোথাও তা যুদ্ধের আকারে প্রকট, কোথাও বা রাজনৈতিক দলাদলিতে অথবা মতানৈক্যে আত্মগোপন ক'রে আছে। আমাদের দেশে—খালি আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই—সকলে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কোলাহল দ্বারাই বেশী অভিভূত হয়, অপ্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক জগৎ বা ভাবজগৎ সকলের চোখে পড়ে না—যতক্ষণ না এই সাংস্কৃতিক জগৎ বা ভাবজগৎ রাজনৈতিক ঘটনা বা নীতিতে আত্মপ্রকাশ করে।

আধুনিক জগতের রাজনীতি এত জটিল, আর এত দ্রুত চ'লছে, যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা, প্রতি পাদক্ষেপে তার গতি অনুসরণ করা, সব দিক্ দিয়ে তাকে বোঝা, যারা বিশেষ ক'রে রাজনীতির আলোচনাকারী বা ঐ বিষয়ে পণ্ডিত বা তত্ত্বজ্ঞ নয়, তাদের পক্ষে বেশ একটু কঠিন ব্যাপার। রাজনীতি আমার এলাকার বাইরে, আমি তা নিয়ে বিশেষ ভাবে মাথা ঘামাবার চেষ্টাও করি না।

তবে এটুকু জানি, সব রাজনীতির মূলে যেমন আছে economics বা অর্থ, অন্য দিকে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বার্থ। আধুনিক জগতে চতুর্বর্গের প্রধান আধার আর নিয়ন্ত্রক হ'চ্ছে অর্থ। ধর্মের যেটুকু নিয়ন্ত্রণ-শক্তি ছিল, তাতে ধর্মে আর অর্থে একটা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত বোঝাপড়া হ'য়ে ব্যক্তি-জীবন আর সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-জীবন বা রাজনীতির গতি নিয়ন্ত্রিত হ'ত। এখন সব দেশেই ধর্মকে অল্প-বিস্তর স'রে দাঁড়াতে হচ্ছে—বিশেষতঃ রাষ্ট্র-জীবনে ; রাষ্ট্র-জীবনের প্রভাব এখন এসে সমাজ-জীবন আর ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবান্বিত, পরিবর্তিত, আর কোথাও বা বিপর্যস্ত ক'রে দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ, আর ঐসব স্বার্থকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রকার ideology বা মতবাদ, সর্বত্রই নিষ্ঠুর সংগ্রামে নিযুক্ত। Everything is fair in love and war—এখন এই নীতি, জাতিতে জাতিতে যখন স্বার্থ নিয়ে সংঘাত হয় তখন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় ; propaganda অর্থাৎ তথ্য-বিজ্ঞাপন বা বিঘোষণের নামে এত মিথ্যা আর অর্ধসত্য, ধর্মবুদ্ধিকে এতটা জলাঞ্জলি দিয়ে বোধ হয় আর কখনও জগতে প্রচারিত হয় নি ; আর যে জা'ত যত বড়, তার প্রতিপক্ষ যত দুর্বল, সেই জা'ত তত মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে—এও এক অদ্ভুত ব্যাপার।

কোনও দেশে গিয়ে, একেবারে চোখ কান বুজে না থাক্‌লে, সেখানকার রাজনৈতিক, নৈতিক আর সাংস্কৃতিক হাওয়া কেমন বইছে তার একটা ধারণা করা কঠিন হয় না। দেশের লোকে কতটা সব জিনিস তলিয়ে' দেখ্‌ছে—দেখ্‌তে পাচ্ছে বা দেখ্‌তে পাবার চেষ্টা করছে, তাদের শাসক-সম্প্রদায়ের মতিগতিই বা কি, আর কি ভাবে তারা দেশের লোককে চালাচ্ছে—তা চট্ ক'রে নজরে প'ড়ে যায়। আর একটু লক্ষ্য ক'রলে, দেশের বাইরেকার জীবনের অন্তরালে ভাল বা মন্দ যা আছে, ভাব-জগতে, চিন্তা-জগতে, কর্ম-জগতে, তাও দেখ্‌তে পারা যায়। নিজের রুচি আর শিক্ষা এ বিষয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে' দেয়—ভাব বা চিন্তা, অথবা উভয়ের প্রকাশক কোন্ প্রকার কর্ম নিয়ে আমরা অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌বো।

আমার নিজের আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে ভাষা-বিজ্ঞান আর আনুষঙ্গিক ভাবে নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম আর দর্শন, আর শিল্প আর শিল্পেতিহাস হ'চ্ছে আমার ব্যসন। এগুলির সাহায্যে সংস্কৃতি-বিষয়ক অবস্থা কেমন, তা অনুমান করা যায়। আমি সাধারণ ভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির জীবন-যাত্রা অল্পস্বল্প লক্ষ্য করেছি, ইউরোপের সংস্কৃতির নানাবিধ প্রকাশের মধ্যে শিল্প অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্র—একটু কৌতূহলী হ'য়ে অবলোকন করেছি—বিভিন্ন শহরের নানা ইমারৎ, বিভিন্ন সংগ্রহশালা আর প্রদর্শনী দেখেছি। ভদ্র ইতর, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত, পাঁচজনের সঙ্গে যথাসাধ্য কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা ক'রেও অনেক বিষয়ে ইউরোপের সংস্কৃতি ও সমাজের নানা দিকে অপ্রত্যাশিত আলোকপাত হ'তে দেখেছি।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, সংস্কৃতি, শিক্ষা, মানসিক প্রগতি প্রভৃতি এক রকমের নয়, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সভ্যতাকে মোটের উপরে এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা হয়েছে বিগত চারশ' পাঁচশ' হাজার বারোশ' বছর ধ'রে, আর সে ছাঁচটা হ'চ্ছে গ্রীকো-রোমান ছাঁচ। তার ফলে, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার basis বা আধার, অথবা বিভিন্ন জাতির

মৌলিক প্রকৃতি, যাই থাক্ না কেন—তা টিউটন বা জরমানিক, অথবা শ্লাব ( শুদ্ধ শ্লাব বা বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত শ্লাব ), অথবা বাল্তিক, অথবা মজর—ইউরোপের লোকেরা একটা সাধারণ আদর্শ পেয়েছে, আর এই আদর্শ ইটালীয় ফরাসী ইংরেজ জরমানদের মধ্যে কাজ ক'রে সবচেয়ে বলশালী প্রভাব বিস্তার ক'রে এসেছে। সব ইউরোপীয় জাতি এখন একই ভাবের ভাবুক, আর সকলেই প্রায় একই ধরণের কর্মী হ'তে চায়। মনোভাব আর কর্মপদ্ধতি এক হওয়ায়, এদের সমস্যাগুলিও এখন প্রায় সব দেশেই একই ধরণের দাঁড়িয়ে' গিয়েছে।

ধীরে ধীরে যে কর্মাদর্শ যে নীতি ইউরোপে পোর্তুগীস স্পেনীয় ইংরেজ ফরাসীর দৃষ্টান্তে সাধারণের কাম্য হ'য়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে exploitation অর্থাৎ শোষণ-মূলক সাম্রাজ্য-গঠন। এই আদর্শের মূল কথা হ'চ্ছে, অপরের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ ক'রে নিজের পেট বা পকেট ভরাবো। এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে একটা মনোভাব দৃঢ় হ'য়ে যায়—নিজের জা'তকে বড় ক'রে দেখা, অন্য জা'তকে খাটো ক'রে দেখা। এই মনোভাব ইংরেজের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে, ফ্রান্সও এই মনোভাব আয়ত্ত কর্বার কসরৎ ক'রছে, জরমানিতে এই মনোভাব একটা উন্মাদ-লক্ষণের মত দেখা দিয়েছে, ইটালি জরমানির ছোঁয়াচে নোতুন ক'রে এই মনোভাবের সাধনা শুরু ক'রে দিয়েছে। "আমরা বড়, আমরা বড়, আমরা বড়, আমরা সকলের সেরা,"—এই দম্ভ-মন্ত্র চেঁচিয়ে' চেঁচিয়ে' বা চুপি চুপি সবাই জপ ক'রছে ; এটা সেকেলে হিন্দুর জাত্যভিমানের মত সরল জিনিস নয়, এই দাম্ভিকতা আধুনিক জটিল সভ্যতার এক জটিলতম কুফল। যেখানেই exploitation-এর চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শ বিদ্যমান, সেখানেই এই মনোভাব প্রকট বা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান। এমনকি সেদিন স্বাধীনতা পেলে যে পোলাণ্ড, পশ্চিম ইউরোপের—বিশেষতঃ ফ্রান্সের—নকল করা সত্ত্বেও যার মানসিক আর সামাজিক সংস্কৃতি অনেক বিষয়ে এখনও মধ্য-যুগ ছাড়িয়ে' আস্তে পারে নি, যার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়, গ্রামীণ, কৃষি-মূলক, সেই পোলাণ্ডও আকাঙ্ক্ষা প্রকট ক'রছে, ফ্রান্স জরমানি ইংলাণ্ডের মতন তার colonial আর industrial expansion চাই—কালা আদমীর দেশে তার সাম্রাজ্য চাই, কারখানায় মাল তৈরী ক'রে কালা আদমীর দেশে বিক্রী ক'রে তার ফেঁপে ওঠা চাই। এক স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে—ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন আর ফিন্লাণ্ডে—এই ভাবটা নেই ব'লে মনে হয়, কারণ ঐ দেশের লোকেরা নিজের ঘরেই এমন ভাবে হিসেব ক'রে চ'ল্ছে যে বাইরে থেকে সংগ্রহ না ক'রে নিয়ে এলে তাদের অচল হবে না, আর অন্য জা'তের কাছ থেকে যেন-তেন-প্রকারেণ আদায় ক'রে নিয়ে আসবার জন্য এখন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ তাদের মধ্যে তেমন জোর পায় নি। রুষদেশে বিপ্লব হ'ল, সেখানে এই exploitation-মূলক অর্থনীতি আর রাষ্ট্রনীতির অবসান ঘ'ট্ল, অন্য পাঁচটা জাতির তুলনায় একটা জাতিকে বিশেষ অধিকার দেবার প্রবৃত্তিও কিছুকাল ধ'রে সেখানে লোপ পেলে ; কিন্তু সম্প্রতি রুষদেশে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘ'টেছে, আর এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে আশঙ্কা করা অমূলক হবে না যে সোভিয়েট-সংযুক্ত-রাষ্ট্রে আবার সেই জাতির বড়াই রুষজাতির মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে, যা থেকে সোভিয়েট-রাষ্ট্রে মৌলিক exploitation-বিরোধী রীতির হানি ঘটা অসম্ভব হবে না।

ইউরোপে এখন পুরোপুরি মাৎস্যন্যায় বিদ্যমান—বড় ছোটকে গ্রাস ক'রতে চায়, এবং এই গ্রাসের চেষ্টাতে বাধা দেবার কেউ নেই। এখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে, কোথাও ভয়ের প্রাবল্য, কি ক'রে প্রবল প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিজের সত্তাকে রক্ষা ক'র্‌বে, স্বাধীন থাক্‌বে ; অথবা কি ক'রে ক্রম-বর্ধমান শক্তিশালী অন্য জাতির লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজের সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে ; আর কোথাও বা লোভ আর রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ; আবার কোথাও বা রাষ্ট্রের মধ্যে মতানৈক্যজনিত আত্মকলহে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবার আশঙ্কা। জাতিতে জাতিতে বিশ্বাস নেই, একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশ্বাস নেই। এমন অবস্থা যে, যদি বহিঃশত্রুর সঙ্গে কোনও দেশের লড়াই বাধে, সেই দেশের মধ্যেই অন্তর্বিপ্লব হবার আশঙ্কা প্রায় সর্বত্র। যেগুলি Totalitarian State, যেমন জরমানি, ইটালি, সোভিয়েট্‌-সংযুক্ত-রাষ্ট্র বা রুষ সাম্রাজ্য, যেগুলিতে শাসক-সম্প্রদায় যা অনুমোদন করেন তার বাইরে অন্য কোনও অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক বা সমাজনৈতিক মত পোষণের অধিকার কারও নেই, সেগুলিতে স্বাধীন চিন্তা লোপ পেতে বসেছে ; কেবল যে রাষ্ট্রনীতি আর অর্থনীতি সম্পর্কে তা নয়, যে কোনও বিদ্যার সঙ্গে মানুষের জীবনের বা নীতির যোগ আছে সেই বিদ্যায় স্বাধীন মত, বিশেষতঃ তা যদি প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির বিরোধী হয়, পোষণ করা বা প্রকাশ করা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'চ্ছে। জরমানির নাৎসি শাসক-সম্প্রদায় এই মত পোষণ করেন যে, জরমান জাতি জগতের সবচেয়ে সেরা, আর জরমান জাতি হ'চ্ছে শুদ্ধ অবিমিশ্র 'আর্য' জাতি ; অমনি পণ্ডিতদের এই মতে সায় দিতে হবে, নইলে তাদের অন্ন যাবে—যদিও জরমানির পণ্ডিতেরাই নৃতত্ত্ব-বিদ্যার সহায়তায় দেখিয়েছেন, কত বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে জরমান জাতির সংগঠন ঘ'টেছে। ইহুদীদের উপরে এক শ্রেণীর জরমানের বিরাগ আছে, আর সে বিরাগের কারণও আছে যথেষ্ট ; কিন্তু নাৎসি শাসক-সম্প্রদায় এই বিরাগকে অবলম্বন ক'রে যে প্রবল ইহুদী-বিদ্বেষ আর ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে, তার সমর্থন ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছে পণ্ডিতেরা। জরমানির অনুকরণ শুন্‌ছি রুষদেশেও আরম্ভ হ'য়েছে, ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ; রুষদেশের এক পণ্ডিত সম্প্রতি পৃথিবীর প্রাচীন আর আধুনিক ভাষাগুলিকে দুটী শ্রেণীতে ভাগ করছেন, রুষদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার অনুকূল ক'রে ; সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন স্লাব, প্রাচীন চীনা প্রভৃতি ভাষা হ'চ্ছে bourgeois অর্থাৎ শ্রমিক-বিরোধী মধ্যবিত্ত-জনের ভাষা, আর রুষ, জরমান, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি হ'ল proletarian বা শ্রমিক জাতির ভাষা। রুষেরা এখন আবার সংস্কৃতি-প্রসারে রুষ জাতির বিশেষ কৃতিত্ব নিয়ে জাতীয় গৌরব-গাথা গাইতে আরম্ভ ক'রেছে—এটা নিশ্চয়ই বিশ্বজাতি-সমন্বয়ের পক্ষে সহায়তা করবে না। ইটালিতেও এবার দেখে এলুম, বিশুদ্ধ ইটালীয় জাতির—তথাকথিত আর্য জাতির—শ্রেষ্ঠত্ব, আর ইহুদীদের অপকৃষ্টত্ব নিয়ে কতকগুলি ভ্রান্ত অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচার করা হ'চ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী-দলন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। ইটালিয়ানরা আর জরমানেরা, দুটী জাতি—উৎপত্তি, মানসিক-প্রগতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সব বিষয়ে অনেকটা পৃথক্ ; দু দলেই আর্যত্বের দাবী ক'রলে, জিনিসটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক্ নেই।

প্রায় সমগ্র ইউরোপে এখন ভয়, অনিশ্চিততা, দলবদ্ধ গুণ্ডামি, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার,

মিথ্যা-প্রচার, বেশ দাপটের সঙ্গে চল্‌ছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন সরকারের তরফ থেকে মিথ্যা-প্রচারের ফলে, কতকগুলি জাতির জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে যাচ্ছে; ইংরেজের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ চেষ্টায় যেমন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা ধারণা, ইংলাণ্ড আর অন্য ইউরোপীয় দেশে আর আমেরিকায় প্রচারিত হ'চ্ছে। অবশ্য মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোনও প্রকারের সরকারী প্রচারে বিশ্বাস করেন না। তবে অনেক সময়ে, নানা প্রতিপক্ষ প্রচারের বাহুল্যে, বুদ্ধিমান্ লোকেরও মতিভ্রম হয়। খবরের-কাগজ পড়ে সকলেই, কিন্তু সে খবর যেমন ভাবে রাষ্ট্রের কর্তারা প্রকাশিত হ'তে দেবেন সেই খবরটুকু তেমনি ভাবে প্রকাশিত হ'তে পারবে।

ইউরোপের সাংস্কৃতিক জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের অবস্থা এখন ভয়াবহ। সাহিত্য, দর্শন, মানব-জীবন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বা বিদ্যায় স্বাধীন গবেষণা, যদি তা দেশের একচ্ছত্র রাষ্ট্রনীতির অনুকূল না হয়, তার অবাধ গতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এক বিষয়ে উন্নতির কোনও বাধা নেই—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি উপযোগ-মূলক বিজ্ঞানে, যার সাহায্যে প্রাকৃতিক জগৎকে মানুষের কাজে আরও বেশী ক'রে আন্‌তে পারে; আর এই সব বিষয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যকে কাজে লাগাবার জন্য, যাতে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার নব নব কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে জাতির ( সমগ্র মানবজাতির চেয়ে বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রের ) শক্তি বাড়্‌তে পারে, সব দেশেরই রাষ্ট্র উৎসাহ দিচ্ছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা বা চেষ্টা, স্বাধীন মতবাদ, ক্ষুণ্ণ, সংকুচিত। আমার মনে হয়, উপস্থিত অবস্থা কিছুকাল ধ'রে চল্‌লে, ইউরোপের মানসিক সংস্কৃতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে; এখনই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এক বিষয়ে ইউরোপের সংস্কৃতিতে এই অনীপ্সিত অবস্থা নেই—সেটা হ'চ্ছে শিল্প। শিল্পের কাজ হয় বেশীর ভাগ দ্যোতনা দিয়ে; সেইজন্য, সাধারণ অজ্ঞ লোকে যতটা ধ'রতে পারে, শিল্প তার চেয়ে আরও অনেক বেশী প্রকাশ ক'রতে পারে। আমার মনে হয়, কেবল শিল্প-জগতে ইউরোপের সংস্কৃতি রাষ্ট্রনীতির তাড়া বা তাগিদে আত্মসংকোচন এমন কি আত্মহত্যা ক'রতে বসে নি। জরমানি আর ইটালির নাৎসি আর ফাশিস্ত্ রাজ ঐ দুই দেশের শিল্পকে পূরোপূরি নিজের কাজে লাগাতে পারে নি—শিল্পে অনেকটা স্বাধীনতা, অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দ গতি এখনও বিদ্যমান। নোতুন ধরণের যে স্থাপত্য-রীতি সমগ্র ইউরোপে দেখা দিচ্ছে, সেটা অনেকটা আন্তর্জাতিক, সার্বজনীন ব্যাপার; তাতে ইউরোপের সংস্কৃতির এক সুন্দর, অভিনব, অব্যাহত আত্মপ্রকাশ ঘ'টেছে। লীগ্-অভ্-নেশনস্ বা বিশ্ব-রাষ্ট্র-মণ্ডলীর কাজ আর কিছু হোক্ আর না হোক্, জেনেভায় তার বিরাট্ বাড়ীটী আধুনিক জগতের বাস্তু-রীতির এক মহনীয় এবং অতি মনোহর বস্তু। ওস্‌লোর নোতুন টাউন-হল, স্টক্‌হোল্‌মের সুবিখ্যাত টাউন-হল, হেলসিংকির নবনির্মিত পার্লামেন্ট-গৃহ, ওয়ার্শর নোতুন মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা, বের্লিনের কতকগুলি আধুনিক গৃহ এবং বিরাট Reichssportsfeld বা ওলিম্পিক ক্রীড়া উপলক্ষে প্রস্তুত জাতীয় ব্যায়ামশালা, পারিসের আধুনিক শিল্পের সংগ্রহশালা এবং নূতন Trocadero ত্রোকাদেরো, রোমের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আর ব্যায়ামশালা Foro Mussolini—এসব বাড়ী দেখ্‌লে, ইউরোপের বাস্তুবিষয়ক উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ ক'রতে হয়। এখানেও ইউরোপের

প্রকাশ বাধা-হীন—কারণ এগুলির দ্বারা জড়-বিজ্ঞানের তথ্যকে কাজে লাগাতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু স্থাপত্য-শিল্পে বিশ্বাতিগ প্রতিভারও লীলার অবকাশ আছে, সেইজন্য এগুলিতে ইউরোপের প্রাণের যথার্থ সংস্কৃতির প্রকাশের সুযোগ আছে।

আধুনিক ইউরোপের স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে, তার রূপ-শিল্প—চিত্র আর ভাস্কর্য, বিশেষ ক'রে ভাস্কর্য—আমায় বিশেষ মুগ্ধ ক'রেছে। জরমানি, স্কান্দিনাভিয়া ( ডেন্‌মার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে ), ফ্রান্সে, ইটালিতে, ঐ সব দেশের নোতুন ভাস্কর্য-রীতিতে যে অভিনবত্বের, যে শক্তি আর সৌন্দর্যের, যে ভাবপ্রবণতার সঙ্গে প্রকৃতির অনুকারিতা দেখেছি, তা থেকে ব'লতে পারা যায় যে, এই চিন্তা- ও ভাব-ঘটিত দুর্যোগের দিনেও ইউরোপ মরে নি,—তার শিল্প, তার প্রাণবত্তার আর তার জীবনীশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিচ্ছে। আমার মনে হয়, এই ভাস্কর্য-শিল্প এর কতকটা অনুপ্রাণনা আধুনিক যুগ থেকে, বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের শিক্ষা ও শক্তি থেকে পেয়েছে ; কিন্তু আধুনিক শিল্পক্রমের প্রাণরস যতটা প্রাচীন গ্রীস থেকে এসেছে, ততটা আর কিছু থেকে নয়। বিগত শতকের শেষপাদ থেকে, রোমান জগতের আবরণ উন্মোচন ক'রে প্রাচীন গ্রীসকে তার স্বরূপে দেখ্‌তে শিখ্‌লে আধুনিক ইউরোপ ; রোমান চোখে, রোমান চশমা প'রে সে এতাবৎ গ্রীসকে দেখে আস্‌ছিল। প্রাচীন গ্রীসের শাশ্বত সৌন্দর্য আর সৌমনস্য, নোতুন ক'রে ধরা দিলে, ইউরোপের পণ্ডিত আর শিল্পীদের কাছে। গ্রীসের শেষ বা পতনোন্মুখ যুগের, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব শতকসমূহের শিল্প নিয়ে, ইউরোপ মেতে ছিল ; নোতুন চোখে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শিল্প আর সাহিত্যকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, ষষ্ঠ শতক আর তার আগেকার যুগের শিল্পের মহনীয়তা আধুনিক ইউরোপ প্রথম আবিষ্কার ক'র্‌লে ; প্রাচীন গ্রীক দেবতারা—জ়েউস্‌, আপোল্লোন্‌, আর্তেমিস্‌, আফ্রোদিতে, হের্মেস্‌, আথেনা, দেমেতের্‌, পের্সেফোনে—আবার তাঁদের আদিম যুগের অতিমানব এবং বিশ্বাশ্রয়ী যথার্থ দেবতার স্বরূপে প্রকাশিত হ'লেন। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে, বিশেষতঃ ভাস্কর্যে, নবীন ভাবে এক শুদ্ধ-হেল্লেনীয় পুনর্জাগৃতি দেখা দিলে। নবীন দৃষ্টিতে, যেন গ্রীক সংস্কৃতির আলোক-পাতের ফলে, ভাস্করগণ তাঁদের চতুর্দিকের সুখদুঃখময় মানব-জীবন অবলোকন ক'রলেন। আধুনিক ব'লে, এঁরা পূর্বকালের শিল্পের বিভিন্ন যুগের সঙ্গে পরিচিত ; খালি শুদ্ধ গ্রীক নয়, শুদ্ধ বিজান্তীয় আর গথিককেও এঁরা আবিষ্কার ক'রেছেন ; বিজান্তীয় আর গথিকের আলো-আঁধারি, তাদের গভীর জীবন-রহস্য সম্বন্ধে সচেতনতা, তাদের ভাবশুদ্ধি—এসব থেকেও যা আত্মসাৎ করবার তা এঁরা ক'রলেন ; ওদিকে আবার প্রাচীন মিসরের ও বাবিলনের, ভারত বহির্ভারত আর চীন-জাপানের, আর আফ্রিকার, আমেরিকার ওশেনিয়ার আদিম জাতিদের শিল্প চর্চা ক'রে, তার অন্তর্নিহিত শাশ্বত রসবস্তুকে আবাহন ক'রে নিজেদের শিল্প-চেতনায় উপভোগ্য ক'রে নিলেন, এই সব শিল্পের কৃতিত্বকে বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি ব'লে গণ্য ক'রে, তা থেকে যে দৃষ্টিকোণ যে ভঙ্গী যে রীতি আধুনিক মানুষের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য তাও নিতে চেষ্টা ক'রলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে যা দেখলেন—যে মূর্তি আর যে ভাব—তারও সরল ও সবল প্রকাশনে ব্যাপৃত হ'লেন। নোতুন চোখে বিশ্বময় মানুষের কৃতিত্ব দেখার ফলে, ইউরোপে এখন এক নোতুন ধরণের মানবিকতা—মানবের কৃতিত্ব, মানবের মহত্ত্ব সম্বন্ধে

সচেতনতা—দেখা দিয়েছে; এই মানবিকতা নোতুন ক'রে বিশ্বমানবের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছে, নরজাতির গৌরবের জয়জয়কার ক'রছে, মানুষকে এমন কি দেবতার আসনে বসাচ্ছে। মানুষকে নিয়ে এই রকম মাতামাতি, এটা অল্পবিস্তর সব জাতির মধ্যেই বিদ্যমান; মহাভারতে ব'লেছে—'গুহ্যম্ ব্রহ্ম তদিদম্ ভো ব্রবীমি—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' (শান্তিপর্ব)—'তোমাদের এই গুপ্ত মন্ত্র ব'ল্‌ছি—মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।' আর বাঙ্গালী সহজিয়া কবির বচন আমরা সকলেই জানি,—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' কিন্তু এই নরের শ্রেষ্ঠতার জয়গান, তার সম্বন্ধে এতটা বোধ, প্রাচীন গ্রীক জাতির সংস্কৃতিতে যতটা পরিস্ফুট, এতটা আর কিছুতেই নয়। রোমান জাতি গ্রীকদের কাছ থেকে এই জিনিস গ্রহণ করে, তাদের সংস্কৃতির আর সমস্ত অঙ্গের সঙ্গে; রোমান জাতির কাছে মানবিকতা, মানবপ্রীতি, Humanitas নাম গ্রহণ করে। এই Humanitas, বা Humanity শব্দ, যার পরিবর্ধিত অর্থ দাঁড়ায় 'মৈত্রী', এবং 'সাহিত্য', এখন ইউরোপীয় সভ্যতার একটী প্রধান কথা; আর এ জিনিস যে একেবারে বিনষ্ট হয় নি, তা আধুনিক ইউরোপের রূপশিল্প যতটা পরিচয় দিচ্ছে, এতটা আর কিছুতে না।

নবীন ভাবে মানবিকতার সাধন ভাস্কর্য-শিল্পে আরম্ভ ক'রলেন, ফরাসী ভাস্কর Rodin রোদ্যাঁ; আর তাঁর পরে কতকগুলি ফরাসী ভাস্কর দেখা দিলেন, Bourdelle বুর্দেল্, Maillol মাইল্যল, Despiau দেস্‌পিও প্রভৃতি। এঁরা ফ্রান্স তথা ইউরোপের ম্রিয়মাণ ভাস্কর্য-শিল্পকে পুনর্জীবিত ক'রে তুল্‌লেন, ভাস্কর্য এঁদের হাতে কেবল মৃত রাজা বা সেনাপতি বা মন্ত্রী বা জননেতা অথবা চিন্তানেতার স্মারককে আশ্রয় ক'রে, অথবা কেবল কতকগুলি allegorical figure অর্থাৎ রূপক-মূর্তি (যেমন 'বিজ্ঞান', 'দেশমাতৃকা', 'যুদ্ধ', 'শান্তি', 'উন্নতি', 'আশা' প্রভৃতি)-কে অবলম্বন ক'রে আর রইল না, ছোট বা সব রকম মানুষের জীবন, তার আশা আকাঙ্ক্ষা জয় পরাজয় চিন্তা কর্ম প্রভৃতিকে বেশী ক'রে দেখাতে লাগ্‌ল। ফ্রান্সের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশেও দেখা দিলেন বড় বড় ভাস্কর—এঁরাই হ'লেন আধুনিক নব জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী কবি; যেমন জরমানির Kolbe কোল্‌বে, Klimsch ক্লিম্‌শ্, Barlach বার্‌লাখ্ প্রভৃতি; ডেনমার্কের Kaj Nielsen কাই নীল্‌সেন্, নরওয়ের Gustav Vigeland গুস্টাভ্ ভিগেলাণ্ড্, আর সুইডেনের Carl Milles কার্ল মিল্লেস্। ইটালিতে এখন তেমন বড় নামী ভাস্কর কেউ দেখা দেন নি; ইটালির রোমনগরীস্থ Foro Mussolini-তে বিভিন্ন ইটালিয়ান ভাস্কর কয়েক ডজন মূর্তিতে নোতুন ক'রে যৌবন-শক্তির জয়গান জুড়ে দিয়েছেন—এই মূর্তিগুলিতে ইচ্ছা ক'রেই যেন শিল্পীরা অন্য আদর্শ অপেক্ষা শক্তির প্রচণ্ডতাকেই বেশী ক'রে প্রকট ক'রেছেন। নরওয়ের শিল্পী ভিগেলাণ্ড্ গত তিরিশ বছর ধ'রে বহু ব্রঞ্জ আর পাথরের মূর্তি আর মূর্তিমণ্ডলী মিলিয়ে' মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের এক বিরাট্ মহাভারত তৈরী ক'র্‌ছেন, যা রবীন্দ্রনাথও কয় বছর আগে দেখে বিস্মিত বিমুগ্ধ হ'য়েছিলেন। জরমান শিল্পী কোল্‌বে, আদিযুগের গ্রীক শিল্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আর নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠ দৈহিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে' তোলবার চেষ্টা ক'রে, নোতুন ভাবে অদ্ভুত সুন্দর আদর্শে তরুণ আর তরুণী মূর্তির পরিকল্পনা ক'রে, কতকগুলি যে পুরুষ আর নারী মূর্তি আর একত্র মিথুন বা দম্পতী বা পুরুষ-প্রকৃতি মূর্তি ব্রঞ্জে ঢেলেছেন, তা আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে,

জগতের শিল্পে এক লক্ষণীয় জিনিস। এইখানেই জরমানির যথার্থ মহত্ত্ব ও যথার্থ গৌরব ; ইহুদী-নির্যাতনে বা আর্যামির নূতন ছুঁৎমার্গ প্রচারে জরমানির যে কলঙ্ক, তার অপনোদন এইখানে। নাৎসি আর ফাশিস্ত্ আর অন্য রাষ্ট্রনীতির গুণ্ডামি আর ছ্যাঁচড়ামির বহু ঊর্ধ্বে, জাতিতে জাতিতে যে সর্বনাশকর হিংসার প্রচারে ইউরোপের কয়েকটী জাতি যে মহোৎসাহে মেতে গিয়েছে তাকে ছাপিয়ে' পরাজিত পরাস্ত বিধ্বস্ত জাতি—বিশেষতঃ সে জাতি অন্-ইউরোপীয় হ'লে—তার বুকের উপরে দাঁড়িয়ে' যে সাম্রাজ্য-বাদের জয়জয়কার ঘোষণা চ'লছে তাকে অস্বীকার ক'রে ; সর্বজাতির উপরে সব বিষয়ে স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব-বোধকে, জাতির আপামর সাধারণের মধ্যে, তার শিরায় শিরায় বিষ ঢুকিয়ে দেবার মত যে মিথ্যা-প্রচারের, আর আত্মহননকারী তথাকথিত পাণ্ডিত্যের নানাবিধ চেষ্টা ; সে সবের বিরুদ্ধে, মূক প্রতিবাদ-স্বরূপ, ইউরোপের রূপ-শিল্পে, কেবল মানুষ ব'লে জাতিবর্ণদেশ-নির্বিশেষে বিশ্ব-মানবের বা সব-মানুষের যে জয়গান হ'চ্ছে, সব-মানুষের হ'য়ে মানুষের গৌরবের যে নিত্যসেবা চ'লেছে, তা আধুনিক ইউরোপ আর জগতের ইতিহাসে অমর উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে।

শিল্পকে আশ্রয় ক'রে মানবিকতা—সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে স্বাজাত্যবোধ, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানব-জীবনের তাবৎ সুখদুঃখকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা—আধুনিক সংস্কৃতির একটী লক্ষণীয় প্রকৃতি। ইউরোপে এই জিনিস এবার লক্ষ্য ক'রে এলুম—আমেরিকায় এই জিনিস ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ ক'রেছে—মেক্সিকোতে Diego Rivera দিয়েগো রিভেরা, গুয়াতেমালাতে Carlos Merida কার্লস্ মেরিদা, পেরুতে Jose Sabogal হোসে সাবোগাল প্রমুখ চিত্রকরদের রচনায়, বিজিত অবজ্ঞাত অথচ নানা সদ্‌গুণের আধার আমেরিকার সুসভ্য আদিম নিবাসীরা আবার আত্মপ্রকাশ ক'রতে সমর্থ হয়েছে—এই শিল্পীদের চিত্রাবলীতে পরাধীন অত্যাচারপিষ্ট জাতির সম্বন্ধে যে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তার দ্বারা এই সব জাতিকে তুলে ধ'রতে, এদের আবার দাঁড় করাতে যথেষ্ট সহায়তা মিলেছে। আধুনিক জগতে মুখ্যতঃ শিল্পই এইরূপে বড় আদর্শকে আত্মসাৎ ক'রে, নিজের সার্থকতা সাধন ক'রছে।

# বিদেশী কবিতা

(Christina Rossetti-র ইংরেজী হইতে)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

## গান

আমি মরে' গেলে, ওগো প্রিয়তম,
গেয়ো না কাতরে করুণ গান,
কবরে আমার দিয়ো না গোলাপ,
অথবা ঝাউয়ের ছায়া সে ম্লান;
সেথা তৃণদল—শিশিরে বাদলে
আপনি ভিজিয়া শ্যামল রবে;
যদি প্রাণ চায়, মনে রেখো মোরে,
যদি নাহি চায়, ভুলিয়ো তবে।

এই আলো-ছায়া পড়িবে না চোখে,
গায়ে লাগিবে না বৃষ্টি-শীত,
রাতের পাখীটি গাবে সারারাত—
শুনিব না তার ব্যথার গীত;
নাই কভু যার অস্ত-উদয়
সেই গোধূলির স্বপন-বনে—
হয়তো তোমারে ভুলে যাব, সখা,
হয়তো তোমারে পড়িবে মনে।

## সুখ

দুইটি কপোত এক ডালে বসি',
একটি বোঁটায় দুই কমল,
দুই প্রজাপতি একটি কুসুমে
দেখে দু'জনায় সুখ-বিভল।

বড় সুখ সে যে—দেখা দু'জনায়,
সুখে ফাগুনের আলোর ফাগ!
তখনো পড়ে নি দোঁহার মানসে
নিশীথের কালো কালির দাগ!

## শান্তি

ওগো মাটি, ওর মুখখানি তুমি ভাল করে' দাও ঢেকে,
মুদিয়া দাও গো জাগরণে-ক্ষীণ আঁখি-পল্লব তার ;
চাপো চারিপাশে—বাহিরের হাসি-কান্নার চীৎকার
পশিতে দিও না আহা ওর কানে, কোনখানে ফাঁক রেখে।
উত্তর নাই, বিদায় নিয়েছে প্রশ্নও মুখ থেকে ;
জন্ম-অবধি যত দুর্ভোগ—শান্তি সে-সবাকার
রচিয়া দিয়াছে শয়ন-শিবির নিবিড় স্তব্ধতার—
অসাড় শরীর জুড়ায়েছে যেন অমৃতের অভিষেকে।

দিবালোক চেয়ে স্বচ্ছ আঁধার রয়েছে তাহারে ঘেরি',
তার সে মৌন সঙ্গীত চেয়ে শতগুণ সুরময়,
তাই বক্ষের স্পন্দন-ধ্বনি স্তব্ধ হইয়া রয় ;
যতকাল সেই অনন্ত দিবা-প্রভাতের আছে দেরী
সে শুধু ঘুমাবে, সে ঘুমের নাই আরম্ভ, নাহি শেষ—
জেগে উঠে তবু মনে হবে, এ যে ক্ষণিক নিদ্রাবেশ!

## যদি

আর বার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
পদ্মের বীজ জলতলে ফেলি' রব না বসি' ;
রোপণ করিব সেই ফুল শুধু আঙন-কোণে,
সদ্য যা ফুটে পড়িবে খসি'।

আর বার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
শুনিব না আমি যেই গান গায় রাতের পাখী ;
দিনের আলোয় গান গায় যারা ঝটিকা সনে,
তাহাদেরি সাথে উঠিব ডাকি'।

আর বার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
যদি আসে—হায়, জীবনে এখন সকলি 'যদি'—
ভাবিব না আর দূরের ভাবনা অন্যমনে,
বাঁধিতে চাব না স্রোতের নদী।

দিন যায়, সে যে চলেই যায়,
হেসে খেলে তারে দিব বিদায়,
আর বার যদি বসন্ত আসে আমার বনে,
জাগিয়া রহিব প্রথমাবধি।

## জন্মদিন

আজি এ হৃদয় পাখীটির মত
গান গেয়ে কচি শাখায় দোলে,
আপেল-তরুর মতন আজি সে
ফলে-ফলে ডাল ভরিয়া তোলে ;
যেন সে রঙীন ঝিনুক-তরীটি
বাহিছে নিথর নীল সাগর,
আজ মোর প্রাণে সুখ ধরে না যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর।

শয়নের বেদী উঁচু করে' বাঁধি'
ফুলমালা তায় দুলায়ে দে,
সোনার সুতায় বোনা সে চাদরে
মুকুতা-ঝালর ঝুলায়ে দে ;
আঁকি তোল্ তায় পাখী-ফুল-ফল
লতায় পাতায় সুমনোহর,
আজি এ প্রাণের জন্মতিথি যে—
এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর।

## মৃত্যুর পরে

মরে' গেনু যবে আত্মা আমার
হেরিল ফিরিয়া ভবনে মোর—
নব-পল্লব নেবুর কুঞ্জে
স্বজন-সখারা আমোদে ভোর।
হাত হ'তে হাতে ফিরিছে পেয়ালা,
মধুভরা ফল চুষিছে সবে ;
হাসি-পরিহাস গানের ফোয়ারা—
প্রেমে গলাগলি সে উৎসবে।

সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস যত
        শুনিনু দাঁড়ায়ে একটু দূরে,
কেহ বলে, 'কাল চল মোরা যাই,
        সাগর-বেলায় বেড়াব ঘুরে' ;
বলে একজন, 'জোয়ারের আগে
        পৌঁছিব সেই শৈলকূটে',
আর জন বলে, 'কালিও তা হ'লে
        বেড়াব এমনি আমোদ লুটে'।

অসীম আশায় বলীয়ান সবে,
        সকলেই ভাবে সুখের কথা,
'আগামী দিবস' ছাড়া কথা নাই,
        গত-দিবসের ভুলেছে ব্যথা।
তারা যে এখনো মধ্যগগনে,
        আমি হয়ে গেছি নিরুদ্দেশ,
তারা চায় শুধু সমুখের পানে,
        আমি অতীতের ভস্মশেষ !

শিহরিনু বটে সেই কথা ভাবি',
        তবু মোর ছায়া অ-লক্ষণ
ফেলি নাই সেথা,—ত্যজিতে সে ঠাঁই
        অথবা রহিতে চাহে না মন।
শেষে চলে' গেনু মোর গৃহ ছাড়ি'
        —প্রেম হ'তে চির-নির্ব্বাসনে,
ভুলিয়াছে মোরে স্বজন-সখারা,
        যথা গৃহস্থ অতিথি-জনে।

## মনে রেখো

আমারে রাখিও মনে, চ'লে যবে যাব সেই দেশে—
যেথায় সকলি স্তব্ধ, নাহি কথা, নাহি গীত-গান ;
তখন ও হাতখানি এ হাতের পাবে না সন্ধান,
আমিও চলিতে গিয়ে থমকিয়া থামিব না হেসে।

এত যে মিলন-স্বপ্ন, সুখ-সাধ সব যাবে ভেসে,
দিনে-দিনে গড়ে'-তোলা বাসনার হবে অবসান ;
যখন সকল ভয়-ভাবনার ঘুচিবে নিদান,
তখন আমারে শুধু মনে রেখো—কঠিন নহে সে।

তবু যদি ভুলে গিয়ে কিছুকাল, পরে পুনরায়
সহসা স্মরণ কর—চিত্তে যেন নাহি হয় ক্লেশ ;
আমার এ দেহ যদি ততদিনে মাটি হয়ে যায়,
জেগে থাকে তারি মাঝে এতটুকু চেতনার লেশ—
জেনো তবে, ব্যথা যদি পাও সখা স্মরিয়া আমায়,
ভুলিয়াই ভালো থাকো—সেই মোর সুখ যে অশেষ !

## দুর্গম

সারাপথ কিগো এমনি উচল—উঠেছে পাহাড় বেয়ে ?
তাহাতে যে ভুল নাই !
দীর্ঘ দিনেও ফুরাবে না পথ, চলিতে হবে কি ধেয়ে ?
—সকাল হইতে সন্ধ্যা নাগাদ ভাই !

পথের অন্তে রাত্রিবাসের আছে কি পান্থশালা ?
—আছে, আছে যবে সন্ধ্যা নামিবে ধীরে ;
আঁধারে অন্ধ খুঁজিয়া না পাই যদি সেই একচালা ?
—হতেই পারে না, পাবে সে আবাসটিরে।

আরো সে অনেক পান্থজনের পাব কি সে রাতে দেখা ?
—আগে যারা গেছে তারাই সেথায় র'বে।
ডাকিতে হবে, না—ঘা দিব দুয়ারে, বাহিরে দাঁড়ায়ে একা ?
—দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকিতে কভু না হবে।

দীর্ঘপথের ক্লান্ত পথিক লভিবে শান্তি-সুখ ?
—সব দুঃখের অবসান সেই ঘরে ;
শয্যা সেথায় আছে কি বিছানো ঘুমাইতে একটুক ?
—যে আসে তাহারি তরে।

# বাংলা দেশে আধুনিক কাঠখোদাই চিত্র

শ্রীসুমিত্রকুমার গুপ্ত

শিল্পরচনার স্বতন্ত্র একটি বিভাগরূপে কাঠখোদাই ছবির প্রচলন আমাদের দেশে বেশি দিনের কথা নয়। কাপড়ে ছাপ তুলিয়া সুশোভিত করিবার জন্য কাঠের ব্লকের ব্যবহার বহুদিন পূর্ব্বেই ছিল; তার পরে যখন আমাদের দেশে বই ছাপা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু তাহার ছবিগুলির মূল্য ঐতিহাসিক, শিল্প-নিদর্শন হিসাবে সেগুলি তেমন বিচিত্র নহে।

আমাদের দেশে আধুনিক কাঠখোদাইয়ের চর্চ্চার প্রেরণা বিদেশ হইতে আসিয়াছে। চীন দেশে, পরে ইউরোপেও, বহু শত বৎসর পূর্ব্বে সুলভ কাঠের ছাপের

সরাইখানা — শ্রীবাসুদেব রায়

সঙ্গে ধাতুময় ব্লকের যখনও প্রচলন হয় নাই, সেই সময় কাঠে ছবি খোদাই করিয়া তাহার সাহায্যে কতকগুলি বাংলা বই চিত্রিত করা হইয়াছিল। এরূপ বই ও ছবি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগ্রহে আছে, ঐ যুগের বাংলা বইয়ের পুস্তক-চিত্রণের অনেকগুলি নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তথ্যসংগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়া শীঘ্রই তিনি সেগুলি প্রকাশ করিবেন। সে কাঠখোদাই ছবি তীর্থযাত্রীরা স্মারকচিহ্নস্বরূপে লইতেন, যেমন এখনও আমাদের দেশে বৃদ্ধারা জগন্নাথ-দর্শনে গেলে সস্তা জার্ম্মান ওলিওগ্রাফে জগন্নাথের চিত্র লইয়া আসেন ও তীর্থদর্শনের স্মৃতিরূপে সযত্নে রাখিয়া দেন। তারপরে ছাপাখানার প্রচলনের সঙ্গে পুস্তক-চিত্রণের কাজে কাঠখোদাইয়ের বহুল প্রচলন হয়। কিন্তু তাহাতে উচ্চাঙ্গের শিল্পাদর্শের বিকাশ তেমন কিছু দেখা যায় নাই, প্রধানতঃ তাহা

অনুকৃতিমূলকই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষেই আধুনিক কাঠখোদাই ছবি বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সৃষ্টি—এই সময় হইতে এই পদ্ধতিতে ইউরোপের অনেক শিল্পী যে পরীক্ষণ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করেন, তাহারই ফলে কাঠখোদাই বহু বিচিত্র ভাব ও রসের বাহন, এবং নানারূপ চমৎকারজনক কারুগত পরীক্ষার আধারস্বরূপ হইয়াছে। কাঠখোদাই ছবির সম্বল শুধু সাদা ও কালো; তাহারই নব নব সমাবেশ উদ্ভাবন করিয়া বিচিত্র পরিকল্পনার সৃষ্টি হইতেছে; কালো অংশে রেখাপাতের দ্বারা ধূসর করিয়া তোলা হইতেছে এবং সাদা অংশের বিভিন্নরূপ নিয়ন্ত্রণে আলোক-বিভ্রম সৃজন চলিতেছে; সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া, আপাতদৃষ্টিতে অসুন্দর লালিত্যবর্জ্জিত চিত্র কাঠে খোদাই করা হইতেছে; নিছক প্যাটার্ন বা নক্সা হইতে আরম্ভ করিয়া গভীরতম বেদনা, মহত্তম ধারণা কাঠের ছাপে রূপ-পরিগ্রহ করিতেছে। এইরূপে, কাঠখোদাই এখন আর অনুকৃতিমূলক নাই, উহা শিল্পী-মানসের আত্মপ্রকাশের স্বতন্ত্র, সবল ও বিশিষ্ট একটি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন অবশ্য আবার পুস্তক-চিত্রণের কাজে বিদেশে কাঠখোদাইয়ের ব্যবহার খুব প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ধাতুময় ব্লকের পরিবর্ত্তে নহে, সে ছবিগুলিও প্রকৃতির অনুকৃতিমূলক নহে। সাদা ও কালোর বিচিত্র সমাবেশে শিল্পীর হাতে যে গম্ভীর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহারই সুযোগ লইয়া পুস্তক অলঙ্কৃত করিবার জন্য এই পদ্ধতির চিত্রের ব্যবহার হয়। এবং তাহাতে শিল্পীর স্বাধীনতাও যথেষ্ট থাকে।
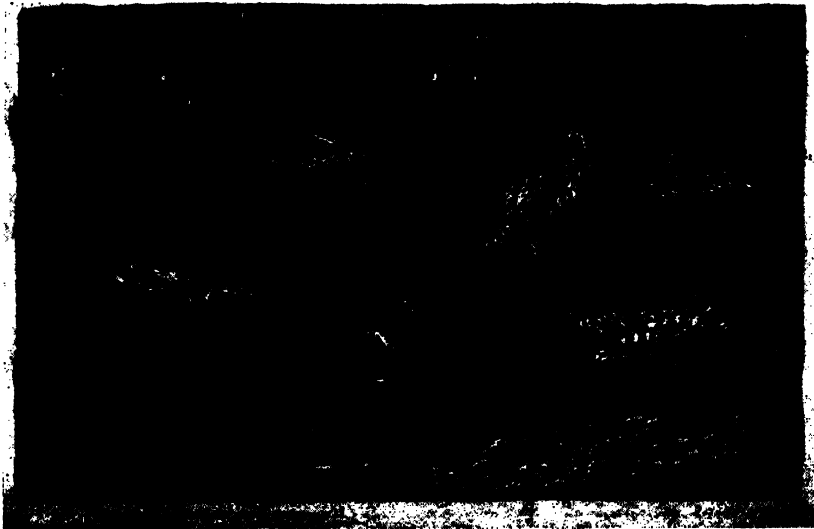
পল্লীপথে　　শ্রীবাসুদেব রায়

হাঁস　　শ্রীবাসুদেব রায়

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অধ্যক্ষতাধীন শান্তিনিকেতন কলাভবন আমাদের দেশে শিল্পের দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকরণ লইয়া পরীক্ষণের একটি প্রাণবান্ কেন্দ্র। শিল্পচর্চ্চার কোনও উপাদান-উপকরণ, বা শৈলী বিদেশী বলিয়া এখানে বর্জ্জন করা হয় নাই। কয়েক বৎসর আগে এখানেই কাঠখোদাইয়ের চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌ শিল্প-

বিদ্যালয়ের ললিতমোহন সেনও কাঠখোদাইয়ের কাজ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে "গান্ধীজি" প্রভৃতি প্রতিকৃতির উল্লেখ চলিতে পারে।

কাকাতুয়া শ্রীবাসুদেব রায়

কেবল জল-রঙে ছবি আঁকিবার একঘেয়েমি হইতে এই শিল্পকারুর চর্চ্চায় শান্তিনিকেতনের তৎকালীন যে সকল ছাত্র বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কাজ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাজ উচ্চাঙ্গের হইলেও আমাদের দেশের সাধারণের পক্ষে দুরূহ বলিয়া লোকপ্রিয় হয় নাই। তাঁহার ছবির রসগ্রহণ করিতে হইলে বিশেষ আলোচনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের লিনো-কাটগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই ছবিগুলির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে নন্দলাল বসু মহাশয়ের কাজের কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন।

তিনি বহু বিচিত্র উপাদান ও উপকরণ লইয়া বিভিন্ন শিল্পরীতিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। ছাপের ছবিতেও তিনি নিজস্ব প্রতিভার ছাপ দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ লিখিত শিশুপাঠ্য 'সহজ পাঠ' বইয়ের জন্য তিনি এইরূপ কতগুলি ছবি করিয়া দিয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে বহু রেখাপাতের দ্বারা হাফটোনের ভাব আনিবার চেষ্টা নাই, সরল পরিকল্পনায়, প্রচুর কালো অংশের সহিত প্রচুর সাদার অবকাশ দিয়া ছবিগুলি করা হইয়াছে, এবং কালো অংশে কোণাকৃতির ব্যবহার দ্বারা একটা সহজ বলিষ্ঠতার ভাব উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার "বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা" ছবিটিতে এইরূপ কোণাকৃতির ব্যবহার দ্বারা দৃঢ়তার ভাবব্যঞ্জনা হইয়াছে, এবং অল্প সাদা ও অল্প কালো অংশের পুনঃ পুনঃ সমাবেশে একটি সুন্দর প্যাটার্নের সৃষ্টি হইয়াছে। উপরে নীচে লম্বা এই ছবিটির জনতার বিন্যাসে একটু বিশেষত্ব আছে; উপর কোণ হইতে নীচের দিকে জনসমষ্টিকে এমন ভাবে সাজানো হইয়াছে, যাহাতে অল্প কয় জন লোকই দীর্ঘ জনতার ধারার আভাস দেয়। 'সহজ পাঠে'র দুই একটি পাদপূরক চিত্রের কথাও উল্লেখযোগ্য। একটি ছবিতে ভরা বর্ষার নদীতে নৌকার প্রখর গতিবেগ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার কাঠখোদাই ছবিতে তাঁহার ছাত্রজীবন ও কর্ম্মজীবনের পারিপার্শ্বিককে মধুর রূপ দিয়াছেন; শান্তিনিকেতন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল-গ্রাম, ও কলিকাতার অনেক দৃশ্য তাঁহার ছবির উপজীব্য। তাঁহার পাখীর ছবিগুলিও উল্লেখযোগ্য।

ঝড়ে শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

"শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ" ছবিতে ঘননিবিষ্ট আম্রতরুরাজি কালো রঙে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার ফাঁকে ফাঁকে জমিতে সাদার স্বল্প অবকাশ দিয়া রৌদ্রালোকের আলিপনা খুব চাতুর্য্যের সহিত আঁকা হইয়াছে, সব মিলিয়া একটি অপূর্ব্ব রহস্য-লোকের আভাস চিত্রটিতে সঞ্চারিত হইয়াছে। "শান্তিনিকেতনে অভিনয়" ছবিটির খোদাই-পদ্ধতির সহিত তাঁহার অন্যান্য ছবিগুলির কিছু পার্থক্য ও তুলনায় বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার অন্যান্য কাঠ-খোদাইর অধিকাংশগুলিতেই কালো ও সাদার প্রায় সমান সমান ব্যবহার দেখা যায়। এই ছবিটির জমিটি প্রায় সম্পূর্ণ ই কালো, আলোক যাহা আছে তাহা নেপথ্যে, অভিনয়মঞ্চে, তাহা ছবির বহির্ভূত; শুধু আলোকরেখার একটি বেষ্টনী দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দর্শকের জনতা, কালো জমিতে সূক্ষ্ম সাদা লাইনের দ্বারা তাহাদের দেহরেখা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। অবিচ্ছিন্ন কালোর নীরসতা দূর হইয়াছে অভিনয়মঞ্চ হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের কয়েকটি ক্ষীণ সমান্তরাল সাদা রেখা দ্বারা ও তরুশীর্ষে পত্রগুচ্ছে প্রতিফলিত স্পষ্টতর আলোকবিন্দু দ্বারা ও মঞ্চের

শান্তিনিকেতনে অভিনয়        শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

অপেক্ষাকৃত সম্মুখেই উপবিষ্ট জনতার দেহে ও গাত্রা-বরণে উজ্জ্বলতর আলোকের কিছু নির্দ্দেশ দিয়া। এইরূপে প্রায় সম্পূর্ণ অনবচ্ছিন্ন কালোর ব্যবহার দ্বারা তিনি ছবিখানিতে ক্ষীণালোকিত রাত্রির রূপ ভাল ফুটিয়াছে। আরও একখানি কাঠখোদাই ছবি করিয়াছিলেন, তাহার

গরুর গাড়ি        শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

জলপ্রপাত — শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

আনন্দজনক বলিয়া মনে হয় না; এইজন্যই এটিকে আঁকিতে গিয়া অনেকেই ফোটো-গ্রাফিক বা দৃষ্টিকটু করিয়া ফেলিয়াছেন। রমেন্দ্র-বাবুর অধিকাংশ কাজেই কেবল স্পষ্ট সাদা ও কালোর ব্যবহার দেখি। পরে তিনি "জননী", "পটুয়া" প্রভৃতি ছবিতে, বিপরীত দিক হইতে সমান্তরাল রেখার ব্যবহারের দ্বারা ধূসর বর্ণেরও সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রমেন্দ্রবাবুর অন্য কাজ, সাঁওতাল-জীবনের বিভিন্ন চিত্র, ও কলি-কাতার পারিপার্শ্বিকের দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অন্যত্র বিস্তৃততর আলোচনা হইয়াছে, ছবিগুলিও অনেক বার ছাপা হইয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। কেবল এই কয়টি কথা বলা যাইতে পারে; রমেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি সমধিক পরিমাণে মাধুর্য্য-সন্ধানী; সাঁওতালদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশের মধ্যে যে একটি সহজ বন্যশ্রী আছে, তাহা তাঁহার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, ও সে ছবিতে এইজন্যই তিনি সহজেই রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। এগুলির সম্বন্ধে বলিবার কথা এই যে এগুলি তিনি আঁকিয়াছেন প্রধানতঃ বর্ণচিত্রীর মনোভাব লইয়া, ইহার অনেকগুলি কাঠে খোদাই না করিয়া রঙে আঁকিলে দুইয়ের রীতিতে কোন পার্থক্য হইত বলিয়া মনে হয় না। এই যে মাধুর্য্য-সন্ধানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহার কলিকাতার চিত্রগুলিতেও

বিষয়—শান্তিনিকেতনে সপ্তপর্ণতলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধন-বেদী। প্রায়ান্ধকার পটভূমিতে সপ্তপর্ণকুঞ্জের নীচে তরুমালাবেষ্টিত বেদীর একটি দিক দেখা যাইতেছে, তাহার পাশে অল্প খানিকটা সাদার অবকাশ দিয়া আকাশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে; বেদীটিকে একান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া না দেখাইয়া, তরুচ্ছায়ানিবিড় আবেষ্টনের মধ্যে একখণ্ড আকাশের অবকাশ আনিয়া, বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য্য খুব পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। এই বেদীটি শান্তি-নিকেতনের অনেক শিল্পীরই বিশেষ প্রিয় বিষয়বস্তু, কিন্তু অন্য কাহারও চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই, কারণ ইহার মাহাত্ম্য অধিকপরিমাণেই ইহার আবেষ্টন, ভাব ও স্মৃতি-সম্পদের উপর নির্ভর করে, বেদীটি শিল্পীর দৃষ্টিতে ঠিক প্রীতিকর ও

বনস্পতি — শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

দেখা যায়; পুরাতন বাড়ির প্রলেপ-খসা দেয়াল, অন্ধকার মালিন্যময় গলি, সব হইতেই তিনি একটা সুষমা-সার ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন, তাহা ঠিক বাস্তব নহে। কোথাও বাস্তব তাহার লাবণ্যহীন কঠোর রুক্ষ রূপ লইয়া শিল্পীর মনকে বাঁধিতে পারে নাই।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাঠখোদাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তাঁহার ছবিগুলি লালিত্যধর্ম্মী নয়; আর, যে উপাদানের উপর চিত্র রচনা করিতেছেন, তাহার স্বকীয় বিশিষ্টতার পরিচয় তাঁহার ছাপের ছবিগুলিতে স্বীকৃত আছে, এবং খোদাই-যন্ত্রগুলির ব্যবহারের চিহ্নও ছবিগুলিতে রাখিয়াছেন। শান্তিনিকেতনের পারিপার্শ্বিক ল্যাণ্ডস্কেপ হইতে যে সব ছবি তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি একটি গাম্ভীর্য্যময় মহিমা সঞ্চার করিয়াছেন তাহাকে লাবণ্যোচ্ছল রূপ দেন নাই। "বনস্পতি"র ছবিটিতে বিশাল প্রাচীন তরুর উদার রুক্ষ সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। গরুর গাড়ির ছবিটিতে বীরভূম অঞ্চলের কণ্টকগুল্মসমাকীর্ণ তালতরুবিকীর্ণ মেঠো পথের যে একটি বৈরাগ্যকরুণ উদাসীন রূপ আছে, তাহা সহজেই মনকে আকর্ষণ করে ও সেই বৈরাগ্যের সুরটি দর্শকের মনে সঞ্চারিত হয়।

সর্ব্বপ্রথম এদেশে যাঁহারা কাঠখোদাইয়ের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার প্রস্তুত বারোটি লিনোকাটের একটি অ্যাল্‌বাম তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। কেদারনাথ, বদরীনাথ ভ্রমণকালে যে সব ছবি তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল, এই ছবিগুলিতে তাহা তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেদারনাথে মন্দিরের ছবি, বদরীনাথে পাহাড়ের ছবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পর্ব্বতে তুষারের আবরণ তিনি কৃতিত্বের সহিত আলঙ্কারিক রূপ দিয়া দেখাইয়াছেন। পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের কতকগুলি পোর্ট্রেটে তিনি ঐ অঞ্চলের লোকদের চরিত্রের বিশিষ্টতা আনিতে পারিয়াছেন। বহুল রেখার ব্যবহারে, ও অবকাশের অভাববশতঃ তাঁহার অনেকগুলি ছবির সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। তাঁহার পাহাড়ী ঝরণার ছবিটি তাঁহার অন্য ছবিগুলি হইতে স্বতন্ত্র ধরণে প্রস্তুত, কালো জমিতে অল্প কয়টি সাদা রেখায় জলধারা চাতুর্য্যের সঙ্গে দেখানো হইয়াছে।

পাল্কী শ্রীবাসুদেব রায়

রমেন্দ্রবাবুর দৃষ্টান্তে কলিকাতায় সরকারী আর্ট স্কুলে ও অন্যত্র অনেকে কাঠখোদাই-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। সুধাংশু রায় মসলিপট্টমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় রমেন্দ্রবাবুর ছাত্র ছিলেন। পরে লিনোকাট ও উডকাটের একটি অ্যাল্‌বাম প্রকাশ করেন। কলিকাতার দৃশ্য, বস্তি প্রভৃতির যে ছবিগুলি তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ রমেন্দ্রবাবুর শিল্পরীতিরই অনুকৃতি। সুধাংশুবাবু "বালক", "অন্ধ বালিকা" প্রভৃতি যে পোর্ট্রেট গুলি করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবদ্যোতক ও সাদা-কালোর কন্‌ট্রাস্টে জোরালো হইয়াছে। তারক বসুও তাঁহার প্রস্তুত ছাপের ছবির একটি চিত্রমালা প্রকাশ

করিয়াছিলেন ; তাঁহার "ফিল্ম্‌স্ট্ুডিয়োর অভ্যন্তর" ছবিটিতে একটি রহস্যময় আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়াছেন ; বাড়ি তৈরির ছবিটিও উল্লেখযোগ্য। অন্য প্রায় সব ছবিগুলি নিরর্থক রেখাপাতে বিরক্তিকর ও অসার্থক হইয়াছে। বাসুদেব রায় উড-এন্‌গ্রেভিঙে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন। সূক্ষ্ম সাদা রেখার ও সমান্তরাল রেখার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা কালো অংশকে ভাঙিয়া দেওয়া তাঁহার অনেক ছবির বিশেষত্ব।

শান্তিনিকেতনের বর্ত্তমান ছাত্র ও শিল্পীদের কাজেও নানারূপ পরীক্ষার প্রয়াস দেখা যায়। বিশ্বরূপ বসু রঙিন কাঠখোদাইয়ে বিশেষজ্ঞ ; একরঙা ছাপের ছবিতেও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। "মা ও সন্তান" ছবিতে দেহ-রেখা-নির্দ্দেশক স্পষ্ট সাদা রেখা সমস্ত ছবিটিকে আলোকিত ও ভাবব্যঞ্জক করিয়াছে। যমুনা দেবীর ছাপের ছবিগুলিতে বাংলার পটাঙ্কনরীতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

কাঠখোদাই আমাদের দেশে এখনও বিদেশী কাঠ-খোদাইয়ের মত বিচিত্র ভাবের বাহন ও পরীক্ষার উপাদান হইয়া উঠে নাই। তবে আমাদের দেশে শিল্পের অন্যান্য দিকের সাধারণ অবস্থার তুলনায় দেখিলে এই ধারাটিকে আর তুচ্ছ করা চলে না।

# সত্যই ?

**"বনফুল"**

তুলেছে তোমার দাঁত অরসিক কোন দন্তবিদ ?
সত্যই সাঁড়াসি দিয়া সবলে করেছে উৎপাটন ?
দন্তহীনা তরুণী যে নিতান্তই নগণ্য উদ্ভিদ
এই তথ্য তার কাছে করে নাই কেহ উদ্‌ঘাটন !

গোলাপেরে নিষ্কণ্টক করি যারা করে সংস্কার
বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় লঙ্কার ঝালত্ব-করে দূর,
আমি কবি, দূর হ'তে তাহাদের করি নমস্কার
কণ্টকবিলাসী আমি ঝালে ঝাঁজে লোভ যে প্রচুর।

দংশন করিবে কিসে ? কিসে বল করিবে চর্ব্বণ ?
মরিয়া অনেক মুণ্ড প্রতীক্ষা যে করিছে সাগ্রহে !
নকল দন্তের জোরে সফল কি হবে, কহ, রণ ?
অতি পক্ক খুলিগুলি মোটেই যে অমজবুত নহে !

কায়াহীন ছায়ালোকে অশরীরী যে কবিত্ব-ভূত
মায়াময় মিথ্যা দিয়া নানা ধোঁয়া করিছে সৃজন
শুনো না তাহার কথা, জুয়াচোর সে অতি অদ্ভুত
যে পথে লইয়া যাবে ফাঁকা তাহা—নিতান্ত বিজন !

ফণী হবে ফণাহীন, দন্তহীন হইবে দন্তুর,
বিজ্ঞানী অসুর শেষে গানেরও কাড়িবে নাকি সুর ?

# পদ্মা
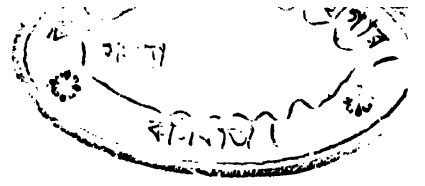
অধ্যাপক শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, এম. এস-সি., ডি. এস-সি.

শরতের পদ্মার বুকে সন্ধ্যা নামিতেছে। একূল ওকূল দেখা যায় না। যেদিকে সূর্য অস্ত গিয়াছে, সেদিকে এখনও একটা সোনালী রঙের ছোপ জলের উপর লাগিয়া আছে, জরির পাড়ের মতই ঝিক্‌মিক করিতেছে। মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া যাইতেছে, জলের উপরে ছোট ছোট ঢেউয়ের রাশি থরথর করিয়া যেন কাঁপিতেছে। আকাশে এখনও দুই এক ঝাঁক বক দ্রুত উড়িয়া যাইতেছে, একটু পরে আঁধার নামিলে আর তাহারা পথ দেখিতে পাইবে না।

ছোট একখানি পানসি। দুইটি মাঝি, দুইটি আরোহী। একখানি ছোট সাদা পাল বায়ুর চাপে ঈষৎ ফুলিয়া উঠিয়াছে। মৃদুমন্দ গতিতে পানসিখানি চলিয়াছে, ছোট ছোট ঢেউগুলি নৌকার নীচে মধুর কুলুকুলুধ্বনি তুলিয়াছে, পিছনের মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়া তামাক সেবন করিতেছে, দাঁড়ী দাঁড় ছাড়িয়া পালের দড়ি ধরিয়া বসিয়া আছে।

নৌকার মধ্যে একটি যুবক এবং একটি যুবতী, বীরেশ আর রমা, একখানি শতরঞ্জির উপর বসিয়া আছে। পাশে দুইটি সুটকেস, একটি ছোট বিছানা, একটি টিফিন-ক্যারিয়ার, একটি লণ্ঠন আর একটা ছাতা। দুইজনে দুইটি সুটকেসে হেলান দিয়া মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। রমা বলিল, সন্ধ্যা তো হয়ে এল, আর কতদূর ?

—আর বড় জোর ঘণ্টাখানেক।

—আমার কিন্তু ভয় করছে।

—ভয় কি ? আমরা তো প্রত্যেক বছরই কতবার ক'রে এ পথে যাতায়াত করছি। তুমি তো আগে কখনও আস নি, তাই। দেখ, কি সুন্দর নদী, কত বড়, সামনের ওই নৌকোখানা মনে হচ্ছে যেন একখানি ঝিনুক, বা তার চেয়েও ছোট !

—সত্যি, কি সুন্দর ওই পালগুলো, ঠিক যেন পাখীর ডানা ! কি সুন্দর বাতাস, এমন মিষ্টি বাতাস আমি জীবনে কখনও দেখি নি !

—তোমার কাছে তো এখন সবই মিষ্টি লাগবে।

—কেন, তোমার কাছে ?

—আমার কাছেও, রমা। এতদিন পরে আজ আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছি, একথা মনে হতেই আমার মন আনন্দে ভ'রে উঠছে। কি করব, ভেবে পাচ্ছি না।

—আঃ, আস্তে, ওই সামনে মাঝি ব'সে রয়েছে, তা বুঝি ভুলেই গেছ ?

—আমি আজ সবই ভুলে গেছি, রমা। আমার সব পাগলামিই সইতে হবে তোমায়। একটা গান গাইবে ?

—যাও ! এখন কি গান গাইব, মাঝিদের সামনে ?

—থাকগে মাঝি, তুমি গাও।

রমা সুটকেসের উপর মাথাটি রাখিয়া গুন্‌গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া—

গান শেষ হইলে, রমা বলিল, একটুতেই অমন হাঁপিয়ে উঠি কেন ?

—অমন হয়।

উভয়েই নীরব। একটু পরে বীরেশ একটু তন্দ্রাভিভূত হইল, রমা তাহার কোলের কাছে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খাইয়া উভয়েই জাগিয়া উঠিল। তখন বাতাস বেশ জোরে বহিতেছে, মাঝি তাড়াতাড়ি পাল নামাইয়া লইয়াছে। আকাশের ঈশান কোণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ক্রমশ ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। টপ্‌টপ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা নৌকার ছইয়ের উপর পড়িতেছে, মাঝিরা গামছা খুলিয়া মাথায় ও পিঠে দিয়াছে।

রমা ভীত হইয়া বলিল, কি হবে ?

—অত ভয় পাচ্ছ কেন ? আজকালকার ঝড়বৃষ্টি বেশিক্ষণ হয় না, এই আছে, এই নেই। একটু পরেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রমাকে অভয় দিলে কি হইবে ? বীরেশও রীতিমত ভয় পাইয়াছে। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। একটু আগে দুই একখানা নৌকার পাল দেখা যাইতেছিল, এখন তাহাও নাই। চারিদিকে শুধু জল আর জল, আর গাঢ় অন্ধকার। জল ও আকাশ অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। শন শন, শোঁ শোঁ, হু হু করিয়া বাতাস বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাঝি নিরুপায় হইয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছে, নৌকা যেদিকে ইচ্ছা ছুটিয়া চলিয়াছে ; কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে অত্যন্ত কাত হইয়া পড়িতেছে ; রমা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে, বীরেশ কম্পিতকণ্ঠে বৃথা অভয় দিবার চেষ্টা করিতেছে।

মাঝি বলিয়া উঠিল, বাবু, আর বুঝি পারি না। আতঙ্কে বীরেশ শিহরিয়া উঠিল, মূর্চ্ছিতপ্রায় রমাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিল। মাঝি পুনরায় বলিল, বাবু, নৌকা তো আর বাঁচে না।

বীরেশ এবার আর ভীত কম্পিত নয়। বজ্রমুষ্টিতে রমাকে ধরিয়া বলিল, অমন ক'রে থাকলে তো চলবে না, নৌকো বোধ হয় এখুনি ডুববে, আমাদেরও জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

রমাও যেন সহসা জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছে। বলিল, তা দোব, কিন্তু আমি যে সাঁতার জানি না।

—তা নাই জানলে। আমি যা বলি, করতে পারবে তো ?

—নিশ্চয়ই।

একটু পরেই জলে যেন একটা বিকট আলোড়ন সুরু হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ বাতাসের ধাক্কা খাইয়া নৌকাখানি কাত হইয়া প্রায় ডুবিয়া গেল। মাঝি দুইটি চীৎকার করিয়া উঠিল, ইয়া

আল্লা, আমাদের প্রাণ নিতে চাও নিও, কিন্তু ওই সোনার ঠাকরুণটিকে বাঁচিও।—ইহা বলিয়াই তাহারা জলে ঝাঁপ দিল।

বীরেশ এক টানে তাহার জামা ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিয়া রমাকে লইয়া জলে ঝাঁপ দিতেই নৌকাখানি ডুবিয়া স্রোতের টানে অদৃশ্য হইয়া গেল। বীরেশ বলিল, তুমি আমার পিঠের ওপর দিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে ভেসে থাক, আমি সাঁতরাতে থাকি; হয় কোন নৌকোর সঙ্গে দেখা হবে, কিংবা হয়তো একটা চড়া-টড়াতে গিয়ে ঠেকতে পারি।

রমা বীরেশের কথামত কাঁধে হাত দিয়া বলিল, এই রকম?

—হ্যাঁ, কি আশ্চর্য! সাঁতার-না-জানা লোকে এমন ক'রে সাবধানে আর একজনের কাঁধে হাত দিয়ে ভেসে থাকতে পারে, এ যে ভাবতেই পারছি না।

—কেন, তুমি যে বললে অমনি ক'রে থাকতে!

—তা তো বললুম, কিন্তু তুমি পারলে কি ক'রে তাই ভাবছি! যারা সাঁতার না জানে, তাদের অজ্ঞান ক'রে না ফেলে বাঁচানোই যায় না। কাছে কাউকে পেলে তারা নিরুপায় হয়ে জড়িয়ে ধরে, ছজনেই ডোবে। কিন্তু কি অসীম ধৈর্য তোমার!

—তুমি যে বললে!

—আমি তো বললুম, তুমি পারলে কি ক'রে?

—আমি যে বাংলার মেয়ে। আমি যে তোমারই রমা।

—রমা!

—কি?

—তুমি দেবী।

—হিঃ—হিঃ—হিঃ।

—কি, হাসলে যে?

—তোমার যা কথা।

—দেখ তো, কোন নৌকো-টৌকো নজরে পড়ে কিনা!

—কই, কিছুই তো দেখছি না! চারিদিকে তো ভীষণ অন্ধকার। তবে বাতাসটা একটু কমেছে।

—দেখ, কিছু মনে ক'র না, শাড়িখানা খুলে ফেলে দাও, একটু ভার কমুক, শেমিজ থাক।

—আচ্ছা, এই ফেলে দিলাম, তোমার খুব পরিশ্রম হচ্ছে, না?

—এখনও তেমন হচ্ছে না, তবে—

—তাই তো, কোথাও কোন কিছুর চিহ্ন দেখা যায় না। আকাশটা কিন্তু একটু পরিষ্কার হচ্ছে।

—হ্যাঁ, ওই দেখ, চাঁদও যেন উঠছে একটু একটু ক'রে। দেখ, আমি যেন একটু ক্লান্ত বোধ করছি। একা তো পাঁচ ছ ঘণ্টা অনায়াসে সাঁতরাতে পারি, কিন্তু—

—আমাকে নিয়ে আর কতক্ষণ সাঁতরাবে বল! আচ্ছা, ওই একখানা নৌকোর পাল না— চাঁদের আলোয় চক্‌চক করছে?

—হ্যাঁ, পালই তো, কিন্তু ও যে অনেক দূর, অতদূর পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। তা ছাড়া ও নৌকোটা কোন্ দিকে যাচ্ছে তাই বা কে জানে! দেখ, আমার হাত দুটো যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে।

—তাই তো! তা হ'লে আমি তোমাকে ছেড়ে দিই।

—সেকি! সে কখনও হতে পারে না, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না, ডুবতে হয় দুজনেই ডুবব।

—পাগলামি ক'র না। আমি মেয়েমানুষ, আমি গেলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। তুমি বাঁচবার চেষ্টা কর। পুরুষ তুমি, তোমার অনেক শক্তি, অনেক সুযোগ, অনেক দায়িত্ব, আমার জন্যে নিজেকে বিসর্জন দিও না। পরিবারের জন্যে, সমাজের জন্যে অনেক কাজ তোমায় করতে হবে। তুমি থাক, আমি বরং যাই। তুমি একা একা দু তিন ঘণ্টা সাঁতরাতে পারলেও হয়তো একটা আশ্রয় মিলবে। অনুমতি দাও, আমি যাই।

—একি অদ্ভুত ব্যাপার, রমা! এমন ক'রে স্বামীর গায়ে হাত রেখে, ভেবে-চিন্তে নিশ্চিন্তমনে কেউ প্রাণ দিতে পারে, এ যে কল্পনাও করতে পারছি না, রমা! কি দিয়ে গড়া তোমার দেহ? কি দিয়ে গড়া তোমার মন? কি দিয়ে গড়া তোমার প্রাণ? এই ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যেই কি ভগবান তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন? মানুষ যে মানুষের চেয়ে কত বড়, তা তো তোমাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না! না, রমা, আমি তোমায় ছাড়ব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আর তো পারছি না।

—ছিঃ, আবার ওই কথা! লক্ষ্মীটি, আমায় যেতে দাও।

—কি ক'রে এ কথা বলছ তুমি? মানুষে এ পারে কেমন ক'রে?

—আমি যে বাঙালীর মেয়ে। আমরা সব করতে পারি, প্রাণ দেওয়া তো অতি তুচ্ছ। যাক, তুমি অত্যন্ত হাঁপিয়ে উঠেছ, আর না, লক্ষ্মীটি একবার ঘাড়টি একটু ফেরাতে পারবে? এই অসীম জলরাশির মধ্যে, এই অসীম আকাশের নীচে, এই অসীম জ্যোৎস্নালোকে আমার অসীম সাধনার ধন, তোমার ওই ক্লান্তশ্রান্ত মুখখানি একবার জন্মের মত দেখে যাই। আচ্ছা, যাই।

রমা ধীরে বীরেশের কাঁধ হইতে তাহার ক্ষীণ হাত দুইটি সরাইয়া লইল, এবং তৎক্ষণাৎ পদ্মার জলরাশি পূজার নৈবেদ্যের মতই এই মহীয়সী রমণীমূর্তিটি আত্মসাৎ করিল। অর্ধচেতন, অর্ধ-অসার, অর্ধ-অবশ বীরেশ চাহিয়া দেখিল, অনতিদূরেই তাহার সাধের প্রতিমা বিসর্জিত হইল, বোধ হয় শ্বাসরোধজনিত অসহ বেদনায় কাতর রমার একখানি হাতের চম্পককলিসদৃশ কোমল আঙুল কয়টি একবার জলের উপরে দেখা গেল, বীরেশেরই দেওয়া আঙটিটি তাহার অনামিকায় চাঁদের আলোয় যেন একবার চিক্‌চিক করিয়া উঠিল, তাহার পরেই সব শেষ। বীরেশের হৃৎপিণ্ডটা যেন কে ছিঁড়িয়া লইল।

একান্ত মুমূর্ষু বীরেশ যেন শুধু আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণাবশতই চিৎ হইয়া নিজের অতি শ্রান্ত দেহটিকে কোনমতে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেই তাহার মাথাটা কিসে যেন ঠেকিল! হাত বাড়াইয়া দেখে, একটা চড়া।

একি নির্মম উপহাস তোমার, বিধাতা!—বলিয়াই বীরেশ বালুর চড়ার উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

# বিপিনের সংসার

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

মাসী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জবাব দিল, আচ্ছা, হয়েছে ঢের, আর বলার কাজ নেই বাপু। বেলা হয়েছে, চললাম আমি। কদিন আছ এখানে ?

—মঙ্গলবার সন্দেবেলা কি বুধবার সকালে যাব। মাসীমা, যা বললাম কথাটা মনে রেখ। টাকাটা যদি যোগাড় ক'রে দিতে পারতে, তবে বড্ড উপকার হ'ত। তোমার কাছে না চাইব তো কার কাছে চাইব, বল!

কামিনী সে কথায় তত কান না দিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, তোমার পাইককে কি ওই নটবরের ছেলেটাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও, পেঁপে পেকেছে সঙ্গে দেব।

মঙ্গলবার বৈকালে কামিনীর কাছে পাওয়া গেল পঁচিশটি টাকা। ধোপাখালির হাট হইতে একটি টাকা খরচ করিয়া জমিদার-গিন্নীর ফরমাসমত জিনিসপত্র কিনিয়া বিপিন বুধবার শেষ-রাত্রির দিকে গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হইল এবং বেলা দশটার সময় পলাশপুর আসিয়া পৌঁছিল।

জমিদার-বাড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বে শুনিল, জামাইবাবু কাল রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জমিদারবাবুর অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া তেমন বড় পাত্রে মেয়েকে দিতে পারেন নাই। জামাই আইন পাস করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে—পৈতৃক বাড়ি, যদিও দেশ এই পলাশপুরের কাছেই নোনাপাড়া।

তরিতরকারির ধামা গরুর গাড়ি হইতে নামাইতে দেখিয়া জমিদার-গৃহিণী খুশি হইয়া বলিলেন, ওই দেখ, বিপিন মহল থেকে কত জিনিসপত্র এনেছে! বড় কুমড়োটা কে দিলে বিপিন? কি চমৎকার কুমড়োটি!

বিপিন বলিল, দেবে আবার কে? কাল হাটে কেনা।

—আর এই পটল, ঝিঙে, শাকের ডাঁটা?

—ও সব হাটে কেনা। দেবে কে বলুন, কার দোরেই বা আমি চাইতে যাব?

—ওমা, সব হাটে কেনা! তা এত জিনিস পয়সা খরচ ক'রে না আনলেই হ'ত। মহল থেকে আগে তো দেখেছি কত জিনিসপত্র আসত, তোমার বাবাই আনতেন, আর আজকাল ছাই বলতে রাইও তো কখনও দেখি নে। ওটা কি, মাছ দেখছি যে, বেশ মাছ! ওটাও কেনা নাকি?

—আড়াই সের, সাত আনা দরে, সাড়ে সতেরো আনায় নগদ কেনা।

জমিদার-গিন্নী বিরক্ত মুখে বলিলেন, কে বাপু তোমায় বলেছিল নগদ পয়সা ফেলে আড়াই সের মাছ কিনে আনতে? মহলে নেই এক পয়সা আদায়, এর ওপর তরিতরকারি মাছে দু টাকার ওপর খরচ ক'রে ফেলতে কে বলেছিল, জিগ্যেস করি?

বিপিন বলিল, দু টাকার ওপর কি বলছেন? সাড়ে তিন টাকা খরচ হয়েছে। আপনি সেই এক নাগরি আখের গুড় আনতে বলেছিলেন, তাও এনেছি। সাড়ে সাত সের নাগরি, তিন আনা ক'রে সের হিসেবে—

জমিদার-গিন্নী রাগিয়া বলিলেন, থাক, আর হিসেব দেখাতে হবে না। যেখানে হিসেব দেখাবার সেখানে দেখিও। তোমাকে আমি ওসব কিনে আনতে কি বলেছিলাম যে আমার কাছে হিসেব দেখাচ্ছ?

বিপিন মনে মনে ভাবিল, বেশ হয়েছে, মরছেন জ্ব'লে পয়সা খরচ হয়েছে ব'লে। কি কঞ্জুষ আর কি ছোট নজর রে বাবা!

মুখে সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জামাইটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল বিকালের দিকে। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ বছর, একটু হৃষ্টপুষ্ট, চোখে চশমা, গম্ভীর মুখ—বৈঠকখানায় বসিয়া কি ইংরেজী কাগজ পড়িতেছিলেন। বিপিন বার কয়েক বৈঠকখানায় যাওয়া-আসা করিল বটে, কিন্তু জামাইবাবু বোধ করি তাহার অস্তিত্বের প্রতি বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়াই একমনে খবরের কাগজ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

বিপিনের রাগ হইল। তখনই সে সংকল্প করিল, সেও দেখাইবে, বড় লোকের জামাইকে সে গ্রাহ্যও করে না। তুমি আছ বড় লোকের জামাই, তা আমার কি?

বিপিন বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিয়া ফরাস বিছানো চৌকির এক পাশে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ নিঃশব্দে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, জামাইবাবু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না বা একটা কথাও বলিলেন না।

বিপিন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল এবং ইচ্ছা করিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল এমন ভাবে যাহাতে জামাইয়ের চোখে পড়ে।

জামাইবাবু বোধ হয় এবার ধূম্র হইতে বহ্নিমান পর্ব্বতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইলেন। বিপিনকে তিনি চেনেন, বিবাহের পর দুই তিন বার দেখিয়াছেন, শ্বশুরের জমিদারির জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়া জানেন। তাহাকে এরূপ নির্ব্বিকার ও বেপরোয়া ভাবে তাঁহার সম্মুখে বিড়ি ধরাইয়া খাইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত তো হইলেনই, লোকটার বেয়াদবিতে একটু রাগও হইল।

কিন্তু সে বেয়াদবি সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক করিয়া দিল, যখন সেই লোকটা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, জামাইবাবু, কেমন আছেন? চিনতে পারেন? বিড়ি-টিড়ি খান নাকি? নিন না, আমার কাছে আছে।

কথা শেষ করিয়া লোকটা একটা দেশলাই ও বিড়ি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিতে আসিল। লোকটা নিতান্ত বেয়াদব ও অসভ্য।

জামাইবাবু বিপিনের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, থাক, আছে আমার কাছে।—বলিয়া পকেট হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেটের কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট

ধরাইলেন। বিপিন ইহাতে অপমানিত মনে করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য পাল্টা অপমানের অন্য কোন ফাঁক খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, জামাইবাবুর ও কি সিগারেট? একটা এদিকে দিন দিকি!

বাড়ির গোমস্তা জমিদারবাবুর জামাইয়ের নিকট সিগারেট চায়, ইহার অপেক্ষা বেয়াদবি ও অপমান আর কি হইতে পারে? বিপিন সিগারেটের জন্য গ্রাহ্যও করে না; কিন্তু লোকটাকে অপমান করিয়াই তাহার সুখ।

জামাইবাবু কিন্তু রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

বিপিন সিগারেট ধরাইয়া বলিল, তারপর জামাইবাবু, কবে এলেন?

—কাল রাত্রে।

—বাড়ির সব ভাল তো?

—হুঁ।

—আপনি এখন সেই আলিপুরেই ওকালতি করছেন?

—হুঁ।

—বেশ বেশ। দিদিমণি আর ছেলেপুলেদের সব এখানে এনেছেন নাকি?

—হুঁ।

এতগুলি কথার উত্তর দিতে গিয়া জামাইবাবু একবারও তাহার দিকে চাহিলেন না বা খবরের কাগজ সেই যে আবার চোখের সামনে ধরিয়া আছেন তাহা হইতে চোখও নামাইলেন না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল, আরও একটু শিক্ষা দেয় এই শহুরে চালবাজ লোকটাকে। অন্য কোনও উপায় না ঠাওরাইতে পারিয়া বলিল, মানীর শরীর বেশ ভাল আছে তো?

মানী জমিদারবাবুর মেয়ে সুলতার ডাকনাম। ডাকনামে গ্রামের মেয়েকে ডাকা এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, যদি বিপিনের বয়স বেশি হইত। কিন্তু তাহার বয়স জামাইয়ের চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়, বা সুলতাও নিতান্ত বালিকা নয়, কম করিয়া ধরিলেও সুলতা বাইশ বছরে পড়িয়াছে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে।

এইবার প্রত্যাশিত ফল ফলিল বোধ হয়, জামাইবাবু হঠাৎ মুখ হইতে খবরের কাগজ নামাইয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া একটু কড়া গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করিলেন, মানী কে?

অর্থাৎ মানী কে তিনি ভাল রকমেই জানেন, কিন্তু জমিদার-বাড়ির মেয়েকে 'মানী' বলিয়া সম্বোধন করিবার বেয়াদবি তোমার কি করিয়া হইল—ভাবখানা এইরূপ।

বিপিন বলিল, মানী মানে দিদিমণি—বাবুর মেয়ে, আমরা মানী ব'লেই জানি কিনা। আমাদের চোখের সামনে মানুষ—

ঠিক এই সময়ে চা ও জলযোগের জন্য অন্দর-বাড়ি হইতে জামাইবাবুর ডাক পড়িল।

বিপিন বসিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল, শহুরে জামাইবাবুর চালবাজি সে ভাঙিয়া দিয়াছে।

বিপিনকে এখনও চেনে নাই। চাকুরির পরোয়া সে করে না, আর কেহ যে তাহার সামনে চাল দেখাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া রাখিবে—তাহার ইহা অসহ্য।

ঝি আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, মা-ঠাকরুণ বললেন, আপনি কি এখন জল-টল কিছু খাবেন ?

রাগে বিপিনের গা জ্বলিয়া গেল। এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে অতি বড় নির্লজ্জ লোকও কি বলিতে পারে যে সে খাইবে ? ইহাই ইহাদের বলিয়া পাঠাইবার ধরণ। সাধে কি সে এখানে থাকিতে নারাজ !

রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই ধরণের ব্যাপার অন্য রূপ লইয়া দেখা দিল।

দালানের একপাশে জামাইবাবু ও তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। জামাইয়ের পাতের চারিদিকে আঠারোটা বাটি, তাহাকে দিবার সময় সব জিনিসই পাতে দিয়া যাইতেছে। তাহার পরে দেখা গেল, জামাইবাবুর পাতে পড়িল পোলাও, তাহার পাতে সাদা ভাত। অথচ বিপিন বিকাল হইতেই খুসির সহিত ভাবিয়াছে, রাত্রে পোলাও খাওয়া যাইবে। পোলাও রান্নার কথা সে জানিত।

কি ভাগ্য, জামাইয়ের পাতে লুচি দেওয়ার সময় জমিদার-গিন্নী তাহার পাতেও খান চার লুচি দিলেন !

বিপিন খাইয়ে লোক, চারখানি লুচি শেষ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া জমিদার-গিন্নী বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব।

ইহা জিজ্ঞাসা নয়, দিব্য পরিস্ফুট স্বগত উক্তি। অর্থাৎ ইহা শুনিয়া যদি বিপিন লুচি আনিতে বারণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিপিন তরুণ যুবক, ক্ষুধাও তাহার যথেষ্ট। চক্ষুলজ্জা করিলে তাহার চলে না। সে চুপ করিয়া রহিল। জমিদার-গিন্নী আবার চারখানা গরম লুচি আনিয়া তাহার পাতে দিলেন, বিপিন সে কখানা শেষ করিতে এবার কিছু বিলম্ব করিল, চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া। কারণ, ওদিকে জামাইবাবু হাত গুটাইয়াছেন। জমিদার-গিন্নী ঘরের দোরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ; বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব।

ইহাও জিজ্ঞাসা নয়, পূর্ব্ববৎ স্বগত উক্তি, তবে বিপিনকে শুনাইয়া বটে। বিপিন ভাবিল, ভাল মুস্কিলে পড়া গেল ! লুচি দেব, লুচি দেব ! দেবার ইচ্ছে হয় দিয়ে ফেললেই তো হয়, মুখে অমন বলার কি দরকার ?

জমিদার-গৃহিণী যদি ভাবিয়া থাকেন যে, বিপিন আর লুচি আনিতে বারণ করিবে, তবে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল, বিপিন কোন কথা কহিল না। আবার চারখানা লুচি আসিল।

এবার লুচি কয়খানি শেষ হইবার আগেই বিপিন বলিল, মাসীমা, লুচি-টুচি খাওয়া আমার তেমন অভ্যেস নেই, দুটি ভাত আমায় দিতে বলুন।

—কেন, ভাত কেন ? লুচিই এনে দিই।

চারখানি করিয়া ফুলকো লুচিতে বিপিনের কি হইবে ? সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, খাইতে

পারে, ওরকম এক ধামা লুচি হইলে তবে তাহার কুলায়। কাজেই সে বলিল, না মাসীমা, লুচি খাওয়া অভ্যেস নেই, ভাত না হ'লে যেন খেয়ে তৃপ্তি হয় না, যদি ভাত থাকে—

জমিদার-গিন্নী ভাত আনিয়া দিলেন, মনে হইল তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। বিপিন মনে মনে হাসিল।

খাওয়া শেষ করিয়া সে বাহিরের ঘরে যাইতেছে, রোয়াকের কোণের ঘরের জানালার কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে কে ডাকিল, ও বিপিনদা!

বিপিন চাহিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া ঘরের ভিতরে জমিদারবাবুর মেয়ে মানী দাঁড়াইয়া আছে।

মানী দেখিতে বেশ সুশ্রী, রংও ওর মায়ের মত ফর্সা, এখনও একহারা চেহারা আছে, তবে বয়স হইলে মায়ের মত মোটা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, বেশভূষার প্রতি চিরকালই তাহার সযত্ন দৃষ্টি, এখনও যে ধরণের একখানি রঙিন শাড়ি ও হাফ-হাতা ব্লাউজ পরিয়া আছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা তেমন আটপৌরে সাজ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না, একথা বিপিনের মনে হইল।

বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জে যখন এঁদের স্টেটে নায়েব ছিলেন, বিপিন বাপের সঙ্গে বাল্য-কালে কত আসিত এঁদের বাড়িতে, মানীর তখন নয় দশ বছর বয়স। মানীর সঙ্গে সে কত খেলা করিয়াছে, মানীর সাহায্যে উপরের ঘরের ভাঁড়ার হইতে আমসত্ত্ব ও কুলের আচার চুরি করিয়া দুইজনে সিঁড়ির ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া খাইয়াছে, মানীর পড়া বলিয়া দিয়াছে, বিপিনের পৈতা হইবার পর মানী একবার বিপিনের ভাতের থালায় নিজের পাত হইতে কি একটা তুলিয়া দিয়া বিপিনের খাওয়া নষ্ট করার জন্য মায়ের নিকট হইতে খুব বকুনি খায়। সেই মানী, কত বড় হইয়া গিয়াছে! ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

বিপিন বলিল, মানী, কেমন আছ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বিপিনদা?

বিপিনের মনে হইল, তাহার সহিত কথা বলিবার জন্যই মানী এই জানালার ধারে অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

মানীকে এক সময় বিপিন যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিত, ভালবাসা হয়তো তখনও ঠিক জন্মায় নাই; কিন্তু বিপিনের সন্দেহ হয়, মানী তাহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহাকে শুধু 'স্নেহ' বা 'শ্রদ্ধা' বলিলে ভুল হইবে, তাহা আরও বড়, ভালবাসা ছাড়া তাহার অন্য কোন নাম দেওয়া বোধ হয় চলে না।

মানীর কথা বিপিন অনেকবার ভাবিয়াছে। এক সময়ে মানী ছিল তাহার চোখে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ। মনোরমাকে বিবাহ করিবার সময় বাসরঘরে মানীর মুখ কতবার মনে আসিয়াছে। তবে সে সব আজ ছয় সাত বছরের কথা, তাহার নিজের বয়সই হইতে চলিল সাতাশ আটাশ।

বিপিন বলিল, খুব ভাল আছি। তুমি যে মাথায় খুব বড় হয়ে গিয়েছ মানী?

—বিপিনদা, ওরকম ক'রে কথা বলছ কেন? আমি কি নতুন লোক এলাম?

বিপিনের মনে পড়িল, মানীকে সে কখনো 'তুমি' বলে নাই, চিরকাল 'তুই' বলিয়া আসিয়াছে; এখন অনেক দিন পরে দেখা, প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, বলিল, কলকাতার লোক এখন তোরা, তুই কি আর সেই পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট মানীটি আছিস?

—তুমি কি আমাদের কাছারিতে কাজে ঢুকেছ?

—হ্যাঁ। না ঢুকে করি কি, সংসার একেবারে অচল। তোর কাছে বলতে কোনও দোষ নেই মানী, যেদিন এখানে এলুম এবার, না হাতে একটি পয়সা, না ঘরে একমুঠো চাল। আর ধর লেখাপড়াই বা কি জানি, কিছুই না।

—কিন্তু তুমি এখানে টিকতে পারবে না বিপিনদা। তুমি ঘোর খামখেয়ালী মানুষ, তোমায় আর আমি চিনে নে? বিনোদকাকা যে রকম ক'রে কাজ ক'রে টিকে থেকে গিয়েছেন, তুমি কি তেমন পারবে? আজই কি সব করেছ, দু তিন টাকা খরচ ক'রে দিয়েছ—মা বলছিলেন বাবাকে।—বলিয়া মানী হাসিল।

বিপিন বলিল, যদি খরচই ক'রে থাকি, সে তো তোদেরই জন্যে। তুই এসেছিস্ এতকাল পরে, একটু ভাল মাছ না খেতে পেলে তুইই বা কি ভাববি?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মহল থেকে মাছ আনলে না কেন?

—কে মাছ দেবে বিনি পয়সায় তোমাদের মহালে? বাবার আমলের সে ব্যাপার আর আছে নাকি? এখন লোক হয়ে গিয়েছে চালাক, তাদের চোখ কান ফুটেছে। তোমার মা কি সে খবর রাখেন?

—তা নয়, বিনোদকাকার মত ডানপিটে হুঁদেও তো তুমি নও বিপিনদা। তুমি ভাল মানুষ ধরণের লোক, জমিদারির কাজ করা তোমার দ্বারা হবে না।

শেষ কথাগুলি মানী যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল।

বিপিন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তাই তো রে মানী, একেই না বলে জমিদারের মেয়ে! দস্তুরমত জমিদারি চালের কথাবার্ত্তা হচ্ছে যে!

মানী বলিল, কেন হবে না, বল? আমি জমিদারের মেয়ে তো বটেই, সংস্কৃত তো পড়ছি বিপিনদা, সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—সিংহের বাচ্চা জন্মেই হাতীর মুণ্ড খায় আর—

—থাক্ থাক্, তোর আর সংস্কৃত বিদ্যে দেখাতে হবে না, ও সবের ধার মাড়াই নি কখনও। আচ্ছা, আসি মানী, রাত হয়ে যাচ্ছে।

মানী বলিল, শোন শোন, যেও না, রাত এখন তো ভারী! আচ্ছা বিপিনদা, ভারী দুঃখ হয় আমার, লেখাপড়াটা কেন ভাল ক'রে শিখলে না? তোমার চেহারা ভাল, লেখাপড়া শিখলে চাকরিতে তোমায় যেচে আদর ক'রে নিত—এ আমি বলতে পারি।

বিপিন বলিল, আচ্ছা মানী, একবার তুই আর আমি ভাঁড়ারঘর থেকে কুলচুর চুরি ক'রে খেয়েছিলাম, মনে পড়ে? সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছিলুম?

মানী বলিল, তা আর মনে নেই! সে সব এক দিন গিয়েছে! কিন্তু আমার কথা ওভাবে চাপা দিলে চলবে না। লেখাপড়া শিখলে না কেন, বল?

বিপিন হাসিয়া বলিল, উঃ, কি আমার কৈফিয়ৎ-তলবকারিণী রে!

পরে ঈষৎ গম্ভীরমুখে বলিল, সে অনেক কথা। সে কথা তোর শুনে দরকারও নেই। তবে তোর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। হ'ল কি জানিস? বাবা মারা গেলেন বিস্তর বিষয়সম্পত্তি ও কাঁচা টাকা রেখে। আমি তখন সবে আঠারোতে পা দিয়েছি, মাথার ওপর কেউ নেই। টাকা উড়ুতে আরম্ভ ক'রে দিলাম, পড়াশুনো ছাড়লাম, বিষয়সম্পত্তি নগদ টাকা পেয়ে কম দরে মৌরসী বিলি করতে লাগলুম। বদখেয়ালের পরামর্শ দেবারও লোক জুটে গেল অনেক। কতদূর যে নেমে গেলাম—

মানী একমনে শুনিতেছিল, শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বল কি বিপিনদা!

—তোর কাছে বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই, সঙ্কোচ হ'লেও কোনও কথা লুকোব না। আজ এত দুঃখু পাব কেন মানী, এখানে চাকরি করতে আসব কেন? কিন্তু এখন বয়েস হয়ে বুঝেছি, কি ক'রেই হাতের লক্ষ্মী ইচ্ছে ক'রে বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম তখন!

—তারপর?

—তারপর ওই যে বলছিলাম, নানা রকম বদখেয়ালে টাকাগুলো এবং বিষয়-আশয় জলাঞ্জলি দিয়ে শেষে পড়লাম ঘোর দুর্দ্দশায়। খেতে পাই নে—এমন দশায় এসে পৌঁছুলাম।

মানীর মুখ দিয়া এক ধরণের অস্ফুট বিস্ময় ও সহানুভূতির স্বর বাহির হইল, বোধ হয় তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে। বিপিনের বড় ভালো লাগিল মানীর এই দরদ ও তাহার সতেজ সহজ সজীব সহানুভূতি।

—সে সব কথাগুলো তোর কাছে বলব না। মিছে তোর মনে কষ্ট দেওয়া হবে। এই রকমে দেড় বছর কেটে গেল, তারপর তোর বাবার কাছে এলুম চাকরির চেষ্টায়, চাকরি পেয়েও গেলাম। এই হ'ল আমার ইতিহাস। তবে এ চাকরি পোষাবে না, সত্যি বলছি। এ আমার অদৃষ্টে টিকবে না। দেখি, অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে—

মানী অত্যন্ত একমনে কথাগুলি শুনিতেছিল। গম্ভীর মুখে বলিল, একটা কথা আমার শুনবে?

—কি?

আমায় না জানিয়ে তুমি এ চাকরি ছাড়বে না, বল?

—সে কথা দেওয়া শক্ত মানী। সত্যি বলছি, তুই এসেছিস এখানে তাই, নইলে বোধ হয় এবার বাড়ি থেকে আসতাম না। তবে যে কদিন তুই আছিস, সে কদিন আমিও থাকব। তারপর কি হয় বলতে পারছি নে।

—চিরকালটা তোমার একভাবে গেল বিপিনদা। নিজের গোঁ ও বুদ্ধিতে কষ্ট পেলে চিরদিন। আমার কথা একটিবার রাখ বিপিনদা, তেজ দেখানোটা একবারের জন্যে বন্ধ রাখ। আমায় না জানিয়ে চাকরি ছেড়ো না, আমি তোমার ভালোর চেষ্টাই করব।

বিপিন হাস্যমিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, উঃ, মানী পরের উপকারে মন দিয়েছে দেখছি! এমন মূর্ত্তিতে তো তোকে কখনও দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না মানী?

মানী রাগতভাবে বলিল, আবার!

—না না, আচ্ছা তোর কথাই শুনব, যা। রাগ করিস নে।

—কথা দিলে?

এই সময় ঘরের মধ্যে মানীর ছোট ভাই সুধীর আসিয়া পড়াতে মানী পিছন ফিরিয়া চাহিল। বিপিন তাড়াতাড়ি বলিল, চলি মানী, শুইগে, রাত হয়েছে। শরীর ক্লান্ত আছে খুব, সারাদিন মহালে ঘুরেছি টো টো ক'রে রদ্দুরে।

[ ক্রমশ ]

# পত্র

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত )

আশ্বাস ছিল প্রাণ ছিল যতখণ;
ধুক্‌ধুক্-করা কচি-বুকে ছিল মোর কবিতার প্রাণ।
থেমেছে যন্ত্র, কবিতা বন্ধ, ঠেকিবে অর্থহীন,
অবোধ মনের অবাধ কথার মালা;
কবিতা লিখিয়া মনেতে লজ্জা মানি।
কেহ নাই জেগে, পৃথিবী ঘুমায়, ঘুমাইবে চিরকাল,
জেগে আছে শুধু নামধামহীন অন্ধ আতুর ক্ষুধা—
মহাকাল-বুকে মহাকালী যার নাম।
জীবন-নদীতে মৃত্যুর চোরাবালি—
ঘোরে অবিরাম, টানিতেছে নীচে আবর্ত্ত ভয়াবহ,
ভেসে থাকে যারা দেখে বিস্ময়ে একটি দুইটি করি
পথের সঙ্গী মিলায় ঘূর্ণীজলে।
অসহায় শিশু সেও ডুবে যায়, শুধু দুটি কচি হাত
জাগিয়া শূন্যে নিমেষে মিলায় শেষ নির্ভর খুঁজি;
চেয়ে চেয়ে দেখি, ভাসি কালস্রোতোজলে—
অনন্ত মহামৃত্যুর মাঝে জীবন ক্ষণবিকার।

তুমি তো বন্ধু, জীবনে দেখেছ সব ক্ষতি ক্ষোভ মাঝে,
মরণে দেখেছ মুক্তি অথবা মহাবিভীষিকা রূপে।
দেখেছ লিখেছ সহৃদয় প্রেমে নর-বুদ্‌বুদ-কথা,
কেন তারা জাগে, কেন রঙ ধরে, বুদ্‌বুদ-আবরণ
হর্ষে ব্যথায় কেমনে ফাটিয়া যায়;
আমিও বন্ধু, স্রোতে ভাসিতেছি এইটুকু পরিচয়,
সংগ্রহ করি যতটুকু দেখি বুদ্‌বুদ-ইতিহাস—
মুখে যাই থাক, বুকেতে আমার নাই সান্ত্বনা-ভাষা।
কারেও ভাসায়ে কারে আবর্ত্তে টানি
মহাকাল-পথে চালান যে জন তাঁহারে নমস্কার।

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

# আধুনিকতা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

চিরকাল যে বাটখারা দিয়া অসঙ্কোচে ওজন করিয়া আসিতেছি, মাঝে মাঝে সেটাকে ওজন করিয়া দেখা দরকার, মাপে ঠিক আছে কি না। ইতিহাসে এমন সময় এক একবার আসে, সেটাকে আমরা বলি যুগসন্ধি। বহুদিনের ব্যবহারে বাটখারা ক্ষইয়া যায়, যদিও উপরের অঙ্কপাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এমন লোহা আছে কি কালের সংস্পর্শে যা ক্ষয় না পায়?

ইতিহাসে এমন একটা যুগ আসিয়াছে, অন্তত বাংলা দেশের ইতিহাসে যে আসিয়াছে, তার আর সন্দেহ নাই। বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ যে বাটখারায় জীবনের পরিমাপ আরম্ভ করিয়াছে, তার নাম আধুনিকতা। আমরা একবার আধুনিকতার ওজন করিয়া দেখিব, বাটখারা ঠিক আছে কি না।

আধুনিকতা বাংলা দেশে খুব আধুনিক নয়; নূতনত্ব মানেই যা কালক্রমে পুরাতন হয়। একশো বছরের বেশি হইল, রামমোহন রায় একদিন পুরাতন বাটখারাগুলাকে ফেলিয়া দিয়া নূতন বাটখারা দিয়া জীবনের মাপ স্বুরু করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁকে দুর্ভোগ কম সহ্য করিতে হয় নাই; বিরুদ্ধ-পক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সেই নূতন বাটখারাই গ্রহণ করিয়াছে, এবং জীবনের মূল্যনির্দ্ধারণ সেই মাপেই হইতেছে; সেদিনের বিরুদ্ধপক্ষের আপত্তি ক্রমে প্রশংসার আকার ধরিয়াছে।

আজও আমরা সেই বাটখারার মাপেই জীবনকে গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু ক্রমে সন্দেহ জাগিতেছে; ওই পরিমাপে যে বস্তু কিনিতেছি তার পরিমাণ যেন কম, পুরা দাম দিয়া জিনিস ঘরে আনিতেছি, কিন্তু আয়ে কুলাইতেছে না—যেখানে দশ দিন চলিবার কথা, সেখানে সপ্তাহকালও যাইতেছে না; যে পরিমাণে স্বাস্থ্য ও স্বাদ আশা করা যাইতেছে, তেমন পাইতেছি কই? আনন্দের রং তেমন আর গাঢ় নয়। মনে মনে যে সংশয় ছিল, মুখে মুখে তা বাজার-গুজব আকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বহুদিনের ব্যবহারে বাটখারার তলা ক্ষইয়া গিয়াছে; পাল্লায় পুরা জিনিস আর উঠিতেছে না; একবার বাটখারাগুলা ওজন করিয়া দেখা যাক না।

সাহিত্যের দিক দিয়াই প্রধানত আলোচনা করিব; তার মানে নয় যে, সাহিত্যকে আমরা জীবনের চেয়ে বড় মনে করি। কিন্তু আকস্মিকতা ও সাধনার যুগ্ম হাতের ঠেলায় বাঙালীর কাছে অন্তত সাহিত্য জীবনের চেয়ে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এটাই বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির ট্র্যাজেডি। রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগের সাহিত্য যত বড় হোক না কেন, তখনকার জীবন-ব্যাপার তার চেয়ে অনেক উদার ছিল; ইংলণ্ডের ভিত্তি তখন সাত সমুদ্রের পারে আপন বনিয়াদ পাকা করিতেছিল; এত বড় ভিত্তি পাইয়াছিল বলিয়াই শেক্সপীয়র-বেকন-স্পেন্সার সাহিত্য-সৌধকে অত উঁচু করিয়া গড়িতে পারিয়াছিলেন।

মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বাংলা দেশের সে প্রশস্ত ভিত্তি কোথায়? এঁরা মুষ্টিমেয় বাঙালী জীবনের ক্ষেত্রে অলৌকিক মণিসৌধ গড়িয়াছেন; এ সৌধ ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তি—সমগ্র বাঙালী জাতির নয়। ইতিহাস-লক্ষ্মী প্রসন্ন হইলে যে জীবন-বনিয়াদ বহুব্যাপ্ত উদারতা লাভ করিতে পারে, দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালীর অদৃষ্টে তা ঘটে নাই; জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতার চাপে সাহিত্যের উৎস তীব্র উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়াছে; সঙ্কীর্ণতার বজ্র-আঁটুনি যত দৃঢ়, উৎসের ঊর্দ্ধগতি তত উচ্ছল। এই উৎসের উচ্ছলতায় আমাদের দৃষ্টি এমন আকৃষ্ট যে, জীবনের প্রতি আমাদের মনোযোগের অভাব। তাই বলিতেছিলাম, ইতিহাসের আকস্মিকতা ও ব্যক্তিগত প্রতিভার সাধনা মিলিয়া বাঙালীর কাছে জীবনের চেয়ে সাহিত্যকে বড় করিয়া তুলিয়াছে।

মধুসূদনকে তাঁর সময়ের লোকে গালি দিত সাহেব বলিয়া, ওটার বর্ত্তমান পরিভাষা হইতে পারে আধুনিক। বাস্তবিক মধুসূদন উগ্র-আধুনিক ছিলেন। কিন্তু আধুনিকতা তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, হাব-ভাব ভেদ করিয়া মগজ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। তিনি ইংরেজীতে কাব্য লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কাব্যের ভাষা যাই হোক, উপজীব্য ছিল ভারতীয় জীবন। তিনি বিলাত গিয়া বুঝিয়াছিলেন, বিলাতের মাটি বিলাতী-মাটি, তা দিয়া এদেশের শান বাঁধানো চলে, কিন্তু এদেশের প্রাণ তাতে পল্লবিত হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রও মধুসূদনের ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু তা আরও অল্পকালব্যাপী। তিনি প্রথম উপন্যাস ইংরেজীতে লিখিয়াছিলেন; বুঝিলেন, ভুল পথ লইয়াছেন; সে উপন্যাস বাংলায় কিয়দংশ অনুবাদ করিলেন; বুঝিলেন, ভুল সম্পূর্ণরূপে সংশোধন হয় নাই; তখন একেবারে বাংলায় উপন্যাস আরম্ভ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঠনঠনিয়ার চটির কথাই আমরা মনে রাখি, কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, তিনি বই বিলাতে পাঠাইয়া বাঁধাইয়া আনিতেন; তাঁর আধুনিকতা আরও বাহ্য, ওই বিলাতী বাঁধাইয়ের মত। শুনিয়াছি, ভূদেব কখনও কখনও কাঁটাচামচ ব্যবহার করিতেন, ভূদেবের আধুনিকতা ওই পর্য্যন্ত।

কিন্তু এঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি; এঁদের বিচার সাধারণ বাঙালীর বিচার নয়। আধুনিকতার আক্রমণের বিপদের দিনে এঁরা অর্দ্ধ বা তদর্দ্ধ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিকতা মরে নাই, ঘরের কোণে সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল; সেদিনের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের যে ক্ষতি সে করিতে পারে নাই, আজ তার প্রতিশোধে সে উদ্যত।

আজ সংখ্যাবহুল শিক্ষিত সমাজের ভিড়ে সে ছদ্মবেশে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, মিত্রভাবে তাকে ঘরে আহ্বান করিয়া আনিয়া নিশীথের অতর্কিত আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছি।

মধুসূদন ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় উপজীব্যের কাহিনী লিখিয়াছিলেন, আর আমরা যে ভাষা লিখি সেটা বাংলা বটে, কিন্তু বাঙালীর সাধ্য কি তা বোঝে। তার কারণ, বাঙালীর মত করিয়া আমরা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমরা চিন্তারাজ্যের ইঙ্গ-ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশের অধিবাসী, আমাদের দো-আঁশলা চিন্তা চিৎশক্তির জারজ সন্তান। যে আধুনিকতা মধুসূদনের পোষাক-পরিচ্ছদের

বর্ম্ম মাত্র ভেদ করিয়াছিল, মগজে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই আধুনিকতা আমাদের মগজে প্রবেশ করিয়া অরাজকতা বাধাইয়া দিয়াছে, মগজের এই অবস্থাকেই বোধ করি ইংরেজীতে বলে brain softening।

আজ আমরা বিদ্যাসাগরের অনুকরণে (বোধ হয় তাঁর সম্মাননার জন্যই) সুদৃশ্য কারুখচিত বহুমূল্য ঠনঠনিয়ার চটি পায়ে দিই বটে, দেশীয় চারুশিল্পরক্ষার নামে মিহি ধুতি পরি বটে, কিন্তু আধুনিকতার এটা ভীষণতর আক্রমণ, কারণ এটা তার ছদ্মবেশ; কারণ আধুনিকতা এবার দেশীয়তার বেশে আসিয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার আধুনিকতার প্রাচীনতার বেশ। চোখে দেখিতে ঠেকে ভাল, কিন্তু চোখও যে সম্মোহিত।

মধুসূদনদের আধুনিকতাকে তত ভয় ছিল না, কারণ তাঁরা ছিলেন প্রতিভাবান; বাহিরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিবার শক্তি তাঁদের অন্তরে ছিল; বরঞ্চ তাঁরা আধুনিকতার হাত হইতে অমরত্বের নিশান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁদের সাহিত্য-কীর্ত্তির উপরে আজ সেই জয়পতাকা প্রশংসমান বাঙালী জাতির প্রাণের নিশ্বাসে কাঁপিতেছে।

এবারে ভয়ের কথা। আজকের ভিড়ে যদি কোথাও প্রতিভাবান ব্যক্তি থাকেন, তবে তাঁর জন্য বৃথা চিন্তা করিব না, তিনি আত্মশক্তির বলেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতায় যে নূতন শিক্ষিত বাঙালীর উদ্ভব হইয়াছে, অচিরকালের মধ্যে সে সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে, আশঙ্কা তাদের জন্য। তারা প্রতিভাবান না হওয়ায় আত্মরক্ষায় অক্ষম; চক্ষুষ্মান না হওয়ায় চোখের চেনা চিনিতে অশক্ত এবং চিন্তাশীল না হওয়ায় (লক্ষ জনের একজনও সত্যকার চিন্তা করিতে পারে কিনা সন্দেহ) পরিণাম বিবেচনায় অসমর্থ। আধুনিকতার ছদ্মবেশী নিশিভূত না জানি কোন্ চোরাবালিতে বাঙালীর সমাধি স্থির করিয়া রাখিয়াছে!

এই আধুনিকতার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে, এখন সে বিষয় আলোচনা করা যাক।

## ১

আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ অবিরাম প্রগতিতে বিশ্বাস। নিরন্তর প্রগতি উদ্দেশ্যহীন, কারণ এর কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, যেন প্রগতির জন্যই প্রগতি। যে-চলা কেবল চলার জন্যই, গন্তব্য স্থলের কোন বন্ধন না থাকাতে তা অসংযত; অসংযম আধুনিকতার ধর্ম্ম।

ইতিহাসের তাৎপর্য্যের মধ্যে অবিরাম প্রগতির স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। পেরিক্লিসের গ্রীসের লোকেরা খুব সম্ভব প্রগতিতে বিশ্বাস করিত; মধ্যযুগে ইউরোপের মনীষীরা প্রগতিতে আস্থাবান ছিল না; গ্রীক সংস্কৃতির পুনরুত্থানের ফলে ইউরোপের লোকেরা পুনরায় প্রগতিতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিশেষ ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে। বিজ্ঞান ও তার ফলে যান্ত্রিকতার উদ্ভবে অত্যল্পকালের মধ্যে পরিবর্ত্তন এত আমূল হইয়াছে, উন্নতি (?) এত দ্রুত ঘটিয়াছে, মানুষের চিন্তা-বিপর্য্যয় এত বহুপ্রসারী হইয়াছে যে, লোকের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, ইতিহাসের গতিই বুঝি

এমনই, এটাই বুঝি ইতিহাসের ধর্ম্ম। উনিশ শতকে বিজ্ঞান যে তত্ত্বকে কলেবর দিয়াছে, বিংশ শতকে বের্গস্ঁর গতিমাত্র-ধর্ম্ম-দর্শন দিয়াছে তাকে আত্মা। ফলে লোকে যুগপৎ দর্শন ও বিজ্ঞানের তাড়নায় লক্ষ্যহীন অরাজকতার মুখে ছুটিয়াছে—সংক্ষেপে এরই নাম প্রগতি।

মধ্যযুগের মনীষীরা স্বর্গের যে কল্পনা করিয়াছে, তাতে ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া অবিরাম আবর্ত্তনে নৃত্য চলিতেছে; এতে বোঝা যায় যে, তারা জীবনচক্রের আবর্ত্তনে বিশ্বাস করিত, এ আবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ছিল, কেন্দ্র ছিল, এবং এর মূলে ছিল আনন্দ।

আধুনিকতার স্বর্গে ভগবানের স্থান আছে কিনা জানি না; কিন্তু সেখানে নৃত্য যে সম্ভবপর নয় তা নিশ্চিত। আধুনিকতার দর্শনকে মানিতে হইলে সেখানে অবিরাম সোজা পাল্লায় দৌড় চলিতেছে, কেন চলিতেছে কেউ জানে না, কি তার লক্ষ্য কেউ খোঁজ করে না; তার কোন কেন্দ্র নাই, উদ্দেশ্য নাই, কাজেই শক্তিও নাই, সংযম নাই; এবং এমন স্বর্গীয় শতগজী দৌড়ের মূলে যে আনন্দ নাই, তা সহজেই অনুমেয়; তার মূলে খুব সম্ভব পটুত্ব বা efficiency।

আমার বক্তব্য, অবিরাম প্রগতি ইতিহাসের সাধারণ লক্ষণ নয়, কাজেই একে সাধারণ লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করায় আমরা ইতিহাসের তাৎপর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিতেছি; আধুনিকতার প্রথম ও প্রধান ছিদ্র এখানে—খণ্ড ব্যাপারকে অখণ্ড বলিয়া গ্রহণে।

আধুনিকতার দ্বিতীয় ছিদ্র এর যাযাবর মনোবৃত্তিতে। মানুষ এক সময়ে যাযাবর ছিল, তারপরে সে দেখিল, যাযাবরত্বে গতি আছে, কিন্তু উন্নতি নাই; সে কৃষির সন্ধান পাইল, এবং কৃষি করিতে গিয়া কৃষ্টির সৃষ্টি করিল, বস্তুত কৃষি ও কৃষ্টি এক ধাতুতে গড়া; যাযাবর মানুষ গৃহস্থ হইল।

উনবিংশ শতকের প্রচণ্ড যান্ত্রিকতার ফলে মানুষ মাটির বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়াছে; সে আর এখন অন্নসংস্থানের জন্য বিশেষ ভূখণ্ডের উপরে নির্ভর করে না। হাজার বছর একই ভূখণ্ড ফসল দিতে পারে, কিন্তু এমন কোন খনি নাই যে হাজার বছর ধরিয়া কয়লা, কি হীরক, কি তৈলদ। নিজের দেশ ছাড়িয়া পৃথিবীর যেখানে সুবিধা কল স্থাপন সে করিতে পারে, এবং তার বিরাট আকর্ষণে হাজার হাজার কৃষককে মাটি ছাড়িয়া দিনমজুর করিয়া তোলে। উপানৎ আঘাতের পরে গোদানের মত মজুরীভূত কৃষকের উন্নতির জন্য অবশ্য চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু আদৌ এই বিড়ম্বনা কেন? বিজ্ঞান ও যান্ত্রিকতার আমরা পৃষ্ঠপোষক, কেবল তার কুফলকে স্বীকার করিব না।

যান্ত্রিকতার প্রসারে লাভের অঙ্ককে উচ্চতর করিবার আশায় দেশের ও জাতির গণ্ডি আপনিই ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের মন তথ্যকে ডিঙাইয়া তত্ত্বকে সন্ধান করে, কাজেই আধুনিকতা দেশীয়তা ও জাতীয়তাচ্ছেদী এক দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে; আধুনিকতা নাকি মহামানবতার ডিম্বভেদী বিরাট গরুড়, দেশ ও জাতির বালখিল্যসুলভ গণ্ডিতে তাকে ধরে না।

আধুনিকতা যে শুধু দেশ ও জাতিকে মানে না তা নয়, পরিবার-প্রথাকেও সে অস্বীকার করে, অন্তত কাজের বেলায় তাই দেখা যাইতেছে। কাজেই সবটা মিলিয়া দাঁড়াইয়াছে এই যে,

মানুষ মনে মনে আবার যাযাবর হইয়া পড়িয়াছে; কৃষির অবহেলার সঙ্গে কৃষ্টিও অবহেলিত; সে আর যন্ত্ররাজ নয়, যন্ত্রই তার রাজা; আর রেল, টেলিগ্রাফ, মোটর, এরোপ্লেনের মারাত্মক আকর্ষণের ফলে মানুষ খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; মধ্যযুগে মানুষ মানুষের যত নিকটে ছিল আজ তার চেয়ে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে, কারণ যে প্রাচীরের দ্বারা সে ভিন্ন, তার ভিত মনের মধ্যে, দূরত্বের মধ্যে নয়।

আধুনিকতার তৃতীয় ছিদ্র এর অবাস্তব বস্তুনিষ্ঠা। আধুনিকদের মুখে 'রিয়ালিজ্ম', 'রিয়ালিস্ট' কথাগুলো বড় বেশি শোনা যায়; তাদের নাকি এমন বস্তুদর্শন ঘটিয়াছে, যা এর আগে আর কোন লোকের ভাগ্যে ঘটে নাই। এদের বস্তুনিষ্ঠা আছে বটে, কেবল বস্তু কি সে জ্ঞান নাই। রূপকথার কুমীর শিয়ালের পা ধরিতে বটের শিকড় ধরিয়া আছে, এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই ধরিয়া আছে। এদের বস্তুজ্ঞান খণ্ডদর্শনজাত; জীবনের তলানিই বস্তু, উপরের অংশ নয়; কদর্য্যতাই বাস্তব, সৌন্দর্য্য নয়; মিথ্যাই সত্য, সত্য নয়; কেয়াফুলকে এরা অবহেলা করে, কেয়া-খয়েরকে নয়; দারিদ্র্যের মধ্যে, কদর্য্যতার মধ্যে, বস্তির মধ্যে এরা জীবনতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছে, এগুলোই যেন বিশেষভাবে বস্তু, এদের বিপরীত যা কিছু সব অবাস্তব। দুটাই যে সমানভাবে বস্তু এই বাস্তবজ্ঞানটা আধুনিকতার নাই। এমন খণ্ডদৃষ্টির ফলে যদি কোন তত্ত্ব গড়িয়াই ওঠে, তবে সে তত্ত্ব যে খণ্ডিত হইবে তাতে আর সন্দেহ কি! এবং খণ্ডিত তত্ত্ব যে অখণ্ড কালকে সান্ত্বনা দিতে পারে না, তাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে!

প্রধানত এই তিনটি লক্ষণের দ্বারা লক্ষণিত আধুনিকতা আধুনিককালে একটা মানসিক অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তার ফলে আমাদের মনের মধ্যে বিরুদ্ধ আইডিয়ার, সাদা-কালোর, ভাল-মন্দর, সত্য-মিথ্যার, ভূত-ভবিষ্যতের বিপর্য্যয় রকমের মাথা ঠোকাঠুকি চলিতেছে। এই মানসিক অরাজকতা মনের ভারকেন্দ্র বিচলিত করিয়া শান্তি, সংযম, কেমন ভাবে নষ্ট করিয়াছে, একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তা বোঝানোর চেষ্টা করিব। দৃষ্টান্তটি সাহিত্য হইতে লইব।

গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যে ফর্মটি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তার নাম গদ্য-কবিতা, ছোট বড় অধিকাংশ কবিই এই নূতন পথে ঝুঁকিয়াছে, এর কারণ বাঙালীর চরিত্রের মধ্যে নিহিত।

পদ্য অনুভূতির ভাষা, গদ্য চিন্তার ভাষা; গদ্য-কবিতা কিসের ভাষা? গদ্য পদ্যের স্তরে উন্নীত হয় এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে; পদ্য গদ্যের স্তরে নিম্নিত হয়, এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে; কিন্তু গদ্য-কবিতা কোন্ স্তরের বাণীবাহক? আধুনিকতার ফলে মানসিক রাজ্যে যে অরাজকতা চলিতেছে, গদ্য-কবিতা তারই বাহন; আধুনিকতার স্পর্শে বাঙালীর মনের একটা অংশ, প্রধান অংশ, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মত নানা উপজাতির দ্বারা উপদ্রুত, গদ্য-কবিতা সেই অরাজক রাজ্যের ভাষা।

আধুনিকদের অবাস্তব বস্তুনিষ্ঠার কথা বলিয়াছি, যার ফলে তারা কদর্য্যতাকে বস্তু মনে করে, সৌন্দর্য্যকে মনে করে বিধাতাপুরুষের ফাঁকি, এবং তাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় নাকি পুরুষের কাপুরুষতা।

এই মনোভাব হইতেই আধুনিকতা ফর্মের সৌন্দর্য্যকে সাহিত্যিক শঠতা মনে করে; ফর্মের সৌন্দর্য্য বুঝিবার ও আয়ত্ত করিবার শক্তি তাদের আছে কিনা জানি না; কিন্তু তাকে অবহেলা করাতেই নাকি সাহিত্যিক-পৌরুষ। কাজেই এই ফর্ম-হীন সাহিত্যিক-ভ্রূণ-জাতীয় গদ্য-কবিতা আধুনিক বাঙালীর বড় প্রিয়; তারা বলে যে, কদর্য্যতাকে তারা বাস্তব মনে করে, গদ্য-কবিতাই নাকি তার একমাত্র বাহন।

গদ্য-কবিতা লিখিয়াই যে তারা খালাস তা নয়, পৃথিবীর যত ফর্ম-হীন, গঠনসৌন্দর্য্যহীন কবিদের তারা খুঁজিয়া বাহির করিয়া সাহিত্যিক-পীর করিয়া তুলিয়াছে, সেইজন্যই আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকের কাছে ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের বড় আদর। জগতের মহাকবিদের তুলনায় হুইটম্যান তৃতীয় শ্রেণীর কবি; কবিত্ব-রস হয়তো তাঁর কিছু ছিল, কিন্তু তা ফর্ম না পাওয়ায় কবিতার ভ্রূণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে; আধুনিকরা এই ভ্রূণের মধ্যে অনাগত মহামানবের সত্তা দেখিয়া ফেলিয়াছে। আসল কথা, হুইট্‌ম্যান সম্বন্ধে তাদের বিচার সাহিত্যিক-বিচার নয়, সাহিত্যেতর বিচার; তাদের কথায় বাস্তবের বিচার; কিন্তু যা সাহিত্যও নয়, বাস্তবও নয়।

কিন্তু এ হেন মেরুদণ্ডহীন আধুনিকতাকে ভয় পাইবার কিছু আছে কি? রোগকে ভয় করিবার থাকিলে একেও আছে; আধুনিকতা বাঙালীর মনের একটা রোগ। বহুদিনের স্বাস্থ্য-সঞ্চয়কে কঠিন পীড়া অল্পদিনেই জীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, এ ক্ষেত্রে পারিবে কিনা নির্ভর করে বাঙালীর স্বাস্থ্যের বলিষ্ঠতার উপরে। কিন্তু ভয়ের কারণ অন্যত্র। রোগকে রোগ বলিয়া বুঝিতে পারিলে অনেকটা ভয় কাটিয়া যায়, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা চলে। আর আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা রোগকে স্বাস্থ্যেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া মনে করিতেছি; মনে করিতেছি, এটাই স্বাভাবিক পরিণাম। ইউরোপের সাহিত্যের আধুনিকতার নজির দেখাইয়া লাভ নাই; তারা বলিষ্ঠ জাতি; গত মহাযুদ্ধেও তাদের মারিতে পারে নাই, দু'দশজন আধুনিক সাহিত্যিকের রচনা বা মতবাদ তাদের মারিতে পারিবে না নিশ্চয়। আমাদের ম্যালেরিয়া আছে, বার্ষিক বন্যা আছে, অজন্মা আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, পরাধীনতা আছে, দারিদ্র্য আছে, এর উপরে আর গদ্য-কবিতা চলিবে না। তুমি বলিবে, বোঝার উপরে শাকের আঁটি; আমি বলিব, উটের পিঠে শেষতম খড়ের আঁটি; কাজেই তর্কের মীমাংসা হইবে না। ইতিহাসে দেখিয়া শেখার নজির নাই; ঠেকিয়াই শিখিতে হইবে, কিন্তু সে পরিণাম যে কি ভয়াবহ তাই ভাবিতেছি।

# ডাক

শ্রীহেমন্তকুমার তরফদার

দিনটা আজ রবিবার হইলেও হাতে কাজের যে কিছু কমতি ছিল তা নয়। তবু সকাল হইতেই মনে করিতেছিলাম যে, অন্তত জোর করিয়াই আজ ছুটি লইব। দিনের পর দিন লাগাম-পরা ঘোড়ার মত ছুটিতেছি, এ চলার বিরাম নাই, ছেদ নাই। কিন্তু এই ঘোড়া লাগাম-পরা অবস্থাতেই যদি একদণ্ড একটু দাঁড়াইয়া পড়ে পথের মাঝে, তাহাতে কিই বা আর এমন আসিয়া যাইবে ?

বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছি। সামনে টেবিলের উপর খাতাপত্র গাদা করা আছে। তা থাক। ওগুলা আজ আর নয়। হাতের চুরুটের জ্বলন্ত ডগা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, আর কতটুকু পুড়িলে ছাইটুকু খসিয়া পড়িবে। এমন সময় ঘরের বাহিরে একটা গোলমাল সুরু হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল আমার দশ বছর বয়সের ছেলে। তাহার বোনের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছে। মেয়েটা প্রাণপণে চেঁচাইতেছে, দাদা, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে দিয়ে দে, আমি ওটা ভাঙা বাক্স থেকে নিয়েছি। তাহার দাদা বলিতেছে, দাঁড়া, আগে বাবাকে দেখিয়ে কানমলা খাওয়াই, তবে তো দিয়ে দোব।

তাহার হাত হইতে মেয়েটার চুলগুলি ছাড়াইয়া দিলাম। তারপর পকেট হইতে বাহির হইল এক তাড়া চিঠি একটা সুতা দিয়া বাঁধা। বুঝিলাম, এইটি লইয়াই গোলমাল। দুজনের সকলরব চীৎকার হইতে যা সার সংগ্রহ করা গেল তা এই, একটা ভাঙা কাঠের বাক্স বাড়িতে অনেক দিন হইতে পড়িয়া ছিল। বিশেষ কোন কাজে লাগিত না। কেবল অদরকারী কাগজ ও চিঠিপত্র তাহার মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইত। কয়েকদিন আগে সেটা সারিতে দেওয়া হয়। ভিতরের কাগজপত্র ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে এই চিঠির তাড়াটি লইয়া আমার মেয়ে তাহার খেলাঘরে রাখিয়াছিল। হঠাৎ তাহার দাদা দেখিতে পাইয়া এই কাণ্ড বাধাইয়াছে। অলক্ষ্মী-আশ্রিত ছোট বোনের প্রতি বড় ভাইয়ের দায়িত্ববোধ একটা আছে তো!

শ্রীমান উপযুক্ত স্থানে আসামীকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চিঠির তাড়াটি খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। অনেক দিনের পুরানো চিঠি। দুইএকখানি একেবারে ময়লায় কালো হইয়া গেছে। নিষ্কর্ম্মা দিনে পুরানো চিঠি হাতের কাছে পাইয়া একবার সবগুলি উলটাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। মেয়ে বলিল, বাবা, দেবে না আমাকে ওটা ?

বলিলাম, হ্যাঁ মা, দোব। তুমি এখন খেলা করগে। আমি এটা একটু দেখে নিয়েই তোমাকে দিয়ে দোব।

মেয়ে খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

চিঠিগুলি এক এক করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কয়েকখানি খামের পর একখানি পোস্ট-কার্ড। ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন মেঘভাঙা রৌদ্রের মত স্মৃতির প্রান্তরে এক ঝলক

আলো খেলিয়া গেল। একি! না, সেই তো বটে! একখানি পোস্টকার্ড, অনেক দিনের ধুলি জমিয়া মলিন হইয়া গেছে। তাহার উপর অপটু হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা ছোট্ট দুটি লাইন,—দাদা, আর কত দেরি করবে? ফিরে এস। ইতি—রাণু।

রাণুর চিঠিই বটে। সেই রাণু!

আস্তে আস্তে বর্ত্তমান ঝাপসা হইয়া আসে। টেবিলের উপরের কাগজপত্র, কত দিনের কত পুরানো চিঠি নিস্পৃহ দৃষ্টির যেন অন্তরালে সরিয়া যায়, চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে মৌন অতীতের একটুকু—অনেকগুলো অর্থভরা দিন একে একে ভাসিয়া উঠে। স্মৃতির পটে একখানি ছবি অনেক দিনের ধুলাবালি ঝাড়িয়া পরিষ্কার স্পষ্ট হইয়া আসে।

একটি সকাল। ইচ্ছামতী নদীর ধারে ছোট একখানি গ্রাম। আম-কাঁঠালের গাছ ও বাঁশঝাড়ে ঢাকা গ্রামখানি। লোকের বসতি আছে কি না অথবা কোথায় আছে অবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। নারিকেল গাছগুলি সবার উপর মাথা জাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিদেশীকে ইহারাই প্রথমে দূর হইতে আহ্বান করিয়া লয়।

এই গ্রামে গিয়াছিলাম, ইহারই একমাত্র মাইনর স্কুলের মাস্টারীর পদ লইয়া। ও রকম পাড়াগাঁয়ে সেই প্রথম যাওয়া। তা ছাড়া বাড়ি ছাড়িয়া সঙ্গীহীন বিদেশে প্রথম প্রথম যে ভাল লাগিবে না এ তো অত্যন্তই স্বাভাবিক। সেদিন বোধ হয় স্কুলের কি একটা ছুটি ছিল। দুপুরে নির্জ্জন ঘরে একা বসিয়া আছি। ঘরের পাশে বাগানে বাতাবি-নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। দুপুরে ঘুমানো কোনদিন অভ্যাস নাই। জানালার কাছে একা বসিয়া আছি। বাহিরে দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্র। বাগানের মধ্যকার ঘন ছায়ায় নিঃসঙ্গতা যেন জমাট বাঁধিয়া গেছে। নিস্তব্ধ অলস মধ্যাহ্নের কেমন একটা তন্দ্রাতুর ঝিমঝিমে সুর আছে। সেই সুর ছাপাইয়া মাঝে মাঝে একটা ঘুঘুর ক্লান্ত করুণ ডাক কানে আসে, ঘু—ঘু—ঘু। খানিকক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই যেন একটা আবেশ আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শেষকালে কি কাব্য-রোগে ধরিবে নাকি? আমি মাইনর স্কুলের এফ. এ. পাস-করা মাস্টার। বিদেশে আসিয়াছি টাকা রোজগার করিতে। আমার এসব কেন? সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

সরু একটা পথ। তাহারই একধারে একটা পুকুরের উঁচু বাঁধ। তাহার পাশ দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ কানে আসিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যাইতেই দেখি, একটি ছোট মেয়ে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। দূর হইতে একটা গরু শিং নাড়িয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মেয়েটির পরনে একখানি লাল ডুরে শাড়ি। পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে দুই একটা গরু দেখিতে পাওয়া যায়, লাল কাপড় বা ঐ রকমের কোন কিছু দেখিলে ইহারা ছুটিয়া গুঁতাইতে যায়। বুঝা গেল, এই গরুটিও ঐ শ্রেণীর। যা হোক, মেয়েটির উপর আসিয়া পড়িবার আগেই আমি ছুটিয়া যাইয়া তাহার শিং দুটি ধরিয়া ফেলিলাম, তারপর জোর করিয়া একটা মোচড় দিতেই গরুটা ধপাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি আসিয়া মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইলাম। বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে, বড় বড় ডাগর দুটি চোখ, একমাথা ঝাঁকড়া কালো চুল। ঠোঁট দুটি বোধ

হয় লালই হইবে, কিন্তু এখন ভয়ে সাদা হইয়া গেছে। তাহার কান্না এতক্ষণে থামিয়াছিল। কিন্তু বুকের মধ্যে এখনও ধপ ধপ করিতেছে।

গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া একটু শান্ত হইলে পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের বাড়ি কোথায় খুকী ?

চমৎকার মিষ্টি গলার স্বর। বলিল, ওই যে আমবাগান না ? ওরই ওধারে।

বলিলাম, এদিকে এসেছিলে কেন ?

সে বলিল, বাঃ রে ! আমি তো তেলাকুচো পাড়তে এসেছিলাম। দেখ না, ওই গাছে কত পেকে রয়েছে। দেবে আমাকে পেড়ে ?

চাহিয়া দেখি, বেড়ার গায়ে একটা গাছে অনেক তেলাকুচা ফল ধরিয়াছে, কয়েকটা পাকিয়া লাল হইয়াও আছে। ফল পাড়িতে পাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি খুকী ?

—রাণু।

এইরূপে রাণুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

এই পরিচয় যে কতক্ষণে, কি ভাবে কত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল জানিতেও পারি নাই। যে দিন খেয়াল হইল, সে দিন দেখিলাম, আমার দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় অধিকার করিয়া আছে রাণু। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বাকি সব সময় কেমন করিয়া কোথা দিয়া কাটে জানিতেই পারা যায় না। তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও এক মুহূর্ত্ত থাকিবার উপায় নাই। রাণুর মা হয়তো এই বিদেশী ভদ্রলোকের একাকীত্বের বেদনা বুঝিতেন। তাই দিনরাত্রির সব সময় ও বাড়ির দরজা আমার জন্য উন্মুক্তই থাকিত। মিলনের কোন বিঘ্নই ছিল না। তাই বিচ্ছেদও ছিল না।

মা আদর করিয়া বলিতেন, আলো-ছায়া। অর্থাৎ রাণু খুব ফর্সা আর আমি কালো, তাই।

এই নামকরণ বিশেষ বেমানান হয় নাই। তাহার খেলাঘরের উপকরণ সংগ্রহ করিতে তাহার সঙ্গে স্থানে অস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। কালোজামের সন্ধানে বনে বনে দুজনে সকাল সন্ধ্যা কাটাইয়া দিই। বাদল-দিনে যখন ঘরের বাহির হওয়া যায় না, তখন তাহাকে বিভিন্ন বই হইতে ছবি দেখাইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। সন্ধ্যাবেলা তাহাকে কোলের কাছে বসাইয়া গল্প বলিতে হয়, শেষে গল্প শুনিতে শুনিতে সে এক সময় কোলেই ঘুমাইয়া পড়ে। পড়াশুনা করিতে চাহে না। দুরন্ত মেয়ে, বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে, মা বলেন। বই লইয়া পড়াইতে হইলেও আমি। জ্বরের সময় সাবু খাওয়াইতে তাহাকে কেহই পারে না, আমি ছাড়া।

এইরূপে এই ছোট্ট মেয়েটির আব্দারে অত্যাচারে আমার প্রবাসের দিনগুলির নিরানন্দ নিঃশেষে উবিয়া গিয়া কখন মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল জানিতেও পারি নাই। কিন্তু জানিতে পারা গেল একদিন, যখন এই আলো-ছায়ার খেলা শেষ করিবার তাগিদ আসিল।

অন্যত্র বেশি মাহিনার একটি কাজ পাওয়া গেল। বাঁধন যে কত শক্ত তা জানিতে পারা যায় বাঁধন ছিঁড়িবার বেলা। ছিন্ন করার কাজ সব সময় সহজ নয়। ছোট একটি মেয়ের আরও ছোট্ট দুটি হাতে এত শক্তি ! দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া রাণু কাঁদিতে লাগিল। না, কিছুতেই

আমাকে সে যাইতে দিবে না। কিছুতেই না। কিন্তু যাইতে যে হইবেই। এ কথা শিশুরা না বুঝুক, প্রাপ্তবয়স্করা বুঝে। অবশেষে রাণুর মায়ের নির্দ্দেশমত বলিতে হইল যে, কলিকাতা হইতে তাহার জন্য কলের পুতুল আনিতে যাইতেছি। পুতুল লইয়াই ফিরিয়া আসিব। ও পাড়ার বোসেদের উমার একটা পুতুল আছে, সেটার মাথায় একবার একটু চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিলেই সেটা অনেকক্ষণ ধরিয়া মাথা নাড়িতে থাকে। সেই পুতুলটার উপর রাণুর বড় লোভ।

তাই পুতুল কিনিবার কথায় তাহার হাতের বাঁধন একটু আলগা হইল। শেষে অনেক বুঝাইবার পর তবে সে আমাকে ছাড়িয়া তাহার মায়ের কোলে গিয়া উঠিল। কিন্তু চোখে তাহার তখনও জল রহিয়াছে। সেদিন চলিতে চলিতে পিছন ফিরিয়া তাহার আয়ত চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি বার বার দেখিয়াছিলাম। প্রয়োজনের তাগিদে যে বিদায়, সে এমনই নির্ম্মম।

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক বছর। তিরিশটি দীর্ঘ বছর। রাণুর কাছে বিদায় লইয়া আসিবার পর জীবনধারা ঠিক সহজ খাতে বহিতে পায় নাই। মানুষের চলিবার পথে পদে পদে কঠিন সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষের ঝঞ্ঝাবেগে অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছি। চলিবার সময় পথের দুই পাশে এবং পিছনে কি পড়িয়া রহিল, না রহিল, ফিরিয়া দেখিবারও অবকাশ পাই নাই।

কিন্তু এই দীর্ঘদিনে শুধু ক্লান্তি, শুধু দুঃখই কি সঞ্চয় হইয়াছে? আনন্দ কি কিছুই পাওয়া যায় নাই? হাঁ, কিছু নিশ্চয় পাওয়া গিয়াছে। সংসার পাতিয়াছি। বিবাহিত জীবনে সুখ-সৌভাগ্য কিছু কম প্রাপ্তি হয় নাই। ছেলেমেয়েরা আসিয়াছে, ছোট এক একটি আনন্দের ফোয়ারা। তাহাদের মুখের পানে চাহিলে ভুলিয়া যাই, জীবনে নিরানন্দের কোন কারণ কোনদিন ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের মন! সেই কলের পুতুল নিজের ছেলেমেয়েদের কত কিনিয়া দিয়াছি। কখনও মনে পড়ে নাই, একবার একটি বঞ্চিত হৃদয় আমারই ব্যর্থ আশ্বাসে প্রলুব্ধচিত্তে দিন গণিয়াছে।

ওখান হইতে চলিয়া আসিবার মাস ছয়েক পরে এই চিঠিটা রাণু লিখিয়াছিল।—দাদা, আর কত দেরি করবে? ফিরে এস। ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই। ইহার কোন উত্তরও দেওয়া হয় নাই। পল্লীজীবনের সেই ছায়াশীতল দিনগুলির তখন অবসান হইয়াছে। জীবনের খরতাপে, জনতার হাটে তখন ছুটাছুটি। কেহ যে ডাকিয়াছিল, সে কথা হয়তো তখন মনের ভিতরে পৌঁছেও নাই।

রাণুর চিঠিটা সামনে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে মনে বার বার করিয়া পড়ি। মনের দিগন্তে কোথায় যেন তাহার একটা প্রতিধ্বনি বাজিতে থাকে—ফিরে এস, ফিরে এস।

রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে পুকুরের উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া রাণু। ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। পরনে তাহার রঙিন ডুরে শাড়ি। মাথায় তাহার একরাশ ঝাঁকড়া কালো এলোচুল বাতাসে উড়িতেছে। সে ডাকে, ফিরে এস। আর কতদিন আশা ক'রে থাকব?

কিন্তু সে কতদিন আগের কথা। আজিও কি সে—? না না, নিশ্চয়ই বাঁচিয়া আছে, নিশ্চয়ই আছে। হয়তো এতদিন তাহারই ঘর-সংসার হইয়াছে। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই হইয়াছে। তাহার এতদিনে হয়তো কত ছেলেমেয়ে হইয়াছে। তাহারাই এখন পুতুল লইয়া খেলা করে। আচ্ছা, এখন আমি যদি তাহার সেই সত্যকার খেলাঘরে যাইয়া দাঁড়াই, আমাকে সে চিনিবে কি?

পড়ন্ত বেলার ম্লান রৌদ্রে অশথতলার পথের বাঁকে যেখানে বনের ধারে ফুটন্ত ভাটি ও বন-করমচা ফুলের গন্ধে বাতাস মন্থর হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া একটি ছোট্ট মেয়ে। মাথায় তাহার ঘন কোঁকড়া কালো এলোচুল। দূর মাঠের দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। ডাগর দুটি চোখ তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে,—ফিরে এস, ফিরে এস।

ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই। কলের পুতুলের দেনা রহিয়া গেছে।

চিঠিটা সামনে পড়িয়া আছে। সামান্য একটুকরা ধূলিমলিন কাগজ। কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া যে কথা কহিয়াছে, সে কে? সে আজ কোথায়? সে আজিও আছে কি? সরল হৃদয়ের অকুণ্ঠ দাবি লইয়া এই নিমন্ত্রণ সেদিন যে পাঠাইয়াছিল, সে কি আজিও আছে?

তিরিশ বছরের বিস্মৃতির ওপার হইতে রাণু ডাকে, ফিরে এস।

তিরিশ বছর? না, কত কাল, কত হাজার হাজার বছরের পরপার হইতে মহাকালের বিস্তীর্ণ প্রান্তরপথে যুগযুগান্তের বিস্মৃতিজাল ছিন্ন করিয়া এই ডাক ভাসিয়া আসিতেছে, ফিরে এস। পথের বাঁকে বাঁকে উষ্ণ-মধুর হৃদয়ের সাগ্রহ বাণী, সুগোপন-সঞ্চিত অমৃতপাত্র—ফিরে এস। শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়ের দিগন্ত হইতে দিগন্তরালে তাহার প্রতিধ্বনি—ফিরে এস, ফিরে এস।

কিন্তু—কিন্তু ফিরিয়া কোথায় যাইব? মানুষের এমন কোন স্থান আছে কি? ছোট্ট একটু স্থান,—তা সে যতই ছোট হোক—সামান্য এতটুকু একটু নীড়, যেখানে ফিরিয়া গিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটু ডানা গুটাইয়া বসিয়া প্রিয়জনের স্নেহবুভুক্ষু প্রতীক্ষাচঞ্চল বুকে বুক দিয়া একটিবার বলা চলে, আমি এসেছি?

উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্পী [ 'মন্দিরের কথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

# সমসাময়িক সাহিত্য

শ্রীগোপাল হালদার

## জনতার প্রভাব

ইউরোপীয় অনেক সাহিত্যিকই যে বর্ত্তমানকালের সাহিত্য-সঙ্কটের সম্মুখে পড়িয়া চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, ইউরোপীয় যে কোনও সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ডুয়ামেলের মত প্রবীণ মনস্বী, ও পল ভ্যালেরির মত রস-বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যের এই সমাগত সঙ্কটের কয়েকটি দিক ও কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা মুখ্যত এই—এ যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামাজিক মতাদর্শের চাপে সাহিত্যিক আপনার স্বধর্ম্ম খোয়াইতেছেন; এবং একালের রুচিহীন গণসমাজের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া সাহিত্যিক আপনার রুচি ও রসানুভূতিকে ভাসাইয়া দিয়াছেন। কথাটা আরও একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাহিত্যিক যে জাত খোয়াইয়াছেন তাহার কারণ সাহিত্যিক আজ জীবিকার জন্য ও যশের জন্য রাজা-রাজড়ার বা অভিজাত-শ্রেণীর মুখাপেক্ষী নয়, সে গণসমাজের মন যোগাইতেই ব্যস্ত। অর্থাৎ, দোষটা সাহিত্যিকের বটে; কিন্তু দোষটা তাহারও একার নয়, দোষটা কালের, দোষটা গণতান্ত্রিকতার প্রসারের। তাই, লোকসমাজ আজ রসিকসমাজের আসন দখল করিয়া বসিয়াছে, আর সাহিত্যিক তাহারই বন্দনাগীতি গাহিতেছে—তাহারই ভাষায়, তাহারই ভাবে, তাহারই রীতিতে। সাহিত্যেও গণমানসিকতারই তাই জয়ঘোষণা হইতেছে, রসিকতার দিন গিয়াছে অস্তমিত হইয়া।

কথাটা নূতন নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাইজারলিং ও অ্যারি মাসি প্রমুখ ইউরোপীয় দার্শনিকদের প্রগল্‌ভ প্রাচ্য-প্রচার যখন বাড়িয়া উঠে, আমাদের দেশেও তাহার এক আধটুকু সাড়া তখনই পড়িয়াছিল; তখন ফরাসী মনীষী জুলিয়েঁ বাঁদা তাঁহার 'লা ত্রাহিজঁ দ্য ক্লের্ক' নামীয় বহু-আলোচিত গ্রন্থে ইউরোপীয় মনস্বীদের এই আত্মাবমাননার কথা তীক্ষ্ণ ভাষাতেই উল্লেখ করেন, ইহারও একটি সজোর প্রতিঘাত আমাদের সাহিত্যে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনস্বী শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তখনকার দিনের সাহিত্যিক যে দেবতার সেবা করিতেন, সে দেবতারও অবশ্য ইতিমধ্যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, প্রাচ্য-বিলাসের স্থান গ্রহণ করিয়াছে উগ্র স্বাজাত্য-ঔদ্ধত্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে দেবতাই বুঝি আর নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতন্ত্র আজ প্রায় অবলুপ্ত; কাজেই, গণমতের জয়নাদে সাহিত্য আর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে কেন? কিন্তু আসলে বাঁদা প্রমুখ লেখক-সমাজ যে গণতান্ত্রিক প্রসারের জন্য পীড়িত বোধ করেন, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবিশেষ নয়, তাহা জনসমাজের সাধারণ রূপ। রাষ্ট্রক্ষেত্রে নূতন বিগ্রহের অভিষেক হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আরাধনা চলিয়াছে এই দেবতার। সে দেবতা জনতা। এক-নায়ক-শাসিত ইউরোপীয় দেশগুলিতেও যে দেবতার পূজা চলে, প্রতিনিধি-পরিচালিত ইউরোপীয় গণতন্ত্রেও সেই দেবতারই সেবা হয়; জনতার জয় সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইতেছে—এক-নায়কত্বেও যেমন, সর্ব্ব-নায়কত্বেও তেমনই; রাষ্ট্র-বিবর্ত্তনেও যেমন, রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়েও তেমনই; এ যুগের এক-নায়কেরা জননায়ক বলিয়াই সর্ব্ব-নায়ক, তাহারা জনমনকে সত্যসত্যই

কখনও পথনির্দ্দেশ করেন, না জনমনকে আয়ত্ত করিবার প্রয়োজনে শুধু তাহার পরিতুষ্টিবিধান করেন—ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নই ঠিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধেও উঠে, লোকমতের তাঁহারা দাস, লোকমনের পথপ্রদর্শক নন; লোকরঞ্জনের কৌশল তাঁহারা আয়ত্ত করিতেছেন, লিপি-কুশলতা ভুলিতেছেন।

২

সাহিত্যক্ষেত্রে জনতার এই অতিপ্রতিষ্ঠা যে সমাজ-ক্ষেত্রে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠারই ফল, এ কথা প্রায় সহজেই স্বীকার করিতে পারি। ইহাও প্রায় সকলেই মানি, সাহিত্যিক নিজের তাগিদেই লিখুন বা যাই করুন, তিনি একান্ত নিজের জন্য লিখিয়াই তুষ্ট হন না। হয়তো তাঁহার লেখা তাঁহার আত্মপ্রকাশ, নিজেরই কাছে নিজের অবগুণ্ঠন উন্মোচন, এক আত্ম-আবিষ্কার। কিন্তু তবু যাহা প্রকাশ, তাহা বহুর সম্মুখেও প্রকাশ; এ আবিষ্কার অর্থ-উদ্ঘাটন, অবগুণ্ঠন যে খসিয়া পড়িল তাহাতে বাহিরের বহু চক্ষু একেবারে তাহার মুখের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িবেই, আর সেই শত সহস্র চক্ষুর নিকট এই আমন্ত্রণই কি সাহিত্যিকের আপন প্রয়াসেও জানা-অজানায় প্রেরণ করে না? নিজের কাছে নিজেকে খুলিয়া ধরিবার, নিজেকে বুঝিবার প্রেরণাই যদি লরেন্সকে 'সেভেন পিলার্স অব উইস্‌ডম' রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে, তবু ভুলিলে চলিবে না, অন্যের চোখেও যেন আপনার এই রূপটি ধরা পড়ে, এই রহস্যটি ছায়াপাত করে, এই চেষ্টা না থাকিলে কোনও লেখারই সাধারণ্যে প্রকাশ প্রয়োজন হইত না। রূপকে সৃষ্টি যে করি সে অপরের রূপদৃষ্টি আছে বলিয়াও অনেকাংশে করি, আমাতেই আমি সম্পূর্ণ হইয়াও যে সম্পূর্ণ নই, এই চিরন্তন সমস্যারই উহাও একটি দিক মাত্র—আমার রূপসৃষ্টি আমার রূপদৃষ্টিরই জন্য, তবু সে এমনই বহু বহু চক্ষুর এমনই দৃষ্টিরও ভিখারী—এই সত্যটিই ইহাতে প্রমাণিত হয়।

৩

আসলে, সাধারণের দাবি মানিতে শুধু একালের নয়, পুরাকালের সাহিত্যিকরাও বারে বারে আপত্তি জানাইয়াছেন, এ কথা মসিয়েঁ বাঁদা বা ডুয়ামেলের সাবধানী-বাণী উচ্চারণের পূর্ব্বেও আমাদের জানা ছিল। অ্যারিস্টোফিনিস কাহাকেও নিষ্কৃতি দেন নাই; স্বয়ং শেক্‌স্পীয়র যে এই সাধারণের রুচিতে কিরূপ উত্যক্ত হইতেন, তাহা তাঁহার লেখাতে বহুস্থলেই সুস্পষ্ট। কিন্তু দিনের পর দিন সাধারণই হইয়া দাঁড়াইল সমাজক্ষেত্রে প্রধান, জনতা ক্রমেই আপনাকে জাহির করিতে লাগিল। সাহিত্যিকেরও উপায় রহিল না, বাহিরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তাঁহার বরাবরই আছে আমরা দেখিয়াছি, সে সম্পর্কটা এখন রসিকমাত্রের গণ্ডি ছাড়াইয়া আবার জনগণের বৃহত্তর সমাজ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতে চাহিল। ইহার একটা অত্যন্ত বাস্তব তাড়না আসিল সাহিত্যিকের বাস্তব জীবনযাত্রা হইতে, জীবিকার ক্ষেত্রে সে স্বল্পের খেয়াল-খুশি হইতে মুক্তি পাইল বহুর মনোরঞ্জনের সুযোগ পাইয়া। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজ সেই সুযোগ সে কাজে লাগাইল—বহুর পরিতুষ্টিতে, তাহার সস্তা ভাবালুতার ও প্রয়াসহীন মানসিকতার খোরাক জোগাইয়া। মনস্বীরা বলিতেছেন, জনতার ছোঁয়াচে এমনই করিয়াই খাঁটি সাহিত্য—পিওর লিটরেচর—লোপ পাইতেছে।

একটা কথা সত্যসত্যই কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভাবিবার আছে, আধুনিককালে জনতার সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তো স্পষ্ট; কিন্তু এই জনতা বা পাঠক-সাধারণ কি সত্যসত্যই সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে বাধা হইয়া উঠিয়াছে? এককালে জনতা ছিল অজ্ঞানতার প্রতীক, রুচি তো দূরের কথা, মনের সাধারণ বিকাশই তাহাদের ঘটিতে পারিত না। সে সুযোগ যাহাদের ছিল, তাহারাই হইত সাহিত্যের পাঠক। কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বা রুচির দাবি করিতে পারিত কয়জন? এখনকার সমাজে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান, তাহাদের মধ্যেই বা কয়জন রসবোধের অধিকারী? আর শুধু রসবোধই যথেষ্ট নয়, মন একটু মার্জ্জিত না হইলে সত্যকার রসও মানুষ সহজে উপভোগ করিতে পারে না, ভেজাল জিনিসে মুগ্ধ হয়, মেকি মালের চটকে ভুলিয়া যায়, কিম্বা চলতি ভাবালুতায় ভাসিয়া পড়ে। এই রুচির অভাব আধুনিক সভ্যসমাজেও দেখা যায়, শুধু জনতাকে অপরাধী গণ্য করিলে চলিবে কেন? অতীতের ও বর্ত্তমানের সাক্ষ্য

এই যে রুচি বা রসবোধ—কোনও শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া নয়।. পুরাতন লেখকদের পাতা হইতে সে সময়কার ভদ্রশ্রেণীর 'ফিলিস্টাইন'দের বিরুদ্ধে তাই উক্তি সংগ্রহ করা এত সহজ। একালের অভিজাত-সাহিত্যের অতি-পরিশীলনকামীদের নিকট জনতা যে কারণে এত অবজ্ঞেয়, সেদিনকার রসস্রষ্টা সাহিত্যকদের নিকটও সেই কারণেই ভদ্রশ্রেণী ছিল এত বিদ্রূপের হেতু। ইহারাই পাঠকশ্রেণী, ইহাদেরই দৃষ্টিতে লেখক নিজেকে খুলিয়া দিতেছেন, অথচ সে দৃষ্টিতে ঔজ্জ্বল্য নাই, দীপ্তি নাই, গভীরতা নাই, রুচি নাই, রসপিপাসা নাই। সকল কালের লেখককেই পাঠকের এই অনগ্রসরতার জন্য কতকাংশে আহত হইতে হয়, কতকাংশে নিজেকেই আশ্রয় করিয়া করিতে হয় পাঠককে উপেক্ষা, কিম্বা নিজেকে খর্ব্ব করিয়া করিতে হয় পাঠককে পরিতৃপ্ত। অতএব আজ হঠাৎ লেখকের অক্ষমতার জন্য বা বিকৃতির জন্য পাঠক-সাধারণ হিসাবে একালের জনসাধারণকে দোষী করিলে চলিবে কেন? আজ পাঠক-গোষ্ঠী আর ক্ষুদ্র নাই, বৃহৎ; আজ জনসাধারণ পাঠকশ্রেণীতেও উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু চিরদিনই লেখকদের মন সময়ে সময়ে পাঠকদের নাগালের বাহিরে থাকিয়া যাইত—এই কথাটি স্মরণ রাখা দরকার। তাহা হইলে জনতার উপর এই রাগের কারণও অনেকটা দূর হইয়া যায়।

৪

আসলে বরং জনতার আত্মপ্রতিষ্ঠায় লেখকসমাজের সুবিধা হইবারই কথা। রস ও রসবোধ হয়তো সকলের নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক। তথাপি অনেকের জীবনে তাহার বিকাশ ঘটে না নিতান্ত বাস্তব অবস্থার চাপে, আবার অনেকের প্রাণে সে রসবোধ পরিচ্ছন্ন হইতে পারে না রুচির অভাবে, পরিমার্জ্জনার অভাবে। অর্থাৎ হৃদয়গত রসানুভূতি কোনও শ্রেণীবিশেষের সম্পত্তি নয়। কিন্তু উহার সুষ্ঠু বিকাশ নির্ভর করে মনের দীপ্তির উপর, বুদ্ধি ও রুচির অনুশীলনের উপর। আধুনিককালের জনতা অনেক বেশি পরিমাণে এই দিকে উৎসাহী, অশিক্ষিত তাহারা থাকিতে চায় না। তাই তাহাদের মধ্যে যাহারা রসবোধের অধিকারী, তাহারা বেশি পরিমাণেই বুদ্ধির ও রুচির অধিকারী হইবার সম্ভাবনা, খাঁটি রসকে বুঝিবার মত আয়োজন তাহাদের আয়ত্ত হয়।

এইখানেই আপত্তি উঠে এই যে, জনতা জানিতেছে অনেক, শিখিতেছে না কিছুই, তাহার মনের উপর সংবাদের সহস্র ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে মন পূর্ণ হইতে পারিতেছে না, শূন্যই থাকিয়া গিয়াছে। অতএব তাহার মনের রসবোধ জাগে নাই, বরং তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এই জানার নেশায়। আবার রুচি কতটা জন্মগত, রক্তগত, কতটা বা পরিবেশগত, তাহার ঠিক নাই; তবে তাহাও প্রখর হয় ঠিকমত প্রয়াসে। একালের সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের সে রুচিকে বিকাশ পাইতে দেয় না, বরং বিনাশ করিয়া ফেলে। তাই জনতা রুচির অধিকারীও নয়, সেই প্রয়াস সে করিতেও চায় না। অতএব তাহার রসানুভূতি বিকাশ পাইবে কোথা হইতে?

এমনই করিয়া যুক্তির পরে যুক্তি বাড়িতে থাকে; কিন্তু তবু যখন দেখি, একালের একখানা ভাল বিলাতী দৈনিকপত্রেও সাহিত্যের সুনিপুণ সমালোচনা প্রতি সপ্তাহে না বাহির করিলে চলে না, শিল্পের ও সঙ্গীতের নূতন পুরাতন সৃষ্টির পরিচয় না দিলে সাধারণ সংবাদ-পত্রও প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়; যখন দেখি, একমাত্র সাহিত্য, একমাত্র শিল্প বা একমাত্র সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়াও সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র চলে, এমন কি বাংলায়ও একাধিক এরূপ পত্র প্রকাশিত হয়, আর নিশ্চয় কতকাংশে তাহার প্রয়োজন অনুভূত হয় বলিয়াই তাহা সম্ভব হয়, তখন কি বলিতে পারি না, জনসাধারণ পাঠকগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ায় সাহিত্যের বরং আসর বৃহত্তর হইতেছে, ব্যাপকতর হইয়াছে? কথা হইতে পারে, ইহা জার্নালিজ্‌ম, আর জার্নালিজ্‌ম সাহিত্যকে বিনাশ করে। এ কথা হয়তো আংশিক সত্য, অর্থাৎ আংশিক মিথ্যাও। এমন সাহিত্য আছে যা সব যুগে ফুটে না—কালিদাসের লেখা, শেক্স্পীয়রের লেখা কিম্বা সেকালের মহাকাব্য। কিন্তু এ হইল অতি-বিরাট বা অতি-মহৎ সাহিত্যের কথা, উহার জন্ম হয় বহুযুগে একবার। উহার নিয়ম বলা দুঃসাধ্য। ইহার পরেই আসে, যে সাহিত্য লইয়া আমরা আলোচনা করি, যাহা আমরা উপভোগ করি, তাহার কথা। সে

সাহিত্যের পক্ষে পাঠকগোষ্ঠীর মনের প্রসারতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য বরং বিশেষ সহায়ক। আধুনিককালে জনতা এই জিনিসটিরই অধিকারী হইতেছে, তাই আধুনিক সাহিত্য বরং একটা বুদ্ধিমান পাঠকশ্রেণী পাইতেছে বেশি করিয়া, যাহাদের মন অন্তত আর মূর্চ্ছিত নাই, যাহা দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের আলোচনায় অনেকটা সম্মার্জ্জিত হইয়া উঠিতেছে। সংবাদের আগাছাই শুধু তাহাতে জন্মে না, অনেক অজ্ঞানতার আগাছাও পরিষ্কৃত হয়। এই সুযোগ কি সাহিত্যিকের পক্ষে কাম্য নয়? শেক্‌স্পীয়র পৃথিবীতে একবারই জন্মিয়াছেন, মহাকাব্যের যুগও হয়তো একবারই আসিয়াছিল; কিন্তু এ যুগের মত কোনও যুগে তবু এত সুনিপুণ সাহিত্যের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। উপন্যাসের মধ্যে এমন জীবন ও জগতের বিপুল রহস্যকে যে গ্রথিত করিয়া তোলা যায়, এমন মহাকাব্যও যে সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা একালে ছাড়া কে ভাবিতে পারিত? আর এ সবই এ যুগের বৈশিষ্ট্য—যে যুগে জনতা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসকে পূর্ণতর বিচিত্রতর করিয়া তুলিতেছে। সাহিত্যে ইহার ছাপ পড়িতেছে, এই বৃহৎ বিচিত্র লিপি ফুটিতেছে, তাই পুরাতন রীতি ও রসের ঐতিহ্যে তাহার মানদণ্ড পাওয়া যায় না। তখন বিভ্রান্ত রসিক হতাশ হন, তাঁহার চোখ পড়ে অক্ষমদের দিকে, সেই অক্ষমতাকেই মনে করেন তিনি একালের সমস্ত সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ।

তাই মনে হয়, জনসমাজের প্রভাব সমাজ ও সাহিত্যের উপর বাড়িয়া উঠায় যে অবস্থাটির উদ্ভব হইতেছে, তাহাতে সাহিত্যরসপিপাসুর সংখ্যা বাড়িয়াছে অনেক, অধিকতর লোকের মনের ক্ষেত্র আজ প্রস্তুত; আর উহারই ফলে, অধিকতর সাহিত্যযশপিপাসুরও ভিড় জমিয়াছে তাহাদের দুয়ারে, কিন্তু সত্যকারের রসস্রষ্টা ও রসিক পাঠকের দল সংখ্যায় বা কৃতিত্বে কমেন নাই, বরং বাড়িয়াছেনই।

# কবিতা

আমার মনের অবসর—
বিচ্ছিন্ন করিছে মোরে প্রতিদিন প্রিয়জন হতে,
ভাসমান তৃণ দেখে আপনারে ধাবমান স্রোতে—
দূর্ব্বাদল-সম্ভাবনা-স্বপ্ন জাগে দিনের আলোতে,
নিশীথে শিশির-বিন্দু—মৃত তৃণ কাঁপে থরথর।

আমার মনের অবসর—
জনতার ভিড়ে রচে একান্ত নিরালা নীড়খানি,
থমকিয়া থেমে থাকে যাত্রাপথ শেষ অনুমানি—
সম্মুখে চলিতে পথ পিছনে কে দেয় হাতছানি,
দ্বন্দ্ব চলে চিরন্তন—ঝরে নিত্য কবিতা-নির্ঝর

# অপরাজিতা

শ্রীসুশীলকুমার দে

পিছনে যেখানে আঁধারের শেষ, সমুখে আলোর লীলার লিখা,
হে মোর নূতন জীবন-পথের নির্দ্দেশিকা,—
সেখানে নহে তরঙ্গী
মকরকেতুর ভঙ্গী
মাধুরীর শুধু চাতুরী-বিলাসে ব্যর্থ-বাণের সঙ্কেতিকা।

জাগে শুধু তব চক্ষু-দীপিকা, আকাশ-লিপিকা তারার মত,
কান্তি-কণিকা আঁধার-পাথারে অব্যাহত ;
স্বপ্নশেষের শীর্ণ
শঙ্কায় অবতীর্ণ
অসার ব্যথার বিহ্বলতার অবসাদ নবপ্রসাদে নত।

বাহিরে হারায়ে অন্তরে যারে পেয়েছি, জয়ে সে অপরাজিতা,
নিত্যকালের পরিচিতা তবু অপরিচিতা ;
খুলে গেছে বাহুবন্ধ,—
তবু রহে নিঃস্পন্দ
চারি চক্ষের তারার মৈত্রী আঁধার জৈত্রী অকুণ্ঠিতা।

কোটি জনমের আগে জাগে যাহা, আছে সে প্রাণের প্রথম আলো,
আজো যবনিকা ভেদিয়া কালের নিকষ-কালো ;
সে-স্মৃতিটি নহে ছিন্ন,—
যুগে-যুগে অবিভিন্ন
ধরার ধর্ম্মে দেহের হর্ম্মে সরাগে বিরাগে বেসেছি ভালো।

এ জনমে শুধু প্রণমি, আঁখির তারাটি আঁখির তারায় আঁকি'
সুদূর স্বর্গপানে অধনীর অর্ঘ্য রাখি ;
ফুটেছে আঁধার-অঙ্কে
অঙ্কুরি' প্রাণ-পঙ্কে
অকলঙ্ক যে প্রীতির পদ্ম আলোর আকাশে,—ল'বে না তাকি ?

খেলা

শ্রীনন্দলাল বসু
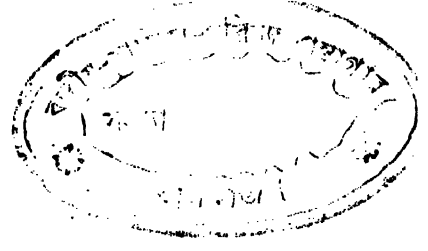
অকালে দহেছে রুদ্র দহনে কবে কামনার তরুণ তনু,
ধূলা হয়ে গেছে ব্যর্থলীলার বিলাসী ধনু ;
গেছে যাহা ছিল দীপ্ত,—
বিভ্রম-তমোলিপ্ত
অস্তমেঘের মিনতি বিথারি আছে শুধু তারি করুণ অণু ।

ভস্মের শেষ শ্মশানে এসেছ তাপসীর বেশে স্বয়ম্বরা,—
নহ কাঙালিনী, আলোক-মালিনী মানসহরা ;
পরশি চরণ-পদ্ম
শ্মশান সুধার সদ্ম ;
চোখে জ্বালা যার, কণ্ঠে গরল, নাহি আর তার মনের জরা

মুক্তি রচেছ বন্ধনমাঝে, সন্ধানী তুমি চিরন্তন,
মরণের মাঝে জীবনের নব নিবন্ধন ;
ধরার ছায়ার কুঞ্জে
মঞ্জু মেঘের পুঞ্জে
ফুটাল কি-আলো শেষের সীমায় নিবিড় হাসির নিমন্ত্রণ !

মহানদী-তীরে

# নারীচরিত্র

## সম্বুদ্ধ

রুণু আসিয়া বিষণ্ণমুখে কহিল, কাকাবাবু, মা মেরেছে।

হাতের বইটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া এক হাতে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলাম, কেন মারলে? কি করেছিলে?

সে কহিল, কিছু করি নি। আমি তো শুধু ভিস্তিওয়ালা খেলছিলাম।

—ঠাকুমার হট-ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে?

—হ্যাঁ। তাই মা মিছিমিছি মারলে।

—আচ্ছা, তার জন্যে দুঃখ ক'র না। মাগুলো সব অমনই হয়। আমি যখন তোমার মত ছিলাম, আমার মা আমাকে আরও অনেক বেশি ক'রে মারত।

—ঠাকুমা? রুণুর চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

—হ্যাঁ। তোমাকে কেমন ক'রে মারলে?

রুণু চেয়ারের হাতার উপর উঠিয়া বসিল, কহিল, গালে চড় মেরে মেরেছে। এই দেখ, এখনও জ্বালা করছে।

কহিলাম, আচ্ছা, এস, হুমোপাখী ক'রে দিই। মুখটা এই দিকে ফেরাও, গালে ঠিক অমনই ক'রে আর একটা চড় মেরে দিলেই এক্ষুনি জ্বলুনি সেরে যাবে, দেখো।

রুণু কহিল, ন্না।

কহিলাম, তবে কি করবে? যীশুখ্রীষ্ট হবে?

—কোন্ যীশুখ্রীষ্ট? সেই যে ছবিতে আছে?

—হ্যাঁ।

রুণু চক্ষু মুছিয়া কহিল, বা, যীশুখ্রীষ্ট হব কি ক'রে? আমার তো দাড়ি নেই।

কহিলাম, দাড়ি লাগবে না। বাঁ গালটাতে মা চড় মেরেছে তো, ডান গালটাকে মার কাছে বাড়িয়ে দাওগে—এমনই ক'রে।

—দিলে কি হবে?

—খুব ভয়ানক কাণ্ড হবে। দিয়ে দেখই না গিয়ে।

—মা যদি বকে?

—বকবে না। ব'ল, কাকাবাবু ব'লে দিয়েছে।

রুণু নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল, এবং দু মিনিট না যাইতেই অতি দুঃখিতচিত্তে ফিরিয়া আসিল। আমি কুশলপ্রশ্ন করিবার আগেই আমার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, মা ডান গালেও চড় মারলে।

তাহার মাথায় করুণ কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়া দিয়া কহিলাম, ভালই করেছে। এক গালে চড় মেরে রেখেছিল, বিয়ে হ'ত না। এবার হবে।

এবার রুণু রাগিল। কহিল, ছাই হবে। তুমিই তো আরও আমাকে মিছিমিছি চড় খাওয়ালে। তুমি ছাই।

কহিলাম, নিঃসন্দেহ। আর কিছু না?

—ন্না।

—তা হলে এবার পালাও, খেলা করগে। আমি পড়ব।

—না, পড়বে না। আমি ছবি দেখব।

—এখন তো ছবির বই নেই।

—আছে।

—বেশ খুঁজে দেখ।

রুণু টেবিল হাঁটকাইল, শেল্‌ফের বই দুই একটা টানিয়া নামাইল, তারপর ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি ছবি এঁকে দাও।

কাতর হইয়া কহিলাম, এখন নয়, আমার কাজ আছে, দেখছ না? পরে দেব'খন। এখন যাও, লক্ষ্মীটি।

লক্ষ্মীটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, উঁহু, যাব না। এক্ষুনি দিতে হবে। এই নাও।—বলিয়া শেল্‌ফ হইতে কাগজ ও লাল-নীল পেন্সিলটা পাড়িয়া আনিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিল।

জানি, ঝোঁক যখন চাপিয়াছে, ছবি না আঁকিয়া নিস্তার নাই। অগত্যা পেন্সিলের তিন টানে এক কিম্ভূতকিমাকার নারীমূর্ত্তি আঁকিয়া কহিলাম, নাও।

রুণু ছবিটাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, বা, নাম লিখে দাও নি যে!

ছবির তলায় নাম লিখিয়া দিলাম—'রুণু'। কহিলাম, ভাগ এবারে।

রুণু ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, কক্ষনো নয়। আমি বুঝি অমনই ক'রে শাড়ি পরি কখনও!

—আরও আরও বড় হয়ে পরবে তো। এ হচ্ছে তখনকার ছবি।

—হুঁ, হাতী।

তারপর সহসা রুণুর inspiration আসিল; আমার হাত হইতে পেন্সিলটা টানিয়া লইয়া 'রুণু' কাটিয়া লিখিল, 'মা'।

কহিলাম, ছি, মা লিখতে আছে?

—হ্যাঁ, আছে। মা ছাই, মা বিচ্ছিরি। আমাকে খালি খালি মারে কেন?—বলিয়া সে ছবি লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

কহিলাম, এই, ছবি রেখে যাও। মা দেখলে পিঠে কিল দুমাদুম পড়বে'খন।

—দেখাবই তো। আমাকে মারলে কেন?

রুণু চলিয়া গেল। আমি আবার বই তুলিয়া লইলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে রুণু আবার আসিয়া জানাইল, মাকে ছবি দেখিয়েছি।

—মা ঠুকে দিলে তো ?

—না, কিচ্ছু বললে না।

সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, আমার ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। দরজার পাশেই সুইচবোর্ড। হাতড়াইয়া সুইচ টিপিতেই চোখে পড়িল, আমার চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর শ্রান্তভাবে মাথা রাখিয়া, বউদি। বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে নাড়া দিয়া ডাকিলাম, বউদি, এমন ক'রে ব'সে আছ যে ? অসুখ করেছে ?

বউদি মুখ তুলিলেন না, হাতের মুঠাটা আলগা করিয়া একটা দলা-পাকানো চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। সংবাদ শুভ ও সংক্ষিপ্ত—লীলা দুইদিন আগে এক্লাম্প্‌শিয়া হইয়া মারা গিয়াছে। লীলা আমাদের একমাত্র বোন, বছর দেড়েক আগে তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

মিনিট পনরো পরে বউদি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ধরা গলায় কহিলেন, এ নিয়ে এখন হৈ চৈ ক'র না, মার আজ সারাদিন একাদশী গেছে। যাও, মুখহাত ধুয়ে এসগে।

তারপর চক্ষু মুছিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, এবং ঠিক তখনই 'কাকাবাবু খাবে এস' বলিয়া রুণু আসিয়া ঘরে ঢুকিল। এক মুহূর্ত্ত সে খোলা দরজা দিয়া বউদির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর আমার খুব কাছে আসিয়া চুপিচুপি কহিল, কাকাবাবু, মা কাঁদছে ?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, তোয়ালেটা টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘরে আসিয়া দেখি, রুণু ঈজিচেয়ারে জড়োসড়ো হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া তুলিতে যাইয়া চোখে পড়িল, দুপুরবেলার সেই ছবিটা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে ; তাহার তলায় 'মা' কাটিয়া রুণু আবার বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে, 'রুণু ছাই'।

# মন্দিরের কথা

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

পুরী জেলায় আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। অতিথিসজ্জন বাড়িতে আসিলে প্রাচীন প্রথানুসারে গৃহস্বামী তাঁহাদের দেহ চন্দনপঙ্কে অঙ্কিত করিয়া দেন, একজন ভৃত্য চন্দনের পাত্র লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া থাকে। বাংলা দেশের মত সেখানে পানীয় জলে কেওড়া মেশানো হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে একটি জায়ফল চন্দনপিঁড়িতে ঘষিয়া জলের সহিত মিশাইয়া সুগন্ধিত করা হয়। রন্ধনের ভিতরেও বাংলা দেশের মত মোগল অথবা আধুনিক ইংরেজী প্রভাব প্রবেশ করে নাই। নিমন্ত্রিত-বর্গকে নানাবিধ পিঠা ও পায়সের দ্বারা আপ্যায়িত করিবার রীতি এখনও উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার গ্রামে ঘুরিলে আমরা আরও একটি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাই। বহু গ্রামে ভাগবতঘর নামে একটি মন্দির থাকে। সন্ধ্যায় এখানে ভাগবতপাঠ অথবা কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিপ্রহরে সেখানে তাস অথবা পাশার আড্ডাও বসে। তাহা ছাড়া গ্রামে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে ভাগবতঘরেই তাঁহার স্থান হয়। এই ভাগবতঘরটি একাধারে গ্রামের মন্দির, ধর্ম্মশালা, বৈঠকখানা সবই। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান, অথবা তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে সংস্কৃতি গ্রাম্য অঞ্চলে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, ভবিষ্যতে টিকিবে কি না টিকিবে, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ভারতবর্ষের কোনও কোনও অংশে অলক্ষিতে যে এখনও মোগল যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে দেব-মন্দিরের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ চিরদিন বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী জনগণ যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা

রেখদেউল ও তাহার সামনে ভদ্রদেউল
(সোমনাথ মন্দির, পুরী জেলা)

মন্দির রচনা করিয়াছেন এবং সেই মন্দিরের সহিত ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, সাধুসজ্জন, সংস্কৃত পাঠশালা, দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা, পূজার বিবিধ রীতি, বিশিষ্ট কতকগুলি চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির নানাবিধ অঙ্গ ক্রমে ক্রমে সেখানে আমদানি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ প্রদেশে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তাহা আমাদের সঠিক জানা না থাকিলেও মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে, মনুসংহিতায়

চম্বা রাজ্যে দুইটি রেখদেউল ( পঞ্জাব )

যে অংশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলা হইয়াছে হয়তো সেখানেই উহা সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে কোন্ পথে এবং কাহাদের দ্বারা সেই সংস্কৃতি যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতের নদনদী, গিরিকান্তার অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। বিষয়টি সমুদ্র-সমান বিস্তীর্ণ, ইচ্ছা করিলেই ইহার সকল তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। নিছক আন্দাজের উপরেও নির্ভর করিয়া লাভ নাই ; কেন না, এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি বিস্তারের এক রকম ইতিহাস লিখিয়াছেন, আর একজন অন্য রকম লিখিয়াছেন। অর্থাৎ দুই জনেই স্বীয় সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যই যাহা ঘটিয়াছিল তাহার আংশিক অথবা বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন। দুইটি মতের মধ্যপন্থাকে গ্রহণ করিলেও যে সত্যকে লাভ করা যাইবে তাহাও নহে। প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, তবেই সত্যের কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সত্য তো বহু যুগের বহু জনের সমবেত সাধনার ধন, তাহার কথা আজ না হয় নাই বলিলাম।

এইরূপ একটি উদ্দেশ্য লইয়াই মন্দিরের সম্পর্কে আমি বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। উত্তর ভারতে কোনও সময়ে মন্দিরের একটি বিশেষ রূপ গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই মন্দিরের রূপটি রাজপুতানা ও পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ও উত্তরে যুক্ত-প্রদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে বিজাপুর ও ধারওয়াড় জেলা এবং পূর্ব্বভাগে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন্দিরের এই বিশেষ আকৃতিটির কোথায় প্রথম সৃজন হয়, কেমন করিয়া ইহা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল, কালের প্রবাহে বিভিন্ন প্রদেশে ইহার রূপে কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল—ইহার ইতিহাসটির পুনরুদ্ধার করাই মন্দিরের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের বিষয়। যদি আমরা এই ইতিহাসের কিছু আভাষও উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসের এক অংশের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান জন্মিবে। শিলালিপি, তাম্রশাসন ও সমসাময়িক
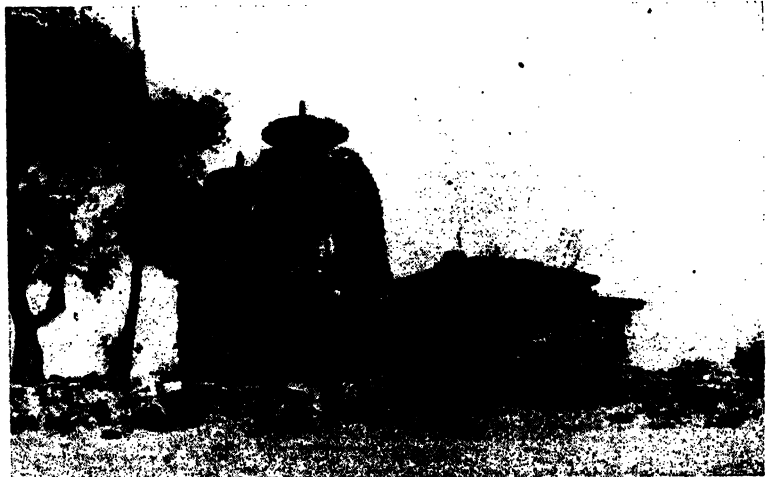
গন্ধরাড়ির যুগল মন্দির ( উড়িষ্যা )

বিবরণের সাহায্যে ঐতিহাসিকগণ ভারত সভ্যতার যে ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন, মন্দিরের বিকাশ বিস্তার ও অভিব্যক্তির আলোচনালব্ধ ইতিহাসের সহিত তাহা মিলিতেও পারে, নাও মিলিতে পারে। যেমনই হউক, বিজ্ঞানের পথে একবার নিষ্ঠার সহিত চলিয়া দেখিতে দোষ কি? তত্ত্ব হয়তো শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মিলিবে না, কিন্তু তথ্য তো অনেক মিলিবেই। তাহাই কি ভবিষ্যতের কর্ম্মীগণের পক্ষে কম লাভের কথা?

মন্দিরের যে রূপটির কথা বলিতেছিলাম, তাহা উড়িষ্যার শিল্পীগণের ভাষায় রেখদেউল বলিয়া পরিচিত। ইহার আসন (ground-plan) চতুরস্র। কিন্তু প্রতি দিকের দেওয়ালের কিছু অংশ বাহিরের দিকে মেলিত (মেলানো = projection) করিয়া বৈচিত্র্য সাধন করা হইয়া থাকে। মূর্ত্তিতে (elevation) বৈশিষ্ট্য আছে। দেওয়াল কিছুদূর খাড়া উঠিয়া তাহার পর চারিদিক হইতে ক্রমশঃ ভিতরের দিকে হেলিয়া যায়। কিছুদূর হেলানো শেষ হইলে তাহার পর মন্দিরের মস্তক বা শীর্ষপ্রদেশ আরম্ভ হয়। শীর্ষদেশে গীবা এবং আমলক নামে দুইটি বিশিষ্ট অংশ থাকে। তাহার উপরে খপুরি ও কলস। মন্দিরের অন্তরেও (section) নানাবিধ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দেশ ও কাল অনুসারে রেখদেউলের অন্তর তিন চারি প্রকারের হইতে দেখা যায়। মূর্ত্তির সম্পর্কে আমরা বলিয়াছি যে, দেওয়াল উপরের দিকে ক্রমশঃ বিস্তারে কমিয়া যায়। ভিতরেও তাই। ভিতরের দিকে অল্প অল্প করিয়া পাথরের খণ্ডগুলি আগাইয়া আনা হয় এবং শীর্ষদেশের নীচে কয়েকখণ্ড পাথরের সাহায্যে খোলা জায়গাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অন্তরগঠন অন্ধ্র দেশে মোখলিঙ্গমের মন্দিরে, গঞ্জামে মহেন্দ্রগিরি পর্ব্বতের উপরে, কটক জেলায় যাজপুর নগরে এবং বড়ম্বা রাজ্যে সিংহনাথের মন্দিরে দেখা যায়।

মন্দিরের অন্তর
(রাণীপুর-ঝরিয়াল, পাটনা রাজ্য, উড়িষ্যা)

ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার গঠনরীতি প্রচলিত ছিল। কিছুদূর দেওয়াল তুলিবার পর আড়াআড়িভাবে বিস্তীর্ণ পাথরের পাটা বসাইয়া একটি ছাদের মত রচনা করা যাইতে পারে। আরও কিছুদূর দেওয়াল তুলিয়া পুনরায় এইরূপ করিলে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দুই তিনটি ক্ষুদ্র কুঠুরিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে চারিদিকের দেওয়ালগুলি পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকায় আরও দৃঢ়স্থায়ী হয় এবং মন্দিরটিকেও ইচ্ছামত অনেক উন্নত আয়তন করা যাইতে পারে। এরূপ মন্দির উড়িষ্যায় পাটনা রাজ্যের রাণীপুর-ঝরিয়াল গ্রামে, ভুবনেশ্বর এবং পুরীর অনেক মন্দিরে, মানভূম জেলায় দামোদরকূলে অবস্থিত তেলকুপী প্রভৃতি নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

শুধু অন্তরের কথাই নহে। মূর্ত্তির মধ্যেও যুগে যুগে ও দেশানুসারে নানাবিধ তারতম্য দেখা যায়। মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ। তাহার প্রসারকে যদি ১৬ ধরা যায়, তবে বাহিরে মন্দিরের পাদপীঠ হইতে কলসের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত অংশ ৪৮ হইতে পারে, ৬৪ হইতে পারে, ৮০ হইতে পারে, তাহার বেশিও হইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভুবনেশ্বর, মহেন্দ্রগিরি প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন মন্দিরগুলির উচ্চতা গর্ভের বিস্তারের তিনগুণ এবং পরবর্ত্তীকালের মন্দিরের উচ্চতা পাঁচ অথবা ততোধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মন্দিরের ইতিহাসের বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বাহির করিতে হইবে, প্রতি প্রদেশে মন্দিরদেহের ঠিক কোন্ মুখে অভিব্যক্তি হইয়াছিল এবং সেই অভিব্যক্তির কারণই বা কি?

মন্দিরের সৌন্দর্য্যবিষয়ে কি লোকের আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতেছিল, না একরকম পাথরের বদলে অন্যরকম পাথর বা ইট ব্যবহার করার ফলে রূপও বদলাইয়া যাইতেছিল, না বিজাতীয় কোনও শৈলীর সংস্পর্শে আসিয়া শিল্পশাস্ত্রের মধ্যেই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, এই সকল বিষয় গবেষণার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে বাহির করিতে হইবে।

যাহাই হউক, সে তো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু উপস্থিত কোন্ বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করিলে আমরা এই গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

উড়িষ্যায়, বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, রাজপুতানায়, পঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে যুগযুগান্তর ধরিয়া বহু মন্দির গঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে বহু মন্দির বিনষ্ট হইয়াছে, অনেকগুলি এখনও বর্ত্তমান। যদি আমরা কোনও উপায়ে সমস্ত প্রদেশের মন্দিরগুলিকে তাহাদের বয়স অনুসারে ঠিক সাজাইতে পারি, তাহা হইলে পরে সেই সকল মন্দিরের আসন, মূর্ত্তি ও অন্তরের বিশ্লেষণ ও তুলনা করিলে অভিব্যক্তির ধারা সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে। কোনও কোনও মন্দিরে নির্ম্মাতার নাম ও নির্ম্মাণের কাল শিলালিপিতে খোদিত আছে। সেগুলি আমাদের কাজের পক্ষে বড় উপযোগী। কিন্তু সকল মন্দিরে তো তাহা নাই। ফার্‌গুসন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ব্বগামী পণ্ডিতগণ অজ্ঞাতকুলশীল মন্দিরের সৃজনকাল নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। কোনও মন্দিরে যদি শিলালেখ থাকে, তবে তাহার সহিত গঠনে মিলিলে শিলালেখবিহীন অপর কোনও মন্দিরেরও সন তারিখ মোটামুটি অনুমান করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল ক্ষেত্রে এরূপ অনুমান প্রয়োগ করা যায় না। এক প্রদেশের মধ্যেই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে এই উপায়ের দ্বারা কিছু ফললাভ হইতে পারে, কিন্তু দূরদরান্তবর্ত্তী দুইটি মন্দিরের তুলনাকালে এই সূত্রটিতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মে। উড়িষ্যার মন্দিরের সহিত তুলনায় মিলিলেই সুদূর রাজপুতানার নামগোত্রহীন কোনও মন্দিরের নির্ম্মাণকাল আমরা পাইয়াছি, এরূপ ভাবিবার কোন হেতু নাই। কেন না, যে শৈলী উড়িষ্যায় সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, তাহা হয়তো রাজপুতানায় নবম শতাব্দীতে চলিত। অতএব সুদূরে অবস্থিত দুই প্রদেশের তুলনাকালে বর্ত্তমান উপায়টি কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা কম।

মাতৃমূর্ত্তি
(মেঘেশ্বর মন্দির, ভুবনেশ্বর)

ফার্‌গুসন মন্দিরের কালনির্ণয়ে আরও একটি বিশেষ সূত্রের সাহায্য লইতেন। মানুষ যেমন সাজসজ্জা করে মন্দিরেরও তেমনই সজ্জা আছে। ফার্‌গুসনের ধারণা ছিল, পূর্ব্বকালে মন্দিরের সজ্জা সরল ছিল, উত্তরকালে তাহা আরও জটিল হইয়া উঠে। অর্থাৎ যদি আমরা নামগোত্রহীন কোনও মন্দিরে সজ্জার আতিশয্য দেখি, বিশেষ করিয়া তাহার শিখরের সংখ্যাধিক্য দেখি, তবে সম্ভবতঃ তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। সহজ অনাড়ম্বর সজ্জা হইলে তাহা প্রাচীন হইবার সম্ভাবনাই অধিক। বিচারে

কিন্তু এই নীতিতেও আমাদের সন্দেহ জন্মে। কেন না, একই কালে মন্দিরের রচয়িতার অর্থসামর্থ্য অনুসারে মন্দিরের সজ্জায় তারতম্য ঘটিতে পারে। যাহা প্রাচীন তাহাও অলঙ্কারে সমৃদ্ধ হইতে পারে, যাহা নবীন তাহা দৈন্যযোগে হীনসজ্জা হইতে পারে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরগাত্রে অবস্থিত বিভিন্ন মূর্ত্তিরাজির গঠনশৈলীর উপরে অনেকাংশে নির্ভর করিতেন। ভারতের বহুস্থানে শিলালেখযুক্ত বহু মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে মূর্ত্তির ক্রমবিকাশের একটি ধারা ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি রচনা করিয়াছেন। তাহারই মানদণ্ডে মন্দিরেরও বয়স নির্ণয় করা যাইতে পারে। ধরুন, একটি মূর্ত্তিতে নবম শতাব্দীর একটি লেখা আছে। যদি আমরা অন্য কোনও স্থানে সেইরূপ শৈলীবিশিষ্ট একটি মূর্ত্তি পাই, তবে তাহাও নবম শতাব্দীতে রচিত হইবার সম্ভাবনা। এখন যদি কোনও দেবমন্দিরের গাত্রে ঐরূপ একটি মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তবে সেই মন্দিরের নির্ম্মাণকাল নবম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে ইহা আমাদিগকে বলিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে এই সূত্র অনুসারে সুফল ফলিয়াছে, কিন্তু সকল দেবমন্দিরই তো মূর্ত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত হয় না। তখন উপায় কি?

উপাসকবৃন্দ
(মোখলিঙ্গম্, মাদ্রাজ)

কোনও মানুষ কোন্ জাতীয়, তাহা আমরা সচরাচর পোষাকপরিচ্ছদ, কেশবিন্যাস এবং অঙ্গের চালচলন বা কথাবার্ত্তার দ্বারা নির্ণয় করিয়া থাকি, আবার তাহার দেহের বর্ণ অথবা অঙ্গের গঠনের দ্বারাও করিয়া থাকি। যদি কোনও স্থানে সাজসজ্জাবিহীন একটি মৃতদেহ পড়িয়া থাকে, অথবা শুধু তাহার অস্থিনিচয় অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কি আমরা তাহার জাতিনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অপারগ হইব? তাহা তো নহে। বস্তুতঃ কোনও মানুষের জাতিনির্ণয় করিতে হইলে তাহার দেহের লক্ষণকেই আমরা প্রধান স্থান দিই, সাজসজ্জা প্রভৃতি বহিরঙ্গের লক্ষণকে নহে। মন্দিরের বেলাতেও তাহাই। মন্দিরে সংলগ্ন মূর্ত্তি, তাহার অলঙ্কার যতই আমাদিগকে মন্দিরের কালনির্ণয়ে সাহায্য করুক না কেন, মন্দিরের দেহকেই আমাদের এ বিষয়ে প্রধানতঃ আশ্রয় করিতে হইবে। বলা হইয়াছে, ভুবনেশ্বর এবং উড়িষ্যার অন্যত্র মন্দিরের পরিমাপ লইয়া আমার এমন সন্দেহ হইয়াছে যে পূর্ব্বকালের অধিকাংশ মন্দির উচ্চে গর্ভের তিনগুণ হইত, পরবর্ত্তীকালের অধিকাংশ মন্দির পাঁচ বা সাতগুণ হইত।

নাগ ও নাগিনী
(বৈদ্যনাথ মন্দির, সোনপুর, উড়িষ্যা)

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুপাতটির ব্যবহার না করিলেও কালনির্ণয়ের ব্যাপারে মন্দিরদেহের অন্য এক অঙ্গের উপর বেশি নির্ভর করিতেন। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল, মন্দিরের দেওয়াল বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপে হেলিয়া থাকিত। পূর্ব্বকালে মন্দিরে নীচে হইতেই মারেণী (batter) আরম্ভ হইয়া উপরের দিকে মন্দিরের আয়তন ছোট হইয়া যাইত, পরের মন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত খাড়াভাবে উঠিয়া অবশেষে হঠাৎ ভিতরের দিকে বাঁকিয়া যাইত। তিনি খালি চোখে অনেক মন্দির দেখিয়া এই ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মাপজোপের সাহায্যে আমি এখনও এরূপ ধারণায় পৌছিতে পারি নাই। একই কালে বিভিন্ন মন্দিরের মারেণী বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহা ছাড়া মন্দিরদেহের মারেণী তাহার মুখ্য লক্ষণ নহে, গৌণ লক্ষণ। বিস্তৃত মন্দিরকে উচ্চতায় যদি বেশি দূর লইয়া যাওয়া না চলে, তবে তাহার দেওয়াল গোড়া হইতেই মারিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহা বহু উচ্চ পর্য্যন্ত তুলিবার সঙ্কল্প থাকে তাহা হইলে তাহা অনেক দূর সোজা তুলিয়া তাহার পর বাঁকাইয়া ছোট করিলেই চলে। মন্দিরের উচ্চতা গর্ভের অনুপাতে কতগুণ ইহাই মুখ্য লক্ষণ, মারেণীর পরিমাণ তাহার উপর নির্ভরশীল গৌণ লক্ষণ। উচ্চতা বাড়ানো কমানো আবার অন্তরের গঠনরীতির উপর নির্ভর করে। সেটিও মন্দিরের মুখ্য ধর্ম্ম। বাহিরের মারেণী নিতান্তই তাহার বহিঃপ্রকাশ। ইহা বিচার করিলে আমাদিগকে প্রথমে মন্দিরের কোন্‌টি মুখ্য, কোন্‌টি গৌণ লক্ষণ তাহা যথাযথভাবে জানিতে হয়, তাহার পর সেগুলিকে কালানুযায়ী সাজাইবার কথা উঠিতে পারে।

লতাকাম
( বৈতাল দেউল, ভুবনেশ্বর )

অতএব আমাদিগকে প্রথমে ধীরভাবে উত্তর-ভারতের সমস্ত রেখমন্দিরের পরিমাপ লইতে হইবে। তাহার পর শিলালেখের সাহায্যে বা যদি অন্য কোনও উপায় থাকে তাহার সাহায্যে সেই সমস্ত রেখমন্দিরগুলিকে দেশ ও কাল অনুসারে সাজাইতে হইবে। তাহার পর প্রতি মন্দিরের বিভিন্ন অংশের অনুপাত অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে হইবে। মুখ্য লক্ষণগুলিকে আশ্রয় করিয়া গৌণগুলিকে পরিহার করিতে হইবে। এই তো গেল দেহাবয়বের কথা। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটিতে কিরূপ সাজ, কোন্ অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও পরীক্ষা করিতে হইবে। এই সকল তথ্য সম্যকভাবে সংগৃহীত হইলে সেই সমুদ্র-সমান তথ্যপুঞ্জের সম্মুখে বসিয়া তুলনা ও বিচারের দ্বারা আমরা উত্তর-ভারতের মন্দির বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিভিন্ন কালে কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহার ইতিহাস রচনা করিতে পারিব, তাহার পূর্ব্বে নহে।

ইতিহাস রচনার এই বৈজ্ঞানিক সাধনায় পরিশ্রম আছে সত্য, কিন্তু আনন্দও প্রচুর আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। শিল্পী যামিনী রায়ের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি যে সকল ছবি আঁকিয়া থাকেন, তাহার অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির সাজাইবার বিভিন্ন স্থানের অলঙ্কারের মত মনে হয়। যামিনীবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে

বলিলেন, "এই ছবিটি মন্দিরের দেওয়ালের অমুক স্থানে থাকিবে, ঐটি অমুক স্থানে মানাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু আপনার মন্দির কোথায়?" তিনি সহাস্যে উত্তর করিলেন, "মন্দির উপস্থিত আমার কল্পনার মধ্যে রহিয়াছে। যে সকল চিত্র রচনা করিয়া যাইতেছি, ইহাদের সকলের স্থান সেই মন্দিরের মধ্যেই আছে। আজ উত্তর দিকের দেওয়ালের এক অংশ সাজাইতেছি, কাল চূড়ার পার্শ্ববর্ত্তী অংশ সাজাইতেছি, এমনই ভাবেই দিনের পর দিন চলিয়াছে। এখনও সত্য-সত্যই আমাদের দেশে ছবি আঁকিবার দিন আসে নাই। কিন্তু আমি তো ভবিষ্যতের মধ্যেই বাঁচিয়া আছি। ভারত স্বাধীন হইবে, তাহার বিশাল দেউল রচিত হইবে, সেই দেউলের পাদদেশে, শিখরে, শীর্ষে, সর্ব্বাবয়ব জুড়িয়া আমার ছবি সাজাইয়া দিব।"

বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যও হয়তো এইরূপই হইয়া থাকে। তাঁহার সত্যের মন্দির কবে যে রচিত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার সত্য তো আকাশপ্রমাণ কিন্তু তিনি যুগে যুগে যে শ্রম করিয়া যান, যে শ্রমের পরিবর্ত্তে তিনি অনাবিল আনন্দ লাভ করেন, অর্থের সমাগম যাহার দ্বারা হয় না, সেই শ্রমে সত্যের সৌধের শুধু ইষ্টক রচনাই হইয়া থাকে। সত্যের সৌধ কবে নির্ম্মিত হইবে, কবে পরিসমাপ্ত ও অলঙ্কৃত হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

আর যে মজুর, তাহার সে সংবাদে প্রয়োজনই বা কি?

# ক্ষণ-শাশ্বতী

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

১

জ্যোস্না-ধারায় বিশ্ব ডুবেছে, আলোক-প্লাবিত শরৎ-রাত,
সুনীল গগনে পাণ্ডুচন্দ্র মদির নেশায় তন্দ্রাতুর;
সাধ যায় সখি, তুমি এসে মোর চুপি চুপি হাতে মিলাবে হাত,
প্রথম-মিলন-রভস-আবেশে আমরা শুনিব রাতের সুর।
পুষ্পশাখীতে স্বপন এসেছে আকাশ হ'তে,
সন্ধ্যামালতী বিকাশের সুখে শিহরি' ওঠে,
মল্লিকা-বন পুলকি' উঠিল সফল-ব্রতে,
গন্ধগরবী রজনীগন্ধা নিভৃতে ফোটে।
কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনে ইন্দ্রজালের মোহিনী হাসে,
তারকার মালা নভোনীলিমায় পুষ্পশয়ন রচনা করে,
স্বপনবিলাসী প্রেমিক-প্রাণের কত না বাসনা আকাশে ভাসে,
সে বাসনা সখি, জ্যোস্নার সাথে শেষ হবে নাকি রাত্রি পরে?

২

পূর্ণিমা রাতে তোমারো প্রাণের প্রেমবিহঙ্গ মেলেছে পাখা?
নিদমহলের অন্ধ অতলে প্লাবন এনেছে চাঁদের আলো?
চোখে ঘুম নাই?—নয়নে কি যেন রূপালি আলোর আবেশ মাখা?
আঁধার-বিহারী প্রাণ বুঝি আজ আলো-জাগরণ বাসিছে ভালো?
নিশীথ আকাশ মুখর হয়েছে পূর্ণিমাতে—
মাতাল মলয় হ'ল গীতময় সুরভি-বনে,
কোন্ আনন্দে ধরা অনন্তে নৃত্যে মাতে—
মুক্তি-পাগল সে নেশা লেগেছে তোমারো মনে?
দিনের আলোয় জাগে না যে কথা, আঁধারে যে কথা ঘুমায়ে রয়,
জ্যোস্না-নিশীথে তারি গান শুনি ভুবন-ভুলানো তারার গানে;
তাহারি গমকে প্রাণের গোপন কামনা হয়েছে ছন্দোময়,
সুদূরবাসিনী, সেই সুর বুঝি পরশ করেছে তোমারো প্রাণে?

৩

পূর্ণিমা-নিশি প্রেম-দেবতার পূর্ণ-প্রেমের মিলন-সাধ—
আলোছায়াময় আমার জীবনে অক্ষয় হোক জ্যোস্না-আলো,
অক্ষয় হোক এই মুহূর্ত্ত যখন প্রেমের নেই প্রমাদ,
অক্ষয় হোক এ মন আমার যে মন তোমায় বাসিছে ভালো।
কাল নিশি-ভোরে জ্যোস্নার আলো মিলায়ে যাবে,
আকাশ-পরীরা দিনের আলোয় কভু কি জাগে?
এমন স্বপন মাটির জীবন কাল কি পাবে?
—অক্ষয় ক'রে রেখে যাব আমি এ অনুরাগে।
কুহেলি-মাখানো স্তিমিত আলোয় এস গো মরণ গোপনচারী,
এই মুহূর্ত্ত শাশ্বত ক'রে নাও তুলে নাও মৃত্যু-পার;
শাশ্বত হোক পূর্ণ এ প্রেম, শাশ্বত হোক স্বপন তারি,
শাশ্বত হোক প্রেমিক প্রাণের জ্যোস্না-আলোর মিলন-হার।

# আয়ুর্বেদে অস্ত্র-চিকিৎসা

ডাক্তার শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, ডি. টি. এম.

চিকিৎসা-বিদ্যা বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি, তার সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম এবং গোড়ার উৎস হচ্ছে আয়ুর্বেদ। এখন যাকে আমরা বলি—চিকিৎসা-বিজ্ঞান, তার প্রথম ভিত্তিস্থাপন জগতের মধ্যে সর্বপ্রথমে হিন্দুরাই করে এই ভারতবর্ষে, আর সেই যে প্রথম চিকিৎসা-শাস্ত্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়, তার নাম দেওয়া হয়—আয়ুর্বেদ।

আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র সর্বপ্রথমে কে রচনা করেছিলেন, সে কথা আমরা জানি না। সুশ্রুত ব'লে গেছেন যে, আয়ুর্বেদ এক প্রকার উপবেদ, এটা অথর্ববেদের একটি অংশ, এবং মানুষের কল্যাণের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা এক লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ এই উপবেদ রচনা ক'রে গেছেন। আয়ুর্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুশ্রুতের এই কথাটুকু মাত্রই আমাদের সম্বল, আর কিছু জানা যায় না। ব্রহ্মাকৃত সেই লক্ষ শ্লোকপূর্ণ আদিকালের আয়ুর্বেদ কোথাও পাওয়া যায় নি। অথর্ববেদের মধ্যে রোগ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কথা পাই বটে, কিন্তু সেগুলি বেশির ভাগই মন্ত্র, তাকে চিকিৎসা-বিদ্যা বলা চলে না।

সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র বলতে আমরা মূলত দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাই ; একটি হচ্ছে—চরক-সংহিতা, আর একটি—সুশ্রুতসংহিতা। চিকিৎসা-বিদ্যার দুটি বিভিন্ন মূল ধারা অবলম্বন ক'রে এই দুই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এবং এই দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্যও বিভিন্ন। চরকের মধ্যে আছে নানা ভৈষজ্য এবং রাসায়নিক ঔষধের গুণাগুণ, নানা রকম রোগের বর্ণনা, এবং কোন্ কোন্ রোগে কি কি ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগ করতে হবে তার ব্যবস্থা। অর্থাৎ বর্তমান কালে আমরা "মেডিসিন"(medicine) বলতে যা বুঝি, চরকসংহিতা হচ্ছে তাই। এর মধ্যে কায়া-চিকিৎসা আছে, রসায়ন আছে, বাজিকরণ আছে, আরও অনেক কিছু আছে ; মোট কথা, এখনকার দিনের ফিজিশিয়ানের কর্তব্যের গণ্ডির মধ্যে যা কিছু পড়ে, তাই নিয়েই চরকসংহিতা রচিত।

কিন্তু সুশ্রুতসংহিতা হচ্ছে একেবারে পাকা 'সার্জারি' (surgery)। এর মধ্যে আছে শল্যতন্ত্র অর্থাৎ major surgery, শালক্যতন্ত্র অর্থাৎ surgery of the ear nose throat and eye, এবং প্রসূতিতন্ত্র অর্থাৎ obstetrics। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে যে ভাবে ভাগ করা হয়েছে, খ্রীষ্টজন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বের অতি প্রাচীনতম যুগেও চিকিৎসা-বিদ্যাকে ঠিক তেমনই ভাবেই ভাগ ক'রে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

চরকসংহিতা সুশ্রুতের চেয়েও প্রাচীন। এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন চরক মুনি, এবং খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই চরক মুনি কে, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। চরকের নিজের উক্তিতে দেখা যায় যে, এই আয়ুর্বেদ-বিদ্যা প্রথমে ব্রহ্মার কাছ থেকে শেখেন দক্ষ ; দক্ষের কাছে এই বিদ্যা শেখেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; তাঁদের কাছে শেখেন ইন্দ্র ; ইন্দ্রের কাছে শেখেন ভরদ্বাজ ; ভরদ্বাজের কাছে শেখেন আত্রেয় ; আত্রেয় মুনির দুজন শিষ্য

ছিলেন, চরক মুনি তার মধ্যে একজন। চরক মুনি এই বিদ্যা আত্মস্থ না রেখে একে গ্রন্থাকারে প্রণয়ন করেন। তারপর এই চরক মুনির গ্রন্থ পরে আরও অনেকের দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও নানা রকম ভাবে পরিবর্ধিত হয়ে এসেছে। পাতঞ্জলি এর ওপর কলম চালিয়েছেন ; চক্রপাণিদত্ত এর ওপর কলম চালিয়েছেন ; হরিচন্দ্র, শিবদাস প্রভৃতি কত লোকেই যে কলম চালিয়েছেন, তার ঠিক নেই। যতদিন এই বিদ্যার উন্নতি হয়েছে, ততদিন এই গ্রন্থের নব নব সংস্করণ ঘটেছে, তারপর এক সময় থেমে গেছে। সুতরাং এখন আমরা যে চরকসংহিতা দেখতে পাই, তার মধ্যে বহু যুগের ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত।

সুশ্রুতসংহিতাও অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। সুশ্রুত ঋষি ছিলেন বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে, দেবতাদের সার্জন—ধন্বন্তরির কাছে তিনি এই সার্জারির বিদ্যা শিক্ষা করেছেন, এবং এই ধন্বন্তরি ও অন্যান্য পূর্বতন মহামহারথী সার্জনদের প্রণিপাত জানিয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য সুশ্রুতের গ্রন্থও অনেক পরিবর্ধিত হয়েছে। এই সূত্রে পরবর্তী যুগের চক্রপাণিদত্ত, ভাস্কর, মাধব, দল্লানাচার্য, বৌদ্ধযুগের নাগার্জুন প্রভৃতি অনেকেরই নাম পাওয়া যায়। এই সুশ্রুতসংহিতা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব্য ভাষায় অনূদিত হয় এবং সেই পুস্তকের নাম —কিতাব-ই-সুশ্রুদ্। তৎপরে আরব দেশ থেকে যে এই বিদ্যা পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে, এ কথা সহজেই অনুমেয়।

সুশ্রুতের পরেও আরও অনেক প্রাচীন আয়ুর্বেদগ্রন্থ আছে, যেমন বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, মাধবকরের নিদান অর্থাৎ প্যাথলজি, চক্রদত্তের চিকিৎসাসারসংগ্রহ, শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধরসংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি। কিন্তু সার্জারি-সম্পর্কীয় অস্ত্রশস্ত্রাদির কথা বলতে গেলে প্রধানত আমাদের সুশ্রুতকেই অবলম্বন করতে হবে, কারণ অস্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে অমন বিস্তারিত বিবরণ আর কোনও গ্রন্থে নেই। এর সম্পূর্ণ দুটি অধ্যায়ে আছে কেবল অস্ত্রবর্ণনা, এবং একটি অধ্যায়ে আছে তার প্রয়োগবিধি।

সুশ্রুত চিকিৎসা-যন্ত্রগুলিকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। ধারালো যন্ত্রগুলিকে বলেছেন শস্ত্র, আর যেগুলি কাটবার যন্ত্র নয় অর্থাৎ যার কোন ধার নেই, তাকে বলেছেন যন্ত্র। সুশ্রুত-সংহিতায় ২০ রকম ধারালো শস্ত্রের এবং ১০১ রকম ধারবিহীন যন্ত্রের বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, এই সকল যন্ত্র এবং শস্ত্র অধিকাংশই লোহার এবং ইস্পাতের নির্মিত। সুশ্রুত স্পষ্টই বলেছেন—যন্ত্রসকল "তানি প্রায়শে লোহানি ভবন্তি"। লোহা এবং ইস্পাত তখনকার দিনে খুব ভাল রকমেই প্রস্তুত হ'ত, এবং লোহার যন্ত্র কিরূপে প্রস্তুত করতে হয়, কিরূপে তাতে শাণ দিতে হয়, কেমন ক'রে চকচকে করতে হয়, ইস্পাতে কেমন ক'রে পান দিতে হয় এবং অস্ত্রের ধার কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয়, তা তখনকার সার্জনরা ভাল রকমই জানতেন। পান দেওয়া বা টেম্পার করাকে বলা হ'ত পায়ন, এবং ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রকে কি ভাবে পায়ন ক'রে নিতে হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সুশ্রুত লিখে গেছেন। অনেক রকম প্রলেপ মাখিয়ে জলে এবং তেলে ডুবিয়ে ঐ সকল অস্ত্র পায়ন করা হ'ত। সুশ্রুত বলেছেন, ঐ সকল যন্ত্র যেন মজবুত হয়, সুদৃশ্য হয়, যেন সমাহিত হয় অর্থাৎ

হাত দিয়ে অনায়াসে ধরবার এবং চালনা করবার উপযুক্ত হয়, এবং কোনও ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করবার পূর্বে দেখে নেওয়া হয় যে, তার দ্বারা গায়ের ওপরকার রোম সহজে কেটে যায় কি না। এই রকম পরীক্ষা না ক'রে নিয়ে যেন কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা না হয়।

লোহা এবং ইস্পাত ছাড়া অন্যান্য ধাতু দিয়েও অস্ত্র-নির্মাণ করার বিধি ছিল। চোখের অপারেশন করবার অনেক যন্ত্র তামা দিয়ে তৈরি হ'ত। ছানি তোলবার যন্ত্র এবং চোখে লেখনা প্রয়োগ করবার শলাকা তামা দিয়ে তৈরি হ'ত। এ ছাড়া সোনা এবং রূপা দিয়েও কয়েক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করবার কথা আছে। গরু এবং ছাগলের শিং দিয়েও কয়েক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হ'ত। এই সকল যন্ত্র বেশির ভাগই চুষণ-যন্ত্র, যাকে আমরা বলি—suction apparatus কিংবা cupping apparatus, এবং ঐ সকল যন্ত্র "বিষ পূয়াস্রা চুষণ নিমিত্তং শরীরেষু যুজ্যতে"।

এই সমস্ত যন্ত্র যাতে নষ্ট না হয় এবং যাতে ধার বজায় থাকে, এরূপভাবে রাখবার ব্যবস্থাও ছিল। ধারালো যন্ত্রগুলিকে রাখতে হ'ত শাল্মলি কাঠের খাপের মধ্যে, "ধার সংস্থাপনার্থং শাল্মলি ফলকমিতি"। তা ছাড়া অন্যান্য অস্ত্র রাখা হ'ত চামড়ার খাপের মধ্যে। নিয়ম ছিল যে, এই সমস্ত খাপ ১২ আঙুল লম্বা হবে, ৯ আঙুল চওড়া হবে, এবং প্রত্যেক যন্ত্রের জন্যে তাতে স্বতন্ত্র খোপ থাকবে, আর সেই খাপটি মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। আজকাল ঐ রকম যন্ত্র রাখবার খাপ আমরা এখন দেখতে পাই নাপিতদের কাছে।

এখন যন্ত্রগুলির কিছু মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া যাক।

সুশ্রুত বলেন যে, ধারবিহীন যন্ত্রের মধ্যে সার্জনের হাতখানাই সবচেয়ে প্রধান,—"যন্ত্রশত-মেকোত্তরমত্র হস্তমেব প্রধানতমং যন্ত্র"; তার কারণ যন্ত্র যতই ভাল হোক, তার সমুচিত ব্যবহার হাতের উপরেই নির্ভর করে।

যন্ত্রগুলিকে সুশ্রুত প্রধানত ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা—

১। স্বস্তিক-যন্ত্র—২৪ রকম। এই যন্ত্রগুলির মুখ স্বস্তিক চিহ্নের মত, অর্থাৎ ক্রস দেওয়া, কতকটা আমরা যাকে বলি Lion forceps, Hawk forceps—সেই গোছের সাঁড়াশি-যন্ত্র। এই যন্ত্র ব্যবহার হ'ত হাড়ের ভিতর থেকে কোন বাইরের জিনিস, তীরের ফলা প্রভৃতি টেনে বের করবার জন্যে। এই ধরণের যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন আকারের হ'ত। কোনটা বা সিংহমুখ স্বস্তিক, কোনটা ব্যাঘ্রমুখ, কোনটা রিক্ষমুখ, কোনটা মার্জারমুখ, কোনটা শৃগালমুখ ইত্যাদি। আবার কতকগুলো ছিল পাখীর ঠোঁটের মত, অর্থাৎ সরু মুখওয়ালা, যেমন কাকমুখ, কঙ্কমুখ, উলুকমুখ, শ্যেনমুখ, গৃধ্রমুখ, ক্রৌঞ্চমুখ, ভৃঙ্গরাজমুখ, আভাভঞ্জনমুখ ইত্যাদি। অর্থাৎ যে বস্তু যেমন মুখ দিয়ে ধরবার সুবিধা হয়, সেই বস্তুর জন্যে তেমন মুখওয়ালা যন্ত্রই ব্যবহার করতে হবে, সেইজন্য এত রকমের স্বস্তিক যন্ত্রের সৃষ্টি। এখনকার সার্জারিতেও যে নানা রকমের মুখওয়ালা forceps আছে, তা বোধ হয় সকলেই জানেন।

২। সন্দংশ-যন্ত্র—২ রকম। এর এক রকম হচ্ছে চিমটার মত, কিংবা কামারদের সাঁড়াশির মত, আর এক রকম হচ্ছে স্বর্ণকারের দাঁত দেওয়া সন্না যন্ত্রের মত। আজকালকার দিনে যাকে বলে dressing forceps।

৩। তাল-যন্ত্র—২ রকম। এইগুলি মুখ-বাঁকানো হুক অর্থাৎ আঁকশির মত যন্ত্র। কানের ভিতর, নাকের ভিতর কিংবা গলার ভিতর থেকে কোন কিছু বিজাতীয়-পদার্থ টেনে বের করবার জন্যে এইগুলি ব্যবহৃত হ'ত।

৪। নাড়ী-যন্ত্র—২০ রকম। এইগুলি টিউবের মত ফাঁপা যন্ত্র, অর্থাৎ নানাবিধ দুমুখ-খোলা নলের মত যন্ত্র। এর ব্যবহার অনেক স্থলেই হ'ত। শরীরের ভিতর কোন কিছু পরীক্ষা করতে হলে speculum-এর মত এর ব্যবহার ছিল, কোথাও থেকে পুঁয-রক্ত বের ক'রে দেবার জন্যে, মলদ্বার এবং যোনিদ্বারে অস্ত্র এবং ঔষধ প্রয়োগ করবার জন্যে, অর্শ রোগের জন্যে, এবং নানা রকম কাজের জন্যে এইগুলির ব্যবহার ছিল।

৫। শলাকা-যন্ত্র—২৮ রকম। এইগুলি ছুঁচালো-মুখযুক্ত নানাবিধ শলা। কোনটা বা probe হিসেবে, কোনটা swab হিসেবে ব্যবহার হ'ত। এর মধ্যে কোনটি কর্ণশোধন ( কানের জন্যে ), কোনটি গর্ভশঙ্কু ( মৃত বৎস বের করবার জন্যে ), কোনটি বা অগ্রবক্র ( পাথুরির জন্যে ), কোনটি শরপুঙ্খমুখ, কোনটি অর্ধচন্দ্রমুখ।

৬। উপযন্ত্র—২৫ রকম। এর মধ্যে অনেক কিছুই আছে। রজ্জু আছে, বেণীকা বা ligature আছে, পট্য অর্থাৎ ব্যাণ্ডেজ আছে। ব্যাণ্ডেজ আবার হরেক রকমের আছে। পাশ বা বন্ধনী আছে, মুদ্গর আছে, "অশ্বাদীনাং পুচ্ছভবকেশা" অর্থাৎ horse hair আছে, চামড়া সেলাই করবার জন্যে অশ্মন্তক বল্কল বা ক্ষোমসূত্র আছে, প্রবাহনযন্ত্র অর্থাৎ drainage apparatus আছে। আজকালকার যেমন ঘা ধোলাইয়ের পিচকারি হয়, তখন অবশ্য তেমন ছিল না,—কেবল একটা সরুমুখ নল ছিল এবং তাতে একটা চামড়ার থলি লাগানো থাকত, ঐ থলির ভিতরকার ঔষধাক্ত জল নলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ ক'রে ঘা ধোলাই করত। এ ছাড়া অগ্নি ক্ষার ভেষজাদি সমস্তই উপযন্ত্রের অন্তর্গত।

এই সব গেল ধারবিহীন যন্ত্র। ধারালো যন্ত্র অর্থাৎ শস্ত্র ছিল ২০ প্রকার। এইগুলির নাম ছিল,—মণ্ডলাগ্র শস্ত্র অর্থাৎ গোলমুখ ছুরি, করপত্র অর্থাৎ করাত, বৃদ্ধিপত্র অর্থাৎ ক্ষুর, নখশস্ত্র অর্থাৎ নরুন, মুদ্রিকা অর্থাৎ সরুমুখ ছুরি, উৎপলপত্র অর্থাৎ চ্যাটালো-ব্লেডযুক্ত ছুরি, অর্ধধার অর্থাৎ আধখানা ব্লেডে ধার দেওয়া ছুরি, সূচি বা ছুঁচ, কুশপত্র অর্থাৎ খুব সরু-মুখ ছুরি, অন্তর্মুখ অর্থাৎ কাঁচি, কুঠারিকা অর্থাৎ কুড়ুলের মত কাটবার যন্ত্র, ব্রীহীমুখ অর্থাৎ trocar, অরা অর্থাৎ বাটালির মত যন্ত্র, বেতসপত্রকা, দন্তশঙ্কু, এশনি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, আমরা যন্ত্র ও শস্ত্রগুলির মধ্যে কয়েকটির মাত্র নাম করলাম, কিন্তু এর আরও অনেক আছে। এই সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার কোথায় কি রকম করতে হবে, সে সম্বন্ধেও বিশেষ নির্দেশ সুশ্রুতসংহিতায় দেওয়া আছে। কুড়ি রকম অপারেশনের বর্ণনা তাতে পাওয়া যায়; যথা—নির্ঘাতন ( টেনে বের করা ), পূরণ ( শূন্যস্থান ভরাট করা ), বন্ধন ( বাঁধা ), ব্যুহন ( কাটা মুখ জোড়া দেওয়া ), বর্ত্তন ( কুঁকড়ে দেওয়া ), চালন, বিবর্তন ( ঘুরিয়ে দেওয়া ), বিবরণ ( ফাঁক ক'রে দেওয়া ), পীড়ন ( টেপা ), মার্গ-বিশোধন ( মূত্রনালী মলনালী প্রভৃতি পরিষ্কার ক'রে দেওয়া ), বিকর্ষণ ( যন্ত্রের দ্বারা টেনে বের করা ), আহরণ ( খুঁজে বের করা ), উন্নমন ( ভাঙা জিনিসকে ঠিক

ক'রে বসানো ), বিনমন ( ভাঙা হাড় মুখোমুখি লাগিয়ে দেওয়া ), ভঞ্জন ( অপারেশনের পূর্বে প্রস্তুত ক'রে নেওয়া ), উন্মথন ( probe দিয়ে শোষের নালি খুঁজে ঠিক করা ), আচুষণ ( রক্ত বা পূঁয চুষে বের ক'রে নেওয়া ), দারণ ( কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া অর্থাৎ amputation ), ঋজুকরণ ( বাঁকা জিনিস সোজা করা ), প্রক্ষালন ( ধোলাই করা ), প্রধমন ( powder ফুঁ দিয়ে প্রয়োগ করা অর্থাৎ insufflation ), প্রমার্জন ( রগড়ে বের ক'রে দেওয়া )।

এ ছাড়া আট রকমের বড় অপারেশান বা শস্ত্রপ্রয়োগের কথা আছে। যথা—ছেদন ( কেটে বাদ দেওয়া অর্থাৎ Excision ), ভেদন ( কেটে ফাঁক ক'রে দেওয়া বা incision ), লেখন ( চেঁছে দেওয়া ), বেধন ( ফুটো ক'রে দেওয়া বা puncture করা ), এষণ ( প্রোব চালিয়ে ফাঁক করা ) আহরণ ( দোষাক্ত দ্রব্য কেটে কেটে বের ক'রে দেওয়া ), বিস্রবণ (গভীর স্থান থেকে পূঁয-রক্ত নির্গমন ক'রে দেওয়া অর্থাৎ aspiration), সীবন ( সেলাই করা )।

যে সকল অপারেশনের নাম করা হ'ল, তাতেই বোঝা যাবে যে, তখনকার সার্জারি এখনকার চেয়ে খুব বেশি অনগ্রসর ছিল না। এটা খুব আশ্চর্য কথা কিছু বলছি না। এটা আপনারা সকলেই জানেন যে, যুদ্ধ বাধলেই সার্জারির উন্নতি হয়। তখনকার দিনের মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে, তাতে বোঝা যায় যে, সে যুদ্ধ খুব সামান্য ছিল না। যেখানে ও রকম ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে আহত ব্যক্তিদের জন্যে সার্জারির ব্যবস্থাও যে রীতিমত ছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, তখন cranial operation অর্থাৎ মাথার খুলি কেটে অপারেশন পর্যন্ত করা হ'ত। ভোজপ্রবন্ধ নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, ভোজ রাজার মাথার মধ্যে একবার অপারেশন করা হয়েছিল, তখন তাঁকে সম্মোহিনী অর্থাৎ সম্ভবত সোমরস খাইয়ে অজ্ঞান করা হয়, এবং অপারেশনের পর সঞ্জীবনী পান করিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরানো হয়। এ নিতান্ত সামান্য অপারেশনের কথা নয়। এ ছাড়া আরও অনেক রকম বড় বড় অপারেশন যে সেকালে করা হ'ত, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চোখের ছানি কাটা, প্রসব করতে অপারগ মায়ের গর্ভ থেকে যন্ত্রের দ্বারা সন্তান প্রসব করানো, পেটের ভিতর অস্ত্রপ্রয়োগ করা এবং ছিন্ন অন্ত্র জুড়ে দেওয়া, অ্যাম্পুটেশন করা, ভাঙা হাড় জুড়ে দেওয়া, হার্নিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি আরাম করা, অর্শ এবং ভগন্দরের অপারেশন করা, শিরা কেটে গেলে রক্তপাত বন্ধ করা, বসন্তরোগের টিকা দেওয়া, এই সমস্ত অপারেশনের কথা কেবল সুশ্রুতে নয়, আরও অনেক গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। হাতের কিংবা পায়ের হাড় ভেঙে গেলে অর্থাৎ fracture হ'লে রোগীকে কেমন ক'রে কপাট শয়নে অর্থাৎ fracture bed-এ শুইয়ে রাখতে হবে এবং ভাঙা হাড়ের দু দিকে দুখানা কাঠ এবং পিছন দিকে একখানা কাঠ দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে যতক্ষণ না হাড় জোড়া লাগে, তার বিশদ বর্ণনা দল্লনাচার্যের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শুধু এই নয়, তখনকার দিনেও যে হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল, এবং রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্যে স্বতন্ত্র রকম গৃহ নির্মাণ ক'রে স্বতন্ত্র রকম লোকজন নিযুক্ত ক'রে কেমন ব্যবস্থা ধনীদের পক্ষে করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধে চরকসংহিতায় অনেক উপদেশ আছে।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে পঠিত।

# বাংলার ভৌগোলিক রূপ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী কবি সতেন্দ্রনাথ জন্মভূমির স্বরূপ বর্ণনা উপলক্ষে বলেছেন—

মুক্ত-বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে ;—
বাম হাতে যার কম্‌লার ফুল, ডাইনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক-ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী-অপ্‌রাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে, শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

এই কয়েকটি পংক্তির মধ্যেই কবি অত্যন্ত আশ্চর্য রকমে বাংলার রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালী জাতির পবিত্র তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ এই বাংলা দেশ। তার উত্তরে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট হিমাদ্রি পর্বত সদাজাগ্রত প্রহরীর মত এ দেশকে হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ এবং পার্বত্য জাতিসমূহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে। দক্ষিণে তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র নিয়ত তার পাদদেশ ধৌত করছে এবং বহু দেশ-বিদেশ থেকে আহৃত পণ্যরত্নরাশি তার চরণে উপহার দিচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিমে কমলালেবুর পুষ্প-সুগন্ধে আসামভূমি এবং মহুয়াসুরভিত ছোট নাগপুর প্রদেশ তার পার্শ্ব রক্ষা করছে। এই পরিবেষ্টনের মধ্যে বিরাজ করছেন কনকধান্য-শোভিতা অতসী-পদ্ম-অপরাজিতা প্রভৃতি পুষ্প-ভূষিতাদেহা আমাদের স্নেহময়ী জননী-স্বরূপিণী এই বঙ্গভূমি।

বঙ্গভূমি নদীমাতৃক দেশ। বহু নদ-নদীর জলপ্রবাহেই বাংলার শোভা, শক্তি ও সম্পদ। তাই কবি অন্যত্র বলেছেন—

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তা ঝুরির শতেক ডোর ;
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।

গঙ্গানদী যে বাংলা দেশের প্রাণের নাড়ী, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই গঙ্গার পলি মাটিতেই বাংলার উৎপত্তি ; এই গঙ্গার প্রবাহই আর্যাবর্তের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অমূল্য রত্নরাশি বাংলা দেশে বহন ক'রে এনেছে ; এই গঙ্গার পথেই বাঙালী একদিন দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এক দিকে সিংহল এবং অপর দিকে যবদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্বীয় সভ্যতার বাণী ও পতাকা বহন ক'রে নিয়েছিল ; আবার এই গঙ্গার পথেই আর এক দিন পোর্তুগীস, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত বাঙালীর যোগসাধন করেছিল। বস্তুত, গঙ্গা এবং তার সমস্ত শাখা ও উপনদী মিলে বাংলার ভূমি, বাংলার শক্তি ও সম্পদ, বাংলার জাতীয় সভ্যতা সমস্ত কিছুরই উপাদান জুগিয়েছে। তাই কবি যখন বাংলার প্রাণের নাড়ী গঙ্গার গৌরব স্মরণ ক'রে বাংলাকে "গঙ্গাহৃদি বঙ্গদেশ" ব'লে সম্বোধন করেন, তখন

তার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারি। বস্তুত, বাংলার ভূমি হচ্ছে গাঙ্গেয় ভূমি এবং তার সভ্যতাকেও গাঙ্গেয় সভ্যতা ব'লে বর্ণনা করলে ভুল হবে না। এই জন্যেই সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যে বাংলার উল্লেখের সঙ্গে প্রায়শই গঙ্গার উল্লেখও দেখতে পাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গার তীরে 'গঙ্গা' নামেই একটি নগরী অবস্থিত ছিল। এই বন্দরটি থেকে বহু মূল্যবান পণ্যসম্ভার দেশ-বিদেশে রপ্তানি হ'ত। তার মধ্যে 'গাঙ্গেয়' নামে অতি চমৎকার মসলিনবস্ত্র পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু ছিল। ভারতের মহাকবি কালিদাসও বঙ্গদেশকে গঙ্গাস্রোতোন্তরবর্তী ব'লেই বর্ণনা করেছেন।

বাংলা নদীমাতৃক দেশ ব'লে বাঙালী জাতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই নাবিকবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলেই বাঙালী অতি সহজে সমুদ্রগামী হয়ে সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ও শ্যাম কাম্বোজ প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে বৃহত্তর বঙ্গসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিল, তখনকার দিনে সমুদ্রগামী বাঙালী নাবিকদের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি নগরী। বাংলার সেই গৌরবমণ্ডিত সুবিখ্যাত তাম্রলিপ্তি বন্দর এখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার একটি সামান্য শহরে পরিণত হয়েছে। গঙ্গা এবং তার শাখা-প্রশাখার কৃপায় বাঙালীরা যে শুধু নাবিকবিদ্যায় নিপুণ হয়েছিল তা নয়, জলযুদ্ধেও বাঙালীর নৈপুণ্য সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেছিল। কবি কালিদাস গঙ্গাস্রোতোন্তরবর্তী বঙ্গদেশের বর্ণনা উপলক্ষে বাঙালীকে নৌসাধনোদ্যত ব'লে বাঙালীর নৌযুদ্ধনৈপুণ্যের কথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন। মৌর্যরাজাদের আমলে রথ অশ্ব গজ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে একটি নৌবহরের সংবাদও আমরা পাই। এই নৌবহরটি যে গঙ্গাবক্ষেই বিচরণ করত, তাতে সন্দেহ নেই। পালবংশ এবং সেনবংশের রাজারাও গঙ্গাবক্ষে সর্বদাই একটি নৌবাহিনী রাখতেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকেও বাংলার ভূঞাদের নৌযুদ্ধের নৈপুণ্য সর্বত্র বিস্ময়ের সঞ্চার করত। কাজেই গঙ্গানদী যে শুধু বাংলার শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছে তা নয়, যুগে যুগে বাঙালীর বাহুতে শক্তিও জুগিয়েছে এই নদী। বস্তুত, হিমাদ্রিপর্বত ও হিমাদ্রিদুহিতা গঙ্গানদীই যুগে যুগে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে বাঙালীকে সাহায্য ক'রে আসছে।

এক দিকে শত্রুপথরোধকারী হিমালয় এবং অপর দিকে পণ্যসম্ভারবাহী সমুদ্র আর উভয়ের মধ্যে যোগসূত্ররূপী গঙ্গাপ্রবাহ—এই তিনে মিলেই বাংলার যথার্থ স্বরূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে। ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, বহু বহু যুগ পূর্বে আমাদের এই শ্যামল বঙ্গভূমির অধিকাংশই সুনীল সমুদ্রের গর্ভে বিলীন ছিল। কিন্তু যুগের পর যুগ ধ'রে ভাগীরথীর অক্লান্ত প্রবাহ হিমালয় ও আর্যাবর্তের পলিমাটি ঢেলে ঢেলে সমুদ্রের গর্ভ থেকে উদ্ধার করেছে আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিকে। তাই কবি বলেছেন—

গৌরী তুমি, তৈরি তুমি গিরিরাজের গৈরিকে ;
লক্ষ্মী তুমি, জন্ম নিলে বঙ্গসাগর-মন্থনে।

সুতরাং এই সাগরোত্থিতা লক্ষ্মীস্বরূপিনী বঙ্গভূমিরচনা যে গঙ্গারই অতুল কীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গঙ্গা যে শুধুই কীর্তিময়ী তা নয় ; যুগে যুগে বাংলার কীর্তি বিনষ্ট ক'রে এই গঙ্গা কীর্তিনাশা নামও অর্জন করেছে। শুধু গঙ্গা নয়, গঙ্গার সমস্ত শাখা এবং উপনদীগুলিও ইতিহাসের প্রতি পর্বেই

বাংলার প্রাচীন কীর্তির বিলোপ সাধন ক'রে নব নব কীর্তির ভিত্তি রচনা করেছে। বাংলার নদীগুলি চিরপরিবর্তনশীল ; বাঙালী জাতিও তাই পরিবর্তনপ্রিয়। স্থিতিশীলতা বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির স্বভাব নয়। বাংলার নদ-নদীগুলি কালে কালে নিজেদের প্রবাহের পথ পরিবর্তন করেছে এবং ফলে বাংলার ব্যবসা, বাণিজ্য, রাষ্ট্র সব কিছুরই রূপ বদলে গেছে। তাই বাংলার প্রাচীন কীর্তিকেন্দ্রগুলিও এত সহজে বিলুপ্ত হয়েছে। কখনও নদী এগিয়ে এসে রাজধানী বা শিল্পকেন্দ্রগুলিকে গ্রাস করেছে। আবার কখনও নিজের ধারাকে ঐসব কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে সেগুলিকে শুকিয়ে মেরেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নূতন ধারার তীরে তীরে নব নব শিল্প, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের কেন্দ্র গ'ড়ে উঠছে। এইটেই হচ্ছে বাংলা দেশের ও বাংলার ইতিহাসের একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব। এই সততপরিবর্তন ও নিত্যনবীনতার কথাটি মনে না রাখলে বাংলার মর্মের স্বরূপটিই ধরা যাবে না। এই জন্যই দেখি বাংলা দেশে পৌণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম, নবদ্বীপ, তাম্রলিপ্তি, রাজমহল, পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, সপ্তগ্রাম, হুগলী, চন্দননগর, কলকাতা প্রভৃতি বাংলার মর্মকেন্দ্রগুলি এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত একে একে জ্ব'লে উঠছে, আবার কিছুকাল পরেই নিভে যাচ্ছে এবং তৎক্ষণাৎ আর একটি সহসা দীপ্ত হয়ে উঠছে। বাংলার নগরকেন্দ্রগুলির এই উত্থান-পতনের ইতিহাস নদীর ধারা-পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সে খুব ঔৎসুক্যজনক ইতিহাস। কিন্তু সে কথা আলোচনা করার সময় আমাদের নেই। তবে এটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়ার রূপ-পরিবর্তনে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের রূপ বদলে গেছে ; আবার গঙ্গার ধারা স'রে যাওয়াতে পশ্চিম বঙ্গেও বিপর্যয় ঘ'টে গেছে। আজকাল গঙ্গার জলস্রোত পদ্মার পথে বাংলার বুকের উপর দিয়ে এগিয়ে একেবারে পূর্বপ্রান্তে সাগরে মিশেছে। কিন্তু এক সময়ে গঙ্গার মূল ধারা পদ্মার পথে না গিয়ে ভাগীরথীর পথ ধ'রেই সাগরে যেত। তখন ছিল পশ্চিম বঙ্গের গৌরব ও সমৃদ্ধির যুগ। তখন তার তীরে তীরে ধনজনময় শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি দীপালীর মত উজ্জ্বল হয়ে জ্ব'লে উঠেছিল। সে সময়ে হুগলী শহরের অনতিদূরে ত্রিবেণীর নিকটে গঙ্গা ত্রিধা বিভক্ত হয়ে ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী নামে তিনটি বৃহৎ ধারাপথে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হ'ত এবং ঐ তিনটি ধারার উৎপত্তি স্থলে বাংলার গৌরব সপ্তগ্রাম নামক বৃহৎ নগরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সরস্বতীর ধারা তখন এত বৃহৎ ছিল যে, তার উপর দিয়ে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজসমূহ সপ্তগ্রাম বন্দরে এসে উপস্থিত হ'ত। ঐ তিন ধারার মিলনস্থলটি ত্রিবেণী নামে অভিহিত হয়। প্রয়াগেও গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নামে তিনটি নদী মিলিত হয়েছে ব'লে ঐ মিলনস্থলটিও ত্রিবেণী নামে পরিচিত। কিন্তু প্রয়াগের ত্রিবেণী ও বাংলার ত্রিবেণীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রয়াগে তিনটি বিভিন্ন ধারা একত্র মিলিত হয়ে ত্রিবেণীর সৃষ্টি করেছে, আর বাংলায় একই গঙ্গার ধারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ত্রিবেণীর সৃষ্টি করেছে। তাই প্রয়াগের ত্রিবেণী হচ্ছে যুক্তবেণী আর বাংলার ত্রিবেণী হচ্ছে মুক্তবেণী। কিন্তু হিন্দুর কাছে উভয় ত্রিবেণী সমান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। তাই কবির একথা মিথ্যা নয় যে—

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।

কিন্তু আজ বাংলার সেই পরম পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীর কি অবস্থা? আর ত্রিবেণীর তীরবর্তী সেই প্রাচীন সমৃদ্ধ নগর সপ্তগ্রাম আজ কোথায়? সপ্তগ্রাম আজ বসতিশূন্য বিজন বনভূমিতে পরিণত হয়েছে; তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত বাঙালীর হৃদয় থেকে বিলুপ্ত হ'তে বসেছে। তার কারণ কি? কারণ এই যে, গঙ্গা তার ধারা পরিবর্তন ক'রে ভাগীরথী ছেড়ে পদ্মার পথে চলতে শুরু করেছে এবং তার ফলে এক সময়কার পণ্যসম্ভারপূর্ণ সমুদ্রপোতবাহী সরস্বতী এবং যমুনা নদীও প্রায় সম্পূর্ণ ম'রে গিয়ে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রাণের নাড়ী শুকিয়ে গেছে, তাই সপ্তগ্রামও আর জীবিত নেই।

আমরা দেখলাম, হিমালয়ের পাদোত্থিত নদীগুলি কেমন ক'রে বাংলা দেশকে গড়েছে, আবার যুগে যুগে কেমন ক'রে তাকে পুনঃ পুনঃ ভেঙে ভেঙে নব নব রূপ দিয়ে চলচ্চিত্রের মত চঞ্চল ক'রে তুলেছে। কিন্তু বঙ্গভূমির এই অস্থিরতার কথাটাই তার পরিচয়ের সবটুকু নয়। এই চঞ্চলতার অন্তরালে বাংলা দেশের একটি স্থায়ী ও অচঞ্চল প্রকৃতি রয়েছে। সমস্ত গতি, পরিবর্তন ও চঞ্চলতার অভ্যন্তরে বাংলাভূমির আসল রূপটি স্থির হয়ে বিরাজ করছে। তাকেও জানা চাই। নতুবা বাংলাকে ঠিকমত জানা হবে না। বাংলা দেশের মানচিত্রের দিকে তাকালেই, তার যে আকৃতিটি চোখে পড়ে, মূলত তার কোন পরিবর্তন নেই। তার সমস্ত ভাঙাগড়া ভিতরে ভিতরে চলছে; কিন্তু বাইরে তার রূপটি ঠিকই আছে। বাংলা দেশের এই যে বাহ্য স্থির মূর্তি, তাও নদীরই দান—এইটেই মজার কথা। মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বাংলার নদীগুলি সমস্ত দেশটিকে কয়েকটি অতি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত করেছে। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে এক ভাগ, আধুনিক পরিভাষায় তার নাম রাজশাহী বিভাগ; দ্বিতীয়টি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী বর্ধমান বিভাগ; তৃতীয়টি ভাগীরথী, পদ্মা ও মধুমতীর মধ্যবর্তী প্রেসিডেন্সি বিভাগ; চতুর্থটি ব্রহ্মপুত্র ও মধুমতীর পূর্বতীরবর্তী ঢাকা বিভাগ এবং পঞ্চমটি মেঘনার পূর্বস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগ। বাংলা দেশের এই যে পঞ্চাঙ্গ মূর্তি, এটা স্পষ্টতই গ'ড়ে উঠেছে বাংলার নদীগুলির কৃপাতেই। কিন্তু যে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, সেটি এই যে, বাংলা দেশের এই নদীনির্মিত বিভাগগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রায় অপরিবর্তিতভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। বাংলার শিল্প-বাণিজ্য ও রাজকীয় কেন্দ্রগুলির উত্থান-পতন ঘটেছে; কিন্তু বাংলার এই যে নদীসীমাঙ্কিত পঞ্চমুখী মূর্তি তা বরাবর প্রায় একভাবেই রয়েছে। কিন্তু এই বিভাগগুলি মোটামুটি এক থাকলেও ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এদের নামপরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, উত্তর বঙ্গ বা রাজশাহী বিভাগের প্রাচীন নাম ছিল বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি। পশ্চিম বঙ্গ বা বর্ধমান বিভাগ প্রাচীনকালে রাঢ় বা বর্ধমান-ভুক্তি নামে পরিচিত ছিল, রাঢ়ের দক্ষিণ অংশ সুহ্ম এবং উত্তর অংশ ব্রহ্ম নামেও অনেক সময় অভিহিত হ'ত। দক্ষিণ বঙ্গ বা প্রেসিডেন্সি বিভাগকে বলা হ'ত বাগ্‌ড়ি। আধুনিক ঢাকা বিভাগেরই প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ; এখন ঐ নামটিই আমাদের জন্মভূমির প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরাংশ সমতট এবং দক্ষিণাংশ হরিকেল নামে পরিচিত ছিল। শুধু তা নয়, অতি প্রাচীনকালে বাংলা দেশের এক একটি বিভাগে এক একটি বিশেষ জাতি বাস

করত এবং তাদের নাম থেকেই বিভাগগুলির বিভিন্ন নামও উৎপন্ন হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাচীনকালে বাংলা দেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিল। কালক্রমে কেমন ক'রে ওই বিভিন্ন জনপদগুলি একত্র মিলিত হয়ে বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার সৃষ্টি হ'ল এবং কেমন ক'রে সমস্ত জনপদগুলি একই "বাংলা" নামে অভিহিত হ'ল, সে এক ঔৎসুক্যকর ইতিহাস। কিন্তু সে ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

প্রাচীনকালের কতকগুলি স্বতন্ত্র জনপদ মিলে আধুনিক বাংলা জনপদটি গ'ড়ে উঠেছে। এই জনপদের অর্থাৎ বাংলা-ভাষী জনসমষ্টির বাসভূমি যে বাংলা দেশ, তার পরিধিটাও জানা প্রয়োজন। মানচিত্রে বাংলা প্রদেশের যে আয়তন দেখি, স্বাভাবিক বাংলা জনপদের আয়তন তার চেয়ে অনেক বড়। পূর্ব দিকে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া শ্রীহট্ট ও কাছাড়—এই তিনটি জেলা আসলে বাংলা জনপদেরই স্বাভাবিক অংশ। পশ্চিম দিকে আধুনিক বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণা এই দুইটি জেলার অধিকাংশ, সমগ্র মানভূম জেলা এবং সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমাও বাংলা-ভাষী জনপদের অত্যাজ্য অংশ। পূর্ব দিকে মনস, বরাক ও কর্ণফুলি নদী এবং পশ্চিম দিকে কুশী নদী, তেলিয়াগঢ়ী গিরিবর্ত্ম ও সুবর্ণরেখা নদী স্বাভাবিক বাংলা জনপদের সীমা রক্ষা করছে। এই সীমারেখার বাইরেও বাঙালী জাতি ও বাংলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে প'ড়ে বৃহত্তর বাংলা গ'ড়ে তুলেছে।*



* হিনু ( রাঁচী ) ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।
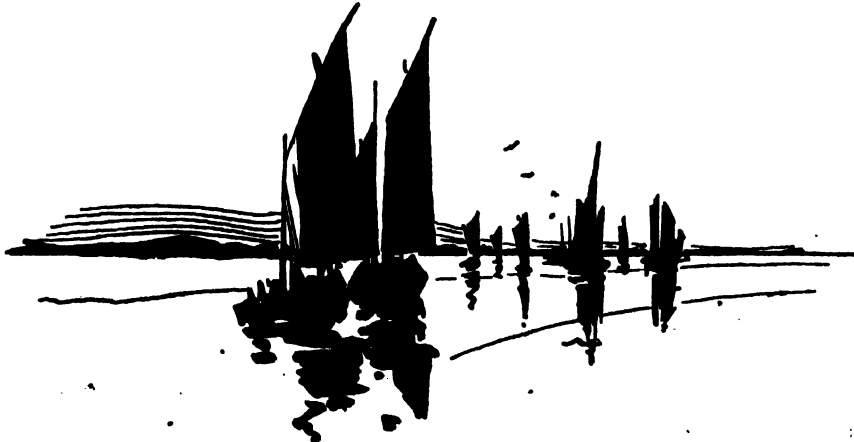
# মৃত্যু

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

১

## জন্ম

সেবার হঠাৎ আমাদের বাড়ি বদল করতে হ'ল। জ্যাঠামশাই পশ্চিমে কাজ করেন, তিনি ছ মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন, আমাদের পুরোনো বাড়িতে জায়গায় কুলোল না।

জ্যাঠামশায়ের মেজ ছেলে হিপ্‌নটিজ্‌ম জানতেন। একদিন দারুণ বাদলা, কি ক'রে সন্ধ্যা কাটানো যায় ভাবছি। কে একজন বললেন, কাউকে হিপ্‌নটাইজ করা হোক।

আয়োজন করতে সময় লাগল না।

মেজদার সাব্‌জেক্ট ছিল তাঁর সেজ বোন,—মোটা গোলগাল শান্তশিষ্ট মেয়ে। মেজদা বলতেন, ওটা বুঁচকি, ওকে হিপ্‌নটাইজ করা সোজা।

প্রথম দিন তাকে হিপ্‌নটাইজ ক'রে খেলা চলল, তাকে ভুল নাম শিখিয়ে দেওয়া, মিছরি ব'লে চক খাওয়ানো। তারপর এই নেশা আমাদের পেয়ে বসল। সপ্তাহে দু দিন তিন দিন আমাদের খেলা বসে। সাব্‌জেক্ট প্রায়ই হয় বীণা, মাঝে মাঝে বা অন্য কেউ।

একদিন ব'সে ব'সে বীণা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চোখ বোজে না, অথচ চোখে দৃষ্টি নেই, নীরব নিস্পন্দ। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, হ'ল কি!

মেজদা বললেন, বোধ হয় স্পিরিট। তার হাতে কাগজ পেন্সিল দিয়ে বললেন, যদি কেউ এসে থাকেন, লিখে জানান। বীণা কাগজে একটা ঢেরা কাটলে।

আমরা থ হয়ে ব'সে রইলাম। ভূতের আবির্ভাব আগে কখনও দেখি নি। ভয়ও যে হচ্ছিল না, এমন নয়।

মেজদা বললেন, আপনার নাম?

বীণা লিখলে, সুরমা বোস।

—আপনি কে?

—আমাদের এই বাড়ি।

সর্ব্বনাশ, এটা ভূতের বাড়ি নাকি!

মেজদা বললেন, আপনি একে ভর করলেন কেন?

বীণা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল, তারপর লিখলে, দয়া ক'রে আমার একটি উপকার করবেন?

—বলুন।

—এই বাড়ির মালিক এখন কোথায় আছেন জানেন?

—না। আমরা তাঁর এজেন্টের কাছে বাড়ি পেয়েছি।

—তা হ'লে তাঁর কাছেই ঠিকানা পাবেন। আমি একটা চিঠি যদি লিখে দিই, সেটা তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন ?

—হঠাৎ তাঁকে চিঠি কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি ?

—আমার বড় দরকার। আজ দেড় বছর ধ'রে এই বাড়িতে আমি অপেক্ষা করছি। দিন আমার এটুকু উপকার ক'রে।

—আপনি তাঁর কে হন ?

—স্ত্রী।

—বেশ, চিঠি লিখে দিন। কাগজ-টাগজ সব দিচ্ছি।

—কিন্তু আমার চিঠি হয়তো খুব বড় হবে।

—মিডিয়মকে তো একসঙ্গে বেশিক্ষণ সীয়ান্সে বসিয়ে রাখা যাবে না। ওর শরীর খারাপ হ'তে পারে।

—না না, তার দরকার নেই। বরং আমি দু তিন দিনে লিখব একটু একটু ক'রে।

মেজদা ইতস্তত ক'রে বললেন, কিন্তু অতটা স্ট্রেন এর ওপরে ফেলা—

বীণা লিখলে, করবেন না এইটুকু উপকার ?

জ্যাঠাইমা উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়স কত ?

—আমার তো এখন বয়স ব'লে কিছু নেই। মরবার সময় আমার বয়স হয়েছিল চব্বিশ।

জ্যাঠাইমা বললেন, রীণার বয়েসী। বিমল, না করিস নে।

রীণা তাঁর বড় মেয়ে, চব্বিশ বছরে তিনি মারা যান।

মেজদা বললেন, আচ্ছা লিখুন আপনি।

—তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে সবাইকে সরিয়ে দিন। আপনারা দুজন শুধু থাকবেন, আর মিডিয়ম।

আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম।

তিন দিন ধ'রে লেখা শেষ হ'ল। মেজদা পড়েন নি, জ্যাঠাইমা প'ড়ে বললেন, বিমল, ঠিকানা খুঁজে চিঠি পাঠিয়ে দাও, দেরি ক'র না।

আমরা বললাম, বাড়ি বদলাব।

জ্যাঠাইমা বললেন, না।

খবর নিয়ে চিঠি পাঠানো হ'ল, কিন্তু কদিন পরে রেজেস্ট্রি খাম ফেরত এল। তাঁরা তখন পাটনায় ছিলেন, ভূমিকম্পের পরে পোস্ট-অফিস আর তাঁদের খুঁজে পায় নি।

জ্যাঠাইমা বললেন, বিমল, যার চিঠি তাকে খবর দাও।

আবার সীয়ান্স বসানো হ'ল। প্রেতাত্মা এসেই লিখলেন, চিঠিটা পাঠিয়েছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ।

জ্যাঠাইমা বললেন, চিঠিটা তো তাঁরা পান নি। তাঁদের পাওয়াই যায় নি।

আর কিছু বলবার আগেই আত্মা হঠাৎ মিডিয়মকে ছেড়ে চ'লে গেলেন। আর কোনদিন তাঁর সাড়া পাই নি।

চিঠিটা জ্যাঠাইমার কাছেই থেকে যায়। তাতে কি লেখা হয়েছিল কেউ জানতাম না, তিনি ছাড়া।

কিছুদিন পরে তাঁরা চ'লে গেলেন। যাবার আগে জ্যাঠাইমা আমাকে বললেন, এই খামটা তুমি রাখ। যদি খোঁজ পাও, পাঠিয়ে দিও।

আমি বললাম, যদি না পাই ?

জ্যাঠাইমা একটু ভেবে বললেন, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিও। তাঁরা যদি কেউ কোথাও বেঁচে থাকেন, হয়তো তাঁদের চোখে পড়বে। একে অবহেলা ক'র না ; মনে ক'র, এ তোমার রীণাদিরই কাজ তুমি করছ।

তাঁদের আর খোঁজ পাই নি। আমার সম্প্রতি শরীর অসুস্থ, কদিন বাঁচব বা তাঁদের খুঁজে বার করবার অবসর আর পাব কি না বলতে পারি না। অগত্যা চিঠিটা কাগজে পাঠিয়ে দিয়ে যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য করলাম।

শ্রীচরণেষু,

আমার নতুন সম্বোধনটা দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ো না। তোমাকে চিরদিন যা ব'লে সম্বোধন করেছি, সে আর এখন করতে পারি নে। তুমি আমার চাইতে বড়। শুধু বয়েসে বড় ব'লে নয়, আমি এখন পৃথিবীর জীবনের বাইরে, তার বয়েসের হিসেব দিয়ে আমাকে আর মাপা চলে না। কিন্তু তা ছাড়াও তুমি এমনিই আমার চাইতে অনেক বড়, আমার চাইতে ঢের ঢের উঁচুতে তোমার স্থান। জীবনের যুদ্ধে আমি হেরে গেছি। এ যে কি পরাজয় তুমি ভাবতে পারবে না, আমিও পারি নি। এই পরাজয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখছি তোমাকে, জীবনে তুমি জয়ী হয়েছ, তুমি বেঁচে আছ। হ্যাঁ, বেঁচে থাকাই জেতা, আমি তা বুঝতে পারলাম অত্যন্ত দেরি ক'রে—এত দেরি ক'রে যখন আর প্রতিকারের উপায় নেই, ভুল শুধরে গোড়া থেকে আবার নতুন ক'রে জীবনের পত্তন করবার সুযোগ নেই। জীবনকে যখন হাতে পেয়েছিলাম, তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, ভেবেছি—জিতলাম। আমার জীবনকে আমি নিজের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করেছি, এই তো বাঁচা। অথচ সে যে আমার কত বড় ভুল ছিল, সে আজ শুধু আমিই জানি।

জীবনের আমার শেষ হয়েছে। যাকে পেয়েছিলাম বিধাতার দান, তাকে হারিয়েছি খেলার ছলে। তার জন্যে দুঃখ এখন করতে পারি, কিন্তু সে দুঃখের তো সান্ত্বনা নেই। পৃথিবীর, জীবন্ত মানুষের স্পর্শে স্পন্দিত পৃথিবীর সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে, হাজার চাইলেও আর তাকে নতুন ক'রে বাঁধা যায় না। যায় না জানি, কিন্তু জানা আর মেনে নেওয়া এক বস্তু নয়। প্রতিটি অণু আমার আজ কাঁদছে—পৃথিবীর জীবন একবার, একটি মুহূর্ত্তের তরে আবার ফিরে পাবার জন্যে—সেই জীবন যে জীবনকে আমি নিজের হাতে শেষ করেছিলাম।

হ্যাঁ, আত্মহত্যাই আমি করেছিলাম, তোমরা কেউ ধরতে পার নি। অথচ তার কি কারণ

ছিল ? দুঃখ ? কিন্তু দুঃখ বলতে কি বোঝায়, তার তো কোনও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। দুঃখ মানে যদি হয় অভাব, কিছু চেয়ে না পাওয়া, দুঃখ আমার ছিল না। আমি যা চেয়েছি, পেয়েছি চিরকাল, যেদিকে চলতে চেয়েছি চলেছি। কিন্তু কি ফল হ'ল তার! চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় দেখলাম, সামনে পথ আর নেই, নেই পাশে তাকাবার স্থান, নেই ফিরে যাবার উপায়। ফিরে যেতে চাই কেন, সে তোমাকে ব'লে বোঝানো যাবে না। হাওয়ার মধ্যে যে অহর্নিশি ডুবে আছে, সে কি কল্পনা করতে পারে, বায়ুহীন জায়গায় হঠাৎ এসে পড়লে তার কি যন্ত্রণা হয় ? জীবন সেই হাওয়া ; তুমি—তোমরা রয়েছ তার মধ্যে ডুবে। তার বাইরে কি আছে তোমরা জান না। তোমরা কল্পনা কর, মৃত্যুর পরে আছে বিস্মৃতি, আছে মুক্তি। বিস্মৃতি কি অত সোজা ? যে পৃথিবী তার সবখানি স্নেহে শতবাহু মেলে জড়িয়ে ধরে তার সন্তানকে, তার মায়া কি কাটানো যায় শুধু মৃত্যুর আঘাতে ?

বলতে পার, তোমাকে এসব বলছি কেন ? বলবার কোনও মানে নেই, আমি জানি ; এতে শুধু তুমি ব্যথাই পাবে, সেও জানি। কিন্তু আর কাকে বলব, কে আমার আর আছে ? এই দু বছর ধ'রে আমি একা। সে কি ভয়ানক নিঃসঙ্গতা ! একা ব'সে ব'সে এই দু বছর আমি চেয়ে খালি দেখেছি, চিরে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি আমার জীবনকে, যে জীবন আমি হেলায় হারালাম। অনেক কথা জ'মে উঠেছে আমার মনে, একা তার ভার আর আমি বইতে পারছি নে।

তোমাদের আমি ঠকিয়েছি। হ্যাঁ, সমস্ত জীবন ধ'রে ঠকিয়েছি—তোমাকে আর সবাইকে, নিজেকেও। নিজেকে ঠকানোর শাস্তি আমি পেয়েছি, পাচ্ছি, হয়তো আরও পাব। পাই পাব, তার জন্যে আমার ক্ষোভ নেই। পায়ে দ'লে এলাম যে স্বর্গকে, তার দুঃখের চাইতেও বড় হয়ে বাজবে এমন আঘাত পৃথিবীতে নেই।

কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মাপ চাইবার আছে। মাপ এর আছে কিনা জানি নে, মাপ ক'র ব'লে দাবি জানাবার জোরও আমার মনে আর নেই। তবু বলছি—মাপ করতে ইচ্ছা না হয়, ক'র না, কিন্তু শোন। একদিন আমাকে তুমি ভালবাসতে, তার দোহাই দেওয়া আর আমার সাজে না। তবু সেই ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, শোন, শোন আমার কথা। আমাকে স্মরণ ক'রে চোখের জল ফেল—এ প্রার্থনা আমি করি নে, সে দাবি আমি নিজেই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তবু শোন, মনকে আমার হাল্কা করতে দাও। জীবনে কাউকে কোনদিন যা আমি জানাই নি, সেই কথা আজ আমায় তোমাদের বলতে হবে, নইলে আমি শান্তি পাচ্ছি নে। চোখে জল নিয়ে একথা শুনো না, ফেলো না দীর্ঘশ্বাস, আমি তার যোগ্য নই। অনাত্মীয় নিঃসম্পর্ক কারও কথা শুনছ, এমনই ক'রেই শোন, যেমন শোন তুমি তোমার কোর্টের কেস, যেমন পড় খবরের কাগজে অপরিচিত কারও কাহিনী।

তোমার সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয়, আমার বয়স তখন উনিশ। আমার জীবনের সুরু, আমার ভুলের সুরু তার ঢের আগে। ঠিক যে কোথায়, আমি আজও জানি নি, কোনদিনও জানি নি। বড় গর্ব্ব ছিল আমার, আমি ভুল করি নে। আজ আমার ভুল তুমি ধ'রে দাও, ব'লে দাও, কোন্ জায়গাতে তার সুরু হয়েছিল।

আমাদের বাড়ি যখন তুমি দেখেছ, তখন তার ভগ্ন দশা। কি ক'রে আমাদের বাড়ি ভাঙল, তুমি তার কিছু হয়তো শুনেছ, কিন্তু তার ভেতরের ইতিহাস তুমি জান না।

আমরা ভাইবোনে বারো জন, আমি দ্বিতীয়।

আমাকে গ্রন্থকীট ব'লে তুমি ক্ষেপাতে, মনে আছে? সে স্বভাবটা আমার বাবার কাছে পাওয়া। ছেলেবেলায় আমি খুব অসুখে ভুগতাম। প্রায়ই শুয়ে থাকতে হ'ত। বাবা নানান রকমের বই এনে দিতেন, তাই প'ড়ে প'ড়ে সময় কাটাতাম। বড় হয়ে অসুখ সারল, কিন্তু পড়ার রোগ সারল না। বাবার ছিল প্রকাণ্ড লাইব্রেরি, সারাদিন আমি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতাম। কি পড়ব, কতখানি পড়ব, তার কোনও স্থির ছিল না; যখন যা হাতের কাছে পাই, বুঝি, না বুঝি, সবার ওপরই চোখ বুলিয়ে যাওয়া আমার স্বভাব হয়ে উঠল। এমনই ক'রে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম অল্প বয়সেই অতি-অধীতা। বইয়ের মধ্যে সারাক্ষণ মুখ গুঁজে থাকবার জন্যে সবার কাছে কথাও শুনেছি কম নয়, কিন্তু এ নেশা আমার কাটে নি, ভাইবোনদের সঙ্গেও খেলাধুলো আমি কমই করেছি। বইয়ের চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার আর কেউ ছিল না।

তখন আমার বয়স চোদ্দ, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। দাদার বয়স আঠারো, সে পড়ে থার্ড ইয়ারে। একদিন কি নিয়ে মার সঙ্গে দাদা তর্ক করছিল। আমি সেইখান দিয়ে যাচ্ছি, কানে এল মার কথা, দেখ খোকা, সব কিছু গায়ের জোরে চালাতে চাস নে। এমনিই ওরা অতগুলো হয়েছে ব'লে আমাকে ঢের কথা শুনতে হয়, তার ওপর তুই যদি আবার এমন করিস—

কথাটা আমি ভুলতে পারলাম না। মা ছিলেন স্বভাবতই অতি শান্তপ্রকৃতির, কখনও মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। তাঁর মুখে এই কথা যেন অতর্কিতে আমাদের বাড়ির একটা অজ্ঞাত দিক আমার চোখের সামনে অনাবৃত ক'রে দিলে, এবং কিছুদিন পরে যখন আমার আবার একটি ভাই হ'ল, লজ্জায় যেন ম'রে গেলাম। কিসের লজ্জা, কেন লজ্জা, নিজে ভাল বুঝতাম না, কিন্তু তবু মনে হ'ল, এ যেন আমারই অপরাধ। পরদিন ক্লাসে টীচার জিজ্ঞেস করলেন, কাল স্কুল কামাই করেছি কেন? জবাব দিতে আমি ঘেমে উঠলাম। ক্লাসের একটি মেয়ে ব'লে দিলে, ওর কাল ভাই হয়েছে। আমার মুখটাকে আমি তখন সবার দৃষ্টি থেকে লুকোতে পারলে বাঁচি।

আর একদিন। আমি ফার্স্ট ইয়ারে, দাদা সেবার এম.এ. দেবে। ছুটিতে দাদা বাড়ি এসেছে। সকালবেলা আমি অঙ্ক কষছি, পাশের ঘরে বাবার কয়েকজন বন্ধু আর দাদা। বাবা ওপরে।

বাবার বন্ধুদের একজন বললেন, তারপর, খোকা, পাস ক'রে কি করবে ভাবছ?

দাদা বললে, কিছুই ভাবছি নে।

তিনি বললেন, তার মানে?

দাদা বললে, মানে, অত আগে থাকতে ভাবতে নেই। যা ভেবে রাখব তা প্রায়ই হয়ে ওঠে না, তখন হয়তো মন খুঁতখুঁত করবে। তার চাইতে কিছু প্ল্যান না করাই ভাল।

তিনি বললেন, তবু তো লোকে একটা ইচ্ছেও রাখে। কোন্ লাইনে যেতে চাও, প্রফেসরি করবে, না কোনও আপিস-টাপিসে চাকরি দেখবে?

দাদা বললে, এখুনই চাকরি নেব কি! বরং পাস ক'রে আবার আর একটা সাব্‌জেক্টে পড়া যাবে। কি রিসার্চ করবার সুবিধে যদি পাই—

তিনি বললেন, ওসব কি আর হয়ে উঠবে! যা সম্ভব তার মধ্যেই ভাব, তোমার বাবার তো রিটায়ার করবার সময় হ'ল, এবার আয় করতে তোমাকে বেরোতেই হবে।

দাদা বললে, হয়, সে তখন দেখা যাবে।—ব'লে বেরিয়ে এল।

ভদ্রলোক বললেন, সোনার টুকরো ছেলে। অথচ দাদা আমার যা ফ্যাক্টরি খুলে বসেছেন তার কাছে ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, he has got to be sacrificed.

দাদা তখনও বেশি দূর যায় নি। চেয়ে দেখলাম, তার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

আমাদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন বাবার ছেলেবেলার বন্ধু, তাঁকে আমরা কাকাবাবু ব'লে ডাকতাম। বাবার পরে তাঁর মত আত্মীয় আমাদের কেউ ছিল না। আর বাবা ছিলেন রাশভারী মানুষ, কাকাবাবুই ছিলেন আমাদের অন্তরঙ্গ।

দাদা কলকাতায় ফেরবার আগের দিন কাকাবাবু আমাদের দুজনকে খাবার নেমন্তন্ন করলেন।

দাদা বললে, তুই যা, আমি যাব না।

আমি বললাম, বিভা দুঃখ করবে।

বিভা কাকাবাবুর মেয়ে, দাদার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হচ্ছিল।

দাদা বললে, সেইজন্যেই যাব না।

বললাম, তার মানে? ঝগড়া হয়েছে?

দাদা বললে, না। ভেবেচিন্তে দেখলাম, বিয়ে আমার হবে না। অতএব স'রে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অথচ আমি জানতাম, বিভাকে দাদা ভয়ানক ভালবাসে।

বললাম, হ'ল কি তোমার হঠাৎ?

দাদা বললে, বৈরাগ্য মানুষের এমনই হঠাৎই সমুপস্থিত হয়। ওটা মহাপুরুষদের লক্ষণ।

পাস ক'রে বেরিয়েই দাদা কলকাতায় ভাল চাকরি পেয়ে গেল। পড়াশোনার সুবিধে হবে ব'লে ভাইবোনদের সবাইকে সে কলকাতায় তার কাছে নিয়ে গেল। আমি যেতে চাইলাম, দাদা বললে, না। তোকে ছেড়ে বাবা থাকতে পারবেন না।

বাবা দাদার বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। দাদা বললে, বিয়ে করব না।

তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে দাদার খুব তর্ক হ'ল, কিন্তু দাদা কিছুতেই টলল না, কেন বিয়ে করতে চায় না, তাও কিছু খুলে বললে না।

আমি বললাম, দাদা, আমি জানি।

দাদা অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, না জানলেই ভাল হ'ত। যাক, যাই জেনে থাকিস, খবরদার মুখ খুলিস নে। ওঁরা শুনলে দুঃখ পাবেন।

বললাম, কিন্তু বিভা?

দাদা বললে, তাকে আমি বুঝিয়ে বলেছি। সে তোর মত হাঁদা নয়।

বললাম, কিন্তু কি ক'রে বললে তাকে ?

দাদা বললে, সত্যি কথা বলি নি, তাকে ঠকিয়েছি। তুই এ নিয়ে কখনও তাকে কোনও কথা বলবি নে, বল। সব বলেছি আমি এক কাকাবাবুকে। তিনি শুনে আমার কথায় রাজি হয়েছেন।

বললাম, কিন্তু এই কি ঠিক হচ্ছে ? আমার তো মনে হয়, তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল। ভাগ্যে যা হবার আছে, সে হবেই।

দাদা বললে, ভাগ্য মানুষের নিজের হাতে, নিজের কাজ দিয়ে তাকে গ'ড়ে নিতে হয়। নইলে মানুষ কিসের র‍্যাশনাল জীব ?

বললাম, কিন্তু তোমার এ রাগ তো চিরদিন থাকবে না। মিথ্যে বিভাকেই দুঃখ দিলে।

দাদা বললে, আমি রাগ করেছি তোকে কে বললে ? খুব বুদ্ধি তো!

বললাম, কর নি ?

দাদা বললে, একটুও না। তোদের সবার ভার নেওয়া এখন আমার ডিউটি। আমার যতটা শক্তি আছে ব'লে মনে করি, সে এর পেছনেই আপাতত লাগবে, তাই আর বোঝা বাড়াতে চাই নে। রাগ করব আমি কার ওপর ?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম, আমিও বিয়ে করব না।

দাদা হেসে বললে, কি করবি তবে ?

বললাম, তুমি যা করতে যাচ্ছ।

দাদা বললে, কিন্তু তার তো দরকার নেই। আমার একার শক্তিতে যা হ'তে পারে, তার জন্যে তোকেও আবার টেনে নেওয়াটা ওয়েস্ট অব এনার্জি।

বললাম, অত আমি বুঝি নে। আমার কথা—আমি বিয়ে করব না। তুমি যদি পার, আমি পারব না কেন ?

দাদা বললে, পারবি নে এমন কথা আমি বলছি নে, কিন্তু এ পারা সহজ নয়। আর এ করতে হ'লে তোকে বাবার কথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

বললাম, হয়, দাঁড়াব।

দাদা বললে, ডেঁপোমি করিস নে। আমি যা করছি সে দরকার আছে ব'লে। তুই করলে সেটা হবে সখে করা। নিজের সখের জন্যে বাবাকে মাকে দুঃখ দিবি ?

দাদা চ'লে গেল। কিন্তু আমার মনে খটকা লেগে রইল। বিয়ের মধ্যে এমন কি আছে, যার জন্যে বিয়ে করতেই হবে, যার জন্যে তার বাইরে থাকাটা কৃচ্ছ্রসাধন ?

আমাকে সান্ত্বনা দেবার, সঙ্গ দেবার পাত্র আজীবন—বই। এবারেও আমার সমস্যার জবাবের জন্যে তারই শরণ নিলাম। পড়লাম হ্যাভেলক এলিস, পড়লাম আরও সব বই—যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব; স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণের গোড়ায় কি থাকে, সেকথা আমার জানা চাই।

বই প'ড়ে প'ড়ে আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম, আরও পেলাম মনের দিক থেকে একটা কঠিন

ঔদাসীন্য। বিয়েকে—প্রেমকে যখন দূর থেকে নাম শুনে চিনে রেখেছিলাম, তখন সে ছিল রহস্যের ধোঁয়ায় ঘেরা, কল্পনার রঙে ঢাকা। এখন তাকে দেখলাম যুক্তির ধারে, চিরে, বিশ্লেষণ ক'রে, বৈজ্ঞানিকের কাচের চোখে খুঁটিয়ে। মানুষের দেহের রক্তমাংসের অণুগুলোকে কেটে ছিঁড়ে চটকে দেখলে আর তার সম্বন্ধে মোহ থাকবার কথা নয়;—মুগ্ধতা অন্ধতারই আর এক পিঠ। তাই বিজ্ঞান আর যুক্তির চোখ দিয়ে যখন পুরুষ-মেয়ের সম্বন্ধকে আকর্ষণকে চিরে চিরে দেখা শেষ হ'ল, তখন আর মনে আমার রোমান্সের রেশও বাকি রইল না। আমি পুরোদস্তুর স্কেপ্‌টিক—সিনিক হয়ে উঠলাম।

এক এক সময় নিজেরই আশ্চর্য্য লাগত, এই বইগুলোর মধ্যে কি এমন ছিল, যা কদিনে আমার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এনে দিলে? মানুষের মনের তত্ত্ব ভাল ক'রে বুঝতাম না, নিজের মনকে বিশ্লেষণ ক'রেও তার এই পরিবর্ত্তনের খেই ধরতে পারতাম না, কিন্তু তবু একে অস্বীকার করবার জো ছিল না। বলতে পারি নে, হয়তো ছেলেবেলা থেকে বইয়ের যে অস্বাভাবিক বেষ্টনীর মধ্যে আমার মন বেড়ে উঠেছিল, তারই এটা ফল, হালের পড়াটা উপলক্ষ্য মাত্র; হয়তো স্বভাবতই আমার মধ্যে অলক্ষ্যে কঠোরতার পরিমাণ বেশি ছিল, এতদিন ধরা পড়ে নি। অথবা হয়তো গত কবছরের সঞ্চিত গোপন লজ্জা ও গ্লানির প্রতিক্রিয়া আমার মনকে অবশ ক'রে তুলেছিল।

কিন্তু কারণ তার যাই থাক, মন আমার দিনকের দিন যুক্তির মায়ায় বাঁধা পড়ল। এবং এর মধ্যে আমি ভারী একটা আনন্দ পেলাম, গৌরব বোধ করলাম। আমার মনকে আমি আয়ত্ত করেছি, তাকে চিনেছি; আমি ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, আমি জ্ঞানী। এতে আনন্দ হবে না? সবাই যেখানে ভুল করে, আমি সেখানে দেখে শুনে পা ফেলতে পারব, আমি নিজেকে চালাতে পারি, আমার সেন্টিমেণ্ট নেই, তার ঝোঁকে অন্ধ হয়ে আমি কোনদিন পথ চলব না, সে ভয় আমার কেটে গেছে। এই তো জয়, এই তো জীবন। আমার প্রবৃত্তিকে, আমার ভাগ্যকে আমি নিয়ন্ত্রিত করব যুক্তি দিয়ে, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে; আমি মানুষ, আমি র‍্যাশনাল। এই নতুন চিন্তা, নতুন মন হ'ল আমার গোপন বিত্ত, সবার দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে একে আমি বুকের তলায় লুকিয়ে পুষে বড় করতে লাগলাম।

এই দু বছরের মধ্যে দাদা কখনও একসঙ্গে বেশি দিন বাড়িতে এসে থাকে নি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলত, ছুটি নেই। তার বিয়ের কথাও আর ওঠে নি। বিভার বিয়ে হয়ে গেল।

আমার বি. এ. পরীক্ষার যখন অল্প বাকি, দাদার নামে একটা কুৎসা রটল। কলকাতায় দাদার বাড়ির কাছেই এক বড়লোকদের বাড়ি ছিল। তাদের আশ্রিত একটি বিধবা মেয়েকে তারা হঠাৎ বাড়ি থেকে বার ক'রে দেয়। দাদা জানতে পেরে তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়, তারপর সে সুস্থ হয়ে উঠলে ছেলেসুদ্ধ তাকে এক নারী-আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসে। কলকাতায় আমাদের এক নিকট-আত্মীয় থাকতেন, তিনি দেশে এসে ব্যাপারটাকে বেশ পল্লবিত ক'রে রটিয়ে দিলেন। ফলে আমাদের শহরময় দাদার নামে যাচ্ছেতাই সব কথা ছড়াতে লাগল।

আমি দাদাকে লিখলাম, এ কি শুনছি?

দাদা লিখলে, তুইও বিশ্বাস করেছিস?

আমি লিখলাম, আমি করি নে, কিন্তু বাবা হয়তো করেছেন।

দাদা লিখলে, বাবা আমাকে চেনেন। তবু যদি তিনি এ বিশ্বাস করেন, তবে সে নিয়ে নিজের জন্যে প্লীড করবার আমার প্রবৃত্তি হবে না।

বাবা দাদাকে লিখলেন, তুমি এ চিঠি পেয়েই সে মেয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি চ'লে আসবে। নইলে জানবে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

দাদা লিখলে, তার সঙ্গে আমার কোনও খারাপ সম্পর্ক ঘটেছে, এ যখন আপনি বিশ্বাস করতে পেরেছেন, তখন আমি আর কিছু বলতে চাই নে। তাকে আশ্রয় আমি দেওয়া উচিত ব'লেই দিয়েছিলাম, তার জন্যে কৈফিয়ৎ দেবারও আমার কিছু নেই।

বাবা চারদিকের গুঞ্জনে পাগল হয়ে উঠেছিলেন, এ চিঠির মধ্যে দাদার অভিমানটা তাঁর চোখে ধরা পড়ল না, সে যে জিদ দেখিয়েছে, সেইটেই তাঁর বাজল। লিখলেন, সেই মেয়ের পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করবার দুঃসাহস যখন তোমার হয়েছে, তখন আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কও ফুরোল। তুমি আমাকে আর কখনও মুখ দেখিও না। আমার ছেলেমেয়েরা—যারা তোমার কাছে আছে, তারা যদি এখনও আমার থাকে, তাদের এখানে পাঠিয়ে দিও ; তোমার শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত তাদের মনে যদি ঢোকাতে পেরে থাক, পাঠিও না। তাদেরও আমি আর চাই নে।

দাদা লিখলে, তাদের আমি পাঠাব না। আপনার বয়স হয়েছে, তাদের ভার এখন আমার। মুখও আপনাকে আমি আর দেখাব না।

আমাকে দাদা লিখলে, তাঁকে বলিস, এ আমার রাগের কথা নয়। যদি কোনদিন আমাদের ফিরে চান, ডাকলেই সবাইকে পাবেন।

দাদার শেষ চিঠি পেয়ে বাবা গুম হয়ে গেলেন। কাউকে কোন কথা বললেন না, ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে জানলা দিয়ে আকাশপানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাবার মত দুঃসাহস কারও ছিল না। তবু তিনি সামলে নিলেন, পরদিন থেকে বাড়ির সমস্ত-কিছু আবার আগের মতই চলতে লাগল। এ ধাক্কা সইতে পারলেন না শুধু একজন, তিনি আমার মা।

মা মারা যাবার পরে বাবা হঠাৎ ভেঙে পড়লেন। আমাকে কাছে ডেকে বললেন, রাণু মা, আমার দিন ফুরিয়ে এল, এইবার তোমার বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজব।

আমি বললাম, আমি বিয়ে করব না।

শুনে তিনি তাঁর সেই বিশাল দুই শান্ত চোখ তুলে আমার পানে চাইলেন, বললেন, রাণু মা, তুইও—?

তাঁর চোখে যে আর্ত্তি ফুটে উঠল, তা চেয়ে দেখতে পারলাম না, ঝুঁকে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে বললাম, রাগ ক'র না বাবা, নাই বা করলাম বিয়ে। বিয়ে না করলে কি হয়?

তিনি আমার চুলের মধ্যে দুই হাত পুরে দিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। শেষে বললেন, আমি তো ম'রে যাব। তোর অবস্থা কি হবে?

বললাম, মাস্টারি করব।

তিনি হাসলেন, শ্রাবণসন্ধ্যার রৌদ্র। বললেন, পাগলি, তোর একটা সুব্যবস্থা না ক'রে আমি মরি কি ক'রে, বল তো ?

চুপ ক'রে রইলাম। বাইরে তিনি কঠিন, অন্তরে তাঁর স্নেহের কি ফল্গু বইত, সে জানতাম বাড়ির মধ্যে আমিই।

আবার বললেন, বিয়ে করতে চাস নে কেন ? আমায় বল, আমাকে তো তোর লজ্জা নেই।

তিনি জানতেন না, তাও থাকতে পারে। বললাম, এমনিই।

তিনি আবার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, পরে বললেন, রাণু মা, তুইও লুকোচুরি সুরু করলি। বল, বল আমাকে, আমি তোর বাবা। কাউকে ভালবেসেছিস ?

এমন ক'রে কথা তিনি কোনদিন বলতেন না। বললাম, না।

—তবে ?

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, আচ্ছা, দুদিন পরে তোমাকে বলব, বিয়ে করব কি না।

চ'লে আসতে আসতে শুনলাম, তাঁর স্পষ্ট দীর্ঘনিশ্বাস ; তবু বললি নে, কেন চাস নে বিয়ে করতে !

হায়, সেদিন যদি তাঁকে বলতাম ! তাঁর মত সহজে আমার সংশয় কাটিয়ে দিতে আর কে পারত !

কিন্তু তবু লজ্জা ছিল, সমস্ত জীবনে এই একটি কথায় তাঁর কাছে আমার লজ্জা ছিল, সঙ্কোচ ছিল, এ তাঁকে আমি বলতে পারতাম না।

ছেলেবেলায় হঠাৎ-শোনা মার মুখের সেই একটুখানি আত্মধিক্কারের ভাষা আমার মনে তখনও তেমনই স্পষ্ট ; দাদা কিসের জন্য এক কথায় সন্ন্যাসী হয়ে গেল, সেও আমি জানি। কে.জানে, হয়তো আমিও একদিন মার মতই ক্ষোভ করব আমার সন্তানের জন্ম নিয়ে, তাদের মনে ছাপ ফেলব এই লজ্জার, যে লজ্জা আমার মনে বাসা বেঁধেছে। না না, বিয়ে আমি করব না, হব না সন্তানের জননী। এই যে অভিশাপের বোঝা, এর এইখানেই শেষ হোক।

কিন্তু বাবা যখন তাই প্রশ্ন করলেন, তাঁকে বলতেও পারলাম না। কি ক'রে মুখ ফুটে বলব তাঁকে, কেন আমার বিয়ে করতে ভয় !

দুদিন গেল। দ্বিতীয় দিনে বাবা ডেকে বললেন, রাণু মা, তোমার আজ জবাব দেবার কথা।

তাঁর চোখে চোখে চাইতে পারলাম না, বললাম, আমি পারব না বাবা।

না চেয়েও টের পেলাম, তাঁর উদাস দুই চোখ জলে ভ'রে এল। নিশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা।

তারপর যেন কতকটা আপন মনেই বললেন, যাদেরই ওপর জোর করতে গিয়েছি, তাদেরই হারিয়েছি। তোমার ওপর আর জোর করব না।

পরদিন থেকে তাঁর অসুখ বাড়ল।

যতই যন্ত্রণা হোক, আর্ত্তনাদ তিনি কোনদিনই করতেন না ; কিন্তু তাঁর পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। যদি পারতাম—যদি তাঁর শেষ ইচ্ছে রাখতে পারতাম ! কিন্তু

পাঁচ বছর ধ'রে যে গোপন ক্ষত অহর্নিশি বুকের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, তাকে এক নিমেষে ভোলা যায় না। কি কুক্ষণেই যে মার কাছে সেদিন গিয়ে পড়েছিলাম!

একদিন রাতের বেলা ব'সে ব'সে বাবাকে হাওয়া করতে করতে এই কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার নিশ্বাস পড়ল, তিনি চমকে তাকালেন। তারপর কষ্টে আমার হাতটা তাঁর দু হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, রাণু মা, আমার কথা রাখতে পার নি ব'লে তুমি দুঃখ ক'র না। বিয়ে করতে যদি তুমি নাই চাও, নাই করলে। কিন্তু মিথ্যে মন খারাপ ক'র না এ নিয়ে, তোমার নার্ভাস স্ট্রেন হবে।

তার পরদিন কাকাবাবু এলেন তাঁকে দেখতে। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আমার ঘরে এসে বসলেন, বলিলেন, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

কি কথা আমি জানতাম। বললাম, বসুন।

তিনি বললেন, আজ বসবার সময় নেই। কাল দুপুরে তোর এন্‌গেজ্‌মেণ্ট রইল আমার ওখানে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

পরদিন কাকাবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তোর বাবাকে শেষকালে শান্তিতে মরতেও দিবি নে?

চুপ ক'রে রইলাম।

কাকাবাবু বললেন, কি হয়েছে তোর, বল আমাকে। আমাকে তো আর তোর লজ্জা নেই।

নিজের সঙ্গে লড়াই ক'রে আর পারছিলাম না। বললাম, আচ্ছা, আপনাকেই শুধু বলব। কিন্তু একটি সর্ত্ত—বাবাকে জানাবেন না।

সব শুনে তিনি বললেন, একেবারে ছেলেমানুষ। এর জন্যে এত ভাবনা কিসের? আজকাল দৈবর দিন চ'লে গেছে, সন্তান না চাস, সে তো নিজের হাতেই রয়েছে।

বললাম, কিন্তু বিয়ে করব আর সন্তান হবে না—এ আপনি সম্ভব মনে করেন?

তিনি বললেন, করি। আমি তোর মত আইডিয়া-বিলাসী নই, আমি ডাক্তার, প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ।

বললাম, আইডিয়া-বিলাসী আমিও নই, কিন্তু facts are facts.

তিনি বললেন, facts are facts নয়। তুই পড়েছিস ম্যাল্‌থসের বক্তৃতা, আমি করি মানুষের প্র্যাক্‌টিকাল ব্যবস্থা।

বললাম, কিন্তু সে তো শুনেছি সব সময়ে কাজ দেয় না।

তিনি বললেন, গাধা। নে, এই বইগুলো পড় গিয়ে। শেষ হ'লে আবার আসবি।

বই কটা শেষ ক'রে তাঁর কাছে আবার গেলাম। বললাম, এতে যা লেখে, সে প'ড়ে বিশেষ ভরসা পেলাম না। তবে একটা উপায় হ'তে পারে, আমাকে স্টেরিলাইজ ক'রে দিন।

তিনি অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন, শেষে বললেন, গাধা নোস, তুই হনুমান। স্টেরিলাইজ করলে সেটা জন্মের মত করা হয়, জানিস?

বললাম, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমি বিয়ে যদি করিই, করব বাবার জন্যে, সন্তানের জন্যে নয়।

তিনি বললেন, don't be silly. আজ ভাবছ বাবার জন্যে বিয়ে করছ, কিন্তু চিরজীবন একভাবে কাটবে না। হয়তো শেষে অনুতাপ করবে এর জন্যে।

বললাম, করব না।

তিনি বললেন, বলা যায় না। তা ছাড়া বিয়ে তোমার একার ব্যাপার নয়। তোমার স্বামী সন্তান চাইবে না?

বললাম, চায়, আবার বিয়ে করবে। সবার ভাবনা আমি ভাবতে পারি নে, আমি যা বললাম, ভেবে দেখুন। ঐ এক কন্‌ডিশনে আমি বিয়ে করতে পারি।

তিনি বললেন, তার মানে তোর ইচ্ছে নয়, তোর বাবা বাঁচেন। হবে না কেন, দাদারই বোন তো। বাপের গুণ কিছু পাস, না পাস, তার একগুঁয়েমি ষোটোতেই পেয়েছিস।

আমার চোখে জল এল। বললাম, তাই যদি বুঝে থাকেন, তবে আমার বলবার কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, ভুল বুঝিস নে। আমি সব দিক ভেবেই বলছি। তুই বইয়ের বুলি মুখস্থ করেছিস, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের বেশি।

বললাম, সে আলোচনা এখন থাক। আমি যা বলছি, যদি রাজি থাকেন, ভেবে দেখুন।

শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজি হলেন; বাবাকে বাঁচাতে হ'লে এ ছাড়া উপায় ছিল না। কাকাবাবু নিজেই অপারেশন করলেন। সবাই জানলেন, আমার পেটে টিউমার হয়েছিল। আসল কথা কেউ জানলে না, বাবা পর্য্যন্ত না। তাঁকে যখন বললাম, আমি বিয়ে করতে রাজি, তাঁর সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিয়ে হ'ল। বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন বিয়ের আগে, আমি পাত্রকে দেখতে বা চিনতে চাই কি না। আমি বললাম, চাই নে। আমি জন্ম-সিনিক, বিয়ে বা ভবিষ্যৎ স্বামীর সম্বন্ধে আমার মনে কোনও রোমান্স ছিল না, কৌতূহলও ছিল না। আমি জানতাম আমার বাবাকে, তাঁর জন্যেই আমি বিয়ে করছিলাম। স্বামী কে হবে, না হবে, সে নিয়ে আমার উদ্বেগ ছিল না; উদ্বেগ ছিল যা নিয়ে, তার তো ব্যবস্থা চুকেই গিয়েছিল।

বিয়ের পরে কিছুদিন বাবার কাছেই রইলাম। তারপর তিনি একটু ভাল হয়ে চেঞ্জে চ'লে গেলেন। আমিও চ'লে এলাম এখানে। আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হ'ল।

[ ক্রমশ ]

## গ্রন্থ-পরিচয়

**পত্রধারা, প্রথম—তৃতীয় খণ্ড, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

[ বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ছিন্নপত্র—৩৪৯ পৃ. ; ভানুসিংহের পত্রাবলী—১৫৮ পৃ. ; পথে ও পথের প্রান্তে—১৪৮ পৃ., মূল্য ৩৷৽ ]

'ছিন্নপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে, 'ভানু-সিংহের পত্রাবলী' ১৩৩৬ সালে এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' ১৩৪৫ সালে—তিনটিকে একত্র গ্রথিত ও 'পত্রধারা' নামে স্বতন্ত্র একখণ্ডে প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পত্রগুলি রচনার কাল ১৮৮৫ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—দীর্ঘ ৫৩ বৎসর।

এই ৫৩ বৎসরের বহুধাবিস্তৃত রবীন্দ্র-জীবনীর ইতিহাস-গঠনে এই 'পত্রধারা'ই একমাত্র উপকরণ। ইহাতে সন্নিবিষ্ট পত্রগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এই কালের মধ্যে আরও অসংখ্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় চিঠি লিখিয়াছেন, বস্তুত লিপি-শিল্পী হিসাবে পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত ও মৃত সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রধান এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সকলগুলি সংগৃহীত হয় নাই; আরও যেগুলি সংগৃহীত হইয়া বিশ্বভারতীর দপ্তরে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে ( সংখ্যায় তাহারা কম নয়! ) যতদিন না সেগুলি সাধারণের গোচরে আসিতেছে, ততদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী-রচনায় এই 'পত্রধারা'কেই বহুমূল্য উপকরণ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। কবিতা পাঠ করিয়াও আমরা কবির পরিচয় পাইতে পারি, কিন্তু কাব্য পড়িয়া আমরা যেমন ভাবি কবি তেমন নন, এইরূপ সন্দেহ রবীন্দ্রনাথই আমাদের মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে অন্যত্র আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাণপণ করি, কবির বন্ধু ও পরিচিত সমাজে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়া বেড়াই; কিন্তু সেখানে এমন গরমিল ও পরস্পরবিরোধ যে, শেষ পর্য্যন্ত কবিকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের কল্পনাবিলাস চলিতে থাকে। দূরকালের কালিদাস শেক্‌স্পীয়র, অনতিকালের কীট্‌স শেলী হাইনে প্রভৃতি কবির ক্ষেত্রে ধরিবার মত, ছুঁইবার মত কিছু পাইয়া কল্পনা হয়তো পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের কালের রবীন্দ্রনাথ এমন দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে তাঁহার আপাতপ্রকাশ দেহ ও মনকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন যে, মাথা ঠুকিয়া রক্তারক্তি হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার আসল স্বরূপ আমাদের নাগালের মধ্যে আসে না। যাঁহারা এই 'পত্রধারা' মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্মবৎসরে 'জীবন-স্মৃতি' নাম দিয়া আপনার চারিপাশে কাব্যের যে মায়া-আবরণ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি আপনাকে ছাড়া সেকালের অনেক কিছুকে প্রকাশ করিয়াছেন; বস্তুত 'জীবন-স্মৃতি' উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শিক্ষিত বাঙালী মনের কাব্যানুভূতির ক্রমপরিণতির ইতিহাস। এই ইতিহাস যেখান হইতে ব্যক্তিগত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, অর্থাৎ 'কড়ি ও কোমলে'র সঙ্গে সঙ্গেই রূঢ়-ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, কৌতূহল জাগাইয়া দিয়া কবি সরিয়া পড়িয়াছেন। এই নির্ম্মম সংযমের দ্বারা যে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা ছিল, আপনার অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথ এই 'পত্রধারা'র দ্বারা তাহা কতকটা পূর্ণ করিয়াছেন। 'জীবন-স্মৃতি'র যেখানে সমাপ্তি, 'পত্রধারা'র সূত্রপাত সেইখানে।

সুতরাং বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবির মনের অলি-গলির খবর পাইবার জন্য এই খণ্ডিত ও টুকরা পত্রগুলিই আমাদের অবলম্বন।

'পত্রধারা' ইতিহাসের উপকরণ, কিন্তু ঠিক ইতিহাস নয়। ইহা জার্নাল জাতীয় জিনিস; বিভিন্ন ঋতু ও কালে বিভিন্ন অবস্থায় কবি-মনের অসংখ্য বহুবিচিত্র mood-এর বাচনিক অভিব্যক্তি। কোনটিই পাথুরে প্রমাণ সম্বলিত ইতিহাস নয়, কিন্তু সবগুলি মিলিয়া একটি অখণ্ড সত্য ইতিহাস। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে পত্রগুলি রচিত, তাঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি, কবি-মনের অসংখ্য-তার-বীণাযন্ত্রে বিভিন্ন ভাবে আঘাত করিয়া তাঁহারা যে সুর তুলিয়াছেন তাহার সবগুলিই শাশ্বত নয়, কিন্তু এই ক্ষণিকাদের সম্মিলিত মূল্য বড় কম নয়। পরস্পরবিরোধী সুরও আছে এবং আছে বলিয়াই মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ধরা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া এই পত্রগুলির মধ্যেই মর্ত্ত্যমানবের সঙ্গে সামান্য কারবার করিয়াছেন; তাঁহার সহিত প্রেমের সম্পর্ক পাতাইবার এইগুলিই চোরাপথ।

> "সর্বজনের দরবারে সাধারণ সাহিত্যের আর অন্তরঙ্গ মহলে চিঠির সাহিত্যের গতিবিধি। সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূরদেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি। তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।"

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অন্তত আমরা তাঁহার 'পত্রধারা'র সব পত্রগুলি সম্বন্ধে মানিতে প্রস্তুত নই। দূরদেশ দূরকালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়াইয়া ইহাদের অনেকগুলির গতি। দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ, তাহার প্রয়োজন নাই।

'পত্রধারা' পড়িতে পড়িতে 'ছিন্নপত্রে'র একস্থানে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের যে সহজ পরিচয় মিলিল, তাঁহার দীর্ঘ দুই ভ্যলুম জীবনীতে তাহার অধিক খবর মেলে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ আষাঢ় তারিখে তিনি সাহাজাদপুর হইতে লিখিতেছেন—

"আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপননিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে—এদিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয়নি, ওদিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন কার্তিকের যুগল সাধনা রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈতো নয়—এমনি ক'রে কতদিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক এক সময়ে মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক এক সময় মনে হয় আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয় সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ ক'রে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়—আবার এক এক সময় মনে হয় দূর হোকগে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন,—মিল ক'রে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো "দীর্ঘ দৌড়ে" কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্যবিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্য-বুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সবচেয়ে উপকার

হবে সাহিত্য কর্তব্যজ্ঞানে সেকথা ভাববার দরকার নেই কিন্তু কোন্‌টা আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্ব-রাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তাহলে তো মন্দ হয় না—আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই কী, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন "বাল্য-বিবাহ" কিম্বা "শিক্ষার হেরফের" নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চ'লে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ—তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হোলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন —আমার ছেলেবেলাকার আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।"

'ছিন্নপত্রে'র অপর একটি স্থল যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করে—এই প্রাচীন মতবাদে বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের সায় আছে কিনা কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়।

"ছন্দের দ্বারা কবিতা এক একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেই রকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই—সে একটা বৃহৎ বিশেষত্বহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে একটা গতি আছে—কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক গ্রাস ক'রে পড়ে থাকে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার প্রয়োজন হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়—নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে একদিকে ধাবিত হোতে পারে না। বিলের জলকে পল্লীগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল—তার কোন ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায়; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথা-গুলোও সেই রকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত ক'রে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে—সেই জন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে ওটা একটি কৃত্রিম অভ্যাসজাত সুখ দেবার জন্যে নয়—ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা; ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন ক'রে সুখ দেয়—ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারি ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে, বিশ্ব জগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটা সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে ব'লেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায় তার আর আঘাত করিবার শক্তি থাকে না।"

'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র মধ্যে কোনও মতামত নাই, কবি ছেলেমানুষি করিবেন ইহা স্থির করিয়াই অত্যন্ত সাবধান হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্রম এবং ভ্রমণ, আহার এবং প্রসাধন-পরিবেশের মধ্যেই কবির এমন একটি ব্যক্তিচরিত্র এই চিঠিগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, সকল ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁহাকে আমাদের একান্ত আপনার বলিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হয়। যখন পড়ি—

"যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল. সবশেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মতো দেখতে পাচ্চি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েছে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চ'লে যায়, জানা জিনিস ঝাপসা হ'য়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণ-মনকে প্লাবিত ক'রেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।"

অনুমান তখন আশ্রয় পায়, চক্ষু আপনার অজ্ঞাতসারেই অশ্রুবাষ্পাকুলিত হইয়া উঠে।

'পথে ও পথের প্রান্তে'র মধ্যে প্রবীণ কবি থিওরি এবং প্রোপাগাণ্ডার মোহে পড়িয়াছেন, কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত্তে চিরন্তনী কবিতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে—

"জগতে সবাই অবকাশের অধিকার নিয়ে আসে না—অনেকের পক্ষেই অবকাশটা শূন্যতা—আমি কিন্তু শিশুকাল থেকেই বিধাতার কাছ থেকে আমার সব চেয়ে বড়ো দান পেয়েছি এই অবকাশের দান। আর একবার এখান থেকে বিদায় নেবার আগে অবকাশের পশ্চিম দিগন্তে রঙের খেলা খেলিয়ে তারপরে অস্তসমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করে। খ্যাতির বোঝা ঘাড়ে চেপেছে সেটাকে শেষ পর্যন্ত নামাতে পারব না—তবু যতটা পারি আমার অভিমানটাকে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তাতে আলপনা কেটে যাব এই ইচ্ছেটা প্রতিদিন দরজায় ধাক্কা মেরে যাচ্চে—শীতের মধ্যাহ্নে নীলাভ সুদূরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি।"

বিশ্বভারতী আমাদের পুরাতন স্মৃতিকে 'পত্রধারা'র সহজ আয়তনের মধ্যে নাড়া দিতে পারিলেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাও অর্জ্জন করিলেন।

**বনফুলের আরও গল্প—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়**
[ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ২১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা ]

পুস্তকান্তর্গত "ঐরাবত" গল্পের ত্রিগুণাবাবুর মত শ্রীযুক্ত বনফুল ছোটগল্পের বখেরা মিটাইবার জন্য যে প্রয়াস করিতেছেন, আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই দুই নম্বর ফল। তাহার সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই; কারণ, আকারে ছোট হউক, বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর হউক, গল্পগুলি জমিয়াছে। সামান্য মাটির হাঁড়ি বাজাইয়া যে ব্যক্তি পথের মাঝখানে বাঁয়াতবলার বোল তুলিতে পারে, উপকরণের ওজুহাতে তাহার কেরামতিতে সন্দেহ করা চলে না; উদ্দেশ্যহীন পথিকের তাহা অধিকতর বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়া থাকে।

কিন্তু বাদ্যের রেশ কানে দীর্ঘকাল বাজিতে থাকে কি না এবং কানের ভিতর দিয়া তাহা শ্রোতার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছায় কি না, গল্পগুলি একটানা পড়িবার পর সে সন্দেহ মনে রহিয়া যায়। ইংরেজীতে যাহাকে 'clever' বলে এগুলি যে তাহাই, ইহা নিশ্চিত; প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি শব্দও কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই—সে হিসাবে আর্টিস্টিকও, কিন্তু মানব-মনের গভীরতর রহস্য-সন্ধান, রসের আবর্ত্তে টানিয়া লইয়া চোখের জলে ভাসাইয়া তোলার ট্র্যাজিক অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, এগুলি ক্বচিত বিস্তার করে এবং সম্ভবত তাহা করে না বলিয়াই ছোটগল্প হিসাবে এগুলির সার্থকতা। যে সূক্ষ্ম সূত্রের উপর গল্পান্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের আশা-নিরাশা আনন্দ-বেদনা, এক কথায় জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে, লেখক বৈজ্ঞানিক সবলতায় তাহাকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছেন, আমাদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা হেতুই আমরা সেইজন্য খুশি হইয়া উঠি, কিন্তু অনিবার্য্যের হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম এই পরম আশ্বাসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি না।

'বনফুলের আরও গল্পে'র পশ্চাতে কথকের যে পরিচয় মেলে তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি একজন সুস্থ সবল ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকে এক নিক্তিতে ওজন করিয়া নির্ম্মমভাবে মূল্য কষিয়া ছাড়িতেছেন; তাঁহার সবলতা ও নিরপেক্ষতাকে মাঝে মাঝে দোষ বলিয়া ভ্রম হয়। "রূপকথা"য় তাঁহার গুণ্ডা বিবেককে রীতিমত expose করিয়াও তিনি আমাদের ভয় দূর করিতে পারেন নাই।

এক কথায় বলিতে পারি, গল্পগুলি অসাধারণ হইয়াও সুখপাঠ্য। লেখককে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হয়।

স.

# চয়ন

[ এই বিভাগে বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উল্লেখযোগ্য রচনা অংশত উদ্ধৃত হইবে। লেখক ও পত্রিকা-সম্পাদকদের নিকট হইতে মৌখিক বা লিখিত অনুমতি লওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। আমরা সমবেতভাবে সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।—স. অ. ]

## অরণ্য-দেবতা

…মানুষ অমিতাচারী; যত দিন সে অরণ্যচর ছিল তত দিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হ'ল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ্, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন ক'রে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মম ভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে-অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণ-পাঠক মাত্রেই জানেন যে এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর-ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না; এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছায়া।

এ-সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্য-সম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড় বড় বন ধ্বংস করা হয়েছে, তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন ক'রে রেখেছিলেন—মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন ক'রেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস ক'রে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয় তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।…

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রবাসী'।

## মুঘল ভারতের ইতিহাসের উপাদান

…মুসলমান-জগৎ ভারতকে যে দানগুলি দিয়াছে তাহার মধ্যে ইতিহাস-সাহিত্য একটি প্রধান। এটি ভারতের পক্ষে অপূর্ব্ব।…

হিন্দুযুগে এরূপ ইতিহাস রচিত হয় নাই, যদি হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক ইয়াং চুয়াং ( ৬৩০ খ্রী: ) বলেন যে ভারতবর্ষের "মধ্যদেশে" প্রত্যেক প্রদেশের ঘটনার কাহিনী সত্ত্য সত্ত্য

লিখিবার পদ্ধতি ছিল, এবং এই বিবরণগুলিকে "নীলপীট" নাম দেওয়া হইত। কিন্তু এরূপ রচনার এক পৃষ্ঠাও রক্ষা পায় নাই, এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই।

সুতরাং মুসলমান-বিজেতাগণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদের সভাসদ কর্ত্তৃক রচিত কাহিনীই প্রথমে ভারতে ইতিহাস-পদবাচ্য হইল, সাহিত্যে একটা নূতন ধারা আনিয়া দিল। পরে হিন্দুরা পারসিক ও অন্যান্য ভাষায় ইতিহাস লিখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহা মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অপেক্ষা অনেক অংশে নিরেশ হইল। মুসলমান-লেখকদের কয়েকটি মহা সুবিধা ছিল, যেমন—(প্রথম) এক সন ও তারিখ—হিন্দুদের অসংখ্য সন ও মাস-গণন পদ্ধতির মত নহে। (দ্বিতীয়) এক সাহিত্যিক ভাষা পারসিক। (তৃতীয়) একই সাহিত্যিক আদর্শ। (চতুর্থ) জাতিভেদ না থাকায় অনেক স্থলে মুসলমান অসিধারীরা কলম চালাইতেও দক্ষ ছিলেন—সাহিব-ই-সয়েফ্ ব কলম্; ইহার ফলে তাঁহাদের দৃষ্ট ঘটনার বর্ণনা অতিশয় সত্য ও উজ্জ্বল আকারে লিখিত হইত। এই সুবিধাগুলি হিন্দুদের ছিল না। তদ্ভিন্ন নানা দেশের নানা জাতি ইসলামের প্রভাবে ভারতে মিলিত হইয়া, অতি শীঘ্র প্রাদেশিক বা জাতিগত বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া এক মিশ্রিত সাধারণ সমাজ গঠন করিয়া ফেলিত, এইরূপ লোকদের মধ্যে সাহিত্যের ছাঁচটা একই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিত, এবং ইতিহাসগুলিও এলোমেলো হইতে পারিত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হিন্দু ও মুসলমানের ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে হিন্দুরা ইহজগৎ অপেক্ষা পরলোকের কথাই বেশী ভাবে, তাহারা এই সব নশ্বর রাজরাষ্ট্র সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি পার্থিব জিনিষ মনোযোগ করিয়া দেখিয়া লিখিয়া তাহা হইতে স্থায়ী সাহিত্য রচনা করিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক, অপারক, এক্ষেত্রে তাহারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক নীচে।...

ভারত-বিজয়ী মুসলমান রাজারা ভারতের বাহিরের মুসলমান-জগৎ হইতে ইতিহাস-রচনার আদর্শ সঙ্গে করিয়া আনেন, আর যুগে যুগে ইসলামীয় সভ্যতার কেন্দ্র খোরাসান, বাগদাদ, মিসর ও কর্ডোভা হইতে মুসলিম পণ্ডিতগণ ভারতে আসিয়া এই সাহিত্যকে নূতন রসে সতেজ করিয়া তুলিতেন। আমাদের এই সব রাজাদের নিজ নিজ ইতিহাস—অন্ততঃ পূর্ব্বজগণের কাহিনী, রচনা করাইবার একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল; অথবা তাঁহাদের সভায় প্রতিপালিত পণ্ডিতগণ নিজ নাম অমর করিবার জন্য উৎকৃষ্ট পারসিক ভাষায় সেই সেই যুগের ইতিহাস লিখিতেন। এরূপে মহমুদ গজনবী হইতে দ্বিতীয় শাহ্ আলম পর্য্যন্ত আট শত বৎসর ধরিয়া ভারতের কোন-না-কোন অংশ লইয়া পারসিক ইতিহাস রচিত হওয়ায় এক মহাসমুদ্রের মত প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, ইহার অতি অল্প অংশই লোপ পাইয়াছে।

আরও সৌভাগ্যের বিষয়, এই মহাসমুদ্রে আমরা এক জন প্রবলপ্রতাপান্বিত কর্ণধার পাইয়াছি। তিনি লর্ড ডালহৌসীর ফরেন্ সেক্রেটারি সার্ হেনরি মায়ার্স এলিয়ট। তাঁহার আরব্ধ ও অধ্যাপক ডাউসন কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ-কৃত আট ভলুম *History of India as told by its own Historians* এই সব মুসলমান ঐতিহাসিক-গণের জীবনী, গ্রন্থ-পরিচয়, সমালোচনা এবং অনেক স্থলে আংশিক অনুবাদ দিয়া এই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও মূল্য বুঝিবার, এই ক্ষেত্রের নিজ নিজ নির্ব্বাচিত কোণ-টুকুতে গবেষণা করিবার পথ অতি সুগম করিয়া দিয়াছেন। এলিয়টের আরও মহান্ কীর্ত্তি এই সব পারসিক ইতিহাসের হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ।... ইহার মধ্যে এমন এমন গ্রন্থও আছে জগতে যাহার আর কোন নকল নাই। ভারতের মুসলমান-যুগের সমস্ত ফারসী ইতিহাস সংগ্রহ এবং অনুবাদ করা এলিয়টের জীবনের ব্রত ছিল; এ কাজ তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, কারণ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বিলাত যাইবার পথে মারা গেলেন (১৮৫৩)। তখন এক ভলুম মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরব্ধ এই ঐতিহাসিক মহাকোষ তাঁহার মৃত্যুর অনেক বৎসর পরে ভারত-সচিবের খরচে অধ্যাপক ডাউসন্ শেষ করেন (১৮৭৭ খ্রীঃ, আট ভলুমে, এবং পরিশিষ্ট লইয়া নয় ভলুমে)।

আমাদের আরও একটি সৌভাগ্যের বিষয়, এলিয়ট এই সব ঐতিহাসিক পুথি কুড়াইয়া একত্র করিয়া বিলাতে

পাঠান সিপাহী-বিদ্রোহের পাঁচ ছয় বৎসর আগে। তাহাতেই এগুলি রক্ষা পাইয়াছে, আমরা এখন এগুলি দেখিতে পাইতেছি। নচেৎ, যদি এগুলি দেশী মালিকদের বাড়ীতে থাকিত, তবে ঐ উত্তর-ভারতব্যাপী মহাবিপ্লবে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইত।...

ফারসী ভারত-ইতিহাস-মালার অনুবাদ সুদীর্ঘ আট ভলুমে প্রকাশ করিয়া এলিয়ট্-ডাউসন্ কত বড় উপকার করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় যদি আমরা ১৮৭৭ সালের আগে ও পরে লিখিত মুসলমান-ভারতের ইতিহাস দুখানি লইয়া তুলনা করিয়া দেখি। ঐ আট ভলুমের একটি সুফল ষ্টান্‌লি লেন্-পুল্-রচিত "মধ্যযুগীয় ভারত"। ইহাতে চারি শত পৃষ্ঠায় মুসলমান ভারত-ইতিহাস-রূপ মহানাটকের অঙ্কের পর অঙ্ক দৃশ্যপটের মত পাঠকের সম্মুখে খুলিয়া দিয়াছে; ইহার সমস্ত উপাদান এলিয়ট্ হইতে লওয়া। সব বর্ণনা নিখুঁত সত্য, সাক্ষীদ্বারা প্রমাণিত, অথচ বইখানি জীবন্ত মানুষে ভরা, আমরা সব বড় বড় ঐতিহাসিক পুরুষদের চরিত্র অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি; পাঠক যাহা পড়িবেন তাহা মনে বহুদিন স্মরণ থাকিবে। ফলতঃ মেকলে যেমন ইতিহাসকে সরস ও জীবন্ত করিয়া দিতেন, লেন্-পুলও তাহাই করিয়াছেন, এবং এলিয়টের গ্রন্থে অসংখ্য সমসাময়িক বিস্তৃত বিবরণ ও উক্তি পাইয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পর অনেকেই অংশতঃ বা ব্যাপকভাবে গবেষণা করিবার সুবিধা এই আট ভলুম হইতেই পাইয়াছেন।...

মুঘল সাম্রাজ্যের শিল্প-কলা ও ধন-দৌলতের কথা আমরা সকলেই জানি; সে যুগের অট্টালিকা ও চিত্র আজিও জগতের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ঐ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গৌরবের, আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কাজের দান হইতেছে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অজস্র ও বিচিত্র ধারা। এগুলির অনুগ্রহে মধ্যযুগের ভারতের অবস্থা, সমাজ ও সভ্যতা আমরা এখনও যেমন অতি সূক্ষ্ম, অতি স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই, অন্য যুগের পক্ষে তেমন সম্ভব নহে। এই সব ঐতিহাসিক উপাদান বিভিন্ন শ্রেণীর এবং সেগুলি একই ঘটনা বা রাজত্বকালের উপর নানা দিক্ হইতে আলোকপাত করে, একটি অপরটিকে সমালোচনা ও সংশোধন করিবার উপকরণ-স্বরূপ।

প্রথম শ্রেণী—আকবর হইতে বাহাদুর শাহ্ ( অর্থাৎ প্রথম শাহ্ আলম ) পর্য্যন্ত, ১৫৫৬ হইতে ১৭১০ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বাদশাহ্‌র দীর্ঘ ধারাবাহিক সরকারী ইতিহাস লিখিত হয়, যেমন 'আকবরনামা', 'পাদিশাহ্‌নামা', 'আলমগীরনামা' এবং 'বাহাদুরশাহ্‌নামা'। এই সঙ্গে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীকেও ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বে-সরকারী ইতিহাস; এগুলি সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা লিখিত হইলেও, অফিশিয়াল্ হিষ্ট্রি অর্থাৎ সরকারী আজ্ঞায় দরবারে লিখিত এবং বাদশাহ্ বা উজীরের দ্বারা অনুমোদিত ইতিহাস হইতে ভিন্ন। এগুলির রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র এবং ঘটনা ও তারিখ অনেক কম। বড় কর্ম্মচারীদের জীবনচরিতও এই শ্রেণীতে আসে।

তৃতীয় শ্রেণী—এগুলিকে রীতিমত ইতিহাস বলা চলে না, খণ্ড ইতিহাস অথবা ইতিহাসের উপকরণ বলিলে অধিক সত্য হয়, যেমন দিন-লিপি ( ডায়েরী ), কোন সমর অভিযানের সম্পূর্ণ রিপোর্ট ইত্যাদি।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—ইতিহাসের কাঁচা মসলা, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য অমূল্য আধার, যেমন সমসাময়িক চিঠি এবং হাতে-লেখা খবরের কাগজ।

ষষ্ঠ শ্রেণী—শাসন সম্বন্ধে কাগজপত্র, চিঠি, আজ্ঞা, আয়ব্যয়ের বিবরণ, হিসাব ইত্যাদি।

এখন এই বিভিন্ন ধরণের ইতিহাসগুলির স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। আকবরের আজ্ঞায় শেখ আবুল্-ফজ্‌ল্ 'আকবরনামা' লিখিয়া যে একটি সাহিত্যিক নমুনা শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে দিয়া যান, তাহাই দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী বাদশাহ্‌দের চরিতকারেরা অনুকরণ করেন। এই সরকারী ইতিহাসের এমন কয়েকটি চিহ্ন আছে, যাহা অন্য ধরণের ইতিহাসে নাই। (ক) এগুলি ঠিক বর্ষ ও তারিখ অনুসারে ঘটনা সাজাইয়া লিখিত, (খ) তারিখ, লোকের নাম ও স্থানের নাম এত বেশী দেওয়া হইয়াছে যে, অনেক স্থলে ঠিক আজকালকার পূজার ছুটির পূর্ব্বে কর্ম্মচারী-বদলের গেজেটের মত অপাঠ্য। (গ) কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা অতি বিস্তৃত ভাবে

বর্ণনা করায় আমরা অনেক বিষয়ে সংবাদ পাই, তাহা ইতিহাস ভিন্ন অন্য কাজেও লাগে, যেমন জাতিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি। (ঘ) এই শ্রেণীর বই-গুলির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্য এই কারণে যে, ইহাদের ঘটনাবর্ণন ও তারিখগুলি একেবারে সত্য, এবং মূল আধার হইতে অবিকল উদ্ধৃত করা, অর্থাৎ মৌলিক ও সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাহাই আমার বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পারসিক ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান।...

দ্বিতীয় বিভাগের ইতিহাস। এই শ্রেণীতে তিন জন অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক আছেন, বখ্‌শী নিজামুদ্দীন আহমদ, ফিরিশ্‌তা এবং খাফি খাঁ। ইঁহাদের যেমন বিষয়বিন্যাসে দক্ষতা, সরল অথচ মনোরম ভাষা, অত্যুক্তি এবং বাজে কথা পরিত্যাগ, তেমনি নানা গ্রন্থ খুঁজিয়া এবং নানা কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা। আর এই তিনখানি গ্রন্থেই ভারতের মুসলমান-যুগের সমগ্র ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, দিল্লীর সুলতান ও বাদশাহ্‌দের কাহিনীর সহিত প্রাদেশিক মুসলমান-রাজ্যগুলির ইতিহাস ( সংক্ষেপে ) লিখিত আছে।...

তৃতীয় বিভাগ—কর্ম্মচারীদের জীবনীর অংশ অথবা দিন-লিপি ( ডায়েরী )। এগুলি অমূল্য প্রাথমিক মসলা, যদিও ইহাদের দৌড় বড় কম।...

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী—চিঠি এবং হস্তলিখিত সংবাদ-পত্র ( আখ্‌বারাৎ )। এগুলি তৃতীয় বিভাগের গ্রন্থগুলি অপেক্ষাও অধিকতর মৌলিক ও মূল্যবান্ উপকরণ, ফলতঃ আমি সর্ব্বদাই এগুলিকে ভারত-ইতিহাসের আদি মসলা (raw materials of Indian history) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি।...

আর, রাজদরবার, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কাছারি এবং সেনাপতিদের শিবির হইতে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে হাতে-লেখা খবরের কাগজ প্রেরিত হইত; ইহার নাম ওয়াকেয়া, পরে আখ্‌বারাৎ। ১৬৫৮ সাল হইতে ইহার অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেকারগুলি সব ধ্বংস হইয়াছে। এগুলি অমূল্য এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মৌলিক উপাদান।...

এ-পর্য্যন্ত পারসিক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ও মসলার কথা বলিলাম। এখন সপ্তম বিভাগ অর্থাৎ ইউরোপীয় ভাষায় রচিত তৎকালীন বিবরণ ও রিপোর্টের কথা বলিয়া শেষ করিব। এই শ্রেণীর উপাদানগুলিকে সাহেবেরা অযথা মূল্য দিয়া থাকেন। আমি স্বীকার করি যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রজাদের সুখদুঃখ, রাস্তাঘাট, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি ও সমাজের সমালোচনায় এই বিদেশী সাক্ষীগুলির কথা আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক মহা অভাব পূরণ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা ধরিলে এই ভ্রমণ-কাহিনী ও রিপোর্ট অনেক সময় বিশ্বাসের অযোগ্য, গুজবের উপর নির্ম্মিত অথবা ভাসাভাসা মামুলী কথামাত্র।...

—শ্রীযদুনাথ সরকার, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'।

## আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ

আধুনিক বাংলা সাহিত্য বুঝতে হ'লে ইউরোপীয় ও বিশেষ ক'রে ইংরেজী সাহিত্য জানা দরকার। অতি-আধুনিক সাহিত্যের Cocktail, Marcovitch অথবা রাধা অনুরাধাদলের মন জানাজানির আখ্যানগুলি কাষ্টম অফিসারের সদ্য পাশ করা বিদেশী মাল মাত্র। ঘটনাটা এক হিসাবে অনিবার্য্য। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নাছোড়-বান্দা রকমের দোকানদারী প্রেম শুধু ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় রপ্তানীতে শেষ হয় নি, ব্যবসায়ের নানা উপকরণ সমেত বিলাতী বটতলার বইয়ের বাজারটাও সঙ্গে সঙ্গে উপহার দিয়েছে।

মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি তার অনুভূতি ও চিন্তা-ধারাকে মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত করে। সমষ্টিগত চিন্তা যা সাহিত্যে, ধর্ম্মে বা দর্শনে প্রকাশ পেয়েছে তার জন্মবৃত্তান্ত জানতে হ'লে ব্যক্তিবিশেষের মগজের দিকে না তাকিয়ে—সমাজের বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির উৎপাদন বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার আলোচনা করলে মিলবে। যে কালে সমাজে কৃষিপ্রধান ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল, সে কালের সাহিত্যে বা প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের সাহিত্যে যদি ঘোড়া ছাগলের উৎপাত বা দেবদৈত্যের হানা হয়ে থাকে তো আজ তা শুনে লোকে আশ্চর্য্য হয় না। তেমনি আধুনিক সমাজের জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের

হাজারো রকম অসুবিধা সৃষ্টি করেছে—ধনসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন মুষ্টিমেয় অকেজো লোকের ব্যাঙ্কের সম্পত্তি। তাই এ সাহিত্যে বিরাট সমাজের বহু অংশের ছায়া পড়ে না—পড়বার উপায়ও নেই। কারণ, উচ্চশ্রেণী এক দিকে যেমন প্রচার ক'রে থাকেন ধনসম্পত্তি minority efficiencyর অধিকারভুক্ত, তেমনি সাহিত্য বস্তুটাও নিতান্ত ব্যক্তিগত, অতএব minority cultureএর অন্তর্গত। ইংরেজী সাহিত্যের এই নির্দ্দেশ বাংলা সাহিত্য এই কিছুদিন হ'ল মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে এ দেশের শিল্পের যতটুকু প্রসার হয়েছে তারই ভিতর বাংলা সাহিত্য পল্লীর 'অরক্ষণীয়া' ছাড়িয়ে সহরের 'অমিতার প্রেমে'র ব্যাপারে উঁকিঝুঁকি মারছে এবং দক্ষিণ কলকাতাটা যদি বেশী জনবহুল হয় এবং তাতে সাহিত্যের যদি জাতিচ্যুতির আশঙ্কা থাকে, সেইজন্য বালীগঞ্জের কেতাদুরস্ত ফাঁক ফাঁক বাড়ীগুলির হলঘরের অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্বল্পালোকিত কোণে বাংলা সাহিত্যের বাসস্থান ঠিক করা হচ্ছে।

—শ্রীসুধীরঞ্জন প্রধান, 'ভারত'।

## জীবতত্ত্বের একটা দিক

···Reflex বস্তুটি যে শারীর-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন পদার্পণ করিয়াছে তাহা নয়। তবে ইহার দ্বারা এতকাল ইতর প্রাণীর ব্যবহার এবং মানুষেরও সহজ, সরল, প্রাথমিক গোটা কয়েক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বুঝিতে পারা যাইত। মানুষের জটিল, গভীর ব্যবহারগুলিকে বা মস্তিষ্কের উন্মার্গগামী, অনবদ্য এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলিকে ধরিতে পারা যায় নাই, মানব-মনের বিচিত্র স্ফূর্ত্তিগুলি রহস্যের মায়াজাল ভেদ করিয়া আসিতে পারে নাই; হয়তো বা অন্তরীক্ষে অবস্থিত লীলাচটুল কোন চিন্ময়ী ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপরিস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রের, তথা মস্তিষ্কের কার্য্যাবলীর কোন বৈজ্ঞানিক ভাষ্য খুঁজিয়া না পাওয়াই behaviourism মতবাদের প্রধান অপরাধ। এই অপরাধ স্খালনের গুরু দায়িত্ব লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন বিশ্ববিশ্রুত রুষ বৈজ্ঞানিক Ivan Petrovitch Pavlov.

Pavlov বলিলেন, ক (উদ্দীপনা) এবং খ (প্রতিচ্ছায়া) হইতেই সমগ্র মানুষটিকে চেনা যাইবে—তা তিনি মহাত্মাই হোন আর নরপাংশুলই হোন। পর্য্যবেক্ষণের ত্রুটিতে এবং চিন্তার বিপর্য্যয়ে এতদিনকার আপাত রহস্যগুলির ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যায় নাই, অতঃপর যাইবে। সবই reflexএর চাতুরী। তবে reflexএর প্রকারভেদ রহিয়াছে,—সাবলীল (unconditioned) এবং অনবলীল (conditioned)। খাদ্যের উপস্থিতিতে গ্রন্থি হইতে লালা নিঃসৃত হইবে, ইহা যে কেবল ঔদরিকের ধর্ম্ম তাহা নয়, জীবের সহজাত প্রবৃত্তির একটা প্রকাশ। ইহার মূলে রহিয়াছে আত্মত্রাণের প্রচেষ্টা, কেননা খাদ্যের শ্বেতসারকে পরিপাক করিতে হইলে লালার অন্তর্ভুক্ত ptyalin নামক জারক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। অথচ, মজার কথা এই, প্রতিদিন যদি কোন জীবকে (Pavlov সর্ব্বদা কুকুরের উপরেই পরীক্ষা করিতেন) খাওয়াইবার সময়ে ঘণ্টাধ্বনি করা যায়, কিছুকাল পরেই খাদ্য-সম্পর্কহীন ঘণ্টাধ্বনিতেই উহার লালাস্রাব হইবে। ইহাকে যে আপাত-দৃষ্টিতে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বলা যায় না তাহা বুঝিতে পরিশ্রম হয় না, কেননা প্রকৃতি উন্মাদিনী নহেন, ঘণ্টাধ্বনিও এমন কিছু নহে, যাহাকে জীর্ণ করিতে পাচকরসের প্রয়োজন। অতএব, এই নবলব্ধ reflexকে 'অর্জ্জিত' বা 'অনবলীল' (conditioned) বলা হইবে। মুস্কিলের কিছুই নাই। কেবল স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটি নূতন রাস্তা বানানো হইল, বিচ্ছিন্ন স্নায়ুপদার্থের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করিয়া দেওয়া হইল। এই যোগসূত্রের বিস্তৃতি নেহাৎই বস্তুগত ব্যাপার, অতীন্দ্রিয় জগতের কোন কারসাজি নয়। সাধারণ reflexএর প্রক্রিয়া,—ইন্দ্রিয়>জ্ঞানবহা স্নায়ু, কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থান> চেষ্টাবহা স্নায়ু>পেশীকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া—ইন্দ্রিয়> জ্ঞানবহা স্নায়ু>কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থান>জ্ঞানবহা স্নায়ু> কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থান > চেষ্টাবহা স্নায়ু > পেশী রূপে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই অর্জ্জিত reflexএ পৌঁছান গেল। স্নায়ুচক্রের পরিধি একটু বাড়িল মাত্র। এই পরিধিবিস্তার বীক্ষণাগারের বাস্তব নিয়মে সংসাধিত হইয়া থাকে, ইহাতে হেঁয়ালির স্থান নাই। Pavlov ইহার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে এতদুর নিঃসংশয় ছিলেন যে মানুষের উচ্চতম বৃত্তিগুলিকেও তিনি শারীর-বিদ্যার আয়ত্তে আনিতে চাহিয়াছেন, মানসবিজ্ঞানের অস্পষ্ট কুহেলিলোকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বস্তুতঃ, Pavlovএর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে জীবজগতের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, এমন কি মানবের ব্যষ্টি বা সমষ্টি-সম্পর্কিত তথাকথিত ইন্দ্রিয়াতীত মননশক্তিও শারীরবিদ্যার মারফতেই পরীক্ষিত হয়, মানসবিজ্ঞান নামক এক মিথ্যা ও স্বয়ম্ভু শাস্ত্রের কোনরূপ স্বীকৃতি বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পাপ।

—শ্রীনরেন্দ্র সরকার, 'ভারত'।
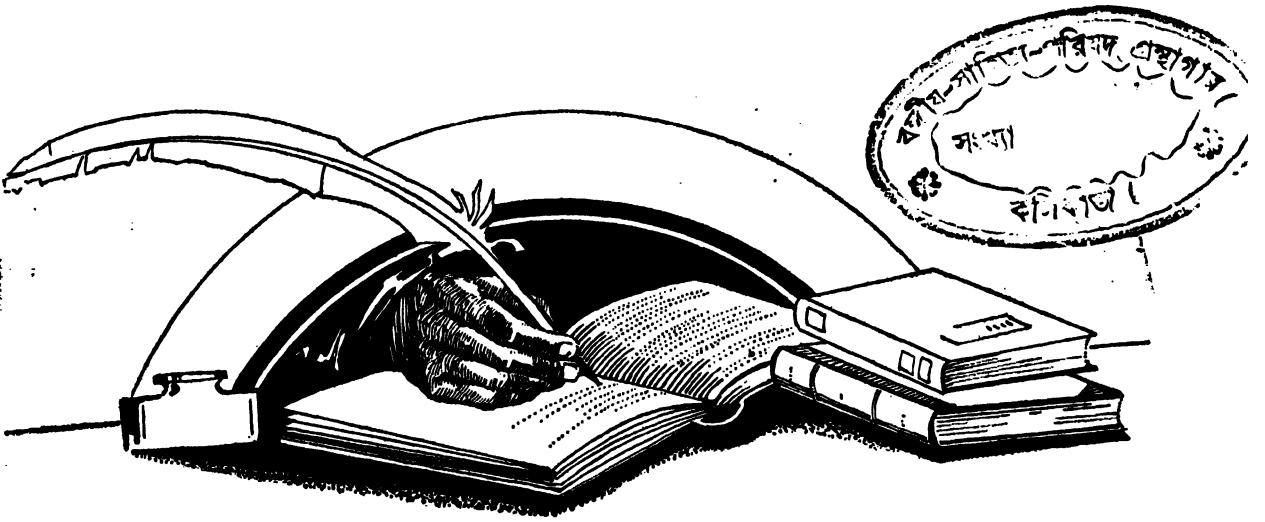
# সম্পাদকীয়

## ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান

এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় চৈতন্যও উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আমরা গ্রাম, জেলা, বিভাগ, এমন কি প্রদেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড ভূভাগ হিসাবে দেখিতে শিখিয়া মনে মনে একজাতীয়ত্ব কল্পনা করিতেছি। উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের শিক্ষা আমাদিগকে এ বিষয়ে অনেকখানি প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল; দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ নবজাগরণে আমাদের ভারতীয়তা-বোধ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতের সুবিধা, তজ্জনিত অবাধ মেলামেশা এবং ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে মিলনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়। একচ্ছত্র ইংরেজ-শাসনকে সর্ব্বত্র-জাগ্রত রাষ্ট্রীয় চেতনার ফলে আমরা পীড়ন বলিয়া বোধ করিতে থাকি; স্বাধীনতা-স্বপ্ন-দর্শন সুরু হয়। উদ্দেশ্য এক হওয়াতে মিলন নিবিড় হইতে থাকে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।

সে আজ ৫৩ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। ইতিমধ্যে মিলন সম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগও ঘটিয়াছে। অথচ আজ দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া চোখে পড়িতেছে, বর্দ্ধমানে এবং শ্রীহট্টে প্রতিমা-বিসর্জ্জন লইয়া হিন্দু-মুসলমানে গভীর বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের হানাহানি ও রক্তপাতের কথাও মনে পড়িতেছে। ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া মুসলিম লীগ প্রবল হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষকে এক করিবার স্বপ্ন যাঁহারা ভাঙিয়া দিবার পক্ষে ছিলেন, যে কৌশলেই হউক, তাঁহারা সফল হইয়াছেন।

আমাদের আশাভঙ্গে দুঃখের অবধি নাই। তথাপি ইতিহাস উল্টাইয়া দেখিতেছি, এই বিরোধের বীজ অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই, সুরু হইতেই ছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ, ২৯এ এবং ৩০এ ডিসেম্বর তিন দিন ধরিয়া বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। মিঃ এ. ও. হিউমের প্রস্তাবে এবং মাদ্রাজের মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও বোম্বাইয়ের মাননীয় কে. টি. তেলাঙের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাংলা দেশের তদানীন্তন স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার পৌরোহিত্য-ভার গ্রহণ করেন। তিন দিনের অধিবেশনে সর্ব্বসুদ্ধ নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৃতীয় দিনে চতুর্থ প্রস্তাব করেন বোম্বাইয়ের মাননীয় দাদাভাই নৌরোজি। প্রস্তাবটি বিলাতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা সংক্রান্ত। মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত বীর রাঘবাচারিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন—

"The progress of education throughout the different provinces of the Indian Empire is so great, and the facilities for intercommunication so various, that we, who were hitherto strangers to each other as the Sikhs, the Mahrattas, the Bengalees and the Madrasees, consider ourselves as one people with the same grievances, and with

the same aspirations. We now begin to perceive that notwithstanding the existence of differences in our mother tongue, social habits and manners, we possess the true elements of a nationality about us, we possess the talent for organization, and we possess too many things in common to permit of our living apart for ever as strangers. Is it not time for us now to sink our minor differences and concentrate our forces for the attainment of grand national objects ?"

অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে আচার-ব্যবহার-ভাষা-ইত্যাদি-গত ব্যবধান দূর করিয়া পরস্পর এক হইবার স্বপ্ন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথম হইতেই দেখেন ; বাধাগুলিকে তাঁহারা মোটেই দুর্লঙ্ঘ্য বিবেচনা করেন না।

কিন্তু এই সদিচ্ছার মধ্যে একটা 'কিন্তু' থাকিয়া যায়। 'টাইম্‌স' পত্রিকার বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি এই মহাসভা-সম্পর্কে ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে বিলাতে যে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং যাহা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের সাপ্তাহিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়, তাহার একটি অংশ এই—

"For the first time, perhaps, since the world began India as a nation met together. Its congeries of races, its diversity of castes, all seemed to find common ground in their political aspirations. Only one great race was conspicuous by its absence ; the Mahomedans of India were not there, they remained steadfast in their habitual separation. They certainly do not yield to either Hindu or Parsee in their capacity for development, but they persistently refuse to act in common with the rest of the Indian subjects of the Queen-Empress. Not only in their religion, but in their schools, and almost all their colleges, and all their daily life they maintain an almost haughty reserve. The reason is not hard to find. They cannot forget that less than two centuries ago they were the dominant race, while their present rivals in progress only counted as so many millions of taxpaying units who contributed each his mite to swell the glory of Islam."

'টাইম্‌সে'র সংবাদদাতার সংবাদে যদিও কিছু ভুল ছিল ( মিঃ আর. এম. সয়ানি ও মিঃ এ. এম. ধরমসি বোম্বাই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন—ইঁহারা উভয়েই মুসলমান ), কিন্তু তাঁহার মন্তব্যে ভুল যে ছিল না, দীর্ঘ ৫৩ বৎসর পরেও আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যে মনোভাবের উল্লেখ 'টাইম্‌স'-সংবাদদাতা করিয়াছিলেন, সেই মনোভাবই বর্ত্তমান মুসলিম লীগে প্রকাশ পাইতেছে ; মিঃ জিন্না এই মনোভাবের মূর্ত্তিমান প্রতীক এবং মিঃ ফজলল হক এই প্রতীকেরই উপাসনা করিতেছেন। আশার কথা এই যে, এই রাজকীয় স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একদল জাতীয়তাবাদী মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর স্বপ্নকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে সফল করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও উন্নতিই সম্ভব নয়।

## ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা

২৯এ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী "হিন্দুস্থানী, হিন্দী ও উর্দ্দু" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে হিন্দুস্থানী নামীয় অদ্যাপি-অগঠিত ভাষাকে কেন রাষ্ট্র ভাষার সম্মান দেওয়া হইবে, চমৎকার ইংরেজীতে সে সম্বন্ধে কতকগুলি যুক্তি দাখিল করিয়াছেন। গত কিছুকাল যাবৎ এ বিষয়ে ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে ; উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা হিন্দীর পক্ষে, সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানেরা উর্দ্দুর পক্ষে, বাঙালীরা বাংলার পক্ষে এবং দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ অঞ্চলের লোকেরা তামিল-তেলেগুর পক্ষে যুক্তিপূর্ণ দাবি জানাইতেছেন, কিন্তু অল-ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে হিন্দুস্থানীকেই রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া জাহির করিতেছেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সেদিন পর্য্যন্ত, আজও পর্য্যন্ত বলিলে অন্যায় হয় না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্র-প্রধানেরা পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ইংরেজীকে যে ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি

হিন্দুস্থানীকে সেই প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার হুকুম হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসাবে হিন্দুস্থানীরই দাবি জানাইয়াছেন।

এই দাবি সঙ্গত কি না অনেকে অনেক ভাবে তাহার বিচার করিয়াছেন। 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আষাঢ়ের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" এবং শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দাস মহাশয় শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রবন্ধে বাংলা দেশের পক্ষে হিন্দুস্থানীর দাবি যে অশোভন নানা যুক্তিপ্রয়োগে তাহা দেখাইয়াছেন।

প্রথম এবং প্রধান যুক্তি এই যে, "হিন্দুস্থানী" নামীয় কোনও ভাষার এখন পর্য্যন্ত অস্তিত্বই নাই; এই ভাষা এখনও গঠনের অপেক্ষায় আছে। মহাত্মা গান্ধীও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। অস্তিত্বহীন ভাষার দাবি রক্ষা করিতে গিয়া বহুজনসেবিত এবং যথেষ্টপুষ্ট ভাষাগুলির অমর্য্যাদা করিতে হইলে, পশ্চাতে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকা চাই। মহাত্মা গান্ধী অনেকগুলি কারণ দিয়াছেন, কিন্তু কোনটিই যথেষ্ট সঙ্গত মনে হইতেছে না।

মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন, হিন্দুস্থানী—উর্দ্দুও নয়, হিন্দীও নয়, দুইয়ের সংমিশ্রণ।

"This Hindustani will have many synonyms to supply the varied requirements of a growing nation rich in provincial languages. Hindustani spoken to Bengali or Southern audiences will naturally have a large stock of words of Sanskrit origin. The same speech delivered in the Punjab will have a large admixture of words of Arabic or Persian origin. All India speakers will have therefore to command a Hindustani vocabulary which will enable them to feel at home with audiences drawn from all parts of India."

ভাষা তৈয়ার করিয়া যদি তাহার সাহায্যে প্রচার করিতে হয় এবং স্থানভেদে সেই ভাষার যদি রূপভেদের অবকাশ থাকে, তাহা হইলে সেই ভাষা কখনও লিখিত ভাষার মর্য্যাদা পাইবে না, অর্থাৎ তাহা সাহিত্যের ভাষা হইবে না। সুতরাং হিন্দুস্থানীর দ্বারা যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার ক্ষতির আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, মহাত্মা গান্ধীর মতে এই ভাষা মুখের বুলি মাত্র হইবে, ইহার অন্য কোনও পদমর্য্যাদা থাকিবে না

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত রাষ্ট্রিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন-কামনায় ইংরেজী ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রগত অথবা ব্যবসায়গত উদ্দেশ্যসিদ্ধি ছাড়াও আমরা অন্যভাবে লাভবান হইয়াছি; চাকুরির বাজারে আমাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে এবং বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া আমাদের মনের প্রসার আশ্চর্য্য রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তদ্দারা আমাদের প্রাদেশিক ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া লাভবানই হইয়াছে। হিন্দুস্থানী দিয়া ইংরেজীকে হটাইতে হইলে নূতন শিক্ষার্থীর অধিকতর প্রলোভন আবশ্যক। সে প্রলোভন কোথায়?

সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে, গায়ের জোরে যতটুকু ক্ষতি করা সম্ভব উৎসাহের আধিক্যে ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা আমাদের ততটুকুই ক্ষতি করিবেন, আমাদের অন্তর্লোকে তাঁহারা প্রবেশাধিকার পাইবেন না। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে মাদ্রাজে অনেকে কারাবরণ করিতেছেন—হিন্দুস্থানীর প্রসার বিষয়ে ইহা দুর্লক্ষণ। রাষ্ট্রপতির ফতোয়া সত্ত্বেও বাঙালী বাংলা ভাষার গৌরব লইয়া অটল আছেন।

সমস্ত ভারতবর্ষে ভোট লইলে ইংরেজীর সপক্ষে ভোটাধিক্য হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত ভারতবর্ষকে ভাষায় ও চিন্তায় এক কল্পনা করিয়া আমরা যেমন তৃপ্তি লাভ করিতেছি, অচিরাৎ সমস্ত পৃথিবীর সহিত আত্মীয়তা আমাদের তেমনই কাম্য হইবে। তখন হিন্দীপ্রধান অথবা উর্দ্দুপ্রধান কোনও হিন্দুস্থানীই আমাদের উপকারে আসিবে না। হিন্দুস্থানীর মোহে ততদিনে ইংরেজী ভুলিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকবে না।

ধর্ম্ম-ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এমনিতেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, ভাষা-ব্যাপারে সেই বিরোধকে বাড়াইয়া তোলা সমীচীন হইবে না।

বত্রিশ বৎসর বয়সে

## কেশবচন্দ্র সেন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে কয়জন প্রতিভাবান বাঙালী রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কেশবচন্দ্র সেনের নাম এই বৎসরে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই চারিজন মনীষীই ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম তিন জনের স্মরণে শত-বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাকি আছেন কনিষ্ঠ কেশবচন্দ্র। আগামী ১৯এ নবেম্বর তারিখে তাঁহার জন্মের এক শত বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ওই শুভ দিনে আচার্য্য কেশবচন্দ্র দেওয়ান রামকমল সেনের কলুটোলাস্থিত ভবনে ভূমিষ্ঠ হন। কেশবচন্দ্র রামকমলের পৌত্র এবং প্যারীমোহন সেনের পুত্র।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামকমলের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট। বৃহত্তম ইংরেজী-বাংলা অভিধানের সঙ্কলনকর্ত্তা হিসাবে দেশীয়দের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য; ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অভিধান প্রকাশিত হয়, কিন্তু রচনার কাল হিসাব করিলে অভিধান বিষয়ে তিনি উইলিয়ম কেরীরও অগ্রণী। তিনিই সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তিও বড় অল্প ছিল না। কিন্তু পৌত্রের মহিমার নিকট পিতামহের মহিমা ম্লান হইয়াছে, রামকমল সেন কেশবচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ হিসাবেই আজ পরিচিত।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের নাম একসূত্রে গ্রথিত। কেশবচন্দ্র শুধু ধর্ম্মসংস্কারক ও যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন না; নূতন ভাবে সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ও সাহিত্য গঠনে তিনি প্রেরণা দিয়াছেন এবং নিজে সেই আদর্শে জীবনাতিপাত করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির অর্থাৎ নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম্মের দিক দিয়া তিনি একজন গোষ্ঠীপতি, কিন্তু ইহাই তাঁহার সবখানি পরিচয় নয়। এদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সুলভ সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন করেন, লিখিত ভাষাকে সরল করিয়া সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য রীতিমত প্রচারকার্য্য করেন; বাংলা নাটকের অভিনয়ে সে যুগে তাঁহার উৎসাহ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য; তাঁহাকে শিশুসাহিত্যের মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তকও বলা যায়। বস্তুত কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। মাত্র ৪৫ বৎসরের স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি সমাজ ও দেশের হিতার্থ অনেক কিছু সম্পাদন করিয়া যান। স্ত্রীশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও গণশিক্ষা—এই ত্রিবিধ আন্দোলনের সহিতই কেশবচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রামমোহনের পরে তিনিই ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবগত মিলন-সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মসংস্কারক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্বাধীন চিন্তা, দেশপ্রীতি ও জনসেবা তাঁহাকে সমাজ-গণ্ডির বাহিরে বৃহত্তর বঙ্গসমাজে এবং বিশাল ভারতে এমনই প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল যে, তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছিলেন।

আদি, সাধারণ ও নববিধান সমাজের উদ্যোগে এই মাসে কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবার কথা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানও এই মহাপুরুষের স্মৃতিপূজায় যোগদান করিবেন। ৭ই নবেম্বর হইতে উষা-কীর্ত্তনের দ্বারা উৎসবের সূত্রপাত, ১৬ই হইতে ২৬এ নবেম্বর কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের বহু স্থানে সভা বসিবে। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের ইংরেজী ও বাংলা রচনার একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা আশা করি, বর্ত্তমানে অধঃপতিত হইলেও বাঙালী বঙ্গগৌরব কেশবচন্দ্রকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে।

## রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচি

বস্তুপ্রাধান্যের দিক দিয়া যদি যুগ বিভাগ করিতে হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগ—বিজ্ঞাপনের যুগ। হিট্‌লার মুসোলিনির মত ডিক্টেটর এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানকেও সুতরাং সমস্ত শক্তির পুরোভাগে যথোপযুক্ত বিজ্ঞাপনের বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। বর্ত্তমান জগতে এইখানেই আমেরিকার জয়, শক্তি ও ব্যবসায় বিস্তারে বিজ্ঞাপন যে অত্যন্ত কার্য্যকরী, আমেরিকাই তাহা সর্ব্বপ্রথম প্রচার

করেন। সে দেশে ফিটফাট পরিষ্কার টাক লইয়া কাহারও স্বস্তিতে পথ চলিবার উপায় নাই, অতখানি মূল্যবান 'স্পেসে'র অপব্যয় বিজ্ঞাপন-দাতারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়।

জাপান সর্ব্ববিষয়েই আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, বিজ্ঞাপন ব্যাপারে টাক তো দূরের কথা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ অথচ মূল্যবান স্থান কবি-মনকেও জাপান নিঃসংশয়ে নৃশংসভাবে অধিকার করিগাছে। পোয়েট-লরিয়েটের ডিউক-অব-ওয়েলিংটন-প্রশস্তিতেই সেখানে বিজ্ঞাপন-বৃত্তির চরম পরিণতি নয়; কবি সমস্ত কাব্যপ্রেরণা, এমন কি সম্পূর্ণ অন্তরাত্মা প্রয়োগ করিয়া জাপানের তরফে বিজ্ঞাপন দিতেছেন; শয়তান পূজা-মন্দির অধিকার করিয়াছে।

সুতরাং ভারতে কবি নোগুচির সফর কাব্যমার্গে অনাবিল প্রীতিসংস্থাপনের অভিযান নয়, বৃহত্তর অভিযানের যে পূর্ব্বাভাষ এতদিনে তাহা বুঝা যাইতেছে। গঙ্গা-তীরবর্ত্তিনীর হৃদয়গ্রাহী প্রশস্তি মলাট-আবরণের মধ্যেই কবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ কবিত্বমুখোস-বিরহিত নোগুচিকে দেখিয়া অকারণে বিস্ময় অনুভব করিতেছেন। নোগুচির প্রথম পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ তাই বলিতেছেন—

> আপনি এমন একটি এশিয়ার কল্পনা করিয়াছেন যাহা নর-কপালের স্তম্ভের উপর রচিত হইবে। আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাসবান্ ইহা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু যে বীভৎস নরহত্যার কার্য্যে তৈমুরলঙ্গের হৃদয় নন্দিত করিত, সেই কার্য্যের সহিত এই বাণীকে এক শ্রেণীভুক্ত করিবার কল্পনা আমি কখনো করি নাই...যে গবর্নমেণ্ট তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রে জীবনের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত ধ্বংসসাধনে ব্রতী, সেই গবর্নমেণ্টের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া তাহার বিশেষ অনুগ্রহলাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকিকে জীবনের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়ানকে আমি আধুনিক বুদ্ধিজীবীগণ কর্ত্তৃক মানবতার প্রতি কৃতঘ্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি।

কিন্তু পোস্টার বা বিজ্ঞাপন কখনও চাপা পড়ে না, এক স্থানে চাপা পড়িলেও অন্যত্র অত্যন্ত প্রগল্ভভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞাপন-নোগুচিও দমিবার পাত্র নন। তিনি 'স্বপ্নবিলাসী' ও 'বুদ্ধিজীবী' এই দুইটা শব্দের মারপ্যাচে রবীন্দ্রনাথকে যে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সমস্ত বুঝিয়াও রবীন্দ্রনাথ যে কেন পুনরায় তাহার জবাব লিখিতে বসিলেন, আমরা তাহাই ভাবিতেছি।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি স্মরণীয়—

"I suffer intensely not only because the reports of Chinese suffering batter against my heart, but because I can no longer point out with pride the example of a great Japan. It is true that there are no better standards prevalent anywhere else and that the so-called civilised peoples of the West are proving equally barbarous and even less "worthy of trust". If you refer me to them, I have nothing to say. What I should have liked is to be able to refer them to you. I shall say nothing of my own people, for it is vain to boast until one has succeeded in sustaining one's principles to the end."

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এলগিন রোড হইতে প্রকাশিত

মেট্রোপলিটনের
পলিসি
সুখ ও শান্তির
উৎস
মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ।
হেড অফিস:—২৮, পোলক স্ট্রীট,

ক্যালকেমিকোর
প্রসাধন সম্ভার।
রূপ-চর্চ্চায়—মার্গোসোপ,
রেণুকা টয়লেট্ পাউডার
কেশ-বিন্যাসে—
ক্যাষ্টরল, ভৃঙ্গল, কোকোনল,
সিলট্রেস্, ও লাইজু
অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত
মনোরম আধারে
পাওয়া যায়।
—ক্যালকাটা কেমিক্যাল—

## সূচী

অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

## 'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষাণ্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষাণ্মাষিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষাণ্মাষিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'র প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

### বিজ্ঞাপনের হার

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ | ১ | পৃষ্ঠা | প্রতি মাসে | ২০৲ |
| ,, | ½ | ,, | ,, | ১১৲ |
| ,, | ¼ | ,, | ,, | ৬৲ |
| কভার | ৪র্থ | ,, | ,, | ৬০৲ |
| ,, | ২য় | ,, | ,, | ৫০৲ |
| ,, | ৩য় | ,, | ,, | ৪৫৲ |

( বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র )

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।

৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

MEGAPHONE
CALCUTTA

মা

শ্রীযামিনী রায়

প্রথম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ | তৃতীয় সংখ্যা

# জাতীয়তা, জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা

শ্রীশরৎচন্দ্র রায় ( রাঁচি )

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান সমস্যা, কি উপায়ে আমাদের বিশিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও জাতীয় আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের জাতীয় একত্ব বা জাতীয়তার (nationalism) পরিপুষ্টি সাধন করা যায়।

কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান কংগ্রেস-নেতা রাঁচিতে আসিয়া বাঙ্গালীদের ইউনিয়ন ক্লাবে এই মর্ম্মে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, "আমরা বাঙ্গালী, আমরা বিহারী, আমরা হিন্দুস্থানী, আমরা মহারাষ্ট্রী, আমরা গুজরাটী, আমরা মাদ্রাজী—এই সব কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর একেবারে ভুলিতে হইবে।" তিনি নিজে নাকি অনেক দিন যাবৎ এইরূপ স্বীয় পৃথক-জাতিত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন, এবং উহা না ভুলিলে নাকি ভারতের কল্যাণ হইবে না, স্বাধীনতা লাভ হইবে না। আরও তাঁহার মতে এবং কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষদের মতে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ হিন্দী ও উর্দ্দুর মিশ্রিত খিচুড়ি-ভাষা ভারতের সাধারণ ভাষারূপে গৃহীত না হইলে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে নাকি একত্ব স্থাপিত হইবে না। তবে মাতৃভাষায়ও অনুশীলনের তিনি বিরোধী নহেন।

আমার মনে হয় যে, ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে স্বদেশী ও প্রবাসী উভয় জাতির সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই উভয় সমাজের পরস্পরের মিলন ও সংস্কৃতির সমীকরণ করিয়া ঐক্যস্থাপন করা প্রয়োজন; এবং তাহা দুরূহ নহে; উভয় জাতির পক্ষে ও জাতীয়তার পক্ষেও কল্যাণকর।

কেন এইরূপ মনে হয় ও কি উপায়ে ঐরূপ ঐক্যস্থাপন সম্ভব হইবে, এ সম্বন্ধে আমার ধারণা সাধারণভাবে দুই-এক কথায় বলিব।

## প্রত্যেক জাতির বা সমাজের বৈশিষ্ট্য—তাহার শক্তির উৎস

জগতের বা ভারতের সকল জাতিকে ও সংস্কৃতিকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করা মানবের হয়তো কখনও সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রভাবে ও অপর কোনও কৃত্রিম উপায়ে তাহা কখনও সম্ভব হইলেও, তদ্দ্বারা সভ্যতার অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়।

বিহার সরকার সম্প্রতি যেরূপে বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালীত্বভ্রষ্ট নকল বিহারী প্রস্তুত করিতে চাহিতেছেন, তাহা সমাজতত্ত্বসম্মত নহে, এবং বিশুদ্ধ রাজনীতিসম্মত কিনা সন্দেহ। সেরূপ প্রচেষ্টায় সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ঘটিবার আশঙ্কা অধিক। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বর্ত্তমানে ঐরূপ প্রচেষ্টা হইতেছে বটে; কিন্তু সেখানকার ইতিহাস ও অবস্থান (conditions) ভারত হইতে বিভিন্ন। যুক্তরাজ্যের লোক-সংখ্যা ১২ কোটি, ভারতের প্রায় ৩৬ কোটি, অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে তিন গুণ বেশি। যুক্তরাজ্যের অসভ্য জাতিগুলি ছাড়া প্রায় সমগ্র অধিবাসী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও তাহাদের সংস্কৃতিও সমধর্ম্মী ও সমস্তরে অবস্থিত।

যদি সমস্ত বাঙ্গালী ও বিহারীর মধ্যে জাতিভেদ রহিত হইয়া অবাধ বিবাহ-সম্বন্ধ প্রচলিত হইত, তাহা হইলে হয়তো উভয় জাতির ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে একটি নূতন জাতি ও সংস্কৃতির উদ্ভব হইতে পারিত,—যেমন আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে অধুনা হইতেছে। কিন্তু জাতিভেদগ্রস্ত ভারতের সে আশা সুদূরপরাহত। আর, বস্তুতঃ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই, ভারত-সভ্যতাকে সৌন্দর্য্য ও গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল। ইংলণ্ডের একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী (journalist) মিঃ মাইকেল পিম ভারতে আসিয়া এইরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার "Power of India" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:—"All these different races and classes mixed up together—not losing their individuality, not attempting to impress upon their neighbours,—what a richness it gave to the pattern of existence. This was part of the fascination of Indian life—part of the depth of Indian culture and thought!"

পূর্ব্বকালে, এমন কি দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বেও, যে সমস্ত বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বা বিহারে বা উড়িষ্যায় বা অন্য কোনও প্রান্তে খণ্ড খণ্ড ভাবে গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের সন্তান-সন্ততিরা বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালা দেশের সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন ও যাতায়াত-রহিত হওয়াতে, বাঙ্গালা ভাষা ও রীতি-নীতি অল্লাধিক বিস্মৃত হইয়া অনেকটা অবাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছেন। যেখানে কেবল দুই একটি বাঙ্গালী পরিবার দূর প্রদেশে গিয়া সুদীর্ঘকাল বাস করিতেছেন ও বাঙ্গালা প্রদেশ ও স্বজাতি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরেরা তো সর্ব্বতোভাবে অবাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু স্বজাতির প্রতি আন্তরিক টান তাঁহাদের মগ্নচৈতন্যে (subconscious region) এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুদূর জয়পুর রাজ্যের রাজা মানসিংহের পুরাতন রাজধানী অম্বরে ইহার পরিচয় আমি বিশেষভাবে পাইয়াছিলাম। রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক অম্বরে আনীত যশোহরেশ্বরী

কালীমূর্ত্তি তাঁহার প্রাসাদস্থ মন্দিরে এখনও অধিষ্ঠিত আছে এবং যশোহর হইতে আনীত বাঙ্গালী পুরোহিতের বংশধরেরা এখনও ঐ দেবীর পৌরোহিত্য করেন। কয়েক পুরুষ জয়পুররাজ্যে বাস করিয়া এবং তথায় বিবাহ-সম্বন্ধাদিতে সম্বদ্ধ হইয়া ঐ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পরিবার একেবারে জৈপুরী মাড়োয়ারী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চেহারা, পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা, রীতি-নীতিতে বাঙ্গালীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবুও এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঙ্গালীত্বের গৌরব করেন। যখন আমরা ঐ দেবীমূর্ত্তি দেখিতে যাই, ও পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম যে, এই সেই আদি যশোহরেশ্বরী ; পুরোহিত ঠাকুর তখন বলিতে লাগিলেন যে, এ মূর্ত্তি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর হইতে আনীত হয় এবং তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ ইহার বাঙ্গালী পূজারী ছিলেন এবং এই দেবীমূর্ত্তির পূজার জন্য যশোহর ( আঁধারমাণিক গ্রাম ) হইতে এখানে আনীত হন। যশোহরের ( বর্ত্তমান জেলা যশোহর নহে ) সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকার পরিচয় পাইয়া, সেখানকার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও আমাদিগকে আদর-আহ্বানে আপ্যায়িত করিলেন। এই বাঙ্গালী পরিবারের মাড়োয়ারী হইয়া যাওয়ায় সংস্কৃতির দিক দিয়া জয়পুরবাসীদের বিশেষ উপকার হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না ; কিন্তু সেদিক দিয়া এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পরিবারের জয়পুরী সংস্করণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ঐ পূজারীকে দেখিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছিল।

রাঁচি জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে কয়েকটি গ্রামে দুই-চারিটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পরিবার দেখা যায়, যাঁহারা বহুপুরুষ বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে আচার-ব্যবহারে ধর্ম্ম-কর্ম্মে ও ভাষায় অনেকটা অবাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছেন। রাঁচি জেলার পূর্ব্ব প্রান্তের ( পাঁচ পরগণায় ) ও হাজারিবাগ জেলার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ( গোলা প্রভৃতি থানায় ) যে সমস্ত বাঙ্গালী পরিবার বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সংখ্যাধিক্যের জন্য এবং মানভূম জেলার সান্নিধ্যের জন্য অনেকটা বাঙ্গালীত্ব এখনও বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি তাঁহাদিগকে নকল বিহারী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা প্রবলভাবে চলিতেছে। তথাকার বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দীর প্রচলন করা হইয়াছে। কেহ কেহ অর্থনৈতিক আপাত সুবিধার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে হিন্দীভাষী বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ণিয়া জেলার শিরপুরিয়া ভাষা বাঙ্গালার উপভাষা। রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার কুড়মী জাতির 'করমালি' নামক ভাষা বাঙ্গালা ভাষারই রূপভেদ মাত্র। এবং পুরাতন সেন্সাস রিপোর্টে ইহা বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই পরিগণিত হইত ; কিন্তু এখন তাহা মাগধী হিন্দী বলিয়া গণ্য হইতেছে। শিরপুরিয়া বাঙ্গালারও সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১-এর সেন্সাস রিপোর্ট তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপ কৃত্রিম উপায়ে বিহারে বাঙ্গালাভাষীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে অল্প হইতে অল্পতর ও বিহারী হিন্দীভাষীর সংখ্যা অধিক হইতে অধিকতর-রূপে পরিণত হইতেছে।

বিহার সরকারের বর্ত্তমান মনোভাবে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি বাঙ্গালীত্ব হারাইয়া বিহারী হইয়া না যায়, তাহা হইলে এ প্রদেশে তাহাদের স্থান হইবে না,—তাহাদের কোনও দাবি স্বীকার করা হইবে না।

সংস্কৃতির ও জাতীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে এইরূপ রাজনীতিকে আত্মঘাতী নীতি (suicidal policy) বলিয়া মনে হয়। কারণ, বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ করিলে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতির একটি দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

দেশজ সংস্কৃতির উপর কোনও আগন্তুক (immigrant) জাতির সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার প্রধানতঃ দুইটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, আগন্তুকদের সংখ্যা; দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের সংস্কৃতির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা অথবা নিকৃষ্টতা। সাধারণতঃ কোনও আগন্তুক জাতি দেশবাসীদের তুলনায় সংখ্যায় একেবারে নগণ্য হইলে এবং তাহাদের সংস্কৃতি দেশজ সংস্কৃতির সমস্তরের বা উচ্চতর স্তরের হইলেও তাহা তদ্দেশবাসীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় না। এই জন্যই পূর্ব্ব-কালের বাঙ্গালী প্রবাসীদের সংস্কৃতি বিহার বা অন্য কোনও দেশে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই; বরং অনেক স্থলে প্রবাসীরাই তাঁহাদের প্রবাসের সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল কোনও কোনও বিশেষ প্রতিভাশালী প্রবাসী বাঙ্গালী যে সমস্ত দেশজদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাদেরই উপরে স্ব স্ব চরিত্র ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। যেমন বৌদ্ধযুগে বিহারের বিক্রমশীলা, নলান্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্র, অতীশদীপঙ্কর, শান্তরক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী ও সহকর্ম্মী ও অন্যান্য গুণমুগ্ধ বিহারীদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন; কিন্তু সে প্রভাব বিহারী জনসাধারণের নিকট পৌঁছিবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্য প্রদেশের ও জাতির সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করা যেমন সাধারণতঃ দুই চারিজন ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে, তেমনই অন্য জাতির সংস্কৃতি হইতে উপাদান গ্রহণ, সমীকরণ ও আয়ত্তীকরণ দ্বারা স্বীয় জাতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিকরণ খণ্ডভাবে দুই এক ব্যক্তির কার্য্য নহে; উহা বহু ব্যক্তির মনের সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়ার ফল (the work of many minds undergoing similar reactions)।

অবশ্য মহাপুরুষদের কথা স্বতন্ত্র। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবেই বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আর অন্য কারণে অসভ্য জাতিদের কথাও স্বতন্ত্র। তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিশেষ অভাববশতঃ তাহারা পশুপালের মত দলনেতাকে অন্ধবৎ অনুসরণ করে। তাই কখনও কখনও দেখা যায় যে, এইরূপ গড্ডলিকাবৃত্তি (herd-instinct) দ্বারা পরিচালিত অসভ্য জাতির নেতারা দুই একটি প্রতিভাশালী অন্য জাতির আগন্তুকের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে নূতন ধর্ম্মমত বা সামাজিক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। মুণ্ডাদের "বীরসাধরম" সম্প্রদায়ের, উরাঁওদের "টানাভগত" সম্প্রদায়ের, সাঁওতালদের "খাড়োয়ার" বা "ছাপা-হোড়" সম্প্রদায়ের এবং কুড়মী প্রভৃতি জাতিদের "হরিবাবা" সম্প্রদায়ের সূচনা ও অনুপ্রাণন (inspiration) অপরজাতীয় শিক্ষাগুরুর দ্বারাই হইয়াছিল।

বাংলার পালরাজবংশের অধিকার বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশেও বিস্তৃত হওয়ায়, বাঙ্গালী সংস্কৃতি কিয়ৎ পরিমাণে ঐ সমস্ত প্রদেশবাসীদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে, মুসলমান আমলেও দেখিতে পাই কয়েকটি বাঙ্গালী মহাজন বিহার,

উড়িষ্যা প্রভৃতি সরকারে স্ব স্ব চরিত্র ও প্রতিভাবলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে, বিহার সরকারের দেওয়ান (Revenue Commissioner) বাঙ্গালী কায়স্থ রায় চিন্তামণি দাস ও বিহারের বাঙ্গালী নায়েব-নাজিম (Deputy Governor) মহারাজা জানকীরাম সোম এবং উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম বাঙ্গালী দুর্ল্লভরামের কীর্ত্তি ও প্রভাবের পরিচয় আপনারা ইতিহাস হইতে অবগত আছেন। অনেকে জানেন যে, মহারাজা জানকীরাম তাঁহার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তাঁহার বিহারী কায়স্থ দেওয়ান রাজা রামনারায়ণকে তাঁহার নিজের কার্য্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ও তাঁহার নিজের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য নবাবের নিকট সুপারিস করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; যদিও মহারাজা জানকীরামের স্বীয় পুত্র নবাব-সরকারের উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, তবুও তাঁহার দাবি উপেক্ষা করিয়া তিনি রাজা রামনারায়ণকেই স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপ দুই চারিজন মহাপ্রাণ বাঙ্গালীর মহত্ত্বের ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যার অল্পতার জন্য সেকালে প্রবাসে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মুসলমানের রাজত্বকালে এবং ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথমভাগেও দেখা যায়, কয়েকটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিহার প্রভৃতি প্রদেশে কোনও কোনও প্রসিদ্ধ জমিদার বা রাজাদের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের সমাদরের নিদর্শনস্বরূপ ঐ রাজা ও জমিদারদের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর গ্রামাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি এখনও ঐসব সম্পত্তির অধিকারী আছেন। বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদের অনেকের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতি তাঁহারা অল্পবিস্তর রক্ষা করিলেও, সংখ্যায় লঘুত্বের জন্য দেশজদের উপর সে সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ পাটনা জেলায় সিলাও গ্রামের বাঙ্গালী ভট্টাচার্য্য জমিদারদের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমন ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সহজসাধ্য হওয়ায় দেশজেরা এবং প্রদেশান্তর হইতে আগন্তুকেরা উভয়েই অল্লাধিক উপকৃত হইতেছেন বা হইতে পারেন। প্রবাসীদিগকে এখন জাতীয় সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইতে বা মাতৃভাষা বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হয় না। বরং দেশের দুই একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও গুণগ্রাহী উদারচেতা দেশীয় নেতা প্রবাসীদের সংস্কৃতি হইতে গ্রহণযোগ্য উপকরণ সমাহরণ ও তাঁহাদের জাতীয় সংস্কৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য অনতিকাল পূর্ব্বে যত্নবান ছিলেন। বিহারী যুবকদের কোনও কোনও বিষয়ে বাঙ্গালীর অনুকরণ ইহার প্রমাণ। দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা অনেক স্থলে প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও আন্তর্প্রাদেশিক ঈর্ষা, আন্তর্জ্জাতিক ও আন্তর্প্রাদেশিক সংস্কৃতি-বিনিময়ের অন্তরায় হইতেছে। কোনও প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক ঈর্ষার প্রশ্রয় না দিয়া তাহার প্রশমন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা বাহুল্য। আন্তর্জ্জাতিক অসূয়া দ্বারা কেবল প্রবাসী ও দেশী উভয় সম্প্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে তাহা নহে, সমগ্র ভারত-সভ্যতার উৎকর্ষবিধানে বিঘ্ন ঘটিবে। অপর পক্ষে আমাদের বিভিন্ন প্রান্তীয় সরকার (provincial

governments) যদি শিক্ষিত প্রবাসীদিগকে তাঁহাদের প্রদেশে আসিয়া বাস করিবার সুবিধা প্রদান করেন এবং প্রবাসীদের স্ব স্ব ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে বাধা না দিয়া সহায়তা করেন এবং দেশী ও প্রবাসী উভয়কে জাতিনির্ব্বিশেষে তুল্য ব্যবহার ও সমান অধিকার প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের (provincial autonomy) গৌরবরক্ষা ও সার্থকতা হইবে, স্বদেশসেবা যথাযথ সাধিত হইবে ও যথার্থ স্বদেশানুরাগ প্রকটিত ও প্রমাণিত হইবে। প্রবাসীদের সংস্কৃতি হইতে গ্রহণযোগ্য উপাদান সমাহরণ করিয়া এবং দেশজ সংস্কৃতির সুরের সহিত তাহার সমীকরণের দ্বারা প্রাদেশিক সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সুযোগ হইবে।

এই উদ্দেশ্যে যাহাতে প্রবাসীদের কৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে, ও প্রবাসীরা তাহাদের জন্মভূমি হইতে মধ্যে মধ্যে নূতন ভাবধারা ও জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া জাতীয় সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করিতে পারে, সেজন্য প্রবাসীদিগকে তাহাদের আদিম মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা ও তথায় অবাধ গমনাগমনে বাধা না দিয়া উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই উপায়েই ভারতের বিভিন্ন জাতির বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরস্পরের জাতীয় কৃষ্টির উন্নতিসাধন হইতে পারিবে।

আর প্রবাসী ও দেশজ উভয় জাতির কর্ত্তব্য এই যে, যথাসম্ভব একের ব্যবহারে অপরের স্বার্থের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া উভয়ের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক হিতসাধনে পরস্পরের সহযোগিতা করেন। সহযোগিতা ও ত্যাগ-স্বীকারই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয়বিধ উন্নতির স্বাভাবিক পন্থা।

## পরিশেষে ভারতের একটি সাধারণ ভাষার কথা

সাধারণতঃ দেশের ভাষার দুই রকম রূপ দেখা যায়,—একটি সাধু ভাষা অথবা সংস্কৃতির ভাষা; অপরটি বিভিন্ন প্রাদেশিক চলতি ভাষা। যে দেশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ একজাতীয়, সেখানে সংস্কৃতির ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হয়; যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জারমানি, ইটালি প্রভৃতি দেশে। যে দেশের লোক বিভিন্নভাষাভাষী সেখানে এক বা একাধিক সাংস্কৃতিক ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হয়; যেমন সুইজারলণ্ডে। সেখানে জারমান, ফরাসী ও ইটালিয়ান তিনটি ভাষাই সাংস্কৃতিক ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত ও সম্মানিত হয়। যদিও (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসে) সুইজারলণ্ডের জনসংখ্যা হিসাবে শতকরা ৭০.৯ জন জারমানভাষাভাষী, শতকরা ২১.২ জন ফরাসীভাষাভাষী ও শতকরা কেবল ৬.১ জন ইটালিয়ানভাষাভাষী, তথাপি সুইস ফেডারাল কন্‌স্টিটিউশনের বিধান অনুসারে ফেডারাল পার্লামেণ্টে এই তিন ভাষাই ব্যবহৃত হয় এবং সমস্ত আইনকানুন ডিক্রী প্রভৃতি এই তিন ভাষাতেই প্রচারিত হয়। জনসংখ্যা ও আয়তনে সুইজারলণ্ড আমাদের বর্ত্তমান ছোটনাগপুর বিভাগ হইতেও ছোট। সুইজারলণ্ডের আয়তন প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গমাইল, ছোটনাগপুর ২৭ লক্ষ বর্গমাইল। সুইজারলণ্ডের জনসংখ্যা ৩৯½ লক্ষ, ছোটনাগপুরের ৬৬½ লক্ষ। অতএব এক প্রদেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির ভাষা থাকিলে তথাকার জাতীয়তা বা একতার হানি হওয়া অবশ্যম্ভাবী নহে। অপর পক্ষে প্রাদেশিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভাষার মধ্যে একটিকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিলে, অবশিষ্ট ভাষাগুলির উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবার কথা।

স্বাধীন হিন্দু ভারতে সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের ভাষা। সেজন্য জনসাধারণের ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষাগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। পরে মুসলমান রাজত্বের দিনে পারসী ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষার সমাদর হ্রাস হইল ও উহা প্রধানতঃ ধর্ম্মগ্রন্থের ও পূজা-পাঠের ভাষায় আবদ্ধ থাকিল। আর রাজশক্তির আনুকূল্যে প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষাগুলি (vernaculars) প্রাদেশিক সংস্কৃতির ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজারা তাঁহাদের রাজসভায় বিদ্বান ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিতের দ্বারা সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতির রচনা করাইতেন ও শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যান শুনিতেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমান নবাবদের পক্ষে কঠিন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা সহজ-সাধ্য ছিল না; সুতরাং তাঁহারা উপস্থিত সুধীগণের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ করাইয়া দেশীয় ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত হইতেন। যেমন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ের পাঠান নৃপতি নাসিরশাহ মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ করান। গৌড়ের আর এক নৃপতি কৃত্তিবাসকে রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করে। মুসলমান শাসকদের দ্বারা দেশীয় প্রাকৃত ভাষার এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়া কোনও কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থরচনা আর হেয়জ্ঞান করিতে পারিলেন না; বরং নিজেরাও ঐসব ভাষায় পুস্তকাদি রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। আর হিন্দু জমিদার, রাজা প্রভৃতিও প্রাকৃত ভাষায় পুস্তকাদি রচনায় উৎসাহদাতা হইলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের, বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম রাজা বাঁকুড়ারায়ের, ও ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্যে স্বচ্ছন্দে বাঙ্গালা ভাষার সেবা ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান প্রভৃতি সম্রাটগণ হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যেরও উৎসাহদাতা ছিলেন।

পরে ব্রিটিশ অধিকারকালে ইংরেজী ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। এবং জাতীয় কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণী ও প্রস্তাবাদিতেও (resolutions) ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী এখন কেবল রাষ্ট্রের ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাষা নয়। উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনেরও ভাষা। আর ঐ ভাষার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের মধ্যে ও অন্যান্য সভ্যদেশের সহিত কারবার ও পত্রাদি ব্যবহার ও ভাব বিনিময় হইয়া থাকে। ঐ ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য দেশের নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও গবেষণার সহিতও পরিচিত হইতে ও যোগ রাখিতে পারিতেছি ও পারিব। ইংরেজী ভাষার প্রতিপত্তি আজ সমগ্র সভ্য জগতে পরিব্যাপ্ত। আন্তর্জ্জাতিক ভাষা হিসাবে, বিশেষতঃ দৌত্যের ভাষা (language of diplomacy) হিসাবে অধুনা ইংরেজী ভাষা ফরাসী ভাষাকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজীকে আজ বিশ্বের ভাষা বলিলেও একেবারে অত্যুক্তি হয় না। স্বাধীন জাপানে এবং চীন দেশেও ইংরেজী ভাষা কারবারী ভাষা (language of commerce) হিসাবে এখন প্রচলিত। চীন দেশে ও স্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টে যে 'pidgin' ইংরেজী ব্যবহৃত হয়, তাহার আসল নাম ছিল "Business English"। ঐ নামটি যেমন ইংরেজী কথার অপভ্রংশ, সমগ্র ভাষাটিতেও তেমনই ইংরেজী কথা ও বাক্য-গঠন চীনা ছাঁচে ঢালা। হয়তো ভারত যখন স্বাধীন হইবে, তখনও ইংরেজী ভাষাকে আন্তর্প্রাদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও ভাবের আদান-প্রদানের ভাষারূপে ব্যবহার করিলে ভারতবাসীদের জাতীয় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ নাও হইতে পারে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মত অন্যরূপ। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে ইংরেজী যে স্থান অধিকার করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে, কংগ্রেস হিন্দুস্থানীকে সেই স্থানটি দিবার চেষ্টা করিতেছে।" মহাত্মার উপর আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সত্ত্বেও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই চেষ্টা সফল হইবার পক্ষে অন্তরায় অনেক এবং যদি কখনও সফল হয়, তাহা হইলে সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি হিন্দি ও উর্দ্দু মিশ্রিত খিচুড়ি-ভাষা যাহাকে "হিন্দুস্থানী" বলা হইতেছে এবং যাহাতে কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নাই, তাহাকে কেবল আন্তর্প্রাদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভাষা ও কথাবার্ত্তা চালাইবার ভাষারূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে বিশেষ আপত্তির কারণ হইবে না। একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ ভাষা (common language বা *lingua franca*) থাকিলে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু যদি ইংরেজীর পরিবর্ত্তে ইহাকে রাষ্ট্রের ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার ভাষা করা হয়, তাহা হইলে ভারতের সংস্কৃতির দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলি রাজকীয় অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাধারণের সমাদরে বঞ্চিত হইয়া হীনপ্রভ ও মর্য্যাদাশূন্য হইবে ও তাহাদের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হওয়া সম্ভব। আর হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা এবং সাংস্কৃতিক ভাষারূপে চালাইতে গেলে আন্তর্প্রাদেশিক ঈর্ষা ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। মাদ্রাজ প্রান্তে ইহার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। মুসলমানেরাও ভয় দেখাইতেছেন। সেদিন সিন্ধু মুস্লিম লীগে সভাপতি জিন্না সাহেব তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"By introducing Hindusthani as the *lingua franca*, Congress is endangering Muslim culture of which Urdu is the vehicle." গত ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'-পত্রিকায় কোনও লেখক ক্ষুব্ধচিত্তে লিখিয়াছেন, "হিন্দী প্রচার ও 'বন্দে মাতরমে'র বিচার একই মনোভাবপ্রণোদিত—বাঙ্গালার সঙ্গীত ও সাহিত্যকে অস্বীকার। বাঙ্গালার ভাবধারা হইতে দূরে থাকিতে চায় বলিয়া অবশিষ্ট ভারত বাঙ্গালার সহিত শেষ সংযোগ 'বন্দে মাতরম্'কে ছিন্ন করিল। আজ বাঙ্গালার গৌরবে অবশিষ্ট ভারত গৌরব অনুভব করে না। বাঙ্গালা আজ নির্ব্বান্ধব।"

সম্প্রতি বিহারের কংগ্রেস সরকার একটি "শিক্ষা-সংস্কার-কমিটি" (Education Re-organisation Committee) নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই কমিটি তাঁহাদের তদন্তের সৌকার্য্যার্থে ১৫৭টা মূল প্রশ্ন ও ২৮টি অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্তরের জন্য অনেক শিক্ষানীতিজ্ঞ ব্যক্তি ও সমিতির নিকট পাঠাইয়াছেন। তাহার কয়েকটি প্রশ্ন হইতেই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিহার সরকারের সঙ্কল্প স্পষ্ট জানা যায়। ৪৭ নম্বর প্রশ্নের মধ্যে বড় হরফে লেখা আছে "the sole medium of instruction in the secondary stage of instruction should be the language of the Province"; আর তারপরেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, "Hindusthani is the mother language of the largest proportion of the people in Bihar." প্রত্যুত, এই উক্তি ঠিক নহে, কারণ উত্তর বিহার বা মিথিলার ভাষা মৈথিলী; উহা হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার অধিকতর অনুরূপ। আর প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র মানভূম জেলা ও রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ ও পূর্ণিয়া এবং সাঁওতাল পরগণা জেলার কিয়দংশের ভাষা বাঙ্গালা। তারপর ৫২ নম্বর প্রশ্নে

জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, "How far do you consider it desirable that Hindusthani, the language of this province and *also the common national Indian language* should serve as the ordinary medium of intercourse between all communities in the province?" আইন-ব্যবসায়ীরা এই প্রশ্নকে leading question নামে অভিহিত করিবেন এবং নৈয়ায়িকেরা (logicians) ইহাকে 'begging the question' বা 'petitio principii' দোষে দুষ্ট বলিবেন। এইরূপে অযথা হুকুমের (fiat) দ্বারা হিন্দুস্থানীকে ভারতের সাধারণ ভাষা সাব্যস্ত করা হইলেও অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের লোকে ইহা স্বীকার করিবে—এ আশা কম। বাধ্যতামূলক হিন্দী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে যে ভীষণ অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষ ফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। যদি কেবল সাধারণ কারবারের ভাষা-হিসাবে ডঃ ও. কে. অগ্‌ডেনের উদ্ভাবিত Basic English-এর অনুরূপ একটি Basic Hindusthani ভাষার প্রবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে বিশেষ আপত্তির কারণ হইবে না; বরং সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। Basic English-এ মোট ৮৫০টি মাত্র সহজ কথা আছে। ভারতবর্ষের জন্য Basic Hindusthani-তে ঐরূপ অল্প সংখ্যক সহজ হিন্দী ও উর্দ্দু কথা ছাড়া তামিল, তেলেগু, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা হইতেও সহজ কার্য্যোপযোগী কিছু শব্দ গ্রহণ করিলে ঐরূপ কারবারী ভাষার প্রচলনের পক্ষে আরও সুবিধা হইতে পারে। ডঃ জেমেনফের প্রবর্ত্তিত Esperanto ভাষার যদিও আন্তর্জ্জাতিক ভাষা হিসাবে ইউরোপে সমাদর ক্রমে কিছু বৃদ্ধি হইতেছে, তবু ঐ ভাষা ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীর উপযোগিতা, বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেক কম। ভাষায় ভাব ও চিন্তা প্রকাশের ক্ষমতায় (range and power of expression) বাঙ্গালার সহিত হিন্দুস্থানীর তুলনাই হয় না। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার সংস্কৃতির ভাষা হইবার যোগ্যতা নাই; সেই যোগ্যতা অর্জ্জন করা তাহার পক্ষে দীর্ঘসময়সাপেক্ষ। এ বিষয়ে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর অপেক্ষা উর্দ্দু ভাষার উপযোগিতা অধিক; যদিও তাহাও বাঙ্গালা ভাষার অপেক্ষা অনেক কম। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে ভারতের কোনও ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার সমকক্ষ নহে। বাঙ্গালার সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। বিজ্ঞানে ও দর্শনে, উপন্যাসে ও ইতিহাসে, গদ্যে ও পদ্যে, আনন্দের অভিব্যক্তিতে, ভাববৈচিত্র্যে ও ভাষার ঐশ্বর্য্যে বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, ভারতের অপর কোনও প্রাদেশিক সাহিত্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালা সাহিত্যরথীদের প্রতিভার বলে আজ বাঙ্গালা ভাষা জগৎ-সাহিত্যের দরবারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংখ্যাতেও, বাঙ্গালাভাষাভাষীরা ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষীদের অপেক্ষা গরিষ্ঠ। এই হিসাবে পৃথিবীর প্রধান ভাষাদের মধ্যে বাঙ্গালার স্থান সপ্তম। (ইংরেজী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৫৪ কোটি, চীনার ৪৫ কোটি, রাশিয়ানের ১৬·৬ কোটি, জারমানের ৯ কোটি, জাপানীর ৫·৬ কোটি ও বাঙ্গালার ৫·৩ কোটি)। আর হিন্দী, হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করাও সহজসাধ্য। কারণ বাঙ্গালাতে ঐসব ভাষার ন্যায় অচেতন

পদার্থের লিঙ্গবিভেদ এবং লিঙ্গ ও বচন হিসাবে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ হয় না। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা রূপে এবং সাধারণ ব্যবহারিক ভাষারূপেও গ্রহণ করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ভাষা বাঙ্গালা। ভারতের সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ গভীর ও ব্যাপক ভাবে হইয়াছে, এরূপ ভারতের অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষায় হয় নাই। অপক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখিলে বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদী। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে ইহা সাহিত্য-সম্পদে ও ভাষা-গৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ; অথচ ইহার ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও প্রাঞ্জল। অধিকন্তু ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহারই যোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে কংগ্রেস-নেতার উক্তির উল্লেখ করিয়াছি, বাস্তব জগতে সে উক্তির যদি কিছু ভিত্তি থাকে, তাহা আমাদের সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। বিভিন্ন জাতির ও সমাজের স্বাতন্ত্র্য সাধারণ মানব আমরা বিস্মৃত হইতে অসমর্থ।

যে মুষ্টিমেয় সিদ্ধপুরুষেরা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ও বিশ্বমানবের একত্ব অনুক্ষণ উপলব্ধি করিয়া অন্তরের প্রকৃত স্বরাট লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই হয়তো বাঙ্গালী, বিহারী, গুজরাটী, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া একত্বের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। সাধারণ মানব আমরা, যুক্তিহিসাবে ঐ অদ্বৈত তত্ত্ব স্বীকার করিলেও, কার্য্যতঃ সর্ব্বভূতে "সমবুদ্ধি" হইতে পারি নাই। কংগ্রেসপন্থী সরকারেরা তাহা পারিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

বরং কংগ্রেসপন্থী বিহার সরকার বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদের সরকারী ও অর্দ্ধ-সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ, স্কুল-কলেজে প্রবেশ লাভ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত ভেদবোধক স্পষ্ট ও উহ্য (explicit and implicit) বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অযথা বা অতিরিক্ত প্রভেদদর্শিতার (excessive racial discrimination) পরিচায়ক ও জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়াই সাধারণ বাঙ্গালীর স্থূল-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বিহারে কংগ্রেসের কর্ণধার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সম্বন্ধে বিহারের জন্য ঐ প্রভেদমূলক নীতির (discriminative policy) অনুমোদন করিতেছেন। এ সংবাদ আমরা নিশ্চিত বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যেমন পূর্ব্বোল্লিখিত কংগ্রেস-নেতার ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমস্ত প্রকৃতিগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য মুছিয়া ফেলিবার প্রস্তাব সমাজবিজ্ঞান-সম্মত একত্বের সীমা অতিক্রম করিতেছে, বিহার-কংগ্রেসনেতাও সেইরূপ জাতীয়তা-বিরোধী (anti-national) প্রভেদদর্শিতার পোষকতা করিলে বিপরীত দিকে ভ্রমে পতিত হইবেন। প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে জাতিনির্ব্বিশেষে দেশজদের সহিত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম-অধিকার প্রদান করাই সমাজবিজ্ঞান-সম্মত পন্থা ও প্রকৃষ্ট রাজনীতি।*

* রাঁচিতে হিছ্ ফ্রেণ্ড্স ইউনিয়ন ক্লাব অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

# বিদেশী কবিতা

( Heinrich Heine-এর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে )

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

["The magic of Heine's poetical form is incomparable ; He employs this form with the most exquisite lightness and ease, and yet it has at the same time. the inborn fullness, pathos, and old-world charm of all true forms of popular poetry".—*Mathew Arnold*]

## কবির প্রেম

আমার সাথে তোমার বিয়ে
হয় যদি গো, যদিই হয় ;
দিনগুলো তায় কাটবে এমন,
দেব্‌তাদেরো তেমন নয়।

ঝগড়া যদি কর,
আমি সাধ্‌ব হাসিমুখে,
মুখ ফেরালে টান্‌ব তোমায়
সোহাগ ক'রে বুকে ;
কিন্তু যদি, পত্ত আমার
মন্দ লাগে কও শুনি—
বিয়ের দোহাই মান্‌ব নাক'
তালাক দেবো তখ্‌খুনি !

## প্রেমের স্বরূপ

চায়ের টেবিলে ব'সি কয়জনে
প্রেমের বিষয়ে কহিছে কথা ;
পুরুষেরা বাকি বসি' চুপচাপ,
মেয়েরা সকলে হাস্যরতা।

কহিলা জনেক জন-হিতৈষী—
'সেই প্রেম যাহা দহে না দেহ' ;
পত্নী তাঁহার হাসি চাপিলেন,
তাঁর চেয়ে বেশি জানে কি কেহ ?

'ঘর-করণার সামিল না হ'লে
প্রেম লঘুপাক কখনো নয়'—
অধ্যাপকের এ কথা শুনিয়া
'বুঝায়ে বলুন' ছাত্রী কয়।

হেনকালে কহে জমিদার-জায়া—
'প্রেম অসি-সম করাল ক্রুর',
স্বামীরে পেয়ালা আগাইয়া দিতে
গাল লাল হ'ল সেই বধূর।

তুমি যে সেদিন ছিলে না সেথায়
চেয়ে মোর পানে ভাবের ভরে,—
দু'জনে নীরবে দিতাম বুঝায়ে
এত বকাবকি যাহার তরে !

## ঘোষণা

সন্ধ্যার ঘোর ঘনায় অন্ধকারে
সাগরে বাড়িছে জোয়ারের কলরব,
সৈকত-ভূমে ব'সে আছি এক ধারে,
হেরিতেছি সাদা ঢেউয়েদের উৎসব।

ক্রমে সে আমারো বক্ষ ফুলিয়া ওঠে
সিন্ধুর মত, জাগে কোন্ ব্যাকুলতা ?
মন কার পানে অধীর হইয়া ছোটে,
কাঁদিয়া উঠিল দারুণ বিরহ-ব্যথা।

সে যে তোমা লাগি', ওগো হৃদয়েশ্বরী !
তোমারি মূরতি হেরি যে আঁখির আগে,
ওগো মায়াময়ী মর্ত্ত্যের অপ্সরী !
ডাকিতেছ যেন আমারেই অনুরাগে ;
বহে সব ঠাঁই সেই কণ্ঠের সঙ্গীত-সুরধুনী—
বায়ুর বাঁশীতে, জলের কলোচ্ছ্বাসে,
কান পাতি' সেই কণ্ঠের ধ্বনি শুনি
আমার বুকের মৃদুতর নিশ্বাসে।

নল-খাগ্‌ড়ার শীর্ণ কলমে লিখিনু বালুর তটে—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি,'
সাগরের ঢেউ এমনি নিঠুর বটে—
মুছিয়া দিল তা' তখনি ছুটিয়া আসি' !
ওগো দুর্ব্বল তৃণের লেখনী, বেলাভূমি বালুময়,
ওগো দয়াহীন ঊর্ম্মির দল ! তোমাদেরে আর নয় !
আকাশের পট কালো হয়ে ওঠে যত,
হৃদয়ে আমার বাসনার বেগ তত ;
মনে হয়, ভাঙি' মহা-অরণ্য হ'তে
বনস্পতির শাখাটি দীর্ঘতম,—
ডুবাইয়া মুখ গিরির অনল-স্রোতে
করি লই তারে অগ্নি-লেখনী মম,
লিখি তাই দিয়ে আকাশ-ললাটে,
ভেদিয়া আঁধাররাশি—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি'।

যুগযুগান্ত নিশার আকাশে জ্বলিবে সে লেখা মোর,
আগুনের লেখা আঁধারে অনির্ব্বাণ !
কোটি নরনারী পড়িবে হরষে ভোর
স্বর্গ-তোরণে বাণী সে দীপ্যমান ;
তারাও পড়িবে আজো যারা নয়
ধরণীর অধিবাসী—
'আগ্‌নেস, আমি তোমারেই ভালবাসি'।

## আমার প্রিয়তমা

আমার প্রিয়তমার দুটি উজল আঁখিতারা
বাখানি' তারে কবিতা লিখি কত ;
আমার প্রিয়তমার দুটি অধর 'চেরী'-পারা,
উপমা তারি রচিনু মনোমত।

আমার প্রিয়তমার দুটি কপোল কমনীয়,
গেঁথেছি তারো শোভার সুধা-গীতি ;
হৃদয় আহা, হইত যদি তেমনি রমণীয়,
দিতাম রচি' সনেট নিতি নিতি।

## ভালবাসিও না

তুমি মোরে ভালবাস না ? আহা সে
এমন কিছুই কথা ত' নয় !
শুধু মুখখানি দেখি তব, রাণি,
তাতেই ভরিবে মোর হৃদয়।

'তোমারে দেখিলে বড় ঘৃণা হয়'—
বলেছ আমারে যে মুখে তুমি,
পরাণ আমার জুড়াইয়া যাবে
যদি একবার সে মুখ চুমি।

## এমন রবে না

এখন তোমার গাল দুখানিতে
গোলাপের নব ফাগুন-রাগ ;
বুকের মাঝারে সুকঠিন শীত,
সেথা বাস করে দারুণ মাঘ।

এর পর, সখি, এমন রবে না—
কালের কঠিন নিঠুর দাপে
গাল দুটি হবে শীত-জর্জ্জর,
হৃদয় গলিবে সূর্য্যতাপে।

## রূপসী

গোলাপের ঘ্রাণ এত যে মধুর,
বুলবুল এত মধুর গায়—
জানে কি তাহারা, সেই মধুরিমা
পুরুষেরে করে পাগলপ্রায় ?

জানে কি, জানি না ; শুধু এই জানি
—বড় অপ্রিয় সত্য কথা—
ভান ক'রে তবু ফল পাওয়া যায়
নাই থাক বুকে কোনই ব্যথা।

## গুপ্তকথা

নয়নে অশ্রু, দীর্ঘনিশাস—দেখিতে পাবে না আর,
মুখে হাসি নাই—সে শুধু হাসির রব ;
আমার প্রেমের গোপন তত্ত্ব কে করে আবিষ্কার ?
কথায় ধরিয়া ফেলিবে—অসম্ভব !

দোল্‌নার ওই শিশুটি, অথবা যে জন
কবরে আছে—
তারাও যদি বা দিতে পারে সংবাদ,
আরো যে গোপন আরো অকথন সে কথা
আমার কাছে
—জীবনের সেই সুমহান অপরাধ !

## দ্বিতীয় বার

প্রথম প্রেমে যে পরাজয়ও ভাল,—
সে দুর্ভাগারে প্রণাম করি ;
যদি সেই জন ফের প্রেম করে
পায় না সেবারও—গলায় দড়ি !

আমি যে তেমনই মহান মূর্খ—
নিষ্ফল হ'নু দ্বিতীয় বার ;
রবি শশী তারা হেসে হ'ল সারা,
হাসে সেও—টুটে পরাণ যার।

## চরম দুঃখ

চিরদিন সবে জ্বালাল আমারে,
সহিনু কত না অত্যাচার—
কেহ জ্বালায়েছে ভালবাসা দিয়ে,
কেহ শক্রতা করেছে সার।

জীবনের সুখ-শান্তির মাঝে
কেহ ঢালিয়াছে প্রেমের বিষ,
কেহ বা তাহারে করিয়াছে কটু
ঢালি' বিদ্বেষ অহর্নিশ।

তবুও যে জন সবচেয়ে দুখ
দিয়াছে আমার এই প্রাণে,
ভালও বাসে নি, ঘৃণাও করে নি—
ফিরেও চাহে নি মুখপানে !

# বিক্রমপুরে প্রাপ্ত একটি খোদিত কাষ্ঠস্তম্ভ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম.এ., পি-এইচ. ডি.

বিগত ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে বিক্রমপুরে বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী রামপালের আশেপাশে প্রাপ্ত দারুভাস্কর্য্যের কয়েকখানি অতি সুন্দর নমুনার সচিত্র

আড়িয়লে প্রাপ্ত অতিভঙ্গ দারুমূর্ত্তি

বর্ণনা দিয়াছি। আমার প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইবার প্রায় সমকালেই আড়িয়ল গ্রামে অতি চমৎকার তক্ষণযুক্ত একটি কাষ্ঠস্তম্ভার্দ্ধ আবিষ্কৃত হয়। উহার সঙ্গে একখানি কাঠের মূর্ত্তিপীঠ, একটি ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি এবং তক্ষণযুক্ত অপর একটি লম্বা কাষ্ঠখণ্ডও বাহির হয়। ফোটো সংগ্রহ করিতে না পারায় এতদিন ইহাদের সম্বন্ধে লিখিতে পারি নাই। এই বর্ষায় যাইয়া উহাদের ফোটো লইয়া আসিয়াছি এবং উহাদের চিত্র ও বর্ণনা পাঠকপাঠিকাসমীপে উপস্থিত করিতে পারিতেছি।

কৌতূহলী পাঠক ফাল্গুনের (১৩৪৪) 'প্রবাসী' দেখিবেন। উহাতে রামপালের যে মানচিত্র (৬৫৩ পৃঃ) ছাপা হইয়াছে, সেই মানচিত্রের নিম্ন বামকোণে আমতলী গ্রামের অবস্থান লক্ষ্য করুন। আড়িয়ল গ্রাম এই আমতলী হইতে সোজা পশ্চিমে মাইল দেড়মাইল মাত্র।

বিক্রমপুর পরগণার কেন্দ্রে অবস্থিত আড়িয়ল গ্রাম হাতে তৈয়ারি কাগজের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে বিখ্যাত। ঐ গ্রামের রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এস-সি. প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী ভদ্রলোকের যত্নে গ্রামে একটি চিত্রশালাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসাহী পূর্ণবাবু গ্রামে একটি তৈল-পরিচালিত ইঞ্জিন চালাইয়াছেন; ঐ গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের

কৃষকগণ সামান্য দক্ষিণা দিয়া এই ইঞ্জিন-পরিচালিত কলে তাহাদের ইক্ষু, সরিষা, তিল ভাঙ্গাইয়া লইয়া যায়। এই সকল কারণে বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রাম বিশেষ সুপরিচিত।

আড়িয়লে শানবাড়ি বলিয়া পরিচিত একটি বিস্তৃত ভিটিভূমি আছে। উহার সংলগ্ন দীঘি-পুষ্করিণী হইতে প্রায়ই পাথরের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। শান শব্দটি পাষাণের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। পাকা বাঁধানো প্রাঙ্গণকে শান বলে। পালিশ করিবার পাথরকে শান বলে। কাজেই, পাকা বাঁধানো বাড়ি বা পাষাণময় বাড়ি বুঝাইতেই শানবাড়ি শব্দটি প্রযুক্ত হয় বলিয়া বোধ হয়।

বিক্রমপুর মেঘনাদ, গঙ্গা, ধলেশ্বরীর বিশাল প্রবাহমধ্যস্থ দ্বীপমাত্র, প্রত্যেক বৎসরই এই স্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়। মাটি ফেলিয়া অনেকখানি উঁচু করিয়া ইট দিয়া পাকা বাঁধাইয়া ভিটিভূমি তৈয়ার না করিলে কাঁচা ভিটির উপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুশত বৎসরের স্থায়িত্ব কামনা করা বৃথা। বৎসর বৎসর বর্ষার আক্রমণে কাঁচা ভিটি অলক্ষিতে ক্ষয়িয়া যাইতে থাকে এবং অবশেষে বাসের অযোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান বৎসরের বর্ষার মত বর্ষা আমার জীবনে আমি সাত বার দেখিলাম। এই রকম বর্ষায় বিক্রমপুরের শত-করা শিরালকাটি ভিটিভূমি ভাঙাইয়া যায় এবং নিরভিটির ঘরগুলিতে জল প্রবেশ করে। এই কারণে মন্দির-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত ভিটিভূমিগুলি বেশ উঁচু করিয়া এবং শান বাঁধাইয়া নির্ম্মিত হইত। বিক্রমপুরের বহু গ্রামে এইরূপ শানবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে—এই শানবাড়িগুলির উপরে প্রাক্‌মুসলমান যুগে যে দেউল প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আড়িয়লের শানবাড়ির দীঘিতে আবিষ্কৃত কয়েকখানি সূর্য্যমূর্ত্তি ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। শানবাড়ি হইতে এই ভাবে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়াই মূর্ত্তিগুলি স্বগ্রামে রক্ষা করিবার জন্য গ্রামস্থ যুবকগণের আগ্রহ হয়। আড়িয়লে বিক্রমপুর-চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা এইরূপেই সম্ভব হইয়াছিল। এই চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-লেখক 'শিশুভারতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এবং ঢাকা হইতে আমি ও ডক্টর কানুনগু যাইয়া যোগদান করিয়াছিলাম। ডক্টর চাটুজ্জে ছায়াচিত্র সহযোগে বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমরা সকলেই কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তখনই দেখিয়াছিলাম, চিত্রশালায় প্রাচীন মূর্ত্তি, প্রাচীন পুথি কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকটি মূর্ত্তি অপূর্ব্ব-প্রাপ্ত। বর্ত্তমানে প্রাপ্ত কাষ্ঠস্তম্ভটিও আড়িয়লের
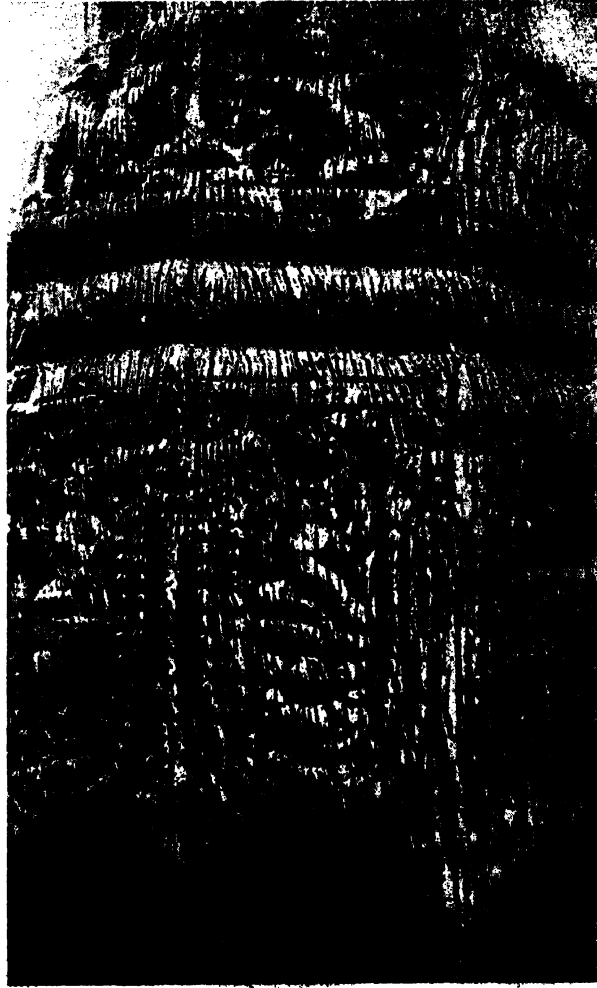
আড়িয়লে প্রাপ্ত কাষ্ঠস্তম্ভ—মধ্যাংশ

আড়িয়লে প্রাপ্ত কাষ্ঠস্তম্ভ—নিম্নাংশ

আড়িয়লে প্রাপ্ত কাষ্ঠস্তম্ভ—শীর্ষ
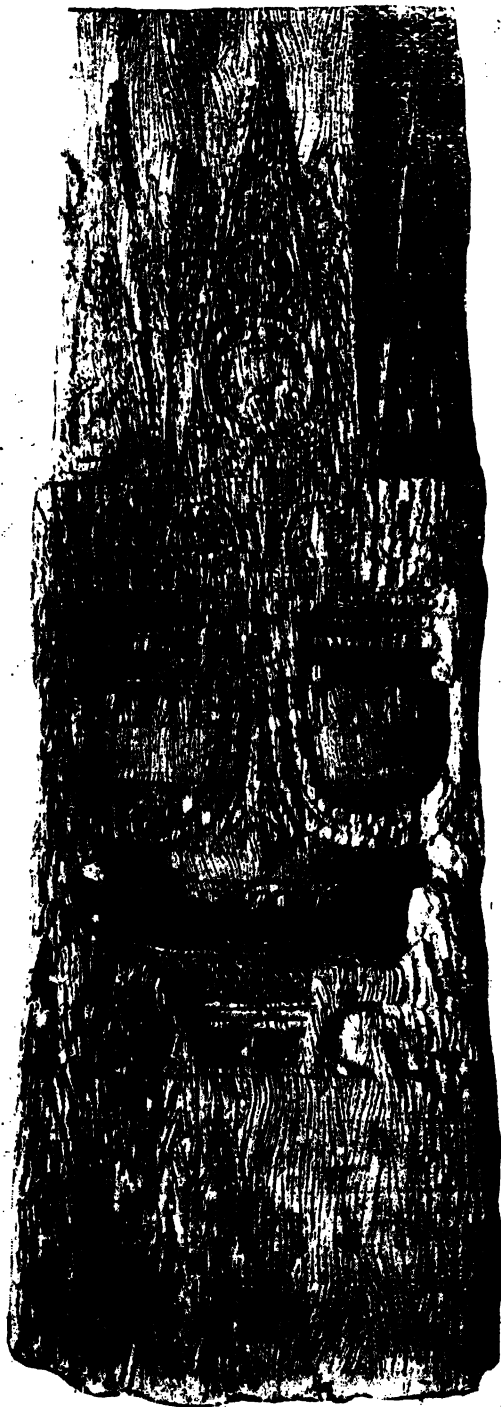
বিক্রমপুর-চিত্রশালার জন্যই সংগৃহীত হইয়া এই ক্ষুদ্র চিত্রশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। চিত্রশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এই কাষ্ঠস্তম্ভাদির আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

আলোচ্য কাষ্ঠস্তম্ভাদি আড়িয়লের শানবাড়ির অন্তর্গত একটি প্রাচীন পুষ্করিণী হইতে মাটি তুলিবার কালে বাহির হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্তম্ভটি স্তম্ভার্দ্ধ মাত্র, উহার অপরার্দ্ধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ত্তমান স্তম্ভার্দ্ধটি প্রায় ১০ ফুট উচ্চ। এ বৎসর আরও খনন করিলে হয়তো উহার অপ্রাপ্ত অর্দ্ধ পাওয়া যাইতে পারে। মন্দিরাদিতে স্তম্ভ সাধারণতঃ যুগলে ব্যবহৃত হয়। কাজেই ইহার জুড়ি আর একটা স্তম্ভ বাহির হইয়া পড়াও বিচিত্র নহে।

'প্রবাসী'র প্রবন্ধে রামপালের দীঘিতে আবিষ্কৃত এবং ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত দুইটি খোদিত কাষ্ঠস্তম্ভের পরিচয় দিয়াছি। বর্ত্তমান স্তম্ভার্দ্ধটির ছন্দও প্রায় একই প্রকারের। তবে রামপাল-দীঘির স্তম্ভ দুইটি চতুষ্কোণ, কোণগুলি সামান্য কাটা মাত্র। আড়িয়ল শানবাড়ির স্তম্ভ গোড়ায় চতুষ্কোণ বটে, কিন্তু পরে ষট্‌কোণ। অনুরূপ ছন্দের প্রায় ১৮ ফুট লম্বা একটি গ্রেনাইট প্রস্তরের বৃহৎ স্তম্ভ সোনারঙ্গ গ্রামের ('প্রবাসী'তে প্রকাশিত মানচিত্র দ্রষ্টব্য) দেউলে আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৭ সনে উহা উক্ত গ্রামের ৺শশীভূষণ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক ঢাকা মিউজিয়মে উপহৃত হয়। স্তম্ভটি প্রায় ২০০ মণ ভারী। বিক্রমপুর হইতে উহা ঢাকায় আনিতে ৫০০ টাকা খরচ হইয়া যায়, এবং মিউজিয়ম-প্রাঙ্গণে স্থাপন করিতে আরও ৩০০ টাকা খরচ হয়। এই সোনারঙ্গের প্রস্তরস্তম্ভটিও গোড়ায় চতুষ্কোণ এবং পরে আড়িয়লের স্তম্ভের মত ষট্‌কোণ। শিল্পচাতুর্য্যে আড়িয়লের স্তম্ভটি সোনারঙ্গ-স্তম্ভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। রামপালের দীঘিতে প্রাপ্ত স্তম্ভদ্বয় হইতেও আড়িয়লের স্তম্ভটি নয়নাভিরাম।

আড়িয়ল-স্তম্ভগাত্রস্থিত কারুকার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য তিন ভাগে উহার ফোটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে। গোড়ার অংশে কৃত্তিমুখটি লক্ষ্যের যোগ্য। এই বিখ্যাত মাঙ্গল্যচিহ্ন বাঙ্গালার প্রাক্‌মুসলমান যুগের শিল্প-নিদর্শনসমূহেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইহা প্রাপ্তব্য বটে, এবং দ্বীপময় ভারতে ও বৃহত্তর ভারতেও এই চিহ্নটি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় ১০০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের ভাস্কর্য্য ও [illegible]ই ইহা বিশেষ চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আড়িয়ল-স্তম্ভের গোড়ার অংশে দেখা যাইবে, বিকশিত পদ্মপীঠে মাঙ্গল্যকলস স্থাপিত। উহার কানায় স্পষ্ট কৃত্তিমুখ। কৃত্তিমুখের মুখ হইতে সুবঙ্কিম ঠামে চারি-ছড়া মালা ঝুলিতেছে। কৃত্তিমুখের একটু উপরেই স্তম্ভ

আড়িয়লে প্রাপ্ত খোদিত স্তম্ভ ও কাষ্ঠখণ্ড

ষট্‌কোণ হইয়াছে, ষট্‌পৃষ্ঠের প্রত্যেক পৃষ্ঠের পাদদেশ পত্রপুষ্পাঙ্কিত ত্রিভুজশোভিত। ত্রিভুজগুলির অভ্যন্তর লতাবৃত্তত্রয়শোভিত, নিম্ন বৃত্তে নৃত্যভঙ্গিতে একটি শশক খোদিত। স্তম্ভের মধ্যাংশে কারুকার্য্য আরও সুন্দর। মধ্যে তিনটি বেষ্টনী। বেষ্টনীনিম্নে প্রত্যেক পৃষ্ঠে পদ্মপীঠের উপরে এবং মাল্যদামের অভ্যন্তরে মাল্যপুষ্পবাহী গন্ধর্ব্বমূর্ত্তি অপূর্ব্ব আনন্দহিল্লোলে আকাশপথে উড়িয়া চলিয়াছে। বেষ্টনীগুলির উপরে একটি শিশু ধনুর্ধারী আকর্ণ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখস্থ সিংহকে বিদ্ধ করিতেছে। শিশুর পিছনে আর একটি পশুমূর্ত্তি দেখা যায়, সম্ভবতঃ মহিষের মূর্ত্তি। স্তম্ভশীর্ষটিও অনবদ্য কারুকার্য্যে ভূষিত।

এই স্তম্ভটির সহিত একখানি কাষ্ঠময় মূর্ত্তিপীঠ, একটি কারুকার্য্যশোভিত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড এবং একটি কাষ্ঠমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কাষ্ঠমূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটি অতিভঙ্গ ভঙ্গিতে বাম উরুর উপর বাঁ হাত স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মূর্ত্তিটি পুরুষমূর্ত্তি, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মস্তকের পিছনে কিন্তু দীর্ঘ কেশরাজি সর্পাকৃতিতে কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে। মূর্ত্তির মুখ-চোখে কৌতুকের হাসি, দক্ষিণ হস্তে একটি ছুরিকা। মূর্ত্তিটি দেবমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয় না, কাষ্ঠময় ভাস্কর্য্যের কোন অংশে উহা সম্ভবতঃ ভূষণ হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

---

চয়ন

# অতি-আধুনিক ভাষা

…একেবারে খাঁটি আধুনিক তুমি। পাঁজিও সেই কথা বলে, তোমার ভাষার থেকেও তার প্রমাণ পাই। এ ভাষায় শব্দ আছে যথেষ্ট কিন্তু অর্থ খুঁজে পাইনে। ভাষা যে কিছু বোঝাবার জন্যে সে দায়িত্ব বুঝি একেবারে অস্বীকার করেছ। আমি সেকেলে লোক আমার কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, যা বলব সেটা যেন পাঁচজনে বুঝতে পারে। যেন না ভাবতে বসে আমি পাগল হয়েছি, না, তারা পাগল হয়েছে। পাঁচজনের সম্বন্ধে তোমার মনের এই দীনতা নেই—তার থেকে প্রমাণ হয় তুমি আধুনিক। যারা সাধারণ ব্যক্তি তারা অন্যকে লক্ষ্য ক'রে যা বলে তা বোঝা যায়—তুমি অসাধারণ, তুমি আধুনিক, তুমি কা'কে লক্ষ্য ক'রে কী যে বলো তা যারা বোঝে তারাও তোমার মতোই অদ্বিতীয়। আমার শব্দের মধ্যে অর্থ ঢুকে পড়েছে—ওটা বুড়োদের দোষ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর থেকেই এই বিভ্রাট ঘটেছে। তোমার মতোই আধুনিকতার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলুম কিন্তু লজ্জা এসে গেছে। তোমার অজস্র [illegible] না পাবার। এর থেকে বুঝি তুমি খাঁটি। তোমার অসংলগ্ন বাক্যাবলীতে ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যায়। আমার সাহস নেই। আজ কিছুকালের মতো তোমারি জিৎ রইল নাচনচন্দ্র—কিন্তু কাল! বলা যায় না, যদি জাতশ্মশ্রু আধুনিকতার ছোঁয়াচ তোমার ভাষায় লাগে তাহ'লে আমাকে লক্ষ্য ক'রে যা বলবে সেই শব্দভেদী বাণ গিয়ে পৌঁছবে একেবারে বৈতরণীতীরে। দোহাই তোমার, আমার কথার মধ্যে সহজ অর্থ খুঁজে পেয়ে তোমার মনে যদি অত্যন্ত ধিক্কার জন্মে তাহ'লে কথাগুলোকে উল্টেপাল্টে দিয়ো—তোমাদের কাজ চলবে। একটা নমুনা দেখাই—

কূলে গরজে। গগনে বসে আছি।
মেঘ একা, ভরসা নাহি। ঘন বরষা।

মনে হচ্চে না কি, কিছু যেন বলা হোলো, কিন্তু কী যে তা বোঝবার দরকারই নেই। তোমার অভিনন্দন পত্রে বীর হও এ আশা জানিয়েছি, কিন্তু কবি হও এ কামনা করিনি। হতে হতে হয়তো তোমার ভাষা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বলা যায় না, কোন্ অকথনীয়ে কোন্ অচিন্তনীয়ে, বাক্য-কলেবরের কোন্ অসংশ্লিষ্ট অপঘাতে, তখন তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, যে হেতু বুঝিয়ে বলার চির প্রচলিত সংস্কারে আমি অভ্যস্ত। যে হেতু এ কালের পরে আমার বিশ্বাস ছিল না, আমার বিশ্বাস চিরকালের পরে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পমিথাড়ের চিঠি'

# টুথ-ব্রাশ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
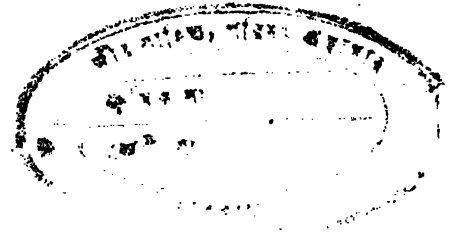
প্রসঙ্গটি বৈষয়িক। অথচ মনস্তত্ত্ব যৌনতত্ত্বের সঙ্গেও ইহার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে।

রসশাস্ত্র বিষয়বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের মৌলিক মূল্য লইয়া দর-কষাকষি রসের হাটে চলিবে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। 'হিউম্যান ভ্যালুস' কথাটা শুধু বিদেশী নয়, অত্যন্ত অর্ব্বাচীন।

*　　*　　*　　*

সুবোধবাবুর মস্তকে একটি অত্যাশ্চর্য্য টাক ছিল। টাক সাধারণত মস্তকের সম্মুখভাগে বঙ্গোপসাগরের আকারে পড়িয়া থাকে; ইহাই রীতি। সুবোধবাবুকে দেখিয়া কিন্তু কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না যে, তাঁহার টেরি-কাটা মস্তকের সমস্ত পশ্চাদ্ভাগটা উষর নির্লোমতায় একেবারে ধূ ধূ করিতেছে। তাঁহার চরিত্রেও, বোধ করি, এমনই একটা ধোঁকা-লাগানো অ-গতানুগতিক বৈচিত্র্য ছিল, সম্মুখ দেখিয়া সহসা পশ্চাতের খবর পাওয়া যাইত না।

আমার সহিত অল্পদিনের জন্যই আলাপ হইয়াছিল, পশ্চিমের যে শহরে আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তিনি ছিলেন সেই শহরের একজন উন্নতিশীল ব্যবসাদার। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, ধীর প্রিয়ভাষী লোক, অত্যন্ত সাধারণ কথাও বেশ রস দিয়া বলিতে পারিতেন। আলাপের পূর্ব্বে অন্য পাঁচজনের মুখে তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুইই শুনিয়াছিলাম; তাহা হইতে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ব্যবসা-সম্পর্কে তিনি যেমন নিষ্ঠুর, তৎপূর্ব্বে ও পরে তেমনই অমায়িক।

বাণিজ্যব্যপদেশে তাঁহার সংস্পর্শে আসি নাই বলিয়াই, বোধ হয়, সুবোধবাবুকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। কার্পণ্য-দোষ তাঁহার ছিল না; প্রতি সন্ধ্যায় বাড়িতে বহু ভদ্রবেশী অভ্যাগতের ভিড় জমিত। সুবোধবাবুর আধুনিকা ও সুচটুলা স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া একটি সামাজিক আসর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন; তাঁহার মোলায়েম হাসি-তামাসা এই সান্ধ্য সভার একটা উপভোগ্য উপাদান ছিল।

কেন জানি না, তাঁহাকে এই মজলিসের বায়ুমণ্ডলে রবারের রঙিন বেলুনের মত নির্লিপ্ত সহজতায় বিচরণ করিতে দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন তিনি মনের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেক কথা ও কার্য্য ওজন করিতেছেন, তাহার মূল্য ধার্য্য করিতেছেন। এ বিষয়ে মুখে তিনি কিছুই বলিতেন না, তবু তাঁহার মনের এই তুলাদণ্ডটি যে সর্ব্বদা সক্রিয় হইয়া আছে, তাহা অনুভব করিয়া আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম।

একদিন তিনি মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, আপনি ছড়ি ব্যবহার করেন কেন, বলুন দেখি?

যুক্তিসম্মত কোনও উত্তরই ছিল না। বেড়াইতে বাহির হইবার সময় একটা ছড়ি হাতে না থাকিলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ও নিঃসম্বল মনে হয়—এইটুকুই বলিতে পারি।

তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমার পানে সেই ওজনকরা দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার কাছে এই অকারণ ছড়ি বহন করিয়া বেড়ানো যে একান্ত অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

মনুষ্যচরিত্রের গূঢ় মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা হয়তো সুবোধবাবুর বিচিত্র টাক ও অন্যান্য বাহ্য অভিব্যক্তি হইতে তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন, কিন্তু এক মাসের পরিচয়ের ফলে তিনি আমার কাছে যেন একটু আবছায়া রহিয়া গিয়াছেন। এমন কি, শেষের যে গুরুতর ঘটনাটা একসঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের মত তাঁহার মাথার উপর ফাটিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উগ্র আলোকেও লোকটিকে স্পষ্টভাবে চিনিতে পারি নাই। হয়তো আমারই নির্ব্বুদ্ধিতা, কোনও বস্তুকে যাচাই করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার বিদ্যা এত বয়সেও অর্জ্জন করিতে পারি নাই। অথচ শুনিয়াছি, এই বিদ্যাটাই নাকি চরম বিদ্যা—শিক্ষা, সংস্কৃতি, এমন কি দর্শনশাস্ত্রেরও শেষ সাধনা।

* * * *

গুরুতর সংবাদটি আমাকে যিনি প্রথম দিলেন, তিনি সম্ভবত সুবোধবাবুর ব্যবসায়-ঘটিত বন্ধু; উত্তেজনা-উদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, খবর শুনেছেন বোধ হয়?

—কিসের খবর?

—শোনেন নি তা হ'লে!—হাস্যোজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি আকাশের পানে তুলিয়া তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, বড়ই দুঃসংবাদ। সুবোধবাবুর স্ত্রী—, তাঁকে কাল রাত্তির থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

—সেকি! কোথায় গেলেন তিনি?

—যা শুনছি—এক ছোকরা খুব ঘন ঘন যাতায়াত করত, তার সঙ্গেই নাকি কাল রাত্রে—। তাঁহার বাম চক্ষুটি হঠাৎ মুদিত হইয়া গেল।

মোটের উপর খবরটা যে মিথ্যা নয়, তাহা আরও কয়েকজন জানাইয়া গেলেন। কেহ স্ত্রী-স্বাধীনতার ধিক্কার দিলেন; কেহ বা গলা খাটো করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ঠিক এই ব্যাপারটি যে ঘটিবে, তাহা তিনি পুরা এক বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির মস্তকের পশ্চাদ্দিকে টাক এবং বকেয়া টাকা না পাইলে স্বজাতি বাঙালীর নামে যে মোকদ্দমা করিতে দ্বিধা করে না, তাহার স্ত্রী যে—ইত্যাদি।

সুবোধবাবুর কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল। নিরপরাধ হইয়াও যাহারা অপরাধীর অধিক লজ্জা ভোগ করে, তাঁহার অবস্থা তাহাদেরই মত। সহানুভূতি জানাইবার বন্ধুর হয়তো অভাব হয় না, কিন্তু মুখের সহানুভূতিকে চোখের বিদ্রূপ যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে খণ্ডিত করিয়া দিতেছে, সেখানে সহানুভূতির মত নিষ্ঠুর পীড়ন আর নাই। তাই মজা-দেখা বন্ধুর মত সমবেদনার ছুতায় তাঁহার বাড়িতে গিয়া ধৃষ্টতা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল।

তবু না গিয়াও থাকিতে পারিলাম না। মনের গহনে একটা নিষ্ঠুর শ্বাপদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,

সুবোধবাবুর মর্ম্মপীড়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সেই, বোধ হয়, সন্ধ্যার সময় আমাকে তাঁহার বাড়িতে টানিয়া লইয়া গেল।

অন্য দিনের মত বাড়িতে মজলিসী বন্ধু কেহ নাই। বারান্দায় একাকী বসিয়া সুবোধবাবু মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হাত বুলাইতেছেন; আমাকে দেখিয়া অন্যান্য দিনের মত সহাস্য সমাদরে আহ্বান করিলেন, আসুন আসুন।

এ অবস্থায় মানুষ ঠিক কি ভাবে আচরণ করিয়া থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সুবোধবাবুর ভাবগতিক স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। যেন কিছুই হয় নাই। হাসিমুখে দুই চারিটা সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা, এমন কি একবার একটা রসিকতা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিলেন।

বেজায় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। যাঁহার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছি, তিনি যদি দুঃখটাকে গায়েই না মাখেন, তবে সান্ত্বনা দিব কাহাকে? অপদস্থের মত নীরবে হেঁটমুখে বসিয়া রহিলাম, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিতেই পারিলাম না।

দিনের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিলাম, সুবোধবাবু তাঁহার তৌল-করা চক্ষু দিয়া আমার মনের কথাটা ওজন করিতেছেন। মুখে একটু হাসি।

চোখোচোখি হইতেই তিনি মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; তারপর বাগানের একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের ডগার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, আমার টুথ-ব্রাশটা কে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না।

অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে চমকিয়া উঠিলাম, মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, টুথ-ব্রাশ!

তিনি তেমনই অর্দ্ধ-নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ, টুথ-ব্রাশ। তুচ্ছ জিনিস, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের একটা সামান্য উপকরণ; যে লোকটা চুরি করেছে, তার রুচির প্রশংসা করতে পারি না। কিন্তু তবু সাবধান হওয়া দরকার। ভাবছি, আর টুথ-ব্রাশ কিনব না।

অবাক হইয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। আমার দিকে সহসা চক্ষু নামাইয়া তিনি বলিলেন, আপনি কখনও দাঁতন ব্যবহার করেছেন? শুনছি, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ভাল। মনে করছি, এবার থেকে ইউক্যালিপ্টাসের দাঁতন ব্যবহার করব। সস্তাও হবে, আর কিছু না হোক, চুরি যাবার ভয় থাকবে না। দাঁতন কেউ চুরি করবে না।—বলিয়া হঠাৎ একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

*　*　*　*

তারপর সুবোধবাবুর সহিত আর দেখা হয় নাই। তবে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাঁহার নাম দেখিতে পাই; তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মোহমুক্ত বিষয়বুদ্ধি তাঁহাকে বৈষয়িক উন্নতির পথেই লইয়া চলিয়াছে।

তিনি আবার টুথ-ব্রাশ কিনিয়াছেন, অথবা দাঁতন দিয়াই কাজ চালাইতেছেন, সে সংবাদ কিন্তু খবরের কাগজে পাই নাই।

## গ্রন্থ-পরিচয়

**বঙ্কিম-প্রতিভা—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত**

[ রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা, ৪+৮৪+৮৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲ ]

বঙ্কিম-জন্মের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের বাহিরে গত এক বৎসর ধরিয়া যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাদের সার্থকতা সাময়িক এবং সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই অধিকাংশেরই পরিসমাপ্তি। কিন্তু এই সাময়িক উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া এমন দুই চারিটি কাজ হইয়াছে, যাহা স্থায়িত্বের গৌরব দাবি করিতে পারে, এবং বঙ্কিমের স্মৃতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়াও যাহার প্রভাব অনাগত দূরকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিয়া ভবিষ্যৎ বাঙালীকে এ যুগের বাঙালী সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্কিমের যাবতীয় রচনার প্রামাণিক শত-বার্ষিক সংস্করণ প্রকাশ এবং বঙ্কিমের কাঁঠালপাড়ার ভিটা সাধারণের সম্পত্তি করিয়া সেখানে পাঠাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সেটিকে সমগ্র জাতির তীর্থস্থানে পরিণত করা—এই সকল স্থায়ী কাজের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে পাইকপাড়া রাজবাটীর শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ও ভ্রাতৃদ্বয় এই 'বঙ্কিম-প্রতিভা' প্রকাশের দ্বারা আর একটি স্থায়ী ও স্মরণীয় কাজ করিলেন। এই দুর্দ্দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি এই মূল্যবান সম্ভ্রম প্রকাশে তাঁহারা বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

কারণ, 'বঙ্কিম-প্রতিভা' মামুলি স্মৃতিগ্রন্থ মাত্র নহে; আহা-উহু সম্বলিত কয়েকটি প্রশস্তি-প্রবন্ধ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ কয়েকটি কবিতার সমবায়ে এই পুস্তকটি গড়িয়া উঠে নাই; বাংলা দেশে যাহারা চিন্তাশীল এবং বাংলা সাহিত্যে বর্ত্তমানে যাহারা প্রধান, বঙ্কিম ও বঙ্কিমের কীর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ও চিন্তা প্রবন্ধ ও কবিতার আকারে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, যদুনাথ, মানকুমারী, মোহিতলাল, শ্রীকুমার, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রবন্ধ-কবিতা সাময়িক উচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত নয়। সম্পাদক বিমলচন্দ্র সিংহের "বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি" বিষয়ক প্রবন্ধটিও নানা দিক দিয়া সুলিখিত ও মূল্যবান।

কিন্তু এগুলিও বাহ্য। 'বঙ্কিম-প্রতিভা'র আসল মূল্য বঙ্কিমেরই রচনার মধ্যে—*Letters on Hinduism*এ। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকৃত 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের কয়েক পরিচ্ছেদের ইংরেজী অনুবাদও কম মূল্যবান নয়, কিন্তু *Letters on Hinduism* বা 'হিন্দুধর্ম্ম প্রসঙ্গে কয়েকটি পত্র' —বঙ্কিম জীবনের একটি অপ্রকাশিত অধ্যায়। আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্পর্কে আজীবন দুরূহ চিন্তা করিয়া এবং পৃথিবীতে প্রচলিত ও বিলুপ্ত অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত হিন্দু-ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি ইহাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার পরিণত জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট মতবাদ, কয়েকটি পত্রের আকারে লেখা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পত্রগুলি সমাপ্ত হয় নাই; হইলে, জাতির পক্ষে ইহা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইত। মন্দের ভাল, এই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইল। 'বঙ্কিম-প্রতিভা'র (ডবল ক্রাউন আট পেজী) পুরা ৬২ পৃষ্ঠায় এই অসম্পূর্ণ রচনাটি মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমের এই বিলুপ্ত কীর্ত্তি রক্ষায় সহায়তা করিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ধন্য।

*Letters on Hinduism* ছয়টি পত্র ও দুইটি অধ্যায়ে অসম্পূর্ণ; দ্বিতীয় পত্রটি "What is Hinduism" শিরোনামায় প্রকাশিত। ইহারই লেখাংশ উদ্ধৃত করিয়া

আমরা পাঠককে এই রচনার সম্পূর্ণাংশ পড়িবার জন্য কৌতূহলী করিয়া তুলিতে চাই—

"Hinduism is in need of a reformation;—not an unprecedented necessity for an ancient religion. But reformed and purified, it may yet stand forth before the world as the noblest system of individual and social culture available to the Hindu even in this age of progress. I have certainly no serious hope of progress in India except in Hinduism—in Hinduism reformed, regenerated and purified. To such reformation, it is by no means necessary that we should revert, like the late Dayananda Saraswati to old and archaic types. That which was suited to people who lived three thousand years ago, may not be suited to the present and future generations. Principles are immutable but the modes of their application vary according to time, to circumstances. The great principles of Hinduism are good for all ages and all mankind—for they are based on what Carlyle would call the "Eternal verities," but its non-essential adjuncts have become effete and even pernicious in an altered state of society."

## চতুরঙ্গ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ১৪৪+১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ ]

পুস্তকের সংস্করণ বা বিক্রয়-বাহুল্যের দ্বারা যাঁহারা পুস্তকের ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে গোপনে একটি সংবাদ দিলে অন্তত বাংলা দেশ সম্পর্কে বিচারের রীতি তাঁহারা পরিবর্ত্তন করিবেন। সংবাদটি অত্যন্ত লজ্জাকর হইলেও সত্য। রবীন্দ্রনাথ প্রণীত 'চতুরঙ্গ' নামক গল্পোপন্যাস ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পুস্তকাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়া দীর্ঘ ১৯ বৎসর দুই মাস পরে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে সেই দ্বিতীয় সংস্করণই চলিতেছে। সংস্করণ-সংখ্যা হাজারের অধিক নয়।

বাংলা দেশের দুর্ভাগা সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রেলপথে ভ্রমণ যাঁহাদের অভ্যাস আছে এবং কৌতুক ও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া হুইলারের স্টলে বিলাতী পুস্তক নাড়াচাড়া করিতে করিতে অধিকাংশ পুস্তকেরই মুদ্রণ সংখ্যা ( ৫ লক্ষ হইতে ৫০ হাজারের মধ্যে ) লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব উপন্যাস বা গল্পপুস্তকের ( মুদ্রণ সংখ্যা পাঁচ শত হইতে হাজার ) প্রকাশক, দপ্তরী, ইঁদুর ও উই কৃত লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া যাঁহারা মরমে মরিয়া যান, বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহারা সান্ত্বনা লাভ করিবেন। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি যে ধাপে ধাপে উঠিতেছে, পুস্তক বিক্রয়ের এই নিদারুণ অবস্থা তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় মাত্র।

আসলে আমাদের সাধারণ রুচি এখনও 'নীলবসনা সুন্দরী' ও 'পতিতার আত্মকথা'র ঊর্দ্ধে উঠে নাই; 'বসুমতী'র "মন্দাকিনী" এবং "নায়াগ্রাপ্রপাত" এখনও আমাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সম্পূর্ণ সক্ষম। সুতরাং সমালোচকের কাজ এখানে কঠিন; যে পরিমাণ ওকালতিতে যথার্থ ভাল জিনিসের লজ্জা হইবার কথা, সমালোচককে এখানে তাহারও অধিক স্পর্দ্ধা ও বাচালতা প্রকাশ করিয়া মনে মনে লজ্জা অনুভব করিতে হয়। 'সাহিত্য দর্পণে'র দেশে সংক্ষিপ্ত আধুনিক পদ্ধতির রসবিচার একেবারেই অচল। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' সম্বন্ধে আলোচনার ওজুহাত একমাত্র ইহাই।

'চতুরঙ্গ' চারিটি বিচ্ছিন্ন গল্পের সমষ্টি, একই নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করিয়া গল্পগুলি রচিত বলিয়া একত্রে ইহা উপন্যাস। ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের 'সবুজ পত্রে' যথাক্রমে "জ্যাঠামশায়", "শচীশ", "দামিনী" ও "শ্রীবিলাস" প্রকাশিত হয়। ইহা 'বসন্তের পালা', 'ফাল্গুনী' ও 'ঘরে-বাইরে'র অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা; ছবি, চঞ্চলা ( "হে বিরাট নদী" ), তাজমহল, উপহার, দুই নারী প্রভৃতি 'বলাকা'র বিখ্যাত কবিতাগুলি ঠিক এই কালের রচনা, 'গল্পসপ্তক' তৎপূর্ব্বেই শেষ হইয়াছে। 'সবুজ পত্রে'র উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ও সক্রিয় মন তখন নিত্যনূতনের রহস্যে অবগাহন করিয়া নব নব মণিরত্নের সন্ধান দিয়া বাঙালী পাঠককে দিশাহারা করিতে ব্যস্ত; বস্তুত রবীন্দ্রনাথ তখন ভাব ও ভাষার, ছন্দ ও গানের এক্সপেরিমেণ্ট করিতেছেন। 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন' যুগের পরে রবীন্দ্র-জীবনে ইহা চতুর্থ ক্রান্তিকারী যুগ—পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিবার যুগ—চরম উৎকর্ষের যুগ। তাঁহার এই সময়ের মনের ভাব 'চতুরঙ্গে'র কয়েক মাস পরে লেখা একটি কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

> নূতন সমুদ্র-তীরে
> তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
> ডাকিছে কাণ্ডারী
> এসেছে আদেশ—
> বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ,
> পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা
> আর চলিবে না।

'চতুরঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ পুরাতন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন; 'বৌঠাকুরাণীর হাট' 'রাজর্ষি' তো অতীতের কথা—'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', এমন কি 'গোরা'র

মধ্যেও পুরাতন-নূতনের একটা সমন্বয়-চেষ্টা আছে, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ও শেষ উপন্যাসদ্বয় 'ঘরে-বাইরে' ও 'যোগাযোগে'ও ( 'শেষের কবিতা', 'চার অধ্যায়', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' প্রভৃতিকে আমি উপন্যাস বলি না ) দেখি, নূতনের প্রচণ্ড ধাক্কায় ভগ্নপ্রবণ পুরাতন ভাঙিতে ভাঙিতেও সগৌরবে বজায় রহিয়া গেল। শিল্পসৃষ্টিতে উদ্দেশ্যবিমুখ রবীন্দ্রনাথ নিজের সকল থিওরি সত্ত্বেও 'চতুরঙ্গে'র পূর্ব্বের এবং পরের যাবতীয় উপন্যাসে হয়তো আপনার অজ্ঞাতসারেই একটা না একটা উদ্দেশ্য অথবা নীতির জয়ঘোষণা করিয়াছেন, অথবা বিশেষ বিশেষ মতবাদ সম্বন্ধে প্রবণতা দেখাইয়াছেন ; এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর হাতেও 'চতুরঙ্গ' একটা আকস্মিক এবং অদ্ভুত সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার এই জাতীয় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই। 'চতুরঙ্গ' উদ্দেশ্য এবং নীতি বহির্ভূত সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির উপর গড়িয়া তোলা একটা বিস্ময়, এবং গুণী ও রসিক সমাজে চিরকাল বিস্ময়ের বস্তু হইয়াই থাকিবে।

ইংরেজী অনুবাদের মধ্য দিয়া পৃথিবীর সাহিত্যের সহিত আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে, তাহার সাহায্যেই বলিতে পারি, পৃথিবীর সাহিত্যেই 'চতুরঙ্গ' বিচিত্র সৃষ্টি ; জ্যাঠামশায় নয়, শ্রীবিলাস নয়, শচীশ আর দামিনী এবং দামিনীরই বিপরীত ননীবালা। শচীশ এই উভয়ের মধ্যে নারীর দুই বিশ্বরূপ দেখিয়াছিল, এবং নিজে চরম নাস্তিকতা হইতে পরম গুরুবাদে—দিনের মুক্তি হইতে নিশীথ রাত্রির বন্ধনে অত্যন্ত অক্লেশে অবতরণ করিয়া পা টিপিয়াই পার হইয়া গেল। ননীবালা? "অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল", নাস্তিক জগমোহনকে ( জ্যাঠামশায় ) যে পাপিষ্ঠা অল্প কয়েকদিনের সংস্পর্শে প্রায় আস্তিক করিয়া তুলিল, পাষণ্ড প্রণয়াস্পদকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়া আত্মকৃত মৃত্যুতে যে তাহাকে মুক্তি দিতে পারিল, মাত্র ৫০।৬০ পংক্তির মধ্যে সেই মহনীয় চরিত্রের স্ফূর্ত্তি এক রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব। আর দামিনী? "সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে।" সেই নারীই একদিন "শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া…প্রণাম করিল।…বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু,…আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও।"

এই 'চতুরঙ্গে'র নায়ক শচীশ, "দেবমূর্ত্তির মতো শাদা পাথরে খোদা", দেখিলেই মনে হয়, "সে ব্রাহ্মণের ছেলে", কিন্তু আসলে সে সোনার বেনে। বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত উপন্যাসসমূহের কোনও নায়কের সহিত শচীশের মিল নাই। সে নাস্তিক, সে ঘোরতর গুরুবাদী ; সে সন্ন্যাসী, সে ঘোরতর প্রকৃতিপরায়ণ। দামিনীর প্রচণ্ড প্রেমকে অন্তরের অমিততেজে প্রতিহত করিয়া শচীশ হইল দামিনীর গুরু। শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করিয়া ধন্য হইল।

এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে এবং অত্যন্ত সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য রস পরিবেশন করিয়াছেন, এক একবার মনে হইতেছে, বাংলা দেশের বর্ত্তমান সংস্কৃতিদৈন্যের দিনে তাহার বহুল প্রচার হইলে তাঁহার অমর্য্যাদাই হইত।

### ডাকের চিঠি—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

[ ১৬, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ ]

গ্রন্থকার এই পুস্তকখানিকে ১।২ ভেদে ২২টি ভাগে ভাগ করিয়া এবং গোড়ায় জবাবদিহিস্বরূপ একটি ভূমিকা সংযোজন করিয়া পাঠককে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, এগুলি ডাকের চিঠি—কোনও বন্ধুকে লেখা ; বন্ধুর ঠিকানা জানা নাই বলিয়া ছাপাইয়া বিলি করিতেছেন। পাঁচজনের হাতে হাতে চিঠিগুলি শেষ পর্য্যন্ত ঠিকানায় পৌঁছিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘরে' চিঠিগুলি ফেলিতে পারিলে লেখককে এতখানি পরিশ্রম ও আয়োজন করিতে হইত না।

রসিকতা যাক, কবি পশুপতি ভট্টাচার্য্য এই গদ্য কবিতাগুলি নিজেকে সম্বোধন করিয়াই লিখিয়াছেন—কয়েকটি তুচ্ছ প্রবাসদিনের এবং প্রবাস বলিয়াই বিদায়ের ব্যথিত রাগিণীতে ওতপ্রোত। মান-অভিমান আছে, মিনতি আছে এবং সত্যকার জীবনের অনেক কাহিনী আছে। সোজাসুজি যা মানুষকে বলিতে বাধে, তার জন্য রূপকের আশ্রয় লইতে হয়। 'ডাকের চিঠি'র রূপক কোথাও সার্থক, কোথাও নিষ্ফল ; কিন্তু সকল সার্থকতা ও নিষ্ফলতা সত্ত্বেও লেখকের কবিপ্রাণ জয়ী হইয়াছে, তিনি অতি সহজেই সমস্ত বিচার-বিতর্কের ঊর্দ্ধে উঠিয়া পাঠকের আত্মীয়তা লাভ করিতেছেন। সুখে এবং দুঃখে স্বগতোক্তি করিবার অভ্যাস ও সুবিধা যাঁহাদের আছে, 'ডাকের চিঠি' তাঁহাদিগকে আনন্দ দিবে।

স.

# কথোপকথনে মনস্তত্ত্ব

ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম. এ., ডি. ফিল.

পরস্পরের কথোপকথনের মধ্যে মনোবিদ্যার দিক থেকে লক্ষ্য করবার বিষয় আমার মনে হয় প্রধানত তিনটি। বিষয়বস্তু, ভাষার গতি, বৈচিত্র্য প্রভৃতি এবং মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অবয়বের ভঙ্গি। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রথম কথোপকথনের বিষয়বস্তু। কোন এক বিষয়ে যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মৌখিক আলোচনা করেন, তখন সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের মতামত তো ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত ক'রেই থাকেন। সেই মতামত বিশ্লেষণ করলে তাঁদের মানসিকতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই রকম নানা বিষয়ের কথোপকথন থেকে তাঁদের চিন্তার ধারা, ভাবের গতি, তাঁদের নৈতিক বিচারের মানদণ্ড, ধর্ম্মে আস্থা বা অনাস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পেয়ে তাঁদের মানসিকতার বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করা খুব শক্ত নয়। শক্ত নয় সত্যি বটে, কিন্তু এখানে একটি বিবেচনা করবার বিষয় আছে। যে সমস্ত মতামত লোকে কথাবার্ত্তায় প্রকাশ ক'রে থাকে, সেই মত যে তারা সত্যসত্যই পোষণ করে এবং তাদের জীবনের কার্য্যাবলী যে সেই মত অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত করে, এ কথা কি সব সময় মেনে নেওয়া যায়? যদি ব্যক্ত মতামতের সঙ্গে তাদের কৃত কার্য্যের সামঞ্জস্য সব সময় বজায় থাকত, তা হ'লে তো মানুষ মাত্রই দেবতা ও পৃথিবী অমরাপুরী হ'ত। ভাষা যেমন মনোভাব প্রকাশ করে, তেমনই আবার তা গোপন করতেও তো সাহায্য করে। আমি অবশ্য একথা বলতে চাই না যে, সকল লোকে যে মতে তাঁদের বিশ্বাস নেই বা যে ভাব তাঁদের আন্তরিক নয়, সেই মত এবং সেই ভাবই অনবরত প্রকাশ ক'রে বেড়াচ্ছেন। আমি শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, মতামত এবং কথোপকথনের ধারা সব সময় বিষয়বস্তুর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। কার সঙ্গে কথা কইছি, তিনি গুরুজন না সমবয়স্ক বন্ধু, কি রকম পরিবেষ্টনীর মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এ সবও কথাবার্ত্তার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মতামতের হিসাবনিকাশ করবার সময় এসবগুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার।

আধুনিক মনোবিদ্যা একটি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যে সমস্ত মতামত সত্যসত্যই কোন ব্যক্তি পোষণ করেন, তাদের ভিত্তি যে সর্ব্বদা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। ধরুন, একজন হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান বললেন যে, সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে, বিচার ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর নিজের ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাঁর এই উপনীত সিদ্ধান্ত কিন্তু ঠিক কতদূর যে তাঁর ঐ বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটা একটা ভাববার কথা। আমাদের মনের একটি স্তর আছে, যার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমরা একেবারেই সচেতন নই, তাকে নির্জ্ঞান মন (the unconcious mind) বলা হয়। আমরা সচরাচর আমাদের যে মনের বিষয় সচেতন থাকি, তার নাম সংজ্ঞান মন (the concious mind)। মনোবিদ্যার নতুন আবিষ্কারের ফলে

আমরা জানতে পেরেছি যে, আমাদের সংজ্ঞান মনের কার্য্যাবলীর উপর এই নির্জ্ঞান মনের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। আমাদের অনেক কার্য্যাকার্য্য, চিন্তাধারা, মতামত, ভাবপ্রণালী এই নির্জ্ঞান মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, যদিও আমরা তাদের সংজ্ঞানমন-প্রণোদিত ব'লেই মনে করি। অতএব মনোবিদ্যার দিক থেকে আমরা এইটুকু জ্ঞান লাভ করেছি যে, কথোপকথনে ব্যক্ত মতামত থেকে বক্তার মানসিকতা সম্বন্ধে অনুমান করতে হ'লে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নয়।

অন্য এক পথে অগ্রসর হওয়া যাক। যেখানে কথোপকথনের বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে ব্যক্তিবিশেষ কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বতঃই কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে সেই ব্যক্তির মন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আমার পরিচিত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন, যিনি জিনিসের বাজারদর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে কথা কইতে একেবারেই ভালবাসেন না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনস্তম্ভ ছাড়া আর যে কিছু পড়বার বা দরকারী কথা থাকে, তা তিনি বিশ্বাস করেন না। এই রকম কারও ঝোঁক খেলাধুলো বিষয়ে, অন্যের সিনেমা এবং ফিল্‌ম্-স্টার সম্বন্ধে, কারও প্রীতি ভোজন ও ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধে, আবার কারও কথাবার্ত্তার একমাত্র বিষয় আপিস এবং বড়বাবু। বাইরের দিক থেকে এগুলি লক্ষ্য করলে মানুষের বিভিন্ন রুচির, চিন্তাধারার আভাস পাওয়া যায়। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে এই রুচির ও চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত ভিত্তিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। একজন মনোবিদ্ বলেছেন, মানবজাতিকে বড় দুই ভাগে ভাগ করা চলে, extrovert এবং introvert. যাঁরা extrovert, তাঁদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই বহির্মুখী। তাঁরা বাইরের পাঁচ রকম জিনিস সম্বন্ধে আলোচনা করতে, কথা কইতে ভালবাসেন। সকলের সঙ্গে মিশতে, দল বাঁধতে, অগ্রণী হ'তে উৎসাহ তাঁদের যথেষ্ট। Introvertরা সব সময় নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, দৃষ্টি তাঁদের অন্তর্মুখী, পাঁচজনে তাঁদের সম্বন্ধে কি বলবে, কি ভাববে, এই চিন্তাই তাঁদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। তাই কার্য্যক্ষেত্রে তাঁরা স্বভাবতঃই দ্বিধাযুক্ত ও পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়েন। অবশ্য সম্পূর্ণ extrovert এবং নিছক introvert লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ। সাধারণ লোক এই দুইয়ের মাঝামাঝি; তবে কারও ঝোঁক extroversionএর দিকে কিছু বেশি, কারও introversionএর দিকে।

একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, দেশকালপাত্রহিসেবে কথোপকথনের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হয়ে থাকে। অল্পবয়স্ক শিশুদের খেলা, গল্প, রূপকথা প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সুতরাং তাদের কথাবার্ত্তার বিষয়বস্তুও ঐসকল সংক্রান্তই হয়ে থাকে। কৈশোর চরিত্রগঠনের কাল—সাধারণত এই বয়সে একটি আদর্শবাদীর (idealistic) ভাব মনে জাগে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের স্বপ্নে, বৃহৎ কর্ম্মধারার পরিকল্পনায় কিশোরের মন মেতে ওঠে। বড়লোকের জীবনী, তাঁদের কার্য্যধারা প্রভৃতি আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে। স্ত্রী-পুরুষের চিন্তাধারার বিভিন্নতা এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। যৌবনে সকল বিষয়েই আগ্রহ উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক, যদিও কৈশোরের আবেষ্টনী ও পরবর্ত্তী কালের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে সকলেরই বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে অনুরাগ বিরাগ প্রভৃতি

জন্মিয়া থাকে। প্রৌঢ় ব্যক্তিদের শারীরিক অসুস্থতার বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ছাড়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আলোচ্য বিষয় সম্ভবত নব্যদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং আধুনিক সমাজের দ্রুত অধোগতি। প্রৌঢ়ারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হ'লে "আজ কি রান্না হ'ল গো দিদি" ব'লে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেও রন্ধনই যে একমাত্র তাঁদের আলোচ্য বিষয়, এ কথা বলা চলে না। ঘরকন্নার খুঁটিনাটি এবং পুত্রবধূদের ও পৌত্রপৌত্রীদের সদসদ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করাটাই বোধ হয় তাঁরা সমধিক পছন্দ করেন।

কথোপকথনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মনোবিদ্যার দিক দিয়ে কিছু বলা হ'ল। এবার ভাষার বৈচিত্র্য, গতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি। কেউ কেউ স্বভাবতই উচ্চভাষী, রাস্তার এ মোড়ে কথা কইলে ও মোড়ে শোনা যায়। কারও কথা আবার দু হাত তফাতে দাঁড়ালেও শোনা যায় না। কেউ দ্রুতভাষী, কেউ অতি ধীরে কথা বলেন। এরূপ বৈচিত্র্যের কারণ কি? আপনারা হয়তো বলবেন, বৈচিত্র্য থাকবে না, সকলেই কি এক রকম ভাবে, এক সুরে এক রকম গলায় কথা কইবে? তা হ'লে তো জীবনধারণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন তা নয়। সংসারে বাস করতে হ'লে বৈচিত্র্যের যে বিশেষ দরকার, তা আমরা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, 'ক'ই বা দ্রুতভাষী হলেন কেন, 'খ' হলেন না কেন, 'গ'এর সব সময় ঐ রকম তারস্বরে কথা কইবার কোন বিশেষ কারণ আছে কি? যেখানে কণ্ঠ প্রভৃতি শব্দ-উচ্চারণের জন্য আবশ্যকীয় অঙ্গের কোন বিকৃতি নেই, সেখানে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে অনুমান করতে হবে। আমি যদি বলি যে, বাল্যকালে 'গ' পিতামাতা এবং অন্যান্য লোকের ব্যবহার থেকে এই ধারণা করেছিল যে, তারা 'গ'এর কথায় মনোযোগ দেন না, বরং তার নতুন ছোট্ট ভাইটির উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের দাম বেশি দিয়ে থাকেন; তাই তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে 'গ' উচ্চৈঃস্বরে কথা কওয়া আরম্ভ করেছিল। তখন থেকে ঐ রকম ভাবে কথা কওয়াই নিজের অজ্ঞাতে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনারা হয়তো মনে করবেন, এটি একটি কাল্পনিক ব্যাখ্যা। কিন্তু আপনারা আশ্বস্ত হ'তে পারেন যে, ঐ ধরণের কোন একটি মানসিক ব্যাপারই প্রত্যেক লোকের কথা কইবার যে একটি নিজস্ব ভঙ্গি আছে, তার কারণ। অনেক শিশু একমাত্র মানসিক কারণেই তোতলামি করে। ইংলণ্ডে সায়েন্স অ্যাসোশিয়েশনের বিগত অধিবেশনে সম্প্রতি এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়েছিল। একজন মনোবিদ্ একটি সাত বছরের বালিকার তোতলামি শুধু তার মানসিক পরিবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনের দ্বারায় কি রকমে সারিয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়েছিলেন।

মনে কোন রকম ভাবের উদয় হ'লে—যেমন ভয়, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি—শরীরের ভেতর দিয়ে তার প্রকাশ হয়। বজ্রমুষ্টি, রক্তবর্ণ চক্ষু দেখলে ক্রোধ সহজেই অনুমান করা যায়। এই সমস্ত ভাবের প্রভাব কণ্ঠ প্রভৃতি মাংসপেশীসমূহের উপরেও ক্রিয়া করে। তাই কণ্ঠাগত স্বরসমূহেরও নানারূপ বিকৃতি ঘ'টে থাকে। স্বরের তারতম্যে আমরা তাই ভাবের বিচার করতে সমর্থ হই।

কথার মধ্যে কতকগুলি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক কথা রীতিমত ব্যবহার করা [illegible] —বোধ হয় সকলেরই অভ্যাস আছে। এক ভদ্রলোক দুটি কথা বলবার পরেই একবার [illegible]

বলে যেয়ে' ব'লে থাকেন। "আমি যখন কাল 'কি বলে যেয়ে' রাজা সন্তোষ রোডে গিছলুম, তখন 'কি বলে যেয়ে' শরৎ বাড়ি ছিল না।" এই রকম ক'রে তিনি কথা কন। 'মানে' 'বুঝলেন কিনা' 'বুঝেছেন কি' 'ওর নাম কি হ্যাঁ' এই ধরণের কতকগুলি কথা প্রায়শই অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই রকম কোন বিশেষ কথা বা কথার সমষ্টি যখন কেউ ব্যবহার করেন, তখন বুঝতে হবে, তাঁর জীবনের কোন একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে ঐ কথা বা কথাসমষ্টির যোগাযোগ আছে, এবং ঐ যোগাযোগ সম্ভবত তাঁর নির্জ্ঞান মনের কাজ।

কথা কইবার সময় এক কথা বলতে আর এক কথা বলা, উদ্দিষ্ট একটি কথার পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতে অনুদ্দিষ্ট আর একটি কথা উচ্চারণ করা, ইংরেজীতে যাকে 'Slips of the tongue' বলে, এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘ'টে থাকে। ঐগুলি বিশদভাবে আলোচনা করলে বক্তার মনের অনেক কথা জানা যায়। মনোবিদ্যা বলে, অজ্ঞাতে যে অনুদ্দিষ্ট কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সে কথাটি তোমার সংজ্ঞান মনের না হ'লেও নির্জ্ঞান মনের উদ্দিষ্টই। অতএব তোমার একেবারে অনুদ্দিষ্ট বলা চলে না। চিঠি পকেটে রেখে ডাকে দিতে ভুলে যাওয়া, সামনে জিনিস থাকতে খুঁজে না পাওয়া, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির নাম ভুলে যাওয়া প্রভৃতি ব্যাপার এরই অনুরূপ। এদের কারণ অনুসন্ধান করতে হ'লে নির্জ্ঞান মনে প্রবেশ করতে হবে।

এইবার তৃতীয় ও শেষ পর্ব্বে আসা যাক। কথোপকথনের সময় শুধু আমাদের জিহ্বাই যে কাজ করে, তা নয়; আমাদের সমগ্র মুখমণ্ডল, শুধু মুখমণ্ডল কেন, অন্যান্য অবয়বও তাতে যোগদান করে। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, মানুষ শুধু মিথ্যা কথা ব'লে সত্যকে ঢাকতে পারে না। জিহ্বা কপটাচরণ করলেও অন্যান্য অবয়ব তাদের ভঙ্গিমার দ্বারায় সত্য প্রকাশ ক'রে দেয়। সুতরাং যিনি এই সকল অঙ্গভঙ্গি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাঁর কাছে শুধু মিথ্যা কথা ব'লেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ভাষা উচ্চারণের সঙ্গে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি যোজনা করা একটি শিল্প—'art'; চিন্তা ভাব প্রভৃতির সঙ্গে অঙ্গচালনার স্বাভাবিক যোগ আছে ব'লেই এই শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। কথাবার্ত্তার সময় অঙ্গভঙ্গির উপর লক্ষ্য রাখলেও তাই বক্তাদের মানসিকতার কিছু তথ্য সংগ্রহ হতে পারে।

মনোবিদ্যার দিক থেকে কথোপকথন সম্বন্ধে সব কথাই যে বলা হ'ল, তা কেউ মনে করবেন না। সে কথা বারান্তরে বলবার ইচ্ছা রইল।*

* All India Radio কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।

# মৃত্যু

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

২

## জাগরণ

বিয়েকে জীবনে আমি মেনে নিলাম, কিন্তু মনে তাকে মানিয়ে নিতে পারলাম না। কি ক'রে পারব! আমার সিনিক মন তার মধ্যে দেখল শুধু বিজ্ঞানের থিওরি, তার নেশা আমার চোখেই লাগল না। তুমি আমাকে আদর করতে, আমার মনে হ'ত বইয়ে-পড়া কথা, মনে পড়ত, এর কে কি ব'লে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তোমাকে ভাল লাগত না এমন কথা বলতে পারি নে, কিন্তু সে ভাল লাগার মধ্যে মোহ ছিল না। ভাল লাগার সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগত বিশ্লেষণ—এই যে তোমাকে আমার চোখে সুন্দর লাগছে, এর একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে; তোমার চেহারা সুন্দর, গলা সুন্দর, তারও একটা বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। তুমি এনে দিতে আমাকে সুন্দর জিনিস, এনে দিতে ফুল, আমি দেখতাম, তার মধ্যে মেয়েকে আকৃষ্ট করতে পুরুষের ইন্‌স্‌টিঙ্ক্‌ট-গত প্রয়াস; আনন্দিত হতাম, কিন্তু সে এই ভেবে যে, বইয়ের কথার একটা জ্যান্ত দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমি ছিলাম তোমার প্রিয়া, তুমি হ'লে আমার সাব্‌জেক্ট—আমার বিদ্যার কতখানি সত্যি তাই যাচাই করবার পাত্র। ভালবাসা আমার ছিল না, ভালবাসবার শক্তিই আমার ছিল না। ভালবাসা ব্রেন থেকে আসে না, সে জন্মায় মনে। মন আমার আছে তখন মানতাম না; আমার মতে, মানে আমার অধীত বইয়ের মতে, মন থাকাটা মানুষের দুর্ব্বলতার চিহ্ন, আদিম বর্ব্বরতার অবশেষ।

আমার এই অবহেলাকে, ঔদাসীন্যকে বাইরের আচরণে আমি কোনদিন প্রকাশ করি নি। কিন্তু তবুও হয়তো তোমার মনে তুমি একে টের পেয়েছিলে। যাচাই করবার সাহস আমার কোনদিন হয় নি। আমি জানতাম, আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করছি। আমার চোখে তুমি ছিলে অপরিণত; আমি জানতাম, আমি যেটাকে বৈজ্ঞানিকের নির্ব্বিকার চোখে দেখতে শিখেছি, তোমার কাছে সেটা সেন্টিমেন্টের রঙে রঙিন। এই সেন্টিমেন্টকে ভেঙে দিতে চেয়েও পারতাম না, মনে হ'ত, আহা, থাক। একটু একটু বাধতও। তুমি আমাকে কত আদরে যে ফুল তুলে এনে দিলে, আমি দেখতে পাই তার মধ্যে শুধু মরা থিওরি, এ তুমি যদি কোনদিন জানতে পাও তোমার কি রকম লাগবে! নিজের এই হঠাৎ-জাগা সেন্টিমেন্টালিটির জন্যে আবার নিজেরই হাসি পেত; নিজেকে নিজে ডেকে বলতাম, রাণু, প্রেমে পড়লে নাকি গো? কিন্তু তবুও এ দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠতে পারতাম না।

একদিন বাগানে কতকগুলো বিলিতী সীজ্‌ন-ফ্লাওয়ার দেখিয়ে তুমি আমাকে বলেছিলে, এগুলো ঠিক তোমার মতন সু। বাইরে দেখতে চমৎকার, ভারী টেকসই, দীর্ঘজীবী; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ, এতে প্রাণ নেই, কোমলতা নেই—মরা কাগজের ফুল।

কথাটা হঠাৎ আমাকে বিঁধল, মনে হ'ল, আমি ধরা প'ড়ে গেছি। কি একটা ছুতো ক'রে সেখান থেকে স'রে গেলাম, ভয় ছিল, আমার মুখ তুমি দেখতে পেলে কি সন্দেহ করবে। তুমি নিশ্চয়ই

কিছু লক্ষ্য করেছিলে, পরে একসময় আমাকে বললে, দেখা গেল ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা মেয়েরাও চটতে জানে। তামাসা ক'রে কি একটু বললাম, আর অমনই মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল।

তুমি তামাসাই করেছিলে, কিন্তু সে তামাসা আমার কোন্‌খানে গিয়ে ঘা দিলে, সে তোমার জানবার কথা নয়।

কতদিন ভেবেছি, তোমার সঙ্গে এই যে লুকোচুরি করছি, এ ঠিক নয়। আমার অন্যায় কিছু কোথাও হয়েছে আমি কখনও ভাবি নি, তবু ভাবতাম, তোমার সঙ্গে একটা খোলাখুলি বোঝাপড়া ক'রে নেওয়া ভাল, তা হ'লে তুমিও আমার মতই একটা র‍্যাশনাল দৃষ্টি নিয়ে সব দেখতে পারবে।

একদিন তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ধর, যদি এমন হয়, তোমার সঙ্গে আমার কোনখানে খুব অমিল আছে দেখা গেল, তুমি কি করবে ?

তুমি হেসে বললে, কি আর করব ! তুমি তো আর আমার চশমা নও যে একটু মিস-ফিট করলে বদলে ফেলব।

আমি বললাম, হেঁয়ালি ক'র না, সত্যি বল ?

তুমি হয়তো লক্ষ্যই করলে না, আমি কি সুরে কথা বলছি। বললে, কিছুই করব না। আমার মত তোমারও একটা নিজস্ব সত্তা যখন আছে, সব রকমে তুমি আমারই নিখুঁত ডুপ্লিকেট হবে, এ আমি আশা করি কি ব'লে ? না মেলে, যে যার মতে চলব—অবিশ্যি ডিসেন্সি বাঁচিয়ে।

ডিসেন্সি ! তাই বটে। ডিসেন্সি আমিও বাঁচাচ্ছিলাম। কিন্তু কেন তুমি সেদিন অমন জবাব দিলে ? কেন বললে না জোর ক'রে, আমাকে তোমার ইচ্ছেয় চালিয়ে নেবে ? কেন, কেন ?

বিয়ের পর তিন বছর কেটে গেল, ছেলে হ'ল না ব'লে আত্মীয়স্বজনরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তুমি বাড়ির এক ছেলে, ছেলে না হ'লে চলবে না। রাশিকৃত মাদুলি ফুলপড়া তাগা তাবিজ এল। আমি জানতাম, হাজার মাদুলিতেও কিছু হবে না। তাদের উৎকণ্ঠা দেখে আমার হাসি পেত। একমাত্র চিন্তা ছিল আমার তোমাকে নিয়ে, প্রবঞ্চনা যদি এ আমার হয় তবে সে তোমার সঙ্গেই, তোমার সমস্ত আত্মীয়কুটুম্বদের সখের দায় আমার নয়।

এই সময়ে তোমাকে কথার ছলে অনেক দিন জিজ্ঞেস করেছি, ছেলের সখ তোমার আছে নাকি ?

তুমি হয়তো জানতে, এটা আমি তোমাকে পরখ করবার জন্যেই জিজ্ঞেস করছি, তুমি ছেলে চাও বললে আমার মনে লাগতে পারে। আত্মীয়দের জিভ এতদিন অচল ছিল না, তুমিও তা জেনেছিলে। তাই যখনই আমি প্রশ্ন করেছি, তুমি হেসে বলেছ, কই, না তো। তোমার সখ হয়ে থাকে তো বল, একটা জাপানী পুতুল কিনে দিই আপাতত।

আমি এর কি জবাব দেব ? হেসেই বলেছি, বেশ তো। তবে এক্ষুনি নয়, সখটা আরও একটু জমুক।

দুজনের মাঝে কি ছলনার পালাই যে তখন চলেছিল। তুমি দিতে আমাকে সান্ত্বনা, ভাবতে,

বন্ধ্যা-অপবাদ পাছে আমাকে দুঃখ দেয়। আর আমি দিতাম তোমাকে সান্ত্বনা, মনে মনে করতাম করুণা, এরা কি! যেন ছেলে হওয়াই জীবনের সব!

ছলনা আমাদের পরস্পরের কাছে সেদিন ধরা পড়ে নি। ভগবান আছেন কিনা জানি নে; যদি থাকেন, তবে হয়তো এক তিনিই এ জেনেছিলেন, আর কাণ্ড দেখে হাসছিলেন।

তারপর হ'ল আমার অসুখ। মাস দুয়েক ভুগে অসুখ ছাড়ল, কিন্তু কলকাতায় শরীর সারল না। ডাক্তার বললে, চেঞ্জে যেতে হবে। শরীর সারাতে গেলাম পিসীমার বাড়িতে।

পিসীমার দেশের বাড়ি তুমি দেখ নি।

নদীর ওপরেই বাড়ি। নদীর দিকে দোতলার ঘরে আমার জায়গা হ'ল। সিঁড়ি বেয়ে বারবার ওঠানামা করা ডাক্তারের বারণ ছিল, পারতামও না। দুর্ব্বল শরীর, দুর্ব্বল মন, বেশি কিছু ভাববার শক্তিও আমার ছিল না। জানলায় ঈজিচেয়ার টেনে সারাদিন নদীর দিকে চেয়ে ব'সে থাকতাম।

সে জায়গাটা নদীর বাঁকের মুখে। দুদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত নদী, ওপারে দিগন্ত-ছোঁওয়া ধানের ক্ষেত, তার শেষে কালো অবিরল গাছের রেখা। তখন আশ্বিনের শান্ত নদী, ধানের ক্ষেত সবুজ, আকাশে পূর্ব্ববঙ্গের পেঁজা মেঘ। কি যে ভাল লাগল বলতে পারি নে! সকালবেলায় শরতের মিষ্টি রোদ এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ত; আকাশে নীলে সাদায় সারাক্ষণ লুকোচুরি চলছে; নদীর ঝকঝকে সাদা মসৃণ জলের ওপর হঠাৎ মেঘের ছায়া পড়ল; একটু দূরে জলের অতি সরু ঢেউয়ের রেখার মাথায় হাজার কাচের কুচি রোদে ঝলমল ক'রে উঠছে; বাটা মাছের ঝাঁক ভাসতে ভাসতে পাড়ের খুব কাছে এসেই হঠাৎ ডুব মেরে খানিক দূরে গিয়ে আবার ভেসে উঠল; ভাঁটার সময় সামনের চড়ায় কাক আর শালিকরা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে; ওপারে একটা বাঁশের ঝাড় নদীর মাঝে নুয়ে পড়েছে; ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে আচমকা হাওয়া ব'য়ে গেল, একটা কালো রেখা মাঠের একধার থেকে আর এক ধার অবধি বেয়ে চ'লে গেল; দূরে গাছের সারির খানিকটা সবুজ, খানিকটা কালো দেখাচ্ছে; সন্ধ্যাবেলা মেঘে ধরল সোনার রং, জলে লাল-হলদে আভা, ওপারে ধানের ক্ষেত নিশ্চল কালোর শয্যা। ক্রমে বন কালো হয়ে এল, শুধু দীর্ঘ সুপারিবৃক্ষশ্রেণীর মাথায় তখনও শেষ রোদ লেগে রয়েছে; সে ছবি আজও আমার চোখে ভাসছে।

একে আমি ভালবেসে ফেললাম—নদীকে, ধানক্ষেতকে, বনকে। হ্যাঁ, সত্যিই ভালবাসলাম, যে আমি দুমাস আগেও একে কাব্য আর সেন্টিমেন্টালিটি ব'লে ঠাট্টা করেছি। এবং এই প্রীতি আমার সমস্ত মনকে প্রকৃতিকে ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেল।

একে ভালবেসে আমি প্রথম জানলাম, বিজ্ঞানের বাইরেও ভাল-লাগা ব'লে একটা বস্তু আছে; জানলাম, জল শুধু $H_2O$ নয়; কেমিস্ট্রি দিয়ে নদীকে বোঝা যায় না, বটানি দিয়ে জানা যায় না বনের সত্তাকে। তেইশ বছর বয়সে আমি নতুন ক'রে পৃথিবীকে দেখতে শিখলাম, তার সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেলাম। এবং ধরা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সৌন্দর্য্য আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। জীবনে এই প্রথম আমি জানলাম, বিশ্বে চোখ মেলে দেখবার, প্রাণ দিয়ে বোঝবার জিনিষ আছে; বইয়ের পাতায় তত্ত্ব থাকে, থাকে না সুন্দরের পরিচয়।

জানলায় ব'সে ব'সে আমি দেখতাম সারাদিন, আর ভাবতাম। এই তো পৃথিবী, যাকে আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। এতদিন বইয়ে প'ড়ে যাকে চিনে রেখেছিলাম, তার সঙ্গে এ এক নয়। দুয়ের কে সত্যি, যাকে বুদ্ধি দিয়ে চিনেছিলাম সে, না যাকে প্রাণ দিয়ে আজ জানছি সে? বুদ্ধি দিয়ে যা জেনে রেখেছিলাম, এ তার গণ্ডির মধ্যে পড়ে না তো! ওই যে গাংশালিকরা মহা উৎসাহে বাসা বাঁধছে, তার সবখানিই অন্ধ ইন্‌স্‌টিঙ্ক্‌ট? পাল তুলে দিয়ে মাঝি নদী বেয়ে চলেছে, স্বামীপুত্রের জন্যে জেলে-বউ নৌকোর ওপরে তোলা-উনুনে রান্না চাপিয়েছে—ওর সবটাই নিছক স্ট্রাগ্‌ল্ ফর এগ্‌জিস্‌টেন্স?

আমার ছাতের কোণে একজোড়া চড়াইপাখী বাসা বেঁধেছিল। একদিন কি ক'রে তাদের বাচ্চা দুটো মেঝেয় প'ড়ে গেল। তাদের বাসায় তুলে দেবার উপায় ছিল না, বাচ্চা দুটো শুকনো গলায় ট্যাঁ ট্যাঁ করতে লাগল, আর ধাড়ি দুটো ঘরময় লাফিয়ে খালি চেঁচাতে লাগল। বাচ্চাদের আঙুলে ক'রে দুধ খাইয়ে দিলাম, জল খাইয়ে দিলাম, আঙুরের বাক্সয় তুলোর মধ্যে তাদের বসিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা বাঁচল না। সারাদিন ধ'রে ধাড়ি পাখী দুটো অবিশ্রান্ত চেঁচাতে আর ঘুরতে লাগল, খাবার দিলাম, খেলে না।

মাস তিনেক সেখানে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পিসীমার ছোট দেওরের ছেলেটি আমার কোলে চেপে বসল, কিছুতেই নামবে না। তার মা এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বাড়ির একটা দিশী কুকুরকে আমি রোজ জানলা থেকে খাবার ছুঁড়ে দিতাম, সে আমার পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন পর্য্যন্ত চ'লে এল, তাড়াতে চেষ্টা করলাম, গেল না। স্টীমার যখন ছাড়ল সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, খালাসীরা বাঁশের লগি দিয়ে ঠেলে তাকে দূর ক'রে দিলে। মুখ ফিরিয়ে নিলাম, জ্ঞান হবার পরে জীবনে এই প্রথম আমার দুচোখ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগল।

দুপুরবেলা বাসায় এসে পৌঁছলাম। বিকেলে তুমি কোর্ট থেকে ফিরে এলে, বললে, বাঃ, চেনাই যে যায় না আর!

আর একদিন তোমার কথা অলক্ষ্যে আমার লেগেছিল, আজও লাগল। উত্তর না দিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে তোমাকে প্রণাম করলাম। তুমি হেসে বললে, বাপ্‌স্, হিঁদু হয়ে গেলে যে গো!

জবাব দিলাম না, তখন কথা বললে গলার স্বরে জলের আভাস তুমি ধ'রে ফেলতে। সারাক্ষণ ধ'রে একটি কথাই আমার কানে বাজতে লাগল, চেনা যায় না, আমাকে চেনা যায় না আর। তুমিও টের পেয়েছ, আমি বদলে গেছি, শুধু শরীরে নয়, মনেও। আমি ভালবাসতে শিখেছি।

আত্মীয়রা সবাই দেখা করতে এলেন, স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি দেখে আনন্দপ্রকাশ করলেন, আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, এবারে বউমা, একটি রাঙা টুকটুকে খোকা এনে দাও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই। চিরদিন এঁদের কথায় আমার হাসি পেয়েছে। সেদিন হাসি এল না।

মাস কয়েক কাটল, তারপর বাবা মারা গেলেন, এবং তার ফলে উমা এ বাড়িতে এল।

উমা আমার মাসতুতো বোন তুমি জান। মাসীমা মারা যান যখন, তখন ওর বয়স সাত, আমার বারো। সেই থেকে ও আমাদের বাড়িতে মানুষ, আমাদের বাড়িতে শুধু নয়, আমার

হাতে। বাবা যখন চেঞ্জে গেলেন ওও সঙ্গে গিয়েছিল; মেসোমশাই তখন আসামের কোন জঙ্গলে বদলি হয়েছেন। কাজেই তখনকার মত আমার কাছে ছাড়া ওর যাবার জায়গা ছিল না।

বাবার শেষ সময়কার কথা বলতে বলতে এক সময় উমা বললে, একটা জিনিস তোমাকে দিতে তিনি ব'লে গেছেন।

—কি রে?

বাক্স খুলে উমা দুটো পাকানো কাগজ বার করলে—কোষ্ঠী। বাবা নিজে কোষ্ঠী করতে জানতেন; এক বড় জ্যোতিষীকে দিয়ে তিনি আমার আর উমার কোষ্ঠী করিয়েছিলেন।

কোষ্ঠীটা হাতে নিয়ে কুলুঙ্গির ওপর তুলে রাখতে যেতেই উমা ব্যস্ত হয়ে বললে, ওকি, অমনি ক'রে রাখবে নাকি তুমি?

বললাম, তাতে কি হয়েছে?

উমা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, বাঃ, কোষ্ঠী কখনও অশ্রদ্ধা ক'রে রাখতে আছে!

বললাম, তুই এসব মানিস নাকি?

সে বললে, বা রে, কোষ্ঠী আবার কেউ মানে না নাকি! দাও তুমি, আমি বাক্সয় তুলে রাখছি।

বললাম, আচ্ছা, আমিই রাখছি তুলে।

বাঁচলাম। উমা আমার মত স্কেপ্‌টিক হয় নি। হয়তো জীবনকে ও এন্‌জয় করতে পারবে।

কদিন না যেতেই সবাই উমার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন—লক্ষ্মী মেয়ে, যেমন দিদি, তেমনই বোন।

দিদিকে তাঁরা চেনেন নি।

প্রথম যেদিন আমরা ওকে নিয়ে জুতে যাই, তোমার মনে আছে? আমি দাঁড়িয়ে হাঁস দেখছিলাম—এমনই বালিহাঁস সেই নদীতেও আসত। তোমরা দুজন এগিয়ে গেলে, হয়তো লক্ষ্য কর নি, আমি পেছনে পড়েছি। শেষে দেখতে পেয়ে আমার অপেক্ষায় ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে। আমি তখন তোমাদের দিকে যাচ্ছি, দূর থেকে দেখলাম, তোমরা দুজনে ব্রিজের আল্‌সের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রাজহাঁস দেখছ। তোমাদের দুজনকে পাশাপাশি তো সারাক্ষণই দেখতাম, কিন্তু সেই সময়টিতে যেন নতুন ক'রে তোমাদের দেখলাম।

এগিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'ল না, সেইখানেই দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম। খানিক পরে উমার চোখ পড়ল, চেঁচিয়ে বললে, বা রে, দিদি, অমন ক'রে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

বললাম, জুতোটা পায়ে লাগছে।

তুমি জুতোটা খুলে পকেটে পুরে নিলে। বললে, কোমলচরণাদের সবই বিচিত্র! জুতো অবধি বইয়ে নিলে শ্বশুরের ছেলেকে দিয়ে!

উমা হাততালি দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। অমন উচ্ছ্বসিত শিশুর হাসি আমি কোনদিন হাসতে পারি নি।

৫

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের সিনেমাতে যাবার কথা। উমা এসে বললে, বাঃ দিদি, রেডি হও নি যে এখনও?

আমি বললাম, আমার শরীর ভাল নেই। আজ তোরাই দেখে আয়।

উমা বললে, সে হবে না।

কিন্তু টিকিট কেনা আগেই হয়ে গেছে। তোমরা চ'লে গেলে।

আমি উমার কোষ্ঠীটা খুলে দেখতে বসলাম। কোষ্ঠীর মোটামুটি ফল দেখতে আমি বাবার কাছেই শিখেছিলাম। আমি কোষ্ঠী বিশ্বাস কোনদিন করতাম না; সেদিন হঠাৎ কেন খেয়াল হ'ল, নিজেই ভাল ক'রে জানতাম না।

উমার কোষ্ঠীটা হাতে নিয়ে মনে হ'ল, নিজেরটাও একটু দেখি না।

আমারটাই আগে খুললাম। খানিক দূর প'ড়ে একটা জায়গায় পৌঁছে কোষ্ঠীটা আমার হাত থেকে প'ড়ে গেল, চীৎকার ক'রে হেসে উঠতে ইচ্ছে হ'ল—পাগলের অট্টহাসি। কোষ্ঠীতে সন্ততি-যোগের জায়গাতে লেখা আছে—জন্মস্থানে গ্রহ-নক্ষত্রদের কি সব যোগাযোগের ফলে আমি নিঃসন্তান, বন্ধ্যা হব।

খুললাম উমার কোষ্ঠী।—সুপুত্রবতী।

আমার কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেল।

পরদিন তোমাকে বললাম, উমাকে তুমি বিয়ে কর।

তুমি আশ্চর্য্য হয়ে বললে, হঠাৎ?

বললাম, হঠাৎ নয়। আমার ছেলেপুলে হ'ল না, বিয়ে তোমাকে আবার করতেই হবে। ওর চাইতে ভাল মেয়ে তুমি পাবে না।

তুমি বললে, বুঝতে পারছি নে তোমার কথা। কেউ কিছু বলেছে?

বললাম, না, আমি নিজে থেকেই বলছি।

তুমি বললে, ছেলেমানষি ক'র না।

বললাম, ছেলেমানষি নয়, সব ভেবেই বলছি। আমার ছেলে হবে না।

তুমি বললে, কে বলেছে তোমাকে হবে না?

বললাম, আমি জানি।

—কি ক'রে জানলে?

হায় রে, কি বলব কি ক'রে জানি! তখনও সত্যি কথা তোমাকে বলা উচিত ছিল, কিন্তু পারলাম না। কেন পারলাম না জানি নে, হয়তো মেয়েদের সহজাত ইন্‌স্টিঙ্ক্‌ট থেকেই।

বললাম, কোষ্ঠী দেখেছি।

তুমি হেসে উঠলে, সরস্বতী, তুমি কোষ্ঠী দেখতেও জান নাকি?

বললাম, বিশ্বাস না হয়, আর কাউকে দিয়ে আমার কোষ্ঠী দেখাও। কিন্তু সত্যি যদি তাই হয়ে থাকে, ওকে বিয়ে করবে বল।

তুমি বললে, পাগলামো ক'র না সু। কোষ্ঠী-টোষ্ঠী সব বাজে, ও আমি মানি নে।

জোর ক'রে বললাম, পাগলামো নয়, আমি সিরিয়াস্‌লি বলছি।

তুমি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলে, তারপর বললে, কি হয়েছে তোমার বল তো। তুমি আমাকে কিছু সন্দেহ করছ না তো?

আমার কপাল, আমি করব তোমাকে সন্দেহ, করব উমাকে সন্দেহ! তা হ'লে বাঁচব কাকে নিয়ে? আর সন্দেহ করবার ইন্‌স্‌টিঙ্ক্‌ট আমার ছিল না, তোমাকে আমি ভালবাসি নি। সন্দেহ ঈর্ষা আমার আসবে কোথা থেকে? কিন্তু কি ব'লে বোঝাব তোমাকে, কেন এ অনুরোধ করেছিলাম! তোমাকে আমি ঠকিয়েছি—তুমি সন্তান চাও, আমি তোমাকে নিঃসন্তান করেছি। আমাকে দিয়ে আর এ জন্মে তার পূরণ হবে না। কিন্তু উমা আমার বোন, আমার ছেলেবেলার সাথী, আমার বন্ধু। ওকে দিয়ে যদি তোমার ক্ষতিপূরণ করতে পারি, সেই হবে আমার পাপমোচন।

বললাম, পারি নে বকতে। কোষ্ঠী দেখাতে হয় দেখিও, কিন্তু আমার কথা নড়বে না। কাল আমি মাকে বলব।

তুমি বললে, না না, সে খবরদার করতে যেও না। কিন্তু তবু বলবে না আমাকে, কি হয়েছে?

জীবনে দুবার এই প্রশ্ন শুনলাম। এবং দুবারই তার জবাব দিতে পারলাম না।

বললাম, কিছুই হয় নি। আমাকে বিশ্বাস কর, যা বলেছি তার বেশি আর কিছু নেই। কথা দিলে?

বললে, না।

বললাম, কেন দেবে না? তোমার বংশের শেষ হয়ে যাক, এই তুমি চাও?

বললে, যায় তো কি করব? তোমার প্রতি এত বড় অন্যায় করতে পারব না, তুমি বললেও না।

বললাম, আর আমি যদি ম'রে যাই?

বললে, সে কথা ওঠে না।

বললাম, বেশ, তা হ'লে তাই হবে, আমি মরব। তা হ'লে তো আর তোমার কোন বাধা থাকবে না।

আমার মুখ চেপে ধ'রে বললে, ছি ছি, কি যা-তা সব বকছ! হ'ল কি তোমার আজ?

বললাম, মাথা-খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, অন্তত এইটুকু কথা দাও, যদি কোনদিন আবার বিয়ে কর, ওকেই করবে। অবশ্য এমনই যদি ওকে অপছন্দ করবার তোমার কিছু থাকে, তা হ'লে আমি জোর করব না।

বললে, তা কিছু নেই। কিন্তু এসব আজগুবি কথা আর নয়, এবার ঘুমোও।—ব'লে এক হাতে আমাকে জড়িয়ে নিয়ে আর এক হাতে আমার কানের কাছে চুলগুলো গুছিয়ে দিতে লাগলে।

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, আমি তোমাকে ঠকিয়েছি, তোমার আদর পাবার আমি যোগ্য নই।

মাকে বললাম। তিনি প্রথমটা রাগ করলেন, তারপর আমার যুক্তিও মানলেন।

উমা এসে বললে, দিদি, আমার ওপর রাগ করেছ ?

তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললাম, তোর ওপর রাগ করব আমি ! এমন কথা ভাবতে পারলি ?

সে বললে, তবে কেন এসব কথা তুলছ ?

বললাম, সে কি রাগ ক'রে ? স্বামী আমার লাঠি না ডাণ্ডা যে, রাগ ক'রে তোর ঘাড়ে বসিয়ে দেব ?

সে বললে, তামাসা নয় দিদি, সত্যি ক'রে বল। তুমি আমাকে কোন রকম সন্দেহ করছ না তো ?

এও বলছে—সন্দেহ ! এইটুকু মেয়ে, সেদিনও ওকে পুতুল কিনে দিয়েছি খেলতে, ওও জানে কোথায় সন্দেহ আসে ! জানতাম না আমি—আমি বিদ্যাবতী।

বললাম, ক্ষেপেছিস তুই ? সন্দেহ করলে, তোকে ঘা কতক দিয়ে বাড়ি থেকে বিদেয় ক'রে দিতুম। সতীন ক'রে নিতে চাইব কেন ?

সে বললে, কিন্তু সে কক্ষনো হবে না। তোমার সতীন আমি কিছুতেই হব না, ম'রে গেলেও না।

বললাম, ভয় নাই রে, আমি তোর সঙ্গে চুলোচুলি করব না।

সে বললে, করলেও তুমি আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে না। কিন্তু সে হবে না।

বললাম, নিশ্চয় হবে। নইলে তুই থাকতে আর একটা কে কোত্থেকে উড়ে এসে আমার সতীন হয়ে বসবে ! দেখছিস, আমি মরতে বসেছি, আমাকে তুই বাঁচাবি নে ?

উমা চুপ ক'রে রইল।

বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের আগে সবাই তোমরা বারবার ক'রে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, এ বিয়েয় সত্যিই আমার কোথাও কোন গ্লানি আছে কি না। একবিন্দু গ্লানি আমার মনে থাকলে শেষ সময়েও বিয়ে ভেঙে দেওয়া হবে। আমি সবাইকে অভয় দিলাম, আমার কোন গ্লানি নেই, কোন দুঃখ নেই। আমার ভাঙা জীবনকে আমি জোড়া দিয়ে তুলতে যাচ্ছি, এতে দুঃখ আমার কেন হবে ! এ তো আমার আনন্দের কথা, গর্ব্বের কথা ; ভাগ্যের ওপর আমার জয়ের আনন্দ; নিজের ভুলের সংশোধন করতে পারার আনন্দ।

বিয়ে-বাড়ির সমস্ত ভার আমি নিজের হাতে তুলে নিলাম। মেয়েরা মুখ বেঁকিয়ে বললে, ধন্যি !

বলুক। ওরা কি জানবে আমার মনের খবর !

সব আয়োজন নিজের হাতে করলাম। বউ-ভাতের থালা নিজে উমার হাতে তুলে দিলাম। ফুলশয্যার দিন আপনি ফুল তুলে বিছানা সাজালাম। রাত্রে হাতে ধ'রে উমাকে ঘরে এনে পৌঁছে দিলাম, দোর-গোড়া থেকে ডেকে বললাম, আড়ি পাতব কিন্তু।

আর কেউ তখন ছিল না। তুমি বললে, ধরতে পারলে গেছ তো !

উমা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। অমনই ক'রেই ও হাসে।

ধমক দিয়ে বললাম, হাসিস নে হতভাগা মেয়ে, বিয়ের দিনে হাসতে নেই। আমার বিয়ের দিনে কি করেছিলাম জানিস?

তুমি বললে, আমি জানি। ভ্যাঁ—

আমি তোমাকে জিভ কেটে ভেংচে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পেছন থেকে শুনলাম, উমা আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

পেছনে হাত বাড়িয়ে দোরটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে এলাম, দোরের শব্দটা কানে গিয়ে হঠাৎ বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। এদিকে এসে বারান্দার রেলিং ধ'রে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ এমন হ'ল কেন? এই তো সব আয়োজন উদ্যোগ নিজেই করেছি, এ কদিন ধ'রে সমস্ত কাজ নিজের হাতে ক'রে এসেছি, কখনও তো এমন হয় নি! এইমাত্র যখন উমাকে নিজে সঙ্গে ক'রে এগিয়ে দিতে গেলাম, তখনও তো মনে কোনও চঞ্চলতা টের পাই নি! ওখানে দাঁড়িয়ে এক্ষুনি যে হাসি-তামাসা ক'রে এলাম, তার মধ্যেও তো কোনও কৃত্রিমতা আমার ছিল না! তবে কেন হঠাৎ বুকটা অমন ধড়াস ক'রে উঠল! মনে হ'ল যেন—কি মনে হ'ল? কিছু নয়, স্পষ্ট কিছুই নয়, যা অনুভব করলাম, তার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নেই, নাম নেই। অথচ এখনও তার রেশ আমার বুকের মাঝে মিলিয়ে যায় নি, এখনও গলার কাছটায় কি একটা কেবলই আঘাত করছে!

কি এ? ঈর্ষা? ক্ষোভ? জানি নে। না না, ঈর্ষা নয়, ঈর্ষা করব আমি উমাকে? ক্ষোভ নয়, ক্ষোভ করব আমি কিসের জন্যে? আমারই তো রচা এই বিয়ের যোগাযোগ, আমারই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সেটা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল, তবে কিসের ক্ষোভ? ক্ষোভ নয়, শ্রান্তি—নার্ভের শ্রান্তি। এ কদিন একটা প্রকাণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম; উমাকে রেখে পেছন ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই তার শেষ হয়েছে, নার্ভের অবসাদ এসেছে। দোরের শব্দটা উপলক্ষ্য মাত্র। আমার কিছুই হয় নি, আমি ভাঙি নি, আমি ইন্‌স্‌টিঙ্ক্‌টের কাছে মাথা নোয়াই নি। আমি শ্রান্ত, শুধু শ্রান্ত, আর কিছু নয়।

কিন্তু মিথ্যা স্তোকবাক্যে নিজেকে বেশিদিন ভুলিয়ে রাখা গেল না। কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট টের পেলাম, আমার মনে আত্মপ্রসাদ যা জমেছে, তার সঙ্গে গ্লানিও মিশে আছে কম নয়।

কিসের থেকে এই গ্লানি এল, আমি জানি নে। হয়তো ইন্‌স্‌টিঙ্ক্‌ট, হয়তো আর কিছু। কিন্তু একে চিনতে আমার দেরি হ'ল না। আমি সিনিক, পরের হোক, নিজের হোক, যে কোন বস্তুকে প্রবৃত্তিকে আলাদা ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা আমার স্বভাব। তারই বলে বোধ হয় একে চিনলাম।

একথা সত্যি, তুমি কোনদিন আমাকে অযত্ন কর নি। আমিই বরং তোমাকে তাড়া দিয়েছি, মনোযোগটা উমার 'পরেই নিবদ্ধ রাখতে। সে তাড়ার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। অথচ মনের আমার কি অবনতি ঘটেছে, সেও ধরা পড়ল এরই মধ্যে দিয়ে।

বিয়ের মাসখানেক পরে। রাত্রে উমা আর আমি ব'সে পান সাজছি, তুমি এসে আমার বাটা থেকে পান তুলে নিলে। আমি ব'লে উঠলাম, আহা-হা, এখন আর এদিকে কেন-গো? নতুন বোয়ের কচি হাতের পান নাও, বেশি মিষ্টি লাগবে।

তুমি হেসে বললে, মাষ্টারমশাই।—ব'লে উমার বাটা থেকে দুটো পান তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলে। হাসি সামলানো উমার স্বভাব নয়, সে ফিক ক'রে হেসে ফেললে।

কিন্তু আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার কথা কটার মধ্যে একটা অদ্ভুত কটু ঝাঁজ আমার নিজেরই কানে এসে বেজেছিল।

উমা বললে, দিদি, হ'ল?

সামলে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

পানের বাটা তুলে রেখে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। একি! আমার কথার মধ্যে এই তিক্ততা কোথা থেকে এল? আমি যখন বলতে সুরু করেছিলাম, তখন তামাসাই করতে যাচ্ছিলাম জানি। অথচ তার উচ্চারণের মধ্যে এমন একটা সুর ফুটে বেরুল, যেটা আমার পুরোপুরি অজানা; এ যেন আর কারও গলা। আমার মনেরও অজ্ঞাতে এ কিসের বিষ এসে আমার বুকে বাসা বেঁধেছে? ঈর্ষা? হ্যাঁ, ঈর্ষা। আর একে অস্বীকার করবার জো নেই।

বিয়ের দিন থেকে সুরু ক'রে সমস্ত খুঁটিনাটি আবার তলিয়ে দেখতে লাগলাম। ফুলশয্যার রাত্রে দোর-ভেজানোর শব্দে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। নার্ভ? না না, নার্ভ নয়, সেও এই ঈর্ষা—জীবদেহের সহজাত প্রবৃত্তি। দোরের শব্দ কানে এসে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, আজ থেকে ঐ দোর আমার জন্যে আর খোলা রইল না, নিজেই তাকে চিরকালের মত রুদ্ধ করলাম। তারই আঘাত বুকে আমার বেজেছিল। যুক্তি দিয়ে তখন একে ধরতে পারি নি, কারণ যুক্তিতে পাওয়ার মত জমাট অবস্থায় এ তখনও পৌঁছোয় নি। প্রবৃত্তি থাকে মনে, বুদ্ধির অগোচরে। বেড়ে বেড়ে চিন্তা ও কাজের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট রূপ যখন সে নেয়, বুদ্ধি তাকে তখনই দেখতে পায়, তার আগে নয়। সেই ঈর্ষা আজ দানা বেঁধেছে, রূপ নিয়েছে আমার মনে, আমারও অজ্ঞাতেই সে আত্মপ্রকাশ করলে আমার কথায়। আবার আমার হার হ'ল। ভেবেছিলাম, নিজেকে আমি জয় করেছি। এখন দেখলাম, করি নি, পারি নি।

সমস্ত রাত আমার ঘুম এল না। অসাড়ের মত শুয়ে প'ড়ে কেবলই ভাবতে লাগলাম, কি হ'ল! আমার এ কি হ'ল! বড় গর্ব্ব ক'রে নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমার শক্তি আছে। কিন্তু কই আমার শক্তি!

আমার দুর্ব্বলতার আজ পরিচয় পেলাম, সংশয়ের আর অবসর রইল না। কিন্তু এই তো সবে সুরু, এর পর? কোথায় এর শেষ? আজ অতর্কিতে যে ইতরতার বিষ আমার কথায় আত্মপ্রকাশ করল, এর পরিণতি কোথায়? একে জয় করবার স্পর্দ্ধা আর রাখি নে; আমার নিজের ওপরে আস্থা ভেঙে গেল এতদিনে। যার অস্তিত্ব নিজের মধ্যে টেরই পেলাম না, তার সঙ্গে যুদ্ধ করব আর কোন্ বলে!

কিন্তু এখন উপায়? আজ তোমাদের আঘাত করেছি, তোমরা হয়তো লক্ষ্য কর নি। আজ হয়তো আঘাত করেছিও বলা চলে না, এ আঘাত আমার স্বেচ্ছায় করা নয়। কিন্তু কে জানে, কাল আমি স্বেচ্ছায় আঘাতই তোমাদের করব কি না! আমি শিক্ষিতা মেয়ে, আমি কাল্‌চারড, আমি

যুক্তিবাদী। কিন্তু সেই শিক্ষা-কাল্‌চার-যুক্তিকে ঠেলে যে পশুপ্রবৃত্তি আমার মধ্যে আজও বেঁচে রয়েছে, তাকে জয় করব আর আমি কি দিয়ে! আজ সে আমার শাসনের শিকল ছিঁড়েছে, কাল সে আমাকে তার খুশিমত টেনে নিয়ে যাবে। আমি হিংস্র জন্তুর মত আঘাত করব তোমাদের—তোমাকে, উমাকে, যাদের চাইতে প্রিয় এই মুহূর্তে আমার আর কেউ নেই। সেই একটি অসতর্ক মুহূর্তের আঘাত আমার তোমাদের দুজনের জীবনকে চিরকালের মত বিষিয়ে তুলবে। অথচ যা নিয়ে আঘাত আমি করব, সে অবস্থায় আমিই তোমাদের টেনে এনে ফেলেছি। যদি আঘাত করি, কি ব'লে তার কৈফিয়ৎ দেব—নিজের কাছে, আমার ভদ্র রুচির কাছে, উমার কাছে, তোমার কাছে? যে তুমি আমাকে কোনদিন এতটুকু অনাদর অবিশ্বাস কর নি, যে উমা জ্ঞান হয়ে অবধি মায়ের বদলে দিদিকেই তার আপন ব'লে জেনেছে? উঃ, তার আগে মরণ হোক, মরণ হোক।

তারপর থেকে এই একটি চিন্তাই আমাকে পেয়ে বসল। মরণ হোক, মরণ হোক। নিজের অবনতি লোকের চোখে ধরা পড়বার আগে, উমার চোখে ধরা পড়বার আগে, মরণ হোক। আমার ভাগ্যকে আমি গড়তে গিয়েছিলাম, সে আমাকে ছুবলেছে। হোক, তবু সে ছোবল আমার ওপর দিয়েই যাক, আর কাউকে যেন তার বিষ স্পর্শ না করে—তোমাকে যেন স্পর্শ না করে, উমাকে যেন স্পর্শ না করে। নিজের ওপরে শ্রদ্ধা আমি হারিয়েছি, তোমাদের ওপরে শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ আমার এখনও আছে। সেই শ্রদ্ধা, সেই প্রীতি অটুট থাকতে থাকতে, আমার ওপরে তোমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি অটুট থাকতে থাকতে স'রে যাওয়াই আমার পরম আনন্দ, পরম মুক্তি। এর বেশি আর কি চাই, আর কি আমার চাইবার আছে!

শুনেছিলাম, আত্মহত্যা করবার আগে মানুষকে ভূতে পায়। সত্যিই আমাকে ভূতে পেল। সারাদিন সারারাত খালি কানের কাছে বাজছে, মরণ হোক, মরণ হোক—মরব, মরব; মরব। মরতে আমি চাই, যত সম্ভব তাড়াতাড়ি। তবে স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা ক'রে থেকে লাভ কি? বরং যত দিন যাবে, ততই আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাবার ভয়। জীবনের কাছে আশা করবার তো আমার আর কিছু নেই, যে আশায় মানুষ বাঁচে। স্বাভাবিক মৃত্যু, সেই বা কতদূর!

আবার কোষ্ঠী দেখলাম। আমার আয়ু সাতষট্টি বছর। মিছে কথা, মানব না, মানব না। একবার নিজের কাজ দিয়ে আমি কোষ্ঠীর কথা সত্যি ক'রে তুলেছিলাম, এবার নিজের কাজ দিয়েই তাকে মিথ্যা প্রমাণ করব। মানুষের ভাগ্য তার নিজেরই হাতে, এই আমি চিরকাল জেনেছি। ভাগ্যকে হাতে নিতে গিয়ে এতদূর এসে পৌঁছেছি, কিন্তু আর নয়; এবার হবে আমার জয়। ভাগ্যকে আমি জয় করব, জয় করব জীবনকে, আমার সারাজন্মের সমস্ত পরাজয়কে উপহাস ক'রে ডঙ্কা মেরে চ'লে যাব।

সঙ্কল্প স্থির করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের সব চঞ্চলতা চ'লে গেল। আর তো চঞ্চল হবার কারণ নেই, এবার আমার মুক্তি কাছে, আমার হাতের মুঠোয়, যখন খুশি তাকে আমি পেতে পারি।

কদিন ধ'রে আমার শরীর ভাল ছিল না, থাকবার কথা নয়। সেই দিন রাত্রে তুমি আমাকে দেখতে এলে। বললে, কেমন আছ?

হেসে বললাম—অনেক দিন পরে হাসতে পারলাম আমি, ভালই। আর কি, এবারে শিগগিরই তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি।

তুমি বললে, কোথায়, চিত্রা না মেট্রো?

বললাম, উঁহু, চালাকি নয়। এবার একেবারে আনন্দধাম।

তুমি বললে, তার মানে কাকার বাড়িতে? কিন্তু তাঁরা তো কেউ এখানে নেই। বাড়ি মেরামত হচ্ছে।

ভ্রূ কুঁচকে বললাম, সোজা কথা বুঝতে পার না কেন? আনন্দধাম মানে মরলে যেখানে যায়।

তুমি বললে, ও। আমার বুদ্ধিটা একটু কম কিনা, তাই বুঝতে দেরি হয়।

তারপর আমার নাকটা দু আঙুলে ধ'রে নেড়ে দিয়ে বললে, বাজে বকো কেন?

আমি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, বাজে কি?

তুমি আমাকে বুকে চেপে ধ'রে চুমো খেয়ে বললে, চুপ।

আমি বললাম, আঃ, ছাড়, দম বন্ধ হয়ে গেল।

বললে, যাক। যতক্ষণ না দিব্যি করছ আর কখনও এসব বাজে বলবে না, কিছুতেই ছাড়ব না।

আমার সমস্ত দেহ অবশ হয়ে এল। তোমার স্পর্শ এত মিষ্টি আগে কখনও জানি নি। আজ তোমার বুকে শুয়ে কেন এত ভাল লাগল জানি নে। হয়তো মনের মধ্যে ঈর্ষা জেগে উঠে আমাকে বেশি সেন্‌সিটিভ ক'রে তুলেছিল; হয়তো বা মৃত্যুকে স্থির ও আসন্ন জেনে আমার দেহ-মনের চিরকালের জড়তা ভেঙে গিয়েছিল।

মনে মনে বললাম, এই একটি সুখ আমার আর অবশিষ্ট আছে, একে আমি নিঃশেষে ভোগ ক'রে যাব। এমনিই ক'রে তোমার আলিঙ্গনের মধ্যেই আমি মরব।

পয়সা থাকলে কলকাতা শহরে যে কোন জিনিস মেলে। এমন বিষ জোগাড় করলাম, যার কাজ খুব দ্রুত ও নিশ্চিত।

তারপর এল আমার মরবার দিন।

সারাদিন আমি বাড়িময় ছোটাছুটি ক'রে বেড়ালাম; আমার পৃথিবীকে আমি শেষ দেখা দেখে নিলাম। উমাকে অকারণে চুল টেনে চিমটি কেটে অস্থির ক'রে তুললাম, সে চেঁচাতে লাগল, আঃ, দিদি, কি যে হচ্ছ তুমি দিন দিন! দাঁড়াও, আজ ব'লে দিয়ে বকুনি খাওয়াব।

রাত্রে যখন দোরের বাইরে তোমার পায়ের শব্দ হ'ল, বিষের বড়ি গিলে ফেললাম।

তোমার বুকে শুয়ে মনে হ'ল, এবার আমার জয়, ভাগ্য আর আমাকে হারাতে পারবে না। তোমার সান্নিধ্যের এই আনন্দ, যখন এ আমার পাবার ছিল তখন আমি এর খবর পাই নি। তা হোক, এই শেষ মুহূর্তে একে পেলাম, এই মুহূর্তটি আমার জীবনে অক্ষয় অমর হয়ে রইল, এর থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে আর কেউ পারবে না।

বিষের তেজে আমার সারাটা বুক মুচড়ে উঠছিল, কিন্তু স্পর্শের উন্মাদনার তলায় সে যন্ত্রণাও চাপা প'ড়ে গেল। তখন তন্দ্রা আমাকে ঘিরে আসছে। তবু আমি প্রাণপণে জেগে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলাম, যতক্ষণ আছি তোমার সান্নিধ্য অনুভব ক'রে নিই, আমার শেষ তৃপ্তি। তন্দ্রার ঘোরে মরা, সে তো অজ্ঞান হয়ে মরা।

ক্রমে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এল। চোখে ধোঁয়া দেখছি, হাত পা অবশ হয়ে আসছে—সেই শেষক্ষণে হঠাৎ বিদ্যুতের মত মনে হ'ল, এ তো আমি চাই নি, আমি বাঁচতে চাই। এই মুহূর্ত্ত এই স্পর্শ আমার অক্ষয় হোক, তাই আমি চেয়েছিলাম,—এত শীঘ্র সে ফুরিয়ে যাচ্ছে কেন? কে আমাকে টেনে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম, তুমি রাখ, জোর ক'রে আমায় ধ'রে রাখ, তোমার বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখ; আমায় বাঁচাও, বাঁচাও।

গলার স্বর ফুটল না।

আমার মুখে চোখে হয়তো সেই আর্ত্তি ফুটে উঠেছিল, ক্ষীণ—অতিক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম, সু, অমন করছ কেন?

তারপর আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ছুটে দোর খুলে সবাইকে চেঁচিয়ে ডাকলে। আর সেই মুহূর্ত্তে একলা শয্যার ওপরে আমি মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়লাম।

তোমার বুকে আমি মরতে চেয়েছিলাম। তোমার বুকে আমি মরতে পেলাম না।

[ ক্রমশ ]

# বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের উপক্রমণিকা

শ্রীসুকুমার সেন

বঙ্গজাতি হইতে দেশবাচক বঙ্গ নামের উৎপত্তি। বঙ্গ-জাতি তথা বঙ্গ-শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, তিনটি জাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং এই তিনটি জাতি হইতেছে পক্ষী, অর্থাৎ পক্ষিসদৃশ যাযাবর,—বঙ্গ, বগধ এবং চেরপাদ।

প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধা শ্চেরপাদাঃ। ২-১-১-৫।

ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে হটিতে হটিতে এই যাযাবর বঙ্গজাতি এখন যে অঞ্চলকে পূর্ব্ববঙ্গ বলা হয় সেই স্থানে বাস করিতে থাকে, এবং তাহা হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম হয় বঙ্গ। বর্ত্তমান সময়ে এই নামে সমগ্র বাঙ্গালা বুঝায় বটে, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও শুধু পূর্ব্ববঙ্গ বুঝাইতেই বঙ্গ-শব্দ ব্যবহৃত হইত। মেয়েলি ছড়ায় বলে—"তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে।" ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মধুসূদন লিখিয়াছেন—"অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে।"

রাঢ় ও সুহ্ম জাতির নাম হইতে পশ্চিমবঙ্গের নাম হয় রাঢ় ও সুহ্ম দেশ। রাঢ় ও সুহ্ম দেশের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় জৈন শাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে। সেখানে রাঢ় দেশের বজ্রভূমি ( "বজ্জভূমি" ) ও সুহ্ম ভূমি ("সুব্ভভূমি") সম্বন্ধে লেখা আছে যে, এখানে মহাবীর আসিয়া বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন; এখানকার শয়ন আসন ভোজন সবই কুৎসিত, লোকেরাও দুষ্ট, মহাবীরের প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল।[১]

বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্ম জাতি আর্য্যেতর ছিল বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃপক্ষে ইহারা যে আর্য্য ছিল, এমন কোনই প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায় না।

বাঙ্গালা দেশে আর্য্যদিগের উপনিবেশ প্রথম স্থাপিত হয় সম্ভবতঃ বরেন্দ্রভূমিতে এবং রাঢ়ের অঞ্চল-বিশেষে, প্রধানতঃ ভাগীরথী ও দামোদরের তীরভূমিতে। বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন নাম পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন। পুণ্ড্রও জাতিবাচক নাম, ইহার উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭-১৮) ব্রাত্যদিগের মধ্যে। এখনও পুঁড় বা পুঁড়ো নামে জাতি এই অনার্য্য পুণ্ড্রদিগের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় এই পুণ্ড্রজাতি আখের চাষে বিশেষ দক্ষ ছিল, এবং ইহাদিগের নাম হইতেই আখের নাম হইয়াছে পুঁড়, এবং এক জাতীয় দেশী আখের নাম "পুঁড়ী"। অথবা এমনও হইতে পারে, আখের প্রতিশব্দ ছিল 'পুণ্ড্র', পরে যাহারা আখের চাষ জাতি-ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা পুণ্ড্র নামে পরিচিত হয়। বরেন্দ্রভূমির নামান্তর গৌড়, ইহা যদি 'গুড়' শব্দজাত হয়, তবে

---

১ অহ দুচ্চর লাঢ়ং অচারী বজ্জভূমিং চ সুব্ভভূমিং চ। পন্তং সেজ্জং সেবিংসু আসনগাইং যেব পন্তাইং॥
লাঢ়েহিং তস্স্ বসগ্গা বহবে জাণবয়া লূসিংসু। অহ লুক্খদেসিএ ভত্তে কুক্কুরা তত্থ হিংসিংসু নিবইংসু॥
অপ্পে জনে নিবারেই লূসণএ সুণএ ডসমাণে। ছুচ্ছুক্ কারেন্তি আহন্তুং সমণং কুক্কুরা ডসন্তু ত্তি॥ ৯-৩-২, ৩, ৪॥

এখানেও আখ চাষের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু গৌড়-শব্দটি খুব সম্ভব গোন্দ জাতির নামের প্রাচীন রূপ হইতে আসিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরেও বহু স্থানে গোন্দ জাতির বাস ছিল; তাহা হইতেই "পঞ্চ গৌড়" দেশের উৎপত্তি। অনেকের মতে পাণিনি একটি সূত্রে বাঙ্গালা দেশের গৌড়পুরের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রটি এই—"অরিষ্ট গৌড় পূর্ব্বে চ" (৬-২-১০০), অর্থাৎ—অরিষ্ট ও গৌড় শব্দ পূর্ব্বপদ করিয়া পুর শব্দের সমাস হইলে পূর্ব্বপদ অন্ত্যোদাত্ত হইবে। কিন্তু এই গৌড়পুর যে পূর্ব্ব-ভারতে অবস্থিত ছিল না, তাহা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র হইতে জানা যাইতেছে— পুরে প্রাচাম্ ( ৬-২-৯৯ ), অর্থাৎ—প্রাচ্য দেশে ( বা প্রাচ্য দেশীয় বৈয়াকরণদিগের মতে ) পুর-শব্দ পরে রাখিয়া সমাস করিলে পূর্ব্বপদ অন্ত্যোদাত্ত হইবে। গৌড়পুর প্রাচ্য দেশে হইলে সূত্রটির কোন আবশ্যকই হইত না। আরও একটি কথা, যখন স্বরের ব্যবস্থা রহিয়াছে—তখন গৌড়পুর বৈদিক যুগের নগর বা গ্রাম বলিয়া ধরিতে হইবে এবং এই স্থানের সহিত পঞ্জাব অঞ্চলের আর্য্যেরা বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এই বিবেচনায় গৌড়পুরকে বাঙ্গালা দেশে টানিয়া আনা সঙ্গত হয় না।

আর্য্যেতর জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া বাঙ্গালা দেশে আগমন আর্য্যদিগের পক্ষে বহুদিন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। এ দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া কেহ স্ব-সমাজে গৃহীত হইত না। যাহারা রহিয়া যাইত তাহারা ব্রাত্য, নষ্ট বা পতিত বলিয়া গণ্য হইত। বৈদিক যুগে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে উপনিবিষ্ট আর্য্যের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই নগণ্য ছিল। ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপন মৌর্য্য সম্রাট্দিগের আমলেই আরম্ভ হয়। প্রথমে বরেন্দ্রভূমিতে এবং রাঢ়ের প্রত্যন্ত-ভূমিতে যাহারা উপনিবিষ্ট হয়, তাহাদের বেশির ভাগ ছিল জৈন মতাবলম্বী। জৈনমতের উৎপত্তি স্থান ও কেন্দ্র মগধ বরেন্দ্রভূমি হইতে সুদূরে ছিল না। দিব্যাবদানে আছে যে, অশোকের সময়ে "পুণ্ড্রবর্দ্ধন" জৈন ধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল।[১]

রাঢ় ও সুহ্মে অসভ্য জাতির প্রাচুর্য্য থাকায় এবং দেশও দুর্গম হওয়ায় এই অঞ্চলে জৈনমত বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। জৈনমতের পর বৌদ্ধমত এবং সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ্যমত বাঙ্গালা দেশে প্রাধান্য লাভ করে। রাঢ় ও বরেন্দ্রীতে আর্য্যসংস্কৃতি আসিবার অনেক কাল পরে, এই দুই স্থান হইতেই বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে ইহা বিস্তার লাভ করে। এই কারণে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পশ্চাৎপদ থাকায় "বঙ্গাল" বা "বাঙ্গাল" অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী আবহমান কাল হইতে উপহাসের উপাদান যোগাইয়া আসিতেছে।

১৫৯ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ও পাহাড়পুরের স্তূপমধ্য হইতে প্রাপ্ত অনুশাসন-খানি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও বরেন্দ্রীতে জৈনমতাবলম্বী শ্রমণ ও শ্রাবকের অসদ্ভাব ছিল না।[২] ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তাঁহার ভার্য্যা রামী তাঁহাদের স্বগ্রাম বটগোহালী-স্থিত "কাশিক-পঞ্চস্তূপনিকায়িক-নিগ্রর্ন্থ-শ্রমণাচার্য্য গুহনন্দি-শিষ্যপ্রশিষ্যাধিষ্ঠিতবিহারে" ভগবান্ অর্হৎদিগের

১। দিব্যাবদান পৃ. ৪২৭।

২। Epigraphia Indica, XX 5; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩৯, পৃ. ১৩৯-১৫২।

উদ্দেশে গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপ প্রভৃতি পূজোপকরণ ও তলবাট নিমিত্ত দেড় কুল্যবাপ ক্ষেত্র অক্ষয়নীবী রূপে ( অর্থাৎ আটকিয়া হিসাবে ) দান করিবার উদ্দেশ্যে রাজকর্ম্মচারিগণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনস্থিত উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ ও স্থানীয় শাসন-পরিষৎ যে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই এই অনুশাসনটিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই অনুশাসনখানি হইতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নামের প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি। ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তাঁহার স্ত্রী রামী ছাড়া কয়েকজন "পুস্তপাল" অর্থাৎ রেকড-কীপারের নাম পাওয়া যায়—দিবাকর নন্দী ( "প্রথম পুস্তপাল" ), ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশি-নন্দী। এখনকার দিনেও এই সকল নাম বাঙ্গালার বাহিরে মিলে না।

এই বটগোহালী-গ্রামে দ্বাদশ শতকেও একটি বৌদ্ধবিহার অবস্থিত ছিল। তখন ইহা সোমপুরবিহার নামেই পরিচিত ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত নালন্দায় প্রাপ্ত বিপুলশ্রীমিত্রের অনুশাসনে "বঙ্গাল" সেনা কর্ত্তৃক এই বিহারের ধ্বংস এবং পরে বিপুলশ্রীমিত্র কর্ত্তৃক সংস্কারের উল্লেখ আছে।[১] বাঙ্গাল সৈনিকেরা বিহারে আগুন লাগাইয়া দেয়, তাহাতে গৃহাদির সহিত শ্রমণ করুণাশ্রীমিত্রও বিনষ্ট হন। করুণাশ্রীমিত্রের শিষ্য মৈত্রশ্রীমিত্র, তৎ-শিষ্য অশোকশ্রীমিত্র এবং তৎশিষ্য বিপুলশ্রীমিত্র, যিনি অনুশাসনটির কর্ত্তা। অনুশাসনের দ্বিতীয় শ্লোক নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীমৎসোমপুরে বভূব করুণাশ্রীমিত্রনামা যতিঃ কারুণ্যাদ্ গুণসম্পদো হিতসুখাধানাদপি প্রাণিনাম্।
যো বঙ্গালবলৈরুপেত্য দহনক্ষেপাজ্জ্বলত্যালয়ে সংলগ্নশ্চরণারবিন্দযুগলে বুদ্ধস্য যাতো দিবম্॥

শ্রীমৎসোমপুরে করুণাশ্রীমিত্র নামক যতি ছিলেন, যিনি কারুণ্যগুণসম্পদ ও প্রাণিদিগের হিতসুখে অবিহিত ছিলেন ( বলিয়া সার্থকনামা হইয়াছিলেন ), এবং বাঙ্গাল সৈন্য আসিয়া অগ্নি সংযোগ করায় বিহার প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে যিনি বুদ্ধের চরণারবিন্দযুগলে সংলগ্ন হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

করুণাশ্রীমিত্র সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এই "বঙ্গাল" সেনা কি তাহা হইলে হরিবর্ম্মদেবের অথবা ভোজবর্ম্মদেবের ?

গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যমত এদেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে, এবং হয়তো এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ মহাযান মতের প্রাদুর্ভাব হয়। জৈন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই তিন মত সমকালে প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গালা দেশে যে কখনও ধর্ম্মবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত অনুশাসনে দেখিতেছি, ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা বটগোহালী গ্রামের জৈনবিহারে অর্হৎদিগের পূজা চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভূমি দান করিতেছেন। পালরাজগণ "পরমসৌগত" অর্থাৎ বৌদ্ধমতাশ্রিত হইলেও ব্রাহ্মণ্যমতের পোষকতা করিতেন। এই বংশের শেষ সম্রাট্ মদনপাল দেবের মহিষী চিত্রমতিকা "বেদব্যাসপ্রোক্ত-প্রপাঠিত-মহাভারত-সমুৎসর্গিত-দক্ষিণা" স্বরূপে চম্পাহিট্টি-গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বটেশ্বর স্বামীকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপির চন্দ্রবর্ম্মার কথা ছাড়িয়া দিলে প্রথম বাঙ্গালী স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন মল্লসারুল অনুশাসনের গোপ[ চন্দ্র ] এবং শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। শশাঙ্কগুপ্ত সম্রাট্‌দিগের বংশোদ্ভূত ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইঁহার রাজত্ব বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই,

১। Epigraphia Indica, XXI পৃ. ৯৭-১০১।

প্রকৃতপক্ষে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবই বাঙ্গালা দেশকে প্রথম স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন। ইঁহাদের আমলেই বাঙ্গালী নৃপতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, এবং এই সময়েই বাঙ্গালা দেশ আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বিশিষ্ট দেশ হিসাবে প্রথম পরিগণিত হইয়াছিল। পাল নৃপতিরা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্য মতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না। ইঁহাদের মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী ছিলেন। পালবংশের পরবর্ত্তী রাজদিগের মধ্যে বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু এই স্থানে ইঁহাদের পরেই যে বর্ম্ম রাজারা আসেন, তাঁহারা পুরাপুরি ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রিতেরা পঞ্চোপাসক ছিলেন; ইঁহাদের ইষ্টদেবতা ছিলেন বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী। বিষ্ণু উপাসনার প্রথম উল্লেখ পাইতেছি চন্দ্রবর্ম্মার শুশুনিয়া লিপিতে। সেনরাজদিগের উপাস্য দেবতা ছিলেন শিব। কিন্তু লক্ষ্মণসেনদেবের সকল অনুশাসনই "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনদেব, কেশবসেন ইত্যাদি সেনবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ধোয়ীর 'পবনদূতে' আছে যে, সেনবংশীয় ভূপতি ( লক্ষ্মণসেনদেব ? ) সুহ্ম দেশের নিকটে মুরারি মূর্ত্তিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—

তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মাদ্ বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ ॥ ২৮ ॥

লক্ষ্মণসেনদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে খোদিত একটি চণ্ডীমূর্ত্তি ঢাকায় পাওয়া গিয়াছে। দেবী চতুর্ভুজা, সিংহোপরি উপবিষ্টা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও জলপাত্র এবং বাম উর্দ্ধ হস্তে কুঠার এবং বাম নিম্ন হস্তে বরাভয় মুদ্রা, তুই পাশে তুই সখী। সম্মুখে উপবিষ্ট তিনজন অনুচর বা ভক্ত; তুই হস্তী শুঁড়ে কলস লইয়া দেবীকে অভিষেক করিতেছে। মল্লিকার্জ্জুন সূরি নামক একজন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ ১১০০ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লল্লাচার্য্য প্রণীত শিষ্যধী মহাতন্ত্রের একটি টীকা রচনা করেন।[১] এই টীকার মঙ্গলাচরণে চণ্ডিকার বন্দনা করা হইয়াছে—

শ্রীমৎ সুরাসুরারাধ্যচরণাম্বুরুহদ্বয়াম্।
চরাচরজগদ্ধাত্রীং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥

দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখি বাঙ্গালা দেশে বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতারে পরিণত হইয়াছেন; জয়দেব বিষ্ণুর দশাবতার বন্দনায় বুদ্ধকে ধরিয়াছেন।

আর্য্যাবর্ত্তের ধারার অনুসরণে বাঙ্গালা দেশেও বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাব ছিল না। অনুশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে, গুপ্ত পাল ও সেন নৃপতিরা "মধ্যদেশবিনির্গত" বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়া বাঙ্গালা দেশে, রাঢ়ে ও গৌড়ে, বাস করাইয়াছিলেন। এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসিয়াও কিছুকাল যাবৎ বেদচর্চ্চা ভুলেন নাই। কিন্তু মধ্যদেশ হইতে সুদূর এবং

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪০, পৃ. ৮৩-৯৪।

আচারব্যবহারে অনেকটা স্বতন্ত্র বলিয়া এদেশে বেদচর্চ্চা পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, বরং চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া শেষে একেবারে লোপ পাইয়া গেল। বৈদিক গ্রন্থবিশেষের দুই একটি টীকা বাঙ্গালা দেশে রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ মহাযান এবং তান্ত্রিক মতের আলোচনার বিশেষ উর্ব্বর ক্ষেত্র ছিল বাঙ্গালা দেশ। সাধারণ বা ব্রাহ্মণ্য মতের দর্শনাদির আলোচনাতেও সে যুগের বাঙ্গালী মনীষী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠি—বর্ত্তমানে হাওড়া জেলা ভুরশুট—গ্রামনিবাসী মহাপণ্ডিত শ্রীধর ৯১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়কন্দলী নামে বৈশেষিক সূত্রের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের একটি টীকা রচনা করেন। এই বইটি প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। উত্তরকালে বাঙ্গালীর মনীষা নব্যন্যায়চর্চ্চায় যে অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তাহার সূত্রপাত পাইতেছি শ্রীধরের ন্যায়কন্দলীতে। সুবিখ্যাত পাণ্ডুভূমি বিহারের প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণরাঢ়ের অধীশ্বর কায়স্থকুলতিলক পাণ্ডুদাস শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ—দুই মতের প্রতি পাণ্ডুদাস সমান পক্ষপাত দেখাইতেন।

ব্যাকরণ-শাস্ত্রের চর্চ্চায় বাঙ্গালী মনীষীরা আবহমান কাল ধরিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তি, জিনেন্দ্রবুদ্ধির ন্যাস ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অভিধান অথবা অভিধানের টীকা রচনায়ও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব সামান্য নহে। এ বিষয়ে বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বানন্দের বিরচিত অমরকোষের টীকা—টীকাসর্ব্বস্বে—প্রায় তিন শতাধিক সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ বহন করিতেছে বলিয়া এই শব্দগুলি ভাষাতাত্ত্বিকের নিকট সবিশেষ মূল্যবান।

যাহারা বাঙ্গালা দেশে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকে, এমন আর্য্যভাষীর দ্বারাই আর্য্য ভাষা বাঙ্গালা দেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। তখনকার দিনে যাহারা দেশের আসল বাসিন্দা ছিল, তাহারা হয় দ্রাবিড়, নয় অস্ট্রিক (Austric) গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা বলিত। এই সব ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু স্থান ও গ্রাম এবং অবশ্যব্যবহার্য্য বস্তু ইত্যাদির নাম হইতে এই ভাষার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের আমল হইতেই বাঙ্গালা দেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে আর্য্যভাষিদিগের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেই ভাষায় আচারব্যবহার ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালা দেশ আর্য্যাবর্ত্তের একতম অংশে পরিণত হইল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই বিস্তর অনার্য্যভাষী হয় আর্য্যভাষী হইয়া গেল, নয় ক্রমাগত কোণঠেসা হইয়া শেষে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পার্ব্বত্য, আরণ্য, জনবিরল স্থানে বসতি করিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে চীনীয় পর্য্যটক হিউএন্-ৎসাঙ্ যখন বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা শুনিয়াছিলেন। হিউএন্-ৎসাঙের পর্য্যবেক্ষণ অভ্রান্ত হইলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই আর্য্যভাষা দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাকে বাঙ্গালা দেশের কেন্দ্রীয় স্থান সমূহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া বাঙ্গালা দেশের জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আর্য্যভাষীরা যখন বাঙ্গালা দেশে উপনিবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের কথ্য আর্য্যভাষা সংস্কৃত রূপ ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে। অঙ্গ ও মগধ বাঙ্গালার নিকটতম প্রদেশ, এবং বাঙ্গালা

দেশে উপনিবেশকারিদিগের অধিকাংশ এই দুই অঞ্চল হইতেই আসিয়াছিল। অঙ্গ ও মগধে যে প্রাকৃত ভাষা বলা হইত, তাহার একটি বিশিষ্ট প্রাদেশিক রূপ ছিল। এই প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাকৃতকে মোটামুটি পূর্ব্বী প্রাকৃত বলা হয়। বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিকদিগের কথিত যে মাগধী ভাষা, তাহা কতকটা এই পূর্ব্বী প্রাকৃতের ছায়াবহ বটে। বাঙ্গালা দেশে যে আর্য্যভাষা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা এই পূর্ব্বী প্রাকৃতেরই প্রকারভেদমাত্র।

কথ্য ভাষা প্রাকৃত হইলেও পোষাকী ভাষা অর্থাৎ সাহিত্য ও রাজকার্য্যের ভাষা, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রায় যেমন সেইরূপ বাঙ্গালা দেশেও, সংস্কৃতই রহিয়া গেল। এই হেতু বাঙ্গালা দেশে সৃষ্ট সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা পুরানো নিদর্শনগুলি সবই সংস্কৃতে রচিত।

বাঙ্গালা দেশে প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বী প্রাকৃত ক্রমশঃ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া বিবর্ত্তনবশে বাঙ্গালা ভাষা রূপে পরিণত হয় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯৫০ সালের দিকে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা উদ্ভবের বহুকাল পর অবধি সংস্কৃতই, সাহিত্যের একমাত্র না হউক, প্রধান বাহন রহিয়া গেল। বাঙ্গালা সাহিত্যের উপক্রমণিকা হিসাবে বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অনুশাসন ও কাব্য প্রভৃতির আলোচনা অপরিহার্য্য।

অদ্যাবধি বাঙ্গালা দেশে যে সকল প্রত্নলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে কিছুকাল পূর্ব্বে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পূর্ব্বী প্রাকৃতে রচিত লিপি বা অনুশাসনটি। এটি মৌর্য্যযুগে প্রচলিত ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ, সুতরাং ইহার রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন সময়ে। লিপিটি অক্ষত না থাকায় সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। অনুশাসনটির পাঠ শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

নেন স[ং]ব[ং]গীয়[া]নং [গলদনস]/ছুমদিন [-মহা-]
মাতে/সুলখিতে পুডনগলতে/এ[ত]ং
[নি]বহিপয়িসতি/সংব[ং]গিয়ানং [চ দি]নে [তথা]
[বী]নিয়ং/নিবহিসতি/দ[ং]গ[া]তিয়া[ি]য়[ে]ক[ে]দ[বা-]
[তিয়ায়ি]কসি/সুঅতিয়ায়িক[সি]পি/গংড[কেহি]
[ধানিয়ি]কেহি এস কোঠাগালে কোসং [ভর-]
[নীয়ে]

এই বিকৃত পাঠ হইতে যতটুকু বোধগম্য হয়, তাহা হইতেছে "পুডনগল" বা "পুণ্ড" (দিব্যাবদান) নগর অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ।

তাহার পর বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ সংস্কৃতে রচিত চন্দ্রবর্ম্মার ক্ষুদ্র লিপি। এই লিপি গুপ্তযুগের প্রাচীনতম অক্ষরে উৎকীর্ণ। ইহা হইতে প্রত্নলিপিবিশারদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রবর্ম্মা "চক্রস্বামী" অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

গুপ্তসম্রাট্‌দিগের আমল হইতেই বাঙ্গালা দেশ একচ্ছত্র রাজার অধীনে আসে। গুপ্ত-সম্রাট্‌দিগের সামন্ত প্রাদেশিক-শাসনকর্ত্তাদিগের প্রদত্ত কয়েকটি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যে দুইটি প্রাচীনতম, সে দুইটি সম্রাট্ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত যে অনুশাসনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত এই দুইটি অনুশাসনের প্রায় সমসাময়িক। এই তিনটি অনুশাসনেই বাঙ্গালা দেশে কাব্যচর্চ্চার প্রাচীনতম নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম অনুশাসন হইতেছে গোপ[চন্দ্রে]র মহাসামন্ত বিজয়সেনের প্রদত্ত মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রানুশাসন। এই অনুশাসনের কাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

তাহার পর অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশের অভ্যুদয়। এই বংশের রাজত্ব একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং এই কয় শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহণ করে। পালসম্রাট্‌গণের অনেকগুলি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে যেটি প্রাচীনতম সেটি বংশকর্ত্তা গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের ৩২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনটির রচনারীতি সুন্দর। চতুর্থ শ্লোকটি হইতে জানা যায় যে, গোপালদেব প্রজাগণ অথবা সামন্তচক্র কর্ত্তৃক অধিরাজ মনোনীত হইয়াছিলেন—

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভি র্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশি র্দিশামাশয়ে শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥

তাঁহার ( অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত বপ্যটের ) পুত্র নৃপতিচূড়ামণি শ্রীগোপাল মাৎস্যন্যায় ( অর্থাৎ, দেশের অরাজক অবস্থা ) দূরীভূত করিবার জন্য প্রজাবর্গের দ্বারা রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ কারিত হইয়াছিলেন। জ্যোৎস্নাতিভারশ্রীযুক্ত ধবলতার দ্বারা পৌর্ণমাসরজনী দিক্‌দিগন্তে বিস্তৃত ইঁহার শাশ্বতযশোরাশির কিঞ্চিৎমাত্র অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়।

বাঙ্গালী কবির প্রথম মহাকাব্য, অভিনন্দের রামচরিত[১] অষ্টম শতাব্দীতে ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যকালে রচিত হইয়াছিল। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধর্ম্মপালদেবের পুত্র যুবরাজ দেবপাল। অভিনন্দ এইভাবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা যুবরাজের নাম করিয়াছেন—

এতে নিকামসরসস্য জয়ন্তি পাদাঃ শ্রীহারবর্ষযুবরাজমহীতলেন্দোঃ।
যৈ র্দ্বাদশার্ককিরণোৎকরদুর্নিবারঃ স্পষ্টোঽভিনন্দকুমুদস্য মহাবিকাসঃ ॥ পৃ. ১০, ৫৫ ॥

মহীতলের ইন্দুস্বরূপ যুবরাজ শ্রীহারবর্ষের নিতান্ত সরস অনুগ্রহের জয় হউক, যে অনুগ্রহ দ্বাদশ সূর্য্যের কিরণের পক্ষেও অসম্ভব কার্য্য, অভিনন্দরূপ কুমুদের মহাবিকাশ, সাধিত করিয়াছে।

কিমিন্দুনা চন্দনবারিণাপি কিং কিমব্জকন্দৈরভিনন্দবৎসলঃ।
বিচিন্ত্যতামান্তরতাপশান্তয়ে স কেবলং বিক্রমশীলনন্দনঃ ॥ পৃ. ৩৯, ৬৩ ॥

ইন্দু, চন্দনবারি, মৃণালখণ্ড ইত্যাদিতে কি হইবে? হৃদয়ের তাপ শান্তির জন্য কেবল অভিনন্দবৎসল বিক্রমশীলের পুত্রকেই অনুসন্ধান করা হউক!

পালান্বয়াম্বুজবনৈকবিরোচনায় তস্মৈ নমোঽস্তু যুবরাজনরেশ্বরায়।
কোটিপ্রদানঘটিতোজ্জ্বলকীর্ত্তিমূর্ত্তি র্যেনামরত্বপদবীং গমিতোঽভিনন্দঃ ॥ পৃ. ৬৩, ১৩০, ৩৩১ ॥

---

১। গায়কবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ( ৪৬ ) প্রকাশিত।

উমার তপস্যা। কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও
শ্রীমঙ্গল ভাস্কর কর্ত্তৃক খোদিত

[ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

শিব, উমা ও নন্দী। কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত ও শ্রীমঙ্গল ভাস্কর কর্ত্তৃক খোদিত

[ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

পালবংশ রূপ পদ্মবনের বিকাশকারী যে নরেশ্বর যুবরাজ তাঁহাকে নমস্কার, যিনি কোটি কোটি মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক কীর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়া অভিনন্দকে অমরত্ব লাভ করাইয়াছেন!

শ্রীধর্ম্মপালকুলকৈরবকাননেন্দু রাজা বিলাসকৃতিপঙ্কজিনীবিবস্বান্।
সর্ব্বাভিরামগুণপত্ররথব্রজৈকনীড়দ্রুমো বিজয়তে যুবরাজদেবঃ॥ পৃ. ২৫৩॥

শ্রীধর্ম্মপালকুল রূপ কুমুদবনের ইন্দু, বিলাস (অর্থাৎ অভিনন্দ) কবির কাব্যপঙ্কজের ভানু, সকল অভিরামগুণ রূপ পক্ষিবৃন্দের একমাত্র নীড়দ্রুম, এমন যে যুবরাজ দেব, তাঁহার জয় হউক!

অভিনন্দ দুই জন সমসাময়িক কবি বা পণ্ডিতের নাম করিয়াছেন—বিষ্ণু ও বনমালী। ইঁহারা বোধ হয় কবির সমালোচক ছিলেন।

এষোঽস্ম্যহং নিজবচস্সু চিরাদিদানীং নিঃসাধ্বসঃ কবিসহস্রসমাগমেঽপি।
শ্রীহারবর্ষনরলোকপতেঃ পুরস্তাদ্ বিস্তারিবিষ্ণুবনমালিবিচারিতেষু॥ পৃ. ৮১॥

সহস্র কবির সমাগম হইলেও শ্রীহারবর্ষ নৃপতির সম্মুখে বনমালী ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিস্তারিত বিচারের মধ্যেও আমি এখন নিজ কাব্য-বিষয়ে ভয়হীন হইয়াছি।

অভিনন্দের পিতা শতানন্দও কবি ছিলেন। পিতা-পুত্রের রচিত কয়েকটি শ্লোক সদুক্তি-কর্ণামৃত ও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এই দুইটি প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংগ্রহ-গ্রন্থের তো কথাই নাই। অভিনন্দের উপাধি ছিল আর্য্যাবিলাস। পুষ্পিকায় অভিনন্দ নিজেকে "বিলাস" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনন্দের কবিখ্যাতি বাঙ্গালার সীমানা ছাড়াইয়া সমগ্র উত্তরাপথে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে কবি সোড্ঢল অভিনন্দকে কালিদাস, বাণ ও বাক্‌পতিরাজের সহিত তুলনা করিয়া "বাগীশ্বর" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

বাগীশ্বরং হন্ত ভজেঽভিনন্দমর্থেশ্বরং বাক্‌পতিরাজমীড়ে।
রসেশ্বরং স্তৌমি চ কালিদাসং বাণং তু সর্ব্বেশ্বরমানতোঽস্মি॥

আর এক কবি ছিলেন অভিনন্দ, ইঁহার পিতার নাম জয়ন্ত ভট্ট। বলা বাহুল্য, ইঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন না। দ্বিতীয় কবির সঙ্গে পৃথক করিবার জন্য প্রথম কবিকে অনেক স্থলে "গৌড়াভিনন্দ" অর্থাৎ বাঙ্গালী অভিনন্দ বলা হইয়াছে।

অভিনন্দের রামচরিত কাব্যের ছত্রিশ সর্গ অবধি পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার পরে কবি আর লিখেন নাই। বাঙ্গালা দেশের এই প্রাচীনতম রামায়ণ কাব্যে বাঙ্গালা রামায়ণের একটি বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে—ইহাতেও দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবশ্য রামচন্দ্রের দ্বারায় নয়, হনুমানের মুখ দিয়া।

নারায়ণপালদেবের মন্ত্রী ভট্ট গুরবের প্রশস্তি তৎপ্রতিষ্ঠিত গরুড় স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। প্রশস্তিটিকে স্বচ্ছন্দে ২৮ শ্লোকাত্মক একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য বলা যাইতে পারে। রামপালদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালদেবের মন্ত্রী সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত[২] খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

---

১। ঐ ভূমিকা, পৃ. ১৪।

২। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রচিত হয়। এই কাব্যটিতে দ্ব্যর্থের সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র এবং রামপালদেব উভয়ের চরিত্র একসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটির রচনা অতিশয় দুরূহ। প্রথম চারিটি সর্গের কবিকৃত টীকা পাওয়া গিয়াছে, সেই কারণে এই অংশটুকু সুগম হওয়াতে ইহা হইতে ইতিহাসের মাল-মশলা অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। রামচরিতের আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম অক্ষয়-কীর্ত্তি।

হরিবর্ম্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন উত্তররাঢ়ের সিদ্ধল-গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ভট্ট ভবদেব। ইহার আবির্ভাব-কাল ১০২৫ হইতে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ভবদেব একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ইহার রচিত দুইটি স্মৃতি-গ্রন্থ এখনও চলিতেছে—কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি ( বা দশকর্ম্মপদ্ধতি ) এবং প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ। বেদ বেদান্ত মীমাংসা জ্যোতিষ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রেও যেমন, রাজনীতি এবং শস্ত্র-ব্যবহারেও ইহার তুল্যরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভুবনেশ্বরে ইনি যে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার গাত্রে ইহার প্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বাচস্পতি কবির রচিত এই প্রশস্তি ৩৪ শ্লোকাত্মক একটি চমৎকার কাব্য। প্রশস্তির মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি এই—

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতমস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুম্ভপত্রলেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে 'অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয়' এই বলিয়া বাগ্‌দেবতা যাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এমন হরি তোমাদিগের শ্রীর কারণ হউন!

এই শ্লোকটিতে ভবদেবের পূর্ত্তকীর্ত্তির বর্ণনা করা হইয়াছে—

রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎপ্রাণাশয়প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-
বক্ত্রাব্জপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ॥ ২৬॥

রাঢ়দেশে জলহীন জাঙ্গলপথযুক্ত গ্রামোপকণ্ঠসীমায় শ্রমার্ত্ত পান্থদিগের মনপ্রাণের প্রীতিদায়ক জলাশয় ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যে জলাশয়ের সুপরিসর বক্ষে স্নানার্থিনী কুলকামিনীগণের প্রতিবিম্বিত মুখারবিন্দ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মধুপবৃন্দ পদ্মবন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে।

পুষ্পিকা শ্লোকটি হইতে জানা যায় যে কবি ভবদেব ভট্টের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ শ্রীবাচস্পতিকবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ।
আকল্পং শুচিসুরধামমূর্ত্তিকীর্ত্তেরধ্যাস্তাং জঘনমিব সুবর্ণকাঞ্চী॥

ইহার প্রিয়সুহৃদ দ্বিজাগ্রগণ্য শ্রীবাচস্পতি কবি কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি প্রণীত হইল। এই পবিত্র দেবমন্দির স্বরূপিণী কীর্ত্তির জঘনদেশে সুবর্ণকাঞ্চীর মত ( উৎকীর্ণ ) এই প্রশস্তি কল্পান্ত পর্য্যন্ত বিরাজিত রহুক!

বর্ম্ম রাজারা ব্রাহ্মণ-মতাবলম্বী ছিলেন। ইহাদের উপাস্য ছিল বিষ্ণু। বেলাব-গ্রামে প্রাপ্ত ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ আছে—

সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রাদুর্ব্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ॥ ৪॥

সেই পূজনীয় পুরুষ ভূমিভারোদ্ধারকারী অংশাবতাররূপে গোপীশতকেলিকার মহাভারতনাট্যের সূত্রধার কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দেওপাড়ায় প্রাপ্ত উমাপতি ধর বিরচিত বিজয়সেনদেবের প্রশস্তিটিও ৩৬ শ্লোকাত্মক সুন্দর খণ্ডকাব্য। উমাপতি ধর দীর্ঘজীবী ছিলেন। কেন না, বিজয়সেনদেবের পৌত্র লক্ষ্মণসেনদেবের সভাসদরূপেও ইঁহার উল্লেখ দেখা যায়। গীতগোবিন্দের একটি শ্লোকে জয়দেবের সহিত উমাপতি ধর, শরণ, গোবর্দ্ধন আচার্য্য ও ধোয়ী বা ধোয়ীক এই চারিজন কবি সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। গোবর্দ্ধন আচার্য্যের আর্য্যাসপ্তশতী এবং ধোয়ীর পবনদূত কাব্যহিসাবে নিকৃষ্ট নহে। আর জয়দেব তো বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি মূল্যবান অলঙ্কার। জয়দেবের পদগুলি লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসের সূত্রপাত। জয়দেবের মত আর কোন কবি এতাবৎকাল ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

আনুলিয়া, গোবিন্দপুর, তর্পণদীঘি এবং শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনগুলির মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি ধান্যোপজীবী বাঙ্গালীর জাতীয় মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শ্লোকটি এই—

বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতে র্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে ভূয়াদ্‌বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥

ফণিপতির মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎস্বরূপ, বালেন্দু ইন্দ্রধনুস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিণী বারিস্বরূপ, শ্বেতকপালমালা বলাকা-স্বরূপ, যাহা ধ্যানাভ্যাসরূপ সমীরণের দ্বারা পরিপূর্ণ, শম্ভুর এমন কপর্দ্দ ( অর্থাৎ জটাজূটরূপ ) অম্বুদ তোমাদের শ্রেয়ঃ শস্যের অঙ্কুরোদ্‌গমের কারণ হউক!

লক্ষ্মণসেনদেবের "মহাসামন্তচূড়ামণি" বটুদাসের পুত্র "মহামাণ্ডলিক" শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১২০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত নামে একটি শ্লোকসংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহাতে জয়দেব, উমাপতি ধর, শরণ, গোবর্দ্ধন আচার্য্য, ধোয়ীক, লক্ষ্মণসেনদেব, কেশবসেনদেব ও যুবরাজ দিবাকর ব্যতীত আরও অনেক বাঙ্গালী কবির রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কতক কবির নামের সঙ্গে তাঁহাদের "গাঁই" বা বাসগ্রামের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইঁহারা নিঃসংশয় বাঙ্গালী ছিলেন। যেমন—তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, ভট্টপালীয় ( বা ভট্টশালীয় ) পীতাম্বর, কেশরকোলীয় (বা কেশরকোণীয়) নাথোক, তালহড়ীয় রক্ষ, রত্নমালীয় পুণ্ড্রোক, গোতিথীয় দিবাকর, কেন্দ্রনীল নারায়ণ, ভবগ্রামীণ বাথোক, করঞ্জ ধনঞ্জয়, করঞ্জ মহাদেব, করঞ্জ যোগেশ্বর। কতকগুলি কবির নাম উপাধি ও জাতি হইতে বাঙ্গালী বলিয়া জানা যায়। যেমন—কেবর্ত্ত পপীপ, কালিদাস নন্দী, তরণি নন্দী, রুদ্র নন্দী, সাঙ্গ নন্দী, ত্রিপুরারি পাল, দিবাকর দত্ত, লঙ্গ দত্ত, বৈদ্য জীবদাস, গদাধর নাথ, বাসুদেব সেন ইত্যাদি। এক অজ্ঞাতনামা বাঙ্গাল কবির ( "বঙ্গালস্য" ) দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।[২]

---

১। মোতীলাল বনারসী দাস কর্ত্তৃক লাহোর হইতে প্রকাশিত।

২। ২-৭০-৪ ; ৫-৩১-২।

চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী নসিরাবাদ গ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত দামোদরদেবের প্রশস্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও কাব্যহিসাবে মন্দ নহে। ইহাতে মাত্র এগারটি শ্লোক আছে। মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

দেবি প্রাতরবেহি নন্দনবনান্মন্দঃ কদম্বানিলো
বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতিকৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী।
তৎকালস্খলদঙ্গভঙ্গিমচলামালিঙ্গ্য লক্ষ্মীং বলাদ্
আলোলাননবিম্বচুম্বনপরঃ প্রীণাতু দামোদরঃ॥

'দেবি, প্রাতঃকাল হইয়াছে দেখ, নন্দনবন হইতে কদম্বানিল প্রবাহিত হইতেছে, শশীর কিরণ লুপ্ত হইয়াছে' ইত্যাকার আলাপ করিয়া কৌতূহলবশে তৎকাল-( অর্থাৎ শয্যোত্থান )-উচিত অঙ্গভঙ্গের জন্য স্খলৎচরণা লক্ষ্মীকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার আলোল আননবিম্বচুম্বনপরায়ণ দামোদর প্রীত হউন!

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা হিসাবে প্রশস্তিটি বিশেষ মূল্যবান।

---

# আধুনিক ইংরেজী কবিতা

"No one could be seriously interested in the great bulk of the verse that is culled and offered to us as the fine flower of modern poetry. For the most part it is not so much bad as dead—it was never alive. The words that lie there arranged on the page have no roots : the writer himself can never have been more than superficially interested in them. Even such genuine poetry as the anthologies of modern verse do contain is apt, by its kind and quality, to suggest that the present age does not favour the growth of poets. A study of the latter end of *The Oxford Book of Victorian Verse* leads to the conclusion that something has been wrong for forty or fifty years at the least."

—F. R. Leavis, 1932

[ যে রাশীকৃত পদ্য বাছাই করিয়া আধুনিক কবিতার উৎকৃষ্ট নমুনা স্বরূপ আমাদিগের নিকট ধরা হইতেছে, সেগুলি লইয়া কেহই বিশেষ মাথা ঘামাইবে না। কারণ, এগুলির অধিকাংশই মন্দ বলিয়া নয়, প্রাণহীন বলিয়াই পরিত্যজ্য—এগুলি কোনও কালেই জীবন্ত ছিল না। কাগজের পৃষ্ঠায় যে সকল শব্দ [ কবিতাকারে ] সজ্জিত থাকে, তাহাদের কোনই মূল নাই : লেখক নিজেও কোনকালে অন্তরের মধ্যে গভীরভাগে সেগুলি প্রয়োগের তাগিদ অনুভব করেন নাই। আধুনিক পদ্যের সঙ্কলন-গ্রন্থসমূহে সত্যকার কাব্য যতটুকু, তাহার শ্রেণী ও গুণ বিচারে এই ধারণাই জন্মে যে, বর্ত্তমান যুগ কবিদের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। 'দি অক্সফোর্ড বুক অব ভিক্টোরিয়ান ভার্স' পুস্তকের শেষাংশ অধ্যয়নে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা এই যে, অন্তত গত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কিছু একটা গলদ ঘটিয়াছে। ]

## অপরাধী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে,
ক্ষমা তুমি করিও আমাকে।
ফুরালো দিনের আলো, পথ যে চিনি নে ভালো,
কারা যে পিছন হতে ডাকে!
নয়নে ঘনায় ঘুমঘোর।
অপরাধ ক্ষমা ক'র মোর।

গুরু গুরু ডাকিতেছে দেয়া।
দূরে কাছে জ্বলিছে আলেয়া।
আঁধারে ভুলেছি দিক, কি যে ভুল, কি যে ঠিক,—
আর তো চলে না চিনে নে'য়া।
অবসাদে ভেঙে পড়ে দেহ।
মা, মোরে এবার ছুটি দেহ।

সে কথা আজিও মনে জাগে,
একদিন বহুবর্ষ আগে
স্বপ্নে হেরি ম্লানমুখ সব দুঃখ সব সুখ
ভুলেছিনু তব অনুরাগে।
বলেছিনু, 'যা হবার হোক,
মুছাব মায়ের অশ্রুচোখ।'

কোথা হতে কেমনে না জানি
শুনিলাম আবাহন-বাণী।
"সময় এসেছে কাছে, তোর মুখ চেয়ে আছে
সর্ব্বহারা রাজরাজেন্দ্রাণী।"
সেই হতে অন্তরের তলে
অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলে।

সেইদিন ছেড়েছিনু ঘর।
কতদিন গেছে তারপর!
কত বর্ষা বজ্রাঘাত! কত অন্ধ অমারাত!
ক্ষররৌদ্র কত দ্বিপ্রহর!
শ্রান্তদেহে আজ মনে হয়,
যাত্রা বুঝি ফুরাবার নয়।

ঘনাইছে রাত্রি-অন্ধকার;
কেহ নাই পথ দেখাবার।
চারিদিকে কাড়াকাড়ি, যে যাহার তাড়াতাড়ি
খুঁজিছে আশ্রয় আপনার।
দিকে দিকে খুলি ছদ্মবেশ
শিকার খুঁজিছে হিংসা-দ্বেষ।

দীর্ঘ পথ দিগন্তে বিলীন,
সমুখে পড়িয়া সীমাহীন।
দীপ নিবে গেছে ঝড়ে, অন্ধকার চরাচরে
স্মৃতির আলোকে দেখি ক্ষীণ—
ভুলে আসা কাহাদের মুখ,
পথপাশে উৎসুক উন্মুখ।

কেন যেন আজ পড়ে মনে,
সন্ধ্যাদীপ জ্বলে বাতায়নে!
কলকণ্ঠে কার হাসি চন্দ্রালোকে আসে ভাসি
রজনীগন্ধার গন্ধ সনে!
পুষ্পিত পিয়ালকুঞ্জ-ছায়
পাপিয়া পঞ্চম সুরে গায়।

জীবনের প্রভাতবেলায়
ছেড়ে যারে এসেছি হেলায়,
মন হতে একেবারে মুছে ফেলেছিনু যারে,
শ্রান্তদেহ আজ তারে চায়।
যাহারে করেছি অস্বীকার।
পথে আজি আমন্ত্রণ তার।

হয়তো বা তন্দ্রাতুর চোখে
ভুল আমি দেখিতেছি ওকে।
রাত্রি নাহি হতে শেষ ঘুচে যাবে স্বপ্নলেশ,
হয়তো বা প্রভাত-আলোকে
মিলাবে সে মায়াবিনী আলো।
তবু আজ সে মোরে ভুলালো।

হে দেবি, তোমার সিংহদ্বার
নাহি জানি কতদূরে আর।
নিষ্ঠুর তিমির-রাতে গেছে সেথা উল্কা-হাতে
যাত্রী শুধু জানি বারংবার।
তাহাদের পদচিহ্নরেখা
আঁধারে যায় না ভাল দেখা।

জানি তুমি আপনার ঘরে
বন্দী আজি নিঠুর নিগড়ে।
প্রাণ দিলে, রক্ত দিলে যদি তব মুক্তি মিলে,
দিতে পারি প্রফুল্ল অন্তরে।
সব আছে শুধু ধৈর্য্য নাই
পূজা মোর ব্যর্থ হ'ল তাই।

একদিন ঘুচিবে বন্ধন।
জানি, মাতা, তোমার নন্দন
একদিন জয়ী হবে, সেদিন আসন লবে
রাহুমুক্ত চন্দ্রের মতন,
মা, তুমি আপন মহিমায়
সগৌরবে বিশ্বের সভায়।

সেদিনের সেই মহোৎসবে
জানি মোর স্থান শূন্য রবে।
জড়তা-জড়িত দেহ পথে মোরে হেরি কেহ
যাত্রাসঙ্গী কথা নাহি কবে।
তব চোখে ভ্রূকুটি মা, কহ,
মৃত্যু, সে কি তা হতে অসহ?

তবু ছুটি দিতে হবে মোরে।
রজনীর প্রথম প্রহরে
তোমার অধম ছেলে সব ভুলে সব ফেলে
ফিরে যাবে ভাঙা খেলাঘরে।
মিটে নাই যত ছোটি সাধ।
ক্ষমা ক'র তার অপরাধ।

ক্ষমা ক'র যদি ভুলে থাকি
পথশেষে তব অশ্রু-আঁখি।
আজি শুক্লাচতুর্দ্দশী, আকাশে হাসিছে শশী,
ভুল ক'রে গেয়ে ওঠে পাখী,
ফুলগন্ধে বাতাস আকুল।
ক্ষমা ক'র আজিকার ভুল।

# সখের বিপদ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

জজ সাহেবের কুকুর-অন্ত প্রাণ। টেমীর যে বাচ্চা হইয়াছে, এইটেই আজকের সবচেয়ে বড় খবর তাঁহার মুখে; যাহার সহিত দেখা হইতেছে, তাহাকেই কথাটা একবার শুনাইয়া দিতেছেন।

মুন্সেফ বীরেশবাবু সান্ধ্যভ্রমণে আসিয়া খবরটা শুনিয়া অতিমাত্র পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, বলেন কি! টেমীর বাচ্চা হয়েছে?

জজ সাহেব বলিলেন, আজ সকালে। কথার ভাবে মনে হচ্ছে, আপনিও কুকুরের বড় ভক্ত। কই, একথা জানতাম না তো!

বীরেশবাবু বিগলিত হইয়া বলিলেন, কুকুর আমার প্রাণ সার্। আর ও রকম প্রভুভক্ত, আর—কি যে বলে—

—ইন্‌টেলিজেণ্ট। তা বুদ্ধির কথা যদি বললেন, টেমীর মত শার্প কুকুর দেখাই যায় না; ওর পেডিগ্রীটা একেবারে নিখুঁৎ কিনা,—তা হ'লে আপনাকে দেখাই। বয়, টেমীকা পেডিগ্রী-চার্ট হাজির করো।

টেমীর কৌলিন্য-পঞ্জী দেখিয়া বীরেশবাবু বিস্ময়ে হাঁ করিয়া রহিলেন। বলিলেন, মাই গড! কখন এ রকম দেখি নি।

কথাটা সত্য এক দিক দিয়া; অর্থাৎ কুকুরের যে আবার কুলজি হয়, সে কথাটা শোনা থাকিলেও সাক্ষাৎ জ্ঞান এই প্রথম। কুকুর জিনিসটাকে তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, এবং যতটা ঘৃণা করেন, তাহার চেয়ে বেশি ভয় করেন। পথে-ঘাটে তাহাদের নিয়ত যা চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাই যথেষ্ট; তাহার উপর আবার তাহাদের কুলজি হাতড়াইবার তাঁহার কখনও বাসনা হয় নাই। তবু জজ সাহেবের কুকুর, তাহাতে আবার নবজাত শিশু, যাহাদের আদিপুরুষ একদিন সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের দরবার অলঙ্কৃত করিয়াছিল; অন্তরের সব ঘৃণা-বিতৃষ্ণা চাপিয়া পুলকে বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিতেই হয়।

বরং প্রশংসার পর যে আর একটা কথা না বলিলে বড় বেখাপ্পা হয়, সেটাও বলিয়া ফেলিতে হইল। বীরেশবাবু গভীর মিনতির স্বরে বলিলেন, এমন জাতের কুকুরের লোভ সামলানো যায় না সার্; একটা আমার চাই, অবশ্য যদি অন্য কাউকেও কথা না দিয়ে ফেলে থাকেন।

আশা ছিল, কথা দিয়া ফেলিয়াছেন; চাওয়ার ভদ্রতাটাও রক্ষা হইবে, অথচ পাওয়ার বিপদও ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে না। আশাটা ঠিকও; কিন্তু মুন্সেফবাবুর প্রশংসা শুনিয়া এবং আগ্রহ দেখিয়া জজ সাহেব বলিলেন, তিনটের কথা দিয়ে ফেলেছি হুমাস আগেই; পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর সিভিল সার্জেনকে—তাঁর বউয়ের আবার ভারী সখ। কিন্তু আপনার—

বীরেশবাবু দম বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, তৃপ্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, তবে থাক, এবার আমার অদৃষ্টে নেই দেখছি। এর পরে বাচ্চা হ'লে কিন্তু—

জজ সাহেব বলিলেন, না না, আপনার যখন এত সখ, তখন নিজের জন্যে যেটা রেখেছি, সেইটেই দোব আপনাকে, এত ভালবাসেন যখন আপনি; কুকুরের সখ যে কি তা তো আমার জানা আছে মশাই।

মুন্সেফবাবু মুখের হতাশ ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, সাংঘাতিক সখ সার্। বলেন কেন, আহার-নিদ্রা ভুলিয়ে দেয় একেবারে!

২

আহার-নিদ্রা সেই রাত্রি হইতেই ভুলিতে হইল। কুকুরের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগের অভাব ছাড়া আর একটি গুরুতর কারণ ছিল। কুকুর গৃহিণীর দুচক্ষের বিষ। এইখানেই শেষ হইলে বরং উপায় ছিল; তিনি আবার কুকুর যে পোষে, তাহাকে পর্য্যন্ত দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। গৃহিণীর সঙ্গে কোন বিষয়েই মতের মিল না থাকায় বীরেশবাবুর দাম্পত্যজীবন তেমন সুখের নয়। তবু ওরই মধ্যে ভগবান ঐটুকু যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছিলেন, উভয়ের এই কুকুর-বিদ্বেষ। কতদিনের কত বিষয়ের মনোমালিন্য এই কুকুরের কথা তুলিয়া কাটিয়া গিয়াছে। এই সেদিনকার কথাই ধরা যাক।

সাত দিন কথাবার্ত্তা বন্ধ। সন্ধ্যার সময় মুন্সেফবাবু বাড়ি ঢুকিয়া খানসামাকে ডাকিয়া বলিলেন, সদানন্দ, পেন্টালুনটা কেচে টাঙিয়ে দে, কুকুরে চেটে দিলে।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন, কার কুকুর রে সদানন্দ?

সদানন্দ নির্লিপ্তভাবে মনিবের মুখের দিকে চাহিল। তিনি তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন, অত ভয় পাবার কি আছে? রাস্তার কুকুর নয়, পুলিস সাহেবের কুকুর, রোজ দুবেলা স্নান করছে—

সদানন্দ কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। তাঁহার রাগটা বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি মনোমালিন্যের কথা ভুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তাই সে ভাটপাড়ার গোঁসাইঠাকুর হয়ে গেল?

মুন্সেফবাবু স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাই তো কেচে দিতে বললাম।

—শুধু জলকাচা ক'রে দিলে চলে? ও পেন্টালুনের আর জাত আছে? আর শুধু পেন্টালুনের কথা যে বলছ, জামাটা? সেটা বুঝি খুব শুদ্ধ আছে? মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি কি কিছু নেই?

মধ্যস্থতার আর প্রয়োজন নাই দেখিয়া সদানন্দ সরিয়া পড়িয়াছিল। মুন্সেফবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হাঁকিয়া বলিলেন, কোথায় গেলি? তা হ'লে বাথরুমে জল দে।

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ঠিক বলেছ, যেন সমস্ত শরীরটা ঘিনঘিন করছে; হোব্বা-চোব্বা-গুলো ছেড়ে স্নান ক'রে ফেলাই ভাল।

—হ্যাঁ, এই অবেলায় স্নান ক'রে কাৎ হয়ে পড়। তোমার আর কি! ভুগতে তো সেই আমিই। গঙ্গাজল দিচ্ছি, ওগুলো ছেড়ে একটু মাথায় দাও। মুখপোড়ারা কুকুর পোষে তো বেঁধে রাখে না কেন?

—ঠিক, গঙ্গাজলই দাও একটু। তোমার মাথায় বেশ চট ক'রে আসে; না হ'লে এক্ষুনি স্নান ক'রে মরতে হ'ত আর কি!

খোসামোদের পর সাহস পাইয়া একটু রসিকতাও করিলেন, আর এ সাতটা দিন যা কেটেছে আমার, একটু শান্তিজলের দরকারও।

সেই কুকুর এখন একেবারে বাড়ি আসিয়া উঠিতেছে। অকস্মাৎ নয়, জানিয়া শুনিয়া আদর আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে আনিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জজ সাহেব ওটা নিজের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন, শুধু মুন্সেফবাবুর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে দিয়াছেন, কথাটা জানাজানি হইতে বিলম্ব হইবে না। তাহার পরের অবস্থা কল্পনারও অতীত।

মহা দুশ্চিন্তা আর অশান্তিতে দিন কাটিতে লাগিল। তিন চার দিন আর জজ সাহেবের বাড়ি গেলেন না, কোর্টেও এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। তাহার পর একদিন এজলাস হইতে নামিবার সময় সিঁড়িতে অতর্কিতে দেখা হইয়া গেল। বলিলেন, কদিন আসেন নি যে বীরেশবাবু? বাই দি বাই, আপনার কুকুরটা যা হয়েছে—ইট্‌স এ ল্যভ! ঐটেই সবচেয়ে ভাল দাঁড়াবে। কাল সিভিল সার্জেন ডেভিড্‌সন এসেছিল। বলে, এটা আমায় দাও মিস্টার চৌধুরী, আমি মুন্সেফ মিস্টার মিটারকে ব'লে দোব। বললাম, আই অ্যাম অ্যাফ্‌রেড, হি উড বি দি লাস্ট ম্যান টু পার্ট উইথ ইট (তিনি কোন মতেই হাতছাড়া করবেন ব'লে ভরসা হয় না)। কুকুরে তাঁর ভীষণ সখ, আবার তাঁর চেয়ে মিসেস মিটারের সখ আরও বেশি। কি, আপনার স্ত্রীর নামটা ঢুকিয়ে দিয়ে ভাল করি নি? হতেন রাজি আপনি?

বীরেশবাবু যেন শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, রাজি সার্! বলে, কবে আপনার ওখান থেকে নিয়ে আসব, দিন গুনছি।

সে দিন—সে দুর্দ্দিন ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে। যখন উপায় নাই, তখন বিপদের সম্মুখীন হওয়াই ভাল। প্রথম হইতে জমিটা তৈয়ার করিয়া রাখা দরকার, আনিতে যখন হইবেই। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে! বিপদের গভীরতারও একটা আন্দাজ করিয়া রাখা ভাল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া রাত্রে আহারের সময় কথাটা পাড়িলেন, প্রায় শেষের দিকে, অনেক ভয়, অনেক কুণ্ঠাকে আহার্য্যের সঙ্গে গলার নীচে ঠেলিয়া নামাইয়া।

প্রথমটা নিজের মনেই 'হুঁঃ' করিয়া একটু হাসিলেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ হাসি হ'ল যে?

—আজ জজ সাহেবের কি হয়েছে, জবরদস্তি একটা কুকুরের বাচ্চা গছাতে চায়। কিছু বলতেও পারি না, অথচ—। আধচাওয়া করিয়া একবার মুখের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

গৃহিণী হাতের পাখা নামাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, সেকি! কুকুরবাচ্চা নিয়ে কি হবে? কি জ্বালা!

—শেষ পর্য্যন্ত বললামও তাই, সেকি, কুকুরবাচ্চা নিয়ে কি করব মশাই? এ যে আপনার অদ্ভুত কথা! কিন্তু—

—আবার কিন্তু কি?

—ঐ যে তোমরা বেশ বল—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী, বলে, না, কুকুর একটা রাখুন বীরেশবাবু; ইংল্যাণ্ডের রাজার বাড়ির কুকুর—যেমন তেজী, তেমনই সুন্দর, তেমনই—

হঠাৎ মুখের দিকে নজর পড়ায় থামিয়া গেলেন। গৃহিণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কথাবার্ত্তার গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন, কুকুর আবার সুন্দর! তা যদি সুন্দরই হয় তো যাদের সুন্দর তাদের কাছেই থাকুক না, আমাদের ঘাড়ে চাপানো কেন?

—সেই কথাই তো বললাম কিনা পাকে-চক্রে; বললাম, ওসব জাতের কুকুর আপনাদের আই. সি. এস.-দের ঘরেই মানায় সার্, আমরা হলাম—কিন্তু এড়ানো কি যায়? বলে—

গৃহিণী পাখার বাঁটটা সোজা করিয়া মাটিতে বসাইয়া বলিলেন, এড়াতে পারলে না? বল কি! বাড়িতে তা হ'লে কুকুর ঢুকছে? ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর, পুজোর ঘর—

—এড়িয়ে এলাম বইকি। হাজার আই. সি. এস. হোন, আমাদেরও তো উকিল চরিয়ে চরিয়ে দাড়ি-চুল পাকানো। এড়িয়ে তো এলাম আপাতত; তবে কথা হচ্ছে—জেলার জজ, একেবারে ওপরওয়ালা—

গৃহিণী আর রাগটা চাপিতে পারিলেন না। গুছাইয়া বসিয়া মুখটা একটু বাড়াইয়া বলিলেন, ওপরওয়ালা ব'লে কুকুর না পোষবার জন্যে মাথা নেবে? এত ভয় কিসের? মগের মুল্লুক নয় তো। আর যদি সেই ভয়ই থাকে তো বদলি তো হচ্ছই কমাস পরে, না হয় আরও শিগগির বদলির জন্যে দরখাস্ত কর। তাতেও না হয়, ইস্তফা দাও চাকরিতে। তিনটে লোকের পেট তো! মোট কথা, কুকুর এ বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে পারবে না।

৩

বোঝা গেল। কিন্তু কথা হইতেছে—বুঝিয়াই বা ফল কি? কুকুর যে আনিতেই হইবে। জজ সাহেবের কুকুরের প্রবল সখ; সেই সখকে দমন করিয়া তিনি নিজের জন্য আলাদা করিয়া রাখা কুকুরটি দিয়াছেন;—একজাতীয় আত্মোৎসর্গ। স্বীকার করিয়া আসা হইয়াছে—কুকুর তাঁহার নিজের প্রাণ, গৃহিণীর প্রাণের চেয়েও অধিক।

অথচ গৃহিণী ত্রিসীমানার মধ্যে আসিতে দিবেন না। এদিককার অবস্থা এই।

ওদিকে আবার লইয়া আসিতেও প্রবল বাধা, বোধ হয় যেন প্রবলতর। বাধাটা স্বয়ং টেমীর পক্ষ হইতে।

পরের দিন বীরেশবাবু বৈকালে জজ সাহেবের বাড়ি গেলেন। মনে যে খুব উৎসাহ বহন করিয়া গেলেন এমন নয়, তবে বারান্দায় পা দিয়াই মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, আর বলবেন না, যা ঝঞ্ঝাটে পড়া গিয়েছিল! কই, আমার বাচ্চার খবর কি? মানে, আপনার টেমীর বাচ্চার?

জজ সাহেব বলিলেন, খবর খুব ভাল। চলুন না, একবার দেখে আসবেন। গায়ের রোঁয়াগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে, তাইতে রংটাও খুলছে দিন দিন। আপনারটা দাঁড়াচ্ছে—গায়ের রং গাঢ় তাঁবাটে, ডীপ চকোলেট; মাথায় একটা স্টার—সিমপ্লি বিউটিফুল! না মশাই, শেষ পর্য্যন্ত যে আপনাকে প্রাণ ধ'রে দিতে পারব, এমন মনে হচ্ছে না। যত বড় হচ্ছে, ততই লোভ সামলানো দুষ্কর হয়ে উঠছে।—শেষের কথাগুলো বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

একটা সুবর্ণসুযোগ। হাসির উপরই হাসিয়া বেশ বলা চলিত, তা নিন না সার্; আপনার অত পছন্দসই জিনিস, নিয়ে শেষে শাপ-মন্যি কুড়ব?

বোধ হয় হাসিঠাট্টার উপরই ফাঁড়াটা কাটিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা তো বলা হইলই না, বরং মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া হাসিয়া বলিয়া ফেলিলেন, তা হ'লে আমি কুকুরের জন্যে ধন্না দিয়ে পড়ব সার্, আমরা কর্ত্তা-গিন্নী দুজনেই। তাঁর যদি আবার ঝোঁক দেখেন; বলেন—

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে কেনেলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটি হাত-আড়াইয়ের নীচু খাট, তাহার উপর একটা গদি, গদির উপর একটা পরিষ্কার কালো কম্বল পাট করিয়া বিছানো। তাহার উপর বাচ্চা চারিটিকে কোলে পিঠে রাখিয়া টেমী কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। জজ সাহেবকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া একবার ঝাঁকড়া লেজটি নাড়িয়া দিল। একটিকে দেখাইয়া জজ সাহেব বলিলেন, ঐটি আপনার বীরেশবাবু। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অব ইট? চমৎকার নয়?

সত্যিই চমৎকার। কাদার ডেলার মত নধর গা; ছোট্ট কান দুইটি, আর পিঠের মাঝখানে চুল একটু কুঞ্চিত। বীরেশবাবু পুলকিত হইয়া বলিলেন, আমার তো আজই নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। টেমী, তোর বাচ্চাকে নিয়ে চললাম আজই।

টেমী নিজের নাম উচ্চারণে মাথাটা একবার তুলিল, এবং মুন্সেফবাবুর দিকে চাহিয়া 'গঁ—অ—অ—' করিয়া একটা অসন্তোষব্যঞ্জক টানা শব্দ করিল।

বীরেশবাবু এমন কিছু কাছে যান নাই, তবুও দুই পা পিছাইয়া আসিলেন। কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, আপত্তি তোর শুনছে কে? বাঁধা আছে তো সার্?

টেমী বুকে হাপরের মত খানিকটা হাওয়া ভরিয়া লইয়া আবার খানিকটা একটানা শব্দ করিল।

জজ সাহেব বলিলেন, না, বাঁধা নেই; তবে কোন ভয় নেই আপনার। বাঁধলে চেনটা বাচ্চাগুলোর গলায় আটকে যেতে পারে কিনা। এমনই ওদের মাদার খুব সাবধান। দেখুন না, ডাকছি, আস্তে আস্তে কি রকম সন্তর্পণে পা ফেলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে উঠে আসবে, পায়ের নখ পর্য্যন্ত না লাগে যাতে। ভয়ঙ্কর ইন্‌টেলিজেন্ট জাত! টেমী, ক্যম হিয়ার।

মুন্সেফবাবু জজ সাহেবের কাছে একটু ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, থাক, আর ও বেচারীকে ডেকে কাজ নেই। বাৎসল্য-স্নেহ, ছেড়ে আসতে বেচারার কষ্ট হবে। আহা, অবলা জীব। নখের কথা বললেন, নখ কুড়িটা, না আঠারটা সার্ ?

জজ সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আপনারও সে সুপার্‌স্টিশ্যন আছে নাকি—বিশটা নখ থাকলে বিষ হয় কুকুরের ? ওটা একটা নিছক গাঁজাখুরি। এই তো সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বেয়ারার পায়ে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছিল। হি ইজ অ্যাজ হেল অ্যাণ্ড হার্টি অ্যাজ এভার ( খাসা রয়েছে সে )।

—তা হ'লে ভাল। চলুন, বেচারী বোধ হয় অস্বস্তি ফীল করছে আমরা দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে। শব্দটা থামাতে চাইছে না, দেখছেন না ? আহা, মায়ের প্রাণ তো ! না টেমী, তুই আগলা তোর বাচ্চাদের ; তবে আর দিনকতক পরে কোন ওজর-আপত্তি চলবে না। ডু ইউ ?

একটু ভুল হইয়া গিয়াছিল। শেষের কথাগুলি তর্জ্জনী নাড়িয়া হাসিয়া একটু বেশি হৃদ্যতা দেখাইয়া না বলিলেই ভাল ছিল। টেমী বাচ্চাগুলাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া একেবারে 'ঝাউ ঝাউ' করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। জজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে 'পীস, টেমী' বলিয়া ধমক দিয়া উঠিতে আবার মুখ নীচু করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া বাচ্চাগুলার গা চাটিতে লাগিল। বীরেশবাবু অবশ্য তখনও জজ সাহেবের পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু সে হাসি কোন রকমে ঠোঁট দুইটাকে জবরদস্তি দুই দিকে টানিয়া রাখা মাত্র—একটা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা।

জজ সাহেব বলিলেন, দেখুন, এ একটা স্টাডি করবার জিনিস। অন্য সময় আপনি এলে আপত্তি করত না। এখন ও কতকগুলো ঘটনা মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া ক'রে নিয়েছে। —এ লোকটা পূর্ব্বে কখনও এদিক পানে আসে নি, আজ হঠাৎ এসেছে, আর আমার বাচ্চাগুলো সম্বন্ধেই এদের জল্পনা হচ্ছে, সুতরাং এ আমার বাচ্চা না নিয়ে যায় না ; সুতরাং একে সন্দেহের চোখে দেখাই উচিত। দেখুন, আপনার দিকে একটু মুখ তুলে আড়চোখে চাওয়াটা একবার দেখছেন তো ? একে স্পেনিয়েল জাতের কুকুর, তাতে টেমীটা আবার এত শার্প যে, বোধ হয় প্রত্যেক কথাটি বুঝতে পারে। সাইলেন্স, টেমী ! চুপ ক'রে শুয়ে থাক। চলুন, যাওয়া যাক।

যাইতে যাইতে একবার ঘুরিয়া, দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বীরেশবাবু বলিলেন, শালী নৈয়ায়িক।

৪

অত্যন্ত চিন্তিতভাবে, সমস্যা সমাধানের হাজার রকম উপায় খুঁজিতে খুঁজিতে বীরেশবাবু বাড়ি-মুখো হইলেন।

টেমীর বাচ্চা আসিয়া পড়িল বলিয়া, কোন রকম উপায় নাই। কথাটা আবার আজ কোন রকমে পাড়িতেই হইবে। মনে মনে মহলা দিতে লাগিলেন। বলিবেন, কোন মতেই ছাড়িলেন না জজ সাহেব, আজ আবার তাঁহার স্ত্রীও যোগদান করিলেন। বেটাছেলের কথা ঠেলা যায়, ঠেলিয়া-ছিলেনও, কিন্তু স্ত্রীলোক—হিন্দুশাস্ত্রে বলে, স্ত্রীলোক আদ্যাশক্তির রূপ। বাস্, ঠিক মনে পড়িয়াছে।—

ঠাসিয়া স্ত্রীজাতির তারিফ করা, এই এখন একটি মাত্র উপায়। স্ত্রীজাতি আদ্যাশক্তির অংশ, করুণার অবতার, বিশেষ করিয়া শিশুসম্বন্ধে। খুব কথাটা পাওয়া গেছে—শিশু! মানুষের শিশুই হোক বা অবুঝ পশুর শিশুই হোক, স্ত্রীজাতির সমভাব, দুই বাহু বাড়াইয়া বক্ষে স্থান দেন, আদ্যাশক্তি যে!

বাহিরের বারান্দায় উঠিতেই দেখিলেন, চাকর কাঁধে একঘড়া জল লইয়া সদর দরজা দিয়া বাড়িতে গেল। পূর্ণকলস দেখিয়া মনটাও প্রসন্ন হইল।

ভিতরে গিয়া দেখেন—প্রলয় কাণ্ড! চাকর কলসীর জলটা তাঁহার শয়নকক্ষের মেঝেয় হুড়হুড় করিয়া ঢালিতেছে। ঝি সেটাকে ঝাঁটা দিয়া ছড়াইয়া সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিতেছে। রান্নাঘরের সমস্ত তৈজসপত্র উঠানে বিশৃঙ্খলভাবে ডাঁই করা। বারান্দা ধোওয়া হইয়াছে, জল সপসপ করিতেছে। এক কোণে কতকগুলা মাদুর, আসন, বালিশ, দুয়ারের পর্দ্দা গাদা করা। গৃহিণী কাঁধে একটা গামছা ফেলিয়া, দুই কোমরে হাত দিয়া তদারকে দাঁড়াইয়া। রাগে মুখে একটু রা নাই; কাপড়ের রাঙা পাড়ে, চুড়ি আর নথের ঝিকমিকিনিতে, কাঁধের রাঙা গামছায় একটা যেন অধূম অগ্নিশিখা!

মুন্সেফবাবু দোর-গোড়া হইতেই নিঃশব্দে পিছন হাঁটিয়া বাহিরে আসিলেন। খবর পাইলেন, ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স-অফিসারের স্ত্রী আর পুত্রবধূ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, সঙ্গে একটি নিরতিশয় চঞ্চল-প্রকৃতির অনুসন্ধিৎসু কুকুরশাবক লইয়া।

সে রাত্রে গৃহের শৈত্য এবং গৃহিণীর উত্তাপের মাঝে পড়িয়া আদ্যাশক্তির গুণগান করা এবং সেই সঙ্গে কুকুরের কথা পাড়া গেল না।

পরের দিন সকালেই টেমীর বাচ্চা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রে ক্লাবে ডেভিড্‌সনের স্ত্রী স্বয়ং ধরিয়াছিল। মুন্সেফবাবুকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া জজ সাহেব ফাঁড়াটা কাটাইয়া দেন এবং পরের দিন ভোরেই বাচ্চাটা মুন্সেফবাবুর বাড়ি প্রেরণ করেন। মুন্সেফবাবুর স্ত্রীর খাতিরেই মিথ্যা কথাটা তিনি বানাইয়া বলিয়াছিলেন।

সেই দিন দুপুরের গাড়িতেই মুন্সেফবাবুর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, এ জন্মে আর ফিরিবেন না, মুন্সেফবাবু কুকুর লইয়াই থাকুন।

বাচ্চাটার নাম হইয়াছে 'জলী'; জজ সাহেব নিজে রাখিয়াছেন। সার্থকনামা কুকুর, যেমন আমোদপ্রিয় তেমনই চনমনে। আমোদের সন্ধানে প্রথম সুযোগেই বাড়ির প্রত্যেক জিনিস পরখ করিয়া ফিরিয়াছে, টেবিলের উপর দোয়াতের কালি হইতে আরম্ভ করিয়া। সদানন্দ তাড়াতাড়ি শিকল কিনিয়া আনিয়া জলীকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং সমস্ত বাড়িটা আর একবার ভাল করিয়া ধুইয়া লইল।

জজ সাহেবের বেহারা চাঁদু বৈকালে তত্ত্ব লইতে আসিয়া সদানন্দকে বলিল, অমন কাজ ক'র না, অত বাচ্চা কুকুরকে কি বেঁধে রাখে!

তাহার পর হইতেই জলী যথা-অভিরুচি বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এখন ধোওয়া-মোছা করিতে গেলে আর কলসীর জলে কুলাইবে না, একটি প্লাবনের দরকার। সেটা মুন্সেফবাবু আর

সদানন্দ উভয়েরই মনঃপুত হয় ; কেন না, তাহাতে জলীরও অস্তিত্ব লোপ পায় ; কিন্তু সে শুভসম্ভাবনা কোথায় ?

টেমীর সমস্ত সন্তানগুলি বিলি হইয়া গিয়াছে। ঝাড়া-হাতপা হইয়া সে এখন সন্ধান লইতেছে, কোন্‌টি কোথায় উঠিল। প্রথম দুইটির সন্ধান পাইয়াছে। তৃতীয়টিকে কোলে লইয়া সিভিল সার্জনের স্ত্রী মোটরে করিয়া প্রায় তাহার মার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসেন। বাচ্চাটা সুখেই আছে। টেমীর মনে খেদ নাই ; কেন না, কুকুরকে যে পরের জন্য প্রসব করিতে হয়, অদৃষ্টের এ বিধানটা কয়েক বারের অভিজ্ঞতায় সে একরকম মানিয়াই লইয়াছে। কিন্তু ছোটটির—কন্যাটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না ; এবং টেমীর ঘোর সন্দেহ—কাঁচা-পাকা বড় বড় গোঁফওয়ালা, থলথলে শরীরের যে লোকটি প্রায়ই আসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে থাকে, কখন কখন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তাহার সহিত নির্ভীকভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করে,—বেশ বুঝা যায়, তস্করের স্বভাব অনুযায়ী ভিতরে ভিতরে খুব ভয়—এ তাহারই কাজ। লোকটাকে সে তাহার সহজ শ্বা-বুদ্ধিতে প্রথম হইতেই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। কিন্তু উপায় ? কি করিয়া দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে কন্যাটিকে উদ্ধার করা যায়?

জলী আসিবার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে মুন্সেফবাবু একদিন জজ সাহেবের বাড়ি আসিয়াছেন। জলীর আসা পর্য্যন্ত মনে একেবারেই শান্তি নাই ; অথচ জলীকে লাভ করায় তাঁহার হর্ষের আর সীমা নাই, দেখাইতে হইবে এই রকম একটা ভাব। সেইটাই আয়ত্ত হইতেছিল না। আজ সাত পাঁচ ভাবিয়া আসিয়া পড়িয়াছেন।

গল্পসল্প হইতেছে।—হ্যাঁ, গৃহিণী একরকম হঠাৎই গেলেন বইকি। টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির, তাঁর ভগ্নীর কঠিন অসুখ, সেই দিনই বড় শালা আসিয়া উপস্থিত। চলিয়া যাইতে হইল। জলীটার জন্য সে কি কান্না ! মেয়েমানুষের মন কিনা, একটুতেই মায়া বসিয়া যায়, তায় আবার একেবারে কুকুর-অন্ত প্রাণ !

টেমী কোথায় ছিল, আসিয়া উপস্থিত। বেশ দৌড়াইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিতেছিল, মুন্সেফবাবুকে দেখিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্য করিয়া কি দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া জুতাটা শুঁকিল, ডান হাঁটুটা শুঁকিল, তাহার পর পিছনে গিয়া এখানে ওখানে এবং চেয়ারের পায়া দুইটা আঘ্রাণ করিয়া সামনে আসিয়া বসিল।

মুন্সেফবাবু হাত পা গুটাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া বসিয়া ছিলেন, বিশেষ করিয়া টেমী যতক্ষণ পিছনের দিকটায় ছিল। সামনে আসিয়া বসিলে প্রসন্নভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, টেমী, কদিন আসি নি, ভুলে গেছলি নাকি ? গায়ে হাত দিয়া বলিতে যাইতেছিলেন, কি ভাবিয়া আর অতটা আত্মীয়তা করিলেন না।

জজ সাহেব ধীরে ধীরে হাসিতেছিলেন, বলিলেন, আপনি ওর মতলবটা ধরতে পারেন নি। ও যা করলে, এইটেই এই জাতের স্পেনিয়েলের বিশেষত্ব। এরই জোরে এর একটা কাজিন প্যারিস পুলিসে একটা পাকা গোয়েন্দার কাজ করছে ; বড় বড় কেসে ইন্‌ডিস্পেন্‌সিব্‌ল্ ( না হ'লেই

নয় )। ও আপনাকে ভাল ক'রে শুঁকে-টুঁকে ঠিক ক'রে ফেললে, আপনিই ওর ছানাটি রেখেছেন। আঘ্রাণশক্তির এত সাট্‌ল্‌টির ( সূক্ষ্মতার ) আমরা মানুষেরা কল্পনাও করতে পারি না। আপনার গায়ে ও ওর ছানার, যেটি আপনার ওখানে রয়েছে, সেই ছানাটির গন্ধ পেয়েছে। দেয়ার মেমারি ইজ ইন দেয়ার সেন্স অব স্মেল ( ওদের স্মরণশক্তি ওদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ) ; আশ্চর্য্য কথা নয় ?

বীরেশবাবু টেমীর উপর দৃষ্টিটা সতর্কভাবে নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, প্যারিসের ক্রিমিনালেরা এক কাজ করলেই পারে, যাতে ক্রাইমের গন্ধ লেগে আছে এমন সব কাপড়-চোপড় সরিয়ে ফেললে, কিম্বা ভাল ক'রে ধুইয়ে ব্যবহার করলে তো আর এদের ঘ্রাণশক্তিতে কুলুবে না ?

এর প্রমাণ তাহার পরদিন হাতে হাতে পাওয়া গেল। ধোপদস্ত চোগা, চাপকান, টুপি পরিয়া আপিসে গিয়াছেন, উপরের বারান্দায় উঠিতেই মনে হইল, যেন পিছনে গোড়ালিতে কি একটা ঠেকিল। ফিরিয়া দেখিতেই চক্ষু চড়কগাছ—টেমী।

টেমী এখানে কোথা হইতে আসিল ! মনে পড়িল, ছানা হইবার পূর্ব্বে টেমী মাঝে মাঝে জজ সাহেবের সঙ্গে কাছারিতে আসিত। তা আসিত বটে, কিন্তু তখন তো এ রকম পিছু লইত না। চুপচাপ এজলাসের একপাশটিতে বসিয়া থাকিত। আজ তবে এ ভাবান্তর কেন ? সত্যই কি তবে পরিচ্ছদে বাচ্চার গন্ধ পাইয়াছে ? কিন্তু এসব তো আজই বাক্স থেকে বাহির করিয়াছেন।

না আদর করিতে সাহস হয়, না অগ্রসর হইতে পা উঠে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিলেন, চাঁদু বেয়ারা আসিয়া টেমীকে ধরিয়া লইয়া গেল।

তাহার পর কাজকর্ম্মের ভিড়ে ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রবলবেগে মকদ্দমা চলিতেছে, সাক্ষীদিগের জবানবন্দি লিখিতে লিখিতে আর মাথা তুলিবার অবসর নাই। উহারই মধ্যে একবার উকিলকে কি একটা প্রশ্ন করিবার জন্য মুখ তুলিতেই একেবারে নিশ্চল হইয়া গেলেন। বাহিরের বারান্দায়, ঠিক দুয়ারের সামনে তাঁহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া টেমী। থাবায় মুখ দিয়া তাহার অভ্যস্ত রীতিতে বসিয়া ছিল, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতেই সামনের পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া বসিল।

মুন্সেফবাবু সম্মোহিতের মত চাহিয়া রহিলেন। সেই ভাবেই একটু পরে উকিলকে প্রশ্ন করিলেন, হুঁ, কুকুরছানার কথা কি বলছিলেন ?

কুকুরছানার কথা নয় সার্, বলছিলাম, কচিছেলের এতটা বুদ্ধি হবে না যে—

মুন্সেফবাবুর চমক ভাঙিল। আঙুল দিয়া কপালের ঘাম ঝাড়িয়া বলিলেন, ও, হ্যাঁ, মানুষের ছেলের কথা বলছিলেন। গরম একটু বেশি পড়েছে যেন। তা বুদ্ধির ডেভেলপ্‌মেণ্টের ( বিকাশের ) কথা কিছুই বলা যায় না।

—তবু একটা সীমা আছে সার্, ধরুন—

দৃষ্টি আপনি বাহিরে গিয়া পড়িল। মুন্সেফবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, আজ্ঞে, না মশাই, সীমা নেই, আপনারা জানেন না।

বাহিরে বেশ একটু ভিড় জমিয়া গেছে। আদালতে যে ভিড় দেখা যায়, তাহার একটা মোটা অংশ উদ্দেশ্যহীন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া বিনা পয়সায় এজলাসে এজলাসে বিচারের

তামাসা দেখিয়া বেড়ায়। আজ একটু নূতনত্ব হইয়াছে। জজ সাহেবের কুকুর মুন্সেফ সাহেবের বিচার শুনিতেছে। তাই ভিড় বেশ একটু চাপ। আরদালী মাঝে মাঝে আসিয়া সরাইয়া দিতেছে, আবার জমা হইতেছে, পুকুরে পানা সরাইয়া দিলে আবার যেমন কেন্দ্রমুখী হইয়া আসিয়া জমা হয়।

এজাহার লইতে গোলমাল হইতেছে। চোখ তুলিলে বারান্দায় কুকুর, চোখ নামাইয়া কাগজে নিবদ্ধ করিলে কুকুর আসিয়া একেবারে কাগজ জাঁকিয়া বসিতেছে; যাহা লিখিতেছেন, সব যেন হইয়া যাইতেছে টেমীর নখ, লেজ, কোঁকড়ানো চুল, লটকানো দুইটা কান, সবের মাঝে দুইটা লুব্ধ দৃষ্টি—রক্তলুব্ধ! কি অসহ্য অবস্থা!

জজ সাহেবের আরদালী আসিয়া আবার টেমীকে টানিয়া লইয়া গেল। যাইতে কি চায়? যাইতে যাইতেও ঘুরিয়া দৃষ্টিক্ষেপ। ভাবটা—ও এজলাস থেকে একবার নেমে আসুক, বাচ্চা পোষার সখ ওর ঘোচাচ্ছি।

৫

সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে মুন্সেফবাবু জজ সাহেবের বাংলায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সদানন্দ, তাহার কোলে বেশ একটি মোলায়েম ধপধপে তোয়ালেতে জড়ানো টেমীর বাচ্চা জলী। জলীর গায়ে জরির পাড়-বসানো বেশ দামী পুরু মখমলের একটি জামা, গলায় খুব সৌখিন একটি কলার, মাঝখানে একটি রূপার ঘুঙুর ঝুলিতেছে।

জজ সাহেব বলিলেন, আসুন বীরেশবাবু, কদিন আসেন নি একেবারে? বাঃ, পপিটা তো খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে! উঃ, জামায় গয়নায় যে একেবারে—

তৈয়ারি হইতে আর বাধা কি? সমস্ত বাড়িটায় একাধিপত্য করিতেছে। মুন্সেফবাবু মুখটা বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন, তোয়ের তো হয়েছে সার্, সেবাযত্নের তো কসুর করি নি, কিন্তু সবই বৃথা হ'ল।

জজ সাহেব বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন? কি হ'ল আবার?

—সেই ব্যাপার, আপনি তো জানেনই। সিভিল সার্জেনের বউয়ের ভয়ে আমার ওখানে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তো? কাল ঠিক ধরেছে, মুন্সেফবাবু, আপনার বাচ্চাটাই সবচেয়ে ভাল দাঁড়াল দেখছি; আমি জজ সাহেবকে বলেওছিলাম; কিন্তু তিনি নাকি আপনাকে কথা দিয়ে ফেলেছিলেন। ও, আই উড গিভ মাই লাইফ ফর ইট; হোয়াট এ ল্যভ (কি সুন্দর,-এর প্রতিদান জীবন পর্য্যন্ত দেওয়া যায়)! বলুন, চাওয়ার কি আর এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষা আছে? তখন বলতে হ'ল—

—দিয়ে দিলেন?

—উপায় কি?

সদানন্দর কোলে জলীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, বড় মায়া ব'সে গিয়েছিল। বিশেষ ক'রে সে এলে যে কি বলব!

জজ সাহেব বলিলেন, কুকুরের বিষয়ে এ জাতটা বড়ই লোভী মশাই ; তা, তার নিজেরটা আপনাকে দিচ্ছে তো ?

মুন্সেফবাবুর এ সম্ভাবনাটা মনে উঠে নাই, একটু হক্‌চকিয়া গেলেন। তখনই সামলাইয়া বলিলেন, কোথায় আছেন আপনি ? বলবার আগেই সে পথ মেরে রেখেছে, ঝানু মেয়েমানুষ ! আপনি যে এতটা স্বার্থত্যাগ করলেন, তার জন্যে ধন্যবাদ মিস্টার মিটার ; আমার কুকুরের সঙ্গে চমৎকার পেয়ার হবে ! নিন, এর ওপর আর অদলবদল করার কথা তুলতে পারেন ? আমাদের চোখের পর্দ্দা আছে, ওদের মতন তো নয়। বললাম, অনেক দিন ওর মাকে দেখে নি। একটা রাত থাক মায়ের কাছে। কাল জজ সাহেবের আরদালী আপনার কাছে দিয়ে আসবে ম্যাডাম। কই, টেমী কোথায় ? এই যে নাম করতেই উপস্থিত। নে টেমী, তোর বাচ্চা। নামিয়ে দাও, সদানন্দ। খুশি হলি তো টেমী ? কেমন জামা দেখ, রূপোর ঘুঙুর ! আর যেখানে সেখানে অমন ক'রে—

সামলাইয়া লইয়া জজ সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সিভিল সার্জেনের বউয়ের কাছে আর কথাটা তুলবেন না, লজ্জিত হয়ে পড়বে। আমার অদৃষ্টেই যখন ছিল না কুকুরটা, তখন আর ও বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্চ ক'রে ফল কি ? আবার কবে বাচ্চা দিচ্ছে টেমী ?

—আবার বছরখানেক পরে।

মাস পাঁচ ছয়ের মধ্যেই বদলি হইবার কথা। একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস মোচন করিয়া মুন্সেফবাবু বলিলেন, অতি অবিশ্যি ক'রে আমার জন্যে একটার কথা বলা রইল সার্। যেন ফাঁকি না পড়ি !

# শাপমোচন

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের যুগে দেবীচরণের আকৃতির বিকৃতিকে বিধাতার খেয়ালের গঠন বলা চলে না। দোষ নাকি গিয়া পড়ে পিতা-মাতার উপর। কিন্তু বিধাতার খেয়ালই হউক, আর অপরাধ পিতা-মাতারই হউক, দেবীচরণ ফলভোগ করে। দেহবর্ণ লোমশ পশুর মত ছাই-রঙের, অস্বাভাবিক লম্বা মুখ, একটা চোখ অহরহ মিটমিট করে, আর একটা চোখ বিস্ফারিত, কে যেন সে চোখের উপরের কপালের চামড়া টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। শীর্ণ দেহ, কাঠির মত হাত পা, তাহার উপর চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, এক পায়ের শিরাগুলি নাকি অহরহ টানিয়া ধরিয়া থাকে।

বেলা তিনটা হইবে, দক্ষিণপাড়ায় দুর্গাপ্রসাদবাবুর চায়ের মজলিসটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; গড়গড়ার মাথায় ধুনুচির মত কল্কেটা আগ্নেয়গিরির মতই ধূমায়মান, হাস্যধ্বনিও প্রচুর উঠিতেছে। এই সময় সম্মুখের রাস্তায় দেবীচরণকে দেখা গেল। পরিধানে আধময়লা কাপড়, কিন্তু পরিপাটি কোঁচায় সুবিন্যস্ত, গায়ে একটি গলাবন্ধ কোট, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা, কাঁধে একটি কন্‌স্টেব্‌ল্‌দের মত ঝোলা।

দুর্গাপ্রসাদের দাদা বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠাবান চিত্রশিল্পী, তিনি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দেশে আসিয়াছেন; চায়ের মজলিস তাঁহাকে লইয়াই গরম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেবীচরণকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, আরে, অদ্ভুত চেহারা তো!

দুর্গাপ্রসাদ মৃদুস্বরে বলিল, আমাদের কিশোরীদার ছেলে—দেবীচরণ।

দেবীচরণের শ্রবণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ, কথাটা তাহার কানে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সে সহাস্যমুখে বৈঠকখানার উপর উঠিয়া বলিল, চিনতে পারছেন না কাকাবাবু? কথাটা বলিয়াই সে শিল্পী শ্যামাচরণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া চাপিয়া বসিল।

শ্যামাচরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া লইতে লইতে বলিলেন, কেমন আছ?

হাসিয়া দেবীচরণ বলিল, আজ্ঞে, অস্তি কশ্চিৎ দরিদ্রব্রাহ্মণগৃহে মার্জ্জারশাবকের অবস্থা। ব্রাহ্মণগৃহের গরুও বলতে পারেন, খাদ্যাভাবে অস্থিপঞ্জরসার।

—কেন? তুমি তো সাবোর না চুঁচড়োয় এগ্রিকাল্‌চার না কি শিখেছিলে না?

দুই হাতের তালু উল্টাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীচরণ কহিল, বেশ, শুধু কৃষিবিদ্যা! শেখার আর অন্ত নাই, স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্য্যন্ত, চুঁচড়োয় কৃষি, জমিদারী-সেরেস্তায় খাতা লেখা, পোস্টাপিসে পিওনীতে শিক্ষানবিশী, শিখলাম অনেক; কিন্তু গেল সব এই মদনমোহন রূপের জন্যে। দেখলেই মালিকের ভুরু কুঁচকে ওঠে। মুখে বলে, দরকার নাই; কিন্তু আমি বুঝি সব। বুঝলেম, অবশেষে শিখলাম জ্যোতিষবিদ্যা; কিন্তু সেখানে আবার আরও বিপদ। লোকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, বলে, সাক্ষাৎ শনি, চোখ দেখছিস না!

মজলিসসুদ্ধ লোক তাহার কথায় হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; শ্যামাচরণ একটু অপ্রস্তুত

হইলেন; তিনি কথাটাকে ঘুরাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন, বল কি! তা হ'লে তো অনেকগুলি বিদ্যে তুমি শিখেছ!

মজলিসের হাসির সঙ্গে দেবীচরণও প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছিল; সে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বিদ্যেতে আমি বিদ্যে-মহাসাগর, কিন্তু একেবারে তলা পরিষ্কার, মণি মুক্তো দূরের কথা, ঝিনুকের খোলাও একটা জন্মাল না।

শ্যামাচরণ সত্যই একটু দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না, বলিলেন, তাই তো, তা হ'লে ঘরেই ব'সে আছ?

মাথা চুলকাইয়া দেবীচরণ বলিল, আজ্ঞে না, কতকগুলো শিশি-বোতল নিয়ে টুংটাং ক'রে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি কোন রকম ক'রে।

বিস্মিত হইয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, শিশি-বোতল নিয়ে?

—আজ্ঞে, জাত্যাভাবে ভবেৎ বৈষ্ণব—কর্ম্মাভাবে চিকিৎসকঃ। আজকাল চিকিৎসক হয়েছি, ওষুধ বেচি।

এবার শ্যামাচরণের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বল কি? চিকিৎসক!

—আজ্ঞে হ্যাঁ; মানে মানে যখন দিলে না লোকে, তখন প্রাণে না মারলে উপায় কি? দেহ তো দেখছেন, চুরি-ডাকাতি করবার সামর্থ্য নাই, কাজেই বলের অভাবে কলে কাজ চালাচ্ছি।

দুর্গাপ্রসাদ এবার একটু হাসিয়া বলিল, দেবীচরণ একটা ওষুধ তৈরি করেছে দাদা, অদ্ভুত ওষুধ; সে ব্যবহার করলে শরীর পুষ্ট হয়, কামদেবের মত রূপ হয়, কোকিলের মত কণ্ঠ হয়, জাতিস্মরের মত স্মৃতি-শক্তি হয়, আরও কি কি হয় বল না হে দেবী!

দেবী অপ্রতিভ হইল না, সে হাসিয়া বলিল, নাস্তি দোষ বিজ্ঞাপনে, বুঝলেন বাবু! ওটা হ'ল আমার বিজ্ঞাপন। তবে হ্যাঁ, ওষুধ আমার ভাল, বুঝলেন কিনা, আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীতে বিশুদ্ধ দেশীয় ভেষজের দ্বারা প্রস্তুত। অষ্টোত্তরশত রকমের গাছ-গাছড়া—অনন্তমূল ইত্যাদি, বুঝলেন কিনা, সেবনে ক্ষুধা হবে, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পাবে, শরীরপুষ্টি হবে, কান্তি উজ্জ্বল হবে, বুঝলেন কিনা; তা কাকাবাবু, আপনি এক বোতল ব্যবহার ক'রে দেখুন। মূল্য নাম মাত্র—আড়াই টাকা। তা সে আপনার কাছে আর কি? শুনতে তো পাই, আপনি একজন মস্ত বড় চিত্রকর—খ্যাতি কত! বুঝলেন কিনা, সেবার গেলাম মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ি; দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের খরচ প্রয়োজন—

সবিস্ময়ে শ্যামাচরণ বলিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর বুঝলেন কিনা, মনে মনে—

আবার বাধা দিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, কেন? প্রথম স্ত্রী তোমার—

—আজ্ঞে, সেদিকে আমি ভাগ্যবান, তিনি খালাস পেয়েছেন। তারপর বলি শুনুন—মনে মনে অনেক প্রণিধান করলাম, ক'রে, একখানা কাপড়-কাচা সাবান বেশ ক'রে যাকে বলে আপাদ-মস্তক

ঘর্ষণ ক'রে, খালি পায়ে, খালি গায়ে, গলায় একটা ন্যাকড়ার ফালিতে একটা চাবি বেঁধে গিয়ে উপস্থিত হলাম জোড়হাত ক'রে। সভায় তখন ঘোর মজলিস, দেখি কাকাবাবুর নাম হচ্ছে। মহারাজ বলছেন, হ্যাঁ, চিত্রকর বটেন শ্যামাচরণবাবু। ভাবলাম, বলি, হুজুর, তিনি আমার কাকা হন। পরক্ষণেই লোভ সম্বরণ করলাম, না, তাঁর মাথা হেঁট হবে, আর আমার ভাগ্যেও হয়তো শিকের দড়ি শেকল হয়ে যাবে, কোন মতেই ছিঁড়বে না।

দেবীচরণ একবার নীরব হইয়া চারিদিক দেখিয়া লইল ; দেখিল, অন্য সকলের মুখে কৌতুকস্মিত হাস্যরেখা সুপরিস্ফুট, কিন্তু শ্যামাচরণ গম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। সে নীরব হইয়া গেল।

—তারপর ? সাহায্য কি পেলে ?—একজন প্রশ্ন করিল।

হাতের উপর হাত দিয়া মৃদু তালি দিতে দিতে দেবীচরণ বেশ গম্ভীরভাবেই বলিল, তা দিয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকা। বললাম, মাতৃবিয়োগ হয়েছে, ব্রাহ্মণের ছেলে। মহারাজের দয়া হয়ে গেল আর কি !

গম্ভীরভাবেই শ্যামাচরণ বলিলেন, বিয়েটা হ'ল কোথায় হে ?

—জায়গা অবিশ্যি খুব ভালই—আম, কাঁঠাল, দধি, দুগ্ধ প্রচুর। গঙ্গার তীর, শীতল জায়গা, মুর্শিদাবাদ জেলা—নবাবী দেশ। শ্বশুরও পণ্ডিত লোক ; হাসছেন কি, বেশ মান-খাতির আছে গো ! মশায়, দানের বাসনই কত গো ! একটা ঘর বোঝাই !

শ্যামাচরণ বুঝিলেন, একটা চাতুরি খেলিয়া মেয়েটির সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে। তিনি একটু কঠিন হাসি হাসিয়া বলিলেন, ঘটকচূড়ামণিটি কে হে ? ঘটকালি করলে কে ?

দেবী হাসিয়া বলিল, অ্যাই দেখুন, কাকাবাবু কি বলছেন দেখুন ! বিজ্ঞাপনে বিবাহের যুগে ঘটকের দফাই যে ইতি শেষঃ। ও আপনার ঘটও ভেঙেছে, কচুও দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত, বাকি আছে ড়ামণি—তা সেটুকু আর থাকবে না, ওই বেতারে বিয়ে আরম্ভ হওয়ার অপেক্ষা আর কি !

মজলিসসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবার শ্যামাচরণের মুখেও হাসি দেখা দিল। দেবীচরণের রসিকতায় তিনি সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, বলিলেন, তাই তো দেবীচরণ, তুমি যে এমন রসিক, তা তো জানতাম না !

—আকার দেখে অনুমান করতে পারেন না বাবু ? আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমার নিজেরই হাসি পায়। বিধাতা বেটাকে বকশিশ করতে ইচ্ছে হয়।

এ কথাটায় অন্য সকলে হাসিল, কিন্তু শ্যামাচরণ আবার যেন গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। দেবীচরণের চক্ষু আকারে দেড়খানি হইলেও তীক্ষ্ণতায়, বোধ করি, সাড়ে চারখানির সমতুল্য—সেটুকু ভাবান্তরও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল, আবার বিয়ের কথা যদি শোনেন, তবে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। বুঝলেন কাকাবাবু, ও দোষ কারুরই নয়, ঘটক তো ছিলই না, আর দোষ আমার শ্বশুরেরও নয়। দোষ আমার আর সেই তার ; মানে, বুঝলেন কিনা, ওই সীতাসাবিত্রীর বাচ্চাটির। যাকে বলে, স্বখাত সলিল। আমি শুধু ঠাকুরের সময়, যাকে বলে বাঁচিয়ে, মানে—ব'লে ক'য়ে সেঙা করা, তাই করেছি।

—আরে, তুমি নিজেই কনে দেখতে গিয়েছিলে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বয়ং একক।

—কেন তোমার জ্যেঠা ? তিনি আছেন তো ?

—আছেন মানে ! দিন দিন ফুলছেন, ইয়া—বিরাট পুরুষ, ওঁর আর বিনাশ নেই। প্রায় বিশ্বরূপের কাছাকাছি, কোমরে এখন কাছি বেঁধে কাপড় রাখতে হয়।

—বল কি, এত মোটা হয়েছেন ? তা মোটা মানুষের নড়াচড়া একটু কষ্টকর হয় বটে।

—অ্যাই, কাকাবাবু আবার বলছেন কি দেখ ! জ্যেঠা গতিতে আমার ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা রেসে হেরে যায়। আজকাল আবার মামীর সম্পত্তি পেয়েছেন একগণ্ডা তুকড়া তুক্রান্তি একদন্তী জমিদারি স্বত্ব। দৈনিক ভূমি কম্পিত ক'রে দপ্তর বগলে দশ বারো মাইল হেঁটে খাজনা আদায় ক'রে আসছেন। তা আমি অবিশ্যি বলেছিলাম জ্যেঠাকে যে, জ্যেঠা, চল আমার সঙ্গে। বেশ লজ্জিত হয়ে বিনয় ক'রেই বললাম। তা জ্যেঠার আমার আর কিছু থাক আর না থাক, জ্যেঠামি অনেকটুকু আছে কিনা, বললে কি শুনবেন ? বললে, তা হ'লে একখানা ফরাসডাঙ্গা না হোক, ধোলাই ধুতি কিনে দে আমাকে, আর ইণ্টারকেলাসে নিয়ে যেতে হবে, ও কাঠের বেঞ্চিতে ভিড়ে আমি যেতে পারব না। ঠ্যাটামি বরং সহ্য হয় বাবু, কিন্তু জ্যেঠামি আদবে আমার বরদাস্ত হয় না। আমি আর কিছু না ব'লে, জয় বাবা শুণ্ডহীন সিদ্ধিদাতা ব'লে জ্যেঠাকে একটি প্রণাম ক'রে একাই চ'লে গেলাম।

অকস্মাৎ সে সচকিত হইয়া বলিল, কে গেল ? পোস্টমাষ্টার নয় ?

পথিকটি তখন পথের সে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, দেবীচরণ দাওয়ার উপর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, হুঁ, সেই ঘুঘু মশায়ই বটেন। বুঝলেন, এখানে এক সম্বন্ধ বার করেছেন, রোজ কুটুম্বিতে ক'রে জলখাবারটি সেখানে সারা চাইই। যাই, আমি আবার ওষুধের দাম পাব, দেখি।—বলিতে বলিতেই সে ঝোলা খুলিয়া একটি বোতল বাহির করিয়া নামাইয়া দিল।

—খেয়ে দাম দেবেন কাকাবাবু। সস্তা ইন্‌স্টল্‌মেণ্ট—চার আনা সপ্তায়, আড়াই মাসে শোধ। নগদ দিলে চার আনা কমিশন।

শ্যামাচরণ হাসিলেন। কে একজন বলিল, বাঃ, বিয়ের গল্পটা ব'লে যাও।

—মানে, গল্প আর কি, চোস্ত সাদা কথায় মেয়েটিকে আমি বললাম, বাপু, এই দেখছ আমার রূপ, আর গুণের কথা বেগুন না হ'লেও কচু বটে, খেতে ভাল না লাগুক, নাড়লে ঘাঁটলে সুড়সুড়ি লাগে ; আর অবস্থার কথা কি বলব, লোকের দশ অবস্থা হয়, আমার আবার দশের আগে দশমিক মাথায় পৌনঃপুনিক। স্রেফ মোটা ভাত আর মোটা কাপড় ; শেমিজ না, সায়া না, বডিজ না, ব্লাউজ না, সাবান না, পাউডার না, স্নো না, ক্রীম না, স্রেফ নারকেল তেল। পছন্দ হয় তো বল বাপু, না হয় তো তাও বল। তা বুঝলেন কিনা, মেয়েটি এক দিকেই ঘাড় নাড়লে, সে ঘাড় আর অন্য দিকে এল না। আমি যদি মাষ্টার আবার অন্য দিকে পথ ধরবে।

শ্যামাচরণ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, বউমাটি দেখতে শুনতে কেমন হে ?

অত্যন্ত লজ্জার সহিত দেবী বলিল, আমার তো আজ্ঞে, দেড়খানা চোখ, ওই একরকম আর কি। সে হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গাপ্রসাদ বলিল, দেবীর বউ খুব সুন্দরী হয়েছে, তা সে কথা ও কিছুতেই বলবে না।

শ্যামাচরণ বলিলেন, ওদের দুজনের ছবি আঁকতে দিলে আমি আঁকি, 'দি বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট' অবশ্য দেবীকে আরও খানিকটা কুৎসিত করতে হবে।

দুর্গা বলিল, ব'লে দেখ না। টাকাকড়ি পেলে হয়তো রাজি হতে পারে।

শ্যামাচরণ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঔষধের বোতলটা তুলিয়া লইয়া একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর ছিপিটা খুলিয়া সেটাকে উপুড় করিয়া সমস্ত ঔষধটুকু নিঃশেষে মাটিতে ঢালিয়া দিলেন।

* * *

'খুব সুন্দরী' কথাটা অতিরঞ্জন ; যে রূপ সংসারে দেখিতে গেলে মানুষ বাধা পায়, সে রূপের মহিমা বাড়িয়া উঠে মানুষেরই কল্পনায়। দেবীচরণের বাড়িতে পর্দ্দার বড় কড়াকড়ি ব্যবস্থা। বধূটি কদাচিৎ বাড়ির বাহির হয়, তাও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মেয়েটি নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে। দেখা যায়, শুধু হাতের ও পায়ের আঙুলগুলি ; গৌরবর্ণ ঈষদ্দীর্ঘ আঙুলগুলি মানুষের মনের রঙে ডুবিয়া তুলিকার কাজ করে। তবে খুব সুন্দরী বা সুন্দরী না হইলেও ভামিনী শ্রীমতী মেয়ে, নিখুঁত রূপ না থাকিলেও একটি রমণীয় শ্রী আছে।

ভামিনী স্বামীর সংসারে একা মানুষ, বাহিরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়াই সে দাওয়ায় রান্না করিতেছিল। গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া দেবীচরণ সন্তর্পণে দরজাটি অল্প খুলিয়া সব দেখিয়া লইল ; নিবিষ্টমনে ভামিনী রান্না করিতেছে। সন্তর্পণেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী ভামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ভামিনী সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনটি দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিল। এবার সশব্দে হাসিয়া দেবীচরণ দাওয়ার উপরের তক্তাপোষটায় বসিয়া বলিল, তুমি তো ভয়ানক চতুরা!

ভামিনী রান্না ছাড়িয়া উঠিল, স্বামীর হাত পা ধুইবার জন্য জল ও গামছা আনিয়া সম্মুখে নামাইয়া দিল, একটি কথাও বলিল না, মাথার অবগুণ্ঠন এতটুকু অপসারিত করিল না। এমনই ভামিনীর অভ্যাস। দশটা কথার একটা জবাব দেয়। দেবী আবার বলিল, তুমি তো দেখি ভয়ানক চালাক!

ঘোমটার ভিতর হইতেই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে ভামিনী বলিল, অ্যাঁ?

—আমি এসে দাঁড়ালাম এত চুপি চুপি ; তুমি বুঝলে কেমন ক'রে বল তো?

—ছায়া দেখে। লম্বা ছায়া পড়ল যে।—ভীরু শিশুর মত ভামিনী উত্তর দিল।

দেবীচরণ বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা হ'লে তুমি বোকা সেজে থাক। নইলে ধূম থেকে বহ্নি, ছায়া থেকে কায়া—এ উপলব্ধি তো সহজ নয়!

ভামিনী ঘোমটার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিল, অ্যাঁ?

—কিছু না; বলছিলাম, তরকারির ডালায় কচু আছে, কচু? থাকে তো দগ্ধ কর, ভক্ষণ করব।

ভামিনী কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত অপেক্ষা করিয়া ত্রস্তভাবে রান্নাশালের দিকে চলিয়া গেল, রান্নায় পোড়া গন্ধ উঠিয়াছে। দেবী ঝোলার ভিতর হইতে আপনার ঔষধগুলি বাহির করিতে বসিল। ঔষধের বোতলের সঙ্গে বাহির হইল একটি কাগজে মোড়া প্যাকেট। শ্যামাচরণ নগদ টাকাই মিটাইয়া দিয়াছেন, এবং কমিশন বাদ না লইয়া আড়াই টাকাই তাহাকে দিয়াছেন। সেই টাকায় ফিরিবার সময় দেবীচরণ ভামিনীর জন্য একখানি শাড়ি কিনিয়া আনিয়াছে। 'বনহরিণী' শাড়ি, শাড়ির পাড়ে চকিত হরিণীর দল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। প্যাকেটের কাগজখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সহসা ঘৃণায় আক্রোশে কুৎসিত মুখখানা বীভৎস করিয়া তুলিয়া দেবীচরণ বলিয়া উঠিল, পরিবারের সহোদর সব! আমার স্ত্রী যেমনই হোক, তাতে তোদের খোঁজ কেন, শুনি? কমিশন বাদ না দিয়েই পুরো আড়াই টাকা নগদ! ভারী দাতা!

কিন্তু ভামিনীর কি দোষ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবীচরণ অবগুণ্ঠনাবৃতা ভামিনীর দিকে চাহিল, এখনও সেই দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অদ্ভুত, সংজ্ঞা নাই, সাড়া নাই, রক্তমাংসের পুতুল একটা। দেবীচরণের সাধ্য আর কতটুকু, কিন্তু তবুও তো দেবীচরণের ত্রুটি নাই! রঙিন কাপড় সায়া শেমিজ ব্লাউজ পাউডার স্নো ক্রীমে ভামিনীর বাক্স ভরিয়া উঠিয়াছে। দেবীচরণ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিল, এগুলো তুলে রাখ দেখি।

ভামিনী উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। একে একে বোতলগুলি তুলিয়া রাখিয়া শেষে কাপড়খানা হাতে তুলিয়া একবার পাড়টা শুধু দেখিল, তারপর সেখানিকেও ঘরে রাখিয়া দিয়া পুনরায় রান্নাশালে ফিরিয়া উনানে কড়াটা চড়াইয়া দিল।

দেবীচরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, সে বলিল, দেখ।

ভামিনী মুখ ফিরাইল। দেবী বলিল, তোমার বাবা আমার পায়ে ধ'রে তোমার পিঠে ফুল-গঙ্গাজল দিয়ে, যাকে বলে উচ্ছুগ্যু ক'রে, তোমাকে দান করেছে, আমি তোমার পায়ে ধ'রে আনতে যাই নি, বুঝেছ?

ভামিনী নিস্পন্দ নির্ব্বাক, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সে বিহ্বল শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রূঢ়স্বরে দেবী বলিল, শুনছ?

মৃদুস্বরে উত্তর হইল, হ্যাঁ।

—তবে? তবে আমাকে দেখে ঘোমটা কেন তোমার? খোল, ঘোমটা খোল।

ভামিনী ঘোমটা খুলিয়া দিয়া দেবীচরণের মুখের দিকে চাহিল। সুন্দর ভামিনীর দুইটি চোখ, তেমনই সুন্দর তাহার দৃষ্টি। দেবীর সমস্ত অন্তরখানি পরম স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে নিজেই উঠিয়া গিয়া সস্নেহে ভামিনীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, কাপড়খানা পছন্দ হয়েছে?

ভামিনী প্রশ্ন করিল, পাড়ে ওগুলো কি? ছাগল?

হাসিয়া দেবী বলিল, না সখি, তোমার মত যাদের চোখ, ওরা হ'ল তাই।

—গরু ?

হা হা করিয়া হাসিয়া দেবী যেন ভাঙিয়া পড়িল, তোমার কি গরুর মত চোখ নাকি ? এমনই গোলাকৃতি ?

অপ্রস্তুত হইয়া ভামিনী বলিল, না।

—হরিণ হরিণ ! আজ কাপড়খানা পরবে, বুঝেছ ? আজ শুক্রবার, 'সোম-শুক্রে পরে শাড়ি, ধন হয় তার আড়ি-আড়ি'। মেলাই টাকা হবে আমাদের। সন্ধ্যেবেলা রান্না সেরে নিয়ে গা ধুয়ে ফেলবে, সুগন্ধ তেল দিয়ে চুল বাঁধবে, তারপর সাবান দিয়ে মুখখানি পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে স্নো মাখবে ; মেখে কাপড়খানি প'রে ফেলবে। বুঝেছ ?

ভামিনীর মুখখানি এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দীপ্তি দেখিয়া দেবীর অন্তর মুহূর্ত্তে উত্তাপে আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, সে তাহার লোমশ দীর্ঘ হাত দুইখানি প্রসারিত করিয়া ভামিনীকে বুকে টানিয়া লইল। ভয়ে ভামিনীর চোখ তখন মুদিত হইয়া গিয়াছে, সংজ্ঞাহীনা কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট সে, মুখখানা শবের মত বিবর্ণ।

সঙ্গে সঙ্গে দেবীও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে বলিল, ঘোমটাটা টান ; শুনতে পাচ্ছ না ?—বলিয়া নিজেই তাহার অবগুণ্ঠন আবক্ষ টানিয়া দিল। গান ! ভদ্রলোকে গান গায় পাড়ার মধ্যে, উপরের জানালার ধারে বসিয়া ! মুখুজ্জেদের ডেঁপো ছেলেটা এই দ্বিপ্রহর বেলায় জানালার ধারে বসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

—হ্যাঁ, রান্না-বান্না তুলে ঘরে রাখ। আমি জল নিয়ে আসি।—বলিয়া দেবীচরণ প্রকাণ্ড দুইটা বালতি লইয়া বাহির হইয়া গেল। ভামিনীর স্নানের জল। উঠানের কোণে তালপাতা দিয়া ঘেরা এক টুকরা বাঁধানো জায়গা, ভামিনীর স্নানের ঘর।

* * * *

প্রাতঃকালে দেবীচরণ চলিয়াছিল রোগী দেখিতে। সঙ্গে দুই তিন জন নিম্নজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ ; তাহারা কবিরাজকে ডাকিতে আসিয়াছে। ময়রাদের দোকানে গোঁসাইজী বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল, সে অকস্মাৎ দেবীচরণকে দেখিয়া বেশ ব্যগ্র হইয়া উঠিল, বলিল, দেবীচরণ যে, অ্যাঁ ! চলেছ কোথায় হে ?

দেবীচরণ বাহিরে আর একটি মানুষ, সে তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া বলিল, আজ্ঞে, ধন্বন্তরি কলে চলেছেন, প্রভু।

গোঁসাইজীও রসিক ব্যক্তি, কিন্তু আজ আর রসিকতা তিনি করিলেন না। পরম গম্ভীরভাবে বলিলেন, তা বেশ বেশ ; কল-টল পাচ্ছ তা হ'লে আজকাল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রীয়াং চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্য। কিসে যে কি হয় প্রভু ! মাটি খুঁড়ে হ'ল না, কাগজে-কলমে হ'ল না, দাসত্বে তো নৈব নৈব চ। অবশেষে দেখি শিশি-বোতলের মধ্যে মা লক্ষ্মী লুকিয়ে আছেন। তা চলি এখন।

গোঁসাইজীও উঠিলেন, বলিলেন, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই খানিকটা। কাজ আছে।

শির-টানা পায়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দেবীচরণ বেশ দ্রুতই চলিয়াছিল। গোঁসাইজী বলিলেন, আরে, তুমি যে ঘোড়ার মত ছুটেছ হে!

—ওই দেখুন, তবু সব মক্কেলরা বলে, ঘোড়া কিম্নন কবরেজ মশাই।

গোঁসাইজী বলিলেন, আচ্ছা দেবীচরণ, তুমি যে চিকিৎসা কর, তা পড়াশুনা করেছ তো?

—অনন্তপারং—

বাধা দিয়া গোঁসাইজী বলিল, পরিষ্কার বাংলা ক'রে বল বাপু, ও অনুস্বার বিসর্গ বাদ দিয়ে বল।

হাসিয়া দেবীচরণ বলিল, আজ্ঞে, চলে না গোঁসাইজী, চলে না। রোগীর বাড়ির লোকদের উপসর্গের মহৌষধ হ'ল ওই অনুস্বার এবং বিসর্গ। পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করছেন, তা সত্যই আপনাকে বলি, আরম্ভ করেছিলাম কুইনিন ম্যাগ্‌সাল্‌ফ নিয়ে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে পড়েছি এবং এখনও পড়ি, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ডাক্তারিশাস্ত্র—দুইই পড়ি।

—ভাল ভাল। এক মিনিট দাঁড়াও দেখি তা হ'লে। ওরে, চল চল, তোরা এগিয়ে চল, দেবী যাচ্ছে।

দেবীচরণের সঙ্গের লোক কয়টি একটু অগ্রসর হইতেই গোঁসাই বলিল, আচ্ছা, স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করতে জান তুমি?

গোঁসাইজীর মুখে স্ত্রীরোগের চিকিৎসার কথা শুনিয়া দেবীচরণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, আজ্ঞে না; আমি এই সামান্য জ্বর-জ্বালার চিকিৎসাই করি গোঁসাইজী; ওসব আমি জানি না।

গোঁসাই কূটকৌশলী বিচক্ষণ লোক, দেবীচরণের এই গম্ভীর কণ্ঠস্বরের উত্তর সে বিশ্বাস করিল না। দেবীচরণের মুখের উপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, তুমি জান।

কাতর মিনতিতে হাতজোড় করিয়া দেবী বলিল, আমাকে মাফ করুন গোঁসাইজী। সত্যই বলছি, আমি জানি না।—সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

বিস্ফারিত চোখে ইঙ্গিত করিয়া একখানি হাত দেবীর মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া গোঁসাই বলিল, পঞ্চাশ।

—আজ্ঞে না। দেবীচরণের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

—এক শো।

—আমাকে মাফ করুন গোঁসাইজী। আপনার পায়ে ধরছি আমি। দেবীচরণ ভয়ে এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গোঁসাই বলিল, কেউ জানতে পারত না হে, কাকে কোকিলে না। মিছে ভয় করলে তুমি। তা যাক, কিন্তু সাবধান, বুঝেছ?

রেহাই পাইয়া দেবীচরণ যেন বাঁচিয়া গেল, সে বিবর্ণ মুখেই পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে না। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে তা হ'লে। দেখবেন আপনি। আপনাকে—আপনি—মানে—। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া প্রলাপের মত সে বকিতে আরম্ভ করিল।

আবার পাছে গোঁসাইজীর সহিত দেখা হইয়া যায়, সেই ভয়ে রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় এক জনবিরল গলি-পথ ধরিয়া বাড়ি ফিরিল; কিন্তু মনে মনে তাহার কৌতূহলের আর সীমা ছিল না। এই ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি কে? গোঁসাই তো বহুবল্লভ; তাহার উপর জাতিকুলশীল সব মজাইয়া তাহার অভিসার। সম্প্রতি ছুতারদের গলিতে নাকি প্রভাতে তাহার পদচিহ্ন দেখা যায় বলিয়া লোকে অনুমান করে। ছুতারদের বিধবা মেয়ে দাসী—দুর্গাদাসীর দুয়ারে তাহার করপদ্মের ছাপ পাওয়া যায়। দেবীচরণের মনটা কুৎসিত আনন্দে ভরিয়া উঠিল, ধান্যলুব্ধ ঘুঘু এইবার জটিল জালে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, একটা ঢাক কাঁধে করিয়া কথাটা সে গ্রামময় ঘোষণা করিয়া বেড়ায়। আনন্দের আবেগে সে অভ্যাসমত সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে আপনমনেই পাগলের মত হাত পা নাড়িয়া নানা ভঙ্গি করিয়া উঠিতেছিল।

বাড়ি আসিয়াই সে তাহার ধন্বন্তরি ঔষধালয়ের দুয়ারটি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। খিলখিল হাসি! বাড়িখানা যেন সে হাসির ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে! তাহার বুকে যেন খিল ধরিয়া গেল। ভামিনী হাসিতেছে! ভামিনী হাসে, হাসিতে জানে! কিন্তু সে হাসি হাসায় কে? রক্ত যেন সনসন করিয়া মাথার দিকে উঠিয়া চলিয়াছে!

দরজার গায়ে একটা লম্বা ফাটল, সেই ফাটলে দেবী চোখ পাতিল। ও, দুই সখীতে আনন্দ হইতেছে! দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু অদ্ভুত, ভামিনী সেই বনহরিণী শাড়িখানা আধুনিক রুচি অনুযায়ী ঘের দিয়া পরিয়াছে, পিঠে বেণী, কানে ও দুইটা কি? ঝুমকো, হ্যাঁ, ঝুমকোই তো মনে হইতেছে। ঝুমকো কোথা পাইল ভামিনী? ভামিনীর সম্মুখেই দেবীর জেঠতুত বোন মণি বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।.

ভামিনী মণিকে বলিল, টুং টাং মিসিন টান। বুঝতে পারতা নেই বাঙালী লোক, আমি মেমসাহেব আছে। এম. এ., বি. এ. পাস করা হ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে মণি এবং ভামিনী উভয়েই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। কিশোরী কণ্ঠের খিলখিল হাসি, সে হাসিতে বাস্তব দিবালোকও যেন স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া ভামিনী বলিল, এইবার ভাই, তুমি রাক্কুসী সাজ।

—না ভাই, আগে তুমি নাচ।

—আচ্ছা। ভামিনী ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া হাত দুইটি তুলিয়া ধরিল, তারপর দুই চারি পা ধীরে ধীরে ফেলিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শিশুরা যেমন নৃত্যের অক্ষম অনুকরণ করে, তেমনই খানিকটা নাচিয়া ভীষণ বেগে খানিকটা ঘুরপাক দিয়া দিল। নৃত্য শেষ করিয়া সে মণির কাছে হাত পাতিয়া বলিল, বকশিশ, বাবুলোক।

মণি বলিল, লবডঙ্কা লেগা, লবডঙ্কা?

দেবীচরণ আর থাকিতে পারিল না, সে দরজা খুলিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, আচ্ছা আঁচ্ছা, বকশিশঠো হামি দেগা।

মুহূর্তে অবগুণ্ঠনহীনা ভামিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; বারবার কাপড়ের আঁচল টানিয়া

মাথায় অবগুণ্ঠন দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; আঁটসাঁট করিয়া ফের দিয়া পরা কাপড়ের আঁচল আসিল না। ভামিনী ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল। মণিও ভয়ে যেন শুকাইয়া গিয়াছে। দেবীর কঠোর শীলতার অনুশাসনের কথা তো তাহার অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু দেবীর অন্তর আজ ভরিয়া উঠিয়াছে। ভামিনীর এমন কৌতুকময়ী লাস্যময়ী রূপ সে কখনও দেখে নাই। সে মণিকে বলিল, কি বকশিশ দিতে হবে রে মণি, নাচওয়ালীকে ?

মণি শঙ্কিত হইলেও—ভগ্নী, তাহার উপর সে তাহার পোষ্য নয়, সে এবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, এই দেখ দাদা, মার-ধোর কর তো ভাল হবে না কিন্তু, আমি কখনও আর তোমার বাড়ি মাড়াব না।

—যা গেল ! মার-ধোরের কথা কোথায় পেলি ?

মণির কথা তখনও শেষ হয় নাই ; সে বলিল, আহা বেচারী, আমার নতুন ঝুমকো দেখাতে এলাম তো বললে, আমায় একবার পরিয়ে দাও না ভাই। তাই ঝুমকো প'রে আমরা দুজনে একটু আমোদ করছি, তা না—এলেন আমার আয়ান ঘোষ একেবারে রক্তচক্ষু হয়ে।

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি যদি ঝুমকোই গড়িয়ে দিই ওকে ?

—কই, দাও দেখি, তবে জানি হ্যাঁ ? তা না, ভাত দেবার সোয়ামী নয়, কিল মারবার গোঁসাই।

দেবীচরণের মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল ; সে বলিল, দিতে পারি, তুই কই একবার রাক্ষুসী সেজে দেখা দেখি। সেটা তো দেখা হ'ল না।

মণি লজ্জা করিল না। তাহার যেন জেদ চাপিয়া গিয়াছে, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাপড়ের আঁচলে গাছ-কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, দেখ, তিন সত্যি কর।

হাসিয়া দেবী বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—উহুঁ। কি হ্যাঁ ? বল, ঝুমকো দোব, ঝুমকো দোব, ঝুমকো দোব।

দেবীচরণ তাই বলিল। মণি কালো মেয়ে, কিন্তু চোখ দুইটি বড় বড়, মাথায় চুলও একরাশ। মাথার চুল সে এলাইয়া অল্প কয়েক গাছা মুখের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তারপর চোখ দুইটা যথাসম্ভব উগ্র ও বিস্ফারিত করিয়া, হাঁ করিয়া হাত দুইটা নাড়িতে নাড়িতে দেবীর দিকে ছুটিয়া আসিল। সত্যই ভয়ঙ্করী রূপ ! দেবী হাসিতে হাসিতে বলিল, তোদের বউকে—বউকে—ঘরের মধ্যে।

মণি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়াই কিন্তু চীৎকার করিয়া উঠিল, জল জল ! দাদা, বউয়ের ফিট হয়ে গেছে, প'ড়ে রয়েছে মেঝের ওপর।

মণির রাক্ষসী মূর্ত্তির আতঙ্কে নয় ; দেবীচরণের উগ্রমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভামিনী সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া ছিল।

চোখে মুখে জল দিতেই অবশ্য চেতনা হইল। মণি পুলকিত কণ্ঠে বলিল, তোর জন্যে আজ ঝুমকো আদায় করেছি ভাই।

আশ্চর্য্য ! ভামিনী আবার যেন প্রাণহীন পুতুল হইয়া গিয়াছে। উচ্ছ্বাসের চাঞ্চল্য দূরের কথা,

স্পন্দনও যেন অনুভব করা যায় না। দেবীচরণ বলিল, ওকে শুয়ে থাকতে বল মণি, তুর্ব্বল শরীর। রান্না আমিই করছি।

উনান ধরাইতে ধরাইতে সে প্রশ্ন করিল, তোর ঝুমকোতে খরচ পড়ল কত রে মণি ?

মণি বলিল, ঝুমকো তোমার কুড়ি টাকাতেও হবে। আমারটা একটু ভারী আছে তো, সাতাশ আটাশ লেগেছে আমার।

নীরবে উনানে কাঠ দিতে দিতে দেবী ভাবিতেছিল, এক শত টাকা—ত্রিশ টাকা গেলেও, সত্তর টাকায় অন্তত একজোড়া রুলি হয়।

—আমি চললাম দাদা, ভাত নামাবার সময় আমাকে বরং ডেকো।

—অ্যাঁ ? দেবী মুখ তুলিয়া মণির দিকে চাহিল।

—বাবা রে! চোখ তুটো কি হয়েছে তোমার দেবীদা! একবারে লাল কুঁচ, দেড়খানা চোখ যেন আড়াইখানা হয়ে উঠেছে। এত ক'রে ঝুঁকে ধোঁয়ায় ফুঁ পেড়ো না।

* * * *

সত্যই, কয়েকদিন পর দেবীচরণ ভামিনীর কানে ঝুমকো এবং হাতে রুলি পরাইয়া দিল। ভামিনীর দেহে জীবন-সঞ্চারের জন্য সে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে সর্ব্বাঙ্গ তাহার সোনায় মুড়িয়া দিবে। সে উপায় পাইয়াছে, পথ চিনিয়াছে।

ভামিনীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল মণির বাড়ি। দেবী একটু তৃপ্তির হাসি হাসিল। সে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, এমনই ছুটিতে ছুটিতে ভামিনী আসিয়া তাহার পায়ে ঠক করিয়া একটি প্রণাম করিবে। এই শিষ্টাচারগুলি ভামিনীর বড় ভাল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের মেয়ে, ধর্ম্মে শিষ্টাচারে নিষ্ঠা যে স্বাভাবিক।

কিন্তু ভামিনী ফিরিয়া আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন আবার সেই পূর্ব্বের ভামিনী। প্রণামও সে করিল, কিন্তু দেবীচরণ সে প্রণামে ক্রুদ্ধ না হইয়া পারিল না। সে পা তুইটা সরাইয়া লইয়া বলিল, থাক।

ভামিনী ভীত দৃষ্টিতে দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবী বলিল, তোমার ব্যাপার কি বল দেখি ?

ভামিনী নিরুত্তর; কিসে যেন তাহার মুখের রক্ত তীব্র আকর্ষণে শোষণ করিয়া লইতেছে। দেবীর বুকেও ক্রোধ ক্ষোভ তুর্জ্জয় আক্রোশে পশুর মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, সে ভামিনীর ভাবান্তর গ্রাহ্যও করিল না, তাহার হাতখানা ধরিয়া নির্দ্দয়রূপে একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, বল বল।

সে নির্দ্দয় আকস্মিক আকর্ষণে ভামিনী মাটির প্রতিমার মতই উঠানে সশব্দে পড়িয়া গেল। দেবী আবার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, কিন্তু দেহখানা অস্বাভাবিক ভারী হইয়া উঠিয়াছে। দেবী হাত ছাড়িয়া দিয়া ভামিনীর দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, হ্যাঁ, ফিটই হইয়াছে! ছুটিয়া জলের ঘটি আনিয়া সে ভামিনীর মুখে চোখে জলের ছিটা দিল। কিন্তু একি, চেতনা হয় না যে! এবার সে তাড়াতাড়ি তাহার ওষুধের ঘরে ঢুকিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল—অ্যামোনিয়া। কই ?

কোথায় ? কোথায় যে কি থাকে ! সে ছুটিয়া উপরে গেল, সেখানে তাহার একটা আলমারি আছে। হায় রে জীবনের অভিশাপ ! ভামিনী পাথর হইয়া যায়, পুতুল হইয়া যায় ! কই অ্যামোনিয়া ?

—বউদি ! ও বউদি !

কে—কে ডাকে ? কাহাকে ডাকে ?

—আপনার নাকি গয়না হ'ল নতুন ? একবার বেরিয়ে আসুন দেখি। আজ একখানা খুব ভাল গান শোনাব আপনাকে।

মুখুজ্জেদের সেই গায়ক ছেলেটা। আলাপ হইয়া গিয়াছে, গোপন আলাপ ! স্ত্রীয়াং চরিত্র—স্ত্রীয়াং চরিত্র—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যঃ ! আর্সেনিক, আর্গট, কার্বলিক, কোথায় অ্যামোনিয়া ?

'এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আনলে বল কে ?' ছেলেটা গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ! স্ত্রীয়াং চরিত্র—স্ত্রীয়াং চরিত্র !

ওটা তো সেকরাদের বরাতী—রাখিয়া দিতে গিয়া বোতলটা সে টানিয়া বাহির করিল।

মেজার গ্লাসে তরল মৃত্যু—সাইনাইড। হউক, শাপমোচন হউক, উভয়ের জীবনের অভিশাপ !

—মণিদি, মণিদি, এ বাড়ির বউদির বোধ হয় ফিট হয়েছে। প'ড়ে রয়েছেন উঠোনে। গান বন্ধ করিয়া ছেলেটা এবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

দেবীর হাতে ফিটের ওষুধ ! ও কে ? দেবী চমকিয়া উঠিল। সে নিজে ? এত বর্ব্বর ভয়াবহ রূপ তাহার ! দেওয়ালে ঝুলানো আয়নাখানার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। উঃ, তাহারই ভয় করিতেছে ! অভিশাপের রূপ এত ভয়ঙ্কর ! না না, অপরাধ নাই, অপরাধ নাই। কন্যা কাময়তে রূপম্। সে বর নয়, সে অভিশাপ।

বাড়িখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। পুলিস আসিয়াছে, সুরতহাল রিপোর্ট লেখা হইতেছে। দাওয়ার এক কোণে মণি বসিয়া আছে ভামিনীকে লইয়া। ভামিনীর মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, চোখে অর্থহীন দৃষ্টি।

# বিপিনের সংসার

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )
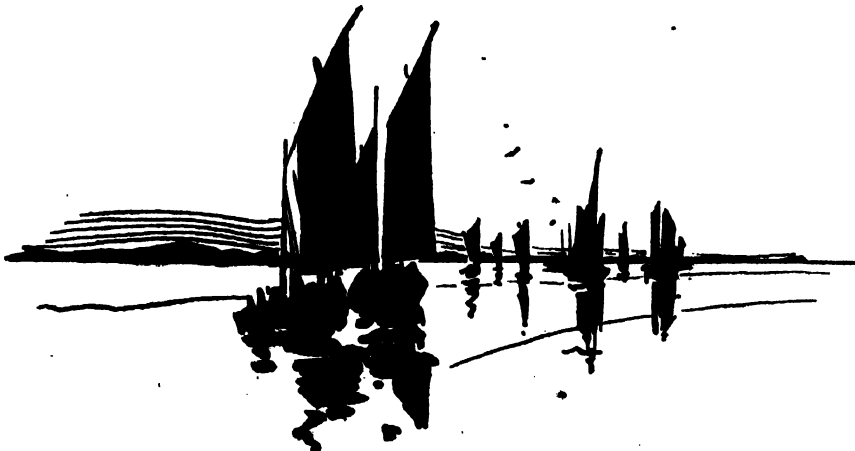
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রে বিপিনের ভাল ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। মানী তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা হইলে সে আজও মনে রাখিয়াছে!

—তবে যে বলে, বিয়ে হ'লেই মেয়েরা সব ভুলে যায়!

বিপিনের পৌরুষগর্ব্ব একটু তৃপ্ত হইয়াছে। মানী জমিদারের মেয়ে, সে গরিব, লেখাপড়া এমন কিছু জানে না, দেখিতেও খুব ভাল নয়, তবু তো মানী তাহার সঙ্গেই নির্জ্জনে কথা বলিবার জন্য লুকাইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল!

দুই তিন দিনের মধ্যে মানীর সঙ্গে আর দেখা হইল না। অনাদিবাবু তাহাকে লইয়া হিসাব-পত্র দেখিতে বসেন, রোকড় আজ দুই মাস লেখা হয় নাই, খতিয়ান তৈয়ারি নাই, মাসকাবারী হিসাবের তো কাগজই কাটা হয় নাই। খাইবার সময় বাড়ির মধ্যে যায়, খাইয়া আসিয়াই কাছারি-বাড়িতে গিয়া জমিদারবাবুর সামনে বসিয়া কাজ করিতে হয়।

অনাদিবাবু লোক খারাপ নন, তবে গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথাবার্ত্তা বেশি বলেন না। জমিদারির কাজ খুব ভাল বোঝেন, তিনি আসনে বসিয়া থাকিলে কাজে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

—বিপিন, গত মাসের প্রজাওয়ারী হিসেবটা একবার দেখি!

বিপিন ফাঁপরে পড়িল। সে খাতায় গত তিন মাসের মধ্যে সে হাতই দেয় নাই।

—ও খাতা এখন তৈরি নেই।

—তৈরি নেই, তৈরি কর। কিস্তির আর দেরি কি? এখনও যদি তোমার সে হিসেব তৈরি না থাকে—

তারপরে আছে নানা ঝঞ্ঝাট। জেলেরা কোমড়-জাল ফেলিয়াছিল পুঁটিখালির বাঁওড়ে, বিপিনই জাল পিছু পাঁচ টাকা হিসাবে তাহাদের বন্দোবস্ত দিয়াছিল; আজ চার মাস হইয়া গেল, কেহ একটি পয়সা আদায় দেয় নাই। সেজন্যও জমিদারবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল।

আজই অনাদিবাবু বলিলেন, তুমি খেয়ে-দেয়ে বীরু হাড়ীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই একবার ঘোষপুরে যাও, আজ কিছু বেটাদের কাছ থেকে আনতেই হবে। মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, খরচের অন্ত নেই। আজ অন্তত কুড়িটি টাকা নিয়ে এস। এই রৌদ্রে খাইয়া উঠিয়াই ঘোষপুর ছুটিতে হইবে! নায়েব গোমস্তা প্রজাবাড়ি তাগাদা করিতে দৌড়ায় কোন্ জমিদারিতে? ইঁহাদের এখানে এমনই ব্যবস্থা। পাইক-পেয়াদার মধ্যে বীরু হাড়ী এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। বাজে পয়সা খরচ ইঁহারা করিবেন না, সুতরাং আদায়ের অবস্থাও তথৈবচ।

সন্ধ্যার সময় ঘোষপুর হইতে সে ফিরিল।

জেলেদের পাড়ায় আজ দুই তিন মাস হইতে ঘোর ম্যালেরিয়া লাগিয়াছে। কেহ কাজে বাহির হইতে পারে নাই। কোমড়-জাল যেমন তেমনই জলে ফেলা রহিয়াছে। তবুও সে নিজে গিয়াছিল বলিয়া তাহার খাতিরে টাকা চারেক মাত্র আদায় হইয়াছে।

রাত্রে অনাদিবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন বাড়ির মধ্যে। গিন্নীও সেখানে ছিলেন।

—কত আদায় করলে বিপিন?

বিপিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চার টাকা।

অনাদিবাবু গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন। চার টাকা মোটে! বল কি? এঃ, এর নাম আদায়? তবেই তুমি মহালের কাজ করেছ!

গিন্নী বলিয়া উঠিলেন, জেলেদের মহালে গেলে বাপু, এক আধটা বড় মাছই না হয় নিয়ে এস! মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, তা তোমার কি সে হুঁস-পব্ব আছে? সেদিন বললাম ধোপাখালির হাট থেকে মাছ আনতে, না আড়াই সের এক কাৎলা মাছ পয়সা দিয়ে কিনে এনে হাজির!

বিপিনের ভয়ানক রাগ হইল। একবার ভাবিল, সে বলে, বেশ, এমন লোক রাখুন, যে প্রজা ঠেঙিয়ে বিনি পয়সায় মাছ আপনাদের এনে দিতে পারবে। আমি চললুম, আমার মাইনে যা বাকি পড়েছে আজই চুকিয়ে দিন। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলাইয়া গেল। কেবল বলিল, মাছ কেউ এখন ধরছে না মাসীমা। সবাই মরছে ম্যালেরিয়ায়, মাছ ধরবার একটা লোকও নেই। বিপিন সামলাইয়া গেল মানীর কথা মনে করিয়া। মানী এখানে থাকিতে তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সে অপ্রীতিকর কিছু করিতে পারিবে না।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন, আর বার-বাড়িতে যাচ্ছ কেন, একেবারে খেয়ে যাও।

ইঁহাদের বাড়িতে রাঁধুনি আছে—এক বৃদ্ধা বামুনের মেয়ে। সে রাত্রে চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া গিন্নী নিজেই পরিবেশন করেন। জামাইবাবুও একসঙ্গেই বসিয়া খান, তবে তিনি নরলোকের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। আজও বিপিন দেখিল, একই জায়গায় খাইতে বসিয়া জামাইয়ের পাতে পড়িল মিষ্টি পোলাও, তাহার পাতে দেওয়া হইল সাদা ভাত। তবে একসঙ্গে বসাইবার মানে কি? সেদিনও ঠিক এমন হইয়াছে। সে জানে, ইঁহারা কৃপণের একশেষ, জামাইয়ের জন্য কোনও রকমে ক্ষুদ্র হাঁড়ির এক কোণে দুটি পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে দিতে গেলে চলিবে কেন? তবু রোজ পোলাওয়ের ব্যবস্থা করিয়া বড়মানুষি দেখানো চাই! খাওয়ার পরে সে চলিয়া আসিতেছে বাহির-বাড়িতে, জানালায় মানী দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল, ও বিপিনদা!

—এই যে মানী, কদিন দেখি নি?

—তুমি কখন যাও, কখন খাও, তোমার নিজেরই হিসেব আছে? আজ পোলাও কেমন খেলে?

—বেশ।

—না, সত্যি বল না? ভাল হয়েছিল?

—কেন বল্ তো ?

—আগে বল না, কেমন হয়েছিল ?

—বললুম তো, বেশ হয়েছিল।

—আমি রেঁধেছি। তুমি মিষ্টি পোলাও খেতে ভালবাসতে, মনে আছে ?

—খুব মনে আছে। আচ্ছা, আমি যাই মানী, রাত হয়ে গেল খুব।

মানী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, মা তোমাকে পেট ভ'রে খেতে দিয়েছিল তো পোলাও ? আমি ওখানে যেতাম, কিন্তু—

বিপিন বুঝিতে পারিল, মানীর স্বামীও সেখানে, এ অবস্থায় মায়ের সামনে পল্লীগ্রামের রীতি অনুসারে মানীর যাওয়াটা অশোভন।

—হ্যাঁ, সে সব ঠিক হয়েছিল। আমি যাই।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে। মায়ের ধাত সে খুব ভাল রকমই জানে, জানে বলিয়াই সে এ প্রশ্ন বিপিনকে করিল। কিন্তু বিপিনের উড়ু উড়ু ভাব দেখিয়া সে একটু বিস্মিত না হইয়া পারিল না। বিপিনদা তো কখনও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় এমন যাই যাই করে না। হয়তো ঘুম পাইয়াছে, রাত কম হয় নাই বটে।

ইহার পর দুই দিন সে জমিদারবাবুর হুকুমে জেলেদের খাজনার তাগাদা করিতে ঘোষপুর গিয়া রহিল। ওখানকার মাতব্বর প্রজা রাইচরণ ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইহার পূর্ব্বেও সে কিস্তির সময় কয়েক দিন ছিল। নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, তবে আদর-যত্ন যথেষ্ট। সঙ্গতিপন্ন গোয়ালাবাড়ি, দুধ-দই-ঘিয়ের অভাব নাই। জমিদারের ব্রাহ্মণ নায়েব বাড়িতে অতিথি। বাড়ির সকলে হাত-জোড়, তটস্থ।

কিন্তু বিপিন মনে মনে ভাবে, এতে কি জমিদারির মান থাকে ? এমন হয়েছেন আমাদের জমিদার, যে একখানা কাছারি-ঘর করবেন না। অথচ এই মহলে সালিয়ানা আড়াই হাজার টাকা আদায়। একখানা দো-চালা ঘর তুলে রাখলেও তো হয় ; কিন্তু তাতে যে পয়সা খরচ হয়ে যাবে ! ওরে বাবা রে !

তিন দিনের দিন রাত্রে বিপিন জমিদার-বাড়ি ফিরিল। যাহা আদায়-পত্র হইয়াছে অনাদি-বাবুকে তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া একটু বেশি রাত্রে বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া ফিরিতেছে, জানালায় দাঁড়াইয়া মানী ডাকিল, বিপিনদা !

—এই যে মানী, কেমন ? তোর নাকি মাথা ধরেছিল শুনলুম, মাসীমার মুখে ?

মানী সে কথার কোনও উত্তর দিল না। বলিল, দাঁড়াও, একটা কথা বলি।

—কি রে ?

—তুমি সেদিন মিথ্যে কথা কেন ব'লে গেলে আমার কাছে ? তুমি পোলাও খেয়েছিলে সেদিন ?

মেয়েমানুষ তুচ্ছ কথা এতও মনে করিয়া রাখিতে পারে। বাসী কাসুন্দি ঘাঁটা ওদের স্বভাব।

দুই দিনের আদায়পত্রের ভিড়ের মধ্যে, কাছারির কাজের চাপে তাহার কি মনে আছে, সেদিন কি খাইয়াছিল, না খাইয়াছিল! মানীর যেমন পাগলামি!

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন? খাই নি, তাতে কি?

মানী বিপিনের কথার সুরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ঝাঁঝালো সুরে বলিয়া উঠিল, তাতে কিছু না। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা কেন ব'লে গেলে? বললেই হ'ত, খাই নি। আমি তোমায় ফাঁসি দিতাম?

বিপিন পুনরায় মৃদু হাসিমুখে বলিল, সেইটেই কি ভাল হ'ত? তোর মনে কষ্ট দেওয়া হ'ত না?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বিপিন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ও মানী, রাগ করবার কি আছে এতে? শোন না, ও মানী!

কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া বিপিন বাহির-বাড়ির দিকে চলিল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, মেয়েমানুষ সব সমান। যেমন মনোরমা, তেমনই মানী। আচ্ছা, কি করলাম, বল তো? দোষটা কি আমার?

মনে মনে, কি জানি কেন, বিপিন কিন্তু শান্তি পাইল না। মানীটা কেন যে তাহার উপর রাগ করিল? করাই বা যায় কি? মানী তাহার প্রতি এতটা টানে, তাহা বিপিন কি জানিত? জানিয়া মনে মনে যেমন একটু বিস্মিতও হইল, সঙ্গে সঙ্গে খুশি না হইয়াও পারিল না।

পরের দিন সকালে বিপিন বাড়ির মধ্যে খাইতে বসিয়াছে, জমিদার-গিন্নী আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা বিপিন, সেদিন আমি তোমাকে কি পোলাও দিই নি?

বিপিন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, কোন্ দিন?

—সেই যেদিন রাত্রে তুমি আর সুধাংশু একসঙ্গে খেলে?

—কেন বলুন তো?

—মেয়ে তো আমায় খেয়ে ফেলছে কাল থেকে, একসঙ্গে খেতে বসেছিলে দুজনে, তোমায় পোলাও দিই নি কেন, তাই নিয়ে। তোমায় কি পোলাও দিই নি, বল তো বাবা?

—কেন দেবেন না? আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি দু হাতা, আমার ঠিক মনে হচ্ছে না মাসীমা, একমনে খেয়ে যাই, কত কাজ মাথায়, অত শত কি মনে থাকে? কিন্তু আপনি যেন দু হাতা কি তিন হাতা—

জমিদার-গৃহিণী রান্নাঘরের দোরের কাছে সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতর কাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ শোন, নিজের কানে শোন। ও খেয়ে তো মিথ্যে কথা বলবে না? কার মুখে কি শুনিস, আর তোর অমনই মহাভারতের মত বিশ্বাস হয়ে গেল। আর এত লাগানি-ভাঙানিও এ বাড়িতে হয়েছে! এ রকম করলে সংসার করি কি ক'রে?

সেদিন রাত্রে খাইবার সময় বিপিন সবিস্ময়ে দেখিল, ভাতের পরিবর্তে মিষ্টি পোলাও পাতে দেওয়া হইয়াছে। ভোজনের আয়োজনও প্রচুর। এবেলা জামাই সঙ্গেই খাইতে বসিয়াছে।

বিপিন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহার ইহাও মনে হইল, জমিদার-গৃহিণী যে ওবেলা মানীর রাগের কথা তুলিয়াছিলেন, সে কেবল সেখানে জামাই ছিল না বলিয়াই।

জামাই প্রতিদিনই আগে খাইয়া দোতলায় চলিয়া যায়। বিপিন একটু ধীরে ধীরে খায় বলিয়া রোজই তাহার দেরি হয় খাইতে। বিপিন খাওয়া শেষ করিয়া বহির্বাটিতে যাইবার সময় দেখিল, মানী তাহারই অপেক্ষায় যেন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন হ'ল, বিপিনদা?

—চমৎকার হয়েছে! সত্যি, সুন্দর পোলাও হয়েছিল। খুব খাওয়া গেল! কে রেঁধেছিল, তুই?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, বল না, কে?

—তুই।

—ঠিক ধরেছ। তা হ'লে আজ খুশি তো? মনে কোনও কষ্ট থাকে তো বল।

—খুশি বইকি, সেদিন যে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলুম পোলাও না খেতে পেয়ে! তবে কষ্ট একটা আছে।

—কি, বল না?

—কাল তুই অত রাগ করলি কেন আমার ওপরে হঠাৎ? আমার কি দোষ ছিল?

মানী স্থির দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, বলব? বলতাম না, কিন্তু যখন বলতে বললে, তখন বলি। আমার কাছে কখনও কোনও কথা গোপন করতে না বিপিনদা, মনে ভেবে দেখ। বাবার হাত-বাক্স থেকে চাকু-ছুরি প'ড়ে গিয়েছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে বল নি, শুধু আমায় বলেছিলে, মনে আছে?

—উঃ, সে কত কালের কথা! তোর মনে আছে এখনও?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিয়াই চলিল, সেই তুমি জীবনে এই প্রথম আমার কাছে কথা গোপন করলে! এতে আমায় যে কত কষ্ট দিলে, তা বুঝতে পার? তুমি দূরে রেখে চলতে পারলে যেন বাঁচ।

—ভুল কথা মানী। সেজন্যে নয়, কথাটা তোমার মার বিরুদ্ধে বলা হ'ত নয় কি? ছেলেমানুষি ক'র না, অন্য কথা গোপনে আর এ কথা গোপনে তফাৎ নেই?

মানী হাসিমুখে কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলিল, বেশ গো ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, বেশ। এখন যা বলি, তাই শোন।

এই সময়ে ভেতরের রোয়াকে জমিদার-গৃহিণীর সাড়া পাইয়া বিপিন চট করিয়া জানালার ধার হইতে সরিয়া গেল।

পরদিনই বিপিনকে ধোপাখালির কাছারিতে ফিরিতে হইল।

আজকাল বেশ লাগে পলাশপুরে জমিদার-বাড়ি থাকিতে, বিশেষত মানীর সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমিবার পর হইতে সত্যই বেশ লাগে।

কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিবার জন্য অনাদি চৌধুরী তো তাহাকে মাহিনা দিয়া নায়েব নিযুক্ত করেন নাই ?

সমস্ত দিন মহালের কাজে টো টো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলা বিপিন কাছারি ফিরিয়া একা বসিয়া থাকে। ভারী নির্জ্জন বোধ হয় এই সময়টা। পৃথিবীতে যেন কেহ কোথাও নাই। কাছারির ভৃত্যটি রান্নার যোগাড় করিতে বাহির হয়, কাঠ কাটে, কখনও বা দোকানে তেল নুন কিনিতে যায়। সুতরাং বিপিনকে থাকিতে হয় একেবারে একা।

এই সময় আজকাল মানীর কথা অত্যন্ত মনে হয়।

সেদিন পোলাও খাওয়ানোর পর হইতেই বিপিন মানীর কথা ভাবে। এমন একদিন ছিল, যখন মানী ছিল তাহার খেলার সাথী। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘাসের উপর অর্দ্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীর মুখ কতবার মনে পড়িত।

আর একবার মনে পড়িয়াছিল বিবাহের দিন। উঃ, বড় বেশি মনে পড়িয়াছিল। নববধূর মুখ দেখিয়া বিপিন ভাবিয়াছিল, মানীর মুখের কাছে এর মুখ! কিসের সঙ্গে কি!

এ কথা সত্য, মানীরও ষোল বছরের সে লাবণ্যভরা মুখশ্রী আর নাই। এবার অনেক দিন পরে মানীকে দেখিয়া বুঝিল যে, মেয়েদের মুখে পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র আসে, বয়স তাহার বিজয়-অভিযানের দৃপ্ত রথচক্ররেখা যত শীঘ্র আঁকিয়া রাখিয়া যায় মেয়েদের মুখে, পুরুষদের মুখে তত শীঘ্র পারে না।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেই মানী তো বটে।

বিপিন ভালই জানিত, জমিদারের মেয়ে মানীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সে জিনিসটা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তবুও মানীর বিবাহের সংবাদে সে যেন কেমন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে।

তখন বিপিনের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। মনিবের মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি গ্রামের গোয়ালাপাড়া হইতে ঘি কিনিয়া টিনে ভর্ত্তি করিতেছিলেন। গাওয়া ঘি বিপিনদের গ্রামে খুব সস্তা, এজন্য অনাদিবাবু নায়েবকে ঘি যোগাড় করিবার ভার দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন বৈকালের ট্রেনে বিপিনের বাবা তিন টিন গাওয়া ঘি, তিন টিন ঘানি-ভাঙা সরিষার তৈল, তরিতরকারি, কয়েক হাঁড়ি দই লইয়া জমিদার-বাড়ি রওনা হইলেন। বিপিন কিছুতেই যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার বাবা ও মা কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিপিন তখন গ্রামের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের পদে সবে ঢুকিয়াছে, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।

তারপর সব একরকম চুকিয়া গিয়াছিল। আজ সাত বছর আর মানীর সঙ্গে তাহার দেখাশুনা হয় নাই। তারপর কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহার নিজের জীবনে। তাহার বাবা মারা গেলেন, কুসঙ্গে পড়িয়া সে কি বদখেয়ালিটাই না করিল। বাবার সঞ্চিত কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া দিনকতক সে ধরাকে সরা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর তাহার নিজের বিবাহ হইল, বিবাহের বছরখানেক পরে বিপিন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল যে, সে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, না আছে হাতে পয়সা, না আছে তেমন কিছু জমিজমা। সে কি ভয়ানক অভাব-অনটনের দিন আসিল তারপরে!

সচ্ছল গৃহস্থের ছেলে বিপিন, তেমন অভাব কখনও কল্পনা করে নাই। ধাক্কা খাইয়া বিপিন প্রথম বুঝিল যে, সংসারে একটি টাকা খরচ করা যত সহজ, সেই টাকাটি উপার্জ্জন করা তত সহজ নয়। টাকা যেখানে সেখানে পড়িয়া নাই, আয় করিয়া তবে ঘরে আনিতে হয়।

কিছুকাল কষ্টভোগের পর বিপিন প্রতিবেশীদের পরামর্শে বাবার পুরানো চাকুরিস্থলে গিয়া উমেদার হইল। অনাদিবাবু বিপিনের বাবাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এক কথায় বিপিনকে চাকুরি দিলেন।

আজ প্রায় এক বছরের উপর বিপিন এখানে চাকুরি করিতেছে। কিন্তু তাহার এ চাকুরি আদৌ ভাল লাগে না। যত দিন যাইতেছে, ততই বিপিনের বিতৃষ্ণা বাড়িতেছে চাকুরির উপর। ইহার অনেক কারণ আছে,—প্রথম ও প্রধান কারণ, অনাদিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর টাকার তাগাদায় তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ টাকা আদায় হয় না—ছোট জমিদারি, তেমন কিছু আয়ের সম্পত্তি নয়, অথচ তাঁহাদের প্রতিদিনের বাজার-খরচের জন্যও নায়েবকে টাকা পাঠাইতে হইবে। কেবল টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও,—এই বুলি।

রাত্রে ঘুমাইয়া সুখ হয় না, কাল সকালেই হয়তো অনাদিবাবুর চিরকুট লইয়া বীরু হাড়ী পলাশপুর হইতে আসিয়া হাজির হইবে। খাইয়া ভাত হজম হয় না উদ্বেগে।

আর একটি কারণ, ধোপাখালির এই কাছারিতে একা বারো মাস থাকা তাহার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর।

বিপিন এখনও যুবক, চার পাঁচ বছর আগেও সে বাপের পয়সা হাতে পাইয়া যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি করিয়াছে; সে আমোদের রেশ এখনও মন হইতে যায় নাই। বন্ধুবান্ধব লইয়া আড্ডা দেওয়ার সুখ সে ভালই বোঝে, যদিও পয়সার অভাবে আজ অনেক দিন হইল সে সব বন্ধ আছে, তবুও গল্পগুজব করিতেও তো মন চায়, তাহাতে তো পয়সা লাগে না। বাড়িতে থাকিতে বাড়িতেই দুইবেলা কত লোক আসিত, গল্প করিত। এই দুরবস্থার উপরও বিপিন তাহাদিগকে চা খাওয়ায়, তামাক খাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবদের পান খাওয়ানোর জন্য প্রতি হাটে তাহার এক গোছ পান লাগে। অত পান সাজিতে হয় বলিয়া মনোরমা কত বিরক্তি প্রকাশ করে; কিন্তু বিপিন মানুষ-জনের যাতায়াত বড় ভালবাসে, তাহাদের আদর-আপ্যায়ন করিতে ভালবাসে। দুরবস্থায় পড়িলেও তাহার নজর ছোট হয় নাই, জমিদারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর মত।

ধোপাখালি গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই, যত মুচি গোয়ালা জেলে প্রভৃতি লইয়া কারবার। তাহাদের সঙ্গে যতক্ষণ কাজ থাকে, ততক্ষণই ভাল লাগে। কাজ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের সঙ্গ বিপিনের আর এতটুকুও সহ্য হয় না। অথচ একা থাকাও তাহার অভ্যাস নাই। নির্জ্জন কাছারিঘরে সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া থাকিতে মন হাঁপাইয়া উঠে। এমন একটা লোক নাই, যাহার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করা যায়। আজকাল এই সময়ে মানীর কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। কাছারির চাকর ছোকরা ফিরিয়া আসে, কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে সামান্য একটু গল্পগুজব হয়। তারপর সে রান্নার যোগাড় করিয়া দেয়, বিপিন রাঁধিতে বসে। কাছারির বাদাম গাছটার পাতায়

বাতাস লাগিয়া কেমন একটা শব্দ হয়, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে, জেলেপাড়ার গদাধর পাড়ুইয়ের বাড়িতে রোজ রাত্রে পাড়ার লোক জুটিয়া হরিনাম করে, তাহাদের খোল-করতালের আওয়াজ পাওয়া যায়, ততক্ষণে রান্নাবাড়া সারিয়া বিপিন খাইতে বসে।

এক একদিন এই সময় হঠাৎ কামিনী আসিয়া উপস্থিত হয়।

হাতে একবাটি দুধ। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া বলে, খেতে বসলে নাকি বাবা ?

—এস মাসী, এস। এই সবে বসলাম খেতে।

—এই একটু দুধ আনলাম। ওরে শম্ভু, বাবুকে বাটিটা এগিয়ে দে দিকি। আমি আর রান্নাঘরের ভেতর যাব না।

—না, কেন আসবে না মাসী ? এস তুমি। বস এখানে, খেতে খেতে গল্প করি।

কামিনী কিন্তু দরজার চৌকাঠ পার হইয়া আর বেশি দূর এগোয় না। সেখান হইতে গলা বাড়াইয়া বিপিনের ভাতের থালার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলে, কি রাঁধলে আজ এবেলা ?

—আলুভাতে, আর ওবেলার মাছ ছিল।

—ওই দিয়ে কি মানুষে খেতে পারে ? না খেয়ে-দেয়ে তোমার শরীর ঐরকম রোগাকাঠি। একটু ভাল না খেলে-দেলে শরীর সারবে কেমন ক'রে ? তোমার বাবার আমলে দুধ-ঘিয়ের সোত ব'য়ে গিয়েছে কাছারিতে। এই বড় বড় মাছ ! তরিতরকারির তো কথাই—

বিপিন জানে, কামিনী মাসী বাবার কথা একবার উঠাইবেই কথাবার্ত্তার মাঝখানে। সে কথা না উঠাইয়া বুড়ী যেন পারে না। সময়ের স্রোত বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের পর হইতেই বন্ধ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কামিনী মাসীর পক্ষে তাহা আর এতটুকু অগ্রসর হয় নাই।

পৃথিবী নবীন ছিল, জীবনে আনন্দ ছিল, আকাশ-বাতাসের রং অন্য রকমই ছিল, দুধ ঘি অপর্য্যাপ্ত ছিল, কাছারির দাপট ছিল, ধোপাখালিতে সত্যযুগ ছিল—৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের আমলে।

সেসব দিন আর কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ভোজনের উপকরণের স্বল্পতার জন্য কামিনী মাসীর অনুযোগ এক প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাহা ছাড়া, কামিনী মাসী প্রায়ই দুধটুকু, ঘিটুকু, কোনদিন বা একছড়া পাকা কলা খাইবার সময় লইয়া হাজির হইবেই।

খানিকটা আপন মনে পুরানো আমলের কাহিনীর বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া চলিয়া যায়। সে বর্ণনা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিপিন শুনিয়া আসিতেছে আজ এক বছর। তবুও আবার শুনিতে হয়, তাহারই পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে কথা, না শুনিয়া উপায় কি ?

[ ক্রমশ ]

# সমসাময়িক সাহিত্য

শ্রী গোপাল হালদার

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে কোলাহল এত প্রচুর ও তাহাতে এত অদ্ভুত বিষয় ও রীতি লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে যে, স্বভাবতই এই সাহিত্যের স্বভাব কি, সাহিত্যেরই বা স্বধর্ম্ম কি, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন সেখানকার চিন্তাশীল ও রসজ্ঞদের চিত্তে জাগিয়াছে। কিন্তু এই অতি-কোলাহল ও অতি-অস্থিরতা সত্ত্বেও সে সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারিবে না—উহা নির্ব্বাক বা নির্জ্জীব। সর্ব্বাপেক্ষা বেশি যে কথাটি ওই সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই চোখে পড়ে, তাহা উহার বৈচিত্র্য। জগৎ ও জীবনের এমন একটি দিকও নাই যাহা পাশ্চাত্য চিত্তে কোন একটি বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল বা রস-সমৃদ্ধ প্রতিঘাত না জাগায়, অনুভূতির সৃষ্টি না করে। হয়তো তাহা সব ক্ষেত্রে সুন্দরও নয়, সার্থকও নয়; তবু মানিতেই হইবে, তাহাদের জীবন-বোধ বিচিত্রকে, সুন্দরকে, কায়া ও মায়া উভয়কেই, গ্রহণ করিতে জানে, রূপদান করিবার সাধনায় সমুৎসুক। প্রাণ তাহাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়, ইহাতে ভুল নাই।

মূলত ইহারও অবশ্য একটা নিতান্তই বাস্তব ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। পাশ্চাত্য জাতিগুলি আর্থিক তাড়নাতেই প্রথমত দিগ্‌দিগন্তে ছুটাছুটি করিতে সুরু করে। ইহাতে তাহাদের গৃহ সোনায় রূপায় ভরিয়া উঠিল, মন নিত্য নূতনের স্পর্শে আসিল; ফলে জন্ম লইল পাশ্চাত্য সভ্যতা, দেখা দিল তাহার দিগ্বিজয়। গতির তাল তাহার যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, তেমনই মনও হইয়া উঠিয়াছে দীপ্ত, শাণিত, বিদ্যুৎ-বজ্রবাহী। পৃথিবীর ঘরে ঘরে উহারা ঘুরিতেছে, আমাদের শিয়রের হিমালয়ে উহাদের পদস্পর্শ বৎসরে বৎসরে পড়িতেছে;—আফ্রিকার বিজন অরণ্যে, তিব্বতের বৌদ্ধ মঠে,—আকাশে এবং পাতালে—অতীতে ও ভবিষ্যতে—উহাদের কৌতূহলী দৃষ্টি নব নব বিস্ময়ের অভিযানে নিয়ত চঞ্চল। তাই, উহাদের সাহিত্যেও সঙ্গে সঙ্গে এমনই প্রশস্ত ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে যে, আজ অতি স্বভাবিক ভাবেই যে কোন অপরিচিত দেশ ও অপরিচিত জীবন-চিত্র উহারা সেখানে স্থাপন করিতে পারে, সেখানে তাহা 'পর' হইয়া থাকে না। সে সাহিত্যের ভাব, ভাষা জীবনযাত্রার সঙ্গে সমতালে চলিয়াছে বলিয়াই অবশ্য ইহা সম্ভব; আর ঠিক এই কারণেই আমাদের সাহিত্যের কোন কাহিনীর পটভূমি বাংলা দেশের বাহিরে স্থাপন করিতে হইলেও আমরা বিপন্ন বোধ করি। আমরা উপনিবেশ গড়িতে জানি না, 'প্রবাসী' থাকিতে চাহি; তাই সেই সব পরিচিত পরদেশের জীবনযাত্রা আমাদের কাছে সন্নিকট হয় না, আমাদের সাহিত্যেও তাহা 'প্রবাসী' থাকিয়া যায়। আমাদের জীবনের গণ্ডি সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত গিয়া ছুঁইয়াছে, তাই সাহিত্যেরও 'দৌড়' ঐদিকে সাঁওতাল জীবন পর্য্যন্ত। অন্য দিকে, আমরা পরাভবের লজ্জা ঢাকি অতীতের স্মৃতির বসনে, কিন্তু সে বাসও বৌদ্ধযুগের চীবর মাত্র—গুহাবাসী নগ্ন মানবের অর্দ্ধজাগ্রত জীবনযাত্রা আর মানব-চিত্তের সেই 'চেতনা-প্রত্যূষে'র সন্ধান আমাদের সাহিত্যে কি আমরা দিতে পারি? সে ভাষা, সে ভাব, সে পরিভাষা, সে পরিবেশ কি আমাদের জীবনে আছে, যাহাতে সাহিত্যেও আমরা উপস্থিত করিতে পারি Sons of Adam-এর কথা কিম্বা The Shape of Things to Come?

একই সময়ে যখন টমাস মান-এর 'জোসেফ ইন ঈজিপ্ট', আঁদ্রে মালরোর 'ডেজ অব হোপ', ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর 'দি ইয়াস' হাতে আসিয়া যায়, মনে পড়ে তখন আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই সমৃদ্ধির কথা—পুরাতন, নূতন, সমস্ত জীবনের চিত্রই ইহারা রূপায়িত করিতে চায়। কথাটা বিশেষ করিয়া স্পষ্ট হয় সোভিয়েট সাহিত্যের নব নব দিগাবিষ্কারের চেষ্টায়—পূর্ব্বেকার 'সিমেণ্ট' প্রভৃতি উপন্যাসে যাহা চোখে পড়িয়াছে, এখনকার 'ভার্জিন সয়েল আপ্‌টার্নড' বা 'ম্যান অ্যাণ্ড মাউণ্টেন্স'-এ যা স্পষ্টতর হইতেছে,—'এ হাই উইণ্ড ইন জেমাইকা'র লেখক রিচার্ড হিউজের রচিত 'ইন হেজার্ড'-এ প্রকৃতির সঙ্গে তেমনই সংগ্রামের আবার জাঁ ফেব্রিয়ে নামক ফরাসী লেখকের রচিত 'পেঁ দ্যঁ ব্রিক' নামীয় গত ফরাসী ধর্ম্মঘট সম্বন্ধীয় লেখায় এই কথাই মনে হইতেছিল; আর এখন আবার বিশেষ করিয়া তাহা মনে হইল, মার্কিন-মহিলা পার্ল বাকের এবার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে।

২

"আমার কোনও মিশন নেই, কোনও বিশেষ সেবার কাজও করছি ব'লে অনুভব করি না। লিখি, লেখা আমার স্বভাব ব'লে; আর যা জানি সে সম্বন্ধেই লিখি। তাই লিখি চীনের বিষয়ে, সেখানেই আমি বরাবর মানুষ হয়েছি। আমার নিজের জাতের মধ্যে আমার বন্ধু বলতে আছে অতি অল্প লোকই, অন্তরঙ্গ তো প্রায় কেউই নেই; তাই যাদের আমি জানি তাদের কথাই লিখি। তারা হ'ল চীনের লোক, যাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি বাস করতে—সেই অতি-সাধারণ লোকেরা, যারা সরকারি উর্দ্দি-তক্‌মার ধার ধারে না।" পার্ল বাকের এই কথা কয়টিতেই তাঁহার পরিচয় স্পষ্ট। তিনি মার্কিন মেয়ে না চীনের মেয়ে, তাহাই বলা শক্ত। চার মাস বয়সে তিনি চীনে আসেন, ইংরেজী শিখিবার আগেই শিখেন চীনে ভাষা, তারপর হইতে ইয়াংসির এই বায়ুমণ্ডলেই তিনি বর্দ্ধিত হইলেন। মার্কিন জীবন-যাত্রার কোন চিহ্নই তাঁহার লেখায় রেখাপাত করে নাই, আগাগোড়া চীনের জমিতেই তাহা জন্মিয়াছে। গর্জ্জমান পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্দাম তরঙ্গ তাঁহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের এই তীরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, কিন্তু আর তাঁহাকে দোলাইয়া নাচাইয়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া তরঙ্গনাদ তুলিতে পারিল না; সরল, সহিষ্ণু, চীনের তটভূমিতে প্রসারিত আকাশ ও বহুকর্ষিত মৃত্তিকার মাতৃক্রোড়ে এই চীনের দুহিতা মানুষ হইলেন—তাঁহার প্রাণে রহিল সেই মৃত্তিকার টান, তাঁহার লেখায় সেই মৃত্তিকার রস, রূপসৃষ্টিতে মৃত্তিকার ছাপ।—এই পার্ল বাকের বৈশিষ্ট্য।

'হাউস অব আর্থ'—'মাটির ঘর' নামে পার্ল বাকের সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'গুড আর্থ' প্রায় সকলেরই পরিচিত—অন্তত সিনেমার কৃপায়। 'দি সন্‌স' ও 'হাউস ডিভাইডেড' এই পরবর্ত্তী খণ্ডদ্বয়ে আসিয়া ওয়াংদের সে কাহিনী সমাপ্ত হয়। ইহা ছাড়াও তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসও আসলে চীনের জীবন-চিত্র—যেমন, 'দি এক্‌জাইল', 'ঈস্ট উইণ্ড : ওয়েস্ট উইণ্ড', 'দি মাদার' এবং 'দি ফাইটিং এঞ্জেল'। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাস 'দিস প্রাউড হার্ট' আমেরিকার পটভূমিকায় স্থাপিত,—অবশেষে লেখিকা কি তাঁহার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন? কিন্তু দৃষ্টিবান পাঠক বলিবেন, অসম্ভব। সুসান গেলর্ড আমেরিকার একঘেয়ে নাগর-দোলায় দুলিয়া যেন কিছুতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে পারেন না, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি সেই বায়ুমণ্ডলে মুক্তি না পাইয়া হাঁপাইয়া উঠে—প্রতিভার এই দ্বন্দ্ব ও প্রকাশের প্রয়াস মিসেস বাক নিপুণ তুলিতেই আঁকিতে বসিলেন। কিন্তু চীনা কালিতে ছাড়া বুঝি তাঁহার তুলিও স্বচ্ছন্দ হয় না। এই ধরণের মার্জ্জিত মনের সূক্ষ্ম পরিচয়দানে তাঁহারও শক্তি যেন দ্বন্দ্ব-পীড়িত। চীনের জনসাধারণ তো ইহারা নয়। বাকও যেন সুসানকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারিলেন না। বৃথা তাঁহার জন্মভূমিতে ফিরিবার প্রয়াস, চীনই তাহার স্বভূমি, স্বদেশ; চীনেরাই স্বজন।

যে চীন বাকের আত্মীয়, তাহার পরিচয়-লিপি তিনি আঁকিয়াছেন 'গুড আর্থ' এবং তৎপরবর্ত্তী 'দি সন্‌স' ও 'এ হাউস ডিভাইডেড' নামীয় উপন্যাসত্রয়ে। প্রধানত এই ত্রিপাদ গ্রন্থের নায়ক হইল ওয়াং লুং ও তাহার পরিবার—পুত্র ও পৌত্র। ইহাদের ঘিরিয়া চীনের পরিচিত জনসাধারণ ফুটিয়া উঠিতেছে—অতি স্পষ্ট, দৃঢ়, সাবলীল রেখায় পরিস্ফুট এক একটি চিত্র, আর কেন্দ্রস্থলে ওয়াং পরিবার

এবং চীনের কৃষিভূমি। নায়ক বলিতে বরং এই চীনের ভূখণ্ডই নায়ক, ওয়াং-পরিবারও সেই মৃত্তিকার মায়ারই সাক্ষী মাত্র।

সেদিন ওয়াং লুং-এর বিবাহ—'গুড আর্থ' সুরু হইল। বসিয়া বসিয়া ওয়াং কল্পনা-নেত্রে দেখিতেছে, ঘরে স্ত্রী আসিতেছে। শীতে গ্রীষ্মে আর ওয়াংকে উনুন ধরাইবার জন্য প্রত্যুষে উঠিতে হইবে না। প্রথমে ধরাইবে স্ত্রী, তারপর সে যদি ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ছেলেমেয়েরাই উনুনে আগুন দিবে, ঘর তাহার ছেলেমেয়েতে ভরিয়া উঠিবে। উনুন ধরাইবে, ক্ষেতে কাজ করিবে, সংসারে ছেলেমেয়েদের মানুষ করিবে—আসিতেছে ওয়াং-এর স্ত্রী—সুন্দরী কেহ নয়—কিই বা তাহাদের প্রয়োজন? হোয়াং-দের বাড়িতে ও-লৌ (O-Lau) ছিল দাসীকন্যা; সেই হইতেছে ওয়াং-এর স্ত্রী। ও-লৌ আসিল গৃহে, দাসীর মত, মূক জীবের মত তাহার সেবা। শুধু একবার সে জ্বলিয়া উঠিল, যখন আপনার অবস্থা ফিরিলে ওয়াং বারবনিতা লইয়া খুব বাড়াবাড়ি সুরু করিয়াছে—সে যে ওয়াং-এর সন্তানদের জননী! তবু ও-লৌ ধৈর্য্য-প্রতিমা—ধরণীর মতই সে—অন্নদাত্রী জীবজননী পৃথিবীরই প্রতীক যেন এই কৃষকনারী—নীরবে সংসারকে ধন-জন যোগাইয়াই সার্থক, পরিতৃপ্ত। স্তন্যদাত্রী ও-লৌ যেন জীবধাত্রীর প্রতিচ্ছবি—"সেই নারী ও তাহার শিশু যেন মৃত্তিকার মতই মেটে রঙের, মাটির মূর্ত্তির মতই তাহারা ছিল উপবিষ্ট।··· পরিণত পীত স্তন হইতে সন্তানের জন্য দুগ্ধ-ধারা বহিয়া আসিতেছে। তুষার-ধবল সেই স্তন্যধারা, শিশু যখন এক স্তনে পান করিতেছে, অন্য স্তন হইতে তখন নির্ঝর-ধারার মত ঝরিতেছে দুগ্ধ। মাতার তাহাতে আপত্তি নাই।" এমনই পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম তাহাদের জীবন। স্বামী-স্ত্রী ক্ষেতে কাজ করিতেছে, "নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক পরিপূর্ণ ছন্দে সমতালে কাজ করিতে করিতে সে (ওয়াং) তাহার (ও-লৌর) সহিত মিশিয়া যাইতেছে। তাহার চিন্তা আর ভাষায় রূপ লয় না, শুধু আছে এই সমপ্রাণ কর্ম্ম-প্রয়াস, এই মাটি উল্টাইয়া উল্টাইয়া রৌদ্রে দেওয়া, যে মাটিতে তাহাদের ঘর নির্ম্মিত হয়, তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তাহাদের দেবতাদের হয় সৃষ্টি।···একই ভাবে একই রূপে দুই জনে কাজ করিয়া চলিয়াছে—একই রূপে, একত্র—পৃথিবীর ফল উৎপাদন করিতেছে—নীরবে করিতেছে একত্র দুইজনায় কাজ।"

মাটিই নায়ক, ওয়াং যেন তাহারই টানে আবদ্ধ, তাহারই একাংশ মাত্র। জমি সে চিনে, জমি সে চায়; ক্ষেতের পর ক্ষেত সে বাড়াইতে ব্যস্ত। অনাবৃষ্টিতে সে প্রদেশ পুড়িয়া গেল, ওয়াং একবার দক্ষিণ দিকে জীবিকান্বেষণেও যাত্রা করিল। কিন্তু সেই শহুরে জীবন তাহার অসহ্য, মাটির টান তাহাকে টানে। শহরের পথে তরুণ ছাত্র দৃপ্তকণ্ঠে স্বদেশী বক্তৃতা দিতেছে; ওয়াং দাঁড়াইল, শুনিল, বুঝিল না,—ভয়ে সে সরিয়া গেল। সে মাটিকে চিনে, স্বদেশী আবার কি?—এমনই 'গুড অর্থে'র কাহিনী।

কিন্তু চীনের জীবন থামিয়া ছিল না—নাইও। ওয়াং-এর ছেলে উদিত হইল একেবারে বিপ্লবের সৈনিকরূপে। চীন-বিপ্লবের চিন্তা, আদর্শ, কর্ম্মপদ্ধতি তাহার জীবনের মধ্য দিয়া ওয়াং-এর সম্মুখে যেন এক চ্যালেঞ্জরূপে আসিয়া উপস্থিত—ওয়াং তা বুঝিতে চাহে না, বুঝিতে পারে না। ছেলেও পারে না পিতাকে তাহার নূতন আদর্শ বুঝাইয়া দিতে তবু সে চলিল তাহার সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ পথে, ওয়াং রহিল তাহার মাটি আঁকড়াইয়া। সেই মাটির অন্তরাল হইতে, সমাধিতল হইতে, ওয়াং লুং তাহার দৃঢ় হস্তখানি বাড়াইয়া আবার টানিয়া মাটির দিকে ফিরাইয়া আনিল আপনার পৌত্রকে। পুত্র ওয়াং তখন সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে দস্যুনেতৃত্বে উপনীত, পৌত্র সেই বিপ্লবের স্তরে স্বস্তি পায় না, সে চায় কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতে। বিপ্লবী সৈনিক ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিল, "যে কৃষক ওয়াং লুং ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে আপনার বংশধরদের জন্য সচ্ছলতা কামনা করিত, তাহারই আত্মা এখনও তাহার পুত্র-পৌত্রদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সমাধিক্ষেত্রের কাষ্ঠফলকে তাহারই সেই মর্ম্মকথা খোদিত—'ওয়াং লুং—দেহ-মনের সমস্ত সম্পদই যাহার মৃত্তিকার দান।'··· সেই রক্ত ও অস্থি গলিয়া গলিয়া দেশের সমস্ত স্তরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।"

এমনি পার্ল বাকের 'মাটির বাড়ি'। *

---

* শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন আচার্য্য মহাশয়ের 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' লিখিত Pearl Buck's Novels নামীয় প্রবন্ধ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য।

৩

পার্ল বাক চীনের লেখিকা, জাতিতে যাহাই হউন। চীন অবশ্য অপর জাতীয় অপর লেখকদেরও আকৃষ্ট করিতেছে, আঁদ্রে মাল্‌রো তাঁহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু তাঁহার চীন শহরের চীন—যে চীনকে আধুনিক চীনা বুদ্ধিবাদীরা সবচেয়ে বড় বলিয়া ঘোষণা করিতে চান,—আর তাই মিসেস বাকের সহিত তাঁহাদের তর্ক ও বিরোধ। আঁদ্রে মাল্‌রোর চীন সেই সংক্ষুব্ধ চীন—সাঙ্ঘাইয়ের সাম্যবাদী বিপ্লবী ও বিপ্লবপন্থী নিঃস্ব স্বশ্রমজীবীদের বিক্ষুব্ধ সংঘাতে চঞ্চল, যে চীনকে চিয়াং-কাই-শেক কঠিন নিষ্পেষণে দাবাইতেছেন, যেখানে তখন প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীর সহিত নব-চেতন নিঃস্বদলের শ্রেণীসংঘাত বাধিয়াছে—একই কালে যেখানে বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন চীনা সংস্কৃতি, নূতন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন জাতীয়তাবাদ ও নূতনতর শ্রেণী-সচেতন সাম্যবাদ মানুষের মনকে দ্বন্দ্বক্ষেত্রে পরিণত করিতেছে—পার্ল বাকের জগৎ হইতে মাল্‌রোর জগৎ অনেক দূরে। কারণ, মাল্‌রো মৃত্তিকার চিরন্তনী মায়ায় মুগ্ধ নন, তিনি সংঘাত-বহুল বর্ত্তমান সভ্যতার এই ধ্বংস-রূপের মধ্যেই আপনার কর্ম্মের ক্ষেত্র ও সৃষ্টির উপজীব্য দেখিতে পান। চীন ছাড়িয়া তাই স্পেনের সমরক্ষেত্রে তিনি আকৃষ্ট হন—গণতন্ত্রী স্পেনের আন্তর্জাতিক বৈমানিকদলের নায়ক হিসাবে এইখানে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইল—স্বচক্ষে দেখিলেন সেই সংঘাতের বর্ব্বর রূপ, আর তাহাই তুলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহার নূতনতম গ্রন্থে। 'ডেজ অব হোপ' মূল ফরাসীর সেই অনুবাদ।

কথা বলিতে 'ডেজ অব হোপে' কি আছে বলা শক্ত। গল্প তো প্রায় নাইই, শুধু একটি কল্পনাসমৃদ্ধ চিত্র—সাধারণতন্ত্রীরা ফ্রাঙ্কোর সহিত সংগ্রামে যে দৈহিক মানসিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সমুত্তীর্ণ হইতেছে, তাহার। ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ-বার্ত্তার সঙ্গে মাদ্রিদের শ্রমিক-পরিষদ ব্যস্ত হইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল—এইখানে গ্রন্থের আরম্ভ; তারপর বার্সিলোনা—বিমান-বহরের ঘটনাচিত্র; টলেডো—বিমান-যুদ্ধের একটি অদ্ভুত বর্ণনা; শেষ হইল—গুয়াদালার যুদ্ধের মধ্যে;—এইরূপ খণ্ড ঘটনাপুঞ্জ ও চিত্রগুলিকে একত্র করিয়াছে গ্রন্থোক্ত কয়েকটি চরিত্র। এক রণাঙ্গন হইতে অন্য রণাঙ্গনে তাঁহারা উপস্থিত হইতেছেন, কাহিনীগুলিকে গ্রথিত করিয়া তুলিতেছেন। মার্কিন সাহিত্যিক জন ডস পাসোস ঠিক এমনই চিন্তা ও কল্পনা সূত্রে তাঁহার ভ্রমণাভিজ্ঞতা লিখিয়া গিয়াছেন—স্পেন তাহারও মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়াছে। হয়তো ভঙ্গির দিক হইতে এই খণ্ডযোজনে মাল্‌রোর উপর তাহার রীতির প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ছিন্ন খণ্ডকে মানসিক অস্পষ্ট ভাবসূত্রে একত্র যোজনের পদ্ধতি তো জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর কৃপায় ( বিশেষ করিয়া আবার 'দি ইয়ার্সে'র ) আজ ঔপন্যাসিকের সাধারণ সম্পত্তি। তবু মাল্‌রোর এই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে ঝলসিয়া উঠা এই ক্ষণিক দৃশ্যগুলি তাঁহার রীতির নূতনত্বেরও সার্থকতার প্রমাণ।

'ডেজ অব হোপ' দিনপঞ্জী নয়, ঠিক উপন্যাসও নয়, শুধু সমর-চিত্রও নয়; উহার প্রধান রস মূরদের অত্যাচার-বর্ণনে বা টলেডোর মৃত্যু-প্রতীক্ষায় দণ্ডিত গণতান্ত্রিক সৈনিকের চিন্তা-বিশ্লেষণও ততটা নাই। উহার বৈশিষ্ট্য এই যে—মানব-সভ্যতার ঘোর দুর্দ্দৈব ও পরিণামের কথাই উহা অত্যন্ত সহজ ভাবে মনে করাইয়া দেয়। হয়তো কোন যোদ্ধাদল তর্ক জুড়িয়াছে, হয়তো কোন বিশ্রামরত শ্রান্ত সৈনিক চিন্তার স্রোতে ডুবিয়া পড়িয়াছে—যুদ্ধোদ্যোগে আদর্শ যাহা থাকে, যুদ্ধের মধ্যে পড়িয়া কি তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে? সংগ্রাম শুধু কি শান্তিভঙ্গ, না সমাজ-জীবনে উহাও ঠিক শান্তিরই মত একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ? কোনও আদর্শের কি সেখানেই মৃত্যু ঘটে, যেখানে তাহার পক্ষীয়দের পরাজয় হয়? মাল্‌রো বলিতে চান, নহে, নহে নহে;—আশার দিন তাহাতে ফুরায় না, তখনও থাকে 'ডেজ অব হোপ'।

টমাস মান বাইবেলের গল্পকে নূতন অবয়ব, নূতন প্রাণ দান করিয়াছেন জোসেফাসের কাহিনী বর্ণনায়; পার্ল বাক চিরন্তনী ভূমিশ্রী ও কৃষিলক্ষ্মীর এক রহস্যময় ধ্যানরূপ আমাদের প্রত্যক্ষ করাইতেছেন; আবার মাল্‌রো প্রমুখ লেখকেরা অতি-ত্রস্ত জীবন-যাত্রার ধ্বংসপুঞ্জের মধ্য হইতে নূতন চিন্তা ও অনুভূতির উপাদান উদ্ধার করিতেছেন—অপেক্ষাকৃত কম খ্যাত লেখকদের বিষয়বস্তুর ও বর্ণনা-রীতির বহুবিস্তৃত বৈচিত্র্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম—সর্ব্বত্র যে তাহা অসার্থক সৃষ্টি তাহাও নয়,—কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, প্রকৃতি ও মানবের মিলন-সঙ্ঘর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া জুল রোমেঁর মত জীবনের বহুবিস্তৃত প্রসার চিত্রণে, কিম্বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানব-চিন্তার ছায়া সন্ধানে, অথবা একেবারে মানব-সমাজের চিরপরিপালিত শ্রেণী-সংঘাত বিশ্লেষণে, দিনে দিনে যে কত প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে, তাহা দেখিলে কি কেহ সমসাময়িক সাহিত্যকে ক্ষীণায়ু বলিতে পারে?

# সম্পাদকীয়

## ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু-মুসলমান

দ্রবিড় বা অনার্য্য সংস্কৃতিকে জয় করিয়া ভারতবর্ষে যখন ধীরে ধীরে আর্য্য সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করে, তখন সম্ভবত একবার সংস্কৃতি-বিরোধ ঘটিয়াছিল। সেই দ্বন্দ্বের জয়-পরাজয়ের ইতিহাস বর্ত্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু-সংস্কৃতির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। বিশেষজ্ঞেরা জানেন, এই পরিচয়ে কখনও অনার্য্য প্রধান, কখনও আর্য্য প্রধান, অর্থাৎ শুধু জয়-পরাজয়ই হয় নাই, সম্মেলনও হইয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণে হিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে।

আজিকার দিনে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির বিরোধে সেই দ্বন্দ্বেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি; কিন্তু সমাধান চেষ্টা কুত্রাপি সফল হইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ, হায়দ্রাবাদ ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর আবদুল লতীফ এইভাবে নির্দ্দেশ করেন—

"ইস্‌লাম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। তাহাদের সমাজও বিভিন্ন আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি অবিমিশ্র একেশ্বরবাদী ও গণতন্ত্রী; মানবতার জন্য ইস্‌লাম বর্ণ, জাতি বা ভাষার কোন বাধা স্বীকার করে না—ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশকেও উপেক্ষা করে। কিন্তু অপরটিতে আছে বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র বর্ণাশ্রম প্রথা। প্রতীকবাদকে ভিত্তি করিয়াই তাহার বিকাশ ও পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বকে এক ধর্ম্ম বলা চলে না। ইহা বিভিন্ন ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া একটি সম্মিলিত ধর্ম্মতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে।"*

"ইসলাম বর্ণ, জাতি বা ভাষার কোন বাধা স্বীকার করে না—ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশকেও উপেক্ষা করে"—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বা সংস্কৃতিগত ঐক্যের ইহাই সর্ব্বপ্রধান বাধা। ভারতবর্ষে যতদিন অমুসলমান থাকিবে ততদিন ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা বর্ণ, জাতি, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমাকে উপেক্ষা করিয়া তুর্কী, আরব, পারশ্য, মিশর, বেলুচিস্তানের মুসলমানদের সহিত অধিকতর আত্মীয়তা বোধ করিবে, অবিচ্ছিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে ইহা অপেক্ষা প্রতিকূল মনোভাব কিছু হইতে পারে না। মাতুলালয়ের দিকে যতদিন আকর্ষণ থাকে, ততদিন শিশু কিছুতেই পিতৃগৃহের সহবৎ আয়ত্ত করিতে পারে না।

বিরোধ-অমীমাংসার আরও একটা বড় কারণ আছে। আর্য্য-অনার্য্য-দ্বন্দ্বের কালে স্বার্থদুষ্ট তৃতীয় দল ছিল না। থাকিলে এবং তাহারা ইংরেজ শাসকদের সমতুল্য শক্তিমান হইলে বিরোধ মিটিয়া কখনই হিন্দু সংস্কৃতির উদ্ভব হইত না। বাধাহীনভাবে আমরা যদি পরস্পর কামড়াকামড়ি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এতদিন নিঃসংশয়ে একটা বোঝাপড়া হইয়া যাইত এবং হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এতদিনে হয়তো একটা ভারতীয় সংস্কৃতিও গড়িয়া উঠিত। কিন্তু মেড়ার লড়াই দেখাইয়া যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গুঁতাগুঁতি বরদাস্ত করে, জখম হইবার আশঙ্কা হইলেই রাশ টানিয়া ধরিয়া চিরকালের জন্য রোখটাকে শানাইয়া রাখে। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে।

---

* মুজিবর রহমান খাঁ কৃত অনুবাদ।

এই সকল অসুবিধা স্মরণ করিয়াই ডক্টর সৈয়দ আবদুল লতীফ সমাধানের একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"ভারতের এই অকল্যাণকর পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে, আজ আমাদিগকে দুইটি বিষয় সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রত্যেক সংস্কৃতির স্বাধীনতা ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য। যদি এই দুইটি দাবী সত্যই অনিবার্য্য হয়, তবে দেশের সম্মুখে আজ ইহার সমাধানের মাত্র দুইটি পথ রহিয়াছে।...এই দুইটি পথের একটি অপরটির পরিণতি মাত্র। সুতরাং পথ মাত্র একটি। একটি পথ হইল, কি করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় বা জাতি বর্ত্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করিতে পারে, যাহার ফলে এক জাতি অন্য জাতির পদানত হইবে না, এবং অন্যটি হইল বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধন ও ভারতের বিভিন্ন জাতির জন্য স্বতন্ত্র সংস্কৃতিমূলক আবাস বা স্বতন্ত্র জাতীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠা। ভারতের বিভিন্ন জাতীয় অঞ্চলের মধ্যে একটি রাজনৈতিক বন্ধন থাকিবে এবং ইহার দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

মুসলমান-সংস্কৃতি-প্রাধান্যের জন্য ভারতবর্ষের চারিটি অংশ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া ডক্টর লতীফ বাকি অংশকে "হিন্দুস্থান" করিয়া তুলিতে নির্দ্দেশ দেন। এই চারি অংশ নিম্নলিখিতরূপ—

১। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর ও বাহাওয়ালপুর।

২। উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।

৩। দিল্লী-লক্ষ্ণৌ অঞ্চল। এই অংশের মুসলমানেরা ছড়াইয়া আছে; তাহাদিগকে সংহত করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আনিতে হইবে।

৪। দাক্ষিণাত্য অঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমানকে হায়দ্রাবাদে সংহত হইতে হইবে।

হিন্দু তীর্থস্থানগুলি সমস্তই "হিন্দুস্থানে" রহিল; করাচি মাদ্রাজ, কলিকাতা ও দিল্লী মুসলমান অঞ্চলে পড়িল।

এই বিভাগই যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোনও কথা নাই; কিন্তু এই ধরণের একটা সমাধান যে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, অপেক্ষাকৃত নিরীহ হিন্দুরা তাহা সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকে।

## পার্ল এস. বাক

আমেরিকার শ্রীমতী পার্ল এস. বাক বর্ত্তমান বৎসরে সাহিত্যের জন্য নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই সংখ্যার "সমসাময়িক সাহিত্য" বিভাগে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার তাঁহার সাহিত্যকীর্ত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী বাকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি জন্ম-অধিকারে (১৮৯২, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, হিল্‌স্‌বরো) আমেরিকান হইলেও সংস্কৃতি ও ভাবসামঞ্জস্যের দিক দিয়া চীন মহাদেশকেই স্বদেশ করিয়া লইয়াছেন। দরিদ্র চীনা কৃষকদের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের সাহিত্যিক রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কৃতিত্ব। চীনকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সাফল্য। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সমপর্য্যায়ের আরও কয়েকজন সাহিত্যিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহারা স্বদেশ ও স্বসমাজের আকর্ষণ কাটাইয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন গণ্ডিতে সাহিত্যিক কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াও অপরিসীম উদারতা-গুণে সফলতা লাভ করিয়াছেন। আইরিশ লাফ্‌কাডিও হিয়ার্ন (১৮৫৬-১৯০৪) জাপানের সহিত আত্মীয়তা-চর্চ্চা করিয়া জাপানকে কেন্দ্র করিয়াই সাহিত্যিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জোসেফ কন্‌রাড (Teodor Josef Konrad Korzeniowski, ১৮৫৭-১৯২৪) জাতিতে পোলিশ হইয়াও ইংলণ্ডকে মাতৃভূমি করিয়া ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং এই শ্রেণীর লেখক-সমাজে ব্যতিক্রম; বিপরীত পথে তাঁহার খ্যাতি। তাঁহার জন্ম ভারতবর্ষের বোম্বাইয়ে (১৮৬৫), জীবনের দীর্ঘকাল তিনি ভারতবর্ষেই অতিবাহিত করেন এবং ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বত প্রান্তরের জীবনধারা বর্ণনা করিয়াই তাঁহার নাম; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার প্রেম ছিল না।

## কামাল আতাতুর্ক

বিগত ১০ই নবেম্বর তারিখে নব্য তুরস্কের স্রষ্টা মোস্তাফা কামাল পাশার মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুকালে তাঁহার

বয়স ৫৭ অতিক্রম করিয়াছিল। মহাযুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত তুরস্ক যে নিদারুণ দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছিল, কামাল পাশার অসামান্ত রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও নেতৃত্ব-প্রতিভা ব্যতিরেকে তাহার মুক্তি সম্ভব হইত না। তিনিই পৃথিবীতে একমাত্র মুসলমান নেতা, যিনি আগে দেশের ও জাতির একজন, পরে মুসলমান ছিলেন।

রাষ্ট্রের দিক দিয়াই যে তিনি শুধু তুরস্ককে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নহে, শরিয়ৎ-শাসিত সেই অশিক্ষা ও অবরোধের দেশে অল্প কয়েক বৎসরের চেষ্টায় সমাজে স্বাধীনতা ও মুক্তির বাতাস বহাইতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। ভারতবর্ষের ভয়াবহ কুসংস্কার ভেদ করিয়াও আজ যখন দেখিতেছি, এই প্রবল প্রতাপশালী বিদ্রোহীকে স্মরণ করিয়া অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তখন আশা হয়, কামালের সংস্কার-পদ্ধতি এদেশে কার্য্যকরী হইলেও এদেশের ধার্ম্মিকেরা তাহা সহ্য করিবেন। তুরস্কের মত ভারতবর্ষের মুক্তিও একদিন ঘটিতে পারে।

কামাল তুর্কী রমণীদের বোরখা খসাইয়া স্কার্ট ধরাইয়াছেন, অন্তঃপুরের অবরোধ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া সংসারের রাজপথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সর্ব্ববিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে উপার্জ্জনের পথ দেখাইয়াছেন, বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ প্রভৃতি যে সকল সামাজিক পদ্ধতিকে ক্ষতিকর বিবেচনা করিয়াছেন, নির্ম্মম আক্রমণের দ্বারা সে সকল পদ্ধতিকে দেশ হইতে দূর করিয়াছেন এবং তুর্ক-মস্তিষ্কে বুদ্ধির বাতাস লাগাইবার জন্য সর্ব্বগ্রাসী ফেজের ব্যবহার রদ করিয়াছেন।

এই গেল ঘরের কথা। ব্যবসায়ক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে বাহিরের যাবতীয় আক্রমণকে তিনি অমিততেজে রোধ করিয়াছেন। দেশীয় ব্যবসায়কে খর্ব্ব করিয়া বৈদেশিক আমদানি রপ্তানিকে প্রশ্রয় দেন নাই। খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিদের ছুঁচ-প্রবেশকে রোধ করিয়া ফাল-প্রবেশ ঠেকাইয়াছেন, ভাষা সাহিত্য ও হরফকে আরবী স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করিতেছে, সেই ধর্ম্মকে রাষ্ট্র হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। কামাল মহাতেজস্বী শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, আমরা তাঁহার জন্য শোক করিতেছি; কামাল দেশপ্রেমিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন, আমরা ভারতবর্ষে তাঁহার আবির্ভাব কামনা করিতেছি।

### "হায় রে বঙ্গদেশ!!!"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম-শতবার্ষিক সপ্তাহে নানা দিকে নানা সভা-সমিতি ও উৎসব হইয়া গেল, এখনও হইবে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আমরা বিভিন্ন ভক্তের মুখে শ্রবণ করিলাম। কলিকাতার সংবাদপত্রসেবীরা কেশব-প্রতিষ্ঠিত 'সুলভ সমাচারে'র কথা স্মরণ করিয়া নানা ভাবে তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। এই সম্মান কেশবচন্দ্রের প্রাপ্য ছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় এক পয়সা মূল্যের চার পৃষ্ঠা ব্যাপী সাপ্তাহিকের প্রবর্ত্তন করিয়া এবং সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কিত নানা হিতকারী নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতির (সকল শ্রেণীর) মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সর্ব্ববিষয়ে শিথিল বাঙালী সমাজে এই চেষ্টা গিরিলঙ্ঘনের তুল্য দুরূহ; ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও কেশবচন্দ্র এই দুরূহ কাজে হাত দিয়াছিলেন। ইহা প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কেশবের আদর্শে 'সুলভে'র পাঠকেরা কি ধরণের কথা শুনিতেন, আজিকার দিনে তাহা জানিতে আমাদের ঔৎসুক্য হইতে পারে। আমরা ১২৭৮ সালের ২রা ফাল্গুনের 'সুলভ' হইতে উপরের শিরোনামাযুক্ত একটি নিবন্ধ সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়া কেশবচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। এই হতভাগ্য দেশে এই নিবন্ধের অভিযোগগুলি এখনও প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয় নাই।

"হায় রে বঙ্গদেশ !!!

পাতা কতক ইংরাজি বাঙ্গলা এবং সংস্কৃত পুঁথি পড়ে আমরা মনে করি আমরা মানুষের মত হইয়াছি। জন কতক বাঙ্গালির ছেলে বি এ, এম এ হইয়াছেন বলিয়া, অহঙ্কারে আর আমাদের পৃথিবীতে পা পড়ে না। দুই চারিখানা ইংরাজি বাঙ্গলা খবরের কাগজ চলিতেছে বলিয়া আমরা আকাশ ছুঁইয়া বসিয়া আছি। বালকদিগের পড়িবার মত বৎসরে বৎসরে বাঙ্গালির রচিত দুই এক হাজার পুস্তক বিক্রয় হয় বলিয়া আর

আমাদের গৌরব দেখে কে? এই ভ্রমে পড়িয়া আমরা মারা যাইতেছি। ঢের হইয়াছে মনে করিলেই উন্নতির পথে কাঁটা পড়ে। দেশের উন্নতি কাহাকে বলে, সাধারণের উন্নতি কাহাকে বলে, লেখাপড়ার চর্চ্চা কাহাকে বলে, পাঠকগণ! আজ একবার মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

"পেনি এনসাইক্লোপিডিয়া" নামে বিলাতে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে, উহা ২৭॥ সাড়ে সাতাশ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে বিবিধ বিষয় লেখা আছে। ঐখানি অতি চমৎকার গ্রন্থ। বিদ্বান ব্যক্তিদিগের লিখিবার পড়িবার সময়, কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে, ঐ গ্রন্থখানি খুলিলেই তাহা জানিতে পারেন। ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ব্যয় শুনিলে বাঙ্গালির জিহ্বা তালুতে লাগিয়া যায়। বিলাতের বিখ্যাত পুস্তকবিক্রয়কারী চার্লস নাইট কোম্পানি ইং ১৮৬৩ সালে যে পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ গ্রন্থের ব্যয় এইরূপে লেখা আছে। প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্ত ১২০০০ বার হাজার টাকা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য দিতে হইয়াছে। ২৭॥ খণ্ড প্রণয়নের জন্য ৩৩০০০০ তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা পড়িয়াছে। ঐ গ্রন্থে অনেক ছবি আছে। তাহার ব্যয় ৮০০০০ আশি হাজার টাকা পড়িয়াছে। এই গ্রন্থখানির মোট ব্যয় চারি লক্ষ দশ হাজার টাকা।

"এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা" নামে বিলাতে আর একখানি এইরূপ গ্রন্থ আছে। চার্লস নাইট কোম্পানি ইহার সপ্তম এবং অষ্টম মুদ্রাঙ্কণের খরচের হিসাব এইরূপে দিয়াছেন। গ্রন্থ প্রণয়নের খরচ ৪০৯৭০০ চারি লক্ষ নয় হাজার সাত শত টাকা; ৩২৫০৩০ তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার ত্রিশ টাকার কাগজ লাগিয়াছে। ছাপাইবার খরচ ৩৬৭০৮০ তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার আশি টাকা। ছবির খরচ ১৮২৭৭০ এক লক্ষ বিরাশি হাজার সাত শত সত্তর টাকা। বাঁধাইবার খরচ ২২৬১০০ দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক শত টাকা। গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের খরচ ১১০৮৯০ এক লক্ষ দশ হাজার আট শত নব্বই টাকা। কাগজের মাসুল ৮৫৭৩০ পঁচাশি হাজার সাত শত ত্রিশ টাকা। এই গ্রন্থখানির মোট ব্যয় ১৯২৯৯৪০ উনিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয় শত চল্লিশ টাকা।

এখন একটী কথা এই, দুইখানি গ্রন্থে যে এত টাকা খরচ হইল, এটী কি লোকসানের হিসাব না পাগলামির চূড়ান্ত? এ দেশে এত টাকা খরচ করিয়া যদি কেহ পুস্তক ছাপান, তবে তাঁহার ভিটাতে ঘুঘু চরে, এবং তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া লোকের মুখে যাহা আইসে তাই বলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বিলাতে এইরূপ ব্যবসায় করিয়া অনেকে বড় মানুষ হইতেছেন। বিলাতে পুস্তকের বড় আদর। সেখানে লোকের ভাত কাপড়ের যেরূপ খরচ পুস্তক ক্রয় করাও প্রায় সেইরূপ। পড়াশুনা করা সাহেব-দিগের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং পুস্তক না কিনিলে চলে না। একখানি পুস্তক পড়িতে কতদিন লাগে? দুই বৎসরও লাগে না, দশ বৎসরও লাগে না। একখানি পুস্তক সাঙ্গ হইলেই আর একখানি কিনিতে হয়। এই নিমিত্ত পুস্তকের ব্যবসায় সেখানে সুন্দররূপে চলে।

এ দেশের যাঁহারা পুস্তক লেখেন আর যাঁহারা পুস্তকের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের উভয়কেই অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। এখানকার লোকে স্কুল ছাড়িলেই পড়াশুনাকে বাঘের মত দেখে। কাঙ্গে কাঙ্গেই দোকানে পড়িয়া পুস্তকগুলি মাটি হইয়া যায়, কুই পোকার উদরেই উহার আরামের স্থান হয়। এখানকার গ্রন্থকার-দিগের চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই। এই নিমিত্ত কাহার গ্রন্থ লিখিতে সাহস হয় না। কত দিনে আমাদের দেশে লেখা পড়ার চর্চ্চা হইবে? কত দিনে লেখা পড়া না করিলে লোকে থাকিতে পারিবে না? কত দিনে ইয়ারকির আড্ডা এ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে? কত দিনে গালগল্প করা এ দেশের লোকের বিষবৎ বোধ হইবে? কত দিনে আমরা মানুষের মত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিব? কত দিনে এ দেশে পুস্তকের ব্যবসায় একটি লাভের ব্যবসায় বলিয়া পরিগৃহীত হইবে?"

গঙ্গার খাত দিয়া সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ টন জল বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। পাণ্ডবেরাও সম্ভবত বই পড়িতে ভাল বাসিতেন বলিয়া এই দেশকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন!

**মৃত্যু**

ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের উপর গত মাসে মৃত্যুর করাল ছায়া পড়িয়া দেশমাতার

কয়েকজন গুণী সন্তানের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিয়াছে। লাভ এবং ক্ষতি জগতের ইহাই চিরন্তন নিয়ম; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা যে হারে হারাইতেছি, সেই হারে লাভ করিতেছি না। এই সকল দুঃখকর মৃত্যুর মধ্যে কলিকাতা মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ননীগোপাল মজুমদারের অপঘাত মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।

মৌলানা সৌকত আলি—আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম, ভারতবর্ষের মুসলমান জননায়ক মৌলানা সাহেব বিগত ২৭এ নবেম্বর তারিখে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে দিল্লীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। •আলিগড়ে শিক্ষালাভের পর তিনি প্রায় সতের বৎসর কাল আবগারি বিভাগে চাকরি করেন ও ১৯১১ সালে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া ধর্ম্ম ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ আলির সহিত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিছুকাল দেশসেবার পর ইসলামের সেবাই তাঁহার কাম্য হয়, ইসলামের গৌরববৃদ্ধির জন্য তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের মুসলমান-সমাজের সমূহ ক্ষতি হইল।

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—'বিশ্বকোষ'-কার নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কর্ম্মীবিয়োগ ঘটিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, গত ১১ই অক্টোবর তারিখে তিয়াত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তিনি দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন ছাড়াও 'শূন্যপুরাণ', 'রসমঞ্জরী', 'চৈতন্যমঙ্গল', 'কাশীপরিক্রমা', 'তীর্থভ্রমণ' প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পুথিও সম্পাদন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা ও কামরূপের প্রত্নতত্ত্বিক এবং বঙ্গদেশের লৌকিক ও সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহেও তিনি সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি 'বিশ্বকোষ'; ইহার হিন্দী সংস্করণের দ্বারা তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাত হইয়াছিলেন। বাংলা 'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করিতে করিতে তিনি লোকান্তরিত হইলেন, সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাই দুর্ভাগ্য।

ননীগোপাল মজুমদার—স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা দেশে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের কাজে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন, ননীগোপাল মজুমদার তাঁহাদের অন্যতম। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে মহাস্থানের (বগুড়া-রাজশাহী) পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত স্তূপ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন; পরে ভারত সরকারের পক্ষে কলিকাতা মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে মোহেনজোদাড়ো ও হারাপ্পা খনন কার্য্যে এবং সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার্ জন মার্শাল প্রভৃতির প্রসিদ্ধ আবিষ্কারে নূতনভাবে আলোকপাত করেন। তাঁহার এই অপঘাত মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক ও নিষ্ঠুর। ভবিষ্যতে এই ধরণের নৃশংসতা হইতে ভারতীয় প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত গবর্মেণ্টের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

স্বামী শুদ্ধানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের আসনের প্রতি গত দুই বৎসরে মৃত্যু খুব ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। গত ৬ই কার্ত্তিক তারিখে অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। মিশনের ছায়ায় রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর কেহ বর্ত্তমান না থাকাতে স্বামী বিবেকানন্দের এই কৃতি শিষ্য অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের বহু ইংরেজী রচনার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বসু—প্রায় আশী বৎসর বয়সে বিগত ২৩এ কার্ত্তিক প্রথিতনামা সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসুর (ব্যাঙবাবু) মৃত্যু হইয়াছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল এবং নাট্য-সাহিত্য লইয়া তিনি প্রচুর চর্চ্চা করিতেন। ফলে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গিরিশ-লেক্চারা নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। ব্যঙ্গ ও রস সাহিত্যে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য।

**পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী**—'কামরূপ-শাসনাবলী' নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখক গৌহাটি কটন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুতে শ্রীহট্ট একজন কৃতী সন্তান হারাইল। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া পণ্ডিত ছিলেন এবং তেজস্বিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তিনি এক সময়ে অনেকের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন।

**ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী বিগত ১৮ই অক্টোবর তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটি বৃহৎ লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থাগারটিকে দুই অংশে ভাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া যান।

এতদ্‌ব্যতীত শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, বরিশালের মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, কাঁথির মধুসূদন জানা, মৌলভী আবুল হোসেন, ঢাকা পিপ্‌ল্‌স অ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার প্রাণকিশোর বসু প্রভৃতির মৃত্যুতেও দেশের অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে। মৃত্যুর এরূপ বিস্তৃত তালিকা দিয়া সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য যেন আমাদিগকে আর কখনও পালন করিতে না হয়, ইহাই কামনা করি।

### 'বাঙলার কথা' ও 'বেঙ্গল উইকলি'

বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী যে নিজেদের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় নন, তাহার প্রমাণস্বরূপ উপরোক্ত দুইটি ইংরেজী বাংলা সাপ্তাহিক বাংলা দেশের জনসাধারণের দরবারে দাখিল করিয়াছেন। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যদি তাঁহারা শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলে সপ্তাহে সপ্তাহে এই অকারণ ব্যয়ের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিতেন। গভর্মেণ্টের বেতার-প্রতিষ্ঠানই এই শ্রেণীর প্রচারকার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

### শ্রী, মিষ্টার ও এস্কোয়ার

নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় নামের পূর্ব্বে বা পরে মিস্টার অথবা এস্কোয়ার জাতীয় সম্মানসূচক তদ্ধিত বা প্রত্যয় প্রয়োগের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। তিনি একান্ত ভারতীয় 'শ্রী'র পক্ষপাতী, এমন কি মিঃ জিন্নাকেও তিনি শ্রীমহম্মদ আলি জিন্না বলিতে কুণ্ঠিত নন। 'শ্রী'র এরূপ অবাধ প্রচলন হইলে আমরা অনেক অনাবশ্যক লাঞ্ছনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই। কোনও নামের পূর্ব্বে বা পরে মিস্টার, এস্কোয়ার, বাবু, মৌলভী, জী—কোন্‌টা লাগাইব তাহা ভাবিয়া মাঝে মাঝে আমরা গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠি। মিঃ মুসোলিনি এবং মিঃ হিট্‌লার না বলিয়া আমরা যখন সিনর মুসোলিনি এবং হের হিট্‌লারই বলিয়া থাকি, তখন শ্রীফজলুল হকেদের আপত্তি না হইলে আমরাও একটা সহজ বন্দোবস্তের মধ্যে আসিতে পারি।

### সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধাদির কপিরাইট

এখন পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্যদেশে 'বার্ন কন্‌ভেন্‌শন' অনুযায়ী কপিরাইটের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আগামী বৎসরে বেল্‌জিয়ামে 'বার্ন কন্‌ভেন্‌শন' সংস্কারের জন্য সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি লইয়া একটি সভা বসিবে, তাহাতে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির কপিরাইট সম্পর্কে আইন অনেক শিথিল করা হইবে, এইরূপ কথা হইতেছে। কপিরাইট থাকাতেও অবশ্য আমাদের কোনই অসুবিধা নাই, কিন্তু একেবারেই না থাকিলে এদেশে সংবাদপত্র-পরিচালন অনেক সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য বাংলা দেশ হইতেও একজন প্রতিনিধি প্রেরণ আবশ্যক।

### এইচ. জি. ওয়েল্‌স

'পৃথিবীর ইতিহাস'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিক মিঃ এইচ. জি. ওয়েল্‌স আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি কলম্বো টাউন হলে একটি বক্তৃতা দিবেন। তাঁহার ইতিহাসে মহাপুরুষ মহম্মদ সম্বন্ধীয় উক্তিতে সম্প্রতি লণ্ডনে তাঁহার বাসগৃহের সম্মুখে যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত

হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া ওয়েল্‌স সাহেব যথেষ্ট সংসাহস প্রদর্শন করিতেছেন।

## ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিভ্রাট

'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রিভিউ' নামক সাময়িক-পত্রের প্রথম সংখ্যায় ভারতবর্ষে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্পর্কে যে সকল ভয়াবহ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আতঙ্কিত হইবেন। সাময়িক-পত্রিকাদিতে মাদুলি তাবিজ এবং দৈব ও স্বপ্নলব্ধ ঔষধের বিজ্ঞাপনের বহর দেখিয়া এই কথা বিশ্বাস করিতে একটুও বাধে না যে, এ দেশে প্রতি দশ হাজার অসহায় রোগপ্রবণ ব্যক্তির তদারক করিতে একজন করিয়াও শিক্ষিত ডাক্তার নাই। বাংলা দেশে যে প্রতি ৫৪০ স্কোয়ার মাইলে অর্থাৎ প্রতি একাশী হাজার সাতাশী জন অধিবাসীর জন্য মাত্র একটি করিয়া হাসপাতাল আছে, হাসপাতাল-সমাকীর্ণ শহরে বাস করিয়া কেই বা তাহা কল্পনা করিতে পারে! মেডিক্যাল রিভিউ বলেন, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসূতিদের জন্য মাত্র আট হাজার 'শয্যা'র বন্দোবস্ত সম্ভব হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ লক্ষ স্ত্রীলোক সন্তান-প্রসবের অব্যবস্থায় সাময়িকভাবে বা চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং সন্তান প্রসব করিতে গিয়া বৎসরে এক লক্ষ ষাট হাজার স্ত্রীলোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তাঁহার মতে ইহার মধ্যে শতকরা আশীটি মৃত্যু সহজেই নিবার্য্য। অথচ ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেই চিকিৎসার জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ মাথা পিছু বৎসরে পাঁচ আনা সাত পাইয়ের (পাঞ্জাব) বেশি নয়, এক আনাও (যুক্তপ্রদেশ) আছে! দুই শত বৎসর ইংরেজ শাসনের পরও যদি এই হিমালয়-পরিমাণ উন্নতি সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'আমরা পারিব না' বলিয়া স্বরাজ্য ঠেকাইয়া রাখার কোনই মানে হয় না।

## আদমসুমারির কলকাঠি

সাপ্তাহিক 'বিহার হেরাল্ডে'র ১৫ই নবেম্বর সংখ্যায় "Manipulating the Census" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ-পাঠে মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জিলায় কি ভাবে আদমসুমারির কলকাঠি নাড়িয়া বেহারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা অবগত হইয়া প্রতি-বেশীদের দূরদর্শিতা দৃষ্টে পুলকিত হইলাম। পৃথিবীব্যাপী বার্থকণ্ট্রোল বা জনসংখ্যা হ্রাসের যে চেষ্টা চলিতেছে, দৈহিক ও মানসিক সুখ-সুবিধা পরিহার না করিয়া এত সহজে মাত্র কলমের খোঁচায় যে তাহা সংঘটিত হইতে পারে, কে জানিত! বাঙালী হিন্দুর যে অতিশয় সুদিন আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেহারে বেহারীত্ব এবং বঙ্গে মুসলিমত্ব এত সহজে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সকল সুবিধাই বাঙালী হিন্দু লাভ করিবে। সেই দিন কত দূরে?

## গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

'অলকা' প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। ২০এ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে, গ্রাহকগণ পোস্ট আপিসে অনুসন্ধান করিয়া সেখানকার উত্তরসহ ৭৭ নং ধর্ম্মতলা স্ট্রীটে অলকা-কার্য্যালয়ে পত্র লিখিবেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৬৩।১ [illegible] রোড হইতে প্রকাশিত

বিশুদ্ধতায় ও গন্ধ-মাধুর্য্যে
অপরাজেয়।

ভারতের প্রিয়তম দন্তমঞ্জন

বাসন্তী কটন মিলস লিমিটেড
সকলেই বলেন—
বাঙ্গালীর
সবচেয়ে সেরা—
নিজস্ব
বাসন্তী-কাপড়
পূজায়
সব জায়গায় পাবেন
মিল
৩নং লায়ন্স রেঞ্জ
পানিহাটি
কলিকাতা
ফোন—কলি ৩২১৬

সকল
আনন্দে
হিন্দুস্থান
রেকর্ড
ও
গ্রামোফোন
আপনার অবসর যাপনের
নিত্য সহচর
হিন্দুস্থান
গ্রামোফোন ও রেকর্ড
সকল দোকানেই
কিনিতে পাইবেন
হিন্দুস্থান নূতন রেকর্ড
অদ্যই
শ্রবণ
করুন!

## 'অলকা'র পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

'অলকা' পড়িয়া যদি আপনার ভাল লাগে,
তাহা হইলে অন্তত পাঁচজন বন্ধুর নিকট
'অলকা'র কথা বলিবেন।

# সূচী

## পৌষ ১৩৪৫

যৌবন-স্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীখগেন রায়

প্রথম বর্ষ { ৯ পৌষ, ১৩৪৫ } চতুর্থ সংখ্যা

# বুদ্ধ ও সত্যক সংবাদ

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

[ পালি 'মজ্ঝিম-নিকায়' বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। যদি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের মুখে তাঁহার জীবন, অমৃত উপদেশাবলী এবং ধর্ম্মসাধনার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ জানিতে হয়, যদি বুদ্ধ-হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে এই নিকায়ের অন্তর্গত সূত্র বা সংবাদনিচয় শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা আবশ্যক। আমরা এই নিকায়েরই অন্তর্গত মহাসচ্চক-সুত্ত হইতে বক্ষ্যমাণ সংবাদটি পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। সংবাদটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ভগবান বুদ্ধ পূর্ব্ব নিষ্ফল কঠোর সাধনার সমুজ্জ্বল ও প্রাণস্পর্শী বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার সময়ে হঠযোগসমূহ প্রচলিত ছিল। পালি ভাষ্যকার আচার্য্য বুদ্ধঘোষ কেন যে এই হঠযোগরহস্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, জানি না। তিনি শুধু বুদ্ধবচনের বাক্যার্থ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। "খেচরী-মুদ্রা," "ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক" প্রভৃতি যোগমুদ্রা ও যোগপ্রক্রিয়াসমূহের বিশদ বিবরণ এই সংবাদে পাইয়াছি। ভারতবর্ষে তান্ত্রিক সাধনা যে কত প্রাচীন, তাহা কতকাংশে এই সংবাদ হইতে প্রতিপন্ন হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে এই সাধনার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ যত দিন যাইবে, ততই ভাল বুঝিতে পারিবেন। ]

এক সময় ভগবান বৈশালী-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,—মহাবনে, কূটাগারশালায়। সেই সময়ে ভগবান পূর্ব্বাহ্নে সুন্দরভাবে[১] বহির্গমনবাস-পরিহিত হইলেন—পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে বৈশালীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে। নিগ্রন্থপুত্র সত্যক পদব্রজে বিচরণ করিতে করিতে মহাবনস্থ কূটাগারশালার দিকে অগ্রসর হইলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ নিগ্রন্থপুত্র সত্যককে দূর হইতে আসিতেছেন দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া ভগবানকে কহিলেন: "প্রভো! এই যে নিগ্রন্থপুত্র সত্যক আসিতেছেন। তিনি ভাষ্য-প্রবক্তা, পণ্ডিতম্মন্য এবং বহুজনের নিকট সাধু

[১] বুদ্ধঘোষের মতে, ভগবান রক্ত দুপট্ট পরিধান করিয়া, কায়বন্ধন বাঁধিয়া, পাংশুকূল চীবরে একাংশ আবৃত করিলেন।

বলিয়া পরিচিত। প্রভো! তিনি বুদ্ধের অখ্যাতি-কামী, ধর্ম্মের অখ্যাতি-কামী, সঙ্ঘের অখ্যাতি-কামী! অতএব, প্রভো! অনুকম্পাপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন।" ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে আসীন রহিলেন। নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন।

২। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নির্গ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন: "হে গৌতম! কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা কায়ভাবনাযোগ[১]-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তভাবনাযোগ[২]-যুক্ত হইয়া নহে। হে গৌতম! তাঁহারা শারীরিক দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন। পূর্ব্ব হইতে শারীরিক দুঃখ-বেদনায় স্পৃষ্ট হইলে উরু স্তব্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, উষ্ণ শোণিত উদ্গীরিত হয়, উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পক্ষে চিত্ত কায়ানুযায়ী হয়, কায়বশে প্রবর্ত্তিত হয়।[৩] ইহার কারণ কি? যেহেতু তাঁহার চিত্ত অভাবিত। হে গৌতম! কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা চিত্তভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, কায়ভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া নহে। তাঁহারা চিত্ত-চৈতসিক ( মানসিক ) দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন। পূর্ব্ব হইতে চিত্ত-চৈতসিক দুঃখ-বেদনায় স্পৃষ্ট হইলে উরু স্তব্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, উষ্ণ শোণিত উদ্গীরিত হয়, উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পক্ষে কায় চিত্তানুযায়ী হয়, চিত্তবশে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার কারণ কি? যেহেতু তাঁহার কায় অভাবিত। হে গৌতম! আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল: নিশ্চয় মহানুভব গৌতমের শিষ্যগণ চিত্তভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, কায়ভাবনাযোগ-যুক্ত হইয়া নহে।"

৩। অগ্নিবেশ্যন! কায়ভাবনা[৪] কি তুমি তাহা জান কি? হে গৌতম! নন্দ-বৎস, কৃশ সাংকৃত্য ও মস্করী গোশালের ন্যায় যাঁহারা অচেলক তাঁহারা মুক্তচারী, হস্তাবলেহী, 'ভদন্ত, আসুন, ভিক্ষা গ্রহণ করুন' বলিলে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, পূর্ব্ব হইতে কেহ ভিক্ষান্ন প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া জানাইলে তাহা গ্রহণ করেন না, কোন নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেন না, কুম্ভিমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না ( পাছে তাহা হাতার আঘাতে ব্যথা পায় ), কটোরাভ্যন্তর হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না ( পাছে তাহা চামচের আঘাতে ব্যথা পায় ), উনান মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না ( পাছে সে উনানে পড়িয়া যায় ), মুষল মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না, যেখানে দুইজন ভোজন করিতেছে তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ভিক্ষা দিতে হইলে তাহা গ্রহণ করেন না ( পাছে তাহার আহার নষ্ট হয় ), গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন

---

[১] অপর সম্প্রদায়গণের পরিভাষায়, কায়ভাবনা অর্থে পঞ্চতপকরণাদির দ্বারা আত্মনিগ্রহ, কঠোর সাধনা বা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দৈহিক দুষ্করচর্য্যা।

[২] চিত্তভাবনা অর্থে শমথ-সাধনা, সমাধি অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের শান্তিবিধান।

[৩] পালি—চিত্তন্বযো কাযো হোতি, চিত্তস্স বসেন বত্ততি।

[৪] নিম্নে আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা দৈহিক দুষ্করচর্য্যার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

[৫] আজীবক বা আজীবিক শ্রমণগণ নন্দ-বৎস, কৃশ সাংকৃত্য এবং মস্করী গোশাল, এই তিনজন মহাপুরুষকে পরমহংসজাতীয় অবধূত বলিয়া সম্মান করিতেন।

না (পাছে গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়), শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণ করেন না (পাছে শিশুর কষ্ট হয়), স্বামীসহবাসকালে স্ত্রীলোক হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না (পাছে তাহার রতিসুখে বিঘ্ন ঘটে), ঘোষিত 'ভাণ্ডারা'[1] হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, যেখানে আহারের আশায় কুক্কুর দাঁড়াইয়া থাকে, যেখানে মক্ষিকা আহার উদ্দেশে একত্র সঞ্চারণ করে সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, মৎস্য-মাংস আহার করেন না, সুরা মৈরেয় ও মদ্য পান করেন না, মাত্র এক গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে এক গ্রাস ভোজন করেন,…মাত্র সপ্ত গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন হইতে সপ্ত গ্রাস ভোজন করেন, মাত্র এক দত্তিতে দিন যাপন করেন, মাত্র দুই দত্তিতে দিন যাপন করেন,…মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করেন, এক দিন অন্তর, দুই দিন অন্তর…সপ্তাহ অন্তর আহার করেন, এইরূপে অর্দ্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন-ভোজননিরত হইয়া অবস্থান করেন। অগ্নিবেশ্মন! তাঁহারা কি মাত্র তাহাতেই দিন যাপন করেন? "নিশ্চয় না, হে গৌতম! মাত্র তাহাতে তাঁহারা দিন যাপন করেন না। হে গৌতম! তাঁহারা কখনও কখনও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করেন, ভোজ্য ভোজন করেন, স্বাদনীয় বস্তু আস্বাদন করেন এবং পানীয় বস্তু পান করেন। ইহাতে তাঁহারা দেহে বল সঞ্চার করেন এবং হৃষ্টপুষ্ট হন।" অগ্নিবেশ্মন! যেহেতু তাঁহারা পূর্ব্বের দুষ্করচর্য্যা পরিহার করিয়া পরে দেহের পুষ্টিসাধন করেন, ইহাতে এই দেহের ক্ষতিবৃদ্ধিও হইয়া থাকে।

৪। অগ্নিবেশ্মন! তুমি চিত্তভাবনা কি তাহা জান কি? চিত্তভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিগ্রন্থপুত্র সত্যক কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগবান তাঁহাকে কহিলেন: অগ্নিবেশ্মন! তাঁহাদের দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত কায়ভাবনা সাধিত হইলেও, সে কায়ভাবনা ধার্ম্মিক কায়ভাবনা নহে। অগ্নিবেশ্মন! যথার্থ কায়ভাবনা[2] কি তুমি তাহা জান না, চিত্তভাবনা জানিবে কিরূপে! অগ্নিবেশ্মন! যেমন কাহারও কাহারও কায় ও চিত্ত অভাবিত হয়, তেমন কাহারও কাহারও কায় ও চিত্ত ভাবিত হয়। তুমি তাহা শ্রবণ কর, সুন্দররূপে মনোনিবেশ কর, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি। 'তথাস্তু' বলিয়া নিগ্রন্থপুত্র সত্যক তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন:

৫। অগ্নিবেশ্মন! কিসে কাহারও কাহারও কায় অভাবিত হয় এবং চিত্তও অভাবিত হয়? অগ্নিবেশ্মন! এখানে অশ্রুতবান পৃথক জনের, অকোবিদ সাধারণ জনের সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। সে সুখ-বেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সুখানুরাগী হয়, সুখানুরক্তি-প্রাপ্ত হয়। তাহার সেই সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ হয়, সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ হইলে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়।[3] দুঃখ-বেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সে অনুশোচনা করে, ক্লিষ্ট হয়, পরিতাপ করে, বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন! উৎপন্ন সুখ-বেদনা তাহার সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু তাহার কায় অভাবিত; উৎপন্ন

[1] কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্প্রদায়বিশেষের শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের ভোজন ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব হইতে ঘোষণা করা হইয়া থাকিলে।

[2] বৌদ্ধ পরিভাষায় 'যথার্থ কায়ভাবনা' অর্থে 'বিপস্সনা' বা বিদর্শন-ভাবনা।

[3] সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ না হইলে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয় না। এই উভয় প্রকার বেদনার মধ্যে আনন্তর্য্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়টি উক্তভাবে বিবৃত হইয়াছে।

দুঃখ-বেদনাও তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু তাহার চিত্ত অভাবিত। যে কাহারও, অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে ( সুখ-দুঃখ ) উভয় পক্ষেই, উৎপন্ন সুখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু কায় অভাবিত, উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যেহেতু চিত্ত অভাবিত। এইরূপেই, অগ্নিবেশ্মন! তাহার কায় অভাবিত হয় এবং চিত্তও অভাবিত হয়। অগ্নিবেশ্মন! কিসে ( কাহারও কাহারও ) কায় ভাবিত হয় এবং চিত্তও ভাবিত হয়? শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবকের সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। তিনি সুখ-বেদনা-স্পৃষ্ট হইয়া সুখানুরাগী হন না, সুখানুরক্তি-প্রাপ্ত হন না। তাঁহার সেই সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ হয়। সুখ-বেদনা নিরুদ্ধ হইলে দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। দুঃখ-বেদনায় স্পৃষ্ট হইয়া তিনি অনুশোচনা করেন না, ক্লিষ্ট হন না, পরিতাপ করেন না, বুক চাপড়াইয়া কাঁদেন না, সম্মোহ প্রাপ্ত হন না। উৎপন্ন সুখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার কায় সুভাবিত। উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার চিত্ত সুভাবিত। যে কাহারও, অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে ( সুখ-দুঃখ ) উভয় পক্ষেই উৎপন্ন সুখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু কায় সুভাবিত, উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে না, যেহেতু তাঁহার চিত্ত সুভাবিত।[১] এইরূপেই ( কাহারও কাহারও ) কায় ভাবিত হয় এবং চিত্তও ভাবিত হয়। "আমি মহানুভব গৌতমের বিষয়ে এরূপ শ্রদ্ধাবান যে, নিশ্চয় মহানুভব গৌতমের কায় সুভাবিত এবং চিত্তও সুভাবিত।"

৬। অগ্নিবেশ্মন! সত্যই তুমি গুণে লক্ষ্য করিয়া, গুণের সম্মুখীন হইয়া এ কথা বলিয়াছ; অধিকন্তু আমি তোমার নিকট বিষয়টি বিবৃত করিব, যেহেতু, অগ্নিবেশ্মন! আমি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায়-বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছি, আমার মধ্যে উৎপন্ন সুখ-বেদনা অথবা উৎপন্ন দুঃখ-বেদনা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে, এই সম্ভাবনা নাই। "তবে কি মহানুভব গৌতমের এমন কোন সুখ-বেদনা অথবা দুঃখ-বেদনা উৎপন্ন হয় না, যাহা সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে?"

৭। অগ্নিবেশ্মন! তাহা না হইবে কেন? আমার সম্যক্ সম্বোধি লাভের পূর্ব্বে যখন আমি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ছিলাম—তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—সবাধ গৃহবাস রজাকীর্ণ পথ, উন্মুক্ত-আকাশ-সদৃশ প্রব্রজ্যা মুক্ত। গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিশুদ্ধ 'সংখ-লিখিত' ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা সুকর নহে। অতএব, কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায়-বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইব।

---

[১] বৌদ্ধ পরিভাষায় 'কায়-ভাবনা' অর্থে বিদর্শন-ভাবনা। বিদর্শন অর্থে প্রজ্ঞা, এবং বিদর্শন-ভাবনা অর্থে জ্ঞান-সাধনা। বিদর্শন-ভাবনা ইন্দ্রিয়-সুখ-বিরোধী এবং পরোক্ষভাবে দৈহিক দুঃখের কারণ, যেহেতু তাহা অনুশীলনের সময় দেহের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়, বাহুমূল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং মস্তক হইতে উষ্মা বাহির হইতেছে মনে হয়। 'চিত্ত-ভাবনা' অর্থে শমথ-সাধনা বা সমাধি-অভ্যাস। সমাধি দৈহিক ও চৈতসিক দুঃখ নিরস্ত করে এবং পরোক্ষে অনল্প সুখের কারণ হয়। যে সুখ-বেদনাকে বিদর্শন-ভাবনা নিরস্ত করে এবং সমাধিজনিত যে অনল্প সুখ উৎপন্ন হয়, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক।

৮। অগ্নিবেশ্মন! সেই আমি পরে যখন তরুণ, নবীন, কৃষ্ণকেশ এবং ভদ্রযৌবনসম্পন্ন তখন স্নেহশীল ও অনিচ্ছুক মাতাপিতাকে কাঁদাইয়া, কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, কাষায়-বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হই। প্রব্রজিত হইয়া কুশল কি সন্ধানে এবং অনুত্তর শান্তিবরপদ নির্ব্বাণ অন্বেষণে অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি: "কালাম! আমি তোমার ধর্ম্ম-বিনয়ে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।" অরাড় কালাম আমাকে কহিলেন: "আপনি এখানে থাকুন; তাদৃশ এই ধর্ম্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" অগ্নিবেশ্মন! আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই ধর্ম্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠ-প্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতে আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি, অপরাপর ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "অরাড় কালাম শুধু বিশ্বাসের উপর নহে, এই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।" অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি: "কালাম! ধ্যানের কোন্ স্তর পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর?" অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে অরাড় কালাম কহিলেন: "অকিঞ্চন আয়তন নামক অরূপধ্যানস্তর পর্য্যন্ত।" তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "শুধু যে অরাড় কালামের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, আমিও সেই ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।" অগ্নিবেশ্মন! আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি অরাড় কালামের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি: "এই ধ্যানস্তর পর্য্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর বলিয়া প্রকাশ কর?" "হাঁ, এই পর্য্যন্তই বটে।" "কালাম! আমিও তো এই ধ্যানস্তর পর্য্যন্ত স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি।" [ তিনি কহিলেন: ] "ইহা আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সব্রহ্মচারী দেখিতে পাইতেছি। আমি যে ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি, তুমিও সেই ধর্ম্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর, ঠিক সেই ধর্ম্মই আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে ধর্ম্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে ধর্ম্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমিও তাদৃশ। অতএব, বন্ধু! আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে

একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।" অগ্নিবেশ্মন। অরাড় কালাম আমার আচার্য্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন, উদারভাবে আমাকে সম্মান করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল: "এই ধর্ম্ম নির্ব্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, সম্বোধির অভিমুখে, নির্ব্বাণের অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয় না। ইহার গতি তো অকিঞ্চন-আয়তন পর্য্যন্ত।" অগ্নিবেশ্মন। আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম্ম পর্য্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি।

৯। অগ্নিবেশ্মন! কুশল কি সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি রুদ্র রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি: "রাম! আমি তোমার ধর্ম্মবিনয়ে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করি।" রামপুত্র আমাকে কহিলেন: "আপনি এখানে থাকুন। তাদৃশ এই ধর্ম্মতত্ত্ব যাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি অচিরে নিজেই নিজের গুরু হইয়া, স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা তাহা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন।" অগ্নিবেশ্মন! আমি অচিরে, অত্যল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম্ম আয়ত্ত করি। ওষ্ঠপ্রহত এবং উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমি সেই জ্ঞানবাদ বলিতে পারি, সেই স্থবিরবাদ জানিতে পারি, দেখিতে পাই, ইহার বৈশিষ্ট্যও জানিতে পারি, শুধু আমি নহি, অপরাপর ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "রামপুত্র শুধু শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর নহে, এই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াই তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন। নিশ্চয় তিনি এই ধর্ম্ম স্বয়ং জানিয়া দেখিয়া উহাতে অবস্থান করেন।" অনন্তর আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি: "রাম! ধ্যানের কোন্ স্তর পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তুমি উহাতে অবস্থান কর?" অগ্নিবেশ্মন! ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে রামপুত্র কহিলেন: "নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন নামক অরূপধ্যানস্তর পর্য্যন্ত।" তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "শুধু যে রামপুত্রের শ্রদ্ধা আছে নহে, আমাদেরও আছে শ্রদ্ধা, শুধু যে তাঁহার বীর্য্য আছে নহে, আমাদেরও আছে বীর্য্য, শুধু যে তাঁহার স্মৃতি আছে নহে, আমাদেরও আছে স্মৃতি, শুধু যে তাঁহার সমাধি আছে নহে, আমাদেরও আছে সমাধি, শুধু যে তাঁহার প্রজ্ঞা আছে নহে, আমাদেরও আছে প্রজ্ঞা। অতএব তিনি যে ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, আমিও সেই ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইব।" অগ্নিবেশ্মন! আমি অচিরে, অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে সেই ধর্ম্ম অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি। অনন্তর আমি রামপুত্রের নিকট উপস্থিত হই, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলি: "রাম! এই ধ্যানস্তর পর্য্যন্তই তো তুমি এই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান কর বলিয়া প্রকাশ কর?" "হাঁ, তাহাই বটে।" "রাম! আমিও এই ধ্যানস্তর পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পারি।" তিনি কহিলেন: "ইহা তো আমাদের মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, আমরা আপনার সদৃশ সব্রহ্মচারী দেখিতে পাইতেছি। আমি যেই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি, তুমিও সেই ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে অবস্থান করিতে পার। তুমি যে ধর্ম্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহাতে

অবস্থান কর, ঠিক সেই ধর্ম্ম আমি স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করি বলিয়া প্রকাশ করি। এইরূপে যে ধর্ম্ম আমি জানি তাহা তুমি জান, যে ধর্ম্ম তুমি জান তাহা আমি জানি; আমি যাদৃশ তুমি তাদৃশ, তুমি যাদৃশ আমি তাদৃশ। অতএব, বন্ধু! আইস, এখন হইতে আমরা উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়া এই শিষ্যগণকে পরিচালিত করি।" অগ্নিবেশ্মন! রুদ্র রামপুত্র আমার আচার্য্য (শিক্ষাগুরু) হইয়াও অন্তেবাসী আমাকে তাঁহার সমস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "এই ধর্ম্ম নির্ব্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে, নির্ব্বাণের অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয় না। ইহার গতি নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা-আয়তন নামক অরূপ ধ্যান পর্য্যন্ত।" অগ্নিবেশ্মন! আমি এই ভাবিয়া সেই ধর্ম্ম পর্য্যাপ্ত মনে না করিয়া তাহা হইতে অনাসক্তভাবে প্রস্থান করি। অগ্নিবেশ্মন! কুশল কি সন্ধানে, অনুত্তর শান্তিবরপদ অন্বেষণে আমি মগধরাজ্যে ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে যেখানে উরুবেলা মহাবেলা, যেখানে সেনা-নিগম, তদভিমুখে অগ্রসর হই। তথায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাই এক অতি রমণীয় ভূমিভাগ, এক মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা নদী প্রবাহমানা, এবং চতুর্দ্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: "এই তো সেই রমণীয় ভূভাগ এবং মনোহর বনখণ্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থযুক্তা প্রবাহমানা নদী, এবং চতুর্দ্দিকে রমণীয় গোচর-গ্রাম। সাধনা-প্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এই তো সেই সাধনার স্থান!" ইহা ভাবিয়া, অগ্নিবেশ্মন! সাধনার পক্ষে এই স্থান পর্য্যাপ্ত মনে করিয়া ঐ স্থানেই আমি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হই।

১০। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার নিকট তিনটি অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য উপমা প্রতিভাত হয়। অগ্নিবেশ্মন! মনে কর, স্নেহযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ জলে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ উদ্দীপিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। অগ্নিবেশ্মন! তুমি কি মনে কর যে, সেই ব্যক্তি সেই স্নেহযুক্ত, জলে নিক্ষিপ্ত আর্দ্র কাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ উৎপাদন করিতে পারিবে? "না, হে গৌতম! তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।" ইহার কারণ কি? "যেহেতু, হে গৌতম! কাষ্ঠ স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র, তদুপরি তাহা জলে নিক্ষিপ্ত, তদ্দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে তাহাতে সেই ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্তি এবং মনোকষ্টেরই ভাগী হইবে।" সেইরূপ, অগ্নিবেশ্মন! যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্য বস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান না করেন, যাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্চ্ছা, কামপিপাসা, কামপরিদাহ অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ ও সুপ্রশমিত না হয়, তাঁহারা সাধনা-প্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্বোধি লাভ অসম্ভব। এমন কি, সাধনা-প্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব না করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে অনুত্তর জ্ঞানদর্শন ও সম্যক্ সম্বোধি লাভ অসম্ভব। অগ্নিবেশ্মন! এই অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য প্রথম উপমাই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

১১। অগ্নিবেশ্মন! অপর এক অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য দ্বিতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ্মন! মনে কর স্নেহযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ আরক-মিশ্রিত জল হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত

হইল। জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ প্রকাশিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া আসিল। অগ্নিবেশ্মন! তুমি কি মনে কর যে, ঐ ব্যক্তি আরক-মিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র কাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশিত করিতে পারিবে? "না, হে গৌতম! তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।" ইহার কারণ কি? "হে গৌতম! আরক-মিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, স্নেহযুক্ত ও আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে তাহাতে ঐ ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্তি ও ব্যর্থতারই ভাগী হইবে।" অগ্নিবেশ্মন! সেইরূপ যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্য বস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্চ্ছা, কামপিপাসা, (অথবা) কামপরিদাহ বলিতে যাহা কিছু তাহা অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ হয় নাই, সুপ্রশমিত হয় নাই, সেই মহানুভব শ্রমণব্রাহ্মণগণও সাধনা-প্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন লাভ, অনুত্তর সম্বোধি লাভ অসম্ভব। অগ্নিবেশ্মন! এই অশ্রুতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য দ্বিতীয় উপমাই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

১২। অগ্নিবেশ্মন! অপর এক অশ্রুতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য তৃতীয় উপমাও আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ্মন! মনে কর স্নেহবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠ আরক-মিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর জনৈক ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিবে, তেজ প্রকাশিত করিবে উদ্দেশ্যে উত্তরারণি লইয়া তথায় আসিল। অগ্নিবেশ্মন! তুমি কি মনে কর যে, ঐ ব্যক্তি আরক-মিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত, (স্নেহবিহীন) শুষ্ক কাষ্ঠ উত্তরারণিতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে, তেজ প্রকাশ করিতে পারিবে? "হাঁ, হে গৌতম! নিশ্চয় পারিবে।" ইহার কারণ কি? "যেহেতু, হে গৌতম! সেই স্নেহবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠ আরক-মিশ্রিত জল হইতে স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।" সেইরূপ, অগ্নিবেশ্মন! যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ কায়ত কাম্য বস্তু হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্চ্ছা, কামপিপাসা অথবা কামপরিদাহ বলিতে যাহা কিছু তাহা অধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ, সুপ্রশমিত হয়, সাধনা-প্রয়াসে তাঁহারা তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব করিলেও তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ সম্ভব হয়; সাধনা-প্রয়াসে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর দুঃখ-বেদনা অনুভব না করিলেও, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ সম্ভব হয়।

অগ্নিবেশ্মন! এই তিনটি অশ্রুতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য উপমাই (তখন) আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

১৩। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার এই চিন্তা হইয়াছিল: "আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া,[১] জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিব।"

---

[১] বুদ্ধঘোষের মতে, উপরের দন্তে নীচের দন্ত চাপিয়া ধরিয়া।

[২] ইহা নিশ্চয় একপ্রকার উগ্রতপ বা হঠযোগ-প্রক্রিয়া। খেচরী-বিদ্যার বর্ণনার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। যোগশিখোপনিষদের মতে তালুমূল চন্দ্রের স্থান, যেখানে সুধা বর্ষিত হয়: তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রঃ সুধাং

অগ্নিবেশ্যন! এই ভাবিয়া আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করি। অগ্নিবেশ্যন! তাহা করিবার সময় আমার কক্ষ (বাহুমূল) হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। যেমন কোন বলবান পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘাড়ে ধরিয়া অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে, তেমন, অগ্নিবেশ্যন! দন্তে দন্ত চাপিয়া, জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিয়া, চিত্তের দ্বারা চিত্ত অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করিলে আমার কক্ষ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। আমার বীর্য্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্যন! সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৪। অগ্নিবেশ্যন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "এখন আমি শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।"[1] আমি মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। অগ্নিবেশ্যন! আমার মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অত্যধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। যেমন কামারের জাঁতা[2] হইতে বায়ু নির্গত হইলে অধিক মাত্রায় শব্দ হয়, তেমন

---

বর্ষত্যধোমুখঃ। যুগকুণ্ডল্যুপনিষদ্, ২ অঃ দ্রঃ। উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগ-প্রক্রিয়ার নাম খেচরী-মুদ্রা। যোগশিখোপনিষদ্, ৫ অঃ, ৩৯-৪৩ শ্লোক:

কণ্ঠং সংকোচয়েৎ কিংচিদ্ বন্ধো জালন্ধরো হ্যয়ম্।
বন্ধয়েৎ খেচরী-মুদ্রাং দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ॥
কপাল-বিবরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোর্ন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥
খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ।
ন পীযুষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি॥
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ মৃত্যুর্ভবেত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্॥

[1] পালি—অপ্পাণকং ঝানং=বৌঃ সং আস্ফানক ধ্যান (ললিত-বিস্তর)। বুদ্ধঘোষের মতে, 'অপ্পাণকন্তি নিরস্সাসকং', নিরুদ্ধশ্বাস। বস্তুত ইহা কুম্ভকেরই নামান্তর।

[2] কম্মার-গগ্গরিয়া তি কম্মারস্স গগ্গরনালিয়া। কামারের গর্গরা বা ভস্ত্রা হইতে নির্গত বায়ুর ন্যায়। উক্ত যোগ-প্রক্রিয়া নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার অনুরূপ। যোগশিখোপনিষদ্ ১ অঃ, ৯৫-১০০ শ্লোক:

মুখেন বায়ুং সংগৃহ্য ঘ্রাণরন্ধ্রেন রেচয়েৎ॥
শীতলীকরণং চেদং হন্তি পিত্তং ক্ষুধাং তৃষম্।
স্তনয়োরথ ভস্ত্রেব লোহকারস্য বেগতঃ॥
রেচয়েৎ পূরয়েৎ বায়ুমাশ্রমং দেহগং ধিয়া।
যথা শ্রমো ভবদ্দেহে তথা সূর্য্যেণ পূরয়েৎ॥
বিশেষণেব কর্ত্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্॥

মুখে ও নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কর্ণরন্ধ্র দিয়া নির্গত বায়ুর অধিক মাত্রায় শব্দ হইতে থাকে। আমার বীর্য্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন! সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৫। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "এখন আমি শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।" অগ্নিবেশ্মন! তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু মূর্দ্ধায় প্রতিহত হইতে থাকে। অগ্নিবেশ্মন! যেমন কোন বলবান পুরুষ তীক্ষ্ণ শিখর[১] দ্বারা শিরে আঘাত করে, তেমন মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু মূর্দ্ধায় প্রতিহত হয়।[২] আমার বীর্য্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন! সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৬। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "আমি শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।" তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় আমার শিরঃবেদনা উপস্থিত হয়। অগ্নিবেশ্মন! যেমন কোন বলবান পুরুষ দৃঢ় চর্ম্মখণ্ডে শিরোপা দেয়, তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় (আমার) শিরঃবেদনা উপস্থিত হয়। আমার বীর্য্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন! সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

১৭। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "এখন আমি শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।" তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু (আমার) কুক্ষি কর্ত্তন করিতে থাকে।[৩]

---

উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগ-প্রক্রিয়ার নাম ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক। যোগকুণ্ডল্যুপনিষদ, ১ অঃ, ৩৪-৩৮ শ্লোক দ্রঃ—

যথৈব লোহকারাণাং ভস্ত্রা বেগেন চাল্যতে ॥
তথৈব স্বশরীরস্থং চালয়েৎ পবনং শনৈঃ।

এস্থলে 'ভস্ত্রা' অর্থে কামারের গর্গরা বা জাঁতা, হিন্দী ভাতি।

১ 'শিখর' অর্থে তরবারির অগ্রভাগ।

২ যোগশিখা ও যোগকুণ্ডল্যাদি উপনিষদসমূহে বন্ধত্রয়ে চারি প্রকার কুম্ভক সাধনার বিবরণ আছে। ভস্ত্রাখ্য কুম্ভক চারি প্রকার কুম্ভকের অন্যতম। তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বন্ধত্রয়ের নাম—মূলবন্ধ, উড্ডীয়ণ ও জালন্ধর। রুদ্ধ শ্বাস ঊর্দ্ধগ হইলে মূর্দ্ধায় প্রহত হইয়া অনেক সময় শিরঃবেদনা উপস্থিত করে। নিম্নে শিরঃবেদনার বর্ণনা আছে।

৩ ইহাও কুম্ভকের অবস্থা, যাহাতে রুদ্ধশ্বাস বায়ু অধোগ হইয়া কুক্ষি কর্ত্তন করিতে থাকে।

অগ্নিবেশ্মন! যেমন কোন দক্ষ গোঘাতক কিংবা গোঘাতক-অন্তেবাসী তীক্ষ্ণ গো-কাটা ছুরি দ্বারা গো-কুক্ষি পরিকর্ত্তন করে, তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় বায়ু আমার কুক্ষি পরিকর্ত্তন করে। অগ্নিবেশ্মন! আমার বীর্য্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন! সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারেন নাই।

১৮। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিলঃ "এখন আমি শ্বাস-প্রশ্বাস-রহিত ধ্যান করিব।" তখন আমি মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করি। মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উপস্থিত হয়।[১] অগ্নিবেশ্মন! যেমন দুইজন বলবান পুরুষ কোনও এক দুর্ব্বলতর ব্যক্তির দুই বাহুতে ধরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করে, তেমনভাবেই মুখে, নাসিকায় ও কর্ণে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিলে অধিক মাত্রায় দেহে দাহ উপস্থিত হয়। অগ্নিবেশ্মন! আমার বীর্য্য আরব্ধ হয় যাহা শিথিল হইবার নহে, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যাহা সংমূঢ় হইবার নহে, বেদনা-বিধুর দেহ-মন অপ্রশান্ত হয়। অগ্নিবেশ্মন! সেই কঠোর-সাধনা-প্রবৃত্ত সাধনা-ক্লিষ্ট আমার এইরূপ উৎপন্ন দুঃখ-বেদনাও চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই।

অগ্নিবেশ্মন! তখন কোন কোন (অধিষ্ঠাত্রী) দেবতা আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বলিয়া উঠিলঃ "(বুঝি) শ্রমণ গৌতম কালগত হইয়াছেন।" কোন কোন দেবতা বলিলঃ "শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, কিন্তু মরিবেন।" কোন কোন দেবতা বলিয়া উঠিলঃ "শ্রমণ গৌতম মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি যে অর্হৎ, অর্হতের ধ্যানবিহার এইরূপই বটে!"

১৯। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিলঃ "এখন আমি সর্ব্বাংশে আহার উপচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইব।" তখন জনৈক দেবতা আমার নিকট আসিয়া কহিলঃ "মারিষ! আপনি তাহা করিবেন না, সর্ব্বাংশে আহার উপচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইবেন না। মারিষ! যদি আপনি তাহা করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজঃ প্রবেশ করাইয়া দিব—যাহাতে আপনি দিন যাপন করিবেন।" অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিলঃ "যদি আমি সর্ব্বাংশে অভোজন-ব্রত গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই সকল দেবতা আমার লোমকূপ দিয়া দিব্য ওজঃ প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং তাহাতে দিন যাপন করিলে আমার ব্রত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।" অগ্নিবেশ্মন! তখন আমি ঐ দেবতাদিগকে বলিঃ "তোমরা এইরূপ করিও না।"

---

[১] দেহদাহ সম্বন্ধে যোগকুণ্ডলী উপনিষদে উক্ত আছেঃ

প্রাণস্থানং ততো বহ্নিঃ প্রাণাপানৌ চ সত্বরম্।
মিলিত্বা কুণ্ডলীং যাতি প্রসুপ্তা কুণ্ডলাকৃতি॥
তেনাগ্নিনা চ সংতপ্তা পবনেনৈব চালিতা।
প্রসার্য্য স্বশরীরং তু সুষুম্না বদনান্তরে॥ (১ অঃ, ৬৪-৬৬ শ্লোক)

২০। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "এখন আমি অল্প অল্প, সামান্য সামান্য আহার করিব, তাহা মুগের যূষই হউক, কুলত্থের যূষই হউক, কড়াইয়ের যূষই হউক অথবা অড়হরের যূষই হউক।" তখন হইতে আমি অল্প অল্প, সামান্য সামান্য আহার করিতে আরম্ভ করি মুগের যূষই হউক, কুলত্থের যূষই হউক, কড়াইয়ের যূষই হউক অথবা অড়হরের যূষই হউক। তাহা করিতে গিয়া আমার দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষীণ হয়, যেমন অশীতলতা অথবা কাললতা সন্ধিস্থানে মিলাইয়া মধ্যভাগে উন্নত-অবনত হয়, তেমনভাবেই সেই অল্পাহার-নিমিত্ত আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুরবস্থা হয়, উষ্ট্রপদের সংযোগস্থলের ন্যায় আমার গুহ্যদ্বার অবিশদ গর্ত্তসদৃশ হয়। সেই আল্পাহারহেতু আমার পৃষ্ঠকণ্টক যষ্টিতে বেষ্টিত সূত্রাবলীর ন্যায় দেখিতে উন্নত-অবনত হয়। যেমন জীর্ণ গৃহের বরগাগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন ( এলোমেলো ) হয়, তেমন অল্পাহারহেতু আমার বক্ষপঞ্জরগুলি উৎলগ্ন-বিলগ্ন হয়। যেমন গভীর উদপানে ( কূপে ) উদকতারকা ( উদকচন্দ্র ) গভীর জলে প্রবিষ্ট হয়, তেমন সেই অল্পাহারহেতু অক্ষিকূপে অক্ষিতারকা গভীরে প্রবিষ্ট হয়। যেমন তিক্ত অলাবু ( করলা ) কচি অবস্থায় ছিন্ন হইলে বাতাতপস্পর্শে সহসা সংম্লান হয়, তেমন অল্পাহারহেতু আমার শিরশ্চর্ম্ম ম্লান হয়। অগ্নিবেশ্মন! সেই অল্পাহারহেতু আমার উদরচর্ম্ম এমনভাবে পৃষ্ঠকণ্টকে লীন হইয়াছিল যে, উদরচর্ম্মে হস্ত স্পর্শ করিলে পৃষ্ঠকণ্টক ধরিয়াছি বলিয়া মনে হয়, পৃষ্ঠকণ্টকে হস্ত স্পর্শ করিলে উদরচর্ম্ম ধরিয়াছি বলিয়া মনে হয়। অগ্নিবেশ্মন! মলমূত্র ত্যাগ করিতে গিয়া সেই স্থানেই কুব্জ হইয়া ভূপতিত হইয়া পড়ি। অগ্নিবেশ্মন! সেই অল্পাহারহেতু দেহ আশ্বস্ত করিতে গিয়া হস্তদ্বারা গাত্রে হাত বুলাই, গাত্রে হাত বুলাইতে গিয়া পচিতমূল লোমসমূহ অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। অগ্নিবেশ্মন! তখন লোকেরা আমাকে দেখিয়া বলিল: "শ্রমণ গৌতম একেবারে কালো হইয়া গিয়াছেন।" কেহ কেহ বলিল: "শ্রমণ গৌতম কালো হন নাই, তিনি পাকা শ্যাম হইয়াছেন।" কেহ কেহ বলিয়া উঠিল: "শ্রমণ গৌতম কালোও হন নাই এবং পাকা শ্যামও হন নাই।" অগ্নিবেশ্মন! সেই অল্পাহারহেতু আমার পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত দেহের বর্ণ অপকৃষ্ট হয়।

২১। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "অতীতে যে সকল শ্রমণব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোন বেদনা হইতে পারে না। অনাগতে যে সকল শ্রমণব্রাহ্মণ সাধনা-জনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করিবেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোন বেদনা হইতে পারে না। বর্ত্তমানেও যে সকল শ্রমণব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ণ ও কঠোর বেদনা অনুভব করেন, ইহাই তাহার সেরা, ইহার অধিক আর কোন বেদনা হইতে পারে না। কিন্তু আমি এই দুষ্করচর্য্যার দ্বারা লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানদর্শন লাভ করিতে পারি নাই। তবে কি বোধি-লাভের অন্য কোন পন্থা নাই?

২২। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "আমি বেশ জানি যখন শাক্যকুলোদ্ভব পিতৃদেব হলকর্ষণ-উৎসবে হলকর্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জম্বুবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আসীন হইয়া আমি কাম্যবস্তু হইতে, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার,

বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। তাহা কি লক্ষিত বোধি-মার্গ হইতে পারে না? অগ্নিবেশ্মন! তখন এই স্মৃতি-অনুযায়ী আমার এই বিজ্ঞান উপস্থিত হয়—ইহাই বোধি-মার্গ বটে![1]

২৩। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "তবে কি আমি সেই লভ্য সুখের ভয় করিতেছি যাহা কাম হইতে বিচ্ছিন্ন, অকুশল হইতে বিচ্ছিন্ন?" অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "না, আমি সেই সুখের ভয় করিতেছি না যাহা কাম হইতে বিচ্ছিন্ন, অকুশল হইতে বিচ্ছিন্ন।"

২৪। অগ্নিবেশ্মন! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল: "যেহেতু অতিরিক্ত মাত্রায় জীর্ণশীর্ণ দেহে সেই সুখ লাভ করা সুকর নহে, আমি স্থূল-আহার আহার করিব, পক্ক ওদন ভোজন করিব।" অগ্নিবেশ্মন! তাহা ভাবিয়া আমি স্থূল-আহার আহার করি, পক্ক ওদন ভোজন করি। সেই সময়ে পঞ্চভিক্ষু আমার সেবায় রত থাকিত, আশা—শ্রমণ গৌতম যে ধর্ম্ম আয়ত্ত করিবেন তাহা তিনি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিবেন। কিন্তু যেহেতু আমি স্থূল-আহার আহার করিলাম, পক্ক ওদন ভোজন করিলাম, সেই পঞ্চভিক্ষু বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল, ভাবিল—দ্রব্যবহুল ও সাধনা-ভ্রষ্ট শ্রমণ গৌতম বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অগ্নিবেশ্মন! আমি স্থূল-আহার গ্রহণে বল সঞ্চয় করিয়া, কাম্য বস্তু হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে অবস্থান করি। অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে উৎপন্ন সুখ-বেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিতর্কবিচার-উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব-আনয়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিচরণ করি। অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে উৎপন্ন সুখ-বেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান সম্বন্ধেও এইরূপ।

২৫। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জাতিস্মর-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় আমি নানা প্রকারে বহু পূর্ব্বজন্ম অনুস্মরণ করি—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, এমন কি শতসহস্র জন্ম,—বহু সংবর্ত্তকল্পে, বহু বিবর্ত্তকল্পে, এমন কি বহু সংবর্ত্তবিবর্ত্তকল্পে, ঐ স্থানে আমি ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, এই আমার গোত্র, এই আমার জাতিবর্ণ, এই আমার আহার, এইরূপ আমার সুখদুঃখ-অনুভব, এই আমার পরমায়ু; তাহা হইতে চ্যুত হইয়া আমি এই স্থানে (এই যোনিতে) উৎপন্ন হই, তথায় ছিল আমার এই নাম, এই গোত্র, এই জাতিবর্ণ, এই আহার, এইরূপ সুখদুঃখ-অনুভব, এই পরমায়ু; তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র (এই যোনিতে) উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে আকার ও উদ্দেশ, স্বরূপ ও গতি সহ নানা প্রকারে বহু পূর্ব্বজন্ম অনুস্মরণ করি। অগ্নিবেশ্মন! অপ্রমত্ত, আতাপী

[1] বুদ্ধের এবম্প্রকার উক্তি হইতেই জাতক ও ললিতবিস্তরাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে শুদ্ধোদনের হলকর্ষণোৎসব ও জম্বুবৃক্ষচ্ছায়ায় বোধিসত্ত্বের ধ্যানমগ্ন হওয়ার বিস্তৃত বিবরণের উৎপত্তি।

( বীর্য্যবান ) ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, রাত্রির প্রথম যামে তেমনভাবেই আমার এই প্রথম বিদ্যা ( জাতিস্মর-জ্ঞান ) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে উৎপন্ন সুখ-বেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই। এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় জীবগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করি। সেই অবস্থায় দিব্যচক্ষে, বিশুদ্ধ, লোকাতীত, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অপর যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি: হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম অধম বর্ণের জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে: এ সকল মহানুভব জীব কায়-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, বাক্-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, মনঃ-দুশ্চরিত্র-সমন্বিত, আর্য্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিপ্রণোদিত কর্ম্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত. নিরয়ে ( নরকে ) উৎপন্ন হইয়াছে; অথবা এ সকল মহানুভব জীব, কায়-সুচরিত্র-সমন্বিত, বাক্-সুচরিত্র-সমন্বিত, মনঃ-সুচরিত্র-সমন্বিত, আর্য্যগণের অনিন্দুক, সম্যক্‌দৃষ্টিসম্পন্ন ও সম্যক্‌দৃষ্টিপ্রণোদিত কর্ম্মপরিগ্রাহী হইবার ফলে দেহাবসানে, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। ইত্যাদিভাবে দিব্যনেত্রে, বিশুদ্ধ লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—জীবগণ এক যোনি হইতে চ্যুত হইয়া অন্য যোনিতে উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারি: হীনোৎকৃষ্টজাতীয়, উত্তম অধম বর্ণের জীবগণ আপন আপন কর্ম্মানুসারে সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। অগ্নিবেশ্মন! অপ্রমত্ত, আতাপী ও সাধনাতৎপর হইলে যেমন যেমন হয়, তেমনভাবেই রাত্রির মধ্যম যামে আমার দ্বিতীয় বিদ্যা ( জীবের গতি-পরম্পরা-জ্ঞান ) অধিগত হয়, অবিদ্যা বিহত, বিদ্যা উৎপন্ন, তমঃ বিহত, আলোক উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে উৎপন্ন সুখ-বেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির ও অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে আমার চিত্ত নমিত করি। তদবস্থায় উন্নত জ্ঞানে যথার্থ জানিতে পারি: ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ-সমুদয়, ইহা দুঃখ-নিরোধ, ইহা দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ; এ সকল আসব, ইহা আসব-সমুদয়, ইহা আসব-নিরোধ, ইহা আসব-নিরোধগামী প্রতিপদ। তদবস্থায় এইরূপে আর্য্যসত্য জানিবার এবং দেখিবার ফলে কামাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতেও আমার চিত্ত বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে বিমুক্ত হইয়াছি এই জ্ঞান উদিত হয়, উন্নত জ্ঞানে জানিতে পারি—চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর অত্র আর আসিতে হইবে না। অগ্নিবেশ্মন! এইরূপে উৎপন্ন সুখ-বেদনাও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতে পারে নাই।

২৬। অগ্নিবেশ্মন! আমি বিশেষভাবে জানি, যখন আমি বহুশত লোকের সভায় ধর্ম্মদেশনা করি, প্রত্যেকে মনে করে—'শ্রমণ গৌতম আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্মদেশনা করিতেছেন।' অগ্নিবেশ্মন! বিষয়টি এইরূপে দেখিতে নাই। শুধু যথার্থভাবে সত্য বিজ্ঞাপনের জন্য তথাগত অপরের নিকট ধর্ম্মদেশনা করেন। অগ্নিবেশ্মন! বক্ষ্যমাণ বিষয় সমাপ্ত হইতে না হইতেই আমি পূর্ব্বাভ্যস্ত সমাধি-নিমিত্তে অধ্যাত্মে চিত্ত সংস্থিত, সন্নিবিষ্ট, সমাহিত ও একাগ্র করি, যাহাতে নিত্যকাল

ঐ সমাধিসুখে অবস্থান করিতে পারি। "মহানুভব গৌতমের, অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু মহানুভব গৌতম ইহা বিশেষভাবে জানেন কি যে, তিনি দিবাভাগে নিদ্রিত হন ?" অগ্নিবেশ্মন ! আমি বিশেষভাবে জানি যে, গ্রীষ্মঋতুর শেষ মাসে ভুক্তাবসানে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চতুর্গুণ সংঘাটি পাতিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া নিদ্রা গিয়াছি। "হে গৌতম ! কোন কোন শ্রমণব্রাহ্মণ ইহাকেই সম্মোহবিহার বলিয়া প্রকাশ করেন।" অগ্নিবেশ্মন ! ইহাতে কেহ সংমূঢ় হয় না, অসংমূঢ়ও হয় না। যাহাতে কেহ সংমূঢ় ও অসংমূঢ় হয় তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর, আমি বিবৃত করিতেছি। 'তথাস্তু' বলিয়া নিগ্রন্থপুত্র সত্যক সম্মতি জানাইলেন। ভগবান কহিলেন ঃ

২৭। অগ্নিবেশ্মন ! কিরূপে সংমূঢ় হয় ? যাহার আসবসমূহ প্রহীণ হয় নাই, যে আসব সংক্লেশ উৎপাদন করে, যাহা পুনর্ভবের কারণ, যাহা কষ্টদায়ক, দুঃখই যাহার বিপাক, এবং যাহা ভবিষ্যতে জন্ম, জরা ও মরণ আনয়ন করে, আমি তাহাকেই সংমূঢ় বলিয়া প্রকাশ করি। অগ্নিবেশ্মন ! তাহার ঐ সকল আসব প্রহীণ না হওয়ায় সে সংমূঢ় বলিয়া কথিত হয়। যাঁহার ঐ সকল আসব প্রহীণ হইয়াছে, তাঁহাকে আমি অসংমূঢ় বলিয়া প্রকাশ করি। অগ্নিবেশ্মন ! তাঁহার ঐ সকল আসব প্রহীণ হওয়ায় তিনি অসংমূঢ় বলিয়া কথিত হন। অগ্নিবেশ্মন ! তথাগতের ঐ সকল আসব প্রহীণ হইয়াছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নশীর্ষ তালবৃক্ষসদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবহীন হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহাদের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অগ্নিবেশ্মন ! যেমন তালবৃক্ষ একবার ছিন্নশীর্ষ হইলে পুনরায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না, তেমনভাবেই তথাগতের ঐ সকল আসব প্রহীণ হইয়াছে, সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, শীর্ষহীন তালবৃক্ষসদৃশ হইয়াছে, পুনর্ভবরহিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে উহাদের পুনর্ভবের সম্ভাবনা নাই।

২৮। ইহা বিবৃত হইলে নিগ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানকে কহিলেন ঃ "আশ্চর্য্য, হে গৌতম ! অদ্ভুত, হে গৌতম ! আমি যতই না কেন মহানুভব গৌতমের নিকট থাকিয়া থাকিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বালোচনা করিয়াছি, তাহাতে সেই অর্হৎ সম্যক্-সম্বুদ্ধের দেহের বর্ণ মার্জ্জিত হইয়াছে, মুখচ্ছবি সুপ্রসন্ন হইয়াছে। হে গৌতম ! আমি বিশেষভাবে জানি, যখন আমি পূরণ কাশ্যপের সহিত, মস্করী গোশালের সহিত, অজিত কেশকম্বলের সহিত, ককুদ কাত্যায়নের সহিত, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্রের সহিত, অথবা নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্রের সহিত বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছি, তিনি আমার সহিত বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া এক প্রশ্নের উত্তরে অপর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গের বাহিরে চালিত করিয়াছেন এবং ( বিষয় সুমীমাংসা না করিয়া ) কোপ, দ্বেষ ও বিচলিতভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমণ গৌতমের নিকট থাকিয়া থাকিয়া যতই বক্ষ্যমাণ বিষয় উপস্থাপিত করিয়া তত্ত্বালোচনা করিয়াছি, ইহাতে তাঁহার দেহের বর্ণ মার্জ্জিত এবং মুখচ্ছবি সুপ্রসন্ন হইয়াছে। হে গৌতম ! এখন আমার বহু করণীয় কার্য্য আছে, অনুমতি করিলে আমি যাইতে পারি।" অগ্নিবেশ্মন ! কার্য্য থাকিলে তুমি আসিতে পার।

অনন্তর নিগ্রন্থপুত্র সত্যক ভগবানের উক্তিতে আনন্দিত হইয়া, তাহা অনুমোদন করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

# ইতিহাস

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

বাঙ্গলার সেনবংশীয় নরপতিগণের প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আরও একটি সেনবংশ পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র একটি জনপদে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই রাজবংশের নাম পাওয়া যায় না, ইঁহাদের সহিত বাঙ্গলার রাজবংশের কোনও সম্পর্কও সম্ভবত ছিল না। বল্মীকভূমি নামক যে জনপদে ইঁহারা কিঞ্চিন্ন্যূন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, ভারতের মানচিত্রে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টায় যে প্রাচীন পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহা বর্ত্তমান বেলুচিস্থানের মধ্যবর্ত্তী কোন ভূভাগ হওয়াই সম্ভব। তবে সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার সময় এখনও আসে নাই।

এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, রাজা সমরসেন বিমাতার কোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র এক শত বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে এই স্থানে আসিয়া উপনীত হন এবং তদানীন্তন রাজা হর্য্যক্ষদেবকে সম্মুখযুদ্ধে পরাভূত করিয়া বল্মীকভূমির সিংহাসন অধিকার এবং তদীয় দুহিতা সুন্দরী মেধার পাণিপীড়ন করেন। রাজা হর্য্যক্ষদেব এবং তাঁহার বীর পুত্রগণ সকলেই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সমরক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন।

ত্রিশ বৎসর কাল অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া সমরসেন লোকান্তরিত হন। তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথিতে বহু অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান গল্পে তাহা অবান্তর বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

তাঁহার পুত্র শূরসেনও পিতার মতই ব্যূঢ়োরস্ক, শালপ্রাংশু মহাভুজ ছিলেন। ক্ষুদ্র বল্মীক-ভূমির আয়তন তাঁহার বীরত্বে এক দিকে সমুদ্রোপকূল এবং অন্য দিকে গম্ভীরা পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার বীরত্বের বহু কাহিনী প্রাচীন পুঁথিতে উজ্জ্বলাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল পাঠ করিলে রোমহর্ষ উপজাত হয়।

গম্ভীরা পর্ব্বতের অপর দিকে যে বিশাল অরণ্য ও বিস্তীর্ণ জনবিরল ভূখণ্ড, পুঁথিতে তাহা কল্মষারণ্য নামে কথিত হইয়াছে। এই অংশে যাহারা বাস করিত, তাহারা কোথাও রাক্ষস, কোথাও দস্যু, কোথাও বা পাপাশয় নামে আখ্যাত হইয়াছে। তাহারা বস্ত্রপরিধান-রীতি জানিত না। আম-মাংস ভক্ষণ করিত এবং গলায় নরমুণ্ডের মালা পরিত। কৃষিকর্ম্মেরও ধার ধারিত না। বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইত। এই সকল বিকটদর্শন হিংস্রপ্রকৃতির লোক সকলেরই ভয়ের বস্তু ছিল।

রাজা শূরসেন সকল সময়েই ইহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার কেমন একটা আশঙ্কা ছিল, ধনধান্যে পরিপূর্ণ বল্মীকভূমির বিপদ যদি কোন দিক দিয়া আসে তো এই দিক দিয়াই আসিবে। কল্মষারণ্য জয় করিয়া রাক্ষসদিগকে বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প তাঁহার বরাবরই ছিল। আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে সে সঙ্কল্প নিশ্চয়ই পূর্ণ করিয়াও যাইতেন। কিন্তু সে সময় তিনি

পাইলেন না। পুত্র মিত্রসেনকে কল্মষারণ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিয়া অকালেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বীরত্বের দিক দিয়া পিতার তুলনায় তিনিও ক্ষুদ্র ছিলেন না। আজীবন কল্মষারণ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিও রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যজয় অপেক্ষা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনেই তাঁহার আগ্রহ অধিক ছিল। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এই দিকেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা এমনই সুখে, শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত যে, পুঁথিতে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহাকে তুলনা করা হইয়াছে।

তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। রাজ্য প্রকৃতি দ্বারাই সুরক্ষিত; অর্দ্ধাংশ সমুদ্র দ্বারা এবং অপরার্দ্ধ দুরারোহ গম্ভীরা পর্ব্বতমালা দ্বারা সুবেষ্টিত। বহিঃশত্রু যদি কেহ কোথাও থাকেও, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয় নরপতিগণের দোর্দ্দণ্ড বাহুবলের স্মৃতি এত শীঘ্র নিশ্চয় তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সুতরাং চিন্তার কোনও কারণ নাই।

রাজা ভদ্রসেন নিশ্চিন্তচিত্তে ছায়াচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ রাজপথ নির্ম্মাণ, নির্ম্মলসলিলা বিশাল দীর্ঘিকা খনন এবং মন্দির নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন। তপস্বীর তপশ্চর্য্যায় এবং পণ্ডিতের বিদ্যার্জ্জনে যাহাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, তাহার জন্য ব্রহ্মত্র ব্যবস্থা করিলেন। শ্রেষ্ঠীদের বাণিজ্যপোত মরালের মত গর্ব্বভরে দেশবিদেশে গমনাগমন করিতে লাগিল। রাজসভা জ্ঞানী ও গুণীর সমাগমে মুখর হইয়া উঠিল। ভদ্রসেনের রাজত্বকালে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, বাণিজ্যে বল্মীকভূমির খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল।

অতঃপর যে সকল ঘটনা ঘটিতে লাগিল, তাহা নিম্নলিখিতরূপ:

নান্দীপাঠ হইয়া গিয়াছে। নক্ষত্রপরিবেষ্টিত চন্দ্রের মত রাজা ভদ্রসেন সভা আলো করিয়া বসিয়া আছেন। পাত্র মিত্র সভাসদ স্ব স্ব আসনে সমাসীন। সভাকবি উঠিয়া সেদিনের প্রথম রচনাটি পাঠ করিলেন। বিষয়বস্তু নিতান্ত সাধারণ,—সূর্য্যোদয়। কিন্তু বাক্যরচনায় কারিকরি ছিল। দিনমণির প্রভাতসভার সঙ্গে রাজসভার বর্ণৈশ্বর্য্যের তুলনা করা হইয়াছিল।

সভার গুণীসমাজে এই সুন্দর কবিতাটি সম্বন্ধে যখন আলোচনা চলিতেছিল, তখন কয়েকজন গ্রামিক দূরে এক কোণে আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইল। রাজা ভদ্রসেনের দৃষ্টি সকল দিকেই তীক্ষ্ণ। আগন্তুকগণকে তাঁহার এই নগরের লোক বলিয়া মনে হইল না। তাহাদিগকে বিপন্ন বলিয়াও বোধ হইল। কাব্যালোচনা বন্ধ রাখিয়া তিনি তাহাদিগকে নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন।

তাহারা আসিয়া যে অবস্থা বিবৃত করিল, তাহাতে রাজসভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

গম্ভীরা পর্ব্বতের ওদিক হইতে রাক্ষসগণ বিগত কিছুকাল হইতেই অত্যাচার করিতেছিল। কিন্তু তাহা তেমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে পাহাড় হইতে নামিয়া খাদ্য ও শস্য লুট করিয়া লইয়া যাইত। তাড়া দিলে বিদ্যুৎবেগে পলায়ন করিত। তাহাদের এই চৌর্য্যবৃত্তি বাড়িতে বাড়িতে দস্যুতায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন এক একটা দলে যত লোক নামিয়া আসে, তাহাদিগকে

প্রতিহত করিবার শক্তি গ্রামবাসীদের নাই। সম্প্রতি তাহারা শস্য তো লুঠ করিয়া গিয়াছেই, গ্রামবাসীদের বাধাদানের ফলে উত্তেজিত হইয়া গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে এবং কয়েকজন নরনারীকে হরণ করিয়াও লইয়া গিয়াছে।

গ্রামিকগণ প্রতিকার প্রার্থনায় রাজসভায় নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অত্যাচারের লোমহর্ষণ বিবরণ শুনিতে শুনিতে সভাসদগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সেনাপতির কোষবদ্ধ অসি ঝনৎকার করিয়া উঠিল। সকলে নিঃশব্দ উত্তেজনায় রাজাদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা ভদ্রসেন করতলে মুখ রাখিয়া গভীরভাবে কি যেন চিন্তায় নিমগ্ন।

গ্রামিকগণ সকলেই বৃদ্ধ, স্থানীয় অঞ্চলের মণ্ডল। ইতিপূর্ব্বে আরও একবার তাহারা রাজসভা দেখিয়া গিয়াছে। তখন মিত্রসেন রাজা। তখনকার রাজসভার সঙ্গে এখনকার সভার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে রাজসিক ঐশ্বর্য্যের কিছুই এখন নাই। বেশ-ভূষায়, আকারে-ব্যবহারে রাজা স্বয়ং এবং রাজসভা সহজ হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান সভা আর আগের মত ভীতির উদ্রেক করে না। এখানে মনের কথা স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করিয়া বলা চলে।

রাজা ভদ্রসেনকে ভদ্রমুনি বলিলেই বোধ হয় শোভন হয়। তাঁহার অঙ্গে হীরা-মণি-মাণিক্যের ভূষা কিম্বা বীরবেশের কিছুই নাই। মাথার বড় বড় শুভ্র চুলে, আবক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুজালে এবং ললাটের ত্রিপুণ্ড্রকে তাঁহাকে রাজা বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর ভদ্রসেন যখন মাথা তুলিলেন, গভীর করুণায় তাঁহার বড় বড় চোখ দুইটি তখন ছলছল করিতেছে।

রাজা ভদ্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা আমাদের রাজ্যে বারে বারে আসে কেন? আগে তো আসত না।

কে জানে কেন আসে, কি তাহাদের মনের অভিপ্রায়!

অনেক চিন্তার পর প্রজারা নিবেদন করিল, বোধ হয় লুটপাট আর নারীহরণ করতেই আসে।

—কিন্তু আগে তো আসত না।

উত্তর দিতে না পারিয়া প্রজারা নীরব রহিল।

জনৈক সভাসদ উঠিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, বোধ হয় তারা আমাদের রাজ্য আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। যদি আদেশ দেন—

রাজা ইঙ্গিতে তাহাকে নিবারণ করিলেন। বলিলেন, আগে জানতে হবে, কি চায় ওরা।

অন্তরাল হইতে কে যেন অস্ফুটস্বরে বলিল, রাজ্য।

সে কথা মহারাজার কানে গেল। বলিলেন, রাজ্যের তো কোনও অর্থ নেই। রাজ্য বলতে আমরা বুঝি তুমি।

—তার অর্থ শস্য সম্পদ।

—ভগবান ভূমি দিয়েছেন এক একটা জাতিকে তার প্রয়োজনের অনুরূপ।

—কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তো শেষ নেই মহারাজ। ভগবানের বিধান সে তরবারির জোরে উল্‌টিয়ে দিয়েছে। ভেবে দেখুন আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের কথা।

—এই বন্ধ্যা ভূমিকে শস্যশালিনী ক'রে, শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তৃতিসাধন ক'রে, প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ ক'রে তার প্রায়শ্চিত্তও কি তাঁরা ক'রে যান নি ?

—সে তো পরের কথা মহারাজ। গোড়ার কথা বিজিগীষা, নিজেকে বিস্তৃত করার মহৎ উচ্চাশা। মানব-সভ্যতা থেকে হানাহানি কাড়াকাড়ি তাই আপনি মুছে ফেলতে পারেন না। কারণ সে তো শুধুই লোভের তাগিদে নয়, প্রয়োজনের তাড়নায়ও নয়।

রাজা নিঃশব্দে ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি করুণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, তবে কি এত যত্নে আমার স্বর্গীয় পিতা এবং আমি শুধুই খেলাঘর পাতলাম ? এত যত্নে সাজানো পথ-ঘাট-বিপণি, শান্তিতে বাঁধা ঘর, সবই মায়া ? তপোবনের সামগান, দেবালয়ের পূজারতি, ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি সমস্ত ফেলে রেখে, যেতে হবে যুদ্ধে ? ময়ূরপঙ্খী নৌকা আর রাণীর মত গর্ব্বভরে সমুদ্রে বিচরণ ক'রে বেড়াবে না ? শাস্ত্রালাপ হবে বন্ধ ? প্রসাধনহীন জনপদবধূ দিনান্তের কমলিনীর মত বাতায়নপথে শুধু থাকবে চেয়ে ?

রাজকবি উঠিয়া বলিলেন, মহারাজ, কাজ নাই যুদ্ধে।

শ্রেষ্ঠী করজোড়ে বলিলেন, কাজ নাই যুদ্ধে। যত ধন লাগে দোব।

সকলে সমস্বরে বলিল, কাজ নাই, কাজ নাই যুদ্ধে। কি তারা চায় ? যা চায় তাই দেওয়া হবে। বিনিময়ে শান্তি আসুক।

প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন গম্ভীরা পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া জীবনে এই প্রথম কল্মষারণ্যে প্রবেশ করিল।

দুর্গম প্রদেশ। পাহাড়ের পর বন, আর বনের পর পাহাড়। মাঝে মাঝে কুটীরের শ্রেণী। স্থানে স্থানে কৃষির চিহ্ন দেখা যায়। বোঝা যায়, বসুন্ধরাকে এখনও তাহারা আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে নাই। বলিষ্ঠগঠন, দীর্ঘ দেহ অনাবৃত এবং পত্রালঙ্কার শোভিত। এখনও আম-মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য।

অবশেষে সন্ধি হইল। বল্মীকভূমির অধিবাসীগণ এক সহস্র গোধন এবং বহু পরিমাণ শস্য দিতে স্বীকৃত হইল। বিনিময়ে কল্মষারণ্য তাহাদের অঞ্চলে দস্যুতা পরিত্যাগ করিবে।

বল্মীকভূমির প্রজাগণ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে মহারাজা ভদ্রসেনের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। তাঁহারই চেষ্টায় এই শান্তি সম্ভব হইয়াছে। পুরমধ্যে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। কেবল সেনাপতি রুদ্রপাল নিঃশব্দে এবং নতমুখে বসিয়া রহিলেন। এই শান্তি শুধু তাঁহারই বোধ হয় মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক যে শান্তির জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে, একা তিনি তাহার কি বিরোধিতা করিতে পারেন !

কিন্তু এমন করিয়া ছয় মাসও অতিক্রান্ত হইল না; দস্যুর দল সন্ধির সকল সর্ত্ত বিস্মৃত হইয়া আবার বল্মীকভূমিতে হানা দিতে লাগিল। বিস্মিত ও উপদ্রুত জনপদবাসী আবার ছুটিয়া আসিল রাজসভায়। আবার নিবেদন করিল তাহাদের ক্ষতি এবং দস্যুদের উৎপীড়ন ও অনাচারের কাহিনী।

রাজা ভদ্রসেন নীরব রহিলেন। সেনাপতি রুদ্রপালের সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপহাস্যের উত্তর দিবার কিছুই তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

কিন্তু পৌরজন যুদ্ধের একেবারে বিরোধী। বিগত সুমিত্রযুদ্ধের স্মৃতি এখনও তাহাদের মনে দুঃস্বপ্নের মত অক্ষয় হইয়া আছে। পুরনারীরা এখনও সেই গান গাহিয়া দুরন্ত সন্তানের নিদ্রাকর্ষণ করে। মহারাজা শূরসেন সেই যুদ্ধে অসামান্য শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। তদবধি সুমিত্ররাজ্য বল্মীকরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু রক্তের সমুদ্রে স্নান করিয়া নবোদিত প্রভাতরবির মত জয়লক্ষ্মী যে গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সান্ত্বনার লেশমাত্রও ছিল না। বস্তুতপক্ষে এই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে যে মহতী ক্ষুধা লেলিহান হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বল্মীকভূমি এবং সুমিত্র উভয় রাজ্যই জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই একটা যুদ্ধে কত মাতা যে সন্তানহীনা এবং কত পত্নী পতিহারা হইয়াছিল, তাহার আর সীমা-সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না।

পৌরজন একেবারে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘকালের নিরঙ্কুশ এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তাহাদিগকে অলস ও নির্বীর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। ঐশ্বর্য্য আনিয়াছে নিত্যনব বিলাসব্যসনের স্রোত। উত্তপ্ত নিদাঘে ধারাগৃহে কাটে দিন। অপরাহ্ণে গন্ধানুলিপ্তকলেবরে সুমনোহর মূল্যবান সজ্জায় বায়ুসেবন। তারপরে সুমধ্যমা নটীগৃহে নৃত্যগীত-আনন্দে রজনীযাপন। আছে শুকসারী, আছে অফুরন্ত সুরার স্রোত। আছে নয়নমনের আনন্দদায়ক আরও কত কি। এ সকল ছাড়িয়া কে যাইতে চায় নিশ্চিত মৃত্যুর বাহুপাশে ধরা দিতে!

উৎপীড়ন যাহা হইতেছে, তাহাও ঠিক রাজ্যমধ্যে বলা চলে না; রাজ্যের সুদূর সীমান্তে গম্ভীরা পর্ব্বতের পাদদেশে। উহাও মহারাজা শূরসেনের রাজত্বকালেই বল্মীকভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে পৃথক রাজ্যরূপেই পরিগণিত ছিল। সুতরাং উহার জন্য কে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধে যাইতে চায়!

চারণের দল পুরবাসীদের চিত্তে উন্মাদনা জাগাইবার জন্য বৃথাই বীরত্বগাথা গাহিয়া ফিরিতে লাগিল। রক্তস্রোত কাহারও ধমনিতে নাচিয়া উঠিল না। রূপচর্চ্চার অবসরে কেহ বা সে গান শুনিল, কেহ শুনিলও না। ঈষদুন্মুক্ত বাতায়নপথে পুরনারীরা সেই সর্ব্বনাশা গান একবার শুনিয়াই সভয়ে বাতায়ন বন্ধ করিল। মদারুণনয়না নগরনটীর নূপুরনিক্কণের দ্রুততালের ঊর্ম্মিমালার নীচে তাহা কোথায় তলাইয়া গেল।

যুদ্ধ হইল না। যুদ্ধের জন্য কেহ প্রস্তুত নয়; সম্মতও নয়। দশ সহস্র পয়স্বিনী গাভী এবং বহু শকট পরিপূর্ণ শস্য দিয়া এবারও দস্যুদের তুষ্ট করা হইল। পৌরবর্গের ঈদৃশ বদান্যতায় গম্ভীরা পর্ব্বতের পাদদেশবাসী জনগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

সেনাপতি রুদ্রপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। লজ্জায় এবং ক্ষোভে মাথা তুলিলেন না।

আরও এক সম্বৎসর কোনরূপে গেল।

পট্টমহাদেবী সুশ্রবা ভগবান একলিঙ্গদেবের পূজা সমাপ্ত করিয়া, রজনীর তৃতীয় যামে আপন প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজা ভদ্রসেন তখনও সুখসুপ্ত। চঞ্চলচরণে পট্টমহাদেবী শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহারাজের চরণ স্পর্শ করিলেন। তাঁহার করস্পর্শে রাজা নয়ন উন্মীলন করিলেন। ভীতকণ্ঠে মহাদেবী কহিলেন, মহারাজ, সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। উঠুন।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে সদ্যজাগ্রত মহারাজা বলিলেন, কি ব্যাপার?

—নগরতোরণে শত্রু হানা দিয়েছে। ঐ শুনুন তাদের তূর্য্যধ্বনি।

মহারাজা কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না।

হাসিয়া কহিলেন, শত্রু নগরতোরণে নয় দেবী, তোমার দুঃস্বপ্নের মধ্যে। নিদ্রা যাও, এখনও রাত্রি আছে।

কিন্তু অজানিত আশঙ্কায় মহাদেবীর বক্ষ তখনও থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতেছিল। ভগবান একলিঙ্গদেবের মন্দির নগরতোরণের সন্নিকটে। সেখান হইতে নগরবাহিরে বহুলোকের পদশব্দ এবং অত্যন্ত মৃদু তূর্য্যধ্বনি তিনি স্পষ্ট শুনিয়া আসিয়াছেন। তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কহিলেন, প্রাসাদশিখরে উঠে দেখিগে বরং, চলুন।

রাজা সহাস্যে কহিলেন, এখনও স্বল্পান্ধকার আছে, কিছুই দেখা যাবে না। ভীরু, তুমি কদিন থেকে অবিরত শত্রুর স্বপ্ন দেখছ। এ তারই ক্রিয়া।

তবে হয়তো তাহাই হইবে। মহাদেবী সলজ্জভাবে লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয়নীয়ে শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রাকর্ষণের পূর্ব্বেই উভয়েই চমকিতভাবে জাগিয়া উঠিলেন।

নগরপ্রাচীর বেষ্টন করিয়া অসংখ্য তূরী ভেরী নিনাদিত হইতেছে। রাজা ভদ্রসেন ত্বরিত-গতিতে প্রাসাদশিখরে উঠিয়া দেখিলেন, দূরে পর্ব্বতাম্বুদসন্নিভ পয়োধরাকার বিবিধায়ুধধারী প্রচণ্ড সৈন্যমণ্ডলী সমুদ্রের মত নগর বেষ্টন করিয়া ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি ও সিংহনাদ করিতেছে। পুরমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। প্রাসাদশিখর হইতে দেখা যায়, ভীত চকিত পৌরজন রাজপথে-পথে মূষিকের মত ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে।

নগরতোরণে শত্রু। সময় আর নাই। যুদ্ধও অনিবার্য্য। বাষ্পার্দ্রলোচনে বারম্বার ভগবান একলিঙ্গদেবকে স্মরণ করিয়া পট্টমহাদেবী স্বহস্তে মহারাজাকে বীরবেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন।

ভদ্রসেন রাজসভায় আসিলেন। সভা শূন্য। সংবাদ পাইলেন, সেনাপতি রুদ্রপাল ইতি-পূর্ব্বেই তোরণরক্ষায় গমন করিয়াছেন। সৈন্যদল অপ্রস্তুত। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেহ অর্দ্ধ-সজ্জিত, কেহ বা অসজ্জিত অবস্থাতেই ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে।

রাজা বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। এই বিশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী লইয়া নগররক্ষা করা অসম্ভব

নয়। তিনি রাজকুলকামিনীদের গুপ্তদ্বারপথে স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন। সকলকেই পাওয়া গেল, কিন্তু কোথায় যুবরাজ চিত্রসেন! সমগ্র প্রাসাদ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

অবশেষে রাজা তাঁহার প্রমোদভবনে প্রবেশ করিলেন।

সেখানেই তাঁহাকে পাওয়া গেল। অসংখ্য অনাবৃতদেহা নটীপরিবীজিত ষোড়শবর্ষীয় কুমার রাজনটী বিদ্যুৎপর্ণার স্তনে শির সংন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িত, বোধ করি বা মাধ্বীপানে অচেতন। শত্রুর তূর্য্যনাদ, পুরবাসীর হাহাকার এই সুমধুর বিস্মৃতির রাজ্যে প্রবেশের পথ পায় নাই।

রাজনটী বিদ্যুৎপর্ণা এবং অন্যান্য নটীগণ আপনাদের অনাবৃত তনুদেহের দিকে চাহিয়া মহারাজার আবির্ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাজা বাহিরে আসিলেন।

তথাপি যুদ্ধ একটা হইল, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে:

মহারাজা ভদ্রসেন এবং মহাবল রুদ্রপাল ক্রোধভরে দস্যুগণের প্রতি ধাবমান হইয়া অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নিশিত অস্ত্রসকল দস্যুকলেবরে নিপতিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রুধির পান করিতে লাগিল। ভুজঙ্গ যেমন গিরিদরী হইতে বিনির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের শরনিকর দস্যুদেহ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ শরীর অস্ত্রনির্ভিন্ন হইয়া ছিন্ন অভ্র-খণ্ডের ন্যায় তদ্দণ্ডেই ধরাতলশায়ী হইতে লাগিল।

কিন্তু তথাপি শেষ রক্ষা হইল না। বল্মীকভূমি সপ্তাহকাল দিবারাত্র যুদ্ধের পর অবশেষে দস্যুপদানত হইল। শ্রেষ্ঠীগণ দস্যুরাজ মুদ্গরপিণ্ডকে সসম্মানে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া আসিল। পণ্ডিতগণ ঘনাবলীপরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের মত মহাবাহু মুদ্গরপিণ্ডকের স্তবগান করিতে লাগিলেন।

সেনবংশের এইখানেই শেষ হইল।
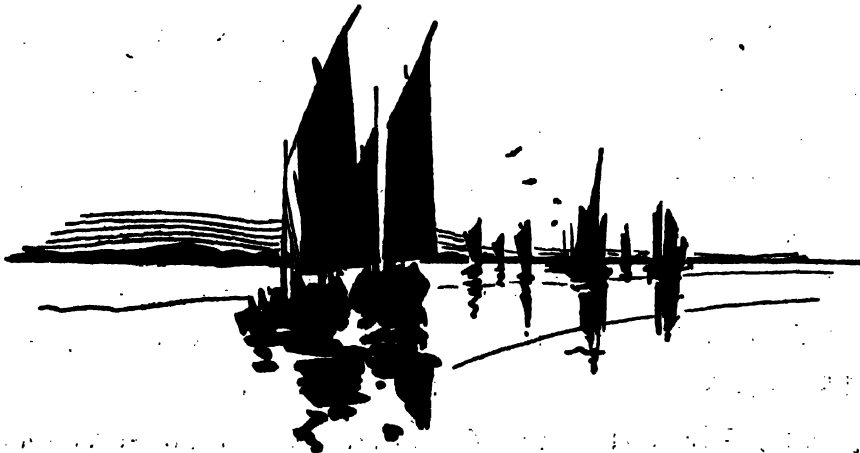
# ভারতের শিল্পীদের পক্ষে বিভিন্ন দেশের শিল্পরীতি পরীক্ষা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাটি পুনঃ পুনঃ আমাদের মনে আসে যে, বাঙালীরা আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা আজ পর্য্যন্ত যে কাজেই হাত দিতে যাই না কেন, সমষ্টিগতভাবে সে কাজ কখনও বেশি দিন চালাতে পারি না। একটা দলাদলির সৃষ্টি ক'রে বসি। তাই দেখি, প্রবাসেও 'যেখানে বাঙালী সেইখানেই দলাদলি', এবং মা-কালীও তারই সঙ্গে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করছেন। আজ তাই দেখছি, শিল্পগুরু পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় গ'ড়ে ওঠা দেশের শিল্পকলা যখন কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জন-মনের কাছে স্থান পেতে বসল, ঠিক সেই সময়েই একটা ভাঙনেরও সূচনা দেখা দিল আমাদের বাংলা দেশে। একদল বাঙালী শিল্পীর কাছে দেখছি, দেশীয় শিল্প ( নবজাগরণ হতে না হতেই ) একটা প্রাচীনতার গোঁড়ামি ব'লে মনে হতে আরম্ভ হয়েছে, এবং এমন কি বহু বিচিত্র উপাদান-উপকরণ নিয়ে বিভিন্ন শিল্পরীতিতে পরীক্ষা করার প্রয়োজন বোধ হয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষা চিত্রশিল্পে কিসের পরীক্ষা ? এবং এই পরীক্ষার ফলই বা কি তাঁরা ভেবেছেন, ঠিক বোঝা যায় না। ধরুন যদি গ্রীক, মিসর, আসেরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি চিত্রকলার রীতি-পদ্ধতির পরীক্ষা আমরা এ দেশে ব'সে করতে যাই, তো অনধিকারচর্চ্চা হয় না কি ? এক এক দেশের শিল্পকলা যুগ যুগ ধ'রে শিল্পীদের সাধনায় অগ্রসর হয়ে যেখানে আজ এসে পৌঁছেছে, সেগুলির পরীক্ষার দ্বারা সেগুলিকে আমরা আরও কোথায় নিয়ে যেতে পারি, তাই আমরা জানতে চাই। আমরা নিজেরাই দেখেছি, রবিবর্ম্মার চিত্রকলায় ইউরোপের শিল্পকলার ছায়াপাত হওয়ায় কি বিপদ ঘটেছে ! আবার বম্বে স্কুলের শিল্পীদের দেশী বিলাতী বা ইঙ্গ-ভারতীয় শিল্পের আবির্ভাবে দেশের শিল্পকে তাঁরা কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন ! তাই স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখন নিজের খেয়ালমত অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই কালে এক পংক্তিতে ব'সেও ইউরোপের futurist এবং cubist প্রভৃতি ধরণ আমদানি করলেন, তখন দেশী শিল্পের সাধকেরা সেদিকে ভুলেও কখনও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকান নি, এও আমরা দেখেছি। কিন্তু আজ আবার ভারতের শিল্পে বিশ্বজনীনতার দোহাই দিয়ে ইউরোপের sur-realist-দের নকলে পরীক্ষা চালাবার এ প্রচেষ্টা কেন দেখা দিলে, সেই কথাই ভাবছি। এত সহজেই আমরা আমাদের সঙ্কল্প ভুলে যাই ? আত্মবিস্মৃতি বাঙালীর পক্ষে কত সহজ, তারই প্রমাণ হয় না কি ? তবে হ্যাঁ, হয়তো দেশী ধরণ বজায় রেখে চিত্রকলার চর্চ্চায় ল্যাটা অনেক আছে। কেন না, দেশী শিল্পকলার রীতি, যুগ ও প্রদেশ অনুসারে বিচিত্র রূপ নিয়েছিল, এখনকার কালে তার সঠিক অনুশীলন সম্ভব নয়। কিন্তু সেগুলির চর্চ্চার দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বের বলে প্রতিভাবান শিল্পী কি দেশের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না ? এর পরীক্ষা কি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা হয় নি ? আমরা চীন বা জাপানে গিয়ে সেখানকার বিশেষ একটি ধরণে আঁকা চিত্রকলা দেখে খুবই প্রশংসা করি। আবার ইউরোপের শিল্পের বৈশিষ্ট্যও আমাদের ভাল লাগে ; তবে আমাদের নিজেদের দেশের শিল্পপ্রথার বেলাই বা এরূপ আমরা উদাসীন হই কেন ? যখন ফরাসী ভাস্কর রোঁদা আমাদের প্রাচীনকালের গড়া নটরাজের কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেন, তখন আমাদের শিল্পের জাতীয় ঐতিহ্যের এবং স্বকীয়তার গৌরব

করি ; আবার যখন বার্ডউড সাহেব আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পকে তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেন, তখন আমাদের জাতীয় অভিমানে আঘাত লাগায় রাগে গরগর করতে থাকি। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অবনীন্দ্রনাথ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে দেশের শিল্পের অনুশীলন-পন্থাটি দেখিয়ে দিলেও আমরা আজ আবার সেই পশ্চিমের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি 'ism' কুড়োবার জন্যে। এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, যদি কোনও শিল্পী আজ দেশীয় রীতিতে ছবি এঁকে নিজের প্রতিভা এবং সাধনার দ্বারা নাম ক'রে থাকেন, এবং শেষ বয়সে হয়তো বা ছবি আঁকা ছেড়ে দেন কিম্বা ছবি আঁকার অভ্যাস মাত্র রাখবার জন্যে হিজিবিজি টেনে যান, তা হ'লে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কেহই দোষ দিতে পারেন না। সেটা তাঁর ইচ্ছা। আর তা ছাড়া, কথায় বলে 'যে গরুটা দুধ দেয়, তার চাটও সহ্য হয়'; কিন্তু তাই ব'লে সেই কুটোগুলি কুড়িয়ে কাব্য লেখার জন্যে art critic-রা যদি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তো, তার চেয়ে দেশের শিল্পকলার পক্ষে দুর্দ্দৈব আর কি হতে পারে?

জীবনের সঙ্গে আর্টের একটা নাড়ীর যোগ আছে। এ কথা অস্বীকার করলে চলে না। দেশের আবহাওয়া এবং শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে শিল্পকলারও পরিণতি ঘটে। খ্রীষ্টীয় সভ্যতার ফলে ইউরোপে, হিন্দু বৌদ্ধ সভ্যতার ফলে ভারতে, চীন এবং জাপানে যে রকমারি রূপ আমরা দেখতে পাই, তার ভিতরকার কথাও ঐ একই। বৈচিত্র্যই যেমন বিশ্বসৃষ্টির বিশেষত্ব, শিল্পকলায়ও দেশভেদে কালভেদে এই যে বিচিত্র ধরণ দেখা যায়, এরই মধ্যে তার মহত্ত্বকে দেখতে পাই। দূরবীনের উল্টো পিঠে যাঁরা দুনিয়াকে দেখেন, তাঁরা এই বৈচিত্র্যের বৈভব দেখেও দেখতে পান না।

এক কথায়, যেমন আমরা দো-আঁশলা মানুষ অর্থাৎ ফিরিঙ্গী মানুষ পছন্দ করি না, তেমনই আমাদের দো-আঁশলা আর্টও মনে সায় দেয় না। তবে 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ', কেউ কেউ হয়তো বলবেন, কেন? দেশের লোকের আর্য্যবর্ণ সব নষ্ট হচ্ছে, অতএব ইউরোপের আর্য্যনারী বিবাহের দ্বারা আমাদের বর্ণোৎকর্ষ একটা বিশেষ ধর্ম্ম হওয়া উচিত। অবশ্য তাঁদের কাছে আমাদের আর বলবার মুখ নেই। তবে যাঁরা সোজাসুজিভাবে ভাবতে বা বুঝতে চান, তাঁরা এটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে, গোঁড়ামি না ক'রেও আর্টের জাত দেশের শিল্পীরা বাঁচাতে পারেন, জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। আজ জাপানে গিয়ে যখন দেখবেন যে, সেখানে তাদের দেশের বিশেষত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে ইউরোপের আর্টের চর্চ্চা হচ্ছে, তখন তাদের জাতীয় ঐতিহ্যের বিষয় স্মরণ ক'রে দীর্ঘ-নিশ্বাস না ফেলে থাকতে পারবেন না কিছুতেই। তখন বুঝবেন যে, কাউণ্ট ওকাকুরা কেন তাঁদের দেশের লোকের মুখ দেশের দিকে আবার ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। জাপানী আর্ট আজ পর্য্যন্ত যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যে সম্মানিত হয়ে এসেছে, তারই জন্যে তিনি মুন্সিয়ানা ক'রে গিয়েছিলেন। আজ তাই আমরাও ভাবি যে, দেশের ছোট বড় মাঝারি সবাইকার জয়-জয়ন্তীতে বঙ্গদেশ মুখরিত হচ্ছে, কিন্তু যে ব্যক্তি দেশের শিল্পকলাকে দেশের লোককে চেনালেন এবং দশের কাছে সম্মানিত ক'রে তুললেন, তাঁকে সম্মান দেখানোর লোক তো বাংলা দেশে নেইই, বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কার্য্যকে প্রাচীনতার গোঁড়ামি ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টারও ত্রুটি নেই। আমাদের জাতির পক্ষেই এটা সম্ভব। অন্য কোনও দেশের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। দেশের শিল্পকলাকে ছেড়ে বিদেশী ism-এর পূজা আমাদের দেশেই একমাত্র সম্ভব।

# ব্যতিক্রম

"বনফুল"

## এক

স্বাস্থ্যবান, সুরূপ, লেখাপড়া শেষ করিয়াছে, উপার্জ্জন করিতেছে, অথচ বিবাহ করে নাই, এহেন সুরেনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বিশেষ কিছু বলে না, খালি একটু হাসে।

বহু অর্থবোধক ছোট্ট হাসিটুকুর বিশেষ কোন তাৎপর্য্য বোঝা যায় না। পিতামাতা হার মানিয়া বহুদিন পূর্ব্বেই স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। এখন জোরজবরদস্তি করিয়া বিবাহ দিবার মত নিকট আত্মীয় কেহ নাই। আল্‌তো-আল্‌তো হালকাভাবে চেষ্টা করিয়া বন্ধুবান্ধবগণও হাল ছাড়িয়াছেন। দুই একজন কন্যার পিতা, কন্যার পিতা বলিয়াই এখনও হতাশ্বাস হন নাই, নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাতেও সুরেনের কৌমার্য্যব্রত ভঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইদানীং সে এই জাতীয় পত্রের উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়াছে। কারণ সোজা 'না' উত্তরেরও মিনতিপূর্ণ প্রত্যুত্তর আসে এবং তাহারও উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং ও বিষয়ে সে আর অকারণ সময় এবং অর্থ নষ্ট করিতে রাজি নয়। কয়েকদিন পূর্ব্বে এইরূপ একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক তাহার এক পরিচিত ব্যক্তির মারফৎ তাহাকে ধরিয়াছিলেন। মেয়েটি আই. এ. পাস, দেখিতে ভাল, গান-বাজনা আদব-কায়দা রন্ধনবিদ্যা গৃহকর্ম্মাদি সর্ব্ববিষয়েই পারঙ্গমা। পরিচিত ব্যক্তি বর্ণনা শেষ করিয়া বলিলেন, এক কথায় তোমারই উপযুক্ত।

সুরেন তাহার সেই হাসিটি হাসিল।

—হাসছ যে!

আর একটু হাসিয়া বলিল, হাসছি আপনার আক্কেল দেখে। যার নিজেরই খেতে কুলোয় না, তার আবার বিয়ে!

—দেড়শো টাকা মাইনে পাচ্ছ, খেতে কুলোয় না কি রকম?

সুরেন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, কোন রকমে কুলিয়ে যাচ্ছে আমার একার। আর একজন এবং তার সঙ্গে বহুজনের সম্ভাবনা, কুলোবে না। তা ছাড়া হাল-ফ্যাশানদুরস্ত মেয়ের—

কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না, কিন্তু মনের ভিতর ধারণাটা তাহার সম্পূর্ণই আছে। আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চধারণা নাই তাহার। সে প্রাচীনপন্থী সংসারে মানুষ হইয়াছে এবং নিজেও প্রাচীনপন্থী। আজকাল খবরের কাগজের কল্যাণে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয় না, ভয় হয়। মহাভারত রামায়ণে পুরুষ-দুঃশাসন, পুরুষ-রাবণ ছিল, এখনও তাহারা অবশ্য আছে। কিন্তু স্ত্রী-দুঃশাসন, স্ত্রী-রাবণের আমদানিটা বোধ হয় আধুনিক। মাসিক মাত্র দেড় শত টাকা আয় লইয়া ইহাদের সহিত পাল্লা

দিবার স্পর্দ্ধা তাহার নাই। এই তো কয়েকদিন আগে সে খবর পাইয়াছে, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের বি. এ. পাস বউ ভ্যানিটি-ব্যাগটি মাত্র সম্বল করিয়া কোথায় উধাও হইয়াছে। কানাঘুষা যাহা শুনা যাইতেছে, তাহা গৌরবজনক নহে। কোন এক আর্টিস্টের সঙ্গে নাকি—

সুতরাং ও পিছল-পথে সে পা বাড়াইবে না। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে নিজেকে লইয়া। মনের মধ্যে ক্ষুধিত কামনা একটা তপ্ত তীরের মত বিঁধিয়া আছে, সেটাকে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ—

ভাবিয়া কোন কূলকিনারা মেলে না। এই ভাবেই চলিতেছিল।

দুই

সুরেন থাকে পশ্চিমের একটি শহরে। শহরের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে তাহার ছোট বাসাটি। বাসায় থাকিবার মধ্যে আছে বৃদ্ধ ভৃত্য হকৃরু আর একটি বাইক। হকৃরু রাত্রে বাড়ি চলিয়া যায়, বাইকটি বারান্দায় ঠেসানো থাকে। দুই বেলা খাইবার সময় পাড়ার একটি অজ্ঞাতকুলশীল কুকুর আসিয়া উঠানে থাবা পাতিয়া উন্মুখ হইয়া বসে। গভীর রাত্রে সঙ্গোপনে একটি বিড়ালও যাতায়াত করে। মাঝে মাঝে দুই একজন কন্যাদায়গ্রস্ত লোক অথবা ওই জাতীয় কেহ আসেন। এতদ্ব্যতীত সুরেনের বাসাটিতে অপর বিশেষ কাহারও গতায়াত নাই। তাহার কারণ, বোধ হয়, সুরেন লোকটি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেখাপ্পাগোছের শিক্ষিত এবং মার্জ্জিতরুচি। সাধারণ লোকের সঙ্গে কেমন যেন তাহার মেলে না। অপরিচিত প্রতিবেশীদের বৈঠকখানায় অনাহূতভাবে গিয়া দাদা খুড়া মেসো পাতাইয়া হুঁকাহস্তে তাসের আড্ডা গুলজার করিবার মত স্বভাব তাহার নয়। সে একটু মুখচোরা স্বভাবের লোক এবং সম্ভবত একটু অহঙ্কারীও।

নিছক ডিগ্রীর জোরেই চাকুরিটি মিলিয়াছে।

তিন

হেমন্তের শুক্লা দ্বাদশী।

অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়া চাঁদ উঠিতেছে। আপিস হইতে প্রত্যাগত সুরেন জলযোগ সমাপনান্তে তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে যাইতেছে, এমন সময় একটি গাড়ি আসিয়া বাড়ির সম্মুখে থামিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেদিকে চাহিয়া সুরেনের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। কারণ গাড়ি হইতে যিনি অবতীর্ণা হইলেন, তিনি একজন তরুণী, রীতিমত আধুনিকা একজন। হস্তে ভ্যানিটি-ব্যাগ, চোখে চশমা, পায়ে হাই-হীল জুতা। ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সহাস্যে তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনার নামই বোধ হয় সুরেনবাবু?

প্রতিনমস্কার করিয়া সুরেনকে সত্য কথাই বলিতে হইল।

সুরেনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া তরুণীটি হাসিয়া বলিলেন, আমি হচ্ছি আপনার বন্ধু ললিতবাবুর স্ত্রী।

স্তম্ভিত সুরেন নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিবার জন্য তরুণীটি ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া নানা ভাবে সেটি দেখিলেন, তাহার পর ভিতর হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, মুস্কিলে পড়লাম তো, খুচরো নেই, এই নোটটা এখানে ভাঙাবার সুবিধে হবে কোথাও, কাছাকাছি কোন দোকান-টোকান আছে ?

সুরেন বলিল, ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি আমি, খুচরো আছে আমার কাছে।

গাড়োয়ান ভাড়া লইয়া চলিয়া গেল। সুরেনের আহ্বানে বন্ধু ললিতের স্ত্রী সুরেনের বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। আহ্বান করিতেই হইল, ভদ্রতা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো। হাজার হোক—ললিতের স্ত্রী।

চার

বলা বাহুল্য, এরূপ আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সুরেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিনা ভূমিকায় হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়লগ্নে ললিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর অভ্যাগম, তাও যে-সে স্ত্রী নয়, রীতিমত রূপসী। সুরেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

তাহার অভিভূত ভাবটা লক্ষ্য করিয়া আভা বলিলেন, আপনাকে বোধ হয় বিব্রত করলাম, নয়?

—না না, বিব্রত কি, কি যে বলেন !

একটু হাসিয়া সুরেন অভিভূত ভাবটা সামলাইয়া লইল।

—ওঁর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। তাই দেখা করতে এলাম।

কানের দুল দুইটি চমৎকার, লাল পাথরটায় ইলেক্‌ট্রিক আলো পড়িয়া অদ্ভুত দেখাইতেছে ! সুরেন তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। হঠাৎ ভদ্রমহিলার প্রশ্নে পুনরায় আত্মস্থ হইল।

—আপনি কতদিন আছেন এখানে ?

—বেশি দিন নয়, বছরখানেক হবে।

দুইখানি চেয়ারে দুইজন দুইজনের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন ভাবিতেছিল, উনি কি এখানে থাকিতে চাহিবেন ? যদি চাহেন, তখন সে কি বলিবে ? আভা ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া কথাটা পাড়া যায়, উনি সব শুনিয়াছেন কি ? শুনিয়া থাকিলে কেমন ভাবে শুনিয়াছেন কে জানে !

কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর নীরবতার পর মুখভাব যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া সুরেন বলিল, এর আগে কখনও দেখি নি আপনাকে আমি। বিয়ের সময়টাতে কিছুতে যেতে পারলাম না, ছুটি পাই নি। আসল কথা অবশ্য, ছুটির জন্য সে চেষ্টাও করে নাই। ললিতের 'লভ ম্যারেজ' শুনিয়াই তাহার কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, তাহা ছাড়া পাওনা ছুটিটা এমন ভাবে নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না, বরং ছুটি কিছু জমিলে পুরী বেড়াইয়া আসিবে, মনে মনে এই বাসনা ছিল। কিন্তু এসব কথা বলা চলে না। ছুটি পাই নাই বলাটাই শোভন।

আভা বলিলেন, আপনার কথা শুনেছি কিন্তু অনেক, তাই তো এলাম। মনে হ'ল, এই বিদেশে একমাত্র আপনাকেই বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারব।

সুরেন মনে মনে ঘামিতে লাগিল। এই রে, এইবার বুঝি ভদ্রমহিলা থাকিবার প্রস্তাবটা করিয়া বসেন! আজকালকার এই সব অগ্রগতিশীলা মহিলাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান একেবারে নাই। ইহারা সব করিতে পারে। স্বামীকেই যখন স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছে, তখন ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে, কয়েকদিন আপনার বাসায় আশ্রয় দিন আমাকে। সুরেনের পক্ষে 'না' বলা মুস্কিল, 'হাঁ' বলা আরও মুস্কিল। অবশেষে মরিয়া হইয়া সে বলিল, কোথা থেকে আসছেন আপনি এখন?

—এখন আসছি আমি আমার কোয়ার্টার্স থেকে। এখানকার মেয়েদের ইস্কুলে হেড-মিস্ট্রেস হয়ে এসেছি আমি। কাল জয়েন করেছি। আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই মনে হ'ল, যাই, আলাপটা ক'রে আসি।—বলিয়া আভা দেবী অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিলেন।

কিন্তু এই নিশ্চিন্তকর শুভসংবাদ শুনিয়া সুরেনের যেরূপ পুলকিত হইয়া উঠা উচিত ছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক ততটা পুলকিত সে হইল না। বরং এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থাটার এমন একটা নিরামিষগোছের সমাধান হইয়া যাওয়াতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে একটু যেন বিমর্ষই হইয়া পড়িল। হয়তো তাহার মুখচ্ছবিতে সে ভাবটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

আভা দেবী বলিলেন, সত্যি, অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধ হয়, কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি?

—না না, বিরক্ত আবার কিসের!

এইরূপ ভাসা-ভাসা আলোচনা খানিকক্ষণ চলিল।

তাহার পর আভা দেবী বলিলেন, আজ এইবার উঠি। আবার আসব এখন মাঝে মাঝে।

হক্রু গাড়ি ডাকিয়া দিল, আভা দেবী চলিয়া গেলেন।

সুরেন রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেল। যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে তেমন কিছু সাংঘাতিক বলিয়া তো মনে হইল না, ভালই লাগিল বরং। বেশ তো সহজ সুন্দর ভদ্র কথাবার্ত্তা, হাব-ভাবেও নারীসুলভ সহজ শ্রীর সহিত নম্র কমনীয়তা, কোন রকম অভদ্রোচিত কিছুই নাই। অথচ ইনিই ললিতের মত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নিশ্চয়ই কোন রকম কিছু—

সমস্ত সন্ধ্যাটা সুরেনের মাথায় অন্য কোন চিন্তাই আসিল না।

## পাঁচ

কয়েকদিন পরে আবার একদিন বৈকালে আভা দেবী আসিয়া দর্শন দিলেন। আসিয়া নিজেই বলিলেন, মুখ ফুটেই চাইব আজ, চা হুকুম করুন। সেদিন আপনি যে রকম মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইলেন, তাতে চায়ের কথা বলতে আর ভরসা পেলুম না।

আভা দেবী সহাস্যমুখে একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। সুরেন তাড়াতাড়ি চা আনিতে বলিল।

—খাবার-টাবার আনতে বলব কিছু? আমার এখানে মুখ ফুটেই বলতে হবে সব, কারণ বুঝতেই পারছেন, আমি ব্যাচিলর মানুষ, আমার ভরসা ওই বুড়ো হক্রু।

—না, খাবার চাই না। ভাল এক কাপ চা হ'লেই চলবে। আপনার হক্রু ভাল চা করতে পারে তো?

সুরেন স্মিতমুখে বলিল, হক্রু আমার কাছে আসার পূর্ব্বে আর কখনও চা করে নি। আমিই ওকে সম্প্রতি চা-শিল্পে দীক্ষা দিয়েছি। সেজন্যে জোর গলায় কিছু বলতে পারছি না।

—তা হ'লে ওকে জলটা গরম ক'রে সব জিনিসপত্র এখানেই দিয়ে যেতে বলুন, নিজেরাই ক'রে নেওয়া যাক।

সুরেন সেইরূপই হুকুম করিল।

—চাটুকু মনোমত না হ'লে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না, যাই বলুন আপনি।

সুরেন একটু হাসিল।

যথাসময়ে চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া হক্রু সামনের টেবিলটায় সাজাইয়া দিয়া গেল। আভা দেবী স্বচ্ছন্দে নিপুণতার সহিত চা প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিলেন ও পান করিলেন।

—কেমন হয়েছে চা?

—সুন্দর।

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করিবার পর আভা দেবী হাতঘড়িটি দেখিয়া বলিলেন, এইবার উঠতে হবে আমাকে, সেক্রেটারি বাবুর আসার কথা আছে আমার বাসায়।

—কে আপনাদের সেক্রেটারি?

—খালি ঘরের কোণে ব'সে পড়াশোনা করা ছাড়া দুনিয়ার আর কোন খবরই রাখেন না বুঝি আপনি?

—আপনাদের ইস্কুলের সেক্রেটারি কে, এইটাই কি একটা রাখবার মত খবর বলতে চান?

—আপনার পক্ষে না হ'তে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে ওইটেই এখন সবচেয়ে বড় খবর।

—কে বলুন তো সেক্রেটারি আপনাদের?

—মুরারিমোহন পুরকায়স্থ, উকিল একজন। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। আমার যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয়, তার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন। উঠি আমি, তাঁর আসবার কথা আছে এখন।

আভা দেবী চলিয়া গেলেন। যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আজও অমুক্ত রহিয়া গেল; এবং যাহা শুনিবার জন্য সুরেন মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। উভয়েই ললিতের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে সমুৎসুক; কিন্তু—একটা 'কিন্তু'তেই বাধিতেছে। সুরেন একবার ভাবিল, ললিতকে একটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়। কিন্তু

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, সেটা ঠিক হইবে না। তাহার স্ত্রী এই শহরে আসিয়া চাকুরি করিতেছে এবং আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, শুনিলে ললিত হয়তো অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইবে। দরকার কি, অনর্থক তাহাকে খবর দিয়া! কিন্তু এই পুরকায়স্থ লোকটা কে?

ছয়

আরও মাসখানেক কাটিয়াছে। ললিতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। আভা দেবীর কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সুরেনের কাছে আভা দেবীই এখন মুখ্য, ললিত গৌণ। আভা দেবীর সংস্পর্শে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে তাহার মতামতের উগ্রতা কমিয়া গিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হয় না, মতামত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সে এখন ভাবে, আভা দেবী যদি শিক্ষিতা মহিলার নমুনা হন, তাহা হইলে সমাজের শঙ্কিত হইবার কারণ নাই, আনন্দিত হইবারই কথা। সুরেনের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, ললিতঘটিত ব্যাপারটার নিগূঢ় একটা কোন রহস্য আছে। মোট কথা, আভা দেবীকে তাহার ভারী ভাল লাগিয়া গিয়াছে, এবং ভাল-লাগার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সে নিজেরই সঙ্গে নানারূপ জটিল তর্ক করিতেছে। অকস্মাৎ তাহার মনে হইয়াছে—

যাক, কি মনে হইয়াছে তাহা আর নাই লিখিলাম। আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি, কাব্য নয়। আজকাল সন্ধ্যার সময় সে আর বেড়াইতে বাহির হয় না, বাড়িতেই থাকে। আভা অবশ্য রোজ আসেন না। কিন্তু যদি কোন দিন আসিয়া ফিরিয়া যান, সেটা বড় অন্যায় হইবে। ইহাই বর্ত্তমানে সুরেনের মনোভাব। আপনারা হয়তো আশ্চর্য্য হইতেছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য্য হইয়াছে সুরেন নিজে।

সাত

মাস দুই পরে।

উপর্য্যুপরি তিনটা সন্ধ্যা বৃথা গিয়াছে। আভা দেবী আসেন নাই। চতুর্থ সন্ধ্যায় অত্যন্ত আকুল অন্তঃকরণে সুরেন বসিয়া আছে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ হইল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া সুরেন দেখিল, আভা দেবী নয়, বকের মত পা ফেলিয়া ফেলিয়া মুরারিমোহন পুরকায়স্থ আসিয়া প্রবেশ করিতেছে।

—আসতে পারি কি?

—আসুন।

পুরকায়স্থ মহাশয় আসিয়া উপবেশন করিলেন।

—ইতিপূর্ব্বে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয় নি। আভা দেবীর মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনতে পাই। তাই ভাবলাম, একটু আলাপ ক'রেই আসা যাক, মানে—চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন আর কি!—গলা খাঁকারি দিয়া পুরকায়স্থ মহাশয় একটু হাসিলেন, চেয়ারটা আর একটু

কাছে সরাইয়া আনিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, মানে, শুনেছি আপনি ওঁর স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। কিন্তু পুরকায়স্থ মহাশয় কাজের মানুষ, কাজের কথাটা পাড়িতে অযথা বিলম্ব করিলেন না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিলেন, ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো। যা শুনছি তাতে তো, মানে—

—আমার মনে হয়, ওসব মিছে কথা।

যেন মস্তবড় একটা ভুল ধারণা সংশোধিত হইয়া গেল, এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া পুরকায়স্থ বলিলেন, তাই, নয়?

তাহার পর একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন, গুজবের কথা আর বলবেন না, আপনার মত নিরীহ লোকের নামও ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে কত কথাই না রটছে শহরে!

—তাই নাকি?

—আর বলেন কেন! অতি পাজি জায়গা এ।

সুরেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। পুরকায়স্থ মহাশয় বলিলেন, আজ তবে উঠি, ঘোষ-পাড়ায় যেতে হবে একবার। ওসব ছেঁড়া কথায় কান দেবেন না মশাই, নিজে নিজে ঠিক থাকলেই হ'ল। কোন্ ব্যাটার তোয়াক্কা করেন আপনি! আচ্ছা, চলি তবে আজ।

বকের মত পা ফেলিয়া ফেলিয়া পুরকায়স্থ চলিয়া গেলেন।

আভা দেবী কেন আসিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরেন বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। শহরে গুজব রটিয়া গিয়াছে।

## আট

তাহার পরদিন বৈকালে একটা স্টেশনারি দোকানে গিয়া অনেক নির্ব্বাচন করিয়া সুরেন চিঠি লিখিবার প্যাড ও খাম কিনিল। দাম একটু বেশি দিতে হইল। এত দামী প্যাড ও খাম সে জীবনে এই প্রথম কিনিল এবং কিনিয়া আনন্দও পাইল। বাসায় ফিরিয়া ঘরে খিল দিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথম দুই তিনখানা কাগজ নষ্ট হইল, লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইল, কিছুতেই ঠিক যেন মনোমত হইতেছে না। শেষে অনেক ভাবিয়া, অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া সে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিয়া ফেলিল। লেখা শেষ হইলে চিঠিটি আদ্যোপান্ত বার কয়েক পড়িয়া তবে সেটি খামে পুরিল। খামের উপর ঠিকানা লিখিতে যাইবে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ। সেই পরিচিত পদশব্দ। তাড়াতাড়ি চিঠিটা প্যাডের তলায় ঢাকা দিয়া সে তাড়াতাড়ি গিয়া কপাট খুলিল।

আভা দেবী আসিয়াছেন।

—কি করছেন ঘরের ভেতর একা একা?

সুরেনের মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—হ'ল কি আপনার? অসুখ করে নি তো কিছু?

—না।

—চলুন, ভেতরে বসা যাক একটু। সময় নেই বেশি হাতে।

সুরেন একটু অনুযোগের সুরে বলিল, অনেকদিন পরে এলেন।

—হ্যাঁ, সময়ই হয়ে ওঠে না। আজ চ'লে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে।

—চ'লে যাচ্ছেন!

—হ্যাঁ, চাকরি করা পোষাল না।

—পোষাল না মানে?

—মুরারিবাবুর জন্যে। তিনি সেক্রেটারির কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠলেন যে, রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল। যাক, সে কথা অবান্তর। যে কথাটা বলতে এসেছি, ব'লে যাই। অনেক দিনই বলব বলব মনে করেছি, হয়ে ওঠে নি। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আপনার বন্ধুকে ত্যাগ ক'রে আমি চ'লে এসেছিলাম। কথাটা মিথ্যে নয়, ত্যাগ ক'রেই এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম, সেই কথাটাই আপনাকে আজ বলব। আপনাকে ব'লে যেতে চাই এই জন্যে যে, আপনি আমার স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আপনি আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করবেন, এটা আমি চাই না।

সুরেন নির্ব্বাক হইয়া শুনিতে লাগিল।

—আপনার বন্ধু লেখাপড়া জানা স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমি ঠিক তাঁর আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ছিলাম কি না জানি না। এইটুকু শুধু জানি, আমাকে তাঁর ভাল লেগেছিল, আমারও তাঁকে ভাল লেগেছিল। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পরে তিনি তাঁর এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন; এবং সাধারণত যেমন গল্পে পড়া যায়, আমার বেলায় সত্যি সত্যি তাই হয়ে গেল। আর্টিস্ট বন্ধু আর্টিস্টিক কায়দায় আমাকে একদিন একখানি চিঠি লিখে বসলেন। চিঠিটা পেয়ে ভাবলাম, স্বামীকে তাঁর বন্ধুর কীর্ত্তিটা একবার দেখাই, তখুনি আবার মনে হ'ল, কি দরকার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়ে। ওরকম ধরণের চিঠি জীবনে তো অনেকই পেয়েছি, কখনও হৈ চৈ করি নি। এসব নিয়ে হৈ চৈ করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। চুপ ক'রে থাকাই ভাল। স্বামীকে কিছু না ব'লে চিঠিখানা ড্রয়ারে রেখে দিলাম। সেই হ'ল কাল। পুড়িয়ে ফেললেই চুকে যেত। হঠাৎ সেই চিঠি একদিন আমার স্বামীর হাতে প'ড়ে গেল, আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি, তুমুল কাণ্ড। আপনার বন্ধুর যে মূর্ত্তি সেদিন আমি দেখেছিলাম, তা আমি জীবনে কোন দিন ভুলব না। সামান্য একখানা চিঠি, তার ইতিবৃত্ত কিছুই না জেনে তিনি এ রকম ভাষায় আমাকে গাল দিলেন যে, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘ'টে গেল। সে

অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে চ'লে এলাম। আসবার সময় ব'লে এলাম, লেখাপড়া জানা রূপসী মেয়ে বিয়ে করার উপযুক্ত তুমি নও। কোন খুকীকে বিয়ে ক'রে হারেমে পুরে রাখা উচিত ছিল তোমার।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আভা চুপ করিলেন।

—তারপর?

—আজ ওঁর চিঠি পেয়েছি, উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিঠি লিখেছেন ফিরে যেতে। আমিও কিছুদিন চাকরি ক'রে বুঝেছি, স্বামীর আশ্রয় ছাড়া আমাদের আর কোন সত্য আশ্রয় নেই। যেখানেই যাই, নানা ছুতোয় এক ঝাঁক পুরুষ পেছু নেবে। জীবনে কত রকমারি ধরণেরই যে চিঠি পেয়েছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। এখানে মুরারিবাবু তো আছেনই, আরও আছেন কয়েকজন ভদ্রলোক, নাম আর করব না। আভা দেবী চুপ করিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া আবার বলিলেন, আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম। সত্যি বলছি, আপনিই একমাত্র ভদ্রলোক যিনি সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করেছেন, চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করেন নি। সত্যি বলছি, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে এবং এত কথা আপনাকে বললাম এর জন্যেই। আপনার বন্ধু যা বলতেন, ঠিকই দেখছি, স্ট্রিক্ট্লি পিউরিটান আপনি। এবার কিন্তু বিয়ে করুন একটা। বলেন তো সম্বন্ধ করি।

সুরেন বিবর্ণমুখে একটু হাসিবার ভান করিল।

আভা হাত-ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, ওমা, ট্রেনের আর বেশি সময় নেই তো, চললাম, নমস্কার। মনে রাখবেন।

চলিয়া গেলেন। সুরেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

# অদৃশ্য কীটাণুর বিচিত্র কাহিনী

পরিদৃশ্যমান জীব-জগতে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির গঠন-বৈচিত্র্যের বিষয় ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু খালি চোখে যাহা দেখিতে পাই এরূপ পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ লইয়াই সম্পূর্ণ জীব-জগৎ গঠিত নহে। পরিদৃশ্যমান জীব-জগৎ যেমন বিশাল ও বৈচিত্র্যময়, আমাদের সাধারণ দৃষ্টির বাহিরে তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা বিশাল জীব-জগৎ রহিয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে দৃষ্টিশক্তির সীমা বর্দ্ধিত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইবার ফলে এই অদৃশ্য জীব-জগৎ সম্বন্ধে যে সকল বিস্ময়কর তথ্যাবলী জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর কথা বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার অদৃশ্য কীটাণু সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ডিম ফুটিবার প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পরীক্ষাগারে দুই ইঞ্চি চওড়া ও চার ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি কাচপাত্র অর্দ্ধেক জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে কুচোচিংড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। একটা পাত্রে পাতা সমেত একটা জলঝাঁজির গাছ ছিল। এই পাত্রটি প্রায় মাস দেড়েক এক স্থানে পড়িয়া ছিল, ইহার জলও বদল করা হয় নাই। একদিন পাত্রটা তুলিয়া আনিয়া দেখিলাম, তাহার জল অনেকটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। জলজ উদ্ভিদটি পচিয়া গিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিতেই দেখিতে পাইলাম, জলের নীচে কাচের গায়ে তেঁতুলপাতার মত চেপটা এক রকম পোকা জন্মিয়াছে। পোকাগুলি অতি ক্ষুদ্র, এক মিলিমিটার বা সামান্য কিছু বেশি লম্বা হইবে। জল হইতে বাহিরে আনিবার জন্য সূক্ষ্মাগ্র শলাকা দিয়া পিছন দিকে সুড়সুড়ি দিতেই একটি পোকা কাচের গা বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল; কিন্তু জলের উপরিভাগের কাছাকাছি আসিয়াই পাশের দিকে ঘুরিয়া গিয়া আবার জলের ভিতর দিকেই যাইতে লাগিল। যতক্ষণ জলের নীচে আছে ততক্ষণ পিছনে সুড়সুড়ি দিলেই উপরের দিকে উঠিয়া আসে, কিন্তু জলের উপরিভাগে শেষ সীমায় আসিয়াই আবার পাশের দিকে ঘুরিয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করে; কিছুতেই জলের বাহিরে আসিবে না। কিন্তু পাশের দিকে ঘুরিয়া যাইবার সময় মুখের কাছে বারবার সুড়সুড়ি দেওয়ার ফলে সে অগত্যা এমন অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিল, যাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলাম। পোকাটা জলের উপরিভাগের কাছে আসিয়া যখন দেখিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই জল ছাড়িয়া আসিতে হয়, অথচ পাশের দিকে ঘুরিলেও প্রত্যেক বার বাধা পাইতেছে, তখন সে জলের উপরিভাগে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত শরীরটাকে জলের উপর চিৎ করিয়া ভাসাইয়া দিল, এবং শরীরের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য রোমরাজির সহায়তায় জলের মধ্যভাগে গিয়া ধীরে ধীরে শরীরটাকে ডুবাইয়া দিয়া একেবারে পাত্রের তলদেশে উপস্থিত হইল। বিভিন্ন পোকা লইয়া যতবার পরীক্ষা করিলাম, ততবারই ঠিক একই রকম ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। এই পোকাগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, জলের নীচে কয়েকটা চিংড়ি মরিয়া লাল হইয়া রহিয়াছে। যে দুই একটা তখনও জীবিত ছিল, তাহাদের একটিকে তুলিয়া লইয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিতেই দেখিতে পাইলাম, চিংড়িটার লেজ ও মুখের কাছে যেন বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভিদ গজাইয়াছে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে দ্রষ্টব্য

রটিফেরার নিষ্ক্রিয় অবস্থা

বস্তুটিকে একফালি কাচের উপর রাখিয়া এক ফোঁটা জল দিয়া টিস্যু কাগজের মত পাতলা ছোট ছোট চৌকা অথবা গোলাকার কাচের ঢাকনি চাপা দিতে হয়, তাহাতে জলটা সহজে উবিয়া যাইতে পারে না। এই এক ফোঁটা জলের মধ্যেই আণুবীক্ষণিক অদৃশ্য কীটাণুগুলি স্বচ্ছন্দে ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দেহের তুলনায় ওই এক ফোঁটা জলই প্রশস্ত জলরাশি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, চিংড়ির গাত্রসংলগ্ন উদ্ভিদের ন্যায় অপূর্ব্ব পদার্থগুলি দেখিয়া প্রথমে নিশ্চল বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ভুল ভাঙিল। উদ্ভিদের গোড়াগুলি চিংড়ির গায়ে শিকড়ের মত আটকাইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেকটি গোড়া হইতে প্রায় শতাধিক ডালপালা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, প্রত্যেকটি ডালের প্রান্তভাগে বিজলী-বাতির 'শেডে'র মত যেন এক একটি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এক একটা গাছে এরূপ পঁচিশ ত্রিশটা হইতে শতাধিক ফুলের মত অপরূপ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। অনুবীক্ষণের শক্তি আর একটু বাড়াইয়া দিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে উদ্ভিদ বা ফুল নহে, কতগুলি আণুবীক্ষণিক কীটাণু মাত্র। এই অদৃশ্য কীটাণুগুলি সর্ব্বদাই এইরূপ দলে দলে বাস করিয়া থাকে, ইহাদের সাধারণ নাম 'ভর্টিসেলা'। অপরিষ্কৃত জলের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় 'ভর্টিসেলা' দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের দৈহিক গঠনও বিচিত্র রকমের হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় অধিকাংশ 'ভর্টিসেলা'ই ডালপালা-সমন্বিত বৃক্ষের আকারে দলবদ্ধভাবে জন্মায়, আবার কোন কোন জাতীয় 'ভর্টিসেলা' সুতার মত লম্বা বোঁটায় আটকাইয়া এককভাবে বর্দ্ধিত হয়। সুতার মত লম্বা বোঁটাটির একপ্রান্তে নখের মত তিন চারটি শিকড় বাহির হয়। এই শিকড়ের মত যন্ত্রের সাহায্যে ইহারা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার জলজ প্রাণীর দেহে আটকাইয়া থাকে। বোঁটার অপর প্রান্তে থাকে চায়ের পেয়ালার মত অদ্ভুত একটি প্রাণী। আহার-সংগ্রহের সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। যতক্ষণ আলো থাকে, ততক্ষণ বোঁটাটাকে লম্বা করিয়া দিয়া চায়ের পেয়ালার মত প্রাণীটি গোলাকার মুখটাকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া দেয় এবং ভিতর হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শুঁয়া বাহির করিয়া সেগুলিকে অতি দ্রুতগতিতে পর পর কাঁপাইতে থাকে। তাহাতে জলের মধ্যে

ভর্টিসেলার উপনিবেশ। পেয়ালার মত শরীর লম্বা বোঁটার সঙ্গে আটকাইয়া আহার সংগ্রহে ব্যাপৃত।

ব্যাচিলারিয়া প্যারাডক্সা দুই দিকে প্রসারিত হইয়াছে

একটা স্রোত উৎপন্ন হইয়া তাহা তাহার মুখের ভিতরে চলিতে থাকে। ঐ স্রোতের সঙ্গে নানা প্রকার জীবাণু তাহার মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। খাদ্যগুলিকে মুখাভ্যন্তরে ধরিয়া রাখিয়া জল অন্য রাস্তা দিয়া বাহির করিয়া দেয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া জলস্রোত মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইতে করাইতে যদি কোন জীবাণু ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে, তখনই তাহারা বুঝিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখগহ্বর সঙ্কুচিত করিয়া হঠাৎ এক ঝটকা টানে বোঁটাটাকে স্প্রিঙের মত গুটাইয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালাটিও অদৃশ্য হইয়া যায়। খাদ্য উদরস্থ করিয়া আবার ধীরে ধীরে বোঁটা ও মুখ প্রসারিত করিয়া আহার-সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। যাহারা বৃক্ষের মত শাখা-প্রশাখায় আটকাইয়া একসঙ্গে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের শিকার-প্রণালীও উপরোক্ত 'ভর্টিসেলা'র মত, শাখা-প্রশাখাসমন্বিত বৃক্ষটি একসঙ্গেই প্রসারিত হয় এবং প্রত্যেকেই জলের স্রোত উৎপাদন করিয়া আহারান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। উহাদের কোন একটির মুখে খাদ্যবস্তু প্রবেশ করিলেই তৎক্ষণা সে একটা ঝটকা টানে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলিও সঙ্কুচিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে। চিংড়ির শরীরে আবর্জ্জনার মত বহুবিধ উপাঙ্গ থাকার ফলে তাহার মধ্যে বিবিধ প্রকারের জীবাণু বাসা বাঁধিতে পারে, অথবা যে কোন কারণেই হউক, নানা প্রকার খাদ্য-বস্তু আটক পড়ে। এই সহজলভ্য খাদ্যের আশাতেই হয়-তো এই জাতীয় 'ভর্টিসেলা'রা তাহাদের শরীরে উপনিবেশ স্থাপন করে। সময় সময় দেখা যায়, এক একটি বিন্দুর মত সবুজ রঙের গোলাকার জীবাণু দলবদ্ধভাবে এই 'ভর্টিসেলা'দিগকে আক্রমণ করে। তাহারা আসিয়াই মাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে পেয়ালাগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে এবং শরীরের পাতলা পর্দ্দা ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। তখন সেই ক্ষতস্থান দিয়া 'ভর্টিসেলা'র শরীরের অভ্যন্তরস্থ দানাদার কতকগুলি পদার্থ বাহির হইয়া আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করে। এই ক্ষুদ্র জীবাণুগুলির আক্রমণে উহাদের কাহারও নিষ্কৃতি পাই-বার সম্ভাবনা নাই। তবে আত্মরক্ষায় অক্ষম হইলে তাহারা বোঁটা ছিঁড়িয়া জলের মধ্য দিয়া সাঁতরাইয়া পলায়ন করে।

রটিফেরা আহার সংগ্রহ করিতেছে।

চিংড়ির গায়ে এই অদ্ভুত প্রাণীগুলির কাণ্ড দেখিয়া কৌতূহলের বশে এক টুকরা পচা পাতা মাইক্রস্কোপের তলায় রাখিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেই এক টুকরা পাতার গায়েও বিভিন্ন রকমের জীবাণু ও কীটাণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েকটির বিষয় এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

পাতাটার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাপজামের মত অনেকগুলি কীটাণু চলাফেরা করিতেছিল। লম্বায় ইহারা আধ মিলিমিটার হইতে এক মিলিমিটারের বেশি হইবে না। গোলাকার শরীরপিণ্ডটির পিছন দিকে লেজের মত একটি উপাঙ্গ আছে, ইহাই উহাদের পা। ইহার প্রান্তদেশে মুরগীর পায়ের মত তিনটি আঙুল আছে। এই আঙুলের সাহায্যে তাহারা কোন কিছুর গায়ে আটকাইয়া থাকে। হাঁড়ির গলার মত ইহাদের গলায় খাঁজ কাটা। মুখখানাও হাঁড়ির মত। কোন কিছুতে আটকাইয়া ইহারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য মুখখানাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। তখন ভিতর হইতে শামুকের মাংসপিণ্ডের মত একটা অদ্ভুত অঙ্গ বাহির হইয়া আসে। এই অদ্ভুত যন্ত্রটার প্রান্তভাগে দুইটি বোঁটার সঙ্গে দুইখানা চাকতি আছে। এই চাকতির চতুর্দ্দিকে খাড়াভাবে অসংখ্য শুঁয়া থাকে। এই শুঁয়াগুলিকে পর পর অতি

দ্রুতগতিতে কাঁপাইয়া ইহারা জলের মধ্যে স্রোত উৎপন্ন করে। তখন মনে হয়, যেন দুইখানি দাঁতওয়ালা চাকতি বনবন করিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহারা মোটেই ঘোরে না। দ্রুত স্পন্দনের ফলে ঘূর্ণায়মান গতি লক্ষিত হয় মাত্র। এইজন্য ইহাদিগকে চাকাওয়ালা কীটাণু নামেও অভিহিত করা হয়, কিন্তু ইহাদের প্রকৃত নাম—'রটিফেরা'। খাদ্যবস্তু জলস্রোতের সঙ্গে ইহাদের মুখগহ্বরে প্রবেশ করে এবং মুখের অদ্ভুত গঠন-কৌশলে খাদ্যদ্রব্য ভিতরে আটকা পড়িয়া যায়, এবং মুখের এক পাশ দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। তিমিমাছ খাদ্য সংগ্রহের জন্য যখন প্রকাণ্ড মুখ হাঁ করিয়া জলের নীচে তীরবেগে ডুব মারে, তখন ছোট ছোট প্রাণীরা জল সমেত তাহার প্রকাণ্ড মুখগহ্বরে দলে দলে ঢুকিয়া পড়ে। তারপর মুখের চাপে খাদ্যদ্রব্যগুলি মুখের মধ্যে আটকা পড়িয়া যায় এবং জল ফোয়ারার আকারে বাহির হইয়া পড়ে। 'রটিফেরা'র আহার-প্রণালীও কতকটা সেইরূপ। ইহারা সাধারণত জোঁকের মত হাঁটিয়া বেড়ায়। কিন্তু দূরতর স্থানে যাইতে হইলে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া লম্বাটে ধরণের হইয়া যায় এবং দ্রুতবেগে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হয়। সাঁতার কাটিবার সময় শুঁয়ার সাহায্যই গ্রহণ করে। কাজেই শরীরটা সব সময়েই সোজা থাকে। কোন অঙ্গভঙ্গি পরিদৃষ্ট হয় না। পচা জলের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় 'রটিফার' দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টেণ্টর। উপরেরটি আহার সংগ্রহ করিতেছে; নীচেরটি সবে মাত্র মুখ বাড়াইতেছে, গলা আরও লম্বা করিয়া মুখখানাকে গ্রামোফোনের হর্নের মত খুলিয়া ফেলিবে।

সেই পচা পাতাটার আর এক পাশেই দেখিলাম, আরও কতগুলি অদ্ভুত কীটাণু রহিয়াছে। ইহারা কিছুক্ষণ পরে পরে পাতার আড়াল হইতে ধীরে ধীরে মুগুরের মত মাথা বাহির করিতেছে, আবার একটু অতিরিক্ত আলো বা কোনরূপ নাড়াচাড়া পাইলেই মুখ গুটাইয়া লইতেছে। মুগুরের মত মুখখানাকে বাড়াইতে বাড়াইতে গলাটা অসম্ভব লম্বা হইয়া পড়িল। তারপর মুখখানা ছত্রাকারে খুলিয়া খাদ্যান্বেষণে ব্যাপৃত হইল। এ অবস্থায় দেখিতে ঠিক গ্রামোফোনের হর্নের মত। প্রকাণ্ড মুখের হাঁ, সরু লম্বা গলা। মুখখানা প্রসারিত করিতেই দেখা গেল—চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়া রহিয়াছে। সেই শোঁয়াগুলি 'রটিফারে'র মত পর পর আন্দোলন করিয়াই ইহারা জলের স্রোত উৎপাদন করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। এই আণুবীক্ষণিক কীটাণুদিগকে 'স্টেণ্টর' বলে। কাচ পাত্রের ওই জলটুকুর মধ্যে তিনটি বিভিন্ন জাতীয় 'স্টেণ্টর' দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারাও এক স্থানে থাকিয়াই মুখখানা এপাশে ওপাশে ঘুরাইয়া আহার সংগ্রহ করে। কিন্তু এক স্থানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য না জুটিলে অবলম্বন ছাড়িয়া শরীরটাকে সঙ্কুচিত করিয়া ঠিক একটি লবঙ্গের আকার পরিগ্রহ করে, এবং শোঁয়ার সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া সোঁ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আহার অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়।

এই পচা পাতাটুকু ফেলিয়া দিয়া অপর এক টুকরা

টিউবিফেক্স জাতীয় কীড়া, পশ্চাদ্দেশ সবেমাত্র খুলিবার আয়োজন করিতেছে।

পাতা লইলাম। এবার ইহার মধ্যে পূর্ব্বদৃষ্ট জীব ছাড়াও আর একটি অদ্ভুত জীব প্রত্যক্ষ করিলাম। কয়েকটি লম্বা লম্বা কাঠি যেন একত্র বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, অন্যান্য কীটাণুগুলিকে দেখিতেছিলাম, এই কাঠির আঁটিটি অনেকবার চোখে পড়িলেও পাতার কোন একটা অংশ-বিশেষ মনে করিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করি নাই, অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, সেই আঁটিটি যেন নড়িতেছে। মাইক্রস্কোপটাকে সেদিকে ফোকাস করিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। একত্র জড়ো করা সেই কাঠিগুলি আস্তে আস্তে এক পাশ হইতে একটি একটি করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া পর পর সাতাশটি কাঠি পাশাপাশি লাগিয়া লাগিয়া খাড়া হইতে হইতে একটি লম্বা লাঠির আকার ধারণ করিল, এই ভাবে দুই তিন মিনিট থাকিবার পর আবার এক পাশ দিয়া একটি একটি করিয়া গুটাইতে লাগিল। প্রায় আধ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত গুটাইয়া পুনরায় একটি আঁটির আকার ধারণ করিল। আলোর তেজ বাড়াইয়া দিলাম। অল্পক্ষণ পরেই খুব দ্রুতগতিতে পূর্ব্বের ন্যায় লম্বা হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই আবার গুটাইয়া গিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া লম্বা হইতে লাগিল। আলোর তীব্রতায় সে এখন আর বেশিক্ষণ গুটাইয়া থাকে না, একবার এপাশ দিয়া লম্বা হয়। আবার ওপাশ দিয়া লম্বা হয়। বার বার এরূপ করাতে সমস্ত জিনিসটাই প্রায় দুই তিন মিনিটের ভিতর অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া আঁটির মতই পড়িয়া রহিল। পুনরায় ফোকাস করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর আলো ফেলাতে সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে একবার সঙ্কুচিত ও আবার প্রসারিত হইতে হইতে আড়ালে চলিয়া গেল। প্রথম বারে সাধারণ আলোতে ইহা এক দিকে যেন এক তালে বাড়িতেছিল, কিন্তু আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়িবার তাল ঠিক রহিল না। কোনবারে এক-সঙ্গে দুই দিকেই বাড়িতেছিল, আবার কোন সময়ে মধ্যস্থল হইতে মালার আকারে বাহির হইয়া আসিতেছিল। ইহারা 'ডায়েটম' শ্রেণীভুক্ত, ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 'ব্যাচিলারিয়া প্যারাডক্সা'। ইহাদের প্রত্যেকটি কাঠি একটি আলাদা 'ডায়েটম'। সকলগুলি একসঙ্গে মিলিয়া একটি উপনিবেশ সংগঠন করিয়া থাকে। 'প্যারাডক্সা'র উপনিবেশে দুইটি হইতে অন্তত ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন কোষের সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কোষ একা থাকিলে ইহারা কোনক্রমেই নড়াচড়া করিতে পারে না। কিন্তু দুইটি

ব্যাচিলারিয়া প্যারাডক্সা এক আঁটি কাঠির মত নির্জীব অবস্থায় পড়িয়া আছে।

কোষ একসঙ্গে থাকিলে একটির পর আর একটি পর্য্যায়ক্রমে উপরে নীচে উঠা নামা করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যাইতে পারে।

এবার পাতার ডাঁটাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। সেগুলিও পচিয়া গিয়াছিল। ডাঁটার অভ্যন্তরে এক স্থানে দেখিলাম, সূত্রবৎ কয়েকটি অদ্ভুত কীটাণু কিলবিল করিতেছে। লম্বায় ইহারা আধ ইঞ্চির কম হইবে না। শরীরটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, কতকটা কেঁচোর মত দেখিতে। শরীরের বাহিরের দিক আগাগোড়া কিছুদূর অন্তর অন্তর কতকগুলি গাঁটের মত হইয়া যায়, এবং সেখান হইতে দুই তিনটা করিয়া শুঁয়া বাহির হয়। ইহার সাহায্যেই ইহারা চলাফেরা করিয়া থাকে। মুখের দিকটা সূচালো কিন্তু হাঁ-টা টিকটিকির মত। খপ খপ করিয়া পাতার পচা অংশগুলি গলাধঃকরণ করে। কিন্তু ইহাদের লেজের দিকের গঠনই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। প্রকাণ্ড একটা গহ্বরের চারিদিকে কুকুরের জিভের মত লম্বা লম্বা পাঁচটা জিভ বাহির হইয়া আছে। জিভের মত উপাঙ্গগুলির ধারে ধারে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়া। শুঁয়াগুলিকে পর পর অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলন করিয়া জলের স্রোত উৎপাদন করে। স্রোতটা কিন্তু বাহির হইতে ভিতরের দিকে যায় না, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যায়। জলস্রোতের এই বাহির টানে পৌষ্টিকনালীর অভ্যন্তরস্থ খাদ্যদ্রব্যের অজীর্ণ অংশ মলরূপে অনবরত নির্গত হইয়া দূরে সরিয়া যায়। ইহাদের পৌষ্টিকনালী অতীব সরল গঠনের, মুখ হইতে শরীরের পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত একটি নলের মত প্রসারিত। এক দিক দিয়া অনবরত পচা পাতার অংশ খাইতেছে, আর এক দিয়া অনবরত সেগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে। মাইক্রস্কোপের নীচে ইহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগ প্রসারিত অবস্থায় দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয় অতি অদ্ভুত রকমে। একটি কীট দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি হইয়া যায়, দ্বিখণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে ইহারা অনেকটা শান্তভাবে অবস্থান করে, দেখিতে দেখিতে শরীরের মধ্যস্থলে একটা গাঁটের কাছে পাশাপাশি-ভাবে একটু অস্পষ্ট রেখা আত্মপ্রকাশ করে, রেখাটি দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে এবং দুইটি শুঁড় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সেই রেখা ধরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। সম্মুখের অর্দ্ধেকের পিছন দিকে জিভের মত উপাঙ্গগুলি তখন ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। অপর অংশের সম্মুখভাগ মুখের আকার পরিগ্রহ করে। ইহাদিগকে 'টিউবিফেক্স' জাতীয় কীট বলা হয়।

এতদ্ব্যতীত ঐটুকু জলের মধ্যে অন্যান্য অনেক জাতীয় প্রোটোজোয়া, অ্যামিবা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ইহা হইতে অদৃশ্য জীব-জগতের বিশালত্ব ও বৈচিত্র্য সহজেই উপলব্ধি হয়।

[ প্রবন্ধের ছবিগুলি বাদ্ধিত আকারের মাইক্রফোটো, লেখক কর্তৃক গৃহীত ]
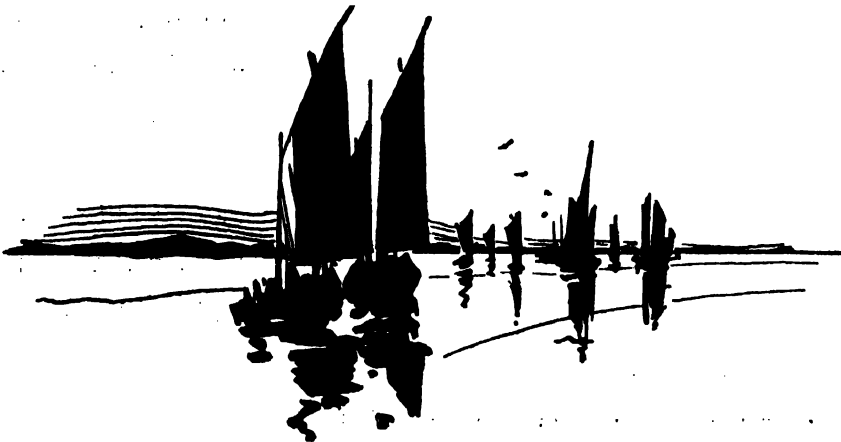
# লীলার রাগ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সূর্য্য অস্ত যাইতে বহু বিলম্ব, অর্থাৎ দিবা-দ্বিপ্রহরের কিছু বেশি। হরিপুরের বোস-বাড়িতে সবেমাত্র মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এবং আহার-শেষে নিত্যনৈমিত্তিক নিদ্রা আসিয়া অন্তঃপুরিকাদের চক্ষুতে আশ্রয় লইবার উদ্যোগ করিতেছে। কেহ পাখা হাতে, কেহ নভেল, কেহ চাপড়াইতেছে দুরন্ত দামাল শিশুকে, কেহ পান মুখে দিয়া পাশ ফিরিয়াছেন; সারাদিনের পরিশ্রমের পর নিদ্রার এই অত্যল্পকাল সাধনা, এ যে কত আরামের জিনিস, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কাহাকেও বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

দ্বিতলের ছোট ঘরখানিতে শুধু এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অন্যদিনের মত খাওয়ার পাট সারা হইলে লীলার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসে এবং চকচকে সিমেণ্টের মেঝেয় আঁচল না বিছাইয়াই শুইয়া পড়ে। পাছে দুরন্ত ছেলেরা নূতন কাকীমাকে বিরক্ত করে, এই ভয়ে দুয়ার বন্ধ করিয়াই সে শয়ন করে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু নিভার চোখে এই দুয়ার বন্ধ করিয়া শোওয়ার মধ্যে আর একটি রহস্যময় হেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং মাথার দিব্য দিয়া যাহাকে সে পরম বার্ত্তাটি গোপনে কানে কানে বলিয়াছে, সে-ই মুখ মুচকিয়া অল্প হাসিয়া আর এক বধূর কানে তুলিয়া দিয়া গোপন বার্ত্তাটির সম্মানরক্ষা করিয়াছে। সুতরাং, সেই অতি সম্মানিত গোপন কথাটি বহু কানে প্রবেশের গৌরবলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। আমরাই বা সে সংবাদের গৌরবহানি করি কোন্ সাহসে?

নিভার নূতন বউদিদি সবেমাত্র বছর খানেক হইল এ বাড়িতে আসিয়াছেন। নূতন দাদা বিবাহের পর বিদেশ গিয়াছেন। বিদেশ মানে কলিকাতা। হরিপুর গ্রাম হইতে ষাট মাইলের মধ্যে কর্ম্মস্থল হইলেও এমন তাঁহার কাজ যে, প্রত্যেকটি ছুটিতে দেশে আসা ঘটিয়া উঠে না। নূতন বিবাহ এবং নূতন চাকরি, মমতা দুইয়ের উপর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। সুরেশ এক শনিবার অন্তর বাড়ি আসিয়া উভয়ের প্রতি প্রীতির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করে না। যখন সে বাড়ি আসে, তখন কাজের সুব্যবস্থা করিয়াই আসে, এবং যখন বাড়ি আসে না, তখন বাড়ির ব্যবস্থাতেও কোন ত্রুটি দেখা যায় না। সাক্ষী নিভা আর ডাকপিওন। 'চিঠি' বলিয়া পিওন বাহির হইতে ডাকিলেই ত্রয়োদশী নিভা ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে হাত পাতে এবং তেমনই হাসিমুখে কর্ম্মরতা (নূতন বধূটিকে কেহ ভারী কাজ দেয় না; বিছানা-পাতা কি পান-সাজা এমনই কাজ সে করে।) বউদিদির কোলে রঙিন খামখানি ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বউদিদি তখন কাজে তন্ময়-চিত্ত, চিঠিখানা হাত দিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার নাই। পরম তাচ্ছিল্যভরে সেখানা খানিক পরে উঠাইয়া পানের বাটার পাশে কিম্বা বিছানার বালিশের উপর রাখেন এবং একবারও সে দিকে না তাহিয়া নিভার সঙ্গে এবাড়ি ওবাড়ির গল্প করেন। নিভার কৌতুকোজ্জল চক্ষুতে বিরক্তি ঘনাইয়া আসে, স্বরে একটু জোর দিয়া সে বলে, পড়ই না চিঠিখানা!

বউদিদি বলেন, ভারি তো চিঠি, তা আবার পড়া!

সত্যই, নিভার কৌতূহলকে শাসন করিবার জন্যই তিনি চিঠির পানে আর ফিরিয়াও চান না।

নিভা মনে মনে মতলব আঁটিয়া তখনকার মত চুপ করিয়া থাকে। পরে খাওয়া শেষ হইলে বউদিদি যেমন দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতে যান, অমনই নিদ্রাকে নির্ব্বাসন দিয়া জানালার ছিদ্রপথে দুই চোখ পাতিয়া নিভা তাঁহার দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা-আরাধনা দেখিতে থাকে। সকালবেলার অপঠিত নগণ্য চিঠিখানা শেমিজের গোপন স্থান হইতে বাহিরে আসে এবং খামের মুখ খোলা হইতেই এমন ভুরভুরে গন্ধ বাহির হয় যে, জানালার ছিদ্রপথে নিভার নাসিকাও সেই গন্ধে কেমন যেন লোভাতুর হইয়া উঠে। বউদিদির নিদ্রা আর হয় না, ছোট কাঠের হাতবাক্স হইতে আরও অনেক রঙিন খাম বাহির হয়। মেঝের চারিদিকে সেগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। নিভার মতে এইটি দুয়ার বন্ধের প্রধানতম এবং গোপনীয় হেতু।

আজ দ্বিপ্রহরে জানালায় অবশ্য নিভা নাই। নাই, কারণ জানালার ছিদ্র নাই। অনবরত গোপন কথা আলোচনার ফলে গোপনচারিণীকেও সতর্ক হইতে হইয়াছে। জলে ময়দা গুলিয়া ছিদ্র বন্ধের সহজ উপায়টি তাই সে প্রয়োগ করিয়াছে। বার্ত্তাচয়নকারিণী নিভা মনের দুঃখে পাড়ায় কোথায় বেড়াইতে গিয়া শহুরে মেয়েদের চাতুর্য্যের কথা সঙ্গিনীকে বলিয়া মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

দুয়ার বন্ধ করিয়া লীলা আজ চিঠির স্তূপ সাজাইয়া বসিল না। গত শনিবার সুরেশ আসে নাই, আসিয়াছিল সুদীর্ঘ কয়েকখানি চিঠি। এ সপ্তাহে সুরেশ আসিবে, চিঠির দীর্ঘত্ব অপ্রয়োজনীয়। আজ সকালে খামের মধ্যে যে লেখাটি আসিয়াছে, তাহা সত্যই সংক্ষিপ্ত, সহজ ও অনাড়ম্বর।

—শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে আমি বাড়ি যাইব, জানিবে।

ভাল কথা। সপ্তাহব্যাপী কবিত্বমণ্ডিত লিপিগুলি ঐ একটি ছত্র প্রিয়আগমন-সম্ভাবনার আনন্দে ম্লান হইয়া গিয়াছে। আজ আর রচনা নয়, রচয়িতা সশরীরে দেখা দিবেন। লেখকের কথা শুনিতে পাইলে কে আর কষ্ট করিয়া লেখার নদী পার হইবার প্রয়াস পায়?

দুই ছত্র লেখা দুই শত বার পড়িয়া লীলা দেওয়াল-আয়নার সম্মুখে গিয়া বসিল। আয়নাতে পরিপূর্ণ মুখশ্রী পড়িতেই লীলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দন্তে ওষ্ঠ চাপিল। লোকে তাহাকে সুন্দরী বলে, কিন্তু এই কি সৌন্দর্য্যের নমুনা? কেশের পারিপাট্য কোথায়? কোথায় ঢলঢলে গৌর মুখখানিতে ফুটন্ত পদ্মের মত চোখ? কর্ম্মের ক্লান্তিতে চক্ষু বসা-বসা বোধ হইতেছে, খাওয়ার ক্লান্তিতে মুখের কোমলত্ব ঘুচিয়াছে। পরনে আধময়লা কাপড়, তার চেয়ে ফরসা ব্লাউজ গায়ে। বারোমেসে চুড়ি কয়গাছি ছাড়া হাতে কোন অলঙ্কার নাই। ঘন ভ্রূর কোণে সূক্ষ্ম টিপ কই? পাতলা ঠোঁট দুইটিতে লালিমা ফোটে নাই, যদিও পান সে খাইয়াছে। পান খাইয়া ঠোঁটের শোভা তো ফোটে নাই, উপরন্তু কুন্দশুভ্র দাঁতের শ্রী নষ্ট হইয়াছে।

ঘরের কোণে একখানা পকেট-টাইম-টেব্‌ল ছিল, লীলা সেখানা খুলিয়া শনিবারের ট্রেনটা কখন স্টেশনে পৌঁছিবে দেখিতে লাগিল। অনেক শনিবার সে টাইম-টেব্‌লের পাতা উল্টাইয়াছে।

ট্রেনের সময়ও তার জানা, অথচ প্রত্যেক বারেই নূতন আনন্দের মুখে নূতন করিয়া সময় দেখা সুরু হয়। এ যেন প্রথম প্রণয়-লিপি, বার বার পাঠেও অতৃপ্তি আসে না। ট্রেন আসিবে সাড়ে চারটায়; স্টেশন হইতে বাড়ি এক ঘণ্টার পথ। লীলা ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, হাতে সময় প্রচুর; প্রায় তিন ঘণ্টা। ইহার মধ্যে বেশবাস সারা হইবে নিশ্চয়। শাড়ি ও অলঙ্কার নির্ব্বাচনে খানিকটা সময় যাইবে, খানিকটা প্রসাধনে—কবরী রচনায়, গাত্র মার্জ্জনে ও ক্রীম লিপ্‌স্টিক লেপনে।

সেবারের মত লাল ক্রেপের শাড়ি পরিয়া সুরেশের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎ-গতিতে সে চলিয়া যাইবে। খানিকটা পুষ্পসার সুবাস আর খানিকটা অগ্নিময়ী রূপের বিদ্যুদ্বিকাশ। সে বহ্নির শিখা লাগিয়া কোন পাতা-ঘেরা কুটীরখানি জ্বলিয়া উঠিবে, সেই হৃদয়-উল্লাসকর সংবাদ শুনিয়া রাত্রির প্রহরগুলি তাহার পরম সুখে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে।

সবুজ ময়ূর পাড়ের শাড়িখানি হাতে তুলিয়া লীলা ভাবিল, যাহাদের অন্তরে সবুজের সমারোহ ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, এই শাড়ি তাহাদের জন্যে। অন্তরের দৈন্য ঢাকিবার জন্যই তো বাহিরের আয়োজন। প্রগাঢ় আনুরক্তির নিদর্শন রক্তবর্ণ; কিন্তু কোন মনে আগুন ধরাইতে তাহার সাধ নাই। নূতন কিছু করিয়া প্রিয়কে বিস্ময়চকিত না করিলে কিসের বা কৌতুক! আজকাল-কার স্কার্ট-শাড়ি, রাম বল! বাঙালীর মেয়ে সে সাজিবে মরুবাসিনী মাড়োয়ারী মহিলা? ডুরে, বেনারসী, মুর্শিদাবাদ-শিল্ক ওসব উৎসব-বাড়িতে পরিলে মানায় ভাল, সাধারণ গৃহস্থবাড়িতে বিনা পর্ব্বে পরিলে কি আর রক্ষা আছে! যে নিভা, প্রচারদক্ষতায় তাহার তুলনা মেলে না। সারা গ্রামে বার্ত্তা রটিবে, আজ শনিবার, দাদা বাড়ি আসিবে, বউদিদি সকাল হইতে সাজসজ্জা করিতেছেন—যেন যাত্রাদলের রাণী! রাণী—রাণী!

লীলার বদলে কেহ যদি নামের শেষার্দ্ধ ধরিয়া ডাকে, কি মিষ্টই যে শোনায় তাহার কানে! আপন মনে কতবার অস্ফুটে সে ঐ নাম উচ্চারণ করিয়াছে। রাণী—রাণী!

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ বুজিয়াছে, এবং কল্পনায় এক জোড়া বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গন ও পেলব ওষ্ঠের সান্নিধ্য ঘন উতল নিশ্বাসের সঙ্গে তাহাকে অর্দ্ধসংজ্ঞাহারা করিয়া দিয়া পরক্ষণেই রূঢ় বাস্তবের জগতে টানিয়া আনিয়াছে। কেহ নাই, কিছু নাই, শুধু ঐ নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা অলস মোহ, কি জানি কিসের নেশার মত, সারা ইন্দ্রিয়কে অবশ করিয়া দিয়াছে।

চারিদিকে সন্তর্পণে চাহিয়া শাড়ির স্তূপের সম্মুখে বসিয়া লীলা বার কয়েক আপন নামের শেষার্দ্ধ উচ্চারণ করিল, এবং অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে যে শাড়িখানি বাছিয়া রাখিল, তাহা কোন দিক দিয়া কাহারও চোখে অশোভন ঠেকিবে না হয়তো।

অতঃপর গহনার বাক্স বাহির করিয়া লীলা লাল পাথরের হাঁস-আঁকা দুল বাহির করিল, বাহির করিল সরু বিছা-হার, ইজিপ্‌শিয়ান আর্মলেট। নিজের রুচির উপর তাহার বিশ্বাস ছিল, অলঙ্কারের ভার চাপাইয়া রূপকে হত্যা করিবার বাসনা তাহার কোন কালেই ছিল না, সে চেষ্টাও সে করিল না। নূতন পদ্ধতিতে আজ সে কেশ রচনা করিবে। ঠাকুরঝি বা জায়েদের চুলে হাত দিতে দিবে না।

পাতা কাটিয়া কপাল ঢাকিয়া দেওয়া, কি অসভ্য সেকেলে ফ্যাশান! যাহাদের চওড়া কপাল, তাহারা অনুশীলন করুক অলকবন্ধনের ওই পুরাতন রীতি, তাহারা পরুক কপাল-জোড়া কাচপোকার টিপ, তাহারা ফুল চিরুনি গুঁজিয়া মাথায় সাজাক মণিহারী দোকান। বিনাইয়া বেণী সে বাঁধিবে না, আলগা চুল কানের পাশ দিয়া ফাঁপাইয়া সেই চুল দিবে নামাইয়া, সুরভিতে কেশকলাপ অবশ্য সিক্ত করিবে। যে ঘন কালো চুল, গাঢ় অন্ধকারভরা নক্ষত্রবিভূষিত উজ্জ্বল আকাশের কল্পনা করিয়াই বুঝি কেশ-রচনার নবতর পদ্ধতি লীলা আবিষ্কার করিয়াছে!

কাপড়, কেশ ও গহনার পর লীলা আপন চালচলনের দিকে যত্নবতী হইল। অর্থাৎ সুরেশের সম্মুখ দিয়া কতবার সে চলিয়া যাইবে; পান দিবার অছিলায়, জল যোগাইবার প্রয়োজনে, ছোট নন্তুর রোদনে ব্যথিতা হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য; চলিবার কালে দুয়ারে বাধিয়া অল্প ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ ও আলনায় কাপড় গোছাইবার খসখস শব্দও হইতে পারে। পানের বাটায় পিতল-কাঁসার ঠোকাঠুকি, নিভাকে শাসন করিবার কালে চাপা উচ্চতর কণ্ঠস্বরের প্রকাশ; সুরেশের কাছে, সে যে আছে, এই সব প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের রাশি স্তূপীকৃত করিয়া সে পাইবে তৃপ্তি ও আনন্দ।

ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিতেই লীলা উঠিয়া পড়িল। করবীগন্ধী সাবান লইয়া তখনই কুয়াতলায় তাহার যাওয়া চাই। বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া সে সাবান মাখিবে। তখনও দিবানিদ্রা শেষ করিয়া অন্য বউয়েরা উঠে নাই, দীর্ঘক্ষণ জল ও সাবান লইয়া অঙ্গমার্জ্জনা করিবার এই সুবর্ণ-সুযোগ। সত্য, সামান্য মাত্র জল ঢালিয়া অঙ্গমার্জ্জনা করিলে তৃপ্তির বদলে তৃষ্ণাই বাড়িয়া যায়। জলের সঙ্গে দেহের স্বাদু সম্পর্ক, সাবানের গন্ধ সেই সম্পর্ককে স্বাদুতর করিয়া তুলে। কতক্ষণ একলা বসিয়া শীতল জল ঢালিয়া সাবানের ফেনা তুলিয়া দেহমার্জ্জনায় যে স্নিগ্ধতা আসে, মনের মধ্যে কল্পনার রঙিন ফানুস সেই পরিতৃপ্তির পথ ধরিয়া উড়িয়া চলে। সে যেন স্বর্গপথ অনুসন্ধানে যাত্রা! নরম সুগন্ধ সাবানের ফেনা মুখে মাখিয়া চোখ বোজ, দেখিবে, প্রিয় আসিয়া নরম গালের উপর উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতেছে; শীতল জল গায়ে ঢালিয়া অনায়াসে সেই প্রিয়স্পর্শের সুখ অনুভব করিতে পারিবে; আর হাত দিয়া জল ছিটাইয়া ছেলেমানুষের মত যে খেলা, সে খেলায় তরুণ চিত্তের অস্থির আবেগ ও কামনার বুদ্বুদ জন্মলাভ করে। লীলা আজ প্রাণ ভরিয়া গায়ে জল ঢালিল, সাবান মাখিল এবং অপরাহ্ণকে গভীর রাত্রিতে রূপান্তরিত করিয়া ঐ সব মধুর কল্পনার ফানুস উড়াইয়া খেলা করিল।

অবশেষে এত সাধের সন্ধ্যা আসিল।

সকলে মিলিয়া লীলার প্রসাধন শেষ করিয়াছে। লীলা বাঁধিয়াছে চুল, নিভার বড় বোন বিভা পরাইয়াছে গহনা, নবউ সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছেন, মেজবউ কপালে ক্ষুদ্র একটি খয়েরের টিপ আঁকিয়া দিয়াছেন, আর নিভা পোড়ারমুখী শিশি উজাড় করিয়া লীলার গায়ে ঢালিয়াছে চামেলীগন্ধী পুষ্পসার। হইতেছে সবই; শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সন্ধ্যার শুভাগমন হইল, আকাশে চাঁদ উঠিল, লীলার মন তারাসনাথ শশীর দর্শনে কুমুদিনীর মতই আপন মনের দলগুলি মেলিয়া ধরিল, কিন্তু এত করিয়াও পত্রের সেই দুই ছত্র লেখার গভীর অর্থ পরিস্ফুট হইল কই? দোতলার জানালা ধরিয়া লীলা পথের

পানে চোখ মেলিয়া আছে। ফাঁকা গ্রাম্য পথ, দুই ধারে কালকাসুন্দা, সিয়াকুল কাঁটা ও আসশেওড়ার ঝোপ; ঝোপ ঠেলিয়া কোথাও কাঠচাঁপার গাছ মাথা তুলিয়াছে, ঝাঁকড়া মাথায় তার হরিদ্রাভ সাদা ফুলের স্তবক। ডোবার ওপাশে বড় পিটুলিগাছটা যেখানে হেলিয়া পড়িয়াছে, পথও সেইখান হইতে বাঁকিয়াছে। সাদা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ধবধব করিতেছে। জনমানবশূন্য পথ।

ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া লীলা ঘরের পানে চাহিল। বোম্বাই খাটে বকের পালকের মত সাদা বিছানা, লীলার নিজের হাতে বোনা ঝালর দেওয়া বালিশ, বালিশের কোণে লাল টকটকে গোলাপ, এবং গোলাপের প্রত্যেকটি পাপড়িতে 'মনে রেখো', 'ভালবাসা', 'ভুলো না' ইত্যাদি লিপি দ্বারা রঙিন যৌবনের জয়গান উৎকীর্ণ। বালিশ উল্টাইলে দেখা যাইবে, দুইটি গন্ধরাজ ফুল রুমাল-ঢাকা রহিয়াছে। সদ্য-কাচানো নেটের মশারিটাও এইমাত্র টাঙানো হইয়াছে। নীল রঙের কাচের ফানুস দুইটি বাতিদানে সাজানো রহিয়াছে, মোমবাতি আছে ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকানো। গভীর রাত্রিতে চারিদিক যখন নিশুতি হইবে, এই বাড়ি গভীর নিদ্রায় চৈতন্য হারাইবে, সেই সময় নীল ফানুসে মোমবাতি জ্বালাইয়া লীলা সুরু করিবে গল্প। সদ্যপ্রস্ফুটিত গন্ধরাজ আনিয়া সুরেশের কানে গুঁজিয়া দিবে, সুরেশ কলিকাতা হইতে আনীত নূতন কিছু দিয়া লীলার সৌন্দর্য্যকে ভূষণ পরাইবে। তারপর সুরু হইবে হাসি আর গল্প, কৌতুক ও রহস্য, চাপল্য ও চুম্বন। নীল ফানুসে মোমবাতি নীরবে নিঃশেষ হইতে থাকিবে ও দীর্ঘতর রাত্রি দণ্ডেকে যাইবে ফুরাইয়া। অনেক কথা বলা হইলেও মনে হইবে, কিছুই বলা হয় নাই; এবং গভীর আশ্লেষে আশ্লিষ্ট হইলেও মনে হইবে, কোথায় কি যেন ফাঁক রহিয়া গেল। তৃপ্তির মাঝেও এত অতৃপ্তি কেন থাকে—এ রহস্য কে ভেদ করিবে? প্রেম যতই বিস্তারলাভ করিতে থাকে, রহস্যের রেখা ততই তার চারিধারে বর্ণবিন্যাসে মনোরম হয়। যেন অসীম নীল আকাশ, প্রত্যহ দেখিলেও অতৃপ্তি আসে না; যেন গভীর নীল সমুদ্রের গর্জ্জন, প্রত্যহ ও প্রতি মুহূর্ত্তে শুনিলেও পুরাতন হয় না। পুরাতন হয় না বলিয়াই একাধারে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি দুইই তাহার মধ্যে আছে।

ঘরের দুয়ার ভেজানোই ছিল। নিভা ঘরে ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, মিছেই ঘর সাজালে বউদি, দাদা বোধ হয়—

ত্রয়োদশী কন্যার পাকামিতে লীলা বিরক্ত হইয়া উঠিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কেউ না এলে বুঝি ভূত সেজে থাকতে হয়?

নিভা হাসিয়া বলিল, ভূত না সাজুক, বিদ্যাধরীও কেউ সাজে না। তা ভেবো না গো, রাত আটটার ট্রেনে দাদা আসতে পারেন।

লীলা রাগ করিয়া বলিল, তোমার দাদার জন্যে ভেবে তো আমার ঘুম হবে না!

নিভা বলিল, কথা সত্যি। আজ রাত্রে ঘুমুতে তুমি পারবে না ভাই, তা দাদা আসুন আর নাই আসুন।

কথাশেষে নিভা আর সেখানে দাঁড়াইল না।

লীলা ক্রোধে অধর দংশন করিয়া খানিক গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দুয়ারে খিল আঁটিয়া ভাবিল, টুলটা জানালার ধারে পাতিয়া আটটার ট্রেনের অপেক্ষা করিবে কি না। না, প্রতীক্ষা সে করিবে না। ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে ঘুমাইতেও সে পারে। কিন্তু প্রতীক্ষাই যদি সে না করিল তো, এই বেশবাসের প্রয়োজন কি? হাতের ঠেলায় খোঁপাকে বিধ্বস্ত করিয়া কপালের ও টিপ উঠাইয়া ফেলিতে দোষ কি? কি প্রয়োজন সৌখিন শাড়ি ও আভরণের সজ্জায়? এই বকশুভ্র বিছানা পাতিয়া, মোমবাতি জ্বালিবার আয়োজন করিয়া, নেটের মশারি টাঙাইয়া, গন্ধরাজ ফুল সঞ্চয় করিয়া তার কতটুকুই বা লাভ? আর সর্ব্বোপরি অন্তরের মধ্যে অধীর প্রতীক্ষা ও রঙিন কল্পনাকে পুষিয়া কেন সে রাতের নিদ্রাকে বিসর্জ্জন দিবে?

লীলা বিছানায় শুইয়া পড়িল, বেশবাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এত যত্ন ও এত সময় দিয়া মন মিশাইয়া আজ দ্বিপ্রহর হইতে সৌন্দর্য্যের কলা সে পরিপূর্ণ করিয়াছে; সেই সঙ্গে কত আশা, কত উল্লাস মনে বাসা বাঁধিয়াছে; বর্ষাকালের নদীর মত দেহের কূল ছাপানো রূপ আরসির সামনে দাঁড়াইলেই তাহাকে বিভ্রান্ত করিতেছে; এক কথায়, অনায়াসে, আটটার ট্রেন না দেখিয়া, তাকে কি বিসর্জ্জন দেওয়া চলে?

অবশ্য সুরেশ না আসিলে এই সজ্জার সার্থকতা নাই। কাল সকালে বাড়ির কাহারও কাছে মুখ সে দেখাইতে পারিবে কি? তরুণ বয়সের এই পরম লজ্জাকর কাহিনী দুঃখ করিয়া কোথাও বলা চলে না, পত্রেই কি লেখা চলে? ইহার চেয়ে মৃত্যু যে ভাল। যৌবনগর্ব্বিতা তরুণীর ব্যর্থ বাসকসজ্জার চেয়ে লজ্জাকর জিনিস পৃথিবীতে কিই বা আছে!

না না, সুরেশ আসুক। আটটার ট্রেন যদি লেট হয়, দশটায় এগারোটায় যখন ইচ্ছা সে আসুক। সে না আসিলে লীলার পক্ষে এই ঘরের খিল খোলা সম্ভব হইবে না, সুরেশের কথা না শুনিলে আজিকার পূর্ণিমা-রাত্রির কোন মূল্য তাহার উত্তরজীবনে থাকিবে না। এই সজ্জা এখনই কণ্টকক্ষতের মত, অগ্নিদাহের মত সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে, সে না আসিলে এই সজ্জা যে চিতানল হইবে।

বালিশে মুখ গুঁজিয়া লীলা হু-হু শব্দে কাঁদিয়া উঠিল।

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে, লীলার লজ্জাই বাড়িয়াছে শুধু। অলঙ্কার আগুন হইয়া লীলাকে দগ্ধ করিয়াছে, পুড়াইয়া ছাই করিতে পারে নাই। সুরেশ সত্যই আসিল না। কিন্তু সে না আসিলেও বাড়ির সকলের খাওয়া আছে, কাজ আছে। লীলার রুদ্ধ দুয়ারে বার কয়েক করাঘাত পড়িয়াছে। উঠিব, কি উঠিব না, ভাবিয়া লীলা উঠিয়াছে। দুয়ার খুলিয়া কোনমতে চারিটি মুখেও দিয়াছে, এবং প্রকাশ্য বিদ্রূপবাণের খোঁচা না খাইলেও কাহারও মৃদুহাসি ও দ্রুতগমনজনিত উপহাস সে না দেখিয়াও বুঝিতে পারিয়াছে। কি করিবে, উপায় নাই। অন্তরে ক্রোধ ও অভিমান মিশিয়া যে ঝড় তুলিয়াছে, সে ঝড় তাহার অন্তরকেই বিধ্বস্ত করুক। সকলের বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড অভিযোগ সবেগে মাথা তুলিতে চাহিতেছে, কেন উঁহারা তাহাকে সাজাইয়া দিলেন? কেনই বা পরিহাস করিতেছেন? কিন্তু তরুণীর অদ্ভুত আত্মসংযম। প্রকাশ্যে কাহাকেও সে অভিযুক্ত করিল না। খাওয়া শেষ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল এবং অবরুদ্ধ অভিমানের উত্তাল তরঙ্গে

ঝাঁপ খাইয়া পড়িল। প্রথমে এক টানে ধবধবে চাদরখানা উঠাইয়া ঘরের কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া ফেলিয়া দিল। তার উপর গিয়া পড়িল ঝালর দেওয়া বালিশ। জানালার বাহিরে পড়িয়া গন্ধরাজের সদ্গতি হইল। ক্লান্তিবশত কেবল মশারিটা খোলা হইল না। গায়ে যে দুই একখানা অতিরিক্ত অলঙ্কার উঠিয়াছিল, তাহা পুনরায় বাক্স আশ্রয় করিল, পুষ্পসারগন্ধী শাড়িখানা গেল ট্রাঙ্কের মধ্যে। বিছানায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিবার সময় কবরীর কবরীত্ব শেষ হইয়াছিল, ছোট্ট বলিয়া কপালের টিপটি তুলিতে সে ভুলিয়া গেল। তারপর, ধোপাবাড়ি দিবার জন্য যে কাপড়ের স্তূপ বোঁচকা বাঁধিয়া বারান্দায় রাখা হইয়াছিল, দুয়ার খুলিয়া চুপি চুপি তাহারই মধ্য হইতে অতি মলিন একখানি শাড়ি আনিয়া লীলা পরিল। এতক্ষণে অন্তরের সঙ্গে বাহির মিলিল।

খালি মেঝের উপর শুইয়া লীলা চক্ষু মুদিল।

হয়তো ঘুমই আসিয়াছিল। ঘুমের রাজত্বে এত যে ক্রোধ, এত যে অভিমানের অন্তর্দাহ এবং অপরিসীম লজ্জা, কিছুই ছিল না। লীলা স্বপ্ন দেখিতেছিল। মধুর স্বপ্ন। বাহিরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটিয়াছে, গন্ধরাজের গন্ধে ঘর ভুরভুর করিতেছে। প্রকাণ্ড পালঙ্কে সে যেন বসিয়া আছে। চারিদিকে অনেক ফুল, অন্য কোন ফুল নহে—খালি গন্ধরাজ। সেই দুইটি ফেলিয়া দেওয়া গন্ধরাজ বহু শত হইয়া ঘর ভরিয়া দিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে নীল কাচের ফানুসে সারি সারি মোমবাতি জ্বলিতেছে। চাঁদের আলো, বিছানার চাদর, গন্ধরাজ ফুল আর নীল ফানুসের মধ্যে বসিয়া আছেন তিনি, পরম শুভ মুহূর্ত্তে যাঁহার চোখের পানে চাহিয়া বেপথুমতী লীলা বাড়াইয়া দিয়াছে নিজের কম্পিত কর, এবং স্পর্শের সঙ্গেই সেই অজানা অন্তরের সঙ্গে মিলিয়াছে তাহার অন্তর; সাগরে যেমন নদী লাভ করে পরম গতি। হাতে হাত ও অন্তরে অন্তর মিলিবার সঙ্গে সঙ্গেই লীলার স্বাতন্ত্র্যবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। বহু বসনাক্রান্ত হইয়া, বহু ভূষণে দেহ সাজাইয়া, অলকপ্রসাধনে কিংবা অবগুণ্ঠনের নিবিড়তায় রহস্যের সৃষ্টি করিয়া প্রিয়মন হরণের প্রয়োজন কি এখনও তাহার শেষ হয় নাই? যাহাদের অন্তরে সবুজের সমারোহ ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, সবুজ প্রীতি পোষণ করুক তাহারাই; যেখানে মনের সঙ্গে মন মেলে না, বাহিরের চাকচিক্য সেইখানেই ফোটে বেশি। লিপ্‌স্টিকের লালিমা, কাজলের কালোরেখা, খয়েরের টিপ, শাড়ি ও অলঙ্কারের নবতর ফ্যাশান, অলকবন্ধনের সুষ্ঠু রীতি অনুশীলন করুক তাহারা, মনের দৈন্য যাহাদের সবচেয়ে বেশি।

সুরেশ আদর করিয়া ডাকিতেছে, লীলা, লীলা, লীলারাণী, রাণী!

টুক করিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্ন ও বাস্তব সঙ্গে সঙ্গে এক হইল।

মনের ভুল নহে, সত্যই দুয়ারে মৃদু করাঘাত আর মৃদুকণ্ঠের সেই মধুরতম ডাক, রাণী!

স্বপ্নের লেশমাত্র লীলার চোখে রহিল না, মনেও না। নিদ্রায় যে বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, জাগরণে মৃদুকণ্ঠের ইন্ধন পাইয়া তাহা দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। নিজের শ্রীহীন দেহের পানে চাহিয়া লীলার চোখ ফাটিয়া জলধারা নামিল। সারা অঙ্গে দৈন্য বহিয়া লীলা দুয়ার খুলিবে কোন্ মুখে?

আসল কথা, ট্রেন লেট হয় নাই, পয়লা অক্টোবর হইতে গাড়ির সময় বদল হইয়াছে মাত্র।

# ভাগবত-পাঠ

( বিদেশী কবিতা অবলম্বনে )

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শোন্ দেখি বাছা, দরজায় যেন কিসের শব্দ হয়—
এত রাত্তিরে কেন বা এমন নড়ে !
না গো, মা জননী ! শব্দ ও কিছু নয়,
বাতাসের ডাক, দুয়ার কাঁপিছে ঝড়ে।
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার ;
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি শোন আরবার।

"জেরুজালেমের যতেক যুবতী আজ রাতে ঘুমায়ো না
বন-পথ বাহি' আসিছে বঁধুয়া—ওই যে যেতেছে শোনা !
পথের পাথরে, শুনি আমি, তার চরণের ধ্বনি বাজে,
নিশার শিশির জমিয়াছে তার সুরভি কেশের মাঝে।"

ওই শোন্ বাছা, বাড়ির ভিতরে মানুষের সাড়া পাই—
গুটি গুটি যেন সিঁড়ি বেয়ে কেউ আসে !
না গো, মা জননী ! কেহই কোথাও নাই,
ইঁদুর ছুটিছে, ঝিঁঝিরা ডাকিছে ঘাসে।
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার ;
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি শোন আরবার।

"জেরুজালেমের যুবতীরা শোন,—আছে মোর বঁধুয়ার
নীল আঙুরের কুঞ্জ-বিতান, মধুর রসের সার !
পাণ্ডুবরণ আনার সেথায় ক্রমে হয় সিন্দুর,—
এ সব ছাড়িয়া পরাণ-বঁধুয়া আসিয়াছে এতদূর !"

ওরে বাছা, তোরে ভূত কি পিশাচে পাইয়াছে নিশ্চয় !
পায়ের শব্দ শুনি যে মেঝের 'পরে !
না গো, মা জননী ! ভূতের সাধ্য নয়—
হয়তো সে কোন্ দেবতা এসেছে ঘরে !
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার ;
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি শোন আরবার।

"মম বল্লভ, হে বর-নাগর, চির-সুন্দর চোর !
আজি এ নিশীথে নিবারিতে নারি হিয়ার কাঁপনি মোর ;
নিবিয়াছে দীপ, নিদ্রিত পুরী নিবিড় অন্ধকারে—
এ হেন সময়ে, রাজার প্রহরী ! ছাড়িয়া দিয়ো গো তারে !"

---

# আত্মোপলব্ধির স্বরূপ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, জগতের সব পদার্থ বিদ্যুৎকণার সমষ্টি, এক জ্যোতির্ম্ময় উপাদান সকলের মূল। বুদ্ধির পথে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের যে একত্ব আবিষ্কার করেছে, এ কত বড় কথা ; স্থূলকে দেখেছেন তাঁরা অস্থূল রূপে আলোকময়, সর্ব্বব্যাপকত্বে—বুদ্ধির অভিব্যক্তিতে—এ কথার তুলনা দেখি নে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আত্মার দিক থেকে মানুষ মুগ্ধ, সে মারছে কাড়ছে—এমন নিষ্ঠুরতাও ইতিপূর্ব্বে কখন দেখা যায় নি ; বুদ্ধির দিক থেকে এমন বিকাশের সঙ্গে শ্রেয়োবুদ্ধির দিক থেকে এমন হীনতার সমাবেশ পূর্ব্বে দেখা যায় নি। তার কারণ অভিব্যক্তির আরও একটা স্তর, আত্মার পূর্ণ বিকাশ মানুষের মধ্যে এখনো হয় নি। আত্মার ধর্ম্ম ঐক্যকে দেখা ; বুদ্ধি অনৈক্যকেই দেখে, তাকে শ্রেণীবদ্ধ করে। আত্মা সেই সর্ব্বব্যাপকত্বকে সন্ধান করে,—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং শ্লোকের মধ্যে যে সর্ব্ব-ব্যাপকত্বের কথা আছে, এ-কথা আমাদের পিতামহেরা কেমন ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন, তা আজকের বিজ্ঞানের মতই আশ্চর্য্য। সেদিন তাঁরা বলেছেন, শোন, আমি অন্ধকারের পার থেকে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখেছি, তাঁকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, মনন করা যায় না, শুধু তাঁকে উপলব্ধির দ্বারা আমরা আনন্দ পাই—সেই আনন্দ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ, অথচ তিনি দেখার অতীত, স্পর্শের অতীত। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কি অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি আমাদের পিতামহদের মধ্যে। সেই জ্যোতির প্রকাশ আজ আমাদের মধ্যে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু তার কাজ চলছে, কোন একদিন তার প্রকাশ হবে। এক একজন মানুষের মধ্যে এই অভিব্যক্তি বিশেষভাবে রূপ গ্রহণ করে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালো কলঙ্কের স্পর্শে জেগে ওঠে আবর্ত্ত পঙ্কিল,
কল ও মিলের ধোঁয়া, জেটি-নৌকা-ষ্টীমার বন্ধন,

আলোকচিত্র হইতে—
শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত

# বিপিনের সংসার

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন দশেক পরে বিপিন বাড়ি হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়া জানিল, তাহার ভাই বলাই রাণাঘাট হাসপাতালে আর থাকিতে চাহিতেছে না। বউদিদিকে অনবরত চিঠি লিখিতেছে, দাদাকে ব'ল বউদিদি, আমায় এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে। আমার অসুখ সেরে গিয়েছে, আর এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

স্ত্রীর চিঠি পাইয়া বিপিন খুব খুশি হইল না। ইহাতে শুধু কয়েকটি মাত্র সাংসারিক কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কিছু বেশি দিন তাহাদের বিবাহ হয় নাই যে, দুই একটি ভালবাসার কথা চিঠিতে সে স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে না।

আজ বলিয়াই বা কেন, মনোরমা কবেই বা চিঠিতে মধু ঢালিয়াছিল? অবশ্য এ কথা খানিকটা সত্য যে, এতদিন সে বাড়িতেই ছিল, মনোরমার কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই তাহাকে চিঠি লিখিবার। তবুও তো সে এক বৎসর পলাশপুরে চাকুরি করিতেছে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে বিদেশে প্রবাসযাপন, অন্য অন্য স্ত্রীরা কি তাহাদের স্বামীদের নিকট এ অবস্থায় এই রকম কাঠখোট্টা চিঠি লেখে?

বিপিন জানে না, এ অবস্থায় স্ত্রীরা স্বামীদের কি রকম চিঠি লেখে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, বিরহিণী স্ত্রীরা বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া প্রবাসী স্বামীদের নিকট কত রকমে তাহাদের মনের ব্যথা জানায়, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বাড়ি আসিতে অনুরোধ করে। নাটক-নভেলে সে এইরূপ পড়িয়াছেও বটে। প্রথম কথা, মনোরমা তাহাকে চিঠিই কয়খানা লিখিয়াছে এক বছরের মধ্যে? পাঁচ ছয়খানার বেশি নয়। অবশ্য তাহার একটা কারণ বিপিন জানে, সংসারে পয়সার অনটন। একখানা খামের দাম চার পয়সা, সংসারের খরচ বাঁচাইয়া জোটানো মনোরমার পক্ষে সহজ নয়। সে যাক, কিন্তু সেই চার পাঁচখানা চিঠিতেও কি দুই একটা ভাল কথা লেখা চলিত না? মনোরমার চিঠি আসে, টাকা পাঠাও, চাল নাই, তেল নাই, অমুকের কাপড় নাই, তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি। কখনও এ কথা থাকে না, একবার বাড়ি এস, তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা করে।

বিপিন চিঠি পাইয়া বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, স্ত্রীকে দেখিবার জন্য নয়, বলাইকে হাসপাতাল হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। ছোট ভাইটিকে সে বড় ভালবাসে। রাণাঘাটের হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছে, বাড়ি যাইতে চায়, ভরসা করিয়া দাদাকে লিখিতে পারে নাই, পাছে দাদা বকে। তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতেই হইবে।

পলাশপুরে গিয়া তিন দিনের ছুটি চাহিতেই জমিদারবাবু বলিলেন, এই তো সেদিন এলে হে বাড়ি থেকে, আবার এখুনি বাড়ি কেন?

বিপিন জমিদারকে সমীহ করিয়া স্ত্রীর চিঠির কথা পূর্ব্বে বলে নাই, এখন বলিল। ভাইকে হাসপাতাল হইতে লইয়া যাইবার কথাও বলিল।

অনাদিবাবু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, যাও, কিন্তু তুমি বাড়ি গেলে আর আসতে চাও না। জামাই চ'লে গিয়েছেন। মানী এখানে রয়েছে, সামনের শনিবারে আবার জামাই আসবেন। রোজ দু তিন টাকা খরচ। তুমি মহল থেকে চ'লে এলে আদায়-পত্তর হবে না, আমি প'ড়ে যাব বিষম বিপদে; তিন দিনের বেশি আর এক দিনও যেন না হয়, ব'লে দিলাম।

মানীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বিপিন দেখিল, তাহা একরূপ অসম্ভব। সে থাকে বাড়ির মধ্যে, তাহাকে ডাকিয়া দেখা করিতে গেলে হয়তো মানীর মা সেটা পছন্দ করিবেন না।

যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কিন্তু বিপিন ইচ্ছাটা কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। একটিমাত্র ছুতা ছিল, বিপিন সেইটাই অবলম্বন করিল। সে যাইবার পূর্ব্বে একবার জমিদার-গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেল।

—ও মাসীমা, কোথায় গেলেন, ও মাসীমা?

ঝি বলিল, মা ওপরে পূজোয় বসেছেন, দেরি হবে নামতে, এই বসলেন।

বিপিন একবার ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তাই তো! বসবার তো সময় নেই। রাণাঘাটে হাসপাতালে যেতে হবে। একটা কথা ছিল, আচ্ছা, আর কেউ আছে? কথাটা না হয় ব'লে যেতাম।

—দিদিমণিকে ডেকে দোব? দিদিমণি রান্না-বাড়িতে রয়েছে, দেখব?

—তা মন্দ নয়। তাই না হয় দাও, কথাটা ব'লেই যাই।

ঝি বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে মানী বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে বিপিনদা! কখন এলে?

—এসেছি ঘণ্টা দুই হ'ল। কর্ত্তার কাছে কাজ ছিল, আমি তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি।

ঝি তখন রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া মানী বলিল, যা তো হিমি, ওপরে আমার ঘর থেকে কর্পূরের শিশিটা নিয়ে বামুন-ঠাকরুণকে রান্নাঘরে দিয়ে আয়।

ঝি চলিয়া গেল।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, দুঘণ্টা এসেছ বাইরে? কই, আমি তো শুনি নি! চা খেয়েছ?

—না।

—তুমি কখন যাবে? কেন, এখন হঠাৎ বাড়ি যাচ্ছ যে?

বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, সে কৈফিয়ৎ তোমার বাবার কাছে দিতে হয়েছে একদফা, তোমার কাছেও আবার দিতে হবে নাকি?

—নিশ্চয় দিতে হবে। আমিও তো জমিদারের মেয়ে, দেবে না কেন?

—তবে দিচ্ছি। আমার ভাই বলাইকে তোর মনে আছে? সে একবার কেবল বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন সে ছেলেমানুষ। সে রাণাঘাট হাসপাতালে—

তারপর বিপিন সংক্ষেপে বলাইয়ের অসুখের ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

মানী বলিল, চা খেয়ে যাও। ব'স, আমি ক'রে আনি।

বিপিন রাজি হইল না। বলিল, থাক মানী, আমায় অনেকটা পথ যেতে হবে এই অবেলায়। চা খাওয়ার জন্যে নয়, একটা কথা জিগ্যেস করি—যদি আমার আসতে দু এক দিন দেরি হয় কর্ত্তা-বাবুকে ব'লে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারবি?

মানী বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া চাপা হাসিমুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বলিল, নির্ভয়ে চ'লে যাও, বিপিনদা। অভয় দিচ্ছি, তিন দিনের জায়গায় সাত দিন থেকে এস। বাবাকে শান্ত করবার ভার আমার ওপর রইল।

বিপিন হাসিয়া বলিল, বেশ, বাঁচলাম। দেবী যখন অভয় দিলে, তখন আর কাকে ডরাই? চলি তবে।

—না, একটু দাঁড়াও। কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না। কোন্ সকালে ধোপাখালি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ, একটু জল খেয়ে যেতেই হবে। আমি আসছি।

মানী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে একখানা আসন আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া দিয়া বলিল, এস, ব'স উঠে।—বলিয়াই সে আবার ক্ষিপ্রপদে অদৃশ্য হইল।

মানীর আগ্রহ দেখিয়া বিপিন মনে কেমন এক ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। এ অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এমন কি সেদিন পোলাও খাওয়ানোর দিনেও হয় নাই। সেদিন সে সে ব্যাপারটাকে খানিকটা সাধারণ ভদ্রতা, খানিকটা মানীর রাঁধিবার বাহাদুরি দেখানোর আগ্রহের ফল বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু আজ মনে হইল, মানীর এ টান আন্তরিক, মানী তাহার সুখদুঃখ বোঝে। বিপিনের সত্যই ক্ষুধা পাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, রাণাঘাটের বাজারে কিছু খাইয়া লইয়া তবে মিশন হাসপাতালে যাইবে। আচ্ছা, মানী কি করিয়া তাহা বুঝিল?

একটা থালায় মানী খাবার আনিয়া বিপিনের সামনে রাখিয়া বলিল, খেয়ে নাও। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি, দৌড়ে চা ক'রে আনি।

থালার দিকে চাহিয়া বিপিনের মনে হইল, বাড়িতে এমন কিছু খাবার ছিল না, তেমন কৃপণই বটে জমিদার-গিন্নী! মানী বেচারী হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যাহা পাইয়াছে—কিছু মুড়ি, এক থাবা দুধের সর, খানিকটা গুড়, এরই মধ্যে দুইখানা থিন্ এরারুট বিস্কুট—তাহাই আনিয়া ধরিয়া দিয়াছে।

মানী ইতিমধ্যে একমালা নারিকেল ও একখানা দা হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া হাজির হইল। বিপিনের মনে হইল, কোথা হইতে নারিকেল-মালাটি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছে এইমাত্র।

—নারকোল খাবে বিপিনদা? দাঁড়াও, একটু নারকোল কেটে দিই। কুরুনিখানা খুজে পেলাম না। তোমার আবার দেরি হয়ে যাবে, কেটেই দিই, খাও। মুড়ি দিয়ে সর দিয়ে গুড় দিয়ে মাখ না। আস্তে আস্তে ব'সে খাও, আবার কখন খাবে, তার ঠিক নেইকো। চা আনি।

একটু পরে চা হাতে যখন মানী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিপিন যেন নূতন চোখে মানীকে দেখিল।

মানী যেন তাহার কাছে এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও তৃপ্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। এই আগ্রহভরা আন্তরিকতা, এই যত্ন বিপিন কখনও মনোরমার নিকট হইতে পায় নাই। মনোরমা যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, ভালবাসে না, তাহা নয়। সে অন্য ধরণের মেয়ে, গোটা সংসারটার দিকে তাহার দৃষ্টি—মা, বীণা, ছেলেমেয়ে, এমন কি বাড়ির কৃষাণের দিকে পর্য্যন্ত। একা বিপিনের সুখদুঃখ দেখিবার অবকাশ তাহার নাই, বিপিন নিজের সংসারে পাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়া মনোরমার যৌথ সেবার কিছু অংশ পাইয়া আসিয়াছে এতদিন। তাহাতে এমন তৃপ্তি কোন দিন সে পায় নাই।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন উঠিল। বলিল, খুড়ীমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, বলিস আমার কথা মানী, চললুম।

—এস। কিন্তু বেশি দিন দেরি করলে চাকরির দায়ী আমি নয়, মনে থাকে যেন।

—খানিকটা আগে অভয় দিয়েছ দেবী, মনে আছে?

—দুমাস দেরি করলেও কি অভয় দেওয়া বাহাল রইল? বাঃ রে, আমি বলেছি তিন দিনের জায়গায় সাত দিন, না হয় ধর দশ দিন।

—না হয় ধর এক মাস।

—না হয় ধর তিন মাস? সে সব হবে না, সোজা কথা শোন বিপিনদা। আমার তো বাবার কাছে বলবার মুখ থাকা চাই।

পরে গম্ভীরমুখে বলিল, কথা দিয়ে যাও, কদিনে আসবে। না, সত্যি, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমি কি বলেছিলুম প্রথম দিন, মনে আছে?

বিপিন কৃত্রিম ব্যঙ্গের সুরে বলিল, হ্যাঁ, বলেছিলে, চাকরিতে টিকে থাকলে তুমি আমার ভালর চেষ্টা করবে।

মানী হাসিয়া বলিল, মনে আছে তা হ'লে? বেশ, এখন এস তা হ'লে—বেলা গেল।

পথে উঠিয়াই মানীর কথা মনে করিয়া বিপিনের দুঃখ হইল। বেচারী ছেলেমানুষ, সংসারের কি জানে! জমিদারির যা অবস্থা, মানী কি উন্নতি করিয়া দিবে তাহার! দেনা ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় হাজারে দাঁড়াইয়াছে রাণাঘাটের গোবিন্দ পালের গদিতে। সদর খাজনা দিবার সময় প্রতি বৎসর তাহার নিকট হ্যাণ্ডনোট কাটিতে হয়। ইহা অবশ্য বিপিন এখানে চাকরিতে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বের ঘটনা, খাতাপত্র দেখিয়া বিপিন জানিতে পারিয়াছে। গোবিন্দ পাল নালিশ ঠুকিলেই জমিদারি নীলামে চড়িবে।

মানী মেয়েমানুষ, বিষয় সম্পত্তির কি বোঝে! ভাবিতেছে, সে মস্ত জমিদারের মেয়ে, চেষ্টা করিলেই বিপিনদাদার বিশেষ উন্নতি করিয়া দিতে পারিবে। বিপিনের হাসি পাইল, দুঃখও হইল। বেচারী মানী!

রাণাঘাট হাসপাতালে বিপিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিল। বলাই তাহাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু বিপিনের মনে হইল, ভাই যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে তাহা নয়, এ অবস্থায় তাহাকে লইয়া যাওয়া কি উচিত হইবে?

বিপিন কৈবর্ত্তের মেয়ে সেই নার্স টিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমার ভাই বাড়ি যেতে চাইছে, কান্নাকাটি করছে, ওকে এখন নিয়ে যেতে পারি?

নার্স বলিল, নিয়ে যাও বাবু, তোমার ভাই আমাকে পর্য্যন্ত জ্বালাতন ক'রে তুলেছে বাড়ি যাব বাড়ি যাব ক'রে। নেফ্রাইটিসের রুগী, যা সেরেছে, ওর বেশি আর সারবে না। কেন এখানে মিথ্যে রেখে কষ্ট দেবে।

তাহার মনে হইল, নার্স যেন কি চাপিয়া যাইতেছে। সে বলিল, ও কি বাঁচবে না?

নার্স ইতস্তত করিয়া বলিল, না, তা কেন, তবে শক্ত রোগ। বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটু সাবধানে রাখতে হবে। নিয়েই যাও বাড়ি, এখন তো অনেকটা সেরেছে।

বিপিনের মনটা খারাপ হইয়া গেল। সে গিয়া মিশনের বড় ডাক্তার আর্চার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আর্চার সাহেব নিজের বাংলার বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন, দীর্ঘাকৃতি, সবল চেহারা। মাথার সামনে টাক পড়িয়া গিয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছেন, বড় ভাল লোক, এ অঞ্চলের সকলে আর্চার সাহেবকে ভালবাসে।

বিপিন গিয়া বলিল, নমস্কার, ডাক্তার সাহেব।

আর্চার সাহেব বিপিনকে চেনেন না, বলিলেন, এস, আপনি কি বলছেন?

আর্চার সাহেব বাংলা বলেন বটে, তবে একটু ভাবিয়া, একটু ধীরে ধীরে, যেখানে জোর দেওয়া উচিত সেখানে জোর না দিয়া এবং যেখানে জোর দেওয়া উচিত নয় সেখানে জোর দিয়া।

বিপিন বলিল, আমার ভাই বলাই চাটুজ্জে ছ নম্বর ওয়ার্ডে আছে, নেফ্রাইটিসের অসুখ, তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি? সে বড় ব্যস্ত হয়েছে বাড়ি যাবার জন্যে।

—হাঁ হাঁ, ওই ওয়ার্ডের ছোক্‌রা রুগী। নিয়ে যান।

—সাহেব, ও কি সেরেছে?

—সে পূর্ব্বের অপেক্ষা সেরেছে। কঠিন রোগ, একেবারে ভালভাবে সারতে এক বছর লাগবে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করবেন, মাংস খেতে দেবেন না।

—তা হ'লে কাল সকালে নিয়ে যাব।

—আপনি রাত্রে কোথায় থাকবেন? আমার বাড়িতে থাকুন। আমার এখানে ডিনার খাবেন। মুকুন্দ, ও মুকুন্দ!

—আমার এখানে আত্মীয় আছেন সাহেব, তাঁদের বাড়ি ব'লে এসেছি, সেখানেই থাকব। আমার জন্মে ব্যস্ত হবেন না।

বিপিন রাত্রে বাজারের নিকট তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি থাকিয়া, পরদিন সকালে ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া ভাইকে লইয়া স্টেশনে গেল।

বলাইয়ের বয়স বেশি নয়—কুড়ি একুশ। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে তার শরীর খুব ভাল ছিল, বিপিনের সংসারের ক্ষেতখামারের অনেক কাজ সে একাই করিত।

মধ্যে যখন বিপিনের বদখেয়ালিতে পৈতৃক অর্থ সব উড়িয়া গেল, সংসারের ভয়ানক কষ্ট, সংসার একেবারে অচল, তখন বলাই আঠারো বছরের ছেলে। বলাই দেখিল, দাদার মতিবুদ্ধি তাহাদের অনাহারের ও দারিদ্র্যের পথে লইয়া চলিয়াছে, যদি বাঁচিতে হয় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইবে এবং বুক দিয়া খাটিতে হইবে।

নদীর ধারের কাঁঠাল-বাগান বাঁধা দিয়া সেই টাকায় সে এক জোড়া বলদ কিনিয়া গরুর গাড়ি চালাইতে লাগিল নিজেই। লোকের জিনিসপত্র গাড়ি বোঝাই দিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার ভাড়া খাটিত, স্টেশনে সওয়ারী লইয়া যাইত। অনেকে নিন্দা করিতে লাগিল। একদিন বৃদ্ধ যদু মুস্তফি ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হে বলাই, তুমি নাকি গরুর গাড়ির গাড়োয়ানি কর?

বলাই একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—সেটা কি রকম হ'ল? বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে হয়ে অমন বংশের নাম ডোবাবে তুমি? কাল শুনলাম, বাজারের নিবারণ সাহার বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে আট দশ গাড়ি বালি বয়েছ নদীর ঘাট থেকে সারাদিন। এতে মান থাকবে?

বলাই একটু ভীতু ধরণের ছেলে। বয়সে বড় ভারিক্কি মুস্তফি মহাশয়কে তাহার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে পর্য্যন্ত সমীহ করিয়া চলিতেন। সেখানে সে আঠারো বছরের ছেলে কি তর্ক করিবে! তবুও সে বলিল, জ্যাঠামশাই, এ না করলে যে সংসার চলে না, মা বোন না খেয়ে মরে। দাদা তো ওই কাণ্ড করছে, দাদার ওপর আমি কিছু বলতে তো পারি না, মাঠের জমি, খাস জমি সব দাদা বিক্রি করছে আর মৌরুসী দিচ্ছে, মার হাতে একটা পয়সা রাখে নি—সব নেশাভাঙে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কি খেয়ে বাঁচব, বলুন তো? এতে তবুও দিন এক টাকা গড়ে আয় হচ্ছে। বালির গাড়ি ছ আনা ক'রে ভাড়া নদীর ঘাট থেকে বাজার পর্য্যন্ত। কাল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এগারো গাড়ি বালি বয়েছি—ছেষট্টি আনা চার টাকা দু আনা একদিনের রোজগার। এ অন্যভাবে আমায় কে দিচ্ছে বলুন?

সে দুর্দ্দিনে বলাই মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়া বুক দিয়া না পড়িলে সংসার অচল হইত। বলাই গরুর গাড়ির গাড়োয়ানি করিয়া লাঙল করিল, জমি চাষ করিয়া ধান বুনিল, আটির মাঠে কুমড়া করিল এবং সেই কুমড়া কলিকাতায় চালান দিয়া সেবার প্রায় ত্রিশ বত্রিশ টাকা লাভ করিল।

বিপিনকে বলিল, দাদা, বাগদী-পাড়ায় নন্দ বাগদীর গোলাটা কিনে আনছি, এবার ধান রাখবার জায়গা চাই, ধান হবে ভাল।

বিপিন বলিল, নন্দ বাগদীর অত বড় গোলা এনে কি করবি, আমাদের তিন বিঘে জমির ধান এমন কি হবে যে, তার জন্যে অত বড় গোলার দরকার। দামও তো বেশি চাইবে।

বলাই বলিয়াছিল, বারণ ক'র না দাদা। বড় গোলাটা বাড়ি থাকলে লক্ষ্মীশ্রী। আমার ওই গোলা দেখলে কাজে উৎসাহ হবে যে, ওটা পুরিয়ে দিতেই হবে আসছে বছর। ওটাই আনি, কি বল দাদা ?

সংসারের জন্য অনিয়মিত খাটিয়া খাটিয়া বলাই পড়িয়া গেল শক্ত অসুখে। কিছুদিন দেশেই রাখিয়া চিকিৎসা চলিল। সে চিকিৎসাও এমন বিশেষ কিছু নয়, গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শরৎ দাঁ দিন পনরো সাদা শিশিতে কি ঔষধ দিতেন, তাহাতে কিছু না হওয়ায় গ্রামের অনেকের পরামর্শে বলাইকে রাণাঘাটের হাসপাতালে আনা হয়।

বলাই এখনও ছেলেমানুষ, তাহার উপর অনেকদিন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিবার পরে আজ দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবার আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রেলগাড়িতে উঠিয়া একবার এ জানালায় একবার ও জানালায় ছুটাছুটি করিতেছে, কত কাল পরে আবার সে নীরোগ হইয়া মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পাইয়াছে। নার্সের কথামত আর ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে না। হাসপাতালের রান্না কি বিশ্রী! মাছের ঝোল না ছাই! মায়ের হাতের, বউদিদির হাতের রান্না আজ প্রায় চার মাস খায় নাই, বউদিদির হাতের সুক্তুনির তুলনা আছে ?

পাঁচিলের পশ্চিম কোণে বড় মানকচুটা সে নিজের হাতে পুঁতিয়াছিল। এখন না জানি কত বড় হইয়াছে। ভগবান যদি দিন দেন এবং তাহাকে খাটিতে দেন, তবে গাঙের ধারে কদমতলার বাঁকে ভাল জমি খাজনা করিয়া লইবে এবং তাহাতে শসা বরবটি এবং পালংশাক করিবে।

হাসপাতালে থাকিতে নার্সের মুখে শুনিয়াছে পালংশাক ও বরবটি নাকি খুব ভাল তরকারি। কলিকাতায় দামে বিক্রয় হয়।

বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কাপালীপাড়ায় রাইচরণের পিসীর কাছে বলা ছিল, ওদের ঝাল হ'লে আমাদের সূর্য্যমুখী ঝালের বীজ দিয়ে যাবে। তুমি দেখ নি সে ঝাল, রাঙা টুকটুক করছে, এক একটা এত বড়—বীজ দিয়ে গিয়েছিল, জান ? আমি এবার চাট্টি ঝাল পুঁতে দেব আমড়াতলায় নাবাল জমিটাতে।

দাদার চাকুরি হওয়াতে বলাই খুব খুশি।

তখন সে একা খাটিয়া সংসার চালাইত। আজকাল দাদার মতিবুদ্ধি ফিরিয়াছে, দাদা আবার পুরানো জমিদার-ঘরে বাবার সেই পুরানো চাকুরি করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে!

দুই ভাইয়ে মিলিয়া খাটিলে সংসারের উন্নতি হইতে কত দেরি লাগিবে ? সে নিজে বিবাহ করে নাই, করিবেও না। মা, বউদিদি, ভানু, বীণা—এরা সুখী হইলেই তাহার সুখ। গোলা দেখিলে মায়ের চোখ দিয়া জল পড়ে। মা বলে, কর্ত্তার আমলে এর চেয়েও বড় গোলা ছিল বাড়িতে, আজকাল দুটো লক্ষ্মীর চিঁড়ে কোটার ধান পাই না!

মায়ের চোখের জল সে ঘুচাইবে। বাবার গোলা ছিল পনরো হাতের বেড়, সে গোলা বাঁধিবে আঠারো হাতের বেড়।

বেলা এগারোটার সময় বিপিন ও বলাই বাড়ি পৌঁছিল।

ইহাদের আজই বাড়ি আসিবার কোন সংবাদ দেওয়া ছিল না। বিশেষত বলাইকে আসিতে দেখিয়া বিপিনের মা ছুটিয়া গিয়া রুগ্ন ছেলেকে জড়াইয়া ধরিলেন। বীণা, মনোরমা, ভানু, টুনি—সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল।

উঃ, সেই রাণাঘাটের হাসপাতাল, আর এই বাড়ির তাহার প্রিয়জন সব—বউদিদি, মা, দিদি, খোকা, খুকী। বলাই আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলিল ছেলেমানুষের মত।

ভানু টুনিও খুশিতে আটখানা। কাকাকে তাহারা ভালবাসে। এতদিন পরে কাকাকে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদেরও আনন্দের সীমা নাই। কাকার গলা জড়াইয়া পিঠের উপরে পড়িয়া তাহারা তাহাদের পুরাতন কাকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন পুঁটুলি নামাইয়া রাখিতেছে, মনোরমা আসিয়া হাসিমুখে বলিল, তা হ'লে আমার চিঠি পেয়েছিলে? কই, উত্তর তো দিলে না?

বিপিন বলিল, উত্তর আর কি দোব? এলাম তো চ'লে বলাইকে নিয়ে।

—ভালই করেছ। ঠাকুরপো তোমায় লিখতে সাহস করত না, কেবল আমায় চিঠি লিখত—আমায় বাড়ি নিয়ে যাও, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও। আহা, ও কি সেখানে থাকতে পারে! ছেলে-মানুষ, তাতে ওর প্রাণ প'ড়ে থাকে সংসারের ওপর। হ্যাঁ গা, ওর অসুখ কেমন? ডাক্তারে কি বললে?

—বললে তো, এখন ভালই। তবে সাবধানে রাখতে হবে। ওকে বেশি খেতে দেবে না। মাকে ব'লে দিও, যেন যা তা ওকে না খেতে দেয়। মাংস খেতে একেবারে বারণ কিন্তু।

—তবেই হয়েছে। যা মাংস খেতে ভালবাসে ঠাকুরপো, ওকে ঠেকিয়ে রাখা ভীষণ কঠিন। আর কি জান, বাড়ি এসেছে, এখন ওর আবদারের জ্বালায় ওকে মাংস না দিয়ে পারা যাবে? তুমি যে কদিন বাড়ি আছ, তারপর ও কি কারও কথা মানবে? নিজেই পাড়া থেকে খাসি কাটিয়ে ভাগাভাগি ক'রে বিলি ক'রে দিয়ে নিজের ভাগে দেড় সের মাংস নিয়ে এসে ফেলবে।

—না না, তা হ'তে দিও না, দিলেই অসুখ বাড়বে। ভয় দেখাবে যে, তোমার দাদাকে চিঠি লিখব, ওসব ছেলেমানুষি চলবে না। বউদিদিকে দেখছি না?

—দিদি তো এখানে নেই। তাকে উলোর পিসীমা নিয়ে গেছেন আজ দিন পনরো হ'ল। তিনি এসেছিলেন গঙ্গাচ্চান করতে কালীগঞ্জে, আমাদের এখানেও এলেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন যাবার সময়ে।

বিপিন এ সংবাদে খুব খুশি হইল না। বলিল, নিয়ে গেলেন মানে তো তাঁর সংসারে দাসীবিত্তি করার জন্যে নিয়ে যাওয়া। ওসব আমি পছন্দ করি না।

মনোরমা বলিল, পছন্দ তো কর না, কিন্তু এখানে খায় কি তা তো দেখতে হবে। তুমি চ'লে

গেলে পলাশপুরে, আমাদের হাতে তো একটি পয়সা দিয়ে গেলে না। একদিন এমন হ'ল—দুটিখানি পান্তাভাত ছিল, ভানু-টুনিকে দিয়ে আমরা সবাই উপোস ক'রে রইলাম। কাউকে কিছু বলতেও পারি না, জাত যায়। পাড়ায় রোজ রোজ কে ধার চাইতে গেলে দেয় বল দিকি? আমি তো বললু', উপোস ক'রে মরি সেও ভাল, কারও বাড়ি, কি রায়গিন্নীর কাছে, কি দুলুর মার কাছে, কি লালু চক্কত্তির মার কাছে চাইতে যেতে আমি পারব না।

কথাগুলি ন্যায্য এবং মনোরমা যে মিথ্যা বলিতেছে না, বিপিন তাহা বুঝিল। বুঝিলেও কিন্তু এসব কথা বিপিনের আদৌ ভাল লাগিল না।

যেমনই বাড়িতে পা দিয়াছে, অমনই সতরো গণ্ডা অভাব-অভিযোগের কাহিনী সাজাইয়া মনোরমা বসিয়া আছে। এও তো এক ধরণের তিরস্কার। সে কেন খালি হাতে সকলকে রাখিয়া গিয়াছিল, কেন একশো টাকার থলি মনোরমার হাতে দিয়া বাড়ির বাহির হয় নাই? স্ত্রীর মুখে তিক্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতেই তাহার জীবন গেল। স্ত্রী কি একটুও বুঝিবে না? স্বামীর অক্ষমতার প্রতি কি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখাইতে পারে না? ক্রমশ

---

# এশিয়ার জাগরণ

শতাব্দীর অধিক কাল হ'ল আমরা শক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতির শাসনশৃঙ্খলে বাঁধা আছি। কিন্তু যন্ত্রশক্তির এই চরম বিকাশের দিনেও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা উপবাসী, আমরা রোগজীর্ণ, দারিদ্র্যে আমরা সর্বতোভাবে পঙ্গু। যে বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, তার আমরা স্পর্শ পাই নি বললেই হয়। এই শিক্ষা জাপানের হয়েছে, আমাদের হয় নি, যদিও বুদ্ধিতে আমরা জাপানীর চেয়ে কম নই। চোখের সামনেই দেখছি, জাপান এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীর কাছে য়ুরোপের গর্বান্ধ জাতিদের অহংকার পদে পদে খর্ব হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে শতাব্দীর অনতিকালের মধ্যে জাপান যখন এই গৌরব লাভ করলে, তখন আমাদের মনের দ্বারে একটা প্রবল আঘাত লাগল, জাগরনের জন্যে আহ্বান এল আমাদের অন্তরে। এশিয়ার পাশ্চাত্যতম ভূখণ্ডে দেখলুম তুর্কি—যাকে য়ুরোপ Sick-man of Europe ব'লে অবজ্ঞা করত, সে কী রকম প্রবল শক্তিতে অসম্মানের বাঁধন ছিন্ন ক'রে ফেলল। য়ুরোপের প্রতিকূল মনোবৃত্তির সামনে সে আপনার জয়ধ্বজা তুলে ধরলে। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই আত্মগৌরব লাভের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের দুর্গতিগ্রস্ত ইতিহাসের আওতার আবছায়ার ভিতরে একটা আশ্বাসের আলো প্রবেশ করল। মনে হচ্ছে অসাধ্যও সাধ্য হয়। স্বাধীনতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নয়—যা চাই তা পাব। মূল্য দিতে হবে, সে মূল্য দেবার লোক উঠবে। এই যে এশিয়ার আকাশের উপরে তুর্কির বিজয়পতাকা উড়ছে, সেই পতাকাকে যিনি সকল রকম ঝড়ঝাপটের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন—সেই দূরদর্শী, বীর, সেই রাষ্ট্রনেতার পরলোকগত আত্মাকে প্রগতি-আকাঙ্ক্ষী আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি যে কেবল তুর্কিকে শক্তি দিয়েছেন তা তো নয়, সেই শক্তিরথের চক্রঘর্ঘর ভারতবর্ষের ভূমিকেও কাঁপিয়ে তুলছে। একটা বাণী এসেছে তাঁর কাছ থেকে, তিনি বুঝিয়েছেন যে, সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে, বিরাট অধ্যবসায় ও অক্ষুণ্ণ আশার কাছে, দুরূহতম বাধাও চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। এই কামালপাশা একদিন নির্ভয়ে দুর্গমপথে যাত্রা করেছিলেন। সেদিন তাঁর সামনে পরাভবের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংকল্পকে তিনি কখনও বিচলিত হ'তে দেন নি। য়ুরোপের উদ্যত নখদন্তভীষণ সিংহকে তার গুহার মুখেই তিনি ঠেকিয়েছেন। এশিয়াকে এই হ'ল তাঁর দান—এই উৎসাহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# বাংলায় ইংরেজী ছন্দ

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরেজী ছন্দ বেশ চালানো যাইতে পারে, এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরেজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও করিয়াছেন। ইংরেজী ছন্দের মূলতত্ত্বগুলি একটু অনুধাবনপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, এ মত আদৌ বিচারসহ নহে।

প্রত্যেক ভাষার ছন্দ-পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। অক্ষরের দৈর্ঘ্য বা মাত্রা-ই যে বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য বাংলা ছন্দকে quantitative বা মাত্রাগত বলা হয়। বাংলা ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্ব্ব, এবং পর্ব্বের পরিচয় ইহার মাত্রা-সমষ্টিতে। বাংলা ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখি, এক একটি অক্ষরের মাত্রা কি—তাহা হ্রস্ব, না দীর্ঘ, এক মাত্রার, না দুই মাত্রার; এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্ব্বাঙ্গ ও পর্ব্বগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহাদের মোট মাত্রাসংখ্যা কত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব্ব লইয়াই বাংলা পদ্যের এক একটি চরণ রচিত হয়।

ইংরেজী ছন্দের মূল তথ্যই বিভিন্ন। ইংরেজী ছন্দ qualitative বা অক্ষরের গুণগত। Accent অর্থাৎ উচ্চারণের সময় অক্ষরের আপেক্ষিক গাম্ভীর্য্যের উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরেজী ছন্দের উপকরণ এক একটি foot বা গণ, এবং foot-এর পরিচয় accented ও unaccented অক্ষরের সমাবেশ-রীতিতে। কোন একটি বিশেষ ছাঁচ অনুসারে ইংরেজী ছন্দের এক একটি foot গঠিত হয়, এবং তদনুসারে প্রতি foot-এ accented ও unaccented অক্ষর সাজানো হয়। সেই ছাঁচেই ইংরেজী foot-এর পরিচয়। ইংরেজী ছন্দের বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখি, কোন্ কোন্ অক্ষরে accent পড়িয়াছে এবং কোন্ কোন্ অক্ষরে পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর সাজানো হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজী ছন্দ যে বাংলায় অচল, তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাংলা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরেজী ছন্দের প্রতিনিধিস্থানীয়, এবং সেই ছন্দোবন্ধে ইংরেজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের ধারণা যে, বাংলা ছন্দের স্বরাঘাত এবং ইংরেজী ছন্দের accent একই জিনিস। সুতরাং ছন্দে যথেষ্ট সংখ্যক স্বরাঘাত দিয়া বাংলায় ইংরেজী ছন্দের অনুসরণ করার কোন বাধা নাই।

কিন্তু বাস্তবিক ইংরেজীর accent ও বাংলার স্বরাঘাত এক নহে। ইংরেজী accent-এর স্বরগাম্ভীর্য্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুসরণ করে, কিন্তু বাংলা ছন্দে স্বরাঘাতের স্বরগাম্ভীর্য্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত একটা ঝোঁক। রবীন্দ্রনাথের

চিন্তা দিতেম | জলাঞ্জলি | থাকতো নাকো | ত্বরা

এই চরণটিতে "তেম্" এই অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য সাধারণ উচ্চারণের অনুসারী নহে। "চিন্" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য অবশ্য পরের অক্ষরটির অপেক্ষা স্বভাবতই বেশি, কিন্তু এই চরণটিতে ইহার স্বরগাম্ভীর্য্য স্বরাঘাতের জন্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। "লাঞ্" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য স্বভাবত পূর্ব্ববর্তন "জ"

অক্ষরটির চেয়ে বেশি কি না খুব সন্দেহ, কিন্তু এখানে যে স্বরাঘাতের জন্য তাহা অনেক গুণ বাড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বরাঘাতের জন্য কখনও কখনও অক্ষরের স্বাভাবিক উচ্চারণের পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম হয়, যেখানে স্বভাবত স্বরগাম্ভীর্য্য একেবারেই থাকিতে পারে না, সেখানেও তীব্র গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের

রঙ যে ফুটে | ওঠে কতো
প্রাণের ব্যাকু | লতার মতো

এই চরণ ছুইটির মধ্যে "ঠে" অক্ষরটির স্বরগাম্ভীর্য্য "ও" অক্ষরটির চেয়ে স্বভাবত কম, কিন্তু স্বরাঘাতের জন্য তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

বাংলা ছন্দের স্বরাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন ও দ্রুত লয়ে উচ্চারণ হয়। সুতরাং স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরমাত্রেই হ্রস্ব। ইংরেজী acccent-এর দরুণ কিন্তু অক্ষরের দৈর্ঘ্যের হ্রাস হয় না; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই accent প্রায়শ পড়ে, এবং ইহার প্রভাবে হ্রস্ব অক্ষরও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয়।

স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ব্বে ৪ মাত্রা এবং সাধারণত ৪টি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু ইংরেজী foot-এর এক একটিতে সাধারণত ২টি বা ৩টি অক্ষর থাকে, তিনের অধিক সংখ্যক অক্ষর লইয়া ইংরেজী ছন্দের foot হয় না; বাংলার পর্ব্বে স্বরাঘাত পড়িলে ছুইটি স্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্তু ইংরেজীর এক একটি foot-এ সাধারণত মাত্র একটি accent থাকিতে পারে; সুতরাং বাংলার পর্ব্বকে ইংরেজী foot-এর অনুরূপ বলা যায় না। প্রতি পর্ব্বের মধ্যে কয়েকটি গোটা শব্দ রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরেজী foot-এ তদ্রূপ কিছু করার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি বাংলা ছন্দের পর্ব্বাঙ্গই ইংরেজী foot-এর অনুরূপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, বাস্তবিক ইংরেজীর foot ও বাংলা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধের পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ পর্ব্বাঙ্গের প্রত্যেকটিতে স্বরাঘাত না থাকিতে পারে, এবং পর পর পর্ব্বাঙ্গগুলিতে স্বরাঘাতের অবস্থান এক না হইতেও পারে। পূর্ব্বে যে ছুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইংরেজী মতে তাহাদের ছন্দোলিপি হইত—

চিন্তা | দিতেম | জলা | ঞ্জলি | থাকৃতো | না কো | ত্বরা
রঙ যে | ফুটে | ওঠে | কতো

ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ইংরেজীতে অচল। ইংরেজীতে anapaest প্রভৃতি তিন অক্ষরের foot দিয়াই পদ্যের চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু বাংলায় স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে বরাবর তদ্রূপ পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহার করা অসম্ভব। বাংলায় স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ব্বের পর একটি ছেদ থাকে, ইংরেজীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি foot বা যুগ্ম ছুইটি foot-এর পরে যে ছেদ থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। ইংরেজীতে একটি foot-এর মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্তু বাংলায় পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না। বাংলায় স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের কাঠামো বাঁধা, কিন্তু ইংরেজী ছন্দের ছাঁচ যে কতদূর পর্য্যন্ত চাপ ও টান সহ্য করিতে পারে, তাহার প্রমাণ

পাওয়া যায় Coleridge-এর Christabel এবং ঐরূপ অন্যান্য কবিতায়। বাংলা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা blank verse লেখা যায় না, কিন্তু ইংরেজী ছন্দে নানা বিচিত্র ভাবে ছেদের সহিত যতির সম্পর্ক স্থাপিত করা যায় বলিয়া ইংরেজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায়। *Paradise Lost, King Lear* অথবা Shelly, Swinburne প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে কতকগুলি পংক্তি লইয়া বাংলা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা করিলেই এইরূপ প্রয়াসের ব্যর্থতা ও মূঢ়তা প্রতিপন্ন হইবে।

আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলন্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া যে এক প্রকার মাত্রাচ্ছন্দ চলিতেছে, কেহ কেহ মনে করেন যে, সেই ছন্দোবন্ধে সব রকম বিদেশী মায় ইংরেজী ছন্দের অনুকরণ করা যায়। হলন্ত অক্ষরকে ইংরেজী accented এবং স্বরান্ত অক্ষরকে ইংরেজী unaccented অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করিয়া বাহ্যত অনেক সময় ইংরেজী ছন্দের অনুসরণ করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে রকম কেহ কেহ বলিয়াছেন যে,

বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | প্রায়

এই চরণটি ইংরেজী amphibrachic tetrameter-এর উদাহরণ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ইংরেজী amphibrach-এর সহিত ইহার সাদৃশ্য আপাত, যথার্থ নয়। প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা আছে বলিয়াই এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরেজী কোন foot-এর ছাঁচ অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া নয়। প্রথমত, ইংরেজী accented অক্ষর ও বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর ধ্বনির দিক দিয়া এক জিনিস নয়; accented অক্ষরের সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় যে ধ্বনি-গৌরব আছে, বাংলা হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই। হলন্ত অক্ষর স্বভাবতই স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে দুই মাত্রা ধরার জন্য তাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল

এই চরণ দুইটিকে ইংরেজী Iambic ছন্দোবন্ধের উদাহরণ মনে করেন। 'ম' 'ভ' ইত্যাদিকে তাঁহারা unaccented অক্ষরের এবং 'হৎ' 'য়ের' ইত্যাদিকে accented অক্ষরের প্রতিরূপ মনে করেন। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে 'হৎ' 'য়ের' শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষর বলিয়া স্বভাবত দীর্ঘ, তাহাদের যে সন্নিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনি-গৌরব আছে, তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বরগাম্ভীর্য্যের পতন হয় বলিয়া 'ভয়ের' 'সাগর' প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষরগুলিকে unstressed syllable-এর অনুরূপ বলাই উচিত; তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ করা যায় যে, আসলে ইহাদের প্রকৃতি ইংরেজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন। 'মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর'কে বদলাইয়া যদি 'মহৎ ভয়েরি মূরতি সাগর' লেখা যায়, তবে ইংরেজী ছন্দের ছাঁচ ভাঙিয়া যায়, কিন্তু বাংলায় ছন্দ ঠিক বজায় থাকে। কারণ আসলে ঐ চরণের ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্ব্ব, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে—

মহৎ ⋮ ভয়ের | মূরৎ ⋮ সাগর

তাহা ছাড়া 'মহৎ' ও 'ভয়ের' মধ্যে যে যতি পড়িয়াছে তাহা অর্দ্ধযতি, এবং 'ভয়ের' শব্দটির পরে একটি পূর্ণযতি পড়িয়াছে, তাহা বাঙালী পাঠকমাত্রেই অনুভব করেন। কারণ, 'মহৎ ভয়ের' এই দুইটি শব্দ লইয়া একটি পর্ব্ব, এবং 'মহৎ' একটি পর্ব্বাঙ্গ মাত্র। ইংরেজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। সেইরূপ "বসন্তে | ফুটন্ত | কুসুমটি | প্রায়" এই চরণটিকে বদলাইয়া "বসন্ত | প্রভাতের | কুসুমটি | প্রায়" লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় থাকে, কিন্তু ইংরেজী ছন্দের ছাঁচ ভাঙিয়া যায়। আসল কথা এই যে, বাংলায় মাত্রাসমকত্বই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাঁচ নহে। কোন একটা ছাঁচ অনুসারে কবিতা লেখার প্রয়াস যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের লেখা হইতেও এ কথা প্রমাণ হয়।

মস্‌গুল্ | বুল্‌বুল্ | বন্‌ফুল্ | গন্ধে
বিল্‌কুল্ | অলিকুল্ | গুঞ্জরে | ছন্দে

এই দুইটি চরণে প্রতি পূর্ণ পর্ব্বে দুইটি হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়া ছন্দ-রচনার প্রয়াস হইয়াছে, কিন্তু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না। সেইরূপ "ভোম্‌রায়্ | গান্ গায়্ | চর্‌কার্ | শোন্ ভাই" ইহার বদলে "ভোম্‌রাতে | গান্ গায়্ | চর্‌কার্ | শোন্ ভাই" কিম্বা "ভোম্‌রাতে | গান্ করে | চর্‌কারি | শোন্ ভাই" লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় না, কিন্তু ইংরেজীতে ছন্দ মাত্রাগত না হইয়া গুণগত বলিয়া ছাঁচটাই আসল। এইজন্য সমজাতীয় foot বা গণের পরস্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, iambus-এর স্থলে anapaest এবং trochee-র স্থলে dactyl বেশ চলে। বাংলায় যাঁহারা ইংরেজী ছন্দের অনুকরণ করার প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহারা সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে। বিখ্যাত ইংরেজ কবি Shelley-র The cloud কবিতাটি ছন্দোমাধুর্য্যের জন্য সুবিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে accented ও unaccented অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তদনুরূপ করিতে গেলে ছন্দোভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

I bring ⋮ fresh showers | for the thirst ⋮ ing flowers,
From the seas | and the streams ;
I bear ⋮ light shade | for the leaves ⋮ when laid
In their noon | -day dreams.

আধুনিক বাংলার সুকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষরূপে কৃতবিদ্য ও ইংরেজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। তাঁহারা কখনও ইংরেজী ছন্দেই বাংলা কবিতা লেখা যায়, এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই বা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ইংরেজী পণ্ডিত ও ইংরেজী ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনিও অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্তও এ চেষ্টা করেন নাই। এমন কি বাংলা কবিতায় যেখানে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানেও ইংরেজী

শব্দ জাতি হারাইয়া বাংলা ছন্দের রীতির অনুসরণ করিয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার

সাত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝেই ধরল মাংস রকমারি
ফাউল বীফ আর মটন হ্যাম ইন অ্যাডিশান টু বক্‌রি

এই চরণদ্বয়ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরেজী শব্দে রচিত। 'আর' বদলাইয়া যদি 'অ্যাণ্ড' লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরেজী ছন্দের লাইন মনে করা যায় ( বক্‌রি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব্দ )। বাংলার এই চরণটির ছন্দোলিপি হইবে—

ফাউল্ বীফ্ অ্যাণ্ড্ | মটন্ হ্যাম্ | ইন্ অ্যাডিশান | টু বক্‌রি
= ফাউল্ বীফ্যাণ্ড্ | মটন্ হ্যাম্ | ইন্যাডিশান | টু বক্‌রি
= (৪ + ৪ + ৪ + ৩)

ইংরেজীতে ইহার ছন্দোলিপি অন্যরূপ

Fowl beef | and mutt | on ham | in ad-di | tion to Bok | ri

এই দুইটি ছন্দোলিপি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ইংরেজী ও বাংলার ছন্দ-পদ্ধতি পরস্পর বিভিন্ন। Milton-এর

* Of man's first diso-be-dience, and the fruit
-1 -1-1-1 -1-1 -:-: -1 -1-1 1 -1 -: -1-1

Of that forbidden tree, whose mortal taste
-1 -1-1 -1 -1 -1-1 -1-1 1 -1 -1 -1-1 -1 -1

প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনি-গৌরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জাল গড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

অক্ষরের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য ইংরেজী ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, তাহা বাস্তবিক বাংলা ছন্দে পাওয়া যায় না। স্বরাঘাতের ব্যবহার হইলে অবশ্য স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধ্বনি-গৌরব লাভ করে, কিন্তু স্বরাঘাতের ব্যবহার বাংলা ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা যায় না, এ সম্বন্ধে কি কি অসুবিধা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সন্নিকটে গুরু অক্ষর বসাইলেও অবশ্য একটা গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইজন্য গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহারের দ্বারাই বাংলায় কবিরা ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়াইবার চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিয়াছেন। "তরঙ্গিত মহাসিন্ধু | মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো" অথবা "কিম্বা বিম্বাধরা রমা | অম্বুরাশি তলে" প্রভৃতি চরণে ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই পার্থক্য ইংরেজী accented ও unaccented-এর পার্থক্যের অনুরূপ নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি করা যায় না ; আসলে, পর্ব্বে পর্ব্বে মাত্রাসমকত্বই বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, অন্য যাহা কিছু গুণ তাহা ছন্দের কচিৎদৃষ্ট বা আকস্মিক অলঙ্কার বা গৌণ লক্ষণ মাত্র।

* এই দুইটি পংক্তির মাত্রালিপি Fox Strangways-এর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রচলিত আকার মাত্রিক স্বরলিপির চিহ্নদ্বারা করা হইয়াছে।

# মৃত্যু

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

৩

## মৃত্যু

আমি মরলাম। মরলাম নয়, আমার মরা সুরু হ'ল। হ্যাঁ, সুরু হ'ল—তিলে তিলে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা আস্বাদন করবার পালা সুরু হ'ল।

ভেবেছিলাম, ম'রে আমি জীবনকে জয় করছি। দেখলাম, এবারেও আমার হার হয়েছে, আমার সব চাইতে বড় হার। জীবনকে আয়ত্ত করতে গিয়ে ছিটকে তার বাইরে এসে পড়লাম। এ বিচ্ছেদে দুঃখ আছে আগে জানতাম না। এখন দেখলাম, এ বড় ভয়ানক! জীবনের মধ্যে থেকে যতদিন তার সঙ্গে লড়েছি, তাকে পেয়েছি নিজের পাশে। তাকে আমি মেনে নিতে পারি নি, তার সঙ্গে লড়াই করেছি, কিন্তু জানতাম না, আমি দাঁড়িয়েও ছিলাম তাকেই ভর ক'রে। এখন আমি তার থেকে দূরে, আমার স্মৃতিতে তার ছবি, আমার মনে তার ছাপ, কিন্তু আমার অবলম্বন সে আর নয়; তার কাছে কাছে পাশে পাশে থেকেও তার মধ্যকার আমি নই। আমি অবলম্বনহীন, নিরাশ্রয়। আমার চারপাশে এক নিঃসীম শূন্যতা আমাকে ঘিরে আছে; এ যে কি ভয়ানক শূন্যতা, যে না জানে সে কল্পনা করতে পারে না।

মুক্তি? কাকে বলে মুক্তি, আমার তো জানা নেই। এ নিশ্চয়ই নয়, এর পরে আরও কিছু আছে কি না আমি জানি না।

এই শুধু জানি, যে জীবনকে খেয়ালের ঝোঁকে নিজের হাতে ভেঙে ছিঁড়ে এসেছি, তার মধ্যে ফিরে যেতে পেলে আর কিছু আমি চাইতাম না। তৃষ্ণা বেঁচে থাকে, কি না? নিশ্চয়ই থাকে, অন্তত আমার আছে। সারাটা জীবন যে পৃথিবীর মধ্যে কাটালাম, যার ছাপ নিয়ে আমার মনের, আমার চেতনার প্রতিটি অণু তৈরি, শুধু একটা ক্ষণিক প্রক্রিয়ার এ পারে এসেই তাকে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব, না তাকে অস্বীকার করাই সহজ? আমি এখনও চিন্তা করি তেমনই ভাবে, সেই সমস্ত স্মৃতি ধারণা সেই সমস্ত কথা নিয়ে; কথা বলতে হ'লে বলব সেই তখনকার শেখা ভাষাতেই। তার বাইরে চ'লে আমি যাই নি। অথচ তার মধ্যেও আমি আর নেই।

জানি না, হয়তো যারা মায়া কাটাতে পারে, তাদের অন্য কোন রকমের মুক্তি হয়, হয়তো তারা আমার মত পৃথিবীর সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য পেছুটানে বাঁধা থাকে না। কিন্তু আমার মায়া আছে। হ্যাঁ, এতদিন পরে আজ আমি নিঃসংশয়ে জানতে পেরেছি, নিঃসঙ্কোচে বলতে পারছি, আমার মায়া আছে। মায়া আছে যে জীবনকে ছেড়ে এসেছি তার প্রতি, তোমার প্রতি, উমার প্রতি, আরও যত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত অপরিচিত সমস্ত মানুষের প্রতি। আমি মানুষের মেয়ে, মানুষের সমাজে আমার স্থান, তারাই আমার আপনার, এইটেই আমার পক্ষে বিদেশ। অথচ তার মধ্যে যতক্ষণ

ছিলাম, সেই সমাজ আমাকে ঘিরে বাঁধতে চেয়েছে ; সে বন্ধন আমি স্বীকার করি নি, মনে করেছি, তাকে স্বীকার করা দুর্ব্বলতা। শেষে যখন তাকে চিনলাম, তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম, তখন আমার বুকে নেই আর আঁকড়ে রাখবার শক্তি, জানা নেই আঁকড়ে থাকবার উপায়। জীবনের ওপরে মায়া আমার যখন প্রথম জন্মাল, তার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলাম। অথচ হলাম নিজেরই ভুলে, নিজেকে বোঝবার ভুলে।

সে ভুল টের পেলাম তখনই। বিছানার ওপর আমার নিশ্চল মৃতদেহটার পাশে দাঁড়িয়ে তুমি নিথর নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইলে। উমা তার ওপরে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল, দিদি, দিদি আমার, আমি কার কাছে থাকব?

সেই ঘরের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমার সমস্ত জুড়ে একটা কান্নার আবেগ ব'য়ে গেল। এ কি করলাম, কি করলাম আমি? তোমাকে দুঃখ দিলাম, উমাকে দুঃখ দিলাম, বাড়িসুদ্ধ লোক ঝি-চাকররা পর্য্যন্ত চোখ মুছছে—তাদের দুঃখ দিলাম। কিন্তু কেন? আমি কি শান্তি পেয়েছি? পাব কি? এদের এই অশ্রুতে পিছল পথে এই যে পা বাড়ালাম, পায়ে পায়ে সে অশ্রু আমার চলার ব্যাঘাত ঘটাবে কি? আমি স্বার্থপর, আমি নীচ, আমি জানোয়ার—নিজের দিকটাই দেখেছিলাম, আর কারও দিক দেখি নি। আমার ওদের ওপর টান আছে, কি নেই, তাই দেখেছি, তাই ভেবেছি ; আমার ওপর সবার যে টান ছিল তার কি প্রতিদান আমি দিলাম? উচিত ছিল না কি আমার এদের নিয়েই বেঁচে থাকা? এদের এই স্নেহের পরিচয় আমি আগে পাই নি, দেখবার চোখ আমার ছিল না। কিন্তু যদি একে চিনতে শিখতাম, যদি এর মাঝে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারতাম, হয়তো আমি বাঁচতে পারতাম, এদের অবলম্বন ক'রে সত্যিকার জীবন নিয়ে বাঁচতে পারতাম। সে চেষ্টা তো আমি করি নি। কোথায় গেল আমার বৈজ্ঞানিক মন, আমার র‍্যাশনাল মন, যার গর্ব্বে আমি বলতাম, আমি জগৎকে চিনেছি, আমি নিজেকে চিনেছি? চিনি নি, তোমাদের আমি চিনি নি, সারা জীবনই আমি ভুল করেছি। আমার ঝি-চাকরেরা আমার জন্যে চোখের জল ফেলছে, আমি কি ফেলেছি চোখের জল কারও জন্যে কোনও দিন? আমি কি জানতে চেয়েছি কখনও, কিসের আকর্ষণে তারা আমার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ যত্ন ক'রে ক'রে দিয়েছে? আমি জানতাম, তারা আমার চাকর, মাইনে পায় ব'লে কাজ করে। পয়সার মাপে আমি বুঝেছি তাদের, বিজ্ঞানের থিওরি দিয়ে জানতে চেয়েছি আমার স্বামীকে। দুঃখ শান্তি আমার হবে না তো, হবে কার? এক মুহূর্ত্তের কাজের ফলে আমি চ'লে এসেছি তোমাদের ছেড়ে বহুদূরে, মাইল গুনে সে দূরত্ব বোঝা যায় না। তোমাদের কাছেই আমি আছি। এই মুহূর্ত্তে সবার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু তবু আমার আর তোমাদের মাঝে ব্যবধান অলঙ্ঘ্য অপরিসীম। তোমাদের আমি দেখতে পাই, সে দেখায় তৃপ্তি নেই ; তোমাদের ডাক শুনতে পাই, জবাব দেবার আমার ক্ষমতা নেই। তোমাদের মধ্যে থেকেও আমি তোমাদের নেই, আমি দূর হয়ে গেছি, পর হয়ে গেছি।

আমি আত্মহত্যা করেছি এ সন্দেহ কেউ করলে না, পোস্ট-মর্টেমও হ'ল না ; হঠাৎ হার্ট-ফেলিওর হয়েছে ব'লে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিলে। ভালই হ'ল। আত্মহত্যা করেছি যদি জানতে,

দুঃখের তোমাদের অবধি থাকত না। সে দুঃখের রূপ আমি আগে কল্পনা করতে পারতাম না, এখন জানি। ভাবলাম, এও ভাল; আমার শাস্তির এইটুকু থেকে যদি রেহাই পেলাম, হয়তো আমার দুঃখ সারা হ'ল। হয় নি—তার প্রমাণ পেতে দেরি হ'ল না। দুঃখ আমার এল, কিন্তু এবার এল অন্য রূপে।

আমি বাড়িতেই র'য়ে গেলাম। যাবই বা কোথায়? এই আমার ঘর, সময় থাকতে একে আমি চিনি নি, এখন জেনেছি, এ আমার কত আপনার। একে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে আর সহজ নয়, আর সম্ভব নয়। জানতাম, এখানে থাকলে প্রতি পায়ে স্মৃতি আমাকে বিঁধবে। তা হোক, সে ব্যথাও আমার ভাল, তবু একে আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না। তখন যদি ভগবান নিজে এসে আমায় বলতেন, মুক্তি নাও, আমি নিতাম না।

কোর্ট থেকে তুমি কখন ফিরবে, সেই আশায় রোজ আমি গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তুমি জান না। রাত্রে তোমার ঘুমন্ত মুখের 'পরে শেডের বাতির মৃদু নীল আলোক পড়ত, কতদিন আমি তোমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে সারারাত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি, তুমি তার খবর রাখ? রোজ তোমার খাবার সময় আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সে তুমি টের পাও নি। তোমার বুকে মুখ রেখে উমা ঘুমোচ্ছে, তার সমস্ত মুখে দেহের মনের নিশ্চিন্ত তৃপ্তির আলো ফুটে উঠেছে, সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার সারা অন্তর কি তৃপ্তিতে ভ'রে গেছে, তার খবর সে জানে না।

ঈর্ষা? না, ঈর্ষা আমার আর ছিল না। আর কাকে আমি ঈর্ষা করব? কেন করব? অথচ এই ঈর্ষার ভয়েই আমি মরেছিলাম, আর মরার পরেই সে ঈর্ষা আমার মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। হয়তো ক্ষুধাতৃষ্ণার মত এটাও দেহের সঙ্গেই থাকে; হয়তো এটা একটা ক্ষণিক ব্যাপার, দুদিন পরে আপনিই চ'লে যেত; হয়তো আমার তাড়াতাড়ি ক'রে আত্মহত্যা করবার কোনই দরকার ছিল না। কিন্তু এখন আর সে ভেবে কি হবে!

কয়েক মাস কাটল। তারপর আবার একদিন ভাগ্যের পরিহাস আমাকে দেখা দিলে।

সন্ধ্যাবেলা উমা শোবার ঘরে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলাম। উমার চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে, মুখ হয়েছে সামান্য পাণ্ডুর, চুলের রাশ হয়েছে দ্বিগুণ। তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, যদি শক্তি থাকত আর একদিন আগের মত ক'রে ওর চুল বেঁধে দিতাম। বিয়ের আগে একদিন আমি তার চুল বেঁধে দিচ্ছিলাম। উমা বললে, ছাই চুল। তোমার মত চুল যদি আমার হ'ত দিদি!

উমার চুল এখন দিদির চাইতেও ঢের ভাল হয়েছে; কিন্তু সে চুল বেঁধে দেবার শক্তি আর তার দিদির নেই।

কিন্তু সত্যিই কি আর হয় না? এই তো আমি ওর এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তবু ওকে স্পর্শ করতে পারি নে, কেন? কতদিন ওকে আমি ছুঁই নি, আমার বুকের মধ্যে ছাড়া সে ঘুমোতে পারত না। আচ্ছা, এই তো আমি রয়েছি, যদি এমন হয়—ও আমাকে হঠাৎ দেখতে পায়, টের পায় আমার সান্নিধ্য, কি করবে ও? জানি, ঝাঁপিয়ে আমার বুকে পড়তে চাইবে, আবার তেমনই ক'রে ডাকবে, দিদি এলে?

আঃ, হোক হোক, তাই হোক, আর আমি কিছু চাই নে। কতকাল ওর মুখের দিদি ডাক শুনি নি! আর, কেন হবে না? ও আমার বোন, আমার সবচাইতে নিকট বন্ধু, আমার ঘরে আমার স্বামীর শয্যায় আমার উত্তরাধিকারিণী। কেন তবে ও আমার অস্তিত্বের সাড়া পাবে না? মনে মনে বারবার ক'রে বললাম, ভগবান, তোমাকে জীবনে কখনও ডাকি নি, তুমি আছ কিনা তাও জানি নে; কিন্তু যদি থাক, এই একটি কামনা আমার তুমি পূর্ণ কর, পূর্ণ কর।

হঠাৎ উমা চীৎকার ক'রে উঠল, তারপর মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সবাই ছুটে এল, ধরাধরি ক'রে তাকে বিছানায় তুলে তার চোখে মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে তার জ্ঞান হ'ল। চোখ বুজেই বললে, দিদি এসেছিল।

তোমরা বললে, কে?

সে কাঁপা গলায় বললে, দিদি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আয়নাতে আমি তার ছায়া দেখতে পেলাম।

তার মুখে চোখে আতঙ্কের যে ছায়া ফুটে উঠল, সে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। কি ক'রে যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম, আমি নিজেই জানি নে। কাঁদতে আমি আর পারি নে, কিন্তু কাঁদতে পারলে সেদিন বাঁচতাম। আমি আজ এত পর হয়ে গেছি, আমার সান্নিধ্যে উমা ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। এর পরে আরও কি দেখবার আছে কিছু জগতে, আরও কি আছে আঘাত? কিন্তু তবু বাড়ির মায়া ছাড়তে পারলাম না। তবে সেই থেকে কারও কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে আর সাহস করি নি।

উমার জন্যে এল মাদুলি, জলপড়া, রক্ষাকবচ। কিন্তু সেই যে ভয় পেয়ে তার জ্বর হ'ল, সে জ্বর ছাড়তে চায় না। প্রবীণরা বললেন, রোজা ডাকাও।

রোজা এল, এসেই বললে, উঠানের কোণে কুলগাছটাকে কেটে ফেলতে হবে। ওতেই নাকি আমি থাকি।

এত দুঃখেও হাসি এল। যে মেয়ে জীবনে কোনদিন গাড়ি চ'ড়ে ছাড়া রাস্তায় বেরোয় নি, মখমলের ছাড়া জুতো পরে নি, মরবার পরেই তার কুলগাছে চ'ড়ে বসবার প্রবৃত্তি হবে কোন্ যুক্তিতে? মৃতদের সম্বন্ধে মানুষ কত কম জানে! গাছটাকে তক্ষুনি কাটা হ'ল। তোমরাও কি সত্যি বিশ্বাস করলে, আমি কুলগাছে বাসা বেঁধেছি?

রোজা মন্ত্র প'ড়ে বাড়ি বন্ধন করলে, চেঁচিয়ে মন্ত্র প'ড়ে ঘুরতে লাগল। আমি জানি, রোজারা কিছুই করতে পারে না, তাদের সবই বুজরুকি; কিন্তু নিজের জানার ওপরে বিশ্বাস আমার ভেঙে গেছে। পাছে তার কোনও অজ্ঞাত শক্তির বলে তার চোখে সত্যিই প'ড়ে যাই, এই ভয়ে তাকে প্রাণপণে এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম। আমার বাড়িতে আমি আজ চোর, খুনির চাইতেও ঘৃণ্য; এই লোকটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে তবে আমাকে এ বাড়িতে টিকে থাকতে হবে।

রোজা মন্ত্র প'ড়ে আমাকে ডাকতে লাগল। আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে আলমারির গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি জানি, যদি সত্যিই তার মন্ত্রের কোনও জোর থাকে, যদি আমাকে সত্যিই সে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়, এ বাড়ি থেকে নির্ব্বাসিত করে!

রোজা আমাকে উদ্দেশ ক'রে বিশ্রী গালাগাল দিতে লাগল। মেয়েরা মুখ ফেরালেন। শুনতে পেলাম, উমা বললে, মা, অমন ক'রে দিদিকে গালাগাল দিতে বারণ করুন না!

উমা, তোর মনে তবে এখনও একটু জায়গা আছে তোর দিদির জন্যে!

মা বললেন, চুপ কর মা, ওই ওদের মন্তর।

উমা তোমাকে বললে, তুমি বারণ ক'রে দাও।

তুমি কথা বললে না। আমাকে এতটুকু কটু কথা তুমি নিজে কোনদিন বলতে না। কিন্তু অনুযোগ করবার মুখ তো আমার নেই আর।

উমার জ্বর ছাড়ল না। তার ঘরে আবার যাবার সাহস আমার ছিল না, দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। তার দিকে চোখ তুলে চাইতাম না, কে জানে যদি তার অকল্যাণ হয়। ঘরের বাইরে থেকে লোকের আসতে যেতে তার সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা শুনতে পেতাম, তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হ'ত।

উমার বয়স যখন নবছর, আমার চোদ্দ, উমার খুব অসুখ হয়েছিল; ক্রাইসিসের দিন রুগীর ঘরে আমাকে যেতে দিলে না। সারারাত জেগে প্রার্থনা করেছিলাম, আমার সবখানি আয়ু নিয়ে ও বেঁচে উঠুক। আজ তেমনই ক'রে দিতে চাইবার আমার কিছু নেই।

সবাই বললেন, বাড়ি বদলাতে হবে। এখানে উমাকে রাখা চলবে না, তার পেটে সন্তান। প্রবীণারা বললেন, হবেই তো, সতীন কাঁটা।

আজ ছমাস উমা আমার সতীন, এই পরিচয়ই আমাদের সবাই জানলে; এই উনিশ বছর সে ছিল আমার বোন, সে কথা আর কারও মনেই রইল না।

কিন্তু উমা, সেও কি ক'রে ভাবতে পারলে, তার দিদি তার ক্ষতি করবে, তার সন্তানের ক্ষতি করবে? যে সন্তান তোমাকে আমি দিতে পারি নি, সেই সন্তান এনে দিলে উমা আমারই প্রতিনিধি হয়ে। সেই সন্তানের, সেই উমার ক্ষতি করব আমি? কি জানি, হয়তো আমার স্নেহও তাদের পক্ষে এখন বিষ, হয়তো আমার শুভকামনায় তাদের অকল্যাণ। আমি যা জানি ব'লে ভাবি, তার বাইরেও তো জগতে অনেক কিছু আছে, যার খোঁজ আমি রাখি নে।

উমাকে নিয়ে তোমরা চ'লে গেলে। বাড়িতে তালা পড়ল। আর তোমাদের কোন খবর পাই নে। বড় ইচ্ছে হচ্ছিল, তোমাদের সঙ্গে যাই, এখানে একা একা নিঃসঙ্গ পুরীতে আমি থাকব কাকে নিয়ে! তবু প্রাণপণ ক'রে নিজেকে সম্বরণ করলাম। কি জানি, হয়তো আমি সত্যিই তোমাদের অকল্যাণ। অমঙ্গলকে এড়াবার জন্যে তোমরা বাড়ি ছেড়ে দূরে পালাচ্ছ, কি ব'লে আমি সেখানেও তোমাদের পিছু নেব? আমি তো জানি নে, আমার অজানতে কতখানি অকল্যাণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, জানি নে, কি বিষ আমার নিশ্বাসে আছে!

নিজেকেই জগতে চিনেছিলাম, কাউকে আপন ক'রে নিতে পারলাম না। শেষে যাদের আঁকড়ে ধরতে গেলাম, তাদের করলাম ভিটে-ছাড়া। আমি অকল্যাণ নয় তো কি!

জানি, এ বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাওয়া উচিত ছিল আমারই। অনেকবার ভেবেছি, যাব, এমন

ক'রে তোমাদের ভিটে-ছাড়া ক'রে রাখব না। কিন্তু যেতে পারি নি। একটি মাত্র কামনা আজও আমার মনে আছে, এই নিঃসঙ্গতার মাঝেও তাকে বুকে নিয়েই আমি টিকে আছি ;—খোকাকে আমি একবার দেখব। উমার ছেলে, তোমার ছেলে—সে আমারও তো ছেলে। আমার অক্ষম আশা উমার বুকে রূপ নিয়েছে—তাকে একটিবার আমায় দেখতে দাও। কোন ক্ষতি তার আমি করব না, তাকে বুকে নিতে যত উগ্র ইচ্ছেই আমার হোক না কেন, তাকে আমি স্পর্শও করব না, সে সাহস আর আমার নেই। শুধু একবার দেখব, দূর থেকে চেয়ে একবার তাকে দেখে জন্মের মত এ বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাব। আর, যদি পার, উমাকে একবার আমায় দেখিয়ো। আমার সারা জীবনের একটিমাত্র প্রিয় বন্ধু সে, তাকে আর একবার দেখিয়ো, দূর থেকেই আমি দেখব, মাত্র একটিবার।

শুনেছিলাম, তোমরা আমার জন্যে গয়ায় পিণ্ডি দেবে। দিলে কি হয় আমি জানি নে, মুক্তি হয় বা না হয়, সে নিয়ে আমার কৌতূহল নেই ; মুক্তি কি, সে ধারণাও আমার নেই। আমি শুধু জানি, পিণ্ডি দিলে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। যদি লোকের বিশ্বাস সত্যি হয়, আর কখনও আমি এখানে ফিরে আসতে পারব না। আমার কাছে এইটুকুই এর সবখানি মানে।

পিণ্ডি দিতে চাও দিও, আমাকে তাড়াবার জন্যে কিছুই তোমাদের করতে হবে না, তবু যদি চাও, নিশ্চিন্ত হবার জন্যে যা ইচ্ছে হয় ক'র। কিন্তু আর একবার আমাকে তাদের দেখতে দাও।

কিছু দাবি করবার জোর আর আমার অবশিষ্ট নেই। কিন্তু একদিন তুমি আমাকে ভালবাসতে, উমা তার দিদিকে ভালবাসত। সেই মৃত ভালবাসার দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি, এই শেষ ভিক্ষাটুকু আমাকে দাও, একবার তাদের দেখতে দাও। আর কখনও আমি আমার এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে তোমাদের কাছে আসব না, তাদের সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত অশুভ আমি মুছে নিয়ে যাব, যে অমঙ্গল আমি সঙ্গে ক'রে এনেছিলাম।

তাদের ব'ল না, আমি তাদের দেখতে চাইছি। খোকা আমাকে চেনে না, তাকে চিনিও না, কোনদিন তাকে জানিও না আমার কথা। আমার জীবনের অভিশাপের কাহিনী তার মনকে হয়তো ব্যথিত ক'রে তুলবে, সে আমি চাই নে। তার চাইতে সে কোনদিন না জানুক আমি ছিলাম, সেই আমার ভাল। উমাকে ব'ল না, আমি তাকে দেখতে চেয়েছি। হয়তো সে দিদিকে ভুলে গেছে, হয়তো সে আসতে চাইবে না, হয়তো ভয় পাবে। যাবার আগে সে দুঃখটা আর আমাকে দিও না, যদি না দিয়ে পার। তোমাকেই আমি জানাচ্ছি আমার প্রার্থনা—একদিন মাত্র কয়েকটি মিনিটের জন্যে তাদের নিয়ে তুমি এস, এস। এ বাড়ির ভিতরে ঢুকতে না চাও, এর বাইরে একটু দাঁড়িয়ে আবার চ'লে যেও, সেই আমার অনেক।

আশা করি, এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে। সেই আশা নিয়েই আমি রইলাম। এস এস এস।

সুরমা

# বাংলা দেশের একটি আধুনিক শিল্পকারু

শ্রীসুমিত্রকুমার গুপ্ত

শিল্পীর হাতের আঁকা মূল চিত্র কি অতীতে কি এখন চিরদিনই রসিকের চেয়ে ধনীরই সম্পত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তা ছাড়া সাধারণের চিত্রশালাতেই থাকুক বা ব্যক্তিগত অধিকারেই থাকুক, একখানি ছবি একই সময়ে তো আর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু লোকের মনোরঞ্জন করতে, প্রত্যহের সঙ্গী হতে পারে না। চিত্রাধিকারী ও তার সীমার বাইরে যে বৃহত্তর রসিক-সমাজ থাকেন, তাদের শিল্পস্পৃহা তৃপ্ত করবার জন্য তাই শিল্পীদের ভাবতে হয়েছে, এক চিত্রকে কি ক'রে বহু করা যায়। কাঠখোদাই ও এচিং—এই দুই রকম ছাপের ছবি এখন শিল্পীর আত্মপ্রকাশের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে থাকলেও, বহুকাল ধ'রে এই সকল ছাপের ছবি, বিশেষত কাঠখোদাই ছবি, চিত্র-কর্ম্মকে একজন চিত্রাধিকারীতে আবদ্ধ না রেখে বহুজনকে আনন্দ দেবার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই দুইটি পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যবহার বিশেষ দক্ষতা, শ্রম ও অভ্যাস সাপেক্ষ; তা ছাড়া সব রকম ছবির প্রতিলিপির জন্য এ দুইটি উপযোগীও নয়। বর্ত্তমানে ব্লক তৈরির প্রণালী এত উন্নত হয়েছে যে, একবর্ণ ও বহুবর্ণ ছবি খুব সুন্দরভাবে তাতে মুদ্রিত হতে পারে। কিন্তু ব্লক যতই নিখুঁত হোক না কেন, তাতে কেবল আমাদের কাজই চ'লে যায় মাত্র, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি রসিক-

মুসাফির — শ্রীপূর্ণেন্দু বসু

ছুতার — শ্রীইন্দু রক্ষিত

জনের কাছে তা কখনও মূল ছবির সমান আদরণীয় হ'তে পারে না, কারণ খুব উচ্চশ্রেণীর ব্লকের ছাপা ছবিতেও একটা প্রাণহীনতার ভাব থেকেই যায়, আর সে ছবিতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্পর্শ কখনই থাকতে পারে না।

লিথোগ্রাফ-পদ্ধতি প্রচলনের পরে বহুজনের প্রীতির জন্য ছবি সহজে, সুলভে এবং সুন্দরভাবে ছাপা সম্ভব হয়। জার্মান গীতকার ও নাট্যকার সেনেফেল্ডার এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন ১৭৯৬-৯৮এর কাছাকাছি সময়ে। তিনি তাঁর গীত ও নাট্য প্রভৃতি সহজে ছাপিয়ে নেবার উপায় সন্ধান করতে ( এইগুলি তাম্রফলকে এন্‌গ্রেভ ক'রে ছাপতে হ'ত ) গিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে লিথো-গ্রাফ-প্রণালীটি অবিষ্কার করেন, এবং ক্রমশ চেষ্টার দ্বারা পদ্ধতিটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। 'গ্রামার অব লিথোগ্রাফি' নামে একখানা বইয়ে তিনি তার বিবরণ সব লিখে যান। এই পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হবার পর বিশেষ সাড়া পড়েছিল, এবং ক্রমশ বহু বিখ্যাত শিল্পী এই পদ্ধতিতে নিজেদের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি ছাপাতে বা বিশেষভাবে এই পদ্ধতিতে ব্যবহার্য্য ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন—গোইয়া, দেলাক্রোয়া, মিলে, মানে, হুইস্‌লার, জোসেফ পেনেল, রোটেন্‌স্টাইন, ম্যুরহেড বোন, ব্র্যাঙ্গুইন প্রভৃতি পূর্ব্বতন ও আধুনিক অনেক বিখ্যাত শিল্পীর ছবি লিথোগ্রাফে আঁকা হয়েছে, ও বিভিন্ন শিল্পীর পরীক্ষণের ফলে এর অনেক উন্নতি ও বৈচিত্র্য সাধিত হয়। বিভিন্ন শিল্পীর প্রণালীতে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে, তবে মোটামুটি এইরূপ ভাবে পদ্ধতিটির বর্ণনা দেওয়া যায়;—পাথরে ( লিথোগ্রাফের জন্য উপযোগী একরকম বিশেষ পাথরও কিনতে পাওয়া যায় ) খড়ি দিয়ে ( এই কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত খড়ি পাওয়া যায়, কালো

হাটের পথে — শ্রীনিরাময় রায়

রং ও চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ) ছবি আঁকতে হয়। ছবি আঁকবার পূর্ব্বে পাথরে বালি ও জল ছড়িয়ে আর এক টুকরা পাথর দিয়ে অনেকে ঘ'ষে নেন, তার ফলে পাথরের গায়ে দানা (grain) পড়ে; অনেকে মসৃণ পাথরেও আঁকেন। মসৃণ পাথরে আঁকলে রেখাগুলি ছাপাতে ঘনবর্ণ হবে; কিন্তু যদি ধূসরাভ রঙে ছাপবার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে বালি ঘ'ষে নেওয়া দরকার হয়। খড়ির পরিবর্ত্তে চর্ব্বিমিশ্রিত একরকম কালিতেও ছবিটি পাথরে আঁকা চলে। ছবিটি আঁকা হ'লে একরকম আঠার (gum arabic) প্রলেপ দিয়ে নক্সাটি পাথরে দৃঢ়বদ্ধ করা হয়। এর পরে পাথরটি জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়; তেলে জলে মিশ খায় না ব'লে চর্ব্বি-মিশ্রিত খড়িতে আঁকা নক্সাটিতে জল লেগে থাকে না। এর পরে কালি মাখিয়ে ( লিথো-গ্রাফের কালিতেও চর্ব্বিজাতীয় বস্তু থাকে; কালিটা শুধু নক্সাটিতে লেগে থাকে, ভিজা অংশে অর্থাৎ যে অংশে নক্সা আঁকা থাকে না, সেখানে কালি ধরে না ) লিথোগ্রাফের প্রেসে ছবি ছেপে নেওয়া হয়।

পল্লীপথ — শ্রীরমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পাথরের মত ভারী জিনিস নিয়ে সর্ব্বত্র চলাফেরা করা সম্ভব নয়, এইজন্য অনেক সময় কাগজে ছবিটি এঁকে সেইটি পরে পাথরে চালান ক'রে নেওয়া হয়। পাতলা কাগজে লিথো-গ্রাফিক চক দিয়ে ছবিটি আঁকা আবশ্যক। পাথরখানা ও কাগজখানির উল্টো দিকটা ভিজিয়ে নিয়ে প্রেসে দিলে, ছবির চর্ব্বির অংশটা পাথরে লেগে যাবে। তারপরে পাথরে কালি মাখিয়ে নিলে নক্সাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রঙিন লিথোগ্রাফ করতে হ'লে প্রত্যেকটি রঙের জন্য স্বতন্ত্র পাথরে নক্সা ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। লিথো-গ্রাফের ছবি প্রস্তুত করবার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে অনেক বইতে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন বিখ্যাত শিল্পী জোসেফ পেনেল-এর "গ্রাফিক আর্টস" নামক বক্তৃতাবলী। এ সম্বন্ধে বার্নেট ফ্রীডম্যান-এর লেখা

বৃদ্ধ শ্রীবাসুদেব রায়

শিল্পামোদীদের আনন্দবিধান করেছিল। ঠাকুর মহাশয়দের বাড়িতে একটি লিথোগ্রাফ প্রেস বসেছিল, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র প্রস্তুত করেছেন, এইগুলি যাতে বৃহত্তর সাধারণকে আনন্দ দিতে পারে, এইজন্য বড় আকারে, প্রায় মূল ছবির সমান আকারে, এইগুলির লিথোগ্রাফ প্রস্তুত হয় ( "অদ্ভুত লোক" চিত্রাবলী )। সুরেন্দ্রনাথ করের বিখ্যাত চিত্র "সাথী"রও রঙিন লিথোগ্রাফ প্রস্তুত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে কলাভবন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর জলরঙের ছবি ছাড়া অন্য নানা উপকরণে শিল্প-রচনার পরীক্ষা যখন আরম্ভ হ'ল, তখন কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রেরা লিথোগ্রাফেও হাত দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর একবার বিলাত-বাসকালে লিথোগ্রাফের পদ্ধতি বিশেষভাবে আয়ত্ত ক'রে আসেন, এবং তারপরে শান্তিনিকেতনে এই পদ্ধতিটির বিশেষ চর্চ্চা হয়েছিল। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র হরিহরন্, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এই পদ্ধতিতে অনেকগুলি চিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। হরিহরনের ও ছোট একটি প্রবন্ধ "আর্ট ইন ইংল্যাণ্ড" নামে ( 'লিস্‌নার' কাগজ থেকে সঙ্কলিত ) একটি পুস্তিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্ত্তনের পরে সর্ব্বসাধারণের জন্য কোন কোন বিখ্যাত চিত্রের রুচি ও শিল্প সম্মত প্রতিলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ( "আঁখি পাখী ধায়" ) ও নন্দলাল বসুর ("সাঁওতাল নৃত্য") কতকগুলি বিখ্যাত চিত্রের লিথোগ্রাফ প্রাচ্যকলা-সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়ে

বাজার শ্রীরাধাচরণ বাগচী

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সাঁওতালদের জীবনযাত্রার চিত্রাবলী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের "উটজ", সুরেন্দ্রনাথ করের "দড়ির পুল", "সাঁওতাল বংশীবাদক", বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের "ছাত্রী" প্রভৃতি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু বিখ্যাত চিত্রের বহু প্রতিলিপি প্রস্তুত করা ছাড়া, স্বতন্ত্র একটি শিল্পকারু হিসাবে এদেশে লিথোগ্রাফের চর্চ্চা বিশেষভাবে এখন থেকেই অল্পবিস্তর আরম্ভ হয়।

মুকুলচন্দ্র দের অধ্যক্ষতায় ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সহকারিতায় কলকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয় নূতনভাবে পরিচালিত হতে আরম্ভ হ'লে, এচিং কাঠখোদাই প্রভৃতি ছাপের ছবির মত লিথোগ্রাফের চর্চ্চাও নূতন উৎসাহে আরম্ভ হয়। কলকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এই পদ্ধতিতে কৃতী হয়েছেন। তার মধ্যে সুশীল সেন, ইন্দু রক্ষিত, পূর্ণেন্দু বসু, তারক বসু, বাসুদেব রায়, রাধাচরণ বাগচী, সত্যরঞ্জন মজুমদার, সমর ঘোষ, সুহাস দে, নিরাময় রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলকাতার হাট-বাজার-মন্দিরের অনেক দৃশ্য, পথে-ঘাটে নানারকম টাইপের মুখ ইত্যাদি প্রত্যহ চোখে দেখা অনেক ছবি লিথোগ্রাফের প্রস্তরপটে এই সব শিল্পীরা এঁকেছেন ও আঁকছেন। অবশ্য এসব চিত্র বিদেশী লিথোগ্রাফের মত বিচিত্র ও জোরালো হয়েছে এমন বলা চলে না, কিন্তু এ দেশে এর উদ্যোগও অল্পদিনের।

---

# বিপুলা চ—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথে পিপীলিকা সম
অগণিত মানুষের ভিড় ;
অবিরাম চলে স্রোত, অহরহ চলে ঠেলাঠেলি,
একের পিঠের সাথে অপরের পেট যায় ঠেকে।
সঙ্কীর্ণ সময়, আরো সঙ্কীর্ণ সামর্থ্য মানবের,
( অভাবের ব্যাপ্তি শুধু মানে নাকো সীমানার বাধা )
ধোঁয়ায় ধূলায় ক্লিন্ন, খিন্ন শীর্ণ দেহ
সিক্ত হয়ে থাকে তাও অশ্রু আর স্বেদে ;
ক্ষুধার আহার নিত্য খুঁটে খেতে হয়—
পৃথিবী ঐশ্বর্য্যময়ী !

নর্দ্দমায় নর্দ্দমায় আচ্ছন্ন কর্দ্দমে
অসংখ্য কৃমি ও কীট করে কিলিবিলি ;
ফেনায়িত মদ্যস্রোত পথে পথে পড়ে উপচিয়া,
কৃমিকীট ভাসিয়া বেড়ায়।
ভাসিয়া বেড়ায় আরো নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
কোটী কোটী রোগের বীজাণু—
জীবনে ঢাকিয়া যায় লক্ষ লক্ষ জীবাণু-বল্মীক !

দর্শনে বিজ্ঞানে জ্ঞানে শাসনে সংযমে,
পৃথিবী সভ্যতাময়ী সহস্র বর্ষের।

# রবীন্দ্র-পরিচয়

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

সম্প্রতি মানুষ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে দু-একটি প্রবন্ধ বাংলা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। কোনও ব্যক্তিকে তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিচার করলে, সে বিচার ঠিক হয় ব'লে আমি মনে করি না। মানুষের বাহ্যিক বেশভূষার মধ্যে এবং চালচলনের আটপৌরে ভাব এবং ফিটফাট ভাবের দো-রোখ লীলা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সেই দো-রোখ ভাবের মধ্যে কোন্‌টি তার স্বভাব-সিদ্ধ, কোন্‌টি কেবল লোক-দেখানো, সেটা বিচার করা শক্ত। কারণ জীবনচর্চ্চার জগতে দুই ভাবই মানুষের মধ্যে কাজ করে; কাজেই দুটোই তার স্বভাবের অন্তর্গত। মানুষের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাব প্রতিনিয়ত তার জীবনযাত্রাকে বিচিত্র ক'রে তুলছে। 'ঘরে-বাইরে'র সমস্যাটা উপন্যাস-জগতে কেবল যে সত্য তা নয়, মানব-জীবনের প্রকৃতিটাও ঘরে-বাইরের সমস্যা নিয়ে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার নিত্য নূতন পরিচয়-সংঘাত এবং তার নিজের ভিতরের স্বভাব—এই দুইয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তার চলেছে সংগ্রাম। এই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে হারজিতের পালায় কখনও হারে মানুষের বাহিরের দিক, কখনও হারে তার ভিতরের দিক। এই হারজিতের লড়াই অল্প-বিস্তর সকলের মধ্যে রোজই ঘটে। প্রবলভাবে ঘটে এই যুদ্ধ কবিদের জীবনে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রতিভাশালী ব্যক্তির, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের মত অসাধারণ প্রতিভাশালী কবির, চরিত্র-বিশ্লেষণ ক'রে তাঁকে বোঝবার একটা কায়েমী বিচারপথ তৈরি করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সেদিক দিয়ে যুক্তি-তর্ক ক'রে কিছু বলবার বৃথা চেষ্টা করব না। তাঁর সান্নিধ্যে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর থেকে, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারে এমন বেশি রকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছি যে, সে বৈচিত্র্যের জাল খুলে আসল মানুষ রবীন্দ্রনাথ কি, সেটা আমি নিজে কোন রকমে কিছু বুঝলেও পরকে বোঝানো শক্ত। কাজেই বৈচিত্র্য-বিশ্লেষণের দিক দিয়েও কিছু বলবার প্রয়াস করব না। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি ঘটনা এবং বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁর সেকালের বসবাসের কিছু পরিচয় দিচ্ছি। এই পরিচয়-প্রবন্ধে সবই যে আধুনিক চিত্র তা নয়, কুড়ি পঁচিশ বছর আগের অনেক কথাও আছে।

সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা, তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ব্যবস্থা বা ম্যানেজ্‌-মেণ্ট বিভাগের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে দেখাশোনা করতেন। ছোট্ট একটি আপিস-ঘরে একটি বড় তক্তাপোষের উপর শতরঞ্চি পাতা থাকত, আর তার উপর থাকত একটা কাঠের লেখবার ডেস্ক। আজকাল শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির সংলগ্ন একেবারে পূবদিকের রিডিং-রুমটি তখন ছিল একক একটি স্বতন্ত্র ঘর, ঐ ঘরের এক প্রান্তে ছিল আমার শোবার খাট, একটি ছোট টেবিল, একটি চেয়ার। আর ঐ ঘরের মধ্যে দক্ষিণাংশে ছিল রবীন্দ্রনাথের আপিস। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে এসে ঐ তক্তাপোষে পদ্মাসন ক'রে ব'সে আশ্রমের হিসেবপত্র দেখতেন, যথা,

হাটবাজারের ফর্দ্দ চেক করা, জমা-খরচের হিসেব দেখা, প্রাপ্ত চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া হ'ল কি না দেখা ইত্যাদি কাজ করতেন। এই রকমের কাজে তাঁর কেটে যেত দেড় দু ঘণ্টা। এই সব কাজের মধ্যে তাঁর অন্যতম কর্তব্য ছিল, স্থানীয় বাজার থেকে যে সব তরিতরকারি আসে, সেগুলি সেওড়াফুলী কিম্বা শ্রীরামপুর থেকে আনালে সস্তা হয় কি না ইত্যাদি বিষয় একে তাকে চিঠি লিখে খোঁজ নেওয়া।

এই আপিসের ঘরদোর ঝাড়ু দেবার এবং পিওনের কাজ করবার জন্যে সতীশ নামে একটি নাপিত ছিল। সে তার নামের শেষে কখন উপাধি দিত পরামাণিক, কখন লিখিত বিশ্বাস।

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

হঠাৎ একদিন বিশ্বাস মশায়ের মনে হ'ল, তার পক্ষে ঘর ঝাড়ু দেওয়া সম্মানহানিকর ব্যাপার। সেদিন সে আর ঘর পরিষ্কার করলে না, রইল ঘর বিনা ঝাড়ুতে প'ড়ে। যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকে দেখেন ঘরের বিশ্রী অবস্থা। তাঁকে বললুম, সতীশের নব চিন্তার কথা। তিনি শুনলেন আমার কথা। শুনে চুপ ক'রে নিজের কাজে মন দিলেন। সতীশের আগমন হ'তেই আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে আপিসের এক কোণে রাখা ঝাঁটাগাছা নিয়ে নিজেই সমস্ত ঘরটা ঝাঁট দিলেন। সতীশ তাঁকে ঐ কাজ করতে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললে, আহা আহা, করেন কি, আপনি ছেড়ে দিন, আমি ঝাড়ু দিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, তোমার যখন এ কাজে অপমান বোধ হয়,

আমরাই দেব। এই পর্য্যন্তই শেষ। সতীশকে আর কোন দিন কিছু বলতে হয় নি, তারপর থেকে সব কাজ সে নিয়মিত করত।

একদিন সকল ছেলে আর শিক্ষকেরা মিলে আশ্রম পরিষ্কারের কাজে লেগেছে, সঙ্গে আছেন পরলোকগত রায় সাহেব জগদানন্দ রায় আর অজিতকুমার চক্রবর্তী। এমন সময় দেখি, রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন ছাতিমতলার দিকে, কালো রঙের একটা লম্বা লুঙ্গিগোছের একটা কিছু পরা, উপরে কালো পাঞ্জাবি, হাতে বেতের বড় ঝুড়ি, আর শুকনো লতাপাতা কুড়োবার একটা জাপনি কাঁটা নিয়ে লেগে গেলেন আমাদের সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে।

এর কিছুদিন পরে, একদিন আকাশ জুড়ে এল মেঘ, মুষলধারায় নামল বৃষ্টি। ছেলেদের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন গোয়ালপাড়ার পথে। সেদিন তাঁর পরনে ছিল নেট ডিজাইনের বড় সাদা হাফ-হাতা গেঞ্জি, মাথার একরাশ চুল উল্টে দিয়েছিলেন মাথার পিছনের দিকে। অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজবার পর ফিরে আসা গেল। এ রকম ব্যাপারে হট্টগোল করতে করতে যাওয়া-আসার পালায় একটা প্রাণখোলা সহজ সুরের গানের প্রয়োজনের বিষয় আলোচনা হ'ল। বাস্, তার কয়েকদিন পরেই তৈরি হ'ল—"আমাদের শান্তিনিকেতন" গান।

তখনকার দিনে ছেলে এবং শিক্ষকেরাই তৎকালীন ছোট রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতেন 'বিসর্জ্জন', 'শারোদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি নাটক, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঐ দলের সঙ্গে মিশে অভিনয় করতেন। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে তাঁর নিজের আদর্শানুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার সামার্থ্য হতে বঞ্চিত হন নি। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে স্বাভাবিক একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, সেই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে কারও সঙ্গে হরিহর-আত্মা হয়ে মিলিত হবার সুযোগ দেয় নি। বিশেষ ক'রে এ দেশে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মেলামেশায় যে একটা গায়ে গায়ে জড়িয়ে ঢলাঢলি রকমের আত্মীয়তার প্রাচুর্ভাব আছে, সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পরিবারেরও কারও সঙ্গে চর্চ্চা করেছেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। কাজেই মানুষ রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের সকল মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের চিন্তা এবং অনুভূতিকে বিজড়িত রেখেও, নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং রাশভারী প্রকৃতিকে অটুট রেখেছিলেন।

পরিচ্ছন্নতা এবং পারিপাট্য রক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধেও যেমন সজাগ, পরের সম্বন্ধেও তেমনই সচেতন। এলোমেলোভাবে, যেমন-তেমনভাবে থাকার সম্বন্ধে তিনি লক্ষ্য করেন মানব-চরিত্রের শৈথিল্য। এই শৈথিল্যকে নিছক সিম্প্লিসিটি ব'লে গণ্য করতে তিনি কোনমতে প্রস্তুত নন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশার বাহ্যিক যে সব অভ্যাস আমরা চিরাচরিত রকমে চর্চ্চা করি, সে সব অভ্যাসের চর্চ্চায় রবীন্দ্রনাথ স্বভাবত বিমুখ। বেশ মনে পড়ে, একদিন বেলা অনুমান এগারোটায় স্নান করতে যাবার আগে তেল মেখে খালি গায়ে আম-বাগানে দাঁড়িয়ে পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে গল্প করছিলুম। অনতিদূরে শালবীথিকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আমার ঐ তেলমাখা খালি গায়ে পিয়ার্সনের সঙ্গে গল্প করা দেখে, বিরক্ত হয়ে এতই অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন যে, তখনই আমাকে চেঁচিয়েই ডাকলেন। তাঁর মুখভঙ্গি দেখেই বুঝলুম,

কেন ডাক পড়েছে। কাছে ডেকে খুব একচোট দিলেন ব'কে। সবটাই হজম করলুম। যুক্তির দিক দিয়ে তাঁর বকুনিকে সঙ্গত গণ্য করলুম, কিন্তু অভ্যাসের দিক থেকে ঐ শ্রেণীর অবাঞ্ছনীয়তা পরিত্যাগের সঙ্কল্প অনেক সময়ই রক্ষা করতে পারি না, এটা বাস্তবিক লজ্জার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সম্রাট ব'লে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন সাহিত্যের ডাক্তার উপাধি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অনুরাগ। হোমিওপ্যাথি এবং বাইওকেমিস্ট্রি বিষয়ক ঔষধাবলীর গ্রন্থ কত যে পড়েছেন তা গুনে বলা শক্ত। একবার তাঁর কানে গেলে হয় যে কেউ অসুস্থ, সে যে রোগেই হোক। অমনই সব কাজ ছেড়ে বসলেন ঐ সব ডাক্তারি বই নিয়ে। চাকরদের কাজ হ'ল রোগীর বাড়ি যাওয়া আর ঔষধ দেওয়া। যতক্ষণ রোগীর রোগ প্রশমিত না হ'ল, আর রক্ষে নেই। রোগী হয়তো চায় খেতে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ; তিনি নাছোড়বান্দা, হোমিওপ্যাথিক কিম্বা বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করতেই হবে। এই রকম ক'রে সারিয়েছেনও কত রোগী তার ঠিক নেই। একবার এক সাংঘাতিক রোগিণীকে নিয়ে পড়লেন দার্জ্জিলিঙে। সে সময় সেখানকার গ্র্যাণ্ড মিত্র বোর্ডিঙের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র মহাশয়ের কন্যা, প্রসবের পর সেপ্‌টিক জ্বরে প্রায় মরণাপন্ন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটির চিকিৎসা কে করছেন। আমি বললুম, ডাঃ শিশির পাল মহাশয় চিকিৎসা করছেন। আর দেরি নয়, আমাকে আদেশ হ'ল, শিশিরবাবুকে আমার কাছে দয়া ক'রে আসতে বল গিয়ে। এলেন শিশিরবাবু। তিনিও দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, ইনিও তাই। শিশিরবাবু অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করলেও হোমিওপ্যাথিতে তাঁর অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা নেই। রবীন্দ্রনাথ শিশিরবাবুকে বললেন, শিশিরবাবু, আপনি রোগিণীকে প্রত্যহ পরীক্ষা ক'রে রোগের সঠিক অবস্থা আমাকে সুধাকান্ত মারফৎ জানাবেন, চিকিৎসা করব আমি। আমাকে দয়া ক'রে চার পাঁচ দিন চিকিৎসা করবার সুযোগ দিন। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য রকমে দিলেন সে রোগিণীকে সারিয়ে। হীরালালবাবু হলেন কবির কাছে কৃতজ্ঞ। লাভ আমার হ'ল, হীরালালবাবু আমাকে পঁয়ত্রিশ টাকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ করলেন প্রেজেণ্ট। এ রকম দুঃসাহসিক রকমের চিকিৎসার দায়িত্ব-ভার নেওয়া তাঁর বাধে না। আমাদের কতবার এই ব'লে তিরস্কার করেছেন, তোমরা মানুষের কষ্ট লাঘবের কথা বিচার কর না, বিচার কর নিজের ঘাড় বাঁচাবার দিক। কেন, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কি সব রোগী সারে? তারা যদি ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা করতে পারে, তবে তোমরা কেন সেই দায়িত্ব নিয়ে রোগীকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না? আমি লোকের নিন্দে কেয়ার করি না, আমি ভাবি, কিসে রোগী সারবে ইত্যাদি। এদানি কারও রোগের সংবাদ পেলে অত্যধিক বিচলিত হন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে কোনও হোমিওপ্যাথের হাতে সমর্পণ না করছেন, ততক্ষণ তাঁর আর সোয়াস্তি নেই।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সকলের সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতে অভ্যস্ত নন, তেমনই যাঁরা তাঁর খুব পরিচিত এবং যাঁদের সঙ্গ তিনি পছন্দ করেন, তাঁদের সঙ্গে খুবই মন খুলে গল্প করেন। এ রকম গল্প শোনবার এবং গল্প-প্রসঙ্গে তাঁর রসিকতা ও পরিহাস শোনবার সুযোগ আমাদের অনেকেরই বহুবার ঘটেছে। অনেকদিন আগের কথা। কবি তখন রামগড় পাহাড়ে ছিলেন। একদিন

বেলা অনুমান নটায় দেখি, কবি তাঁর ডান পায়ের মোজা খুলে পায়ের তলা হাত দিয়ে ঘষছেন। জানি না, কি কাজে তাঁর কাছে গিয়েছি,—ঐ কাণ্ড দেখে জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে? তিনি বেশ হাস্যমুখেই বললেন, চরণপদ্ম চরণকমল ইত্যাদি শব্দ বহুদিন শুনছি, কবিতায় ঐসব শব্দ ব্যবহার করেছি, কিন্তু কেন যে পাকে চরণকমল বলে, সেটা আজ সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করেছি। এই দেখ না, এত জায়গা থাকতে গরম মোজার বন্ধন ভেদ ক'রে একেবারে পায়ের তলায় দিলে হুল বিঁধিয়ে মৌমাছিটা। চরণ যদি কমল না হবে, তা হ'লে কি মৌমাছি এমন কাণ্ড করত?

আর একদিনের ঘটনা, সেও অনেক দিনের কথা। আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মশায়কে পড়ল হঠাৎ রবীন্দ্র-সকাশে তলব। কবির কাছে নেপালবাবু উপস্থিত হ'তেই কবি তাঁকে গম্ভীরভাবে বললেন, মাষ্টার মশায়, ছেলেরা ক্লাসে বিলম্বে এলে আপনারা তাদের দেন শাস্তি। কিন্তু শিক্ষকেরা ক্লাসে বিলম্বে উপস্থিত হ'লে তাঁরা কি দণ্ড পাবার যোগ্য নন? মাষ্টার মশায় মাথা চুলকে মৃদু হেসে বললেন, নিশ্চয়ই।

কবি। ঠিক বলছেন, তাঁরা দণ্ড পাবার যোগ্য?

নেপালবাবু। হ্যাঁ, দণ্ড পাবার যোগ্য।

কবি। তা হ'লে সেজন্য যদি আমি আপনাকে দণ্ড দিই, আপনি আপত্তি করবেন না, স্বচ্ছন্দচিত্তে নেবেন? আচ্ছা, তার পূর্ব্বে একটু চা-জলযোগ সারুন, দক্ষিণা দেব তারপর।

কিছুক্ষণ হাস্যপরিহাসাত্মক গল্প হবার পর, নেপালবাবু উঠে পড়লেন ঘরে ফেরবাব জন্যে। কবি বললেন, বেশ মশায়, দণ্ড নিয়ে যান।—এই ব'লে কবি পাশের ঘর থেকে নেপালবাবুকে একটি বেতের লাঠি এনে দিলেন। লাঠি পেয়ে নেপালবাবু ও স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। নেপালবাবু তার পূর্ব্বদিনে কবির সঙ্গে গল্প সেরে উঠে আসবার সময় তাঁর ঐ লাঠিগাছটি কবির বসবার ঘরে ফেলে এসেছিলেন। কবি নেপালবাবুকে একটু জব্দ করবার জন্যেই লাঠিগাছটি রেখেছিলেন লুকিয়ে। ফেরত দিলেন এই রকম ভাবে। নেপালবাবুকে যাবার সময় কবি হেসে বললেন, মাষ্টার মহাশয়, এ দণ্ডটি আপনার প্রাপ্য ছিল, এইজন্য আমি আপনাকে দণ্ড দেবার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলাম। আশা করি, আপনি এটি স্বচ্ছন্দচিত্তেই গ্রহণ করলেন।

হঠাৎ যেদিন প্রথম চশমা প'রে কবির কাছে উপস্থিত হলুম, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাক, তবু একটা কাজ ভাল হ'ল। ভগবান যা তোমাকে দেন নি, চক্ষু-চিকিৎসক সেই চক্ষু-লজ্জা তোমায় দিয়েছেন।

আর একদিনের কথা, জনৈক স্কাল্প্‌টার মাটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাফ-বাস্ট তৈরি করছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ( ঠিক মনে পড়ছে না, কোন্ ব্যক্তিকে বলেছিলেন ) তিনি একজনকে বলেছিলেন, এই বুড়ো বয়সে, দেখুন তো মশায়, শেষটায় আমাকে এই শিল্পী দিলে ক'রে মাটি।

কথায় কথায় সুরুচিসঙ্গত অথচ হাস্যরসে ভরপুর রসিকতাময় উক্তি কত যে রবীন্দ্রনাথ করেছেন এবং ক'রে থাকেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। এই প্রবন্ধ-লেখকের মাথায় আছে মস্ত বড় টাক। একদিন কবি বললেন, টাকটা দিনে দিনে প্রশস্ত হচ্ছে, ব্যাপার কি? আমি বললুম,

এ টাককে ঠেকানো দায়; কেন না, এটা আমাদের বংশের একটা বৈশিষ্ট্য। কবি হেসে বললেন, ওটার সঙ্গে যখন বংশ-মর্য্যাদার সম্বন্ধ আছে বলছ, তখন ওটা তোমার পক্ষে অবশ্য শিরোধার্য্য। এই রকমের রসিকতা এমন অক্লেশে এবং এমন সহজে কথা-প্রসঙ্গে বলেন, যা শুনলে শুধু রস উপভোগ করা যায় তা নয়, চমৎকৃত হতে হয়। তাঁর পুরাতন ভৃত্য বনমালী এবং উমাচরণের সঙ্গে অবসর-সময় যথেষ্ট রসিকতা করেন। "পুরাতন ভৃত্য" কবিতাটিতে ভৃত্য-সম্বন্ধে প্রভুর যে গভীর ভালবাসার ভাব ফুটে উঠেছে, সেটা নিছক কাল্পনিক কথা নয়, ভৃত্যদের সম্বন্ধে কবির একটা স্বাভাবিক দরদ আছে। তারা আস্কারা পেয়ে অনেক সময় এমন সব প্রত্যুত্তর করে, যা আর কেউ বরদাস্ত করত না, রবীন্দ্রনাথ সহ্য করেন অম্লানবদনে। উমাচরণ বেচারা ম'রে গেছে। সম্পর্কে শাশুড়ীস্থানীয় জনৈক বৃদ্ধা মহিলা রবীন্দ্রনাথের আহার্য্যাদি প্রস্তুত ক'রে দিতেন যখন তিন চার দিনের জন্যে পতিসরে কিম্বা শিলাইদহে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখান থেকে বোলপুরে ফিরে এসে কিছুদিন পরে একদিন রবীন্দ্রনাথ উমাচরণকে ডেকে বললেন, তোর রান্না আজকাল ঠিক হচ্ছে না কেন, রান্না কি ভুলে গেছিস? উমাচরণ অসঙ্কোচে ব'লে বসল, আজ্ঞে, সবে কয়েকদিন হ'ল শাশুড়ীর হাতের রান্না খেয়ে এসেছেন, স্বাদ এখনও ভুলতে পারেন নি, ঐজন্যেই আমার হাতের রান্না আর ভাল লাগছে না। তা আমি কি করব? রবীন্দ্রনাথ চুপ। কিন্তু তারপর উমাচরণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার দেখে মনে হ'ল, পুরাতন ভৃত্য ব'লেই তাঁকে মন থেকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করেছেন।

ভৃত্যদের কাছে মনিব যতটা কর্ত্তব্য আদায় করে, রবীন্দ্রনাথ ততটা তো আদায় করেনই না, বরং ভৃত্যেরা তাঁর কাছে থাকায় যায় কর্তব্য ভুলে। দুপুরবেলা ব'সে লিখছেন, হয়তো পাশের ঘর থেকে একটা প্রয়োজনীয় কিছু আনতে হবে, চাকর ব'সে আছে অদূরেই, তবু তাকে ডাকবেন না, যেহেতু সে বিশ্রামের 'মুড'-এ রয়েছে। নিজেই উঠে গিয়ে নিয়ে আসবেন সেটা। এই বুড়ো বয়সেও দেখছি, পরকে কষ্ট না দেবার ইচ্ছেটা তেমনই প্রবল। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করি, বছর কয়েক পূর্ব্বে যেবার কবি লাহোরে সেখানকার স্টুডেণ্ট্‌স কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করবার জন্যে যান। তিনি ছিলেন সেখানে লালা ধনীরাম ভাল্লার অতিথি, মুলতান রোডে "ভাল্লা কোঠিতে"। সেই সময় একদিন হঠাৎ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় কবি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরের পাশের ঘরটি ছিল একটা ড্রয়িং-রূম। সেই ড্রয়িং-রূমের পাশের ঘরটিতে থাকতুম আমি এবং কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ। আর ড্রয়িং-রূমে রাত্রে থাকত কবির প্রিয় ভৃত্য বনমালী। তার আর এক নাম নীলমণি। যেদিন তাঁর শরীর অসুস্থ, সেইদিন রাত্রিতে অনুমান দুটোর সময়, ড্রয়িং-রূমে কেউ যেন চেয়ারে ধাক্কা খেয়েছে এই রকমের একটা আওয়াজ শুনে বিছানা থেকে উঠে দেখি, ঘর অন্ধকার। কিন্তু মনে হ'ল, ঘরের ভিতরে ঐ অন্ধকারেই কে যেন চলাফেরা করছে। প্রশ্ন করলুম, কে? কবি উত্তর দিলেন, আমি, ভেবেছিলুম, তোদের জাগিয়ে কষ্ট দেব না, নিজেই হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচ খুঁজে নিয়ে আলো জ্বেলে নেব। তাড়াতাড়ি গিয়ে বাতি জ্বাললাম। কবি বাস্তবিকই একটা অসোয়াস্তিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, বিছানায় ভাল লাগছিল না, তাই ড্রয়িং-রূমে একটা ঈজি-চেয়ারে বসবার জন্যে গিয়েছিলেন ঐ ঘরে। বুড়ো মানুষ,

তেমন দৈহিক সামর্থ্য নেই, অসুস্থ, পাশের ঘরেই চাকর, তার পাশের ঘরে দুজন সেক্রেটারি, তবু সঙ্কোচ, ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ডেকে তুলবেন না। আমরা তখনকার মত বিরক্ত হলুম। মুখ ফুটে আমরা দুজনেই তাঁকে বললুম, আপনি এ রকম অন্যায় কাজ কেন করলেন? চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গিয়ে একটা বিপদ বাধালে লোকে আমাদেরই নিন্দে করত, ধিক্কার দিত, কেন আমাদের তিন জনের মধ্যে কাউকে ডাকলেন না? ইত্যাদি। কবি চুপ ক'রে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, বুড়ো হ'লে কি স্বভাব বদলায়? একবার ভাবলুম, ডাকি, তারপর মনে হ'ল, শীতের দিন, বেশ তোমরা ঘুমোচ্ছ, কেন আর কষ্ট দিই?

স্বাধীনতার ভাব অথবা পরের তোয়াক্কা না রাখার ভাব তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। আজকাল বৃদ্ধ বয়স হেতু সেই ইণ্ডিপেডেন্স বজায় রাখা হয় না ব'লে মনে মনে অনেক সময়ই গুমরে মরেন, মুখ ফুটে ব'লেও ফেলেন সেই সব কথা। নিজের দৈহিক অসামর্থ্যের বিষয়টাই আজকাল তাঁর মনকে ক্লেশ দেয় খুব বেশি। তাঁর নিজের কাজ অন্যে ক'রে দেবে, কিম্বা তিনি হেঁটে যেতে পারবেন না, তাঁকে মানুষে রিক্স ক'রে টেনে নিয়ে যাবে, কিম্বা ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে নীচে থেকে উপরে ওঠাবে, আজ এই আটাত্তর বছর বয়সেও এসব তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না, অথচ এই সবই আজকাল তাঁর জন্য আবশ্যক হয়, এইজন্য মর্ম্মান্তিক লজ্জানুভব করেন। বোধ হয়, দেড় দু বছর আগেকার কথা ( অর্থাৎ কলকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের সময় ), একদিন সন্ধ্যের প্রাক্কালে কথা ছিল, মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে বেলঘরিয়ায় যাবেন। হঠাৎ ঠিক সন্ধ্যের প্রাক্কালেই শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই আমাকে ফোন ক'রে জানালেন যে, মহাত্মাজী গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার উদ্দেশ্যে মোটর-কারে ওঠবার পথে দুর্ব্বলতাবশত ফেণ্ট হয়ে যাবার মত হওয়ায় তাঁকে তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি এজন্য যেতে না পারায় দুঃখিত, গুরুদেবকে এ সংবাদ দেবেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

ফোনেই দেশাইজীকে জিজ্ঞেস করলুম, অত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে তিনি আসবার চেষ্টা করলেন কেন, দুদিন পরেও তো পরস্পর তাঁদের দুজনে দেখা-শোনা হতে পারত। উত্তরে দেশাইজী বললেন, গুরুদেব সম্বন্ধে বাপুর মনোভাব তো জানেন, তিনি গুরুদেবকে কথা দিয়েছিলেন যে, ঐ দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, তাই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য জিদ করলেন, যাবেনই যে রকম ক'রে হোক; জহরলালজী, সুভাষবাবু, শরৎবাবু সকলেই বাপুকে অনুরোধ করেছিলেন না যেতে, এবং বাপুজীর না যাবার কারণ গুরুদেবকে বুঝিয়ে বলবার ভার নিচ্ছিলেন জহরলালজী, কিন্তু কারও বারণ না শুনে তিনি যাবার জন্য মোটরে ওঠবার সময়েই দুর্ব্বলতায় ব'সে পড়েন। এই খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যধিক ব্যাকুল এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তাঁর নিজের স্বাস্থ্যও তখন খারাপ। থাকতেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের বেলঘরিয়ার বাগান-বাড়ির দ্বিতল গৃহে। ঐ দোতলায় তাঁকে চেয়ারে ক'রে ওঠাতে হ'ত। তিনি জেদ ধরলেন, আমি এখনই যাব শরৎবাবুর বাড়ি মহাত্মাজীকে দেখতে। আর এক ফ্যাসাদ! একবার একটা কিছু করবার মতলব করলে এমনিতেই রক্ষে থাকে না, আর বিশেষ ক'রে, এই ঘটনা উপলক্ষ্যে। তবু বললুম, আপনিও যদি দুর্ব্বলতাবশত কোন রকম বিপদে সেখানে

পড়েন, তা হ'লে বসু মশায়ের বাড়িতে দুই গ্রেট্ ম্যান নিয়ে একটা মহা বিভ্রাট উপস্থিত হবে। তার চেয়ে বরং আমরা কেউ সেখানে গিয়ে দেখে আসি, মহাত্মাজী কেমন আছেন, এসে আপনাকে খবর দিই। কবি বিরক্ত হয়ে বললেন, বাজে কথা ছাড়, শিগগির গাড়ি আন, আমি যে রকমে পারি যাবই যাব। অগত্যা, ফোনে তখনই শরৎবাবুকে জানলুম যে, কবি রওনা হচ্ছেন মহাত্মাজীকে দেখতে।

শরৎবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়েই কবি দুর্ব্বলতাবশত মোটর থেকে নেমেই বারান্দায় একটা চেয়ারে ব'সে পড়লেন, তখন বেশ দুর্ব্বল। শরৎবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, মহাত্মাজী কেমন আছেন? উপস্থিত সকলেই বললেন, তিনি তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন, এখন সে ঘরে প্রার্থনা হচ্ছে, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আচ্ছা, আমি তবে ফিরে যাই, নিশ্চিন্ত হলুম। উপরে গিয়ে তাঁকে আর ব্যস্ত করা ঠিক হবে না, উপরে গেলেই তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে। মহাদেবজী এবং অন্যান্য সকলেই বললেন, মহাত্মাজী অত্যন্ত দুঃখিত হবেন, আপনি এসেছিলেন, অথচ চ'লে গেলেন তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবার ভয়ে। রবীন্দ্রনাথকে সুভাষবাবু শরৎবাবু ইত্যাদি সকলে মিলে চেয়ারে তুলে উপরে নিয়ে যাবেন—এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত হলেন, বললেন, বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকলে এই রকমের দুর্দ্দশা কতই হয়, কি করব, চল, তাই কর। সম্ভবত, এই যে তাঁকে হাটের মাঝখানে, সকলের সামনে চেয়ারে তুলে, সকলে মিলে হল্লা ক'রে উপরে নিয়ে যাবে—এই চিন্তাই তাঁকে বেশি কাবু করেছিল। উপরে গিয়ে মহাত্মাজীর কোলের কাছে তাঁর বিছানায় বহুক্ষণ ব'সে রইলেন। প্রার্থনার পর মহাত্মাজী খুব মৃদুস্বরে কবিকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং এত কষ্ট ক'রে তাঁর আসা ঠিক হয় নি জানিয়ে দিলেন। আবার কবিকে চেয়ারে ক'রেই নামানো হ'ল। ফেরবার পথে গাড়িতে বললেন, যাক, নিশ্চিন্ত হলুম। ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায় হ'ত যদি মহাত্মাজী আমার কাছে পোঁছে এই রকমে বিপদে পড়তেন, তা হ'লে আমার লজ্জার আর দুঃখের অবধি থাকত না। দেখলুম, দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বেশ প্রফুল্ল। হেসেই বললুম, ঠিক বলেছেন, আর শরৎবাবুর বাড়িতে আপনার যদি আজকে কিছু ঘটত, তা হ'লে শয্যাশ্রিত মহাত্মাজীর এবং শরৎবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট এবং অন্যান্য শিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থাটা কি রকম হ'ত বলুন তো? তিনি বললেন, তোরা আমাকে ভাল ক'রে আজও চিনিতে পারিস নি, অথচ সব সময় কাছে কাছে থাকিস ব'লে মনে মনে খুব অহঙ্কার যে, তোরা আমাকে খুব চিনেছিস। কিচ্ছু জানিস না। দেহের দিক থেকে যতই না কেন দুর্ব্বল হই, মনে করলে সব কিছুকে আমি অতিক্রম করতে পারি। আমি আজ মনকে শক্ত ক'রে বেরিয়েছিলুম এই ভেবে যে, কিছুতেই শারীরিক দৌর্ব্বল্যকে প্রশ্রয় দেব না, সেইজন্যে কিছু হ'ল না।

# পরীদের গান

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

আমরা ভাসাই নিঝুম রাতে ছায়ার জলে শুক্তি-তরী
নীল আঁচলে নেশায়-ভরা স্বপন-রেণুর আবীর ভরি'।
আমরা আসি হাওয়ার তালে
চাঁদ-আঁকা নীল আকাশ-ভালে,
জ্যোছনা-ছাওয়া ধরার গালে
অধর রাখি আদর করি'।
আমরা পরী—আমরা পরী!

আমরা নাচি ঘুমের রাণীর সিংহাসনের স্বপন-সাথে,
চরণ ফেলি আঁচল মেলি লক্ষ-হীরার আলপনাতে।
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে
এলিয়ে-পড়া তনুর মাঝে,
অবাক লাজে বুকের ভাঁজে
লাল প্রবালের সপ্তনরী।
আমরা পরী—আমরা পরী!

আমরা আসি স্তব্ধ রাতে আকাশ যখন নিমেষ-হত,
দর-জোনাকীর আলোক জলে শেষ দীপালীর দীপের মত।
আমরা আসি ঘুম-পুরীতে
নীল মাণিকের প্রদীপ দিতে,
ঝিমিয়ে-পড়া ঝিঁঝির গীতে
বোঝাই করি' নীলাম্বরী।
আমরা পরী—আমরা পরী!

আমরা দুলি ঘুমের নীপে, নেশার ফুলের দোলন বেঁধে,
ক্ষণেক হাসি, বাজাই বাঁশী ঝর্ণা-ঝরার সুরটি সেধে।
হঠাৎ দেখি চাঁদ ডুবে যায়
ঘুমের পুরীর সিংহচূড়ায়,
শ্বেত উষসী মাণিক কুড়ায়,
আবীর উড়ায় দুহাত ভরি'।
আমরা পরী—আমরা পরী!

আমরা কাঁদি শ্যাম ধরণীর সবুজ পাথার পালক 'পরে,
হিম জমে তাই পাতায় ফুলে, নীল গগনের লাল-অধরে।
দিনের বেলায় অনেক দূরে
ঘুমাই মোরা ঘুমের পুরে,
রাতের বেলায় অচিন্ সুরে
আবার ভাসাই শুক্তি-তরী।
আমরা পরী—আমরা পরী!
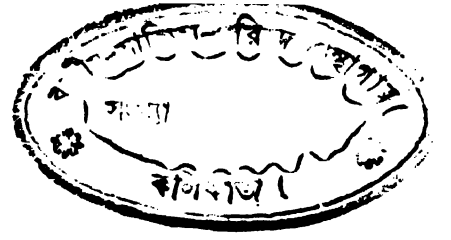
# কাব্যে প্রেম

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

প্রেম নিয়ে কাব্য লেখা হচ্ছে আদিযুগ থেকে। এ পর্য্যন্ত যত বিষয় নিয়ে কাব্য লেখা হয়েছে, তার মধ্যে প্রেম বিষয়টি বোধ হয় সবচেয়ে পুরাতন। শুনেছি, বসন্তে কোকিল যখন ডাকে, তখন সে তার প্রিয়াকেই ডাকে—তা সে কাছেই থাক আর দূরেই থাক। বসন্তের নতুন পাতার সমারোহের মধ্যে কোকিলের কুহুস্বর পরিচিত, আর আমরা তার প্রশংসাও ক'রে থাকি, কিন্তু সে যে কেন অত তীব্র দীর্ঘ তানে আত্মপ্রকাশ করে, তার কথা বোধ হয় আমরা সেদিন মাত্র জানলাম কোন বৈজ্ঞানিকের মারফৎ। সেজন্যে বৈজ্ঞানিকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা এইজন্যে যে, কোকিল-কবির সঙ্গে মানব-কবির একটা সাদৃশ্য বা সাধর্ম্ম পাওয়া গেল। মানব-কবিও প্রিয়াকেই ডাকে, আদিকাল থেকে এ পর্য্যন্ত সে প্রিয়াকেই ডাকে এবং ডাকছে। মনে হয় এই তার প্রেম আর এই তার কাব্য—কবিতা।

প্রেম বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করা কঠিন। সম্ভবত ও আদি কথার একটি—বেঁচে থাকা, খাদ্য খুঁজে বেড়ানো আর নিজকে বাড়িয়ে চলা। কিন্তু চিন্তাশীল দেবতা মানুষ এই নিজেকে বাড়িয়ে চলার মধ্যে একটি কল্পনার স্নিগ্ধ মায়াঞ্জন আনলে, তাকে বহুধাবিস্তীর্ণ করার মধ্যে যে একটি গভীর আনন্দ অনুভব করলে—এক কথায় যা ছিল নিতান্ত নীচু স্তরের জিনিস, তাকে মহিমান্বিত ক'রে দেবত্বের কোঠায় নিয়ে ফেললে; তার এই ভাবনা, এই মহৎ এবং বৃহৎ সত্তার কামনা কাব্যের মধ্যেও প্রকাশিত হ'ল, তাই কবি কাব্যে শুধু প্রিয়াকেই ডাকলে না, প্রিয়াকে যে পায় নি, যে বঞ্চিত হ'ল, সেও তার বেদনাকে কাব্যে অমর ক'রে রাখলে। এই তার প্রেম—তার শাশ্বত কালের ক্ষুধার প্রাশন, তার জীব-যজ্ঞের পূর্ণ আহুতি।

আমি তো বলি, এই না-পাওয়ার বেদনাই প্রেম। মানুষের অপরাজেয় মনোময় সত্তা আপনার পূর্ণ আবেগে আপনাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত ক'রে সার্থকতা পেয়েছে। কেউ কাব্যে রেখে গেছে হাহাকার, কেউ করেছে অপার্থিব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, কেউ বা 'মানুষের ঠাকুরালি'কে বড় ক'রে দেখলে, কেউ বা আনলে বৈরাগ্যের সুর, কেউ বা ঝঙ্কার তুললে ছন্দ-সপ্তস্বরায়, বললে 'ভূমৈব সুখং'। সব নিয়ে সেই গোড়ার কথাতেই আমাদের ফিরে যেতে হয়—বৃহৎ পরিবেশের মধ্যে নিজকে মহত্তর ক'রে দেখার আবেগ।

## ২

জগতের নানা দেশের নানা কাব্য নিয়ে যদি ভাবা যায়, কবি যেখানে নায়ক হয়ে কাব্যে এনেছেন প্রেম, এনেছেন বেদনা আর বিরহ অথবা মিলনের পরিপূর্ণতম অনুভূতি, সেখানে আমরা নির্ব্বাকবিস্ময়ে চিরন্তন মানব-হৃদয়ের সেই মহাসঙ্গীত শুনি। আর দেখি, তার বিচিত্র রূপ, অশেষ

কারুভঙ্গি। আমাদের দেশের বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদের এক একটি চরণে কত রস, কত অসীমকালের বিস্ময়! মানুষ এই রস অনুভব করতে শিখলে, যুগে যুগে সহস্র বিপ্লব-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সে তার প্রিয় কবিদের স্মরণ করলে, তাঁদের অতি-পরিচিত প্রিয় রচনাকে বাঁচিয়ে রাখলে শ্রুতিতে আর স্মৃতিতে। তাই কবির এত সম্মান। অনেক সময় ভেবেই পাই না, সামান্য একটি লাইনের মধ্যে জীবনের নিগূঢ়তম অনুভূতির সঙ্গীতময় প্রকাশ কি ক'রে সম্ভব হ'ল! সেই চরণেই লাগল দোলা, তোলপাড় ক'রে উঠল হৃদয়! 'চিরকাল এ কি লীলা গো, এ কি উদ্দাম কলরোল!'

প্রাচীনেরা প্রেমকে যখন কাব্যরস-বিচারের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, অর্থাৎ কবিতা যখন প্রেম-মূলক, তখন তাঁরা তার অন্তর্নিহিত রসকে বলেছেন শৃঙ্গার। তার আবার নানা রকম অভিব্যক্তি। মিলনে এক রকম, বিরহে এক রকম ; প্রেমের অঙ্কুরে এক রকম, প্রেমহীনতায় এক রকম—এই ভাবে তাঁদের কথা তাঁরা বিচিত্র অলঙ্কৃত ভাষায় ব'লে গেছেন। অর্থাৎ প্রিয়াকে নিয়ে কোনকালেই কারও শান্তি ছিল না, তা তিনি স্বকীয়াই হোন, আর পরকীয়াই হোন। তাঁদের সেই ভাষার কথা, প্রকাশ-ভঙ্গির কথা ভাবলে বিস্মিত হই। এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁরা কাব্যলক্ষ্মীকে সাজাতেন, এত অবসর আর স্বচ্ছ নির্ম্মল চিন্তা ও বোধ তাঁদের ছিল! যে কাব্যে অলঙ্কার নেই বা থাকলেও তার বাহুল্য নেই, সে কাব্য সম্বন্ধে তাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। নানা দিক দিয়ে ভেবে, বিচার ক'রে তর্কালোচনা ক'রে সে কাব্যের মধ্য থেকে অলঙ্কার তাঁরা বার করবেনই। একটা ছোট দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিতে পারি—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ তা এব চৈত্রক্ষপাঃ
তে চ উন্মীলিতমালতি সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বনিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

উক্ত কবিতার লেখিকার নাম শীলা ভট্টারিকা। শ্লোকটির একটি সহজ অর্থ করলে এই রকম দাঁড়ায়,—"স্বামী যিনি, তাঁর সঙ্গেই আমার প্রথম প্রণয়। আমাদের প্রথম মিলনের যে চৈত্ররাত্রি, তা সেই রকমই আছে। প্রস্ফুটিত মালতীফুলের গন্ধও সেই রকমই আছে। মদির কদম্বগন্ধাতুর পবন এখনও ব'য়ে যায়। আমিও ঠিক সেই রকমই আছি—অন্তত নিজের পরিবর্ত্তন নিজে বুঝতে পারছি না—তবু, রেবানদীর তীরে বেতসবনের অন্তরালে আমাদের যে মিলন হয়েছিল, সেই মিলনের স্মৃতিতে লগ্ন আমার মন।" আলঙ্কারিকরা অনেক খেটেখুটে এর মধ্য থেকে এক অলঙ্কার বার করেছেন। আমাদের আধুনিক মন এর মধ্য থেকে অলঙ্কার খোঁজে না, যে মিলন-ব্যাকুলতা এবং পূর্ব্বস্মৃতি-ভাবনায় বিধুর কবি-হৃদয় এই কবিতাটির অন্তর্লীন, তার পরিচয় পেয়েই আমাদের রস-পিপাসা মেটে। এই ধরণের ছোট ছোট কবিতা (সুভাষিতাবলী) সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্তর। 'অমরুশতকে'ও এই ধরণের শ্লোক অনেক আছে। এই সব শ্লোকে যে রসবস্তু, তা প্রায়ই শৃঙ্গার বা রতিভাবমূলক। সেগুলি যে প্রেমের কবিতা, তাতে এক রকম নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভোগলিপ্সা বা লালসা তাদের মূল সুর। কাজেই সে কবিতায় বর্ণচ্ছটা বেশি—বসন্তাগমে বনলক্ষ্মীর লোহিতরাগের

মত। সংস্কৃত কাব্যে এই গাঢ় রঙ—নরনারীর মিলনের অতি স্পষ্ট ছবি এবং মিলনোৎকণ্ঠা বা বিরহ-চিত্রের নগ্নতা কিছু বেশি। ভাষায় তার প্রকাশ এত অকুণ্ঠ যে, ভাবলেও বিস্মিত হই, কি ক'রে এমনটি সম্ভব হ'ল! আমার মনে হয়, তখনকার রুচি ছিল ঐ ধরণের; ভোগে ছিল না বাধা, তখনকার কবির অভিজ্ঞতায় এবং কল্পনায় তা সুন্দরভাবে যেত মিশে এবং কাব্যে কবিতায় হ'ত তার লজ্জাহীন প্রকাশ। আমাদের বাংলা কবিতায়, যেমন ভারতচন্দ্রে, আমরা শৃঙ্গার রসের বর্ণনা পাই, তার স্বপক্ষীয় যুক্তিও অনেকটা ঐ রকমের হবে। মহাকবি কালিদাসের বর্ণনবহুল 'মেঘদূত' কাব্যেও এ ধরণের বহু বর্ণনা আছে। আরও অনেক সংস্কৃত কবির নাম হয়তো করা যায়; কিন্তু সিদ্ধান্ত একই দাঁড়াবে। অর্থাৎ, মানব-মনে প্রেমের যে বিচিত্র অনুভূতি চিরকাল দোলা দেয়, কবিরা তাকে নিয়ে নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন, সে প্রকাশভঙ্গির রঙ কোথাও চড়া, আবার কোথাও বা তা অতি স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। যেমন মহাকবি ভবভূতির কাব্যে আমরা প্রেমের এই স্নিগ্ধ রূপটি প্রত্যক্ষ করি। সীতা আর রামের প্রেম—ভবভূতির কবিতা সীতা-রামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বের চিরন্তন নায়ক-নায়িকার মনোলোকে এসে অবতীর্ণ হয়েছে। 'উত্তররামচরিত' নাটকে যেখানে রাম সীতাকে তাঁর প্রেমসম্ভাষণ জানাচ্ছেন, সেখানকার কয়েকটি পংক্তি পড়লেই সেই স্নিগ্ধ অথচ গভীর দুঃখময় প্রেমের পরিচয় আমরা পাই। "ত্বয়া সহ নিবৎসামি বনেষু মধুগন্ধিষু" অথবা "ত্বং জীবিতং তমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে" প্রভৃতি শ্লোকে কবি ভবভূতির ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগে, মনে হয়, তিনি প্রেমিক ছিলেন, না থাকলে অত সুন্দর স্নিগ্ধ অথচ গভীর দরদের কবিতা তিনি কখনই লিখতে পারতেন না।

৩

আধুনিককালে জীবনের প্রকাশ যত বিস্তীর্ণ এবং গভীর, প্রেমের বৈচিত্র্যও তত বেশি। কাব্যে তার প্রকাশভঙ্গিও তত বিচিত্র। যুগের পর যুগ চ'লে গেছে, কিন্তু মানব-জাতির মৃত্যু ঘটে নি। উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে ধরা যাক, মানব-জাতি একেবারে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লোপ পেয়ে গেল, তার বদলে হয়তো অন্য কোন অদ্ভুত প্রাণী মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করতে লাগল। তখন কোথায় বা কাব্য, আর কোথায় বা মানবীয় প্রেম? কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের, তা হয় নি। কাজেই, প্রাচীনকালে যাঁরা তাঁদের অপরূপ মাধুরী নিয়ে কবি-চিত্ত জয় করতেন, তাঁদের রূপ গেছে বদলে, ভাষার হয়েছে অদল-বদল, তবু তাঁরা তাই আছেন—ভিতরের স্বরূপটার বিশেষ কোন বদল হয় নি। কবির ভাষায় এ ব্যাপারটা এই রকমে বলা হয়েছে—

"তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে!"

সুতরাং তাঁরা তাই আছেন। প্রেমও আছে এবং প্রেমের কবিতাও লেখা হচ্ছে। প্রাচীন দিনের তুলনায় আজকাল যেন বিরহ-ভাবটা কিছু বেশি। না-পাওয়ার ব্যথাটাই প্রবল। বৈষ্ণব-কাব্যে তো

বিরহ-ভাব অতিমাত্রায়। শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ আর বিরহ নিয়ে অনেক ব্যাপার। মিলনের ঘন সমারোহও বৈষ্ণব-কাব্যে খুব। ইংরেজী আমলের বাংলা সাহিত্যে যাঁরা শুধু প্রেম নিয়ে খণ্ডকাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিহারীলালের নাম করা হয়ে থাকে। ইংরেজ কবি-নায়কেরা যে ভাবে তাঁদের নায়িকাদের কাছে কাব্যে প্রেম নিবেদন ক'রে গেছেন, সেই ভাব বাঙালী কবি স্বচ্ছন্দে ছন্দায়িত ক'রে নতুন বাংলা কাব্যের সূচনা করলেন ; তারপর থেকে অনেক ইংরেজী নাম আমাদের কর্ণগোচর হ'ল, যথা—ক্লাসিসিজ্‌ম, রোম্যান্টিসিজ্‌ম, লিরিসিজ্‌ম প্রভৃতি। আমার তো মনে হয়, বেশ ভাল ক'রে প্রেমনিবেদন যিনি তাঁর কাব্যে যত করতে পারলেন, তিনি তত বড় গীতিকবি। এ প্রসঙ্গে কবি অক্ষয়কুমারের নাম না ক'রে থাকতে পারলাম না। বাঙালী-ঘরের গৃহস্থালীর মধ্যে নির্ব্বাককুণ্ঠিতা নিঃশব্দচারিণী বঙ্গবধূর রূপ তাঁর কাব্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ইংরেজ আমলের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আমরা এই যথার্থ বাঙালী কবিকে প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। প্রাচীন সংস্কৃত কবি ভবভূতির কাব্য প'ড়ে আমরা যে আনন্দ পাই, প্রেমের যে কল্যাণময় স্নিগ্ধ রূপ আমাদের কল্পনাকে রূপায়িত করে, অক্ষয়কুমারের কবিতায় আমরা তার দেখা পাই আর আনন্দিত হই।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা কবিতা এখন অনেক সমৃদ্ধ। নতুন বাংলা যাঁরা রচনা করেছেন ধীরে ধীরে, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। তাঁর কাব্য একটা নতুন জাতি গ'ড়ে তুলছে এবং তুলবে। শুধু প্রেমই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নয়, যেখানে তাঁর কাব্যে প্রেম, সেখানে এসেছে প্রকৃতি তার বিচিত্র ঐশ্বর্য্য নিয়ে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতা নব নব রূপ পরিগ্রহ করছে, আদর্শ নায়ক এবং আদর্শ নায়িকার বিচিত্র বেদনা তাঁর কাব্যে যেমন সহজে সঞ্চারিত হয়, এমন সচরাচর দেখি না। বাংলা দেশ এবং বাঙালী জাতি যে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার যাত্রী, সেই দেশ এবং সেই জাতির যে নবযুগ সূচিত হচ্ছে, তার প্রেমের ভাষা যে কি হবে, উদ্ধৃতাংশ পড়লে তার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাবে—

"বোলো তারে বোলো
এতদিনে তারে দেখা হ'লো।
তখন বর্ষণ-শেষে ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল-মোরের থোলো।

বনের মন্দির মাঝে তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল ব'য়ে যায়, নম্র হ'ল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।
দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে লিখিছে আকাশপাতে
এ দেখার আশ্বাস-অক্ষর।

অস্তিত্বের পারে পারে এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে।"

অথবা-

"উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান দুর্গম পথমাঝে
দুর্দ্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই ত পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি॥"

এ দুঃসাহসী যৌবনের গান—যে অক্ষুণ্ণ সাহস এবং শৌর্য্য মানবত্বের ভিত্তিমূলে, এর মধ্যে আমরা তারই দেখা পাই। বাংলার যাঁরা নতুন মানুষ, চিন্তাশীল এবং কর্ম্মী, রবীন্দ্র-কবিতা তাঁদের অনেক শান্তি ও সান্ত্বনার বস্তু।

প্রেমের স্থূল নগ্ন রূপ থেকে জীবনের কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষাক্ষেত্রে প্রেমের মুক্তি-মন্ত্র আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে পেয়েছি। তারও পরে জাতির জীবন প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সমস্যা থেকে যখন উত্তীর্ণ হয়ে নতুনতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, তখনকার প্রেম-মন্ত্র শোনাবার মত কবি নিশ্চয়ই আসবেন। আশ্বাসের কথা এই যে, প্রিয়াদের কটাক্ষ একই রকম থাকবে—তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তখন প্রিয়া কিরূপে কাব্যে দেখা দেবেন, তা আজকের দিনের দ্বন্দ্ব-সমস্যার মাঝখান থেকে বলা কঠিন।

## গ্রন্থ-পরিচয়

### পাশ্চাত্য ভ্রমণ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ১৵+১৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ ]

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ষোল-সতরো, রীতিমত ইংরেজী শিক্ষার ওজুহাতে "সিভিল সার্ভিসের রঙ্গভূমিতে বিলিতি কায়দার নেপথ্যবিধানে"র জন্য তাঁহার বিলাত-নির্ব্বাসন ধার্য্য হইয়াছিল। সেখানকার আদব-কায়দা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি দীর্ঘ পত্র রচনা করিয়া তিনি স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন; ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় পর্য্যন্ত পত্রগুলি 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিতবাদী সংস্করণ 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় ভাগেও এই পত্রগুলি স্থান পাইয়াছিল। 'পাশ্চাত্য ভ্রমণে' স্থান পাইবার পূর্ব্বে এগুলির আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই।

স্বদেশ এবং বিদেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যৌবনসুলভ উগ্রতার আতিশয্যে এই পত্রগুলিতে নানাবিধ ঝাঁঝালো মন্তব্য করিয়াছিলেন; অপরিসীম ভ্রাতৃস্নেহ সত্ত্বেও 'ভারতী'-সম্পাদক সেগুলি বরদাস্ত করিতে না পারিয়া পাদটীকায় কঠোর মন্তব্য যোজনা করিয়াছিলেন, কিশোর রবীন্দ্রনাথও সে সব বিরুদ্ধ মন্তব্য শান্তভাবে সহ্য করেন নাই, পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সেই ঔদ্ধত্য ও চাপল্যের ইতিহাস বর্ত্তমান সংস্করণ হইতে বাদ পড়িয়াছে। তাহাতে মূলের ঐতিহাসিক মূল্য কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইলেও সাহিত্যিক মর্য্যাদা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে এই পুস্তকখানির সম্পর্ক দীর্ঘ ষাট বৎসর পরেও অচ্ছেদ্য হইয়া আছে। চলতি ভাষার প্রয়োগের ইহাই তাঁহার প্রথম প্রয়াস এবং আশ্চর্য্যরকম সক্ষম প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য-জীবনের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে একটা অসামঞ্জস্য এই দেখা যায় যে, কাব্যে ও কবিতায় হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করিয়া টলিতে টলিতে এবং হোঁচট খাইতে খাইতে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন; 'বনফুল' হইতে 'কবিকাহিনী', 'কবিকাহিনী' হইতে 'ভগ্নহৃদয়', 'ভগ্নহৃদয়' হইতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'প্রভাতসঙ্গীত'—এই টালমাটাল খাইতে খাইতে সামলাইয়া লওয়ার ইতিহাস। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সমগ্র অতীতকে তিনি নিজের জীবনে যেন পুরাতন পাঠের মত আওড়াইয়া লইতেছিলেন—কোনও একজন কবি বা নির্দ্দিষ্ট একটা স্থানকে উৎসস্বরূপ মানিয়া লইয়া সেখান হইতেই নিজের যাত্রা সুরু করিতে পারেন নাই। ইতিহাসের সমস্ত দুর্ভোগটাই তাঁহার একার জীবনে ঘটিয়াছে, তবে তিনি 'সোনার তরী'তে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য সূত্রপাত হইতেই সক্ষম ও সবল—ঈশ্বরচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার উপর তাহার ভিত্তিমূলকে স্বীকার করিয়াই তাঁহার যাত্রা। তাঁহার প্রায় আদিমতম গদ্য-রচনা "মেঘনাদবধকাব্য সমালোচনা" ও 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'—বাংলা গদ্যের সাধু এবং চলিত দুই পদ্ধতির দুইটি অপূর্ব্ব নিদর্শন। এই কারণেই 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র সাহিত্যিক মূল্য বরাবর বজায় থাকিবে।

'পাশ্চাত্য ভ্রমণে' 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র সহিত তাঁহার 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'টিও সংযুক্ত হইয়াছে। এই ডায়ারি প্রথমে দুই খণ্ডে বাহির হয়। প্রথম খণ্ডটি ১৬ই বৈশাখ ১২৯৮ তারিখে চৈতন্য লাইব্রেরির এক অধিবেশনে পঠিত হইয়া ঐ মাসেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ হইতে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'সাধনা'য় বাহির হইয়া ১৩০০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। পরে ইহা 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

য়ুরোপ-প্রবাস এবং য়ুরোপ-যাত্রার এই পত্র ও ডায়ারি একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় সাধারণ পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন ; সতরো বৎসরের রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিশ বৎসরের রবীন্দ্রনাথের বাচন ও বর্ণন-ভঙ্গির অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও পরিণতি লক্ষ্য করিবার মত। যে ভঙ্গি তিনি পরবর্ত্তীকালে 'জাপানযাত্রী' (১৩২৬), 'যাত্রী' (১৩৩৬), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৩৩৮) এবং 'জাপানে ও পারস্যে' (১৩৪৩) প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনীতে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত কাজে লাগাইয়াছেন, মাত্র সতরো বৎসর বয়সে তিনি যে তাহার ব্যবহারে কম ওস্তাদ ছিলেন না, 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' পাঠে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন—

> "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্চে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি-ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হোলো প্রায় ষাট। সেক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি-ভাষার সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

ইতিহাসের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের ভুল ( 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র পূর্ব্বে চলতি ভাষায় লিখিত অন্তত এক ডজন পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল ) সত্ত্বেও যুগের হিসাবে এই পুস্তকখানি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

## আর্য্যপ্রভা—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন

[ ৩৪, সরকার লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪।০ ]

প্রতি দশম বাৎসরিক আদমসুমারির বিবরণী-বহিতে ভারতবর্ষে যাহারা হিন্দু নামে উল্লিখিত হয়, তাহাদের বৈশিষ্ট্যের গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক ও গুণিতক কষিয়া অঙ্কফল নির্দ্ধারণের চেষ্টা কেহ করিয়াছেন কি না জানি না ; আমাদের বিশ্বাস, সংখ্যা দুইটি সুক্ষ্মতায় ও বিশালতায় সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন এখন পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। দ্বাপরের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে কলির মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বহু সংস্কারক হরিজনকে প্রাধান্য দিয়া আর্য্য ও আর্য্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনে নানা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু আর্য্যপ্রভা সমান দীপ্তি-সম্পন্ন আছে, বেদের ধর্ম্ম এখনও একটুও টাল খায় নাই। টাল খায় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ ও মাধ্ব, শঙ্কর ও রামানুজ, নাথপন্থী ও বৈষ্ণব, সুফি ও সহজিয়া এবং চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে মূল ধাতুর রূপান্তর ঘটিয়াছে। বেদকে মূল ধরিয়া বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ তন্ত্রের প্রভাবে তাহার বর্ত্তমান পরিণতির ইতিহাস, মায় আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ধর্ম্মের প্রসার পর্য্যন্ত 'আর্য্যপ্রভা'য় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ কৌতূহলোদ্রেকারী ইতিহাস বাংলা ভাষায় আর রচিত হয় নাই।

'আর্য্যপ্রভা' সাতষট্টি অধ্যায়ে বিভক্ত—বেদ, বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাণ ( ইতিহাস ), সাধনকাণ্ড, শিল্প, তন্ত্র, জাতি ও সমাজ, সভ্যতা, পারিবারিক জীবন—বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়। গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতের হিন্দুদর্শনবিষয়ক ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া বেদ ও ঐতিহ্যগ্রাহ্য মতের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তায় চিত্তশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয়তা জাগতিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে কি ভাবে ধীরে ধীরে অনুভূত হইল ; মন্ত্র, যজ্ঞ ও তন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সাধনপ্রণালী কি ভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল ; কি ভাবেই বা ক্ষেত্রবিশেষে সাধনের নামে অভিচার ও ব্যভিচার প্রকাশ পাইল এবং ফলে গুরুকরণের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইল, নানা তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। সাধারণের উপযোগী করিয়া এই সকল দুরূহ তথ্য প্রকাশ করিয়া তিনি হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গীতার ধর্ম্মের এমন স্পষ্ট ব্যাখ্যান আমরা আর পড়ি নাই। এই পুস্তকটি প্রচারিত হইলে সাধারণের ধর্ম্মবিষয়ক বহু অজ্ঞতা দূর হইবে।

## দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্ড—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত

[ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ৫৲+ ৭৭০ – ৩২৮ পৃষ্ঠা ]

১৩১৬ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক বাঁকুড়া জিলার কাঁকিল্যা গ্রামে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বেও একাধিক পণ্ডিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের একত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীদাস-সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠে। সহজিয়া চণ্ডীদাস ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র বড়ু চণ্ডীদাসকে একই ব্যক্তি কল্পনা করা অতিশয় কল্পনাপরায়ণ জনেরও কষ্টসাধ্য হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত ( ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন—

"তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন ? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন ? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা তো হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল ; আর একজন নকল ? কে আসল কে নকল ?"

আসলে চণ্ডীদাস-সমস্যার ইহাই সূত্রপাত। নানা বাদবিতণ্ডার মধ্যে এই সমস্যা যখন ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং কথা-কাটাকাটি প্রায় হাতাহাতিতে পর্য্যবসিত হইবার উপক্রম ঘটে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার গবেষণাগার হইতে বহুদিনের বহু সাধনার ফলে মণীন্দ্রবাবু তখন সুনিশ্চিতরূপে চৈতন্য-পরবর্ত্তী দীন চণ্ডীদাসকে আবিষ্কার করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও তাঁহার রচিত পদাবলী লইয়া আসরে অবতীর্ণ হন ; ফলে অনেক সংশয় কাটিয়া যায় এবং মূল সমস্যার অংশত সমাধান ঘটে। মণীন্দ্রবাবুর দুর্দ্দিনের এই দান পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মণীন্দ্রবাবুর 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র দুই খণ্ডের ভূমিকা পাঠ করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি, তিনি নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রিয় সাধক, নিজ অভিজ্ঞতার ফলে যাহা আয়ত্ত করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অকারণ কল্পনার সাহায্য লইয়া থিওরির প্যাঁচ কষিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত করা তাঁহার স্বভাব নহে। এই কারণে তাঁহার অতি-প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ মন্তব্যের সর্ব্বত্র সমর্থন করিতে না পারিয়াও আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। আমরা তাঁহার মালমশলা লইয়া সহজেই নিজ নিজ সংশয় ও বিশ্বাস অনুযায়ী স্ব স্ব ধারণা গড়িয়া তুলিতে পারি, মণীন্দ্রবাবুর কল্পনা-বিবর্জ্জিত উপাদন সেদিক দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ( ৪২২-৪৪৪ সংখ্যক পদ ) মাথুর ( ৪৪৫-৫১১ ), গৌনরাস ( ৫১২-৫১৮ ), বিভিন্ন বেশে মিলন ( ৫১৯-৫৩৮ ), মহারাস ( ৬৩৯-৬২৬ ), রাসলীলা ( ৬২৭-৬৭৫ ), পূর্ব্বরাগ ( ৬৭৬-৭৫২ ), যুগল-মধুররস ( ৭৫৩-৭৫৭ ), আক্ষেপ ( ৭৫৮-৮৯৬ ), যুগল-মধুররস ( ৮৯৭-৯৬৪ ), এবং পরিশিষ্ট ( ২৯ ) মোট ৫৪৮টি পদ আছে। প্রত্যেকটি পদের পাঠ-নির্ণয় এবং অর্থ-নির্ণয়ে মণীন্দ্রবাবু যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠান্তর ও টীকা দৃষ্টে তাহা উপলব্ধি হইবে।

আমরা তৃতীয় খণ্ডে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত সটীক সহজিয়া পদগুলি দেখিবার জন্য উন্মুখ রহিলাম। প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। যে সকল রসমধুর পদ আমরা এতকাল প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা জানিয়া এই ভাবিয়া পুলকিত হইতাম যে, চৈতন্যদেব পদগুলির আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন, মণীন্দ্রবাবু তাহার অধিকাংশকেই চৈতন্য-পরবর্ত্তী দীন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে হরেকৃষ্ণবাবু ও সুনীতিবাবুর মত সম্পূর্ণ পৃথক ; অতিরিক্ত উৎসাহের বশে এক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইয়াছে।

## বুদ্‌বুদ—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

[ প্রকাশক—শ্রীঅভিজিৎ হালদার, বাদশাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ৫১ পৃষ্ঠা, দাম ৵৹ ]

'বুদ্‌বুদ' রুবাই-ঢঙে ( মিলের দিক দিয়া নয় ) কয়েকটি কবিতা-কণিকার সমষ্টি ; আগাগোড়া একটা নকল ওমর-খায়েমী সুর বর্ত্তমান ; আসল এত পচিয়াছে যে, নকল বিশেষণটি প্রশংসার্থে ব্যবহার করিলাম।

আসলই হউক, নকলই হউক, কণিকাগুলি কবিতা.

হইয়াছে; বুদ্বুদ আখ্যা দিয়া ফাটিয়া মিলাইয়া যাইবার যে শঙ্কিত বিনয় কবি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিচার আমাদের নয়। আমরা দেখিতেছি, বুদ্বুদের জলীয় আবরণে লেখকের মনের আকাশের বিচিত্র রঙ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা খুশি হইয়াছি।

## জীবন ও রাত্রি—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

[ নালন্দা ইউনিভারসিটি প্রেস, কলিকাতা, ৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ ]

'জীবন ও রাত্রি'—আমি ও তোমরা, ভারতী, অরুন্ধতী, মহাকালী, বসুন্ধরা, স্বপ্ন ও মৃত্যু প্রভৃতি তেইশটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন খণ্ডকবিতার সমষ্টি—সুরের ঐক্যে একটি অখণ্ড কাব্য রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রগতি-সাহিত্যের যুগে কবিকে অত্যধিক ভাবপ্রবণ, সুতরাং অনাধুনিক বলিতেই হইবে। কবিতাগুলিকে নিছক কবিতা ছাড়া আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন হইল না বলিয়া কবির প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তিনি বয়সে নবীন, তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করিব। সহজ এবং স্পষ্টকে কঠিন এবং জটিল করিয়া তুলিবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষিত হইল, কবিকে সে সম্বন্ধে সচেতন হইতে অনুরোধ করি

"সাগরের ঢেউ গণি' বালুচরে শুয়ে গণি'
লাখো লাখো সাগরের ঢেউ,
কাল-পারাবার সে যে কলকল গান গায়
সে গান শোনেনি আজো কেউ;
শূন্য গগনবুকে না বলা কত না দুখে
যাতনার ছবি আঁকে জগৎ মলিন মুখে
ব্যর্থ প্রয়াসে তাই ভাবি মনে কিছু নাই
শুধু আছে সাগরের ঢেউ।"

চমৎকার!

স.

## রাণুর দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ২১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০]

দশটি গল্পের সঙ্কলন-পুস্তক। শুনিতে পাই, বাজারে গল্পের বইয়ের চাহিদা নাই। তাই এ ধরণের গল্পসংগ্রহে সূচীপত্র না দিয়া বেমালুম উপন্যাস বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই বইখানিতে এরূপ কপটবৃত্তি নাই; লেখক ও প্রকাশক ইহাকে গল্পের বই বলিয়াই চালাইবার সাহস রাখেন।

কিন্তু ইহা দুঃসাহস নহে। এতদিন পরে গল্পলেখক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বাংলার পাঠক-গোষ্ঠী ইহার গল্পের জন্য যে কিরূপ লালায়িত হইয়া থাকেন, তাহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আমাদেরও আছে। দুঃখ-ধান্দায় ভরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে এত অনাবিল আনন্দ-রস জমিয়া আছে, তাহা এমন করিয়া কে ফুটাইয়াছে! ঝরঝরে হালকা ভাষা রুচির শালীনতা এবং মধুর বাৎসল্য-রস গল্পগুলিকে অভিনবতা দান করিয়াছে, তাই এগুলি বারম্বার পড়িতে ইচ্ছা হয়।

এগুলি মাসিকপত্রে পড়িয়াছি, আবার পড়িবার লোভ হইত, পুরাতন কাগজের বিস্মৃত জঠর হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। আজ এতদিন পরে গল্পগুলির পরিপাটি শোভন সংস্করণ দেখিয়া চিত্ত প্রসন্ন হইল। পাঠক-সমাজে যে পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমনোজ বসু

[ এই সংখ্যায় প্রকাশিত "অদৃশ্য কীটাণুর বিচিত্র কাহিনী"-প্রবন্ধটির লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ]
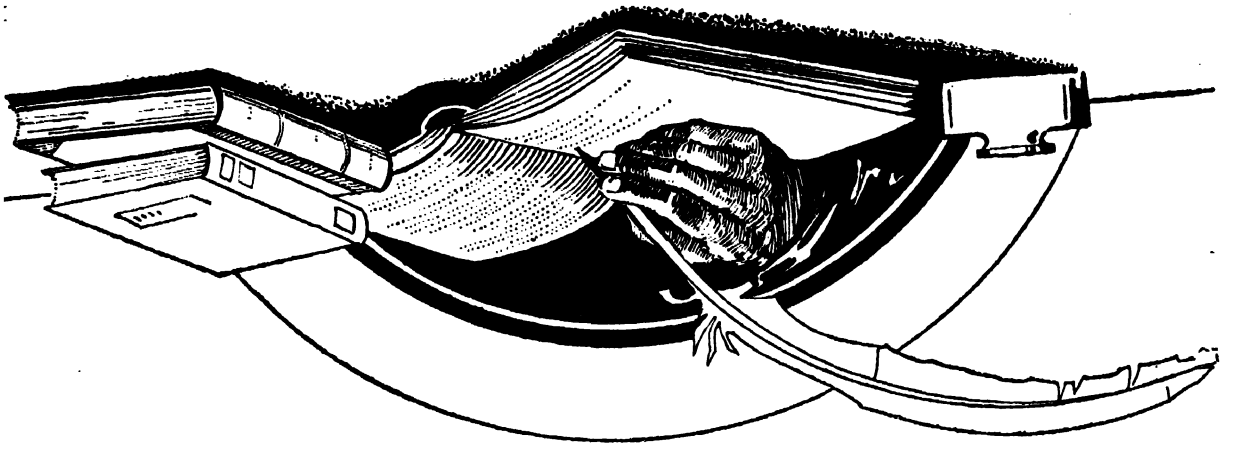
# সম্পাদকীয়

## আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

গত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার ভোরে বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ হইয়াছিল। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছিলেন, কেবলমাত্র ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক-সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নিখিল-বিশ্ব ধর্ম্ম সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য একবার তাঁহাকে সাধারণ জনসভায় দেখা গিয়াছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে আত্মজীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে একজন ঋষিকল্প সাধক-জীবনের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব। সাময়িক-পত্রাদির মারফৎ আমরা সচরাচর তাঁহার জীবনের যতটুকু পরিচয় পাই, তাহা খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের উকিল মহেন্দ্রলাল শীলের দ্বিতীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের ফার্স্ট আর্ট্‌স ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৮৩ সালে প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ বি. এ. পাস করেন। কলেজ-জীবনে তিনি উইলিয়ম হাচেটের প্রিয় ছাত্র ও নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দর্শনশাস্ত্রের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা সিটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা সুরু করেন; পরে পরে নাগপুর মরিস কলেজ, বহরমপুর কলেজ ও কুচবিহার কলেজের শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৯১৩ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাচার্য্য থাকিয়া ১৯১৭ সালেই মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হইয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি নাইটহুড প্রাপ্ত হন। জ্ঞান-আহরণের উদ্দেশ্যে ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য তিনি কয়েকবার ইউরোপ গিয়াছিলেন; ১৯২২-২৩ সালে মহীশূর রাজ্যশাসন-সংস্কার-সমিতির সভাপতিরূপে তিনি রাজতন্ত্র-জ্ঞানেরও প্রভূত পরিচয় দিয়াছিলেন।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ জ্ঞানের এমন উচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিলেন যে, বাংলা দেশের জনসাধারণ নিতান্ত নাম-পরিচয় ছাড়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কখনই পায় নাই; তাঁহার রচিত পুস্তক সংখ্যায় খুব কম এবং সেগুলির প্রচার এদেশে সামান্য; ভাব ও ভাষার জটিলতা ভেদ করিয়া সাধারণে তাঁহার মনোরাজ্যে ক্বচিৎ প্রবেশলাভ করিয়াছে, ফলে লোকশিক্ষকের খ্যাতি তাঁহার হয় নাই। আসলে তিনি ছিলেন দার্শনিকের দার্শনিক, চিন্তানায়কদের চিন্তার উৎস। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি যে সকল মনীষী তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার ভাবধারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং আজিও অনেকে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের নিকট আহৃত জ্ঞান সাধারণ্যে বিতরণ করিয়া যশস্বী হইতেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের এই পরিচয় হয়তো উত্তরকাল

পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক আমরা, তাঁহার বিপুল আত্মমুখী জ্ঞান বিংশ শতাব্দীর বাংলার সংস্কৃতি বিস্তার কার্য্যে যে পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে, আভাসে-ইঙ্গিতেও তাহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। সুখের বিষয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু মনীষীই কাগজে-কলমে এই সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

## চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর, শনিবার দ্বিপ্রহরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে একজন অক্লান্তকর্ম্মী সাধকের বিয়োগ ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ হইয়াছিল।

দুই তিন মাস পূর্ব্বের 'প্রবাসী' পত্রিকায় চারুচন্দ্র-লিখিত "বঙ্কিম-স্মৃতিকথা" হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছিল; তিনি এই বুদ্ধির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। শিশুসাহিত্য-রচয়িতা, ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক, পুরাতন প্রসিদ্ধ পুস্তকের অনুবাদক ও সম্পাদক, প্রাচীন সাহিত্যের গবেষক, পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচক ইত্যাদি বহু মূর্ত্তিতেই আমরা তাঁহার সাহিত্যিক প্রকাশ দেখিতে পাই; অনেক ক্ষেত্রে তিনি যশস্বীও হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, সাহিত্যিক জার্নালিস্ট হিসাবে তিনি বাংলা দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সাময়িকপত্র পরিচালনায় পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তি পাইত। কোনও বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি না করিয়াও তাঁহার জ্ঞান ছিল চৌকস; তাঁহার লেখনী ছিল ক্ষিপ্র; সাধারণের উপযোগী করিয়া যে কোনও বিষয় তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন। তথাকথিত 'ভারতী-সম্প্রদায়ে'র যাহা বিশেষত্ব—রচনা-কৌশলে অনুবাদকে মূলের গৌরবপ্রদান করা—তাহা তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। বৈদেশিক যে কোনও উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতাকে তিনি অনায়াসে খাঁটি বাংলা মূর্ত্তি দিতে পারিতেন। অনেকগুলি অনুবাদ-পুস্তক বাংলা ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ দখলের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান আছে।

তাঁহার সক্ষম-সম্পাদনকালে 'প্রবাসী' পত্রিকা যে সাহিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহার সহিত সম্পর্ক-রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে গৌরবের অনেকখানি লাঘব ঘটিয়াছিল, সাহিত্যিক মাত্রেই এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। সাহিত্য-বুদ্ধির অভাবে তাঁহার সংবাদপত্র-পরিচালনের কৃতিত্ব নীরসতায় পর্য্যবসিত হয় নাই।

কর্ম্মভারক্লিষ্ট অনবসর জীবনকে তিনি যখন প্রায় সাহিত্যমুখী করিয়া আনিয়াছিলেন, ঠিক তখনই তাঁহার জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এ ক্ষতি অল্প নয়।

## পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষা

যে কোনও কারণেই হউক, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত হইয়াছিল; তাহার ফলে চাকুরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সেদিন পর্য্যন্তও বাঙালী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রধান ছিল; হয়তো এখনও আছে, কিন্তু বেশিদিন যে আর তাহার প্রাধান্য থাকিবে না, তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। চাকুরিগত উপার্জ্জনে কয়েক সহস্র মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী প্রতিপত্তি লাভ করিলেও বৃহৎ বাঙালী সমাজ চিরাচরিত কৃষি ও প্রাদেশিক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দৌলতে শিক্ষিত বাঙালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগ্রত হওয়াতে তাহারা মূল বাঙালী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর গৌরব অর্জ্জন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। সমতল নিম্নভূমি হইতে ঊর্দ্ধে স্থান পাইয়া যে আকাশকুসুম কিছুকাল নয়নমনোহর হইয়া বিরাজ করিতেছিল, মাটির স্পর্শব্যতিরেকে তাহা যে শুকাইয়া ম্লান হইয়া যাইতে পারে, এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা অন্তত কুসুমের মনে হয় নাই; হইলে, চটক-ভাঙার এই আর্ত্তনাদ শোনা যাইত না।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-সাধনায় মধ্যবিত্ত বাঙালী একটা বড় লাভ করিয়াছিল—তাহা তাহার শিল্প ও সাহিত্য। এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় অবলম্বনহীন আকাশলোকে অবস্থিত হইয়াও সে এই শিল্প ও সাহিত্যের সাহায্যে অদৃশ্যলোক

হইতে প্রাণশক্তি আহরণ ও সঞ্চয় করিতেছিল, আসন্ন মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রাণশক্তিই যে তাহাকে সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহা অনুভব করিয়া মধ্যবিত্ত বাঙালী এক দিকে যেমন আশ্বস্ত হইতেছে, অন্য দিকে তেমনই অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বাণিজ্য-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে আয়ত্ত করিয়া শ্রমিক-সভ্যতার সমতলক্ষেত্রে বুদ্ধিবলে প্রধান হইয়া উঠিবার প্রাণপণ প্রয়াসে দুর্ব্বল বাঙালীচিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে বাঙালী কখনও সমগ্র পৃথিবীর, কখনও নিখিল-ভারতের দুর্গতদের সহিত একাত্মীয়তা-কল্পনার গৌরব, আবার কখনও প্রাদেশিক বাঙালী-মনোবৃত্তি লইয়া দৃঢ়ভাবে ঘর বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে। বৃহৎ বাঙালী সমাজ যেমন তেমনই আছে; উদ্বেগ ও আশঙ্কাকুল চিত্ত লইয়া মুখপাত্র মধ্যবিত্ত বাঙালী কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে ঢলিয়া পড়িতেছে। গত কয়েকদিন ধরিয়া বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, যে সকল বিচিত্র সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইয়া গেল, তাহার বিবরণীর মধ্যে আমরা বাঙালীমনের এই অতি-আধুনিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাইলাম।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা নূতন পাঠ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাল্‌চারাল ইউনিটি বা সংস্কৃতিগত বিশ্ব-প্রাণতা কবে বাতিল হইয়া গিয়াছে; খণ্ড খণ্ড ভাবে দেশ এবং জাতির বৈশিষ্ট্যই এখন প্রধান হইয়া উঠিতেছে। হিট্‌লারী স্বস্তিক-চিহ্ন এই প্রাদেশিকতার ভীতিপ্রদ প্রতীকরূপে সমস্ত বিশ্ব-সংস্কৃতির ঊর্দ্ধে জ্বলজ্বল করিতেছে; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত ইংরেজী সভ্যতার বিশ্বপ্রেম-শিক্ষা আর বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত রাখিতে পারিতেছে না; পশ্চিম ভারতের রাষ্ট্রচিন্তা, ভাষা ও বাণিজ্যের চাপ ইংরেজ-বাঙালীকে হিট্‌লারী করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে।

## ভাষাগত প্রদেশ গঠন

সুতরাং বাঙালী ভাষাগত প্রদেশ গঠনের দাবি করিতেছে। এই দাবিতে আসামের সিলেট শিলচর অঞ্চল এবং বিহারে মানভূম, সিংহভূম, ছোটনাগপুর ও পূর্ণিয়ার অধিকাংশ বাংলা দেশের সামিল হওয়া চাই। আর্য্য জার্মান রক্তের দোহাই পাড়িয়া হের হিট্‌লার ইউরোপে যে নূতন সভ্যতার জন্ম দিয়াছেন, তাহার প্রভাব যদি শেষ পর্য্যন্ত বাঙালীকে সংহত করিয়া নূতন শক্তি দান করে, তাহা হইলে বাঙালী আর একবার ভারত-বিজয়ে অভিযান করিতে পারে, কিন্তু সেই সংহতির ফলে ইহুদী-আর্য্য সমস্যার মত বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মর্ম্মান্তিক সমাধান সম্ভব হইবে কি না, তাহা ভাবিতে ভরসা হয় না। হিন্দু অথবা মুসলমান—ধর্ম্ম যাহাই হউক—বাঙালী প্রধান হইয়া উঠুক, বর্ত্তমানের কোনও বাঙালী এমন লোভনীয় চিন্তার বশীভূত হইতে পারে কি? সুতরাং এক ধর্ম্মের বাধায় বাঙালীর বাধিতেছে; ইউরোপের নবতন শিক্ষা বাংলা দেশের পক্ষে এইবার বিফল হইবে।

## প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

বাঙালীর আত্মপ্রসাদ লাভের এখনও শেষ উপকরণ—সাহিত্য ও শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের শিষ্য-প্রশিষ্য-সম্প্রদায় এবং ইঁহাদের প্রভাববর্জ্জিত দুই চারিজন বাঙালী শিল্পী আজিও ভারতের সর্ব্বত্র চারুশিল্প ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন; দক্ষিণ ভারতে দেবীপ্রসাদ, উত্তর ভারতে সমরেন্দ্র, হিরণ্ময়, ললিতমোহন, বীরেশ্বর, অসিতকুমার প্রভৃতি বাঙালীর শিল্প-গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রভাব ভারতের অন্য কোনও প্রদেশ এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং ঘরে বাহিরে বাঙালী এই শিল্প ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া মিলিত হইবার প্রয়াস এখনও করিতেছে। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন এই মিলন-বাসনার আশাপ্রদ বাৎসরিক প্রকাশ।

এবারে বড়দিনের ছুটিতে কামরূপ-গৌহাটীতে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সাহিত্যাম্মন্য বাঙালীরা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া দারুণ শীতের মধ্যেও যে আশাতীত রকম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, সংবাদপত্র মারফৎ তাঁহার পরিচয় পাইয়া ঘরে বসিয়াও আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। "বাঙ্গাল খেদা" স্থগিত রাখিয়া আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বড়দলই এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছেন, ইহাও কম আনন্দের কথা নয়।

সভানেত্রীত্ব করিয়াছেন প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করিয়াছেন প্রবীণ কালীচরণ সেন মহাশয়। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়, ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বৃহত্তর বঙ্গ ও শিল্পকলা বিভাগের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচন যে অপেক্ষাকৃত তরুণ-সম্প্রদায়ের মনোমত হয় নাই, একাধিক সাময়িকপত্রে তাহার পরিচয় পাইয়াছি; তাঁহারা নানা কারণে ক্ষোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই জাতীয় সাহিত্য-সম্মেলনকে "পিঁজরাপোল-সম্মেলন" আখ্যা দিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন। অনেকে এই বৎসরে প্রগতি-সাহিত্যের আশ্রয় পাইয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতিবিরোধী মন যে খুশি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

আমরা সম্মেলনের মূল ও বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেকে নূতন কথা বলিবার সৎসাহস দেখাইয়াছেন; অনেক মামুলি কথাও চিত্তাকর্ষক করিয়া বলা হইয়াছে। মোটের উপর, সব মিলিয়া এই সম্মেলন সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে।

## সাহিত্যের সংজ্ঞা

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী তাঁহার অভিভাষণে সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক সাহিত্যিকেরা তাহা মানিয়া লইবেন না। প্রগতি-সম্মেলনে তাঁহাদের মতবাদ আমরা শুনিয়াছি, সুতরাং প্রাচীন মতটাও শুনিতে দোষ নাই। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলিতেছেন—

> "সাহিত্য সমাজের নিছক প্রতিবিম্ব নয়, উহা সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। বাস্তবের সহিত কল্পনার মিলন যখন সুন্দর ও সুসমঞ্জস হয়, তখনই তাহা সুসাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়। সমসাময়িক সমাজের সুখদুঃখের ছবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা সাহিত্যিকের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও তাহাই তাহার চরম কর্ত্তব্য নহে। যাহা হয় নাই অথচ হইতে পারিত, যাহা হইলে ভাল হইত, যাহা পূর্ব্বে হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে হইতে পারে—এ সমস্তই সাহিত্যিকের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বহির্জ্জগতের নানা প্রতিকূলতার সংঘর্ষে যে সমস্ত কামনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যায়, সাহিত্যের কল্পলোকে কল্পনার মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে তাহারা যে কেবল নবজীবনই লাভ করে, তাহা নহে, একের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ দেশকালনিরপেক্ষ হইয়া শতসহস্রের হাসি-অশ্রুর অভিষেকে অমরত্ব লাভ করে। রুচিভেদে সমাজের মহত্তম এবং দীনতম কামনাও সাহিত্যে স্থান পায়। এক দেশের সমাজ অন্য দেশের সমাজের বিচারক হয়। ভবিষ্যতের সমাজ অতীতের সমাজকে বিচার করে। ফলে তাহার শিক্ষা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ অথবা ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিয়া থাকে। সাহিত্যিক যদি সমাজের প্রকৃতই হিতকামী হন তাহা, হইলে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভাষায় এবং ভাবে তাঁহার সংযত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নূতনত্বের নামে ঔদ্ধত্য, রুচিবিকৃতি এবং মুদ্রাদোষের প্রচলন করিয়া দিনকতক হাততালি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।··· সাহিত্যে যাহা মহত্তম সৃষ্টি, তাহা দেশকালজাতিধর্ম্ম-নিরপেক্ষ। এই সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক হউক অথবা ভাবতান্ত্রিক হউক, যদি একাধারে হিতকর এবং মনোহারী হয়, তবেই তাহা সার্থক।"

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বাঙালী সাহিত্যিকের প্রতি যে কয়টি অমূল্য উপদেশবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন, সাহিত্যের সংজ্ঞা-হিসাবে তাহাও কম মূল্যবান নয়। তিনি বলিয়াছেন—

> "আমি প্রগতিবিহীন প্রাচীনপন্থী।···জীবনের সায়াহ্নে, যখন পরপারের আহ্বান আমার কর্ণে আসিয়া পৌছিয়াছে, এই মহতী সভার সম্মুখে এই মুমূর্ষুর অন্তিমকথা দুই একটি নিবেদন করিব। কে একজন কবে একটি বড় কথা বলিয়াছেন, 'সাহিত্যের জন্ম হয় নির্জ্জনে, কিন্তু জন্মমাত্রই হয় জনতার দিকে তাহার স্বাভাবিক গতি!' কথাটি খুব খাঁটি। মানবচিত্তকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা সাহিত্যের অসাধারণ; এই ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে সমাজের অকল্যাণ অপরিহার্য্য। আমি আজ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের নিকট ঐকান্তিক নিবেদন করিতেছি, আপনারা যেন এই অকল্যাণের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করেন। বঙ্গজননীর প্রতিভাবান সন্তানগণ! অশীতিপর বৃদ্ধের এই শেষ নিবেদন। মনে রাখিবেন প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মধ্যে ভেদরেখা, নরনারীর মধ্যে প্রকৃতিভেদ, পাপপুণ্যের প্রভাব—এগুলি মানুষের কল্পিত স্বপ্নলোকের কথা নহে, এগুলি প্রাচীনদের কুসংস্কার নহে, ইহার পিছনে বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিত ও অভিপ্রায় বিদ্যমান। আপনারা দেখিবেন যেন সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজমন ভোগোন্মুখ হইয়া না উঠে; আর্টের মুখোস পরিয়া উচ্ছৃঙ্খলা যেন সমাজে আদৃত না হয়; অনুকরণ ও অনুবাদ যেন মৌলিকতার দাবি না করে; লালসা যেন প্রেমের স্থলাভিষিক্ত না হয়; পাপীর চরিত্র-অঙ্কনে পাপ যেন লোভনীয় না হয়; পুণ্যবান লাঞ্ছিত হইলেও, সেই লাঞ্ছনাই যেন সমাজের মুকুটরূপে শোভা পায়।"

## সাহিত্য ব্যাপারে আধুনিক মতও অতি-প্রাচীন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণে প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে, অধুনা আর্ট ফর আর্ট্‌স সেক অর্থাৎ নীতি-দুর্নীতি অথবা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ সাহিত্যের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, অতি প্রাচীন-কাল হইতেই এদেশে সে সকল যুক্তি প্রচলিত ছিল। এই সকল যুক্তির সমষ্টিগত তাৎপর্য্য এই—

> "রসসৃষ্টির জন্যই সাহিত্য। সেই রসের

আস্বাদনে যদি মানবের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, সামাজিক জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতার দাবানল জ্বলিয়া উঠে—তাহার জন্য কবির কোন দায়িত্ব নাই, মলয়-মারুত-হিল্লোলে, শারদীয় অমল-ধবল চন্দ্রিকায়, বসন্ত-কোকিলের কুহুধ্বনিতে, পাপিয়ার কল-কাকলীতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, রোগবিশেষাক্রান্ত কোন কোন হতভাগ্যের পীড়ার বৃদ্ধি হয় বলিয়া কেহ কি মলয়-মারুতকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে? কখনই নহে—তেমনি রসসৃষ্টিপরায়ণ কবি-ভারতী ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক চরিত্রের অপকর্ষ সাধন করিতে পারে বলিয়া কবির লেখনী-চালনাকে রুদ্ধ করা বা কবিকে দ্বীপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা—কখনও উচিত নহে। সম্ভবপরও নহে।"

কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় উভয় পক্ষের যাবতীয় যুক্তি বিশেষ সদ্বিবেচনার সহিত তৌল করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন—

"প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের রসবিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনৌচিত্য পরিহারের অনেক উপদেশ আছে, তাহার প্রতি ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য-সমালোচকগণের মধ্যে যে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল নহে, প্রত্যুত প্রতিকূল। বাঙ্গালা সাহিত্যই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনের অসাধারণ উপাদান, ইহার বিশুদ্ধি রক্ষার উপর আমাদের জাতীয় জীবনের বিশুদ্ধি ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইষ্টমন্ত্রের মত সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, ভুলিলে চলিবে না—ইহাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এবারের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন আসলে অপ্রগতিবাদীদেরই মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছিল। আসল সাহিত্য-সম্মেলন অর্থাৎ

## প্রগতি-সাহিত্য সম্মেলন

কলিকাতার আশুতোষ কলেজ হলে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সম্মেলনের দুই দিনের অধিবেশনে আমরা বিচিত্রনামা ও বিচিত্রধর্ম্মী বহু পণ্ডিতেরই বহু আত্মপ্রশস্তি ও পরনিন্দা-সূচক বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম, কিন্তু প্রগতি-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কেহ কেহ শেক্সপীয়র টেনিসন প্রভৃতি বৈদেশিক কবিকে এবং একজন রবীন্দ্রনাথকে মৃত ও বিস্মৃতদের দলে ফেলিয়া নূতন সম্প্রদায়ের জয়োচ্চারণ করিয়াছেন; বাংলা দেশের পাঠক সম্প্রদায় রীতিমত শিক্ষিত হইয়া উঠিলে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত মূল্যে তাঁহারা বিকাইবেন—এই আশ্বাসবাণীর মধ্যে অক্ষমের ক্ষোভ আছে, সক্ষমের স্পর্দ্ধা নাই। পীড়িত ও বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির রুগ্নশয্যার প্রলাপোক্তিকে প্রগতি-সাহিত্য লেবেল দিয়া যাঁহারা বাজারে ছাড়িতেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তাঁহাদের ক্ষমা করুন।

সাহিত্য মানব-মনের বর্ব্বরতা হইতে সংস্কৃতির, সত্য হইতে ত্রেতার, ত্রেতা হইতে দ্বাপরের, দ্বাপর হইতে কলির, অর্থাৎ যুগান্তরের ক্রমপরিণতি অথবা গতির ইতিহাস; স্বতন্ত্রভাবে প্রগতি-সাহিত্যে আমরা আস্থাবান নই। এবং দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ শাশ্বত সাহিত্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও যুগের প্রয়োজনে যে সাহিত্য দেশ কাল ও পাত্রের অপেক্ষা রাখে, অনুদার ও অনগ্রসর বিবেচিত হইবার ভয়েও সেই স্থানীয়তা ও কালীয়তা দোষদুষ্ট সাহিত্যের আমরা জয়-ঘোষণা করিয়া থাকি। বাংলা দেশে বর্ত্তমান কালে অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যে প্রাণের এবং স্বাস্থ্যের অভাব লক্ষিত হইতেছে। সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিবার একটা মারাত্মক, বাহ্য এবং আরোপিত প্রেরণায় রূপরসগন্ধস্পর্শহীন যে বস্তু প্রতিদিন সৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে মরশুমি ফুলের জৌলুসও নাই; সর্ব্বগ্রাসী সাম্যের দম্ভ আছে, দেহহীন কামের জয়-ঘোষণা আছে; সৃষ্টিকে বাদ দিয়া রসসৃষ্টির একটা লজ্জাকর প্রয়াস আছে।

এই অস্বাভাবিক অবস্থায় বাংলা দেশের অক্ষম সাহিত্যিক-সম্প্রদায় পৃথিবীর সাহিত্যিকমণ্ডলীর সহিত একটা কৌতুককর আত্মীয়তার দাবি করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন; হাত হইতে ফস্কাইয়া পড়া মাটির আম রসের আধিক্যকে ফাটিবার কারণ কল্পনা করিয়া ফাটার দুঃখ ভুলিতে চাহিতেছে। ব্যর্থ অনুকরণ আছে, কিন্তু প্রাণের বৈচিত্র্য নাই।

আশা করি, আগামী প্রগতি-সাহিত্য সম্মেলনে আমাদের এই ক্ষোভ আর থাকিবে না।

---

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত

# 'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষাণ্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষাণ্মাষিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষাণ্মাষিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

## বিজ্ঞাপনের হার

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ | ১ | পৃষ্ঠা | প্রতি মাসে | ২০৲ |
| ,, | ½ | ,, | ,, | ১১৲ |
| ,, | ¼ | ,, | ,, | ৬৲ |
| কভার | ৪র্থ | ,, | ,, | ৬০৲ |
| ,, | ২য় | ,, | ,, | ৫০৲ |
| ,, | ৩য় | ,, | ,, | ৪৫৲ |

( বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র )

**ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবশ্যক।**

৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

## ‘অলকা’র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে ‘অলকা’র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে ‘অলকা’ বাহির হইবে।

৩। ‘অলকা’র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষান্মাষিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষান্মাষিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। ‘অলকা’য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়মতভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

## বিজ্ঞাপনের হার

| সাধারণ | ১ | পৃষ্ঠা | প্রতি মাসে | ২০৲ |
|---|---|---|---|---|
| „ | ½ | „ | „ | ১১৲ |
| „ | ¼ | „ | „ | ৬৲ |
| কভার | ৪র্থ | „ | „ | ৬০৲ |
| „ | ২য় | „ | „ | ৫০৲ |
| „ | ৩য় | „ | „ | ৪৫৲ |

( বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র )

**ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।**

৭৭, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

## সূচী

মাঘ ১৩৪৫

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
তোর না আমার?
LILY BRAND BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
CALCUTTA
LILY BRAND
FINEST FOOD DRINK
গঠন করে
স্বাস্থ্যবান
হৃষ্টপুষ্ট
ছেলেপুলে
Manufactured By THE LILY BISCUIT Co CALCUTTA.
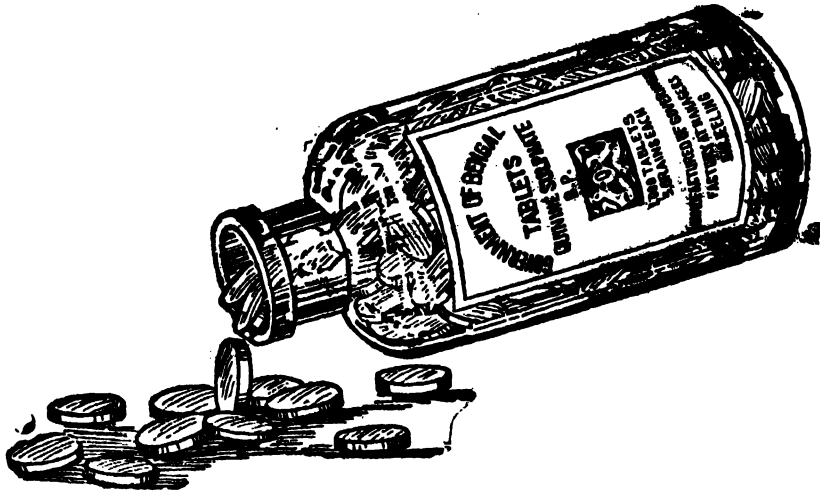
# MEGAPHONE RECORDS

নিউ থিয়েটার্সের নবতম বাণীচিত্র

"সাথী"র মনোমুগ্ধকর গানগুলি

শ্রীমতী কানন দেবী

| | | |
|---|---|---|
| J. N. G. 5310 | তোমারে হারাতে পারি না | 'সাথী' |
| | সোনার হরিণ আয় রে আয় | 'সাথী' |
| J. N. G. 5319 | রাখাল রাজা রে | 'সাথী' |
| | পায়ে চলার পথের কথা | 'সাথী' |

নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ডে শুনুন

মূল্য—২৸০ প্রত্যেকখানি

কলিকাতা

পুষি

শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়
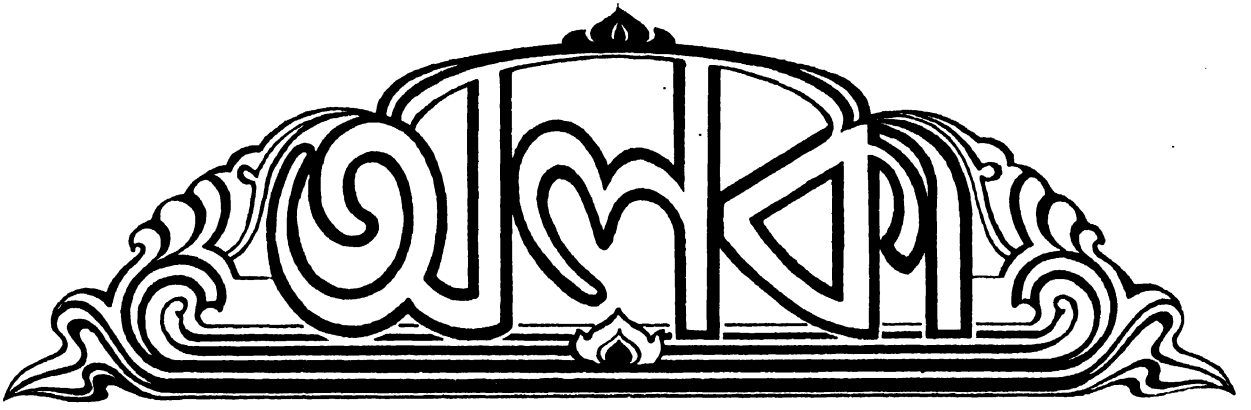
প্রথম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৫ | পঞ্চম সংখ্যা

# শিক্ষার অন্তরায়

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি। কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিলে সেই বস্তু বা বিষয়টিকে নিজের আয়ত্তে আনা যায় অথবা স্বীয় প্রয়োজন-মত ব্যবহার করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রবাদ সকল সময়ে সত্য বলিয়া মনে হয় না। কোনও ব্যক্তির কোনও কু-অভ্যাস হইয়া থাকিলে তাহার কুফল সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেও অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা হয়তো জন্মে না। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই জ্ঞান অনুযায়ী কার্য্য করিবার পথে কোনরূপ অন্তরায় বিদ্যমান আছে। এই অন্তরায় অপসারিত করিতে না পারিলে কার্য্য অগ্রসর হইবে না। সুতরাং তখন আমাদের কর্ত্তব্য হইবে, সেই অন্তরায়গুলি কি তাহা জানিবার চেষ্টা করা এবং কিরূপে সেগুলি দূরীভূত করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যাপারে এইরূপ একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হই নাই। কারণ ঐ জ্ঞান ও কার্য্যের মধ্যে বহুবিধ বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শিক্ষা সম্বন্ধে নানা গবেষণা অধুনা সকল দেশেই হইতেছে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। বলিতে কি, মনোবিদ্যার নূতন আবিষ্কারগুলি শিক্ষাজগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলগত ধারণাগুলি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। অন্যান্য অনেক দেশেই অনুকূল পরিবেষ্টনে শিক্ষাতত্ত্বের নূতন তথ্যগুলি কার্য্যে পরিণত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও তথ্যগুলি মনোবিজ্ঞানের ও ট্রেনিং-কলেজের পাঠঘরের চতুঃসীমানার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বহির্জগতে, বাস্তবকর্ম্মক্ষেত্রে, গৃহে বা বিদ্যালয়ে তাহাদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না, তাঁহার কারণ অবশ্য আছে। নূতন তথ্যের কার্য্যপ্রসূ হইবার পথে আমাদের দেশে অন্তরায় অনেক। সেইগুলির

নিরাকরণ করিতে না পারিলে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার সম্ভবপর নহে। নূতন কার্য্যের বাধা-বিঘ্ন সকল দেশেই থাকে। শিক্ষাদান কার্য্য সফল করিবার চেষ্টায় যে সকল অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতে হয়, সাধারণভাবে তাহাদের আলোচনা করা এবং আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া যে সকল বাধা বিদ্যমান আছে, সেইগুলির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

বাধাগুলি নানাভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। কতকগুলি বাধা ব্যক্তিগত, কতক পরিবারগত, কতকগুলি সমাজগত, ইত্যাদি। পৃথকভাবে এইগুলি বিবেচনা করিলে বক্তব্য সহজ হয়, কিন্তু ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এরূপ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ও পরস্পরনির্ভরশীল যে, বিচ্ছিন্ন আলোচনায় কিছু কৃত্রিমতা-দোষ আসিয়া পড়ে। এ দোষ অপরিহার্য্য হইলেও মারাত্মক নহে। সকল শাস্ত্র, সকল বিজ্ঞানকেই এই ত্রুটি স্বীকার করিয়া লইয়াই প্রথম অগ্রসর হইতে হয়। শেষে সামঞ্জস্য হইয়া যায়। সুতরাং এই অনিবার্য্য সঙ্কীর্ণতার কথা মনে রাখিয়া উপস্থিতক্ষেত্রে আমরাও পৃথক পৃথক ভাবে অন্তরায়গুলির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমতঃ—ব্যক্তিগত বাধা। যাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহার শারীরিক অবস্থা ও মানসিক গুণাগুণের উপরে যে বাধা নির্ভর করে, তাহাকেই আমি ব্যক্তিগত বাধা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। বর্ত্তমান যুগকে শিশুর যুগ বা the age of the child বলা হয়। শিক্ষাপ্রণালীর ইতিহাসের দিক হইতে বিচার করিলে এই বর্ণনার যথেষ্ট সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে যে বিষয় শিক্ষণীয় বলিয়া মনে হইত, সকল শিশুকেই সে বিষয়ে পারদর্শী করিবার চেষ্টা করা হইত। শিক্ষার ধারারও কোনরূপ বিভিন্নতা ছিল না, সকলের প্রতি এক নিয়ম প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা ছিল। সকলকেই যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় না, বা সকল শিশুর প্রতি যে এক শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যকরী হয় না, শিক্ষকেরা ক্রমে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। তখন হইতে এই ধারণার উৎপত্তি হইল যে, শিশুর শিক্ষার বিষয় ও ক্রমপরিণতি এবং তাহার মনের ক্রমবিকাশ, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অতীব প্রয়োজন, নচেৎ শিক্ষা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু শিশুমন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা তখন হয় নাই। সুতরাং বহু ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া সে যুগের শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতির সহিত এই সকল অপরীক্ষিত ধারণা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে এবং শিক্ষাপ্রণালীও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শিক্ষাবিষয়টি এখন শিশুমনের নবাবিষ্কৃত তথ্যগুলির উপর স্থাপিত হইয়া একটি বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য হইয়াছে। শিশুমন-স্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যথেষ্ট হয় বলিয়া এবং শৈশবের শিক্ষার উপরে ব্যক্তিমাত্রেরই চরিত্রের গঠন ও শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, এই সত্য নিঃসংশয়িতভাবে এই যুগে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া এই যুগকে শিশুর যুগ বলা হয়।

মানসিকতার বিকাশের নানা দিক ও স্তর। এক এক দিকে এবং এক এক স্তরে বিশেষ কোনও শিশুর মন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার পরিমাপ করিবার জন্য বহুবিধ মানদণ্ডের (mental test) সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল test-প্রয়োগে নির্ণীত হইয়াছে যে, শিক্ষার দ্বারা উন্নতি সকলের সম্ভবপর নয়। মানসিক বয়স হিসাবে কতকগুলি শিশুকে idiot-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠনও প্রায়ই অস্বাভাবিক ধরণের হইয়া থাকে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জীবনরক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যকীয়

কর্ম্মগুলি করিতেও এই শিশুরা শিক্ষা করে না। প্রাণনাশকারী কোন বিপদের সম্মুখীন হইলেও তাহারা নড়িয়া বসিয়া নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। Test-সমূহের সাহায্যে আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, নির্ব্বোধ বলিয়া যে সকল শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ হতাশ হই, তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতারও তারতম্য আছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইবার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। Imbecile এবং feeble-minded শিশুদিগের বিশেষ রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহাদের বুদ্ধির কথঞ্চিৎ প্রসার হওয়া খুবই সম্ভব। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, idiot-শ্রেণীভুক্ত হওয়া শিক্ষার একটি ব্যক্তিগত বাধা। কিন্তু idiot-শ্রেণীভুক্ত নয় অথচ চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না—এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক সময় দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে জানা যাইবে শিশুর শরীরগত কোনরূপ বাধা আছে। চক্ষু, কর্ণ, টন্‌সিল বা অন্য কোন অঙ্গের দোষ আছে। চিকিৎসা দ্বারা সেই দোষের অপনোদন করিলে সহজ ও সাধারণ ভাবে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। ভগবানের নিকট হইতে যখন আসে তখন সকল শিশুই দেবভাবাপন্ন থাকে, মানুষের হাতে পড়িয়া তাহারা নষ্ট হইয়া যায়, ইহা নিছক কবির কল্পনা। বাস্তবের সহিত ঐ কল্পনার কোনও সম্বন্ধ নাই। মনোবিজ্ঞান পরিষ্কারভাবে আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে যে, জন্মাবধিই ভিন্ন ভিন্ন শিশুর প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং একটি শিশুর প্রতি যে শিক্ষাবিধি প্রযোজ্য, অপরের পক্ষে তাহা নাও হইতে পারে। জোর করিয়া সকলের শিক্ষা একধারামত চালাইলে শিক্ষাপ্রণালীটিই অনেক শিশুর পক্ষে শিক্ষার বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। শিশুর রুগ্নাবস্থায়, শ্রান্ত অবস্থায়, কোনও কোনও বিশেষ ভাবের অবস্থায় তাহাকে শিক্ষাদানের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক শিশুর কোনও বিষয়-বিশেষ শিক্ষা করিবার বা কোনও বিশেষ কার্য্য করিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যদি ঐ বিষয় বা কার্য্য শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের হানিকর না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। নতুবা উৎসাহভঙ্গহেতু তাহাদের অভীপ্সিত বিষয়ও তাহারা শিক্ষা করিবে না, পরন্তু অন্য বিষয় শিক্ষা করিবার আগ্রহ ও চেষ্টাও তাহাদের নষ্ট হইয়া যাইবে।

শিক্ষার পারিবারিক বাধার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয়, শিশুর পিতামাতা ও তাহার পরিবারের অন্যান্য সকলের শিশুমনের বিকাশের ধারার সহিত পরিচয়ের একান্ত অভাব। অভিভাবকদিগের অজ্ঞতার জন্য কত শিশুর ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া যায়, সে বিষয়ে আমাদের ধারণাই নাই। শিশুর শিক্ষা যে তাহার জন্মের মুহূর্ত্ত হইতেই আরম্ভ হয়, একথা ভুলিয়া গিয়া আমাদের ব্যবহারের দ্বারায় প্রায়শই আমরা একটি অবাঞ্ছনীয় পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করি।

শিশুর বাল্যজীবনের উপর তাহার পিতামাতার প্রভাব যে কতদূর ও কিরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী, মনোসমীক্ষণের আবিষ্কর্ত্তা ফ্রয়েড তাহা দেখাইয়াছেন। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিমাত্রেরই চরিত্রের মূলসূত্রগুলি পাঁচ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়া যায়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু তাহার পিতামাতা ও পরিবারবর্গের মধ্যে বাস করে; সুতরাং পিতামাতার দায়িত্ব যে কত গভীর, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এই দায়িত্বজ্ঞান তাঁহাদের এখনও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। চিরাচরিত প্রথামত কখনও অযথা ভর্ৎসনা, কখনও অযথা আদর করিয়া পুত্রকন্যাকে স্কুলে পাঠাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন। স্কুলে শিক্ষকেরাও কোনও প্রকারে তাঁহাদের

নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে পারিলে কার্য্য শেষ হইল বিবেচনা করেন। পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের এই মনোভাব শিক্ষার একটি বিশেষ অন্তরায়।

কিরূপে এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করা যায়, এই বাধা দূর করা যায়, ইহাই এখন চিন্তার বিষয়। একটি উপায় হইতেছে—শিক্ষাবিষয়ক নূতন তথ্যগুলির সাধারণের মধ্যে বহুলপ্রচার। নানারূপ পরীক্ষালব্ধ নূতন জ্ঞান যদি শুধু কয়েকটি বিশেষজ্ঞের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়রূপেই বিরাজ করিতে থাকে, তাহাতে লাভ কি ? সেই জ্ঞানের উপকারিতা কি, যাহা কখনও কার্য্যে প্রকাশ পায় না ? জন-সাধারণের এবং সমাজের হিত-কল্পে বিশেষজ্ঞদিগের ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়—পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রভৃতি সকলকে সহজভাবে ও সরল ভাষায় শিক্ষার নূতন ধারা ও প্রণালীর বিষয় পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করা ও তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করা।

এইখানে আমি আধুনিক বাঙালী পরিবারের জীবনযাত্রার ধারা ও শিক্ষার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে চাই। আমাদের সমাজে বহুকাল যাবৎ যুক্তপরিবার-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। হয়তো পুরাকালে সকল দিক দিয়াই এই প্রথার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ছিল। এখনও এরূপ পরিবারে বাস করা যে কতক বিষয়ে, যেমন ব্যয়সঙ্কোচ বিষয়ে, অনেকেরই সুবিধাজনক, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যুক্তপরিবারের যে পরিণাম বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে, শিক্ষার দিক হইতে দেখিলে উহার আর অধিককাল অবস্থিতি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। আমি যেরূপ ধারণা করিতেছি সকল যুক্তপরিবারেরই যে সেইরূপ অবস্থা, তাহা হয়তো নাও হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশেরই যে সেইরূপ, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিলেই পুরাকালের কথা মনে করিয়া পরস্পরের প্রতি মৈত্রী, আত্মত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যে সমাবেশের কল্পনা করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, বাস্তবিক পক্ষে সেই কল্পনানুযায়ী সুখময়, শান্তিময় সংসার সেকালেও ছিল কি না, তাহা অনুসন্ধানের দ্বারায় অবধারণ করিবার বিষয়। যাহা হউক, অতীতের সহিত আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ের যোগাযোগ নাই। আধুনিক অধিকাংশ যুক্তসংসারই প্রচ্ছন্ন হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির এবং প্রকাশ্য অশান্তির লীলাভূমি। পরস্পরের মতের অমিল, অন্তরের বৈরীভাব পোষণ করিয়া বাহিরে সদ্ব্যবহারের অভিনয় ইহাই আধুনিক যুক্তপরিবারের চিত্র। ফলতঃ, কৃত্রিমতাই এই সকল সংসারের মূল ভিত্তি। এইরূপ সংসার শিশুর শিক্ষার পক্ষে যে কত প্রকার বাধার সৃষ্টি করে, তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমেই স্মরণ করা প্রয়োজন যে, শৈশবে উপদেশ-বাক্যের দ্বারা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। মিথ্যা কথা বলিও না, পরের দ্রব্য লইও না—এই ধরণের উপদেশ প্রত্যেক শিশুই বহুবার শুনে এবং পাঠ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তকে পড়ে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শিশুমাত্রেই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে ও পরের দ্রব্য লইয়া থাকে। শিশুদিগের অনুকরণ-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল এবং ইহারই সাহায্যে বাল্যে তাহারা বহু বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। যেরূপ ব্যবহার তাহারা দেখিতে পায় বা যেরূপ কথোপ-কথন ও আলোচনা তাহারা শুনিতে পায়, তাহারা সেইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকে ও সেইরূপ কথাবার্ত্তা শিখিয়া থাকে। অভিভাবকদিগের মুখে অনেক সময় তাঁহাদের শিশুর সম্বন্ধে এই অভিযোগ আমরা শুনিতে পাই—"আমরা ছেলেবেলায় অমন করি নি বা ওরকম ছিলুম না, এসব কথা উচ্চারণ

করতেই পারতুম না।" কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, শিশুদের মনের এই অপ্রত্যাশিত পরিণতির জন্য তাঁহারা নিজেরাই প্রধানত দায়ী। তাঁহাদের বাল্যকালের ব্যবহার শিশুরা দেখে নাই; সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহারা করিতে পারে না। তাঁহাদের এখনকার ব্যবহার কিন্তু তাহারা প্রতিনিয়ত দেখিতেছে এবং শিক্ষা করিতেছে। সুতরাং Example is better than precept—এই প্রবচন অভিভাবকদের প্রতিমুহূর্ত্তেই স্মরণে রাখিয়া সংযত হইয়া কথাবার্ত্তা বলা ও কার্য্য করা বিশেষ প্রয়োজন।

আর একটি বিশেষ কথা—শিশুর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা অতিশয় তীক্ষ্ণ; কিরূপ তীক্ষ্ণ, তাহা আমরা সাধারণতঃ ধারণাই করি না। পিতামাতা প্রভৃতির ভাবের সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেই শিশু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারে। যুক্তপরিবারভুক্ত ব্যক্তির শিশুর সমক্ষে সংযত হইয়া ও সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলা অতীব কঠিন। পরিবারবর্গের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ ভাব বর্ত্তমান, কে কাহার প্রতি আসক্ত ও কাহার প্রতি বিরক্ত, শিশু তাহা উত্তমরূপেই বুঝে। সুতরাং কোন এক ব্যক্তির প্রতি বিরক্তির ভাব গোপন করিয়া শিশুকে তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়ার কোনই মূল্য নাই। সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা তো করিবেই না, উপরন্তু উপদেশদাতা গুরুজনের ব্যবহার হইতে প্রতারণা করিতে শিখিবে। ইহা কি সুশিক্ষা?

পিতামাতার মধ্যে মনোমালিন্য থাকা শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিঘ্নকর। যুক্তপরিবারে এই মনোমালিন্য সৃষ্ট হইবার ও বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রচুর। উপযুক্ত স্থলে ক্রোধ, অসন্তোষ, বিরক্তি প্রভৃতি প্রকাশ করিতে না পারিয়া শিশুর প্রতি তাহাদের অভিব্যক্তি যুক্তপরিবারে ক্রমাগতই হইয়া থাকে। অন্যায়ভাবে তিরস্কৃত বা অপমানিত হইলে শিশু কখনই ক্ষমা করে না। প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও বা না করিলেও এইরূপ শাস্তিদাতার প্রতি ক্রোধ ও শত্রুভাব পোষণ করিতে থাকে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের গোপনে বিরুদ্ধতাভাব পোষণ করা তাহার শিক্ষার পক্ষে একটি গুরুতর অন্তরায়। দুইটি শিশুর প্রতি এককালে দুই রকমের ব্যবহার তাহাদের যথাযথ মানসিক বিকাশের পক্ষে কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়। সম্মুখ তুলনা দ্বারা বা প্রকাশ্য ব্যবহার দ্বারা একটিকে ছোট করা ও আর একটিকে বড় করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিবেন, যুক্তপরিবারে এই ঘটনা অনবরতই ঘটিয়া থাকে। ছেলেদের বিদ্যা, চতুরতা, শৌর্য্য প্রভৃতি লইয়া এবং মেয়েদের গৃহকর্ম্মে নিপুণতা, গীতবাদ্যাদিতে পারদর্শিতা প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ আলোচনা ও তজ্জনিত যে মনোভাব সন্তানসন্ততির এবং তাহাদের পিতামাতাদের মধ্যেও সৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে সবিশেষ অন্তরায়।

আর এক দিক হইতে দেখিলে এরূপ পরিবারের প্রধান দোষ এই যে, সর্ব্ব বিষয়ের "valuation"-এর, অর্থাৎ "প্রাণ এবং মনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে উপকারিতার হিসাবের" একেবারে ওলটপালট হইয়া যায়। অনেক সময় ক্ষুদ্র কাজ তুচ্ছ কথা বড় হইয়া উঠে, এবং প্রকৃতপক্ষে যে কার্য্য যে কথা দামী, তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। যেমন এরূপ পরিবারে শিশুদের প্রতি প্রায়ই যথোচিত লক্ষ্য থাকে না। তাহাদের প্রত্যেক কথা, প্রশ্ন, খেলা, খাদ্য, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল সময়েই সতর্ক থাকা প্রয়োজন, এ কথা

অভিভাবকেরা, বিশেষতঃ মায়েরা তাঁহাদের গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, একেবারেই ভুলিয়া যান। যে পরিবারে লোকসংখ্যা অধিক, গৃহকর্ম্মও অধিক। কর্ম্মপ্রবাহের সামান্য বিরামের সময় শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ আসিয়া মায়েদের মানসিক বৃত্তিসমূহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শিশুদের বিষয় চিন্তা করিবার বা তাহাদের শিক্ষাসম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা বা অবকাশ আদৌ থাকে না। অশান্তির আবহাওয়ার মধ্যে দিনের পর দিন এইভাবে যাপন করিয়া যাঁহাদের নিজেদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইতে থাকে, তাঁহারা শিশুদের শিক্ষার উন্নতির সহায়ক কিছুতেই হইতে পারেন না। পরিবারের মধ্যে কেহ অধিক উপার্জ্জনশীল, কেহ কম, কাহারও সন্তানসন্ততির সংখ্যা অধিক, কাহারও কম হওয়া অত্যন্তই স্বাভাবিক। আজকালকার ব্যক্তিতন্ত্রতার দিনে এরূপ বিভিন্ন অবস্থাপন্ন একই পরিবারের ব্যক্তিবর্গের শুধু পারিবারিক একতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত একত্র বাস করিবার চেষ্টাতে সকল দিক দিয়াই, বিশেষতঃ মানসিক সুখশান্তির দিক দিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে। সদ্‌বৃত্তিসমূহের অপচয় এবং মিথ্যা, হিংসা, ছলনা প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তির প্রশ্রয়, ইহাই এরূপ জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী নৈতিক পরিণাম। এই নিতান্ত অশুভ পরিবেষ্টনীর মধ্যে পালিত শিশুর সুশিক্ষা কি করিয়া আশা করা যায়? শিক্ষাশাস্ত্রাভিজ্ঞ পিতামাতাও পরিবারস্থ সকলের পরস্পরের মতের অনৈক্য হেতু তাঁহাদের জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হন। পুরাতনত্বের দোহাই দিয়া ও নীতি প্রবচনের সাহায্য লইয়া এই যুক্তপরিবারপ্রথা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা যতদিন চলিবে, ততদিন শিক্ষাবিস্তারের পথে একটি প্রবল বাধা থাকিয়া যাইবে।

একান্নপরিবারে বাস একটি সামাজিক প্রথা, সুতরাং ঐ বাধাকে সামাজিক বাধাও বলা চলে। প্রাণবন্ত সমাজমাত্রই গতিশীল। কালের গতির সহিত সমাজের আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের বহু পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সমাজের আদর্শের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না সন্দেহ। পুরাতন হইতে নূতন সামাজিক ব্যবহারের যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশই আসিয়াছে অন্য দিক হইতে এবং দ্বিধা ও ভয়ের সহিত তাহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রতান্ত্রিক অবস্থাবিপর্য্যয় সমাজের বহু প্রচলিত ধারায় তিরোধান ও নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তনের হেতু। কার্য্যে এই সকল পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেও, সমাজের আদর্শবিষয়ক চিন্তাধারায় ইহাদের উপযুক্ত স্থান আমরা দিই নাই। চিন্তা এবং কার্য্যের মধ্যে এই ব্যবধান থাকাতে আমাদের সামাজিক জীবনে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষাব্যাপারটি অতিশয় সূক্ষ্ম—delicate, কোনরূপ বিশৃঙ্খলার আবহাওয়ার মধ্যে উহার সুষ্ঠু পরিণতি হইতে পারে না। শিশুমনও অতিশয় নরম এবং গ্রহণশীল—receptive, অতি সহজেই এবং শীঘ্রই উহাতে দাগ বসিয়া যায়। শিশুর মনে একবার যে ছাপ অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা দূর করা এক প্রকার অসম্ভব। সংজ্ঞান হইতে মুছিয়া দিলেও শিশুর নির্জ্ঞানে তাহা থাকিয়া যায় এবং তথা হইতে সংজ্ঞানে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। আমি এবং আমার পরিবারবর্গ যদি কোন একটি আদর্শ মানিয়া চলি, শিশু সহজেই সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমি একমতাবলম্বী এবং অন্য সকলের মধ্যে কেহ আমার সহিত একমত এবং কেহ অন্যমত এইরূপ হইলেই শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। উপরন্তু সমাজের এখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, আমরা

নিজেরাই সব সময়ে একমত অনুসারে চলিতে পারি না। ফলে নিজেদের ব্যবহারের মধ্যে বহু অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। শিশুদের আমরা যতই অপরিণত মনে করি না কেন, এই অসামঞ্জস্য তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ অতিক্রম করে না। কাজেই কোন একটি বিশেষ নিয়ম, যাহা নিজেরা কখন মানি, কখন মানি না, শিশুদের উপর প্রয়োগের চেষ্টা করা অর্থাৎ তাহাদের discipline-এর মধ্যে আনা শক্ত হইয়া পড়ে। একটি দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে পড়িতেছে। বাটির স্ত্রীলোকেরা, শিশুর পিতামহী, মাতা প্রভৃতি পুজাপার্ব্বণ ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। শিশুরাও যাহাতে এই সকল কর্ম্মে উৎসাহান্বিত হয়, তাহার চেষ্টাও তাঁহারা করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক বাটিতেই পুরুষেরা ঐ সকল বিষয়ে হয় উদাসীন থাকেন অথবা নানারূপ উপহাসাদি করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় শিশুদের মনোভাব কি হইতে পারে? তাহারা হয় ঐ সকল বিষয়ে উৎসাহান্বিত হইবে, অথবা ঐ সকল অনুষ্ঠানকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখিবে। কিন্তু ঐখানেই ব্যাপারটি শেষ হয় না। শিশু যে মত অবলম্বন করিবে, তাহার প্রতিকূল মতাবলম্বী সকলের প্রতি অবজ্ঞার ভাব মনে পোষণ করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাই হইল বিপদের কথা।

এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দেওয়া যায় যে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত আমাদের নিজেদের মনোভাবের অনিশ্চয়তা হেতু শিশুর মনে অযথা অনেক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করি, কিন্তু সেগুলির সমাধানের কোন পন্থা তাহাকে দেখাইতে পারি না। সহজ অবস্থাতেই শিশুর মনে স্বভাবতঃই কত দ্বন্দ্বের—conflict-এর উৎপত্তি হয়, ফ্রয়েড তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শুধু সেই-গুলিরই যথাযথভাবে সমাধান করিবার জন্য শিশুকে সাহায্য করিতে হইলে অভিভাবকদের নিজেদের আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় ও সংযম অভ্যাস করিতে হয়। পরিণত বয়সের মনোবিকারের ও মানসিক রোগের অঙ্কুর যে অনেক সময় শৈশবের দুষ্ট আবহাওয়াবশতঃই রোপিত হয়, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। শৈশবের আবহাওয়ার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকবর্গ প্রধানত দায়ী। সামাজিক বিশৃঙ্খলাহেতু নূতন নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়াতে শিক্ষা-ব্যাপারটি জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। তাই statistics-এ দেখি, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

এই বিশৃঙ্খলার অপনোদন কি করিয়া হইবে, এক কথায় বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্যার সহিত নানা প্রশ্ন বিজড়িত। তন্মধ্যে অর্থ নৈতিক অবস্থাই প্রধানতম। অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান না হইলে কোনরূপ স্থায়ী সামাজিক অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না। অর্থ নৈতিক অবস্থা দেশের শাসনপদ্ধতি, রাজনীতি প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সুতরাং হঠাৎ কোনরূপ সুফলের আশা করা সমীচীন নহে। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশভাবে সমস্ত চেষ্টা বন্ধ করিয়া স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া বসিয়া থাকা—শুধু অবিবেচক নহে, একেবারে কাপুরুষের মত কার্য্য হইবে। কোন বাধাই অনতিক্রমণীয় নহে। দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, হিমালয়শিখর লঙ্ঘন করিবার অক্লান্ত চেষ্টা দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায়ের সহিত চলিতেছে। কালে সে চেষ্টা যে সফল হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের ঐরূপ অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। আলোচনা, আন্দোলন দ্বারা জাতীয়তাগঠনের ভিত্তি যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার বিষয়ে সকলের মনোযোগ

আকর্ষণ করিতে হইবে, জনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। তখন সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হইবে।

জাতিগত পার্থক্য আমাদের সমাজের একটি অতি প্রাচীন নিয়ম। যদিও অর্থনৈতিক তুমুল আলোড়নের ফলে ঐ নিয়মের অধুনা কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহার প্রাবল্য যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে এখনও আমরা মনে মনে কুণ্ঠিত হই এবং যাঁহারা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সমাজের উচ্চস্তরে তাঁহাদের স্থান দিতে দ্বিধা বোধ করি ; অন্ততঃ যতক্ষণ না তাঁহারা স্বর্গগত সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। কলকব্জার কার্য্য, মিস্ত্রী, ফোরম্যান প্রভৃতির কার্য্যকেও আমরা অবজ্ঞাই করিয়া থাকি। বস্তুতঃ, কোনপ্রকার হস্তশিল্প বা শারীরিক পরিশ্রমজনিত কার্য্যই আমরা শিক্ষিত যুবকদের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। আমাদের এই মনোভাব শিক্ষার অন্তরায় বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। একেই চাকুরি ভিন্ন—তাহাও সামান্য কেরানির চাকুরি—বিশেষ কোনও পন্থা আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগের জন্য উন্মুক্ত নাই, তাহার উপর যাঁহাদের অর্থ এবং সুবিধা আছে, তাঁহারাও যদি ঐরূপ মনোভাবের বশীভূত হইয়া পুত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষাদানে বিরত থাকেন, তাহা হইলে সমাজের পক্ষে বিশেষ দুঃখের বিষয় হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুধু দুঃখের বিষয় নয়, সমাজের ক্ষতিরও কারণ হয়। পুত্র চাকুরি-সংগ্রহের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিল না, এবং ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিতেও মনোমত কার্য্যে যোগদান করিতে পারিল না, ফলে সমাজ ন্যায্য দাবি সত্ত্বেও তাহার নিকট হইতে কোনরূপ উপকার লাভ করিল না। সমাজের সে একটি ভারস্বরূপ হইয়াই রহিল।

সর্ব্বশেষে এবার যে বাধাগুলির কথা বলিব, সেগুলি অতীব গুরুতর। একের চেষ্টায় বা এক পরিবারের উদ্যমে তাহাদের দূর করা সম্ভব নয়। দেশের সকল লোকের, বিশেষতঃ যাঁহাদের হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং নূতন চিন্তাধারা-প্রসূত নূতন কর্ম্মপদ্ধতির প্রচলন ভিন্ন তাহাদের নিরাকরণ হইবে না। আমি দেশের দারিদ্র্য এবং গভর্মেণ্টের অনুদার শিক্ষানীতির বিষয় বলিতেছি। শিক্ষা-বিষয়ক জ্ঞান আমাদের যতই উন্নত হউক না কেন, এক দারিদ্র্যদোষ আমাদের সেই জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে প্রবল বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে, আমার শিশুর কোন একটি বিষয়ে, যেমন চিত্রাঙ্কনে বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ আছে এবং কৃতিত্বের পরিচয়ও দিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন্ ভরসায় আমি তাহাকে শুধু চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতে পারি? অনেক অভিভাবকদের নিকটই এই সমস্যার উদয় হয়। এবং শিক্ষাশাস্ত্রাভিজ্ঞ হইলেও অনেককেই তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিয়া চলিত পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। নূতন জ্ঞান লাভ করিবার বা সেই জ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সুযোগ বা সামর্থ্যই বা আমাদের কয়জনের আছে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক শিক্ষক কোনক্রমে বিদ্যালয়ে তিন চার ঘণ্টা কাল কাটাইতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন। ইহাতে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষতি হয় তাহা নিশ্চিত। কিন্তু বহু শিক্ষককে বাধ্য হইয়াই যে ঐরূপ করিতে হয়, তাহা কি একটি বিবেচনার বিষয় নহে? যাঁহার

অভাব চিরস্থায়ী, তাঁহার উদ্যম কোথা হইতে আসিবে? দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতেই যাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়, তাঁহার অন্য কাজে উৎসাহ কিরূপে হইবে? শিক্ষকদিগের অভাব-অভিযোগ, অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে গভর্মেণ্ট মনোযোগী না হইলে প্রতিকারের উপায় কোথায়?

শিক্ষার কতকগুলি অন্তরায়ের বিষয় আলোচনা করিলাম। নূতন কথা হয়তো কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু অনেক বিষয়েই পুরাতন কথারও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করার যে প্রয়োজন আছে, আশা করি, সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

---
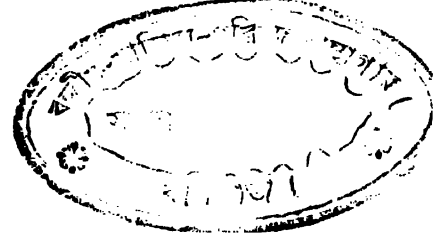
# হিন্দু-স্থান

"...হিন্দুজাতি ব্যাঙের ছাতার মত অপ্রয়োজনে গজাইয়া উঠে নাই, খত লিখিয়া পরামর্শমত এই জাতি গঠিত নয়; কাগজ-নির্ম্মিত খেলনা ইহা নহে, ফরমায়েস-মাফিক প্রস্তুতও হয় নাই। বিজাতীয় উপাদানে জোড়াতাড়া দিয়া ইহা নির্ম্মিত নয়। এই মাটিতে ইহা স্বতঃই জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এই মাটিতেই ইহার শিকড় গভীর ও বহুবিস্তৃত। মুসলমানদিগকে অথবা অপর কাহাকেও অবজ্ঞা করিবার জন্য উপকথার মত ইহা সৃষ্ট হয় নাই; আমাদের উত্তরশায়ী বিরাট ও দৃঢ় হিমালয়ের মত ইহার অস্তিত্বও বিরাট এবং দৃঢ়।...

একত্র এক ভূমিতে অবস্থানের দ্বারা অর্থাৎ আভাসভূমির মিলই কেবলমাত্র ধর্ম্ম-জাতি-সংস্কৃতি অথবা ঐ জাতীয় অন্য বন্ধনের ফলে পরস্পর-পৃথক বিভিন্ন মানুষকে এক করিয়া জাতীয় একতা সাধন করিতে পারে না। ধর্ম্ম-জাতি-সংস্কৃতি-ভাষা ও ইতিহাস ঘটিত ঐক্যবন্ধন যে মানুষের পরস্পর মিলনের পক্ষে কেবলমাত্র বাসভূমির ঐক্যবন্ধন অপেক্ষা দৃঢ়তর আকর্ষণ, এ কথা শুধু রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়াই সত্য নয়, মানুষের স্বভাবধর্ম্মের দিক দিয়াও সত্য। অবশ্য অন্যান্য ঐক্যের সঙ্গে বাসভূমির ঐক্য থাকিলে বন্ধন যে আরও পাকা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।...সিন্ধুনদ হইতে দক্ষিণসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভূভাগ তাহাই হিন্দু-স্থান—হিন্দুদের দেশ; এবং হিন্দুরাই সেই জাতি, যাহারা ইহার মালিক। এই জাতিকে ভারতীয় আখ্যা দিলেও বুঝিব, ইংরেজী ভাষায় 'ইণ্ডিয়ান' 'হিন্দুর'ই সমপর্য্যায়ের শব্দ। আমরা হিন্দুরা হিন্দু-স্থান ও ইণ্ডিয়া বলিতে একই বস্তু বুঝিয়া থাকি। আমরা হিন্দু বলিয়াই ইণ্ডিয়ান এবং ইণ্ডিয়ান বলিয়াই হিন্দু।

আমরা হিন্দুরা নিজেরাই একটা জাতি। যেহেতু ধর্ম্ম-জাতি-সংস্কৃতি-ইতিহাসগত বন্ধন আমাদিগকে ঘনিষ্ঠতর করিয়া একটা অবিমিশ্র জাতিতে পরিণত করিয়াছে, বাসভূমিগত ঐক্য সেই হেতু আমাদের পরস্পর মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিয়াছে। যে ভারত আমাদের মাতৃভূমি, যে ভারত আমাদের তীর্থক্ষেত্র, সেই ভারতের সহিত আমাদের জাতীয় সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সকল ঐক্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যেহেতু আমরা হিন্দুরা একজাতীয়ত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হইতে চাই, সেই হেতুই আমরা এক জাতি।..."

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

# কলিকাতা কলা-পরিষদের প্রদর্শনী

[ ষষ্ঠ বর্ষ ]

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

কলিকাতা কলা-পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠানটি ইদানীং রম্যকলাক্ষেত্রে ভারতের একটি প্রধান ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদির যদি একটি সম্মিলিত সংগ্রহ সম্ভব হ'ত এবং তা যদি কোথাও প্রতি বৎসর প্রকাশ বা প্রদর্শনের সুযোগ হ'ত, তা হ'লে যেমন সাহিত্য-জগতে একটা বিশেষ আন্দোলনের ব্যাপার হ'ত—চিত্র ও মূর্ত্তিকলাক্ষেত্রে এই সৃষ্টি-সম্মিলনটিও সেই রকম হয়েছে। ভারতের সকল বিশিষ্ট চিত্রকর ও ভাস্করেরা তাঁদের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য যেন এই মেলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

গ্রাম্য নদী — শ্রীবিমল মজুমদার

সৌভাগ্যের বিষয়—কলা-পরিষদ কোন রকম জাতিভেদ সৃষ্টি ক'রে কোন পদ্ধতিকে বর্জ্জন করতে চেষ্টা করেন নি। সকল শ্রেণীর চিত্রকরেরাই এর ভিতর জায়গা পেয়েছে। তেল-রঙ, জল-রঙ, সাদা-কালো প্রভৃতি নানা উপায়ে আঁকা ছবিগুলি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এর একটি শূন্যতা হচ্ছে ইউরোপের আধুনিক সৃষ্টির সহিত উদ্যোক্তাদের পরিচয়ের অভাব। যাকে ইউরোপীয় প্রথা বা আন্তর্জাতিক প্রথা বলা যেতে পারে—তার খবর যেন এ দেশে পৌছায় নি। ইউরোপের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Cezanne, Matisse, Nevinson প্রভৃতির আদর্শ এবং আধুনিক Sur-real বা অতিপ্রাকৃত রচনার কোন ছায়া এসব রচনার ভিতর নেই। ইউরোপ ইদানীং লোককলা (folk art), আরণ্যকলা (cave art) এবং শিশুকলার (child art) ছন্দের পক্ষপাতী হয়েছে; কিছুকাল পূর্ব্বে চিত্রে ও সঙ্গীতে নিগ্রো আর্টের হাওয়ায়ও ইউরোপ মশগুল হয়েছিল। তার কোন ছায়াপাত এ সংগ্রহে

নেই। পঞ্চাশ বছর আগেকার আদর্শ নিয়ে একটা নূতন সংগ্রহ আহরণ করায় মনে হয়, প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা আধুনিক আর্ট কাকে বলে, তা জানেন না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের expressionist রচনা ও যামিনী রায়ের গ্রাম্য ও জনশিল্পের সুরের অভাব সমগ্র সংগ্রহকে হতশ্রী করেছে।

ভারতের সকল দেশের শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। তাতে একটা তুলনামূলক সাময়িক বিচার সম্ভব হয়েছে। অপর দিকে অনেক ইউরোপীয় শিল্পীও বহু রচনা পাঠিয়েছেন। ইহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মনস্তত্বের বিভিন্নতা সুস্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য এই সকল ইউরোপীয় শিল্পীরাও এখানকার আবহাওয়ায় সেকেলে হয়ে আছেন। ইউরোপ চিত্ররচনাক্ষেত্রে যে কতদূর এগিয়ে গেছে, তা এঁরাও জানেন না।

তা যাক, তেল-রঙের ছবিতেও শিল্পীরা নানা বৈচিত্র্য উপস্থিত করেছেন। ভারতীয় শিল্পীর ভিতর অনেকেই প্রাকৃতিক ও পল্লীদৃশ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাতে ভারতের প্রাণ যে প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর সান্ত্বনালাভ করে,

মেহেরুন্নিসা — শ্রীরাধাচরণ বাগচী

তাই প্রকাশ পাচ্ছে। বিমল মজুমদারের 'গ্রাম্যনদী' অতি মনোহর হয়েছে। বি. সেনগুপ্তের 'হরিৎ ধান্যক্ষেত্র'ও বাংলার পল্লীর একটি জাগ্রত শ্রীকে উদ্ঘাটিত করেছে। শিল্পীর নিবিড় সহানুভূতিতে চিত্রখানি ভরপুর! কিন্তু এই শ্রেণীর অনুকরণাত্মক চিত্র (realistic) কোন বিশিষ্ট রসের নিবেদন করতে পারে না। মনোজগতের ঐশ্বর্য্য ও বিচিত্র হেরফেরকে উদ্ঘাটিত করবার জন্য অপ্রাকৃত (idealistic) পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এজন্যই কোন বিশিষ্ট

শীতের সকাল—নৈনিতাল — মিঃ এ. ডি. মিলার

সত্য বা সাধনা প্রচার করতে হ'লে নূতন পথে ও আর্টের নূতন ভাষায় রচনা করতে হয়। নব্য রুশিয়ায় গ্রাম্যকলার চর্চ্চার পরে এক শ্রেণীর যান্ত্রিককলার আবির্ভাব হয়; কারণ এ যুগ যন্ত্রের। ইদানীং আধুনিকতম রচনা নিগ্রো-আর্টের জন্য অসাধারণ আগ্রহকে সংযত ক'রে আদিম গুহাশিল্পের রসে মশগুল হয়ে উঠেছে। একে বলা হচ্ছে Modern neolithic art। লণ্ডনে কিছুকাল পূর্ব্বে Mrs. Wertheim-এর West-end Gallery-তে এই রকমের একটি প্রদর্শনী হয়। শিল্পী David Burton-এর বালসুলভ সরলতায় আঁকা ছবিগুলি সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। এ দেশে এ রকম পথে যাওয়ার স্বপ্ন কেউ দেখে না।

এই বিভাগে হেমেন মজুমদারের 'সঙ্গীত' উল্লেখযোগ্য রচনা। এই শিল্পীর সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাস ও রঙের ছন্দ খুব কম আর্টিস্টই জানেন। প্রাচীন যুগের রবিবর্ম্মাও রঙের গমক ও রেখার আবেগে হেমেন মজুমদারের নিকট হার মানে। অতুল বোসের প্রতিরূপ ( portrait ) ও যামিনী গাঙ্গুলীর 'এশিয়ার আলো' উল্লেখযোগ্য রচনা। সমর ঘোষের 'Under the Yellows' চিত্রখানিতে বিরোধকে একটা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপায় করা হয়েছে। ভি. এ. মালীর 'মৎস্যজীবী' একটি বলিষ্ঠ রচনা। শিল্পীর অব্যাহত শক্তি প্রতি রেখায় প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। খুঁটি-নাটি না এঁকেও শিল্পী সকলের চিত্তহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সতীশ সিংহের 'মাদ্রাজী শাড়ি' পদক লাভ করেছে। ইন্দুভূষণ সেনের 'Landscape' মনোজ্ঞ হয়েছে। বধূরাণী ইন্দিরা দেবীর 'প্রহরী' (Sentinels) ভাল রচনা। শ্রীমতী সতী চক্রবর্ত্তীর 'দিশী নৌকো' শিল্পীর প্রতিভা প্রমাণ করে। বস্তুত নারীশিল্পীদের অনেক রচনাই চমৎকার হয়েছে। শ্রীমতী ইন্দুরাণী সিংহের 'প্রভাতের আলো' অভিনন্দনের যোগ্য। রথীন্দ্র মৈত্রের 'চিন্তা' শিল্পীর উৎসাহ ও কল্পনা প্রমাণ করছে।

পল্লীবালা (Under the Yellows) শ্রীসমর ঘোষ

জল-রঙের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথায় রচিত বহু ইউরোপীয় ও দেশীয় শিল্পীর রচনা আছে। এ. ডি. মিলারের 'নৈনিতাল' রচনায় রঙের খেলা প্রচুর। মিসেস হিউ গসেটের 'নীল ফুল' একটি চমৎকার রচনা। গাঢ় রঙের ব্যবহার ইদানীং ইউরোপে খুবই চলছে। মিসেস সুভো ঠাকুর একখানি ভাল ছবি প্রদর্শন করেছেন, তাতে সুভো ঠাকুরের আদর্শ বজায় রাখা হয়েছে। শ্রীমতী সবিতা ঠাকুরের 'রাইরাজা' চিত্রখানিতে শিল্পীর একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। বধূরাণী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'নীরব কবি' ও 'রাত' অতি চমৎকার হয়েছে। আর. এন. চাটুজ্জের 'দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা' চিত্রখানিতে শিল্পীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আশু বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঋষ্য-শৃঙ্গের প্রলোভন' রচনায় একটা রূপের ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। এই শিল্পীর 'মাতা'ও একটি ভাল রচনা। রাধাচরণ বাগচীর 'মেহেরুন্নিসা' চিত্রখানি অতি উপাদেয় হয়েছে।

সাদা-কালো রচনার ভিতর সারদা উকিলের কয়েকখানি চিত্র এবং বিমল দে ও মুকুল দের রচনা উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর রচনা সুষ্ঠুভাবে উপস্থিত করাটা খুব কঠিন। এ পথে দুনিয়ার সব কিছুকেই নানাভাবে উপস্থিত করা যায়, এজন্য আধুনিক যুগে এই রকমের রচনার প্রসার খুবই বেশি হয়েছে।

বিস্ময়ের বিষয়, এই সংগ্রহে "poster"-রচনা থাকলেও cartoon বা caricature - শ্রেণীর কিছু নেই। ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপাত্মক রচনায় জাতির স্বাস্থ্য প্রমাণিত হয়। কৌতুক-হাস্য গভীরতম অনুভূতির সীমান্তে সব সমস্যাকে উপস্থিত করতে পারে। এজন্য এই শ্রেণীর রচনা খুব কঠিন। এ দেশে গগনেন্দ্র ঠাকুর যা সূচনা করেন, তার আরও প্রসার হওয়া উচিত ছিল। এই রীতিতে বাস্তবতার শাসন নেই, শিল্পী স্বাধীনভাবে রেখার ছন্দকে বিপর্য্যস্ত ও লীলায়িত ক'রে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত করতে পারে। এ দেশ এখনও cartoon বা কৌতুকচিত্রের মর্ম্ম বুঝতে পারে নি।

মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর নিজের ও পাকপাড়ার কুমার জগদীশের কয়েকখানি প্রাচীন চিত্রও উপস্থিত করেছেন। এই সঙ্গে কিছু আধুনিক চিত্রও প্রদর্শিত হ'লে ব্যাপারটি সত্যোপেত হ'ত। আধুনিক ইউরোপের স্থূলকে বুঝতে হ'লে নূতন যুগের গতি ও ছন্দকে বুঝতে হবে। এ যুগের সাহিত্য কবিতার ছন্দ ভেঙে, গদ্যকে মথিত ক'রে যে রচনা সৃষ্টি করেছে, তাতে সমগ্র বিধি-ব্যবস্থা বিরাট কটাহে নিক্ষিপ্ত হয়েছে; তেমনই শিল্পও চলেছে এক উদ্দাম আলোড়নের ভিতর দিয়ে। তাতে গ্রীক-রোমক আদর্শ ধূলিসাৎ হয়েছে এবং আদিম আয়োজনের উৎসাহই পরমার্থ বিবেচিত হয়েছে।

মৎস্যজীবী　　মিঃ ভি. এ. মালী

ভাস্কর্য্য-ক্ষেত্রেও এই প্রদর্শনীতে প্রচলিত প্রথার অনেক রচনা উপস্থিত করা হয়েছে। পরিচিত শিল্পীদের ভিতর পি. মল্লিক, মহাপাত্র ও কামাখ্যা দাসের রচনা উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ শিল্পী কে. সি. রায় চৌধুরীর 'স্কুলের শিক্ষয়িত্রী' রচনাটি অতি সুন্দর হয়েছে।

ভাস্কর্য্য-ক্ষেত্রেও নব্য আদর্শ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। সেসব আদর্শের সঙ্গে এ দেশের পরিচয় আছে কি না সন্দেহ। এ দেশ এখনও ইউরোপের অর্দ্ধশতাব্দী পশ্চাতে; এমন কি, এশিয়ার প্রগতিমূলক সৃষ্টির সঙ্গেও তাল রক্ষা ক'রে চলতে পারছে না।

প্রতি বৎসর এই প্রদর্শনী দেখে ধারণা করা যায়, ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হ'ল। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন।*

* অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ফোটো-প্রতিষ্ঠান "ফোটোগ্র্যাফ ষ্টুডিও" কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটো।

# বাংলা সাহিত্যে আসল ও নকল

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও সাহিত্যিক সংসারেও কিছু ওলট-পালট ঘটিয়াছে। সমাজ-জীবনে যে সকল তত্ত্ব, তথ্য, ব্যক্তি ও সম্পর্ককে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম, অকস্মাৎ একদিনের মনোভূমিকম্পজনিত মানসিক বিপর্য্যয়ে যুদ্ধসংশ্লিষ্ট দেশসমূহে তাহাদিগকেই বাতিল হইতে দেখিলাম। 'শেল-শক'গ্রস্ত জীবন ও যৌবন সেখানে আসন্ন নিশ্চিত মৃত্যুর বিভীষিকায় সহজ স্বাভাবিক পথ ভ্রষ্ট হইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। বিকৃত যৌন-উত্তেজনার মত নানা অস্বাভাবিক উত্তেজনার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহাদের প্রিয়পরিজন-বিরহশোকাতুর মন মুহূর্ত্তকালের জন্যও স্থির থাকিতেছিল না। এই বিকৃত উন্মাদনার ফলে সেখানে যে সাহিত্যের উদ্ভব হইল, তাহা সাময়িক হইলেও তাহাদের জীবনে সত্য এবং অনেক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজও তাহার মধ্যেই নিহিত ছিল, কারণ এই বিপর্য্যয়ে প্রত্যক্ষভাবে অসহ যন্ত্রণাভোগের দ্বারা তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছিল।

সাহিত্যের ঢেউ আকাশ-তরঙ্গের মত বিশ্বব্যাপী। বাংলা দেশে আমাদের অন্তঃপুরেও স্বাভাবিক নিয়মে সে তরঙ্গ আঘাত করিয়াছে; সত্যকার ধারক-যন্ত্র এখানে থাকিবার কথা নয়, ছিলও না—দুঃখভোগের দ্বারা আমাদের মন উপযুক্ত পরিমাণে সূক্ষ্ম ও সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু পৃথিবীতে সকল বস্তুই জাল হয়—বাংলা দেশেও জাল রিসিভার গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না। নকল আভিজাত্যের গর্ব্বে তাঁহারা যাহা গ্রহণ করিলেন বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহাদের লেখনীরূপ ট্র্যান্স্‌মিটারের সাহায্যে তাহাই বিচিত্র ভঙ্গিতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল; তাঁহাদের স্বশ্রেণীর সমালোচক-অ্যাম্‌প্লিফায়ারে এই নকল মালেরই কর্ণপটহভেদী বিজ্ঞাপন বিচারবিবেচনাহীন নিরীহ পথিককে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে বিলম্ব করিল না। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত গত প্রগতি-সাহিত্য-সম্মেলনে এই মালের খরিদ্দার-ভুলানো বিজ্ঞাপনের নানা বিচিত্র প্রকাশ দেখিলাম। এমন দলকেন্দ্রিক নির্লজ্জ দম্ভ সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ আধুনিক এবং বাংলা দেশের ইতিহাসে এই আকস্মিক নির্লজ্জতা অধিকতর হেয় এই কারণে যে, ইহা সত্যকার মর্ম্মভেদী বেদনাজাত আর্ত্তনাদ নয়; ড্রইংরুমবিলাসী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের বাঙালীবাবুর নকল মানসবিলাসের ফলে আয়ত্ত হিস্টিরিয়ার আক্ষেপানুকরণ মাত্র।

সাধুতার ভান করিতে করিতে অসাধুও সাধু হইয়া যায়—এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে বিরল নয়; ভানের মোহে বাংলা দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্য-সম্প্রদায়ের দুই একজন যে বর্ত্তমানে সূচনা-যুগের ভানের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ভান-অর্জ্জিত মনোবৃত্তিকেই সত্যকার ধর্ম্মজ্ঞানে প্রচার করিতেছেন, এটুকুও আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? তরঙ্গশিখরে ফেনরাশি তটের সহিত সংঘর্ষেরই পরিমাপক, জলের গভীরতার সহিত ফেনার কোনই সম্পর্ক নাই। এই নব আবির্ভূত সাহিত্যের সহিত বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার বিন্দুমাত্র যোগ নাই। থাকিলে, ক্ষণে ক্ষণে এই পল্লবগ্রাহী সাহিত্যস্রষ্টাদের বুভুক্ষিত

আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতাম না ; ইঁহাদের রচনা বৃহত্তর সমাজে অবহেলিত না হইয়া গৃহীত ও আদৃত হইত, এবং ইঁহারা ভবিষ্যৎ ভদ্র বাঙালী সম্প্রদায়ের উপর সমাদরের বরাদ্দ দিয়া পরস্পর পৃষ্ঠকণ্ডুয়নের আনন্দে আশ্বস্ত হইতে পারিতেন না।

আপনাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিশ্চিন্তে বিচরণশীল এই সকল দিগ্‌ভ্রান্ত পথিককে আমরা নিশ্চিন্তেই থাকিতে দিতাম, কিন্তু দেখিতেছি, এক দিক দিয়া ইঁহারা বৃহৎ বাঙালী সমাজকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। ইঁহাদের দুর্ব্বোধ্যতার মধ্যে আর কিছু না থাকুক—দম্ভ আছে, সুতরাং অপরিপুষ্ট তরুণ মনের পক্ষে লোভনীয় মারাত্মক চটকও আছে ; আমাদের তরুণেরাও স্বভাবসুলভ হঠকারিতায় এই অর্থহীন দাম্ভিকতার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন ; ইংরেজী-বাংলা মিশ্রিত ভাষার নির্ব্বাক ছায়াচিত্রের মোহে বহুদিনের সাধনায় অর্জ্জিত ভাবধারাকে নিকৃষ্টজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে চলিয়াছেন। কারণ, নির্ব্বাক ছায়াচিত্রের সঙ্গে ছেলে-ভুলানো কন্‌সার্ট ও রঙ কৌশলে যোজনা করা হইতেছে। আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসাস্থল এই তরুণ সম্প্রদায়কে সুস্থ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার জন্য ইঁহাদের আকর্ষণের বস্তুর স্বরূপ ধরাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নিরন্তর উপেক্ষার দ্বারা চিন্তা-লেশহীন অভিভাবক-সম্প্রদায় জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলেই কুঠারাঘাত করিতেছেন। আজ সত্য সত্যই প্রতিবাদের প্রয়োজন হইয়াছে।

এক শ্রেণীর মতলববাজ লোক সাহিত্যের বাজারেও এই ধুয়া তুলিয়াছেন যে, এতদিন পর্য্যন্ত যে সাহিত্য বুর্জোয়া এবং দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন পাঠককে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভুলাইয়া আসিয়াছে, তাহা পৃথিবীর জনগণমনের স্বাধীনতা-অপহারক ধনিকসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন স্বার্থান্বেষী আত্ম-সুখভোগলোলুপ লেখকের দ্বারাই রচিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ মানুষের, দুঃস্থ প্রোলিটারিয়েটের সুখ-দুঃখের কথা নাই ; নিপীড়িত জনগণের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই ; তিনু-পাঁচু-রহিম-খলিলের আশা-আনন্দের খবর নাই। সুতরাং পূর্ব্বের সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টিকে ধূলিসাৎ করিয়া নূতন যুগের নূতন সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে আজিকার দিনের ভ্রান্ত সাহিত্যিকদিগকে উত্তেজিত করা হইতেছে। বীভৎস মিথ্যার এমন সুলভ প্রচার পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। মানব-মনের যে সকল বৃত্তি লইয়া চিরন্তন সাহিত্যের কারবার—তাহা মানবীয়, অতিমানবীয় অথবা অমানুষিক এই তিন শ্রেণীভেদে বিভিন্ন হইতে পারে ; স্থান ও কাল মাহাত্ম্যে প্রকাশের বৈচিত্র্যও স্বাভাবিক, কিন্তু সাহিত্যে মানব-মনের সহজ অনুভূতি কোন কালেই রাজ্য-ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য পাণ্ডিত্য-জ্ঞান দারিদ্র্য-অভাব-দুর্ভিক্ষ-জলপ্লাবন শিক্ষাহীনতা-নিরক্ষরতা দ্বারা শাসিত হয় নাই ; সাহিত্যের রাজার মর্ম্মভেদী হাহাকার কেবলমাত্র রাজন্যবর্গের চক্ষু বাষ্পাকুল করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, হীনতম দরিদ্রের বুকের দীর্ঘশ্বাসও টানিয়া আনিয়াছে ; সাহিত্যের গরিব গৃহস্থ-বধূর চাপা কান্না রাজ-অন্তঃপুরের আবহাওয়াকেও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। রাজকুলতিলক রামচন্দ্র অথবা হরিশ্চন্দ্রের দুঃখকাহিনী যুগে যুগে নিখিল ভারতবর্ষের সমগ্র দরিদ্রসমাজকে উন্নত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সান্ত্বনা দিয়াছে ; শবরীর প্রতীক্ষা ও ফুল্লরার বারোমাসী পড়িয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, এমন সম্রাজ্ঞীর কথা আমাদের জানা নাই। দরিদ্র ছুতারপুত্র যীশুখ্রীষ্ট কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ অপেক্ষা সাধারণ পাঠকের অধিকতর প্রিয় নন, ডেন্‌মার্ক-রাজকুমার হ্যাম্‌লেটের গভীর-বেদনাসঞ্জাত প্রলাপ দরিদ্র কৃষকের প্রতিহিংসাবৃত্তি

চরিতার্থ করে না। আসলে সাহিত্য পড়িবার সময় আমরা বংশপরিচয়ের হিসাব ভুলিয়া যাই; নিজের ঘরের মর্ম্মান্তিক অনটন সত্ত্বেও শ্রীবৎস রাজার হাত হইতে পোড়া মাছকে পলাইতে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠি। বর্ত্তমান কালে মানুষে মানুষে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক বৈষম্যের সুযোগ লইয়া যাঁহারা সাহিত্যেও এই বিভেদকে অস্বাভাবিক উপায়ে জাগাইয়া রাখিবার প্রয়াস করেন, তাঁহারা সমাজের শত্রু, মানবতার শত্রু, তাঁহারা মিথ্যার দাস। মানুষের একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়া তাঁহারা অকারণে মানবের অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতে চান।

কিন্তু সুখের বিষয়, এই স্বপ্রধান মরশুমি ফুলদলই বাংলাসাহিত্য-উদ্যানের সবখানি নয়, বাংলা সাহিত্যের যে ধারা কাব্যে চণ্ডীদাস হইতে কবিকঙ্কণে, কবিকঙ্কণ হইতে ভারতচন্দ্রে, ভারতচন্দ্র হইতে মধুসূদনে এবং মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথে উত্তরোত্তর প্রবল এবং প্রশস্ততর হইয়াছে এবং গদ্যে যাহা মৃত্যুঞ্জয় হইতে বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিম এবং বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথে দিনে দিনে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে, গদ্য-পদ্যের সেই প্রবহমান রসধারাকে ভিতরের এবং বাহিরের কোনও শত্রুই খণ্ডিত ও লুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই; তাহা আপনার বেগে আপনি পথ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সাগরাভিমুখে চলিতেছে; রবীন্দ্রনাথের পরেও সাধকের অভাব হয় নাই। সেই সাধকদলের মধ্যে পদ্যে করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জন-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ এবং গদ্যে পরশুরাম-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-বনফুল প্রভৃতি আজিও জীবিত থাকিয়া মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। গদ্যে ও পদ্যে নূতনতর পদ্ধতিতে যে সকল সক্ষম সাহিত্যসেবী একটা সম্পূর্ণ নূতন ধারার প্রবর্ত্তনের জন্য সাধনা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়; সাধনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই এবং ইঁহাদের পদ্ধতি এখনও বৃহত্তর সমাজে পুরাপুরি স্বীকৃতও হয়তো হয় নাই, তথাপি শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র-সরোজকুমার-মনোজ-মাণিক যে ধীরে ধীরে স্থায়ী আসন অধিকার করিতেছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের হতাশার কোনই কারণ নাই।

তবে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে, নকলের ঢক্কানিনাদে সংশয়হীন জনসাধারণ পথভ্রান্ত হইয়া বিপন্ন না হন—সম্পাদক ও সমালোচকদিগকে এখন সর্ব্বদা সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহারা নিজেদের সুবিধার জন্য সাহিত্যাকাশে ধূলি উড়াইয়া আঁধির সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকে চিনিতে ও পরিহার করিতে হইবে। যাঁহারা প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ হইয়া বিশেষ কোনও ব্যক্তিগত কারণে এই নকল সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারাও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শত্রু—এ কথাও যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি। *

* বনগ্রাম-সাহিত্য-সম্মেলন, দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন, সভাপতির অভিভাষণ।

# বলীদের কাহিনী

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

১

## বাঙালীর শক্তিচর্চ্চার ভূমিকা

খেলাধূলা-শক্তিচর্চ্চার ব্যাপারে বাঙালী আজ প্রধানত দর্শক। ভারতের অপর প্রদেশের লোকের কৃতিত্ব দেখে আমরা হাততালি দিই, প্রশংসা করি এবং কোন দিন মনেও করি না যে, এই সব কৃতিত্বের মূলে আছে বাঙালীরই একটা বিরাট প্রয়াস, যার ওপর অন্যান্য জাতিদের কৃতিত্ব গ'ড়ে উঠেছে। সমগ্র ভারতের সম্বন্ধে না হোক, উত্তর-ভারতের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, বিগত শতাব্দীর বাঙালী পথপ্রদর্শকেরা যেমন পেশোয়ার পর্য্যন্ত কালীবাড়ি ও ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্ত্তন ক'রে গেছেন, তেমনই তাঁদের দ্বারা খেলা ও জিম্‌ন্যাস্টিক-আন্দোলনও পুষ্ট হয়েছে। বাঙালী প্রয়াসের অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাস লেখা হয়েছে, কিন্তু শক্তিচর্চ্চার বিষয়ে একটা কথাও লেখা হয় নি, উত্তর-ভারতে জনরবের ভেতর সে সকল কথা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

আমাদের জাতীয় ইতিহাস এত বিক্ষিপ্ত, তার ধারাবাহিকতা এত ক্ষীণ যে, তুলনা ক'রে বলাও যায় না, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মত অন্য কোন যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জাতীয় জীবন গঠন ক'রে তোলবার জন্য এত ব্যগ্র হয়েছিলেন কি না। আজ আমরা জানি, গত শতাব্দীতে এই গ'ড়ে তোলবার প্রয়াস কত একাগ্র হয়েছিল, এবং অল্প কিছুকালের মধ্যে একটা মৃত জাতি জীবনকে কি নূতন রস দিয়ে সঞ্জীবিত করেছিল। যাঁরা সেকালে অন্নের তাগিদে দেশ ছেড়ে প্রবাসী হয়েছিলেন—তাঁদের কাহিনী দিয়েই বোঝা যায়, এই আত্মোপলব্ধির প্রয়াস কত ব্যাপক ছিল। সবই কিন্তু আজ মুছে যেতে বসেছে, জাতীয় কৃতিত্ব যে বর্ত্তমানে শক্তিসঞ্চয় করবার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, তা আর আমাদের মনে নেই।

আধুনিকতম জগতে আজ কাজ ও খেলার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলেছে, কারণ কাজ ও খেলার জন্ম একই মানবীয় উৎস থেকে। বর্ত্তমান কালে আমরা জার্মান, ইতালীয় ও রাশিয়ান শক্তি-আন্দোলনের দ্বারা বোঝবার চেষ্টা করছি যে, কাজে যেমন জীবনীশক্তির ক্ষয় হয়, অবসরমূলক সব খেলা ও কাজের দ্বারা সেই জীবনীশক্তি পুনরায় পূরণ করা যেতে পারে; তাদের উৎস যেমন এক, সংযোগও তেমনই গভীর। কথাটা কিন্তু ভারতবর্ষে নূতন নয়। যদিও এত পরিষ্কার ক'রে তখনকার লোকেরা কথাটা ব'লে যান নি, কিন্তু তাঁরা এ উপলব্ধিটা করেছিলেন যে, কাজ ও অবসরপ্রসূত সব কিছুর নিবিড় যোগ আছে। বাৎস্যায়নের নির্দ্দিষ্ট চৌষট্টি কলা মানুষের অবসরসঙ্গত বিষয়, শরীরচর্চ্চার স্থান তার মধ্যে প্রধান না হ'লেও অগৌণ নয়। আজকের ইতালীয় কিংবা জার্মান অবসরমূলক বিষয়গুলির তালিকা এত বিরাট নয়, হিন্দু কলার মত তাদের প্রভাবও জীবনে এত গঠনশীল ও ব্যাপক নয়। আপাতত এইটুকু বলাই যথেষ্ট, কারণ তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে আমরা বিষয়ান্তরে এসে পড়ব।

ভারতীয় শরীরচর্চ্চার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যা আজও পৃথিবীর অন্য কোন দেশের শরীরচর্চ্চার বিষয়ে বলা যায় না। ভারতীয় শরীরচর্চ্চা ও খেলার প্রধানত দুটি বিভাগ আছে। এই দুটি বিভাগই কিন্তু ব্যক্তিগত, সমষ্টির সঙ্গে তার যোগ নেই। এবং সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাদের যা যোগ তা পরোক্ষ। সমষ্টিগতভাবে আত্মোৎকর্ষ লাভ করা হিন্দুশিক্ষার প্রধান অঙ্গ নয়। শরীরচর্চ্চার প্রথম বিভাগ আত্মার উৎকর্ষ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি আজকালকার ইউরোপীয় ধারার মত বাহ্যিক। এ ছাড়া অন্য একটি দিক আছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের ধারণা যে, সমষ্টিগত খেলা—group games ইউরোপ থেকে আমদানি করা হয়েছে। ধারণাটা যে ভুল, তা এখনই প্রমাণিত হবে।

আত্মার উৎকর্ষ সম্বন্ধীয় শরীরচর্চ্চারও দুটি বিভাগ—হঠযোগ ও পায়াৎ বা অভ্যাসম্। মনে হয়, দুটি ধারাই এক কালে তৈরি হয়েছিল। হঠযোগের প্রসারের বিষয়ে কিছু বলার আবশ্যক নেই, কিন্তু পায়াৎ যথেষ্টভাবে প্রচারিত হয় নি, আমাদের কাল পর্য্যন্ত তা ত্রিবাঙ্কুর দেশেই বেশি আবদ্ধ ছিল। পায়াতের অনেকগুলি বিভাগ আছে, তার যেমন আত্মার উৎকর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ, তেমনই সম্বন্ধ আছে অসিচালনার সঙ্গে। হঠযোগের মতই চিত্তশুদ্ধি ও ধর্ম্মাচরণ পায়াতের মূল কথা।

যৌগিক ব্যাপারে হঠযোগ তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে। হঠযোগের মূল লক্ষ্য—দেহের সব প্রকরণগুলির সমতা স্থাপন ক'রে যোগীর আধ্যাত্মিক জীবনে কিছুমাত্র বিক্ষেপ না ঘটানো। সেদিন পর্য্যন্ত হঠযোগ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল। আমরা কয়জন জনসমাজে হঠযোগের যে দিকটা প্রচার করেছি, তার আত্মার উৎকর্ষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, কারণ আমরা এই বিশেষ বিজ্ঞানের স্বাস্থ্য ও আরোগ্যমূলক দিকটাই গ্রহণ করেছি।

ব্যক্তিগত বাহ্যিক ব্যায়ামের প্রাচীন ভারতীয় ধারা তিনটি। প্রথম—ভার তোলা, দ্বিতীয়—ডণ্ড ও বৈঠক; তৃতীয়—লেজম (Lejam) দ্বারা ব্যায়াম। পদ্ধতি হিসাবে ভার তোলা খুব উন্নতি লাভ করেছিল ব'লে মনে হয় না। পদ্ধতিটি সীমাবদ্ধ। ভার তোলার যন্ত্র নাল যে ভাবে গঠিত, তাতে এই কথাই মনে হয় যে, সময়ে সময়ে শক্তিপরীক্ষা করা ছাড়া নালের ব্যবহার খুব ব্যাপক ছিল না। কিন্তু জনসমাজে এই শক্তিপরীক্ষা করবার ব্যাপারটা যে খুব প্রচারিত হয়েছিল, তার প্রমাণ যুক্তপ্রদেশের সকল স্থানে প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ শিবমন্দিরে এখনও এক একটা নাল প'ড়ে থাকতে দেখা যায়। আমি নিজে লক্ষ্ণৌ শহরে ভৈঁরোনাথের মন্দিরে এ রকম নাল তুলেছি। তা ছাড়া নাগপঞ্চমীর দিনে গুড়িয়ার মেলায় কুস্তির মত নাল তোলা শক্তিকামী যুবকদের অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়। নাল তোলা বিশেষ ক'রে কাশী ও মৃজাপুর অঞ্চলে আবদ্ধ। আমি এ যন্ত্রের ব্যবহার পঞ্জাবে দেখি নি, বাংলা দেশে দেখবার তো কোন কারণই নেই।

ডণ্ড ও বৈঠকের সম্বন্ধে আমার এক সময়ে মনে হ'ত যে, ও দুটি মুসলমানী ব্যায়াম, কিন্তু এখন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। হঠযোগের অনেক ব্যায়াম ইতর প্রাণীর দৈহিক গতির অনুরূপে তৈরি করা, ডণ্ড কুকুর ও বিড়াল জাতির দেহভঙ্গির হিসাবে তৈরি। জিনিসটা এত প্রাচীন যে, ওর জাতি নির্ণয় করার চেষ্টা করাটাই বাহুল্য হবে। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যায়াম নেই, যা ডণ্ড ও বৈঠকের মত বিজ্ঞানসম্মত, যা একটা বিরাট দেশের প্রত্যেক মানুষ যুগযুগান্ত ধ'রে মেনে আসছে।

লেজম প্রাচীন যান্ত্রিক ব্যায়াম। ভারতীয় কল্পনার একমাত্র যান্ত্রিক ব্যায়াম বলা যেতে পারে। লেজমের অনেক ব্যবহার দেখলেও আমি নিজে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করি নি, কাজেই এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে লেজম-প্রণালী আজও উত্তর-ভারতে বেঁচে আছে।

সমষ্টিগত ব্যায়ামের মধ্যে ভারতীয় কুস্তি শ্রেষ্ঠ, ভারতের এ অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সমষ্টিগত খেলায় কপাটি অপূর্ব্ব। খেলার বিজ্ঞান যা কিছু চায়, কপাটিতে দেহ ও মনের সেই ধর্ম্মগুলি বজায় থাকে।

কুস্তির উৎকর্ষ বেশি হয়েছে পৃথিবীর Islamic Beltএ—অর্থাৎ মরক্কো থেকে মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত মুসলমান-অধ্যুষিত দেশগুলিতে; এবং এ বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ হয়েছে পঞ্জাবে। আমার মনে হয়, আধুনিক ভারতীয় কুস্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের দৈহিক শক্তিকামনার সমন্বয় হয়েছে। হিন্দুভারতে যে প্রণালী প্রাচীন কাল থেকে বর্ত্তমান ছিল, তাতে মুঘল সম্রাটেরা অনেক কিছু যোগ ক'রে একটা নবধারা স্থাপন ক'রে গেছেন। এই ব্যাপারের আরম্ভ হয়েছিল বাবরের কালে, তিনি নিজে নামজাদা মল্ল ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কালে এসে পড়লে দেখা যায় যে, বাংলা দেশ তখন দৈহিক শক্তিচর্চ্চায় বিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্য বিলাপ করেছেন। কিন্তু এ অবস্থা যে খুব বেশি দিন ছিল, তা মনে হয় না। কারণ সেই সময় থেকে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার ব্যগ্রতা দেখা যায়। যে শক্তিচর্চ্চার আমরা তালিকা দিলাম, তার মধ্যে বাংলা দেশ বাদ পড়েছে। কোন কোন বাঙালী জমিদার ব্যক্তিগতভাবে কুস্তির চর্চ্চা ক'রে গেছেন; এবং তাঁদের মধ্যে কোন কোন লোকের প্রভাবে ঢাকা, মৈমনসিংহ, কলিকাতা প্রভৃতি শহরে কুস্তির এক একটা কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছিল, কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতিকে তা প্রভাবান্বিত করতে পারে নি।

এই অবস্থায় শক্তিকামী ও উদ্যমশীল বাঙালী যুবক ইউরোপীয় জিমন্যাস্টিক-আন্দোলনের সম্মুখীন হ'লে সাগরপারের এই নূতন ও উদ্যমপূর্ণ ব্যাপারটি তার মনকে ছেয়ে ফেললে। কি ক'রে যে এমন ঘটল, তা বোঝা দরকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মান দেশে ব্যায়ামের একটা নবধারার সৃষ্টি হ'ল, যা পুরোনো কালের লেখকদের মতে হিন্দুব্যায়ামধারার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। এই নব ব্যায়ামধারা জার্মানিতে প্রচারিত হবার আগে আরও উত্তরে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু অবশেষে জার্মানি সেটিকে গ্রহণ করলে, এবং তার সঙ্গে কিছু অভিনব যান্ত্রিক ব্যায়াম সংযুক্ত হ'ল—একেই আজ আমরা জিমন্যাস্টিক-ব্যায়াম বলি। যথাকালে ইংলণ্ডে এই ধারা প্রচারিত হ'লে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে কর্ম্মঠ ক'রে রাখবার জন্যে নবধারাটি Army Council গ্রহণ করলে।

সেকালে ভারতীয় ছাউনিগুলিতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈনিকেরা বৎসরে দু একবার নানা সামরিক ক্রিয়া ও জিমন্যাস্টিক-ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করত। আমি ছেলেবেলায় কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে দু চারটে এই রকম ব্যাপার দেখেছি, এখন অবশ্য এ ধরণের প্রদর্শনী বন্ধ করা হয়েছে, সেনাবাহিনীর ব্যায়ামধারারও আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। এমন কি, বহুকালপ্রচলিত Kochler method-এর musketry-ব্যায়ামেরও আর প্রচলন দেখা যায় না। ব্রিটিশ সেনার কাছ থেকে

বাঙালীর জিম্‌ন্যাস্টিকের প্রেরণা এল, এবং সেটি বাঙালীর কর্ম্মদক্ষতায় পরিণত হ'ল বহু ইংরেজ সার্কাসের দ্বারা। সার্কাসের মোহ বাঙালীকে আকর্ষণ করলে, এবং আমাদের সমাজ থেকে যেমন দক্ষ ব্যায়ামবীর তৈরি হ'ল, তেমনই এক দিকে হ'ল বাঙালী সার্কাসের প্রসার, অন্য দিকে বাঙালী বাংলার বাহিরে জিম্‌ন্যাস্টিক-ধারা প্রচার করতে রত হ'ল। আমি ব্যক্তিগতভাবে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জানতুম। লক্ষ্ণৌ শহরে জিম্‌ন্যাস্টিকের প্রবর্ত্তন করলেন বঙ্গবাবু নামে এক শক্তিমান ভদ্রলোক, সে প্রতিষ্ঠানটি এখন আর নেই। কানপুরে আজ যেটি বিবেকানন্দ-ব্যায়াম-সমিতি ব'লে খ্যাত, তার বয়স পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি। সেখানেই আমার ব্যক্তিগত ব্যায়ামচর্চ্চার হাতেখড়ি হয়েছিল ১৯০৬ সালে। আমার এই কাহিনীতে এই সমিতিটির অনেক কথাই বলতে হবে।

ফুটবল খেলাও বাংলা দেশে এসেছে ওই ব্রিটিশ সৈনিকের কাছ থেকে, এবং উত্তর-ভারতে অর্থাৎ কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে প্রথম প্রচারিত হয়েছে প্রণববাবু ব'লে এক ভদ্রলোকের দ্বারা,—আমাদের জন্মাবার অনেক পূর্ব্বে। স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র এলাহাবাদে ১৩৩ একর ভূমি দান করেছিলেন, যার ওপর আজ বিরাট অ্যাল্‌ফ্রেড পার্ক তৈরি হয়েছে। আগে রেলের টাইম-টেব্‌লে এলাহাবাদ শহরের বর্ণনায় এ কথা লেখা হ'ত, আজকাল আর হয় না। নীলকমলবাবুর পুত্র স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মিত্র অ্যাল্‌ফ্রেড পার্কে অনেক খরচ ক'রে একটা ব্যাণ্ড বাজাবার বেদী তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন, আগে তাতে চারুবাবুর নাম লেখা ছিল, এখন সেটা মুছে ফেলা হয়েছে। তেমনই ক'রে মুছে গেছে বঙ্গবাবু ও প্রণববাবুর নাম, এবং আরও কত পথপ্রদর্শক বাঙালীর নাম যে মুছে গেছে তার আর সংখ্যা নেই।

সৌভাগ্যক্রমে জিম্‌ন্যাস্টিকের আওতায় বাংলা দেশ থেকে কুস্তির চর্চ্চা লোপ পায় নি। কুস্তি অম্বুবাবু ও মুক্তাগাছার জমিদারদের কৃপায় বাংলায় বেঁচে রইল; আজ তা যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করেছে।

১৯১১ সালে আমি আধুনিক ভারোত্তোলন-ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন করি। ১৯২৫ সাল থেকে বাংলা দেশে এই নূতন ধারা অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করে, কয়েক বৎসর ধ'রে বাঙালী ভারোত্তোলক সমগ্র ভারত ও বর্ম্মায় শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। কিন্তু আজ কোন কিছুতেই বাঙালীর স্থান নেই। জিম্‌ন্যাস্টিকে আজ বাঙালীর পরিবর্ত্তে মালাবারী, ফুটবলে পশ্চিমা ও দক্ষিণী, ভারোত্তোলনে মালাবারী ও বর্ম্মী বাঙালীকে স্থানচ্যুত করেছে।

যাঁরা বলেন, বাংলার জলবায়ুর জন্য, বাঙালীর পারিপার্শ্বিকের জন্য বাংলা দেশে ও বাঙালীর ভেতর শক্তিমান পুরুষ তৈরি হয় না, তাঁরা ভুল বলেন। একান্তভাবে বাংলার আবহাওয়ায় গোবরবাবু গ'ড়ে উঠেছেন, যাঁর তুলনায় কোন ভারতীয় মল্ল পাশ্চাত্য প্রদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করেন নি, গামাও না, ইমাম বক্সও না। এই বাংলার আবহাওয়াতেই জ্ঞানদাস দত্ত গ'ড়ে উঠেছেন, যাঁর মত ভারোত্তোলনের কৃতিত্ব আজ পর্য্যন্ত কোন এশিয়াবাসী দেখাতে পারেন নি।

# অ্যাল্‌সেশিয়ান

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

বর্ত্তমান জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় কুকুর অ্যাল্‌সেশিয়ান (Alsatian)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে এই জাতীয় কুকুরের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সুদূর অতীতকাল হইতে মানবজাতির জীবপ্রীতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ইতর প্রাণীকে আমরা সাধারণত গৃহপালিত ও বন্য এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। বন্য জীবই নানা বিবর্ত্তন ও অবস্থার মধ্য দিয়া মানুষের ও সমাজের সংস্রবে আসিয়া গৃহপালিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং মানুষের স্বাভাবিক বিচিত্র স্নেহের মধ্য দিয়া মানুষের সামাজিক জীবনের সুখদুঃখের সাথী হইয়া উঠিয়াছে। এই গৃহপালিত জীব মূক হইয়াও কেমন করিয়া মানুষের স্নেহ দয়ামায়া আকর্ষণ করিয়া তাহার বন্ধুত্ব দাবি করিতেছে, তাহার ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি না।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এক ফরাসী সৈনিক অ্যাল্‌সেশিয়ার এক ট্রেঞ্চে একটি পরিত্যক্ত কুকুরকে সঙ্গী হিসাবে পায়। কুকুরটি দেখিতে ঠিক জার্মানির মেষপালক (German shepherd-dog) কুকুরের মত। সমরক্লান্ত সৈনিকটি অতি শীঘ্রই কুকুরটিকে আপনার নিত্যসহচর করিয়া লইল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কুকুরটি তাহার সহচর হিসাবে যে অসামান্য বুদ্ধি ও তৎপরতার পরিচয় দিল, সে কাহিনী অতি শীঘ্র সমস্ত ইউরোপময় প্রচারিত হইয়া গেল, এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইয়াঙ্কি দেশের চিত্রব্যবসায়ীগণ এই কুকুরটিকে কেন্দ্র করিয়া একটি ছায়াচিত্র তুলিলেন। সেই ছবিই "রিন টিন টিন" নামে অতি শীঘ্র প্রসিদ্ধি-লাভ করিল, এবং কুকুরটিরও তৎসঙ্গে "রিন টিন টিন" নাম হইয়া গেল। এই ছবির মধ্যে কুকুরটি যে অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে, ইহার কথা পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই বা কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহা ব্যতীত এই জাতীয় কুকুর কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে রেড্‌ক্রস সোসাইটির কাজ অতি দক্ষতার সহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কুকুরের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যুদ্ধের সময় আহত ও মৃত সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাসপাতালে লইয়া আসিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিতে পারে। এইজন্যই অ্যাল্‌সেশিয়ান অতি সত্বর এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।
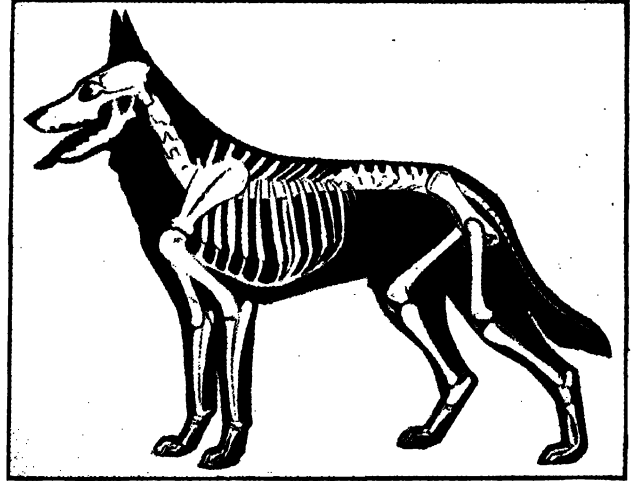
শৃগাল ও নেকড়ের মিশ্র প্রজননের ফলে কুকুরের জন্ম হইয়াছে। প্লিওসেন যুগের প্রথম দিকে যে কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ক্রিয়োদোন্তা

(Creodonta) নামক মাংসাশী জীবের ক্রমবিবর্ত্তনে কুকুরের পরিণতি। ক্রিয়োদোন্তা পরিবর্ত্তিত হয় মিয়াসাইড-(Miacidae) রূপে, তাহাও আবার রূপান্তরিত হয় সাইনোডিক্‌টিস-(Cynodictis) রূপে। আজকাল কুকুর যেমন নখে ভর দিয়া হাঁটে, সাইনোডিক্‌টিস হাঁটিত তেমনই থাবায় ভর দিয়া। সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ শতাব্দীতে এই সাইনোডিক্‌টিসই কুকুররূপে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য সাইনোডিক্‌টিস হইতে কুকুরের রূপ গ্রহণ করিবার জন্য এই জীবজন্ম উচ্চ বিবর্ত্তনের বহু রূপের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের ব্রোঞ্জযুগ বলিয়া যে যুগ-বিভাগটি আছে, সেই যুগে নাকি মানুষ ভাষাকে আপনার ভাবপ্রকাশের বাহন করিয়া লইয়াছিল—সেই যুগ হইতেই সাইনোডিক্‌টিস জীব কুকুরের রূপ পাইয়াছে। ঐ সময় হইতেই ইউরোপে কুকুরকে মেষপালক হিসাবে দেখিতে পাইতেছি। এই ভাবে বহুজাতীয় কুকুর ইউরোপে মেষরক্ষক ও মানুষের সঙ্গী হিসাবে সমাজে স্থান পাইয়াছে।
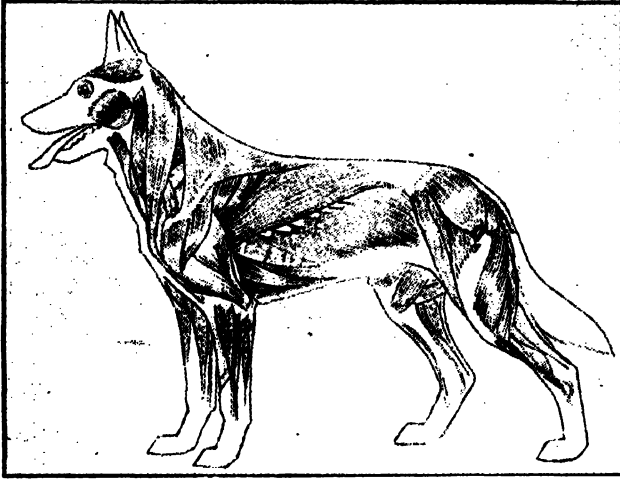
অ্যাল্‌সেশিয়ান নামক কুকুরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৯১৬ সালের পর হইতে। এই কুকুরের নাম যে কি করিয়া অ্যাল্‌সেশিয়ান হইয়া গেল, তাহার সঠিক ইতিহাস দেওয়া কঠিন। জার্ম্মানির সীমান্তে অ্যাল্‌সেশিয়ায় ইহার জন্ম বলিয়া ইহার নাম অ্যাল্‌সেশিয়ান হইয়াছে বলিয়া যে কাহিনীটি রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন। জার্ম্মানির বহু স্থানে এই জাতীয় কুকুর পাওয়া যায়। তবে ইহা ঠিক যে, ইংরেজগণ বুল্‌ডগকে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া যেরূপ দাবি করেন, সেইরূপ জার্ম্মানগণ অ্যাল্‌সেশিয়ানকে তাঁহাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া দাবি করিতে পারেন।

অ্যাল্‌সেশিয়ান একটি মিশ্র সঙ্কর জাতীয় কুকুর। প্রবাদ আছে যে, নেকড়ে বাঘ হইতে অ্যাল্‌সেশিয়ানের প্রজনন হইয়াছে। এইজন্য ইউরোপে অ্যাল্‌সেশিয়ান্ "নেকড়ে-কুকুর" (wolf-dog) বলিয়া সমাদৃত। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মতদ্বৈধ আছে। একদল বলেন, নেকড়ের রক্তই অ্যাল্‌সেশিয়ানের মধ্যে প্রবল, এবং ইহার শারীরিক গঠন, মুখের আকার, চলার ভঙ্গির সহিত নেকড়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। অন্য পণ্ডিতদল ইহার প্রতিবাদে বলেন যে, নেকড়ের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। কারণ অ্যাল্‌সেশিয়ানের চোখ নেকড়ের মত নাসিকা-সংলগ্ন নয়, মুখের সম্মুখভাগ নেকড়ের চেয়ে অনেক স্থূল। লেজ ও শরীর-গঠনের অনেক পার্থক্য আছে। অ্যাল্‌সেশিয়ান যে নেকড়ে হইতেই আসিয়াছে, তাহার একটি আখ্যানের বহুলপ্রচার হইয়াছে। আমরা সেইটি উল্লেখ করিতেছি।

কোন এক ডিউক নেকড়ে শিকার করিতে গিয়া এক নেকড়ে-শাবকের উপর স্নেহপ্রবণ হইয়া সেইটি বাড়িতে লইয়া আসেন। সেই বাচ্চাটি ছিল মাদী। মাদী নেকড়েটি ডিউকের বাড়িতে থাকিয়া

তাঁহার কুকুরটির সঙ্গী হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে দেখা গেল যে, নেকড়েটির স্বভাব, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। ক্রমে নেকড়েটির গর্ভেই কুকুরের বাচ্চা হইল। এবং তখন আরও দেখা গেল যে, সেই নেকড়েটি ঠিক কুকুরের মত আপনার শাবককে মাতৃস্নেহে পালন করিয়া তুলিতে লাগিল। এইরূপে সেই নেকড়ে-কুকুরের মিশ্র প্রজননের মধ্য দিয়া অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুরের জন্ম হইয়াছে।

এই মিশ্র প্রজননে যে কুকুরের জন্ম হইল, ক্রমে দেখা গেল, ইহার মধ্যে অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রহিয়াছে। জার্মানির মেষপালকগণ এতদিন নেকড়ের উৎপাতে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুরের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে, এক একজন মেষপালককে নেকড়ের উৎপাত হইতে মেষ রক্ষা করিবার জন্য বহু কুকুর পুষিতে হইত, এবং সব সময় সেই কুকুরেরা নেকড়ের দলকে হটাইয়া দিতে পারিত না। অ্যাল্‌সেশিয়ানের উৎপত্তি হইবার পর দেখা গেল যে, ইহারা অল্প কয়েকটিতেই মস্ত বড় নেকড়ের দলকে হটাইয়া দিতে পারে। অধিকন্তু ইহা পুষিবার জন্য গৃহস্থকে খুব বেশি খরচও করিতে হয় না। সাধারণ গৃহস্থ যেরূপ আহার করে, সেই আহারেই ইহারা বেশ সুস্থ ও সবল থাকে।

এই ভাবে ধীরে ধীরে অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুরের খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল জাতিই ইহার সমাদর করিতে লাগিল। ইংরেজ কিন্তু কিছুতেই এই অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুরকে গ্রহণ করিতে পারিল না। ইংরেজজাতির উৎকট স্বাজাত্যবোধ এই ব্যাপারেও প্রবলভাবে দেখা গেল। বিলাতে সেইজন্য অ্যাল্‌সে-শিয়ানের মত বুদ্ধিমান, তৎপর ও কার্য্যক্ষম কুকুর প্রজনন করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা লইয়া বহু পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও বিলাতে অ্যাল্‌সেশিয়ানের সমকক্ষ কুকুর জন্মায় নাই। কিন্তু তাঁহারা এখনও হাল ছাড়েন নাই।

এ সত্ত্বেও, কিছুদিন হইল, বিলাতেও অ্যাল্‌সেশিয়ান জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। জার্মানগণ কোন এক সময়ে ওয়েল্‌সের যুবরাজকে একটি অ্যাল্‌সেশিয়ান উপহার দেন। সেই কুকুরটি আপনার বুদ্ধিমত্তা ও তৎপরতার জন্য যুবরাজের এত প্রিয় হইয়া উঠে যে, সেটি তাঁহার নিত্য সঙ্গী ছিল। সেই সময় হইতেই যুবরাজের প্রশংসায় প্রলোভিত হইয়া ধীরে ধীরে ইংরেজগণও অ্যাল্‌সেশিয়ানভক্ত হইয়া উঠিতেছেন। কিছুদিন হইল, বিলাতেও কয়েকটি ভাল ভাল অ্যাল্‌সেশিয়ান ক্লাব গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং সেই সমস্ত কেনেল ক্লাব হইতে যে সকল কুকুর জন্মিতেছে, তাহা খাঁটি জার্মান অ্যাল্‌সেশিয়ান হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

ভারতবর্ষে ঠিক কোন্‌ সালে অ্যাল্‌সেশিয়ানের আগমন হয়, তাহা আমার সঠিক জানা নাই।

বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম জি. এন. দে নামক কলিকাতার এক ভদ্রলোক অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর এদেশে আনান। তাঁহার পর পাতিয়ালার মহারাজাও অ্যাল্‌সেশিয়ান আনান। আজ কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে এই অ্যাল্‌সেশিয়ান দেখা যাইতেছে। গত দশ বৎরের মধ্যেই এই কলিকাতা শহরে প্রায় দশ সহস্র অ্যাল্‌সেশিয়ান আমদানি হইয়াছে।
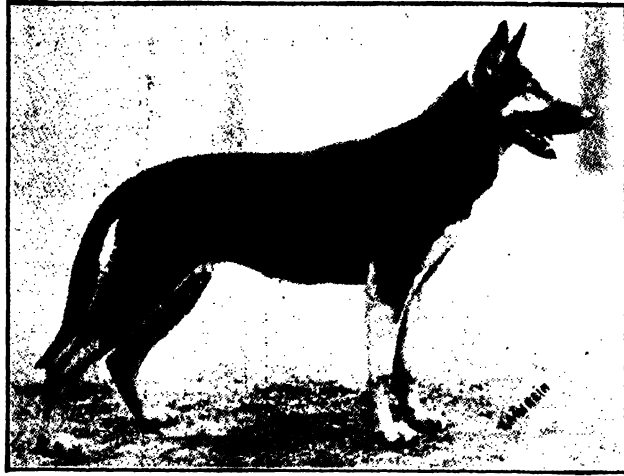
অ্যাল্‌সেশিয়ানের মত প্রভুভক্ত কুকুর আছে বলিয়া আমি জানি না। এই কুকুর সম্বন্ধে বহু সত্য ঘটনা বহু কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দুইটি কাহিনী দিতেছি।

আমার কোন আত্মীয়ার মস্তিষ্কবিকৃতি আছে। রোগ বৃদ্ধি পাইলে তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়া যায়। রক্ত না দেখিলে তিনি সুস্থ হন না। যখন কোন উপায়েই কিছু করিতে পারেন না, তখন নিজের হাত পা কামড়াইয়া রক্ত বাহির করেন। একবার বিকালবেলায় বেড়াইতে বাহির হইবার সময় আমাকে তিনি অকস্মাৎ একটি বঁটি লইয়া আক্রমণ করেন। সেদিন আমার কুকুরটি সঙ্গে না থাকিলে আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কুকুরটি লাফ দিয়া তাঁহার কব্জিতে কামড়াইয়া ধরে। এমন ভাবে ধরিয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই হাত আর নাড়াইতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার হাতে দাঁত বসে নাই।

আর একবার এই কুকুরটি আমার জলমগ্ন ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাঁচাইয়াছিল। আমার কুকুটির বুদ্ধিমত্তার মধ্যে বন্ধ আলমারি হইতে ডিম চুরি করিয়া খাইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। যে ভাবে সে আলমারি খুলিয়াছিল, তাহাতে তাহার বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির সমপর্য্যায়ে ফেলা যায়।

অ্যাল্‌সেশিয়ানের বহু বিচিত্র প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছি। কোনরূপ সঙ্গীত ইহারা ভালবাসে না; এবং ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, নারীজাতির হুকুম মানিতে ইহারা বিশেষ তৎপরতা দেখায় না।

# বিপিনের সংসার

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈকালে বিপিন গ্রামের উত্তরে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠের ওপারেই একটি ছোট মুসলমান গ্রাম, নাম বেল্‌তা। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরি আছে দেখিয়া সে ভাবিল, না হয় এক কাজ করি, আইনদ্দি চাচার বাড়ি ঘুরে যাই। অত বড় গুণী লোকটা, বলাইয়ের অসুখ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ক'রে দেখি, যদি কিছু করতে পারি। অনেক মন্তর-তন্তর জানে কিনা।

আইনদ্দি বাড়ির সামনে বাঁশতলায় বসিয়া মাছ-ধরা ঘুণির বাখারি চাঁচিতেছিল। চোখে সে ভাল দেখে না, বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, আসুন বাবাঠাকুর, আসুন, কবে এলেন বাড়ি? এইখানা নিয়ে বসুন।—বলিয়া একখানা খেজুরপাতার চেটাই আগাইয়া দিল।

বিপিন বলিল, চাচা, তোমাকে তো কক্ষনও বিনি কাজে থাকতে দেখি না? চোখে ঠাওর হয়?

—না বাবাঠাকুর, ভাল আর কনে! হ্যাদে, একখানা চশমা এনে দিতি পার? চশমা ন'লি আর চকি ভাল ঠাওর পাই নে ঝে!

—বয়েস তোমার তো কম হ'ল না চাচা, চোখের আর দোষ কি বল!

—তা একশো হয়েছে। যেবার মাৎলার রেলের পুল হয়, তখন আমি গরু চরাতি পারি। আপনি এখন হিসেব ক'রে দেখ।

এ দেশে সবাই বলে আইনদ্দির বয়স একশো। আইনদ্দি নিজেও তাহাই বলে। আবার কেহ কেহ অবিশ্বাস করে। বলে, মেরে কেটে নব্বুই বিরেনব্বুই। একশো! বললেই হ'ল বুঝি!

মাৎলার পুল কত সালে হয় বিপিন তাহা জানে না, সুতরাং আইনদ্দির বয়সের হিসাব তাহার দ্বারা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে অন্য কথা পাড়িল। বলিল, চাচা, তুমি অনেক রকম মন্তর-তন্তর জান, এ কথাটা তো শুনে আসছি বহুদিন।

বিপিন এই একই কথা অন্তত বিশ বার আইনদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে গত দশ বৎসরের মধ্যে। আইনদ্দিও প্রত্যেক বারেই একই উত্তর দেয়, একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া। আজও সে সেই ভাবেই বেশ একটু গর্ব্বের সহিত বলিল, মন্তর? তা বেশি কথা কি বলব, আপনাদের বাপমার আশীর্ব্বাদে মন্তর সব রকম জানা ছেল। সেসব কথা ব'লে কি হবে, এদিগরের কোন্ লোকটা জানে না আমার নাম? তবে এই শোন। শন্যভরে যাব, আগুন খাব, কাটামুণ্ডু জোড়া দেব—

বিপিন এ কথা আইনদ্দির মুখে অনেক বার শুনিয়াছে, তবুও বৃদ্ধকে ঘাঁটাইয়া এ সব কথা শুনিতে তাহার ভাল লাগে। বিপিনের হাসি পায় এ কথা শুনিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আইনদ্দির উপর শ্রদ্ধা তাহাতে কিন্তু কমে না। বিপিন যুবক, এই শতবর্ষজীবী বৃদ্ধের প্রত্যেক কথা হাবভাব তাহার কাছে এত অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকে। এইজন্যই সে বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে ইহার নিকট

আসিয়া খানিকক্ষণ কাটাইয়া যায়। এ যে জগতের কথা বলে, বিপিনের পক্ষে তাহা অতীত কালের জগৎ। বিপিনের সঙ্গে সে জগতের পরিচয় নাই। নাই বলিয়াই তাহা রহস্যময়।

আইনদ্দি তামাক সাজিয়া হাতখানেক লম্বা এক খণ্ড শোলার নীচের দিকে বাঁশের সরু শলার সাহায্যে একটা ফুটা করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, তামাক সেবা কর বাবাঠাকুর।

বিপিন বলিল, চাচা, তুমি কানসোনার কুঠী দেখেছ?

—খুব। তখন তো আমার অনুরাগ বয়েস। কুঠীর মাঠে নীলের চাষ দেখিছি। এই শোনবা? আমার সম্বন্ধির ছেলে জহিরদ্দি তখন জন্মায়, তিনি বড় চাকরি করত, এখন কুড়ি টাকা ক'রে পেন্সিল খাচ্ছে। তা ভাব তবে সে কত দিনির কথা।

বিপিন বলিল, কি চাকরি করত?

—কি চাকরি আমি জানি বাবাঠাকুর? পেন্সিল খাচ্ছে যখন, তখন বড় চাকরিই হবে।

—চাচা, একটা কবিতা বল তো শুনি? মনে আছে?

আইনদ্দি একগাল হাসিয়া বলিল, আ আমার কপাল! কবিতা শোনবা? রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ ছিল। এখন আর কি মনে থাকে সব কথা বাবাঠাকুর? এই শোন—

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

বিপিন বাংলা সাহিত্যের তেমন খবর না রাখিলেও এটুকু বুঝিল যে, ইহা বিদ্যাসুন্দরের কবিতা। বলিল, এ কবিতা তোমার মুখে কখনও শুনি নি তো চাচা? রামায়ণ-মহাভারতের কবিতাই তো বল। এ কোথায় শিখলে?

—আমার যখন অনুরাগ বয়েস, তখন বিদ্যেসুন্দরের ভারী দিন ছেল ঝে! বিদ্যেসুন্দরের যাত্রা হ'ত, গোপাল উড়ের নাম শুনিছিলে? সেই গাইত বিদ্যেসুন্দর। আমরা সমবয়সী কজন পরামর্শ ক'রে বিদ্যেসুন্দরের বই আনালাম। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কবিওয়ালার বই। এত ভাল লেগে গেল! তারপর আনালাম অন্নদামঙ্গল। বিদ্যেসুন্দর বই ভাল, তবে বড্ড হে-পানা—

—কি পানা চাচা?

—বড্ড হে-পানা; আপনাদের কাছে আর বলব? ছেলে-ছোকরা মানুষ তোমরা, আপনাদের কাল হতি দেখলাম, সে আর আপনি শুনে কি করবা? ওই বিদ্যে ব'লে এক রাজকন্যে, তার সঙ্গে সুন্দর ব'লে এক রাজপুত্তুরের আসনাই হয়—এই সব কথা। প'ড়ে দেখো। বিদ্যের রূপ শোনবা কেমন ছেল?

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥
কিছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মুখ করি কোলে॥

কবিবর ভারতচন্দ্র স্বর্গ হইতে যদি দেখিতে পাইতেন, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে কত নবীন প্রতিভার প্রভাবের মধ্যেও তাঁহার এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্তের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার উৎসাহ-পূর্ণ আবৃত্তি শুনিয়া নিশ্চয়ই খুব খুশি হইতেন। বিপিনের এ কথা অবশ্য মনে হইল না, সে সাহিত্য-রসিক নয়, বা কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোনও বাংলা কবির সহিতই তাহার পরিচয় নাই।

কিন্তু বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়া তাহার কেন যে মানীর কথা মনে হইল হঠাৎ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বিদ্যা তো নয় মানী! কবি যেন তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিয়াই এ বর্ণনা লিখিয়াছেন। মানী কাছে আসিলে তাহাকে খুব সুন্দরী বলিয়া বিপিনের মনে হয় নাই, কিন্তু দূরে গেলেই মানীকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মনে হয়। তাহার চোখ যতটা ডাগর, তাহার চেয়েও ডাগর বলিয়া মনে হয়, রঙ যতটা ফর্সা, তাহার চেয়েও অনেক ফর্সা বলিয়া মনে হয়, মুখশ্রী যতটা সুন্দর, তাহার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

আইনদ্দির বাড়ির পশ্চিমে বেল্‌তার মাঠ, অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা, মাঠের ওপারে হরিদাসপুর গ্রামের বাঁশবন। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও এখনও বেলা আছে, মাঠের মধ্যে ফুলে ভরা বাবলা-গাছের ডালে ডালে শালিক ও ছাতার পাখীর দল কলরব করিতেছে। নিকটে চাঁদমারির বিল থাকাতে বৈকালের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

বিপিনের মন কেমন উদাস হইয়া গেল।

জীবনে তাহার সুখ নাই, একমাত্র সুখের মুখ সে সম্প্রতি দেখিতে পাইয়াছে, অকস্মাৎ এক ঝলক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মানীর গত কয়দিনের কার্য্যকলাপ তাহার অন্ধকার জীবনে আলো আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানী তাহার কে?

কেহই নয়, অথচ সেই যেন সব বলিয়া আজ মনে হইতেছে।

অথচ মানী অপরের স্ত্রী—বিপিনের কি অধিকার আছে সেখানে? ইচ্ছা করিলেই কি তাহার সঙ্গে যখন তখন দেখা করিবার উপায় আছে?

মানী কেন দুই দিনের যত্ন দেখাইয়া তাহাকে এমন ভাবে বাঁধিল!

আইনদ্দি বলিল, একখানা কুমড়ো খাবে তো চল আমার সঙ্গে। বিলির ধারে জলি ধানের ক্ষ্যাতে আমার নাতি ব'সে পাখী তাড়াচ্ছে, সেখানথে দেব এখন। ডাঙার ওপারই কুমড়োর ভুঁই।

চাঁদমারির বিলের ধারে ধারে দীর্ঘ জলজ পাতিঘাসের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ। পড়ন্ত বেলার আধশুকনো ঘাসের রোদপোড়া গন্ধের সঙ্গে বিলের জলের পদ্মফুলের গন্ধ মিশিয়াছে। বিলের এপারে সবটাই জলি ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাঁশের মাচায় বসিয়া লোকে টিনের কানেস্তারা বাজাইয়া বাবুইপাখী তাড়াইতেছে।

আইনদ্দির নাতির নাম মাখন। এ দেশে মুসলমানদের এ রকম নাম অনেক আছে—এমন কি ভুবন, নিবারণ, যজ্ঞেশ্বর পর্য্যন্ত আছে।

মাখনের বয়স চল্লিশের কম নয়, চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার বাবার বয়স প্রায় বাহাত্তর তিয়াত্তর। মাখন বেশ জোয়ান লোক, শুধু জোয়ান নয়, এ অঞ্চলের মধ্যে একজন ভাল গায়ক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে।

ঠাকুরদাদাকে আসিতে দেখিয়া মাখন বলিল, মোর জলপান কনে, হ্যাঁ দাদা?

পিছনে বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাচা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু যে! কখন আলেন? আপনি সেই কোথায় নায়েবী করচ শুনেলাম, তাই ইদিকি বড় একটা যাওয়া আসা কর না বুঝি?

আইনদ্দি বলিল, বাবাঠাকুরকে একটা বড় দেখে কুমড়ো এনে দে দিকি। ওই পূবির বেড়ার গায়ে যে কটা বড় কুমড়ো আছে, তা থেকে একটা আন।

—হ্যাদে, দূর দূর, ওই দেখ বাবাঠাকুর, এক ঝাঁক বাবুই এসে জুটল আবার! সুমুন্দির পাখীগুনো তো বড্ড জ্বালালে দেখচি!—বলিয়া আইনদ্দি নিজেই টিনের কানেস্তারা বাজাইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের ধারের বাবলা-বনে পড়িয়াছে, আইনদ্দির নাতি বিলের উপরের ডাঙায় কুমড়ো-ক্ষেত হইতে সুকণ্ঠে গাহিতেছে—

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি
ও মোর মনে জাগে তার নয়ান দুটি—

বাবুইপাখীর ঝাঁক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে, বৃদ্ধ আইনদ্দি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহারা নির্ব্বিবাদে আবার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

আইনদ্দির নাতির গানের কয়টি চরণ শুনিয়াই বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচে নাচের ধরণে উড্ডীয়মান বাবুইপাখীর ঝাঁক, বিলের ধারের জলে শোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য্য, সব মিলিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল।

যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা।

বিপিন কখনও প্রেমে পড়ে নাই জীবনে। প্রেমে পড়িবার অভিজ্ঞতা তাহার কখনও হয় নাই, মানীর সঙ্গে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর পূর্ব্বে। এখন সে বুঝিয়াছে, আজ মানী তাহার মনের যতটা কাছে, অতটা কাছে কেহ কখনও আসে নাই। বিপিন লেখাপড়া মোটামুটি জানিলেও নভেল নাটক বা কবিতা পড়ে নাই, প্রেমের কি লক্ষণ কবি বা ঔপন্যাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মনের এ শূন্যতা পূর্ণ হইবার নয়।

ইহাকেই কি বলে ভালবাসা?

হয়তো হইবে।

যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—বিপিনের জীবনে ইহা একেবারে নূতন।

সে যে ভাইয়ের অসুখের সম্বন্ধে আইনদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল, এ কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া কুমড়াটি হাতে লইয়া বিপিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিল।

বিপিনের একজন বন্ধু আছে এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে ভাসানপোতা গ্রামে। বন্ধুটির নাম জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে। বয়সে জয়কৃষ্ণ বিপিনের চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। কিন্তু ভাসানপোতার মাইনর স্কুলে উহারা দুইজনে এক ক্লাসে পড়িয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমানে উক্ত গ্রামের সেই স্কুলেই হেড-মাস্টারের কাজ করে। বি. এ. পর্য্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছিল।

এমন একজন লোক এখন বিপিনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। না বলিলে আর চলে না।—বিপিন মনের মধ্যে এসব আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

তাই পরদিন সে ভাসানপোতায় বন্ধুর বাড়ি গিয়া হাজির হইল। জয়কৃষ্ণ এ গ্রামের বাসিন্দা নয়, তবে বর্ত্তমানে কর্ম্ম উপলক্ষে এই গ্রামের সতীশ কর্ম্মকারের পোড়ো বাড়িতে বাহিরের দুইটি ঘর লইয়া বাস করিতেছে।

স্কুলের ছুটির পর জয়কৃষ্ণ নিজের ঘরে ফিরিয়া উনুন জ্বালাইয়া চা তৈয়ারির জোগাড় করিতেছে, বিপিনকে হঠাৎ এ সময়ে দেখিয়া বলিল, আরে বিপিনে যে! আয় আয়, ব'স। কবে এলি রে বাড়িতে?

বিপিন দেখিল, জয়কৃষ্ণ একা নাই—ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ আটত্রিশ, এ গ্রামের স্কুলে আজ প্রায় আট দশ বছর মাস্টারি করিতেছে, থাকে জয়কৃষ্ণের বাসায় অন্য ঘরটিতে, কারণ জয়কৃষ্ণ স্ত্রীপুত্র লইয়া এখানে বাস করে না; বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীই উপরওয়ালা হেড-মাস্টারের এক রকম পাচক ও ভৃত্য উভয়ের কাজই করে। বিনিময়ে জয়কৃষ্ণ তাহাকে খাইতে দেয়।

এসব কথা বিপিন জানিত, কারণ সে আরও বহুবার ভাসানপোতায় আসিয়াছে জয়কৃষ্ণের সঙ্গে

দেখা করিতে। বলা বাহুল্য, বিপিন ও জয়কৃষ্ণ যখন এই স্কুলের ছাত্র, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী তখন স্কুলের মাস্টার ছিল না, উহারা পাস করিয়া বাহির হইয়া যাইবার অনেক পরে সে আসিয়া চাকুরিতে ঢোকে।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন জয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া মানীর কথা তাহাকে বলিতে লাগিল। বেশ সবিস্তারেই বলিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একটু দূরে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া বিপিন গলার সুর আরও একটু নীচু করিল।

বিশ্বেশ্বর দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা কি শুনতে পাব না কথাটা, ও বিপিনবাবু?

—এ আমাদের একটা প্রাইভেট কথা হচ্ছে।

—প্রাইভেট আর কি! কোন মেয়েমানুষের কথা তো? বলুন না, একটু শুনি। বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি বলিল দেখিয়া বিপিন একটু মজা করিবার জন্য কহিল, আসুন না এদিকে, বলছি।

তারপর সে এক কাল্পনিক মেয়ের সঙ্গে তাহার কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে সুরু করিল। একবার ট্রেনে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। মেয়েটির নাম বিজলী। তাহার বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে কলিকাতায় মামার বাসায় যাইতেছিল। বিজলী কলিকাতায় মামার বাসার ঠিকানা দিয়া তাহাকে যাইতে বলে। বিপিন অনেকবার সেখানে গিয়াছিল, বিজলী কি আদরযত্ন করিত! বার বার আসিতে বলিত। একদিন বিপিন তাহার বাপ-মাকে বলিয়া বিজলীকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়। সেখানে বিজলী মুখ ফুটিয়া বলে, বিপিনকে সে ভালবাসে।

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে বলিল, এ কতদিনের কথা?

—তা ধরুন না কেন, বছর ছ সাত আগের ব্যাপার হবে।

—এখন সে মেয়েটি কোথায়?

—এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি থাকে।

—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আলাপ আবার নেই! দেখা হয় মাসে মাসে তার সেই মামার বাসায়, তখন ভারী যত্ন করে।

—কি রকম যত্ন করে?

—এই, গল্পগুজব করে, উঠতে দেয় না, বলে, বসুন বসুন। খুব খাওয়ায়। এর নাম যত্ন আর কি। আমায় কত চিঠি লিখেছে লুকিয়ে।

—বলেন কি! চিঠিপত্র লিখেছে!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। মেয়েমানুষ লুকাইয়া যে চিঠি লেখে—সে চিঠি যে পায়, তাহার কি সৌভাগ্য না জানি! বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, সেসব চিঠিতে কি লেখা আছে জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু নিতান্ত ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয় ধলিয়া, বিশেষত যখন বিপিনের সঙ্গে তাহার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নাই, সে কথা বলিতে পারিল না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনার জীবনে এ রকম কখন কিছু নিশ্চয় হয়েছে, বলুন না শুনি।

বিশ্বেশ্বর নিতান্ত হতাশ ও দুঃখিত ভাবে খানিকটা আনমনেই বলিল, আমাদের এ রকম কখনও কেউ চিঠি লেখে নি, চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কোন মেয়ে কিছু বলেও নি। সাহস ক'রে কাউকে কখনও কিছু বলতেও পারি নি। জীবনে কিছু দেখলাম না মাস্টারবাবু, সত্যি বলছি, এই এত বয়েস হ'ল।

—বিয়েও তো করলেন না।

—বিয়ে কি ক'রে করব মাস্টারবাবু, দেখতেই পাচ্ছেন সব। পঁচিশ টাকা মাইনে লিখি স্কুলের খাতায়, পাই পনরো টাকা। ন মাতা ন পিতা, মামার বাড়ি মানুষ হয়েছি দুঃখে কষ্টে। তেমন লেখাপড়াও শিখি নি। মামাদের দোরে তাদের চাকরগিরি ক'রে হাট বাজার ক'রে অতিকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পাস করি।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিয়ে করলে আপনার লোক পেতেন বিশ্বেশ্বরবাবু। এর পরে দেখবেন, একজন মানুষ অভাবে কি কষ্ট হয়!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলিল, এর পর কেন, এখনই হয়। সত্যি বলছি মাস্টারবাবু, জীবনে একটা ভাল কথা কখনও কেউ বলে নি, বড় দুঃখে এ কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না, কারও মুখে একটা ভালবাসার কথা, এই উনি যেমন বলছেন, এ তো কখনও শুনিই নি, কাকে বলে জানিও না। তাই এক এক সময় ভাবি, জীবনটা বৃথায় গেল মাস্টারবাবু, কিছুই পেলাম না জীবনে।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী এমন হতাশ স্বরে এ কথা বলিল যে, সে যে অকপটে সত্য কথা বলিতেছে, এ বিষয়ে বিপিনের কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। সে যে কিছুদিন আগেও ভাবিত, তাহার তুল্য অসুখী মানুষ দুনিয়ায় কেহ নাই, ইহার বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপিনের সে ধারণা দূর হইল।

এই ভাগ্যহত দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের উপর বিপিনের হঠাৎ বড় করুণার উদ্রেক হইয়া তাহার প্রতি যেন একটা অহেতুক ভালবাসা জন্মিল।

হঠাৎ মনে হইল, জয়কৃষ্ণ তাহার এতদিনের বন্ধু বটে, কিন্তু জয়কৃষ্ণের চেয়েও এই অর্দ্ধ-পরিচিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী যেন তাহার অনেক আপন। ইহা দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রের সমবেদনা নয়, দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা।

কারণ বিপিন এখন ধনী। আজই এইমাত্র বিপিন ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে, সে কত বড় ধনী।

বাড়িতে আসিয়া প্রথম দিন পাঁচ ছয় বলাই বেশ ভাল ছিল। বিপিন চাকুরিস্থলে চলিয়া গেলে সে একদিন গ্রামের নবীন রায় মহাশয়ের বাড়িতে বসিয়া আছে। নবীন রায়ের ছেলে বিষ্ণু বলিল, বলাইদা, মাংসের ভাগ নেবে? আমরা উত্তরপাড়া থেকে ভাল খাসি আনিয়েছি, এবেলা কাটা হবে। সাত আনা ক'রে সের পড়তা হচ্ছে।

বলাই অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলেই অসুখ বাধাইয়াছিল। মাংস খাওয়া তাহার বারণ আছে, এবং দাদা বাড়ি থাকার জন্যই সে বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করে নাই। কিন্তু এখন আর সে ভয় নাই।

মনোরমা বারণ করিয়াছিল। বলাই বউদিদিকে তত আমল দেয় না, ফলে তাহার মাংস খাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারিল না।

দুই তিন দিনের মধ্যে বলাই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিপিন অসুখের খবর পাইয়াও বাড়ি আসিতে পারিল না, জমিদার অনাদিবাবু কিস্তির সময় ছুটি দিতে চাহিলেন না।

দিন কুড়ি পরে বিপিন বাড়ি আসিয়া দেখিল, বলাই একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বলাই বাড়ির সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া দাদাকে মাংস খাওয়ার কথা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিপিনের কানে সে কথা কেহ তুলিল না।

বিপিন একদিন বাড়ি থাকিয়াই চলিয়া গেল। বলাই আবার কুপথ্য সুরু করিয়া দিল। কখনও লুকাইয়া, কখনও বা বাড়ির লোকের কাছে কান্নাকাটি করিয়া, আবদার ধরিয়া।

মাস দুই এই ভাবে কাটিবার পরে বিপিন পাঁচ ছয় দিনের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিল। তাহার বাড়ি আসিবার প্রধান কারণ, পৈতৃক আমলের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটি এবার খড় তুলিয়া ভাল করিয়া ছাইয়া লইবে। এ সময় ভিন্ন খড় কিনিতে পাওয়া যাইবে না পাড়াগাঁয়ে।

বাড়ি আসিয়া প্রথমেই বলাইকে দেখিয়া বিপিনের বাড়ি আসিবার আনন্দ উৎসাহ এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। একি চেহারা হইয়াছে বলাইয়ের! চোখ মুখ ফুলিয়াছে, রঙ হলদে, পায়ের পাতাও যেন ফুলিয়াছে মনে হইল; অথচ নেফ্রাইটিসের রোগী দিব্য মনের আনন্দে নির্ব্বিচারে পথ্য অপথ্য খাইয়া চলিয়াছে।

বিপিন কাহাকেও কিছু বলিল না, তাহার মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল ভাইটার অবস্থা দেখিয়া। সেবার কিছু সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিল, কোথায় সে ভাবিতেছে, এবার গিয়া দেখিবে, ভাইটি বেশ সারিয়া সামলাইয়া উঠিয়াছে। সারিয়া ওঠা তো দূরের কথা, রাণাঘাট হাসপাতালে সেবার লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যা চেহারা ছিল, তাহার চেয়েও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দুই দিন পরে বিপিন নদীর ধারে মাছ ধরিতে যাইবে, বলাই বলিল, দাদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে? বল তো যুগীপাড়া থেকে আর দুখানা ছিপ নিয়ে আসি।

বলাই উঠিয়া হাঁটিয়া খাইয়া-দাইয়া বেড়াইত বলিয়া বাড়ির লোকে হয়তো ভাবে, তবে অসুখ এমন কঠিন আর কি! কারণ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার এই যে, শয্যাশায়ী এবং উত্থানশক্তিরহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও অসুস্থ বলিয়া ধারণা করিবার মত বুদ্ধি সেখানে খুব কম লোকেরই আছে।

মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনে নদীর ওপারে গিয়া বসিল, কারণ এপারে জলে শেওলার দাম বড় বেশি।

চার করিয়া ছিপ ফেলিয়া বিপিন বলিল, বলাই, একটু তামাক সাজ তো কল্কেটায়। আর মাঠ থেকে একটু গোবর কুড়িয়ে নিয়ে আয়, বড্ড চিংড়িমাছে জ্বালাচ্ছে, একটু ছড়িয়ে দিই।

বলাই বলিল, দাদা, গোবর দিলে চিংড়ি মাছ বেশি ক'রে আসবে।

—তুই তো সব জানিস, দে আগে তামাকটা সেজে।

বেলা পড়িতে বেশি দেরি নাই। অনেকক্ষণ বিপিন ছিপ ফেলিয়া একমনে বসিয়া আছে, বলাইও তাহার পাশেই কিছু দূরে ছিপ ফেলিয়াছে। উভয়েরই ছিপের ফাতনা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্তব্ধ। হঠাৎ বিপিন মুখ তুলিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিতেই দেখিল, বলাইয়ের চোখ ছিপের ফাতনার দিকে নাই। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একদৃষ্টে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছে!

কি দেখিতেছে বলাই?

বিপিন কৌতূহলী হইয়া ভাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ওপারের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, ওপারেই চটকাতলার শ্মশান। ওপারের জঙ্গলের বহু গাছপালার মধ্যে বিপিন লক্ষ্যই করে নাই যে, তাহারা শ্মশানতলীর বুড়ো চটকাগাছটার ঠিক এপারে আসিয়া বসিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কোনও কারণও ছিল না এতক্ষণ।

কিন্তু বলাই ওদিকে অমন ভাবে চাহিয়া আছে কেন?

বলাই যেন উদাস, অন্যমনস্ক। দাদা যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এ খেয়ালও তাহার নাই।

বিপিন বলিল, ওদিকে অমন ক'রে কি দেখছিস রে?

বলাই চকিতে ওপারের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, না, কিছু না, এমনই।

বিপিন যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল, অথচ কেন যে আশ্বস্ত হইল, কি ভয়ই বা করিতেছিল, তাহা তাহার নিজের নিকট খুব যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা নহে। তবুও মনে মনে ভাবিল, কিছু না, এমনিই চেয়ে ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য রাখিবার পরে ভাইয়ের দিকে একবার চোখ ফেলিতেই সে দেখিল, বলাই আবার পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে ওপারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বিপিন উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে? কি দেখছিস বল তো?

বলাই বলিল, না, কিছু দেখছি না। এমনিই।—বলিয়াই সে যেন দাদার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াটা ঢাকিয়া লইবার আগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছিপ তুলিয়া বঁড়শিতে নূতন কেঁচোর টোপ গাঁথিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আবার খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। বেলা একদম পড়িয়া গিয়াছে। ওপারের বড় বড় শিমুল শিরীষ বা তেঁতুল গাছের মগডালে পর্য্যন্ত একটুও রাঙা রোদের আভা নাই। মাঠের যেখানে তাহারা বসিয়াছে, তাহার আশেপাশে চিচ্চিড়ে ফলের বনে সারাদিনের রোদ পাইয়া রোদ-পোড়া ফলের শুঁটিগুলি পিড়িক পিড়িক শব্দ করিয়া ফাটিতেছে। এই সময়টা মাছ খায়, সুতরাং বিপিন ভাবিল, অন্তত আর আধ ঘণ্টা আপেক্ষা করিয়া যাইবে।

হঠাৎ তাহাদের সামনে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিঃশব্দে ভাসিয়া উঠিয়া চার পা নাড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে বলাইয়ের ছিপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন আসিতে লাগিল।

বিপিন বলাইকে কথাটা বলিতে গিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, কচ্ছপটা যে ভাসিয়া উঠিয়াছে বা তাহারই ছিপের দিকে সাঁতরাইয়া আসিতেছে, বলাইয়ের সেদিকে দৃষ্টিই নাই; সে আবার সেই ভাবে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে।

বিপিন ধমক দিয়া বলিল, এই! কি দেখছিস ওদিকে অমন ক'রে? ওদিকে তাকাস নি।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিপিনের মনে হইল, এ কথা বলাইকে এ ভাবে বলা ভাল হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহটা অমূলক বা অস্পষ্ট ছিল, সেটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিপিনের হাতে পায়ে যেন বল কমিয়া গেল, মন বেজায় দমিয়া গেল। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ওপারের চটকাতলার শ্মশানের মড়ার বাঁশ ও ফুটা কলসীগুলা যেন কি ভয়ানক অমঙ্গলের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে! ভাসমান কচ্ছপটাও। সে তাড়াতাড়ি ছিপ গুটাইয়া ভাইকে বলিল, নে, চল, বাড়ি চল। সন্ধ্যে হ'ল। আমি ছিপগুলো বেঁধে নিই। তুই ততক্ষণ বাঁশতলার ঘাটে গিয়ে পারের নৌকো ডাক দে।

রোগা ভাইটাকে শ্মশানের সান্নিধ্য হইতে যত তাড়াতাড়ি হয় সরাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

ক্রমশ

---

# প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী

শেক্স্পীয়রের সনেট অবলম্বনে

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

১

তোমার ওরূপে কার অধিকার—এই কথা নিয়া প্রিয়ে,
বুকে আর চোখে বেধে গেছে মোর ঘোরতর সংগ্রাম,
কেহ নাহি ছাড়ে একচুল দাবি। কাহারে অংশ দিয়ে
একজন যদি পেতে চায় তারে, আর জন হয় বাম।
বুক কহে, মণিকোঠায় আমার ধ'রে যারে রাখিলাম,
শত রবি সম দীপ্ত দৃষ্টি সাধ্য কি হেরে তায়!
চোখ কহে, মোর দুটি তারকায় যেই ছবি আঁকিলাম,
সে শুধু আমার আর কারো নয়, কে আবার তারে চায়!
বিবাদ মিটাতে বিচার আসনে বিবেক বসিল আসি;
বাদী-বিবাদীর নালিশ জবাব তার ঠাঁই হ'ল পেশ,
রায় দিল শুনি দুজনের বাণী দুইজনে সম্ভাষি,
বুক ও চোখের অধিকার-সীমা হয়ে গেল নির্দ্দেশ।
চোখ পেল তব বাহিরের রূপ—সেই তার চির আশা,
বুক পেল তব গোপন হিয়ার সুগভীর ভালবাসা।

২

সেই দিন হ'তে হইল সন্ধি বুক-চোখ দুজনায়;
উভয়ে বদ্ধ সমবেদনার দান আর প্রতিদানে,
চোখ যদি দহে তব বিরহের দুঃসহ যাতনায়,
অথবা বুকের ব্যাকুল বেদনা সান্ত্বনা নাহি মানে,
কভু বা নয়ন বিরহী বক্ষে সাদরে ডাকিয়া আনে
আপনার গৃহে, দুজনায় মিলে হেরিতে তোমার ছবি;
হৃদয় কখন ডেকে লয় চোখে আপন গোপন ধ্যানে—
সম ব্যথাতুর উভয়ে তৃপ্ত তোমার সঙ্গ লভি।
তোমার আমার মাঝখানে তাই যত হোক ব্যবধান—
হয় প্রেমে, নয় প্রতিকৃতিতে—বাঁধা তুমি মোর কাছে,
যত দূরে যাও—তার চেয়ে দূরে প্রসারিত মোর ধ্যান,
ধ্যানের বাহিরে তুমি কভু নও, ধ্যান বুকে জেগে আছে;
সে যদি ঘুমায়, হেরে তব ছবি জাগ্রত আঁখি দুটি,
আঁখি-আহ্বানে জেগে ওঠে বুক—বুকে-চোখে লোটালুটি

# একটি অভিনব আর্থিক পরিকল্পনা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

কেহ যদি আমাদের বলে, এখন থেকে প্রতি মাসকাবারে তোমাদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা ক'রে গবর্মেণ্ট দান করবে, তা হ'লে তার কথা তো আমরা হেসেই উড়িয়ে দিই ; অধিকন্তু তার মাথায় মধ্যমনারায়ণ তেল দেবার ব্যবস্থা করি, নয় তো হাওয়া বদলাবার জন্যে রাঁচির কাঁকে অঞ্চলের বড় বাড়িটাতে কিছুদিন থেকে আসবার উপদেশ দিই। সঙ্গে সঙ্গে বুকভরা একটা দীর্ঘনিশ্বাসও বোধ হয় বেরিয়ে পড়ে, আর ভাবি, হায় রে! তাই যদি হ'ত! আমাদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্যে কান্ত-কবি রজনীকান্তের লোলুপ কল্পনার কথাও তখন মনে প'ড়ে যায়, সত্যি, কি মজাই হ'ত! কিন্তু লোকটি যদি তারপরেও বলে, মশায়, আমাকে পাগল ঠাওরাবার আগে বর্ত্তমান দুনিয়ার হালচালটা একবার দেখে আসুন; আমি যা বলছি তা পৌরাণিক রূপকথাও নয়, মুনিঋষির ভবিষ্যদ্বাণীও নয় ; আমাদেরই মত সেই দেশটা মাটির এবং তারই গবর্মেণ্ট দেশের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক প্রজার হাতে মাস-অন্তে ৫০ টাকা নয়, ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬৫ টাকা খয়রাৎ করছে। কথাগুলি শুনে মনে একটু খটকা লাগে, অবিশ্বাস করা একেবারে চলে না, ভাবি, তাই তো, লোকটা বলে কি! যে অর্থশাস্ত্রটাকে নিতান্ত অর্থহীন নীরস বস্তুজ্ঞানে এতকাল পরিহার ক'রে আসা গেছে, তার শেষ সিদ্ধান্ত যদি এই রকমই সুরসাল হয়, তা হ'লে বেঁচে থাক সেই শাস্ত্র। কিন্তু তবু তার সঙ্গে তর্ক করি, বলি, অর্থশাস্ত্রের যতখানি জ্ঞান এবং অর্থ উপার্জ্জনের যতগুলি পথ আমাদের জানা আছে, তা অবলম্বন ক'রে জমাখরচের খাতায় খরচের অঙ্কটার ওপরে জমার অঙ্কটাকে তো কিছুতেই দাঁড় করাতে পারলুম না। আপনি কি বলতে চান, ধনবিজ্ঞান আজ নতুন ক'রে এমন একটা ম্যাজিক আবিষ্কার করেছে, যাতে গোলকধাঁধার গোলকধাম নয়, সত্যিকারের গোলকধামে যাওয়া যাবে ?

ধনবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্র ম্যাজিক জানে কি না জানি না। তবে মানব-সভ্যতার প্রাথমিক যুগের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য ও তার পরিচালন-কৌশল তলিয়ে দেখলে অনেক রকমের মিরাকল যে আর্থিক জগতে ঘটেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আমরা তাদের সঙ্গে আজ এমনই পরিচিত হয়ে গেছি যে, তাদের অভিনবত্ব আর আমাদের চোখে পড়ে না। যাক সে সব কথা। আমরা গোড়ায় যে চমকপ্রদ সংবাদের আভাস দিয়েছি, তৎসম্বন্ধেই আজ আপনাদের কাছে কিছু বলব।

আমেরিকার ক্যানাডা রাজ্যের অন্তর্গত অ্যাল্‌বার্টা একটি স্বায়ত্তশাসনাধীন প্রদেশ। আয়তনে এ গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিগুণ ; কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি নয়, কয়েক লক্ষ মাত্র। এদের মধ্যে রেড ইণ্ডিয়ান, ক্যানাডিয়ান, ইংরেজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য অনেক জাতিই রয়েছে। সাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদের সাহায্যে মন্ত্রিসভা দেশ শাসন ক'রে থাকেন। প্রধান মন্ত্রীর নাম হচ্ছে, উইলিয়ম অ্যাল্‌বার-হার্ট (William Alber-hart)। ইনি পূর্ব্বে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রিদের মধ্যে

একজন গ্রাম্য ডাক্তার, একজন স্টোর-কীপার, একজন চাষীর ছেলে। এঁদের কেউ পূর্ব্বে কখনও এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ক্যানাডা রাজ্যে যত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা আছে, তার মধ্যে এঁরাই হচ্ছেন সবচেয়ে শক্তিশালী ও কৃতী। আর্থিক ও রাজস্ব ব্যাপারে মন্ত্রিসভার প্রধান পরামর্শদাতা হচ্ছেন Major Clifford Hugh Douglus। তাঁরই পরামর্শে কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সত্যই এ ব্যবস্থা করেছেন যে, দেশের প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি প্রতি মাসে পাঁচ পাউণ্ড ক'রে গবর্মেণ্টের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট-আফিসের মারফৎ জাতীয় লভ্যাংশ স্বরূপ পাবে। এতকাল আমরা জানতুম, গবর্মেণ্টকে নানা আকারে আমাদের শুধু ট্যাক্সই দিতে হয়। তার বিনিময়ে গবর্মেণ্ট আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন; বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখেন; দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তারে সাহায্য করেন। কিন্তু নগদ অর্থ দ্বারা প্রত্যেক বয়স্ক লোককে প্রতি মাসে সাহায্য ক'রে থাকেন, এ সংবাদ আমাদের এতকাল জানা ছিল না, শোনাও ছিল না। এই অশ্রুত ও অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা অ্যাল্‌বার্টার মত একটা অখ্যাত দেশে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল এবং কেনই বা তার প্রয়োজন হ'ল, সেটা নিশ্চয়ই জানবার ও ভাববার কথা।

কেন সে এ অভিনব পন্থা অবলম্বন করলে, সেই কথাটাই আগে আলোচনা করব। কিছুকাল থেকে ব্যবসা ও আর্থিক জগতে একটা দুর্দ্দৈব চলেছে। প্রকৃতির দানে কার্পণ্য ঘটে নি; মানুষের সৃষ্টিও তেমনই অবিরাম চলেছে। কিন্তু তবুও একটা বিরাট মানবসমাজের অভাব একেবারেই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এর কারণ কি? তবে কি সমগ্র মানবজাতির অভাব মোচনের উপযোগী সম্পদের সৃষ্টি হচ্ছে না? তাও তো মনে হয় না; কারণ পণ্য-সম্পদ আজ ভূতের বোঝার মত শিল্পী ও বণিকের কাঁধের ওপর চেপে ব'সে আছে—বিক্রি হচ্ছে না। অথচ মানুষের প্রয়োজন মেটেই নি, আর তা সহজে মেটবার কথাও নয়। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর শেষ অসভ্য মানুষটি ক্রোড়পতির চালে জীবন যাপন করতে না পারবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজনের দাবি জগতে থাকবে। তা হ'লে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এক দিকে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, অন্য দিকে অভাবের তাড়না। এক দিকে প্রচুর ভোজ্য, অন্য দিকে সংখ্যাতীত বুভুক্ষু। কিন্তু এই দুয়ের যোগসূত্রটি ছিন্ন হওয়াতেই এই বিসদৃশ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেই যোগসূত্রটি কি? সেটি হচ্ছে অর্থ। এই অর্থের অভাবই আজ সমস্ত অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত পার্থক্যটা আমাদের ভাল ক'রে বোঝা দরকার। কারণ সহজ বুদ্ধিতে আমরা অর্থকেই সাধারণত ঐশ্বর্য্য ব'লে মনে ক'রে থাকি। কিন্তু অর্থত প্রকৃত প্রস্তাবে ঐশ্বর্য্য নয়। কারণ তাকে পরিধান করা যায় না, ভোজন বা পান করা যায় না, তাতে চেপে গঙ্গার ধারে বা গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাওয়া চলে না। সে কেবল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে ও মানুষের দেনাপাওনা মেটাতে সহায়তা ক'রে থাকে। প্রকৃত ঐশ্বর্য্য হচ্ছে পণ্য-সম্পদ, যা মানুষের ব্যবহারে বা ভোগে লাগে এবং যাকে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা আয়াসে লাভ করা যায় না। সেইজন্যই আলো, বাতাস, জল মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য হ'লেও অর্থশাস্ত্রে ঐশ্বর্য্যরূপে গণ্য হতে পারে না; কারণ তা ভগবদ্দত্ত অনায়াসলব্ধ নৈসর্গিক সম্পদ।

মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে নৈসর্গিক কিংবা মানুষের

সৃষ্ট সম্পদের অভাবে ঘটে নি, আর তা ভোগ করবার মত অভাবগ্রস্ত লোকেরও অভাব ঘটে নি, অভাব ঘটেছে শুধু অর্থ নামক মধ্যস্থ দালালটির। তারই অভাবে মানুষ আজ এক দিকে তার জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বা ভোগসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারছে না ; অন্য দিকে ভোগসামগ্রী যারা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ক'রে সৃষ্টি করে, তারা তা উচিত মূল্যে বিক্রি করতে পারছে না। শুধু তাই নয়। বেশি জিনিস তৈরি হ'লে তার দাম আরও হ্রাস পাবার ভয়ে অনেক জিনিস তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, নদীর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, মাটির নীচে পুঁতে ফেলছে। দীনদুঃখীদের কিঞ্চিৎ দুঃখ লাঘবের জন্য তা দান করবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। কারণ তা হ'লে জিনিসের মূল্য আরও ক'মে যাবে। ফল দাঁড়িয়েছে এই, অর্থ আজ ঐশ্বর্য্যকেও ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে—ছায়া হয়ে আজ সে কায়ার স্থান অধিকার ক'রে বসেছে।

অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা এই রকম। একটা ভাল ফিল্ম দেখবার উদ্দেশ্যে আমরা যথাসময়ে মহোৎসাহে ছবিঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু টিকিট কিনতে গিয়ে শোনা গেল, টিকিট-বই উধাও হয়ে গেছে কিংবা টিকিট-বাবু টিকিট-বই দেরাজবন্দী ক'রে গ্যাঁট হয়ে ব'সে আছেন, কোন টিকিটই পাওয়া যাবে না। এদিকে ছবি দেখাবার জন্যে বহু অর্থব্যয়ে মনোরম হল তৈরি হয়েছে, ছবি তৈরি হয়েছে, প্রদর্শকও ছবি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছেন। অন্য দিকে দর্শকেরও অভাব নেই, উৎসাহেরও অন্ত নেই। কিন্তু একমাত্র টিকিটের অভাবে ছবির অধিকারী, হলের মালিক ও দর্শকবৃন্দ—সকলের আশাই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এ রকম আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাড়িতে মার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম শিয়ালদা স্টেশনে। গিয়ে দেখি, সবই প্রস্তুত—গাড়ি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, এঞ্জিনখানা ছোটবার জন্যে গরম হয়ে ভোঁস ভোঁস করছে, টিকিট কিনে চাপলেই হয়। এমন সময় টিকিট-বাবু যদি বলেন, টিকিট সব ফুরিয়ে গেছে, গাড়িতে যাওয়া আপনাদের চলবে না, তা হ'লে আমাদের মনের অবস্থা কেমন হয়? বর্ত্তমান দুনিয়ায় কিছুকাল থেকে যে একটা দুর্দ্দৈব দেখা দিয়েছে, তা অনেকটা এই রকমই। বিপণি সাজিয়ে ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য্য নিয়ে দোকানী ব'সে আছে, মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে দেহ দিয়ে খেটে তা সংগ্রহ করতে চায়। কিন্তু উপায় নেই, যেহেতু অর্থ নামক পদার্থটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল সে? ভাগ্যবানের গৃহে কিংবা ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত রত্নপ্রকোষ্ঠে? সত্যই তাই। চারিদিকে গোলমাল দেখে সবাই ভয়ানক হুঁসিয়ার হয়ে পড়েছেন, অর্থকে একেবারেই ছাড়তে চাচ্ছেন না, তাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত ক'রে সকল দেশের গবর্মেণ্ট, ব্যাঙ্ক ও ধনীরা তাঁদের কোষাগারে আটকে রেখেছেন। বেচারার বিশেষ দোষ নেই ; কারণ তার পা নেই যে নিজে চলবে। আমাদের হাত ধ'রে তাকে চলতে হয়। ভাগ্যবানেরা তার সে চলা অনেকখানি খর্ব্ব করেছেন। তাই আজ প্রশ্ন উঠেছে, মুখের গ্রাস ধ্বংস ক'রে পণ্যের মূল্য স্থির রাখবার বৃথা চেষ্টা না ক'রে, অর্থরূপ টিকিট সৃষ্টি ক'রে পণ্যমূল্য স্থির রাখা, মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে দেওয়া কি বেশি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? সেইজন্যই আজ ৫ পাউণ্ড মূল্যের নোট ছাপিয়ে অ্যাল্‌বার্টা রাজ্য তার প্রত্যেক বয়স্ক প্রজার হাতে প্রতি মাসে তুলে দিচ্ছে, যাতে দেশের পণ্যের বিক্রি বাড়তে পারে, মানুষ আরও খানিকটা ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

'কেন' প্রশ্নের জবাব আমরা দিয়েছি। এখন কেমন ক'রে এটা সম্ভব হচ্ছে, তার জবাব দিতে চেষ্টা করব। গবর্মেণ্ট ৫ পাউণ্ড মূল্যের যে নোট প্রত্যেককে দিয়ে থাকেন, তা একবারমাত্র জিনিসপত্র কেনবার জন্যে ব্যবহার করা চলে। দোকান থেকে ৫ পাউণ্ড মূল্যের এক বা একাধিক পণ্য ক্রয় করবার পর দোকানদার সেই নোট তার মহাজনকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিনিস তৈরি করেছে, তাকে দেয়। সে আবার ব্যাঙ্কের কাছে সেই নোট জমা দেয়; কারণ কলকারখানার মালিককে সাধারণত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কাঁচামাল খরিদ ও অন্যান্য খরচের জন্যে টাকা ধার করতে হয়। ব্যাঙ্ক আবার গবর্মেণ্টের প্রাপ্য টাকা সেই নোট দিয়ে পরিশোধ ক'রে দেয়। এমনই ক'রে একবারমাত্র মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের সহায়তা ক'রে নোটগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট পথে গবর্মেণ্টের হাতে ফিরে আসে; আবার যায়, আবার তেমনই ভাবেই ফিরে আসে। তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সাধারণ নোট বা ব্যাঙ্কের চেকের মত এ নোটগুলি যেখানে সেখানে বা যেমন তেমন ভাবে হস্তান্তর-যোগ্য নয়। মানুষের প্রয়োজন মেটাবার দিক দিয়ে তাতে কিছু আসে যায় না; অর্থশাস্ত্রানুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ প্রচলনের কুফল নিবারণ করবার উদ্দেশ্যেই এই নোটের অবাধ প্রচলন এভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠবে, দেশের ভেতরে গবর্মেণ্টের ভয়ে না হয় কাগজের নোট দিয়ে এই কেনা-বেচা চলল; কিন্তু বিদেশের সঙ্গে কাজকারবারে এসব নোটের তো কোন মূল্য নেই, তারা তো এসব নোট গ্রহণ করবে না, তারা চাইবে সোনা। কারণ স্বর্ণের দ্বারাই বৈদেশিক বাণিজ্যের ও অন্যান্য দেনা মেটাতে হয়। তার কি হবে? তার জবাবে এই বলা যেতে পারে যে, ঐ দেশের সব টাকাই তো আর কাগজের নোট নয়। টাকার ঘাটতি পূরণ করবার জন্যে এটা তো দেশের মোট অর্থের একটা অংশ মাত্র। কাগজের নোটের সাহায্যে কাজকর্ম্ম তো সব দেশেই চলছে। সবাই যদি নোটের ও চেকের বদলে একসঙ্গে সোনা চাইত, তা হ'লে তো কোন দেশই সে দাবি মেটাতে পারত না। তা পারেও নি। সেইজন্যেই তো অধুনা প্রায় সকল দেশই স্বর্ণমান পরিহার করতে বাধ্য হয়েছে।

তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে আর একটা সংশয় থেকে যায়। গবর্মেণ্ট যখন তার নিকট দেনা বাবদ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই নোটগুলি গ্রহণ করেন, তখন গবর্মেণ্ট নিজেকে সেই পরিমাণ স্বর্ণ থেকে বঞ্চিত করেন, এবং তাঁর স্বর্ণ-তহবিল সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়ে পড়ে। এ কথা সত্য। কিন্তু এ ক্ষতি তিনি পুষিয়ে নেন আর এক ভাবে। এই কাগজের নোটগুলি প্রচারের ফলে দেশের লোকের ক্রয়শক্তি বেড়ে যায়, দেশের ব্যবসাবাণিজ্য সচল হয়ে ওঠে, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়, মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। তারই ফলে আয়কর, পণ্যশুল্ক ও বাণিজ্যশুল্ক থেকে গবর্মেণ্টের আয়ও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়, এবং গবর্মেণ্ট নোট প্রচলনের ক্ষতি এভাবে পুষিয়ে নেবার আশা পোষণ করেন।

এখন প্রশ্ন উঠবে, ব্যাপারটা যদি এতই সহজ, তবে আর কোন দেশের গবর্মেণ্ট এমন মজার ব্যবস্থা করে না কেন? তা হ'লে কারও এতটা অভাবের তাড়না সইতে হয় না। কিন্তু আমি যতটা সহজে বললুম, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। এর ভেতর অর্থশাস্ত্রের অনেক মারপ্যাঁচ আছে, সেসব কথা

এখানে বলবার সময় ও সুযোগ নেই। তা ছাড়া নূতন অনভ্যস্ত পথ সম্বন্ধে মানুষের চিরন্তন সংশয় এবং ভয়ও এর মূলে অনেকখানি রয়েছে। মানুষ অজানা পথে সহজে যেতে চায় না। কারণ তাতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট; কিন্তু এ কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, একদল লোক অনভ্যস্ত বিপদসঙ্কুল পথে চলবার দুঃসাহস নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল ব'লেই মানুষ আজ বিস্ময়কর নব নব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে এতটা এগিয়ে আসতে পেরেছে, অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছে। অ্যাল্‌বার্টা তার অভিনব দুঃসাহসিক অভিযানে সফলতা লাভ করতে পারবে কি না, তা বলবার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু তার সফলতা বা বিফলতার কথা ছেড়ে দিলেও আমরা আমাদের এ আলোচনা থেকে যা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই যে, অর্থ ও ঐশ্বর্য্য এক জিনিস নয়। ঐশ্বর্য্যই মানুষের ভোগ্য, অর্থ ভোগ্য নয়। অর্থের অভাবে মানুষের কর্ম্মক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে, তাকে অভাবের দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হবে, এ অবস্থা অস্বাভাবিক ও শোচনীয়। মানুষই ঐশ্বর্য্যকে তার বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছে; ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ের সুবিধার জন্যে অর্থকেও সেই সৃষ্টি করেছিল। অর্থ মানুষ বা ঐশ্বর্য্যকে সৃষ্টি করে নি। অথচ আজ বহু মানব তার কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মক্ষমতা নিয়ে কর্ম্মহীন ও বেকার, শত অভাবে জর্জ্জরিত। বর্ত্তমান যুগের এটাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও মর্ম্মান্তিক সমস্যা। মানুষ অতীতে বহু কঠিন প্রশ্নের সুমীমাংসা ক'রে এসেছে, দুর্জ্ঞেয়কে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ও সহজবোধ্য ক'রে তুলতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ এ জীবন-মরণ সমস্যারও হয়তো একটা সমাধান করতে পারবে। তবে সেটা কি রূপ নেবে তা এখন বলা কঠিন। অ্যাল্‌বার্টায় তারই একটা পরীক্ষা চলছে। রুশিয়াও সম্পূর্ণ অন্যভাবে সেই বিরাট চেষ্টা করছে।

# উড়িষ্যার দেওয়ালে আঁকা ছবি

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বাংলা দেশে গ্রাম যেমন মরিয়া গিয়াছে, উড়িষ্যায় এখনও মরে নাই। তাহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হইল—পুরী কটক প্রভৃতি জেলায় গ্রামে সর্ব্বত্র ঘরদুয়ার অলঙ্কৃত

চিত্র (ক)

করিবার জন্য দেওয়ালের গায়ে নানাবিধ ছবি আঁকা হয়, সৌন্দর্য্যের বোধ গ্রামবাসীর অন্তর হইতে এখনও লোপ পায় নাই। পুরীতে অনেক চিত্রকরের বাস, তাহারা প্রতি বৎসর পাণ্ডাদের বাড়ির দেওয়ালে ছবি আঁকিবার বায়না পায়। কিন্তু যেখানে চিত্রকর নাই, সেখানে গ্রামবাসীরা নিজে নানাবিধ চিত্র আঁকিয়া কুটীর অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। শিল্পের দিক দিয়া এই সকল ছবির মূল্য নির্দ্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু আমার কাছে ছবিগুলি ভাল লাগে বলিয়াই পাঠকগণকে ইহার কিছু নমুনা উপহার দিতেছি।

উড়িষ্যায় ঘরের দাওয়া খুব উঁচু করিয়া গড়া হয়। চার-পাঁচটি সিঁড়ি ভাঙিয়া একটি স্বল্পপরিসর বারান্দা ও তাহার পরে ঘর। বারান্দায় দুই চারিটি থাম থাকে। সেই থামে এবং দরজার দুই পাশে দেওয়ালে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত হয়। পুরীতে সচরাচর থামের গায়ে দুই জন বন্দুকধারী সিপাহীর চিত্র থাকে, তাহারা যেন পাহারায় নিযুক্ত আছে। সিপাহীদের হাতে আবার রুমাল উড়িতে দেখা যায়। থাম পার হইলে গৃহের প্রবেশদ্বার। তাহার উপরে গণপতির মূর্ত্তি থাকে। কোন কোন স্থলে গণপতির পরিবর্ত্তে মঙ্গলাদেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। দুয়ারের পাশে দুই দিকে নীচের দিকে দুইটি পূর্ণকুম্ভ অঙ্কিত হয়। পূর্ণকুম্ভের উপরে নারিকেল ও দুইটি মৎস্যের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ মৎস্য যুক্তপ্রদেশে সাধারণ হিন্দুগণের কুটীরে, এমন কি লক্ষ্ণৌ শহরের মুসলমানী ইমারতেও অঙ্কিত দেখা যায়। এগুলি নাকি মঙ্গলসূচক চিহ্ন। পূর্ণকুম্ভের পাশে উপরের দিকে দুইজন কন্যার মূর্ত্তি থাকে। তাঁহারা যেন হাতে মঙ্গলঘট লইয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকজন বাদ্যকরের ছবিও পাশে স্থাপিত হয়।

দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, সরস্বতী দেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া শুধু চিত্র হিসাবে

চিত্র (খ)

হংস এবং নানাবিধ কাল্পনিক জীবজন্তু বা পক্ষীর চিত্রও থাকে। এই সকল চিত্রের মধ্যে দুই একটি

উড়িষ্যার দেওয়ালে আঁকা ছবি
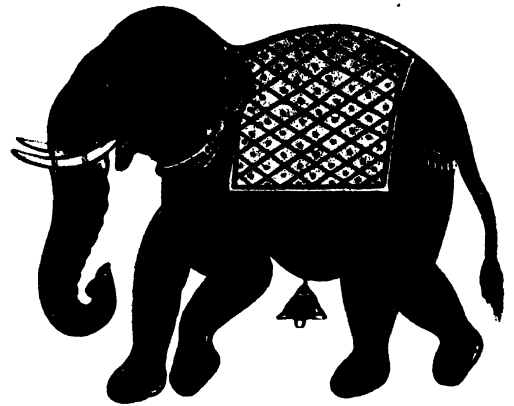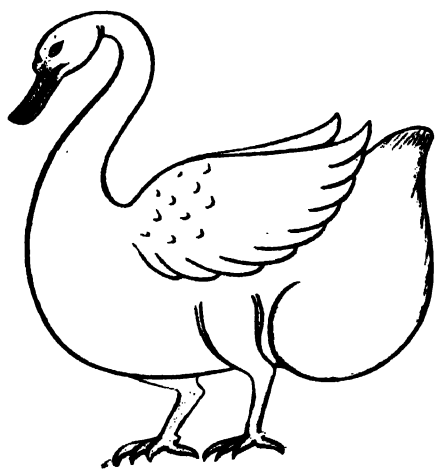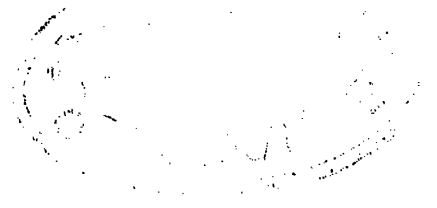
উল্লেখযোগ্য। একটি চিত্রে [ চিত্র (ক) ] দেখা যাইতেছে, ঘোড়ার মত কোনও জীবের সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বস্থ ব্যক্তি অর্জ্জুন এবং চিত্রখানি শ্রীকৃষ্ণের কোনও এক রূপের প্রতিচ্ছবি। আমাদের দেশে যেমন কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রচলিত আছে, উড়িষ্যাতেও তেমনই সারলা দাসের মহাভারত। তাহা প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। সারলা দাসের মহাভারতে লেখা আছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে এক সময়ে বিচিত্র রূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ ময়ূর, বৃষ, হস্তী, মনুষ্য, সর্প, সিংহ, কুক্কুট প্রভৃতি নয়টি জীবের বিভিন্ন অঙ্গের সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছিল। ইহা সেই রূপের প্রতিচ্ছবি, চিত্রকরগণ ইহাকে নবগুঞ্জর বলে। এরূপ নবগুঞ্জরের মূর্ত্তি শুধু উড়িষ্যাতে আবদ্ধ; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ছোটনাগপুরে রাঁচি শহরের তিন চার মাইল উত্তরে বোড়েয়া গ্রামে মন্দিরের দরজায় কাঠের উপর এই চিত্র অঙ্কিত দেখিয়াছি। কোন্ সূত্রে যে উড়িয়া মূর্ত্তিটি বোড়েয়া গ্রামে পৌছিল, তাহা অনুসন্ধান করিবার বিষয়।
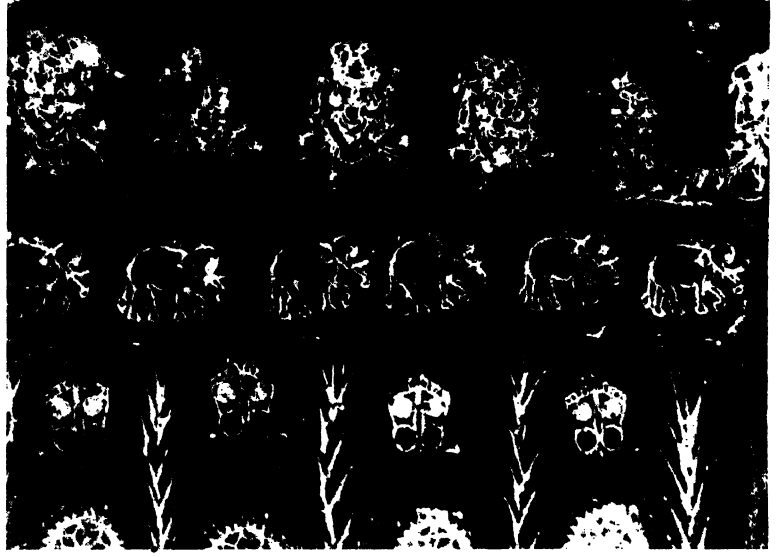
আরও একটি মূর্ত্তির উল্লেখের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গতবারে তাহার চিত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহার নাম উড়িয়ার গণ্ডভয় বা গণ্ডভৈরব। ইহা একটি পাখীর ছবি। [ চিত্র (খ) ] পাখীর দুইটি গলা, দুইটি মুখ, কিন্তু এক দেহ। পাখী দুই চঞ্চুতে এক একটি হাতীকে ধরিয়া আছে, পায়ের নীচেও দুই একটি হাতী ধরা পড়িয়াছে। পাখীর দেহের তুলনায় হাতীগুলিকে ক্ষুদ্র দেখায়। ইহাকে গণ্ডভয় বলা হইলেও এই নামের কোন অর্থ উড়িয়া ভাষায় পাওয়া যায় না। কিন্তু তামিল দেশে এই চিত্রের খুব প্রাচীনকাল হইতে প্রচলন আছে। তামিলে পাখীর নাম গণ্ড-ভেরুণ্ড। তাহার অর্থ ভীষণ ভেরুণ্ড পক্ষী। তামিল দেশে বহু মন্দিরে গণ্ড-ভেরুণ্ডের মূর্ত্তি আছে এবং সম্ভবত ঐ প্রদেশ হইতেই উহা উড়িষ্যায় আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই খুব প্রাচীনকালে নহে; কেন না, কোনও মন্দিরেই গণ্ড-ভেরুণ্ডের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।
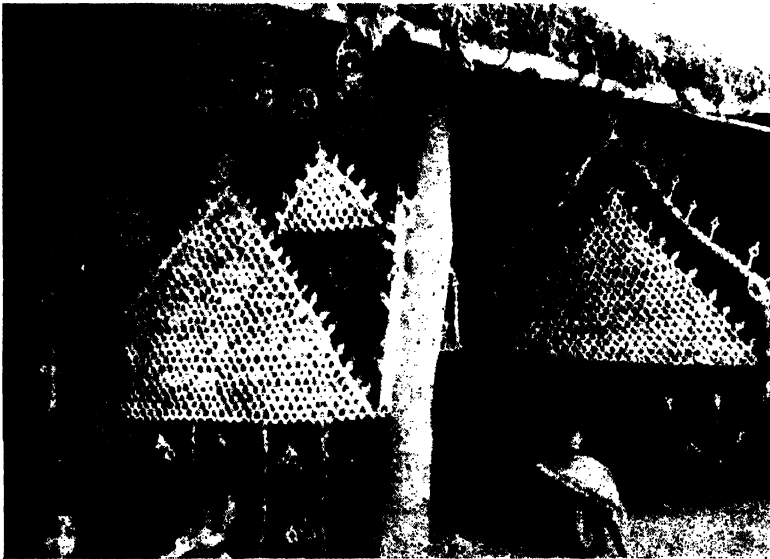
পুরী জেলার ছবিগুলির অঙ্কনপদ্ধতি ভাল এবং সেগুলি খাটি চিত্রকরের আঁকা। কিন্তু কটক জেলায় বাঁকির নিকটে বৈদ্যনাথ গ্রামের যে কয়খানি চিত্র দেওয়া হইল, তাহা গ্রামবাসীরা নিজে আঁকিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু আঙলের ছাপ দিয়া কাজ সারা হয়। কোথাও বা টিনের ফুটা করা ছাপের সাহায্যে জীবজন্তুর চিত্র আঁকা হয়। হাতী এবং লক্ষ্মীদেবীর যে চিত্র সারি সারি অঙ্কিত হইয়াছে, সেগুলি ফুটাওলা টিনের সাহায্যে চূণের ছড়া দিয়া আঁকা হইয়াছে।

চিত্রগুলি হয়তো আমাদের সকলের চোখে ভাল লাগিবে না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, অঙ্কনের কারুকার্য্যে সত্যই এগুলি সুন্দর। রঙের বিন্যাসও ভাল। আর সকলের চেয়ে ভাল হইল, দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত গ্রামবাসীর অন্তরে এখনও এই সকল চিত্র সৌন্দর্য্যের বোধ জাগাইয়া রাখিয়াছে এবং অনাবিল আনন্দ বিতরণ করিতেছে।

---

# নাবিকদের গান

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

ওই তো দূরে নীল সাগরে ভাসছে মোদের মরাল-তরী,
আর কতকাল রইব ঘরে ?—এবার চল বেরিয়ে পড়ি।
সিন্ধু-শকুন উড়ছে নভে, জল-কলোরোল কল্লোলিত ;
দিক্-নেমিতে স্বর্ণ-রবির বর্ণ-শিখা অস্তমিত।
অন্ধকারের আবছায়াতে গর্জ্জে গভীর উর্ম্মি-ভেরী,
বাজাও বিষাণ, উড়াও নিশান, গাও রণ-গান, কিসের দেরি ?

ঝড়-ভ্রূকুটি ? ভয় করি না ;—হৃদয় অসাড় কঠিন শিলা ;
আমরা করি মরণ সাথে জীবন নিয়ে হোলির লীলা।
হল্লা, হাসি, স্ফূর্ত্তি, গানে উড়াই আয়ুর নিমেষগুলি ;
সত্য ? রঙিন স্বপ্ন শুধু,—সামনে চলা,—আশার বুলি !

কন্থা-ঢাকা জীর্ণ দেহে রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারে
তন্দ্রা-চোখে চাই না মোরা কাটিয়ে দিতে জীবনটারে।
নৃত্য-দোদুল উর্ম্মি-দোলায় ঝঞ্ঝা সাথে পাঞ্জা কষি
আমরা টানি মরণ সাথে নিত্য নূতন জীবন-রশি।
ভাগ্য-দেবীর পাষাণ-লিপি আমরা মুছি নিজের হাতে,
সেথায় লিখি নূতন লিখা এই জীবনের বন্দনাতে।
ক্ষুদ্র ঘরের অঙ্গনেতে আধেক বেঁচে, আধেক ম'রে
থাকায় কি ফল ?—সকল বিফল ! যাক সে জীবন আপনি ঝ'রে !

বাঁচবে যত হাসবে তত, ভাববে জীবন নিজের গড়া
তোমার সুখের রসদ যোগায় আকাশ, আলো, বসুন্ধরা।
আমরা বহি জ্ঞানের বাতি নিত্য নূতন দেশ-বিদেশে,
সাগর ছেঁচে মাণিক আনি জন্মভূমির পরাই কেশে।
সন্ধানীরা মোদের লাগি অচিন দেশের আভাস যে পায়,
তবুও মোদের নাম থাকে না জাতির ইতিহাসের পাতায়।
যুদ্ধে যারা জীবন বিলায় তপ্ত মরু-ঝড়ের মত,
অরণ্যময় পাহাড় কেটে বসায় যারা নগর কত ;—
কেইবা রাখে তাদের খবর, কেইবা জানে তার পরিচয় ?
মিথ্যা তাদের ধরায় আসা, মিথ্যা তাদের সব অভিনয়।
দুঃখ কি তায় ? নাই যদি রয় যশের রবি ভাগ্যাকাশে
সামনে চলার ছন্দে তবু এমনি যেন জীবন হাসে !

দিন নেমে যায় দিক্-বলয়ে সন্ধ্যা ডাকে ঘোমটা তুলে ;
পাল তুলে দাও, হাল ধ'রে গাও, পারের রশি দাও গো খুলে।

বদ্ধ কারায় অশ্রু-ধারায়, মায়ের স্নেহে, স্ত্রীর আদরে,
হৃদয়-মণি কোঠার খনি রাখব না আর ধূলায় ভ'রে।
ওই জ'লে যায় স্মৃতির কূলে অতীত ব্যথার রক্ত-চিতা,
তার আলোতে খুঁজব ফিরে ভবিষ্যতের নূতন মিতা।
পারের আলো নিভছে ধীরে, জল-কলোরোল আসছে কানে ;
নিরুদ্দেশের যাত্রী মোরা,—ফিরব না আর ঘরের পানে।
বাঁধন-ছেঁড়া তরীর মত চুকিয়ে এলেম পারের দেনা ;
উর্দ্ধে মোদের আকাশ অসীম, নিম্নে সাগর—ফেনায় ফেনা।

# একটা ডিমের কাণ্ড

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পিতা যখন ছেলেদের নাম রাখিলেন—রাম লক্ষ্মণ, তখন সবাই মনে মনে হাসিয়াছিল। নাম রাখিলে কি হইবে? রাম-লক্ষ্মণের সেই স্নেহবন্ধন, ভালবাসা ও আনুগত্য এ যুগে কি হইবার উপায় আছে? যে যুগের যা। এ যুগে বড় ভাইয়ের ছোট ভাইয়ের প্রতি সেই স্নেহ নাই, আর ছোট ভাইয়েরও বড় ভাইয়ের প্রতি সেই শ্রদ্ধা, আনুগত্য নাই।

রাম লক্ষ্মণ বড় হইতে লাগিল, তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া সবাই বলাবলি করে, না, পিতা ঋষি ছিলেন; ওরা যেন অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। রাম 'ভাই' বলিতে অজ্ঞান, আর লক্ষ্মণ দাদা ছাড়া কিছুই জানে না। উহারা সার্থকনামা। রাম লেখাপড়ায় ভালই ছিল, কিন্তু সংসারের টানাটানিতে বেশি দূর পড়িতে পারিল না; তাহাকে চাকুরি লইতে হইল।

রাম পশ্চিমের একটা শহরে কেরানিগিরি করে। ছোট ভাই লক্ষ্মণের পড়ার খরচ সম্পূর্ণ বহন করিতে হয় বলিয়া বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। যাহা হউক, রামের পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার সার্থক হইল, লক্ষ্মণ যথাসময়ে এম. এ. পাস করিল এবং বেশ ভাল পাসই করিল। রামের ইচ্ছা লক্ষ্মণকে চাকুরি করিতে দিবে না; সে কোন ব্যবসা করিবে। সেই অনুসারে লক্ষ্মণ ব্যবসা করিতে সুরু করিল। প্রথমটা একটু কষ্ট হইলেও লক্ষ্মণের আয় ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। দুই তিন শো সে পাইতে লাগিল। রাম এখন বিবাহের কথা চিন্তা করিতে থাকে।

রাম লক্ষ্মণ দুইজনেই বিবাহ করিল। বধূদের নাম ভিন্ন হইলেও নামের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমরা তাহাদিগকে যথাক্রমে সীতা ও উর্ম্মিলা বলিয়াই ডাকিব।

রাম বিহারে থাকে, লক্ষ্মণ থাকে কলিকাতায়। তবু লক্ষ্মণ মাসের শেষে সমস্ত উপার্জ্জন দাদার কাছে পাঠাইয়া দেয়; রাম আবার উপযুক্ত খরচ লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দেয়। অনেকে লক্ষ্মণকে আহাম্মক বলে, মিছামিছি কেন সে মনিঅর্ডার কমিশনে গোটাকয়েক টাকা নষ্ট করে! লক্ষ্মণ তাহাদের কথায় কান দেয় না; সে বরাবর দাদার কাছে উপার্জ্জিত অর্থ নিয়মিতভাবে পাঠাইয়া দেয়। রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ের ব্যবহার ও ভালবাসা সকলের কাছে আদর্শস্থল হইল।

রামের আয় বাঁধা, বৎসরান্তে পাঁচ টাকা করিয়া বৃদ্ধি; কিন্তু লক্ষ্মণের আয় কয়েক বৎসরের মধ্যে বেশ বাড়িল। রাম লক্ষ্মণের টাকায় বউদের গহনা গড়াইল, কিন্তু খাওয়াতেই ব্যয় করিল বেশি; তাই বছর পাঁচেক পরে লক্ষ্মণ যখন অত্যধিক পরিশ্রমে রোগগ্রস্ত হইল, তখন চিকিৎসার ব্যয় বহন করিতে রামকে চিন্তিত হইতে হইল।

লক্ষ্মণ উর্ম্মিলাকে লইয়া দাদার কাছে যায়। কলিকাতায় লক্ষ্মণের রোগের উপশম হয় নাই; দিন দিন তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পশ্চিমের জল-হাওয়ায় যদি কিছু উন্নতি হয় এবং কতকটা অর্থের অসচ্ছলতার জন্যও রামের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

রাম ভাইয়ের যত্ন লইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। রোগীর পথ্য, ফলমূল যথেষ্ট আনিয়া রাখে।

সীতাও দেবরের সমুচিত যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের কাছে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে ; পূর্ব্বে দুই শো আড়াই শো করিয়া দাদাকে দিয়াছে, এখন কিছুই দিতে পারে না। তাহার উপর তাহার রোগের জন্য খরচ হইতেছে, রামের আয়ও বেশি নয়, তাই লক্ষ্মণের মনটা খুঁত খুঁত করে।

এদিকে ডাক্তার লক্ষ্মণকে দেখিয়া বলে, রামবাবু, ভাইটির অবস্থা তো ভাল দেখছি না ; দিন দিন রোগা হচ্ছে। আরও কিছুদিন এমনই চললে থাইসিস হওয়া অসম্ভব নয়। বেশ ক'রে দুধ আর মুরগীর ডিম দিন।

রাম দুধের মাত্রা বাড়ায় এবং ডিম আনে।

সীতা রামকে বলে, দুধ বলছিল, বেশ, দুধ আরও বাড়িয়ে দাও। আবার মুরগীর ডিম কেন ? ব্রাহ্মণের বাড়িতে এ অনাচার কি সইবে ? শেষে ছেলেপিলেদের কিছু একটা না হয় !

সীতা অতিশয় আচারনিষ্ঠা। তাই মুরগীর ডিমের ব্যবস্থাটা তাহার মনঃপূত হইল না।

লক্ষ্মণ কাঁচা ডিমই খায় ; কিন্তু কিছুদিন খাইয়া আর ভাল লাগে না। উর্ম্মিলাকে বলে, ডিমটা সেদ্ধ ক'রে দাও না।

উর্ম্মিলা একটা এনামেলের বাটিতে করিয়া ডিমটা উনুনে বসায় এবং সিদ্ধ হইলে তুলিয়া লয় ; এমন সময়ে সীতা রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলে, বাটিতে কি, ডিম নাকি ?

উর্ম্মিলা বলে, হ্যাঁ, কাঁচা ডিম আর খেতে চাইছে না, তাই সেদ্ধ ক'রে নিলাম।

সীতা হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলে, তোদের জ্বালায় জাত-ধর্ম্ম রাখা গেল না, রান্নাঘরেও ডিমটা না ঢোকালে কি চলত না ? যদি অসুখ সারবার হয়, তবে ডিম না খেলেও সারবে ; আর মুরগীর ডিমে যদি যক্ষ্মা সারে, তবে খৃষ্টান মুসলমান যক্ষ্মায় মরত না। চাকরকে ডাকিয়া বলে, ভজুয়া, উনুনটা ভেঙে ফেল, এক ঝুড়ি গোবর এনে সব ধুয়ে ফেলে উনুনটা আবার পাত। তারপর নিজে নিজেই বলিতে থাকে, ছেলেপিলেদের আর খাওয়া হ'ল ; যত সব আপদ !

সীতার প্রত্যেক কথাটি লক্ষ্মণ শুনিয়াছে, তাই উর্ম্মিলা যখন ডিমের বাটিটা হাতে লইয়া সাশ্রুনয়নে লক্ষ্মণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তখন আর লক্ষ্মণকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইল না।

রাম বাজার করিতে গিয়াছিল ; মাছ ও তরকারি লইয়া এই সময় ফিরিল। রান্নাঘরের অবস্থা দেখিয়া স্ত্রীকে বলিল, একি, এসব ভাঙছ কেন ?

সীতা রাগতভাবে বলে, ভাঙব না ? মুরগীর ডিম এনে উনুনে সেদ্ধ চড়িয়েছে ! এ উনুনে আর খাওয়া যায় !

তারপর মাছ-তরকারির থলিটা ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। রাম অতি শান্ত স্বভাবের লোক, কাহাকেও কিছু বলিতে পারে না ; কাজটা যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে, তাহা সে বুঝিল।

এই যে অগ্ন্যুৎপাত, আপনারা বলিবেন, বড়ই হঠাৎ হইল, ইহা মোটেই রামায়ণোক্ত সীতোচিত হইল না। তদুপরি সেই নৈয়ায়িকদের ধূমের অভাবের জন্য গল্প-লেখকদের দোষ দিবেন। এবং ব্যাপারটাও একটু আকস্মিক মনে হইবে। তাই বলি, ব্যাপারটা মোটেই আকস্মিক নয়, আর নৈয়ায়িকদের ধূম-প্রকাশেরও অভাব হয় নাই। ধূমের প্রথম প্রকাশ হইল, লক্ষ্মণ যখন পীড়িত হইয়া দাদাকে নিয়মিত টাকা দিতে অপরাগ হইল ; দ্বিতীয় প্রকাশ হইল, লক্ষ্মণ যখন অসুস্থ হইয়া সস্ত্রীক

দাদার কাছে আসিতে বাধ্য হইল ; আর তৃতীয় প্রকাশ হইল সেদিন, যেদিন রাম স্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করিল, ছেলেদের দুধ বন্ধ করিয়া লক্ষ্মণের দুধ ও ডিমের বর্দ্ধিত খরচ সঙ্কুলান করিতে।

যাহা হউক, ব্যাপারটা যতই অপ্রিয় হউক, এইখানেই সমাপ্ত হইলে ছিল ভাল ; কিন্তু ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল না।

লক্ষ্মণ ভাবিতে থাকে, এখানে আর থাকা চলে না ; এতদিন ধরিয়া দাদাকে যে দুই শো করিয়া টাকা দিলাম, তাহা কি কিছুই নয় ? আজ না হয় এক বৎসর ধরিয়া রোগে পঙ্গু হইয়া আছি, তাহা হইলেও পূর্ব্বের সাহায্য কি কিছুই নয় ? আমি কি অধিকতর সহানুভূতি পাইবার যোগ্য নই ?

আমরা জানি, দোষ লক্ষ্মণের নয়। সে প্রকৃতই উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থ দাদার হাতে তুলিয়া দিত। রামের দূরদর্শিতার একটু অভাব ছিল। মনে হয়, এ বিষয়ে রামায়ণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সহিত আমাদের রামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সীতাকে একা ফেলিয়া স্বর্ণমৃগের পিছনে ধাওয়া করা, আর যাহাই হউক, সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। এক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য কিছু সঞ্চয় না করিয়া সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে ; এবং এখন যে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল, ইহার মূলে যে রামের মূঢ়তা বা অদূরদর্শিতা রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা বিছানাপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত। রাম সব দেখিতেছে, অথচ কিছুই বলিতেছে না। একবার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওরা বিছানাপত্র বাঁধছে কেন ? স্ত্রী ঝাঁঝালো উত্তর দেয়, আমি কি জানি ; আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কি ওরা সব কাজ করে ?

লক্ষণ যখন রামকে প্রণাম করিয়া দুর্ব্বল দেহে উর্ম্মিলার কাঁধে ভর দিয়া গাড়িতে উঠিতে চলিল, তখনও রাম কিছু বলিল না ; সে স্থির হইয়া চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, বাস্তবিক কিছু দেখিতেছিল কি না বলা যায় না। মনে হয়, সে চাহিয়াই আছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি যেন কিছুতে আবদ্ধ নয়। এমন সময়ে রামের ছেলে খোকা কাকার বাঁ হাত ধরিয়া বলে, কাকু, কোথায় যাচ্ছ ? আমার কাঁধে ভর দাও, তুমি প'ড়ে যাবে।

লক্ষ্মণের চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল। সাত বছরের খোকা তাহার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার কাঁধে ভর দিতে বলিতেছে ; অথচ দাদা ও বউদিদি চুপ।

পনরো বছর পরের কথা। লক্ষ্মণ পশ্চিমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে, সেইখানেই সে বিস্তর রোজগার করে। ছেলেপুলে তাহার হয় নাই, সেজন্য সে দুঃখিতও নয়। সে একটা স্কুল করিয়াছে, তাহাতে অনাথ বালক-বালিকাদের সাহেবী ধরণে শিক্ষা দেয়। বাংলা দেশে তাহার আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দাদাকে সে ভোলে নাই বটে, কিন্তু বিশেষ পত্র-ব্যবহার আর নাই। বৎসরান্তে বিজয়ার পরে এক পত্র দেয় প্রণাম জানাইয়া ; আর যখন জানিতে পারে, রামের বিশেষ অর্থকৃচ্ছ্রতা, তখন কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয় ; নিয়মিত কিছুই দেয় না।

এদিকে রামের এক চরম বিপদের সম্ভাবনা। রামের বড় ছেলে খোকার যক্ষ্মা হইয়াছে। নানা প্রকার চিকিৎসাই ব্যর্থ হইয়াছে, এখন কলিকাতায় আনিয়া শেষ চেষ্টা হইতেছে। রামের অনেক ধার হইয়াছে, হাতে টাকা নাই, অথচ ছেলের চিকিৎসা না করিলেও নয়।

সীতা লক্ষ্মণের কাছে কিছু টাকা প্রার্থনা করিতে রামকে অনেকদিন বলিয়াছে, তাহার তো অনেক রহিয়াছে, ভাইপোকে দিলে আর বৃথা ব্যয় হইবে না। কিন্তু কেন যে রাম লক্ষ্মণের কাছে টাকা চাহে না, সীতা বুঝিতে পারে না। ঠিক এই সময় লক্ষ্মণ দুই শো টাকা রামকে পাঠাইয়া দেয়; সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডাকা হইল। ডাক্তার বিশেষ অভয় দিতে পারিল না, খাদ্যের ব্যবস্থা করিল, রোজ দুইটা করিয়া মুরগীর ডিম।

রাম সীতাকে বলে ডিম ভাঙিয়া দিতে। সীতা বলে, তুমিই দাও, আমি আর ওসব ছুঁতে চাই না। রাম ডিম ভাঙিতে গিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে; চোখে ভাসিয়া উঠে, উর্ম্মিলার স্কন্ধে ভর করিয়া লক্ষ্মণ চলিয়া যাইতেছে, আর খোকা গিয়া বলিতেছে, কাকু, কোথায় যাচ্ছ, তুমি প'ড়ে যাবে, আমার কাঁধে ভর দাও।

রাম হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে, বলে, লক্ষ্মণ, ভাই, আজ তুই কোথা? খোকা যে প'ড়ে যাচ্ছে, তুই ওকে কাঁধ পেতে দে ভাই। ডিমটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায়।

রাম রোজই নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়া সীতাই ডিম ভাঙিয়া ছেলেকে খাওয়াইয়া দেয়।

---

# আর্যামির বর্ব্বরতা

"মহাভারতে দেখি, যুদ্ধে জয়লাভের লোভে অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ এই একটি মিথ্যা কথা যুধিষ্ঠির ব্যবহার করেছেন। সেজন্য তাঁর কত সংকোচ কত পরিতাপ। সেজন্য তখনকার সমাজ তাঁকে নরকবাস প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য ব'লে গণ্য করেছে। য়ুরোপে আজ জয়লোভে চারিদিকে মিথ্যার মহাপ্লাবন। আজ য়ুরোপীয় যোদ্ধারা হত্যাকাণ্ডের কোনো দুর্নীতিতে কোনো কুণ্ঠা রাখে নি। আমাদের দেশে এক দিন যাঁরা বলেছিলেন নিরস্ত্রকে অস্ত্রী, সুপ্তকে জাগ্রত আক্রমণ করবে না, মানবিকতার অভিব্যক্তিতে তাঁরা উপরে উঠেছিলেন, এখনকার জয়লোভপ্রমত্তদের সঙ্গে তাঁরা এক জাতের মানুষ ছিলেন না। যুদ্ধে হিংস্রনীতির চেয়ে অহিংস্রনীতিতে বীরত্ব প্রকাশ পায় অনেক বেশি, একথা অনুভব করতে যাঁরা অক্ষম, মনুষ্যত্বের পরিণতিতে তাঁরা নিচের কোঠায় আছেন সেকথা সম্পূর্ণ বোঝবারও শক্তি থেকে তাঁরা বঞ্চিত।

একথা শুনে কেউ কেউ মনে করতে পারেন আমরা বুঝি এই সকল পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে উঁচু পদবীর। কিন্তু মানুষের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করতে আমরাও কি কম করেছি। য়ুরোপে ইহুদীদের যেমন কেবলি আজ ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশের আর্যত্বাভিমানীরাও কি তার চেয়ে অনেক বেশি কাল ধরে অনেক বেশি লোককে তিরস্কৃত অপমানিত করে নি? তাদের কি বঞ্চিত করে নি শিক্ষা থেকে সম্মান থেকে ন্যায়ব্যবহার থেকে?

ইহুদীদের প্রতি নির্যাতন দূর থেকে দেখে আজ আমরা উত্তেজিত হচ্ছি, কিন্তু মানুষকে ছুঁয়ে যখন আমরা গঙ্গাস্নান ক'রে শুচি হয়েছি কল্পনা ক'রে গঙ্গার সমস্ত জলকে অশুচি ক'রে দিই তখন সেটাকে অধ্যাত্মনীতির পতন এবং মানবদ্রোহী বর্বরতা বলেই কি গণ্য করব না? আর্য-উপাধিধারী হিটলারের স্বস্তিকলাঞ্ছিত বর্বরতার সঙ্গে তার কি বিশেষ প্রভেদ আছে?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রবাসী', মাঘ ১৩৪৫

# পকেটমার

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

খপ করিয়া লোকটার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। তখনও আমার পকেট হইতে মনিব্যাগটা সম্পূর্ণ বাহির করিয়া লইতে পারে নাই। লোকটার হাত এ বিদ্যায় খুব সাফ নহে বুঝা গেল। হাতখানা সরুই বলা যায়। মনে হইল, আর একটু জোরে চাপ দিলেই পট করিয়া ভাঙিয়া যাইবে।

লোকটা কহিল, উঃ! ছেড়ে দিন সার্। বড্ড লাগছে যে।

বলিলাম, ছাড়িয়া দিবার জন্য তাহার হাত আমি ধরি নাই। বেশ একটু চাপ দিতেই লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া কহিল, সে আমি বুঝতে পেরেছি সার্। কিন্তু অত জোর চাপবেন না মেহেরবানি ক'রে। এই ঠুনকো হাতে ঐ আপনার বজ্রচাপুনি বরদাস্ত হবে কেন?

প্রথমে ভাবিলাম, আচ্ছা করিয়া ঘা কয়েক লাগাই। পরক্ষণেই সে লোভ সম্বরণ করিয়া কহিলাম, এইবার থানায় চল।

পকেটমার কহিল, ঐটি করবেন না বাবু। থানায় লেবেন না। লিলেই ও শালারা আবার আটকাবে। তার চাইতে আপনিই বরং দু এক ঘা যা দিতে হয় দিয়ে ছেড়ে দিন। কিন্তু বেশি জোরে লাগাবেন না যেন। আমার আবার একটু আধটু মিরগীর ব্যামো ছেল। ওটা হঠাৎ ফের চাড়া মেরে উঠলে আপনি আবার ফ্যাসাদে প'ড়ে যাবেন।—বলিয়া সে বোধ হয় আমার হাতের দুই একটা মৃদু আঘাতের জন্যই তৈয়ারি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভারী অদ্ভুত লাগিল। এ যেন সত্যকারের পকেটমার নয়, এ যেন কোন উদ্ভট রূপকথার পকেটমার। মনে হইল, যাক, গল্প লিখিবার জন্য একটা চমৎকার চরিত্র পাওয়া গেল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে একটু আগেই আমার পকেটে হাত ঢুকাইয়াছিল, তাহা মনে হইতেই মনটা যেন আবার কঠিন হইয়া উঠিল। বলিলাম, ইয়ার্কি নয়। চল থানায়।

পকেটমার কহিল, কি অপরাধে সার্?

ভীষণ চটিয়া উঠিলাম। একটা তুচ্ছ আনাড়ি পকেটমার কিনা মুখের উপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি অপরাধে তাহাকে থানায় লইয়া যাইব? কিন্তু তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সেখানে মোটেই ইয়ার্কির ভাব নাই। প্রশ্নটা বেশ গম্ভীর এবং যথার্থ ভাবেই করিয়াছে। তাহার যে কি অপরাধ, তাহা সে কিছুতেই যেন বুঝিতে পারিতেছে না।

প্রশ্ন করিলাম, পকেট মারবার চেষ্টা করাটা অপরাধ নয়?

পকেটমার কহিল, নিজের পকেট ফাঁকা থাকলেই পরের পকেট ফাঁক করতে ইচ্ছে যায় সার্। পকেট ফাঁকা থাকলেও পেটটা তো আর ফাঁকা থাকতে চায় না। ও শালা লবাবকে ভরাতেই হবে।—বলিয়া মুক্ত বাঁ হাতে সে তাহার নবাব শ্যালকের উপর কয়েকটা মৃদু চাঁটি মারিল।

বলিলাম, পয়সার দরকার হ'লে পয়সা রোজগার করলেই পার।

পকেটমার কহিল, তাই তো করতে যাচ্ছিলুম সার্। আপনি ধ'রে ফেলেই তো দিলেন সব মাটি ক'রে।

—পকেট মারাকে কি তুমি রোজগার বলতে চাও ?

—পকেট মারাই তো ত্নিয়ায় সবচেয়ে বড় রোজগার সার্।—বলিয়া পকেটমার বিজ্ঞের মত মৃত্ন মৃত্ন হাসিতে লাগিল। আমাকে একটা বিরাট, আমার কাছে নূতন সত্যের আভাস দিয়াছে, এই আনন্দের আলোয় যেন তাহার সারাটা মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে আরও বলিতে লাগিল, পকেট মারা মানেই আপনার পকেটের টাকা আমার পকেটে লিয়ে আসা। তার মানেই রোজগার। আপনারা সার্, খুচরো পকেটমারদের চালান ক'রে দেন, আর পাইকিরি পকেটমার শালারা দিব্বি আপনাদের পকেট মেরে যাচ্ছে, আপনারা দেখেও দেখেন না। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত বকব ? এই পার্কটার ভেতরে চলুন।

পকেটমারকে লইয়া পার্কের ভিতর ঢুকিয়া একটা অপেক্ষাকৃত নিরালা স্থানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলাম। আমি মোটেই হট্টগোল না করাতে আমাদের ত্নইজনের অপ্রীতিকর সম্বন্ধটা কেহই খেয়াল করে নাই। আমার মনিব্যাগ পকেটেই ছিল। পকেটমার আমার খুব কাছেই বসিল, অর্থাৎ আমি তাহার খুব কাছেই বসিলাম। হাত আর ধরিয়া রাখা দরকার মনে করিলাম না, কারণ আমার হাত হইতে এড়াইয়া যাইতে পারে, এরূপ পাকা দৌড়বাজ বাংলা দেশে তখন কেহ ছিল না, তাহা আমি বেশ ভাল করিয়াই জানিতাম।

পকেটমার কহিল, একটা বিড়ি ধরাচ্ছি সার্, কিছু মনে করবেন না। গলাটা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গলাটা একটু ভিজিয়ে না লিলে আর কথা সরবে না।

লোকটার কথা সরাইবার আগ্রহ আমার প্রচুর ছিল। তাই কিছু মনে না করিয়া তাহাকে বিড়ি ধরাইতে দিলাম। বিড়ির ধোঁয়ায় গলা ভিজাইয়া লইয়া পকেটমার বলিতে লাগিল, আমার হাত যে এখনও পাকে নি, তা বুঝতেই পেরেছেন। সবে লতুন সুরু করেছি কিনা। আমার ওস্তাদ হ'লে এমনই সাফ লিয়ে লিত যে, আপনার বাপের সাধ্যি কি, টের পাবেন !—বলিয়া তাহার ওস্তাদের উদ্দেশে ত্নই হাত জুড়িয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। কহিলাম, তোমার ওস্তাদ আছে নাকি ?

পকেটমার কহিল, থাকবে না ? বলেন কি সার্, ওস্তাদ ছাড়া এসব বিদ্যে শেখা যায় ? যাক গে বাজে কথা। পাইকিরি আর খুচরো পকেট মারার কথা বলছিলুম। ত্নিয়ায় আজকাল দেখছি, খুচরোদের মরণ আর পাইকিরিদের রাজত্বি চলেছে। আচ্ছা, ভিন্‌দেশীরা এসে যখন পকেট মারে, তখন আপনারা কিছু মনে করেন না, আর আমরা শালারা দেশের লোক হয়ে পকেট মারলেই খাপ্পা হয়ে ওঠেন সার্ !

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, ভিন্‌দেশীরা এসে পকেট মারছে ?

পকেটমার কহিল, মারছে না তো কি ? ধরুন না শালার চীনদেশীদের কথা। ও শালারা জুতো মেরে মেরে পকেট মেরে লিচ্ছে না ? আর সেই যে কোন্ শালার কোম্পানি এসে অলিতে-গলিতে দোকান খুলে যেমন লোককে জুতো পেটা করছে, তেমনই পকেট মারছে তো মারছেই,

মেরে মেরে লাল হয়ে গেল সার্। তবু আপনাদের হুঁস নেই, আর আমরা শালারা একটু পকেট ছুঁয়েছি কি অমনই ফোঁস ক'রে ওঠেন!

বক্তৃতাবাজ অনেক রকমের লোক দেখিয়াছি, কিন্তু বক্তৃতাবাজ পকেটমার এই প্রথম দেখিলাম। উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। বিশেষ করিয়া যখন কয়েকদিন যাবৎ গল্প লিখিবার ভাল প্লট পাইতে-ছিলাম না। আরও জমাট হইয়া বসিয়া একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট ধরাইলাম।

পকেটমার কহিয়া উঠিল, এই দেখুন সার্। এই সাদা নলের ধোঁয়াবাজিতে ধোঁয়া ফুঁকছেন না তো, ফুঁকছেন পকেটের পয়সা। শালারা কি রকম ক'রে পয়সা লুটে নিয়ে নিচ্ছে, আর আপনাদের যত পকেট সামলানো আমাদের মতন গরিবগুরবা খুচরোদের বেলায়।

কথাগুলা লোকটা আমার ধূমায়মান সিগারেটের দিকে এমন ভাবে চাহিয়া বলিল যে, হাতের সিগারেটের জন্য লজ্জায় আমার মাথা যেন কাটা যাইতে লাগিল। কিন্তু নেহাৎ ধরাইয়াছিই যখন, তখন সেটাকে ফেলিয়া আর দিতে পারিলাম না; সেটা হাতেই ধূমায়িত হইতে লাগিল।

পকেটমার কহিল, আপনাদের ঐ ধোঁয়াবাজি না করলেই কি হয় না সার্?

সঙ্গে সঙ্গে প্রায়নিঃশেষিত বিড়িতে শেষ টান দিয়া সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। চালুনি ও ছুঁচের গল্পটা মনে পড়ায় কহিলাম, কিন্তু ধোঁয়াবাজি তুমি তো নিজেই করছ হে।

ইঙ্গিতটা পকেটমার বুঝিল, কিন্তু অপ্রতিভ হইল না। কহিল, করছি বটে সার্, কিন্তু বিড়ি, সিগ্রেট নয় তো। আপনি ফুঁকছেন সিগ্রেটের ধোঁয়া, আপনার পকেট মেরে নিচ্ছে বিদেশী; আপনি টের পাচ্ছেন না, পেলেও গা লাগাচ্ছেন না। আপনার পকেট থেকে মেরে নেওয়া পয়সায় শালার বিদেশীদের উঠছে ইমারৎ, ফুলছে ব্যাঙ্কের পুঁজি, উড়ছে মদ, চলছে ফুর্ত্তি। শালাদের তেলা মাথায় তেল প'ড়ে প'ড়ে চুল চপচপে হয়ে উঠল। আপনারা সিগ্রেট ফুঁকে কাপ্তানি ক'রে মরেন, আর ও শালারা আপনাদের পকেট মেরে মেরে লাল হয়ে যায়। আমরা কিন্তু সার্, বিড়ি ফুঁকি। আমাদের ফুঁকে দেওয়া পয়সায় খেয়ে বাঁচে কত গরিব বিড়িওলা, বিড়িওলী। আপনাদের সিগ্রেট ফোঁকা পয়সায় ইমারতের ওপর চিত্তিরের কাজ হয়, পিপের ওপর দাঁড়ায় পিপে; আর আমাদের বিড়ি ফোঁকা পয়সায় ভাঙা খোলার ঘর একটু হয়তো জোড়া লাগে, শুক্‌নো পেটে পড়ে দানাপানি।

পকেটমারের পরিত্যক্ত বিড়িটা একটু দূরে পড়িয়া ছিল। ঐ দিকে তাকাইয়া আমার হাতের সিগারেটটাও যেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। হাত হইতে সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, আর কোন দিন সিগারেট খাব না পকেটমার। ধোঁয়া যদি খেতেই হয় তো বিড়ির ধোঁয়া খাব।

পকেটমারের মুখ আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, আমার কথাটা তা হ'লে আপনি বুঝতে পেরেছেন সার্? ঠিক আন্দাজ করেছিলুম, আপনি বুঝবেন। কিন্তু এত কথা বলবার আগেই যদি বুঝতেন, তা হ'লে আমার হাতখানা এমন জখম হ'ত না।

বলিলাম, সেকি? তোমার হাত জখম হয়েছে নাকি?

পকেটমার কহিল, তা একটু আধটু হয়েছে বই কি সার্। বিদেশী পাইকিরি পকেটমাররা জখম করে আপনাদের, আর আপনারা জখম করেন আমরা বেচারাদের। আমাদের জখম ক'রে থানায় না নিয়ে বরঞ্চ ভীম নাগের দোকানে নিয়ে সন্দেশ খাইয়ে দেওয়া উচিত।

—কেন ?

—দেশের পয়সা আমরা বরং দেশে রাখি। এই আপনার কথাই ধরুন না সার্। আপনার মনিব্যাগে যে পয়সা ছেল, তা দিয়ে আপনি আরও ক প্যাকেট বিলিতি ধোঁয়া ওড়াতেন তার ঠিক আছে ? মনিব্যাগটি আমি লিয়ে লিতে পারলে ঐ ক প্যাকেটের দামই দেশে থাকত, তাতে কতকগুলো গরিবের ছমুঠো ভাত জুটতো সার্। আপনি খপ ক'রে ধ'রে ফেলেই তো সার্, দিলেন সব একদম মাটি ক'রে। আর একদিনের কথা বলি সার্। সেদিন শালার হাতটা যেন আজকের চাইতে ঢের বেশি সাফ ছেল, লয়তো ও শালা ফোতো কাপ্তান আপনার মত পাকা হুঁসিয়ার ছেল না। যাচ্ছিল পকেটে লোটের তাড়া লিয়ে ফুর্ত্তি ওড়াতে ঐ লাইট-কেলাব না কি বলে, তাতে। ফরসা তুলতুলে চেহারা, কোনও শালা টাকার কুমীরের ছাওয়াল-টাওয়াল হবে। বড় রাস্তার ধারে ডেরাইবরকে গাড়ি রাখতে ব'লে গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। কখন বেমালুম সাট ক'রে পকেট মেরে দিলুম সার্, শালার বাপও টের পেল না। টের পেয়েছেল বটে পরে ; কিন্তু তখন তো আর আমি তাকে দেখি নি। ও শালা ফুলবাবুর পকেট মেরে আমার কি অপরাধটা হ'ল, বলুন। ওর এক রাতের ফুর্ত্তিতে যে নোটগুলো পড়ত ফিরিঙ্গী বাইজীর খপ্পরে, সেগুলো আমার পুরো একটা পরিবারের তিনটি মাস খোরাক জোটাল সার্, আর মাঘের হাড্ডিকাঁপানো শীতে আমার রোগা ছাওয়ালগুলোর গায়ে তুলে দিল গরম জামা। পুলিসের খপ্পরে পড়লে সার্, আইনের প্যাঁচে ঠিক শালার ছটি মাস ঘানিতে জুড়ে দিত কলুর বলদের মতন। এই আইনের মতন বেআইনী চিজ, জানলেন আপনি, তামাম ছনিয়া ঢুঁড়লেও আরেকটি পাবেন না। এ শালা জানে শুধু খুচরোদের ঘানিতে জুড়তে, আর পাইকিরিদের সেলাম ঠুকতে।

আমি বলিলাম, ফোতো কাপ্তেনের পকেট তোমরা যত খুশি মার, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু অনেক নিরীহ মাঝারি ছাপোষা লোকের পকেট মারতেও তো তোমরা কসুর কর না। এই তো সেদিন এক মাছিমারা কেরানি ভদ্রলোক তার এক মাসের মাইনে তিরিশটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, হঠাৎ দেখেন, তাঁর পকেট মেরে কে সবগুলো টাকা নিয়ে গেছে। তাঁর কান্না শুনলে তোমার মন হয়তো গলত না পকেটমার, কিন্তু আমাদের সকলেরই কান্না পেল। বেচারীর কি অবস্থা বল তো। ভাব তো একবার।

পকেটমার কহিল, ওরকম একটু আধটু হবেই সার্। ভুঁইকম্প যখন হয়, তখন কত খারাপ লোক মরে, কত ভাল লোকও মরে। পুলিসের লাঠি যখন চলে, তখন এমন ঢের লোকের মাথায় পড়ে, যাদের সেরেফ কোন কসুরই নেই। তেমনই আমরা যেমনই সুবিধে পাই তেমনই পকেট মারি। পাঁজি-পুথি মিলিয়ে পকেটওয়ালার চোদ্দ পুরুষের হিসেব লিয়ে পকেট মারতে গেলে কি আর ব্যবসা চলে সার্? চলে না।

ভাবিয়া দেখিলাম, সত্যই চলে না। নাপিতের সেই বিখ্যাত কাহিনী মনে পড়িল। প্রথমে নরুনের সাহায্যে সে চমৎকার ফোড়া অপারেশন করিত ; কিন্তু অ্যানাটমি শিখিবার পর অপারেশন করিবার জন্য নরুন হাতে লইলেই তাহার এত সব শিরা উপশিরা স্নায়ু উপস্নায়ু প্রভৃতির কথা মনে হইত যে, অপারেশন আর করা হইয়া উঠিত না। পকেটমাররাও যদি হিসাব করিতে সুরু করে

তবে হিসাবই হইবে, পকেট মারা আর হইবে না। মুখ দিয়া যেন অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া গেল, তা মন্দ বল নি পকেটমার।

কি যেন একটুক্ষণ ভাবিয়া পকেটমার কহিল, পকেট মারি কেন জানেন? পেটের জ্বালায় আর রাগের জ্বালায়।

আমি বলিলাম, পেটের জ্বালায় বুঝলুম। কিন্তু রাগের জ্বালা কেন?

পকেটমার কহিল, যখন দেখি, পাইকিরি পকেটমারদের জন্যে আপনারা পকেট খুলে রাখেন, তখন রাগ হয় এই ভেবে যে, খুচরোদের বেলায় তবে অন্য রকম ব্যবস্থা কেন? বাইরের পাইকারদের চাইতে দেশের খুচরোদের পেট ভরানো কি খারাপ সার্? খারাপ লয়। অথচ এটা আপনারা যে বোঝেন না, এই দুঃখে তো বাঁচি না। ঐ শালার বিদেশী পকেটমাররা যত বাড়বে সার্, আমাদের লীলাখেলাও ততই বাড়বে জানবেন। এ একেবারে নিঘ্ঘাত সার্। হতেই হবে। উঃ। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, রাজভোগ পায় ভিন্‌দেশী যোগী। এ কথা যখন ভাবি, তখন শালার রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে। তখন ইচ্ছে করে, আপনাদের সব শালার পকেট একদিনে ফাঁক করে দিই।

পকেটমারের দুইটি চোখই উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিল।

আমারও চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল—বিস্ময়ে। এ ধরণের পকেটমারের কথা কল্পনাও কোন দিন করি নাই।

কিন্তু হঠাৎ সময়ের কথা মনে হওয়াতে হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়িল। দেখিলাম, আর বেশি দেরি করা চলিবে না। যে সময়ে নীহারের ওখানে পৌঁছানোর কথা, সে সময়ের আর বেশি দেরি নাই।

বলিলাম, এক্ষুনি আমায় ট্রামে উঠতে হবে পকেটমার। যেতে হবে সেই টালিগঞ্জের শেষ মাথায়।

পকেটমার কহিল, ওঃ! সে যে অনেকটা দূর সার্।

বলিলাম, সেইজন্যেই তো তাড়াতাড়ি করা দরকার।

পকেটমার একবার আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, অদ্দুর আমায় লিয়ে যাবেন সার্? কেন সার্? কিন্তু থানা তো টালিগঞ্জের শেষ মাথায় লয়।

কহিলাম, থানায় তোমায় নিয়ে যাব না পকেটমার।

—আপনার মেহেরবানি সার্। দুচার ঘা কি আপনি লিজেই লাগাবেন? কিন্তু দেখবেন সার্, আমার আবার সেই পুরোনো মিরগীর ব্যামো। আপনি যেন ফ্যাসাদে না প'ড়ে যান সার্। তা ছাড়া আমার আবার গণ্ডা দেড়েক অপোগণ্ড ছাওয়াল আছে কিনা।

পকেটমারের কথার মধ্যে যাহা ছিল, তাহাতে আমার মুখে যেমন ক্ষণিকের জন্য মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, চোখ দুইটিও তেমনই ছল ছল করিয়া উঠিল। মনিব্যাগ খুলিয়া কহিলাম, হাত পাত পকেটমার।

যন্ত্রচালিতের মত পকেটমার দুই হাত একসঙ্গে পাতিল। মনিব্যাগ উজাড় করিয়া সাত

টাকা সাড়ে তেরো আনা পকেটমারের হাতে ঢালিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় পকেটমার সদ্যবৃশ্চিকদংশিত শিশুর মত চেঁচাইয়া কহিল, একি করলেন সার্?

—তোমাকে দিলুম পকেটমার। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার যেন আর—

আমার সাত টাকা সাড়ে তের আনা বোধ হয় পকেটমারকে বিস্মিত ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কারণ অভিভূতভাবেই সে কহিল, না না, সব আমায় দেবেন না সার্।

কিন্তু সব যে লইতে চাহে না, তাহাকে সব দিবার জন্য মনটা আকুল হইয়া উঠিল। কথার জবাব না দিয়া হন হন করিয়া পার্কের বাহিরের দিকে রওনা হইলাম।

—টালিগঞ্জ অনেকটা পথ এখান থেকে। টেরাম-ভাড়ার জন্যে চার গণ্ডার পয়সা অন্তত লিয়ে যান সার্, মেহেরবানি ক'রে।—বলিয়া আমার পকেটে চার গণ্ডা পয়সা গুঁজিয়া দিয়া একটা সেলাম ঠুকিয়া পকেটমার বিদায় লইল।

---

# তিন যুগ

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

"Quinquireme of Nineveh from distant Ophir..."
*Masefield*

সুদূর সুমাত্রা হতে হংসমুখ, সহস্রক্ষেপণী,
মলয়ে মেলিয়া পাল গঙ্গামুখে বহিছে তরণী।
আনে সে সুবর্ণভার,
উজ্জ্বল মৌক্তিক আর
সিতকান্তি ইভরদ, মাধ্বীসুরা কনকবরণী।

দামস্কে পশ্চাতে রাখি 'আরবিকা' চলে পাল তুলে;
পরিপূর্ণ কক্ষ তার রৌদ্রপক্ব খর্জ্জুরে, গুগ্‌গুলে।
ক্রীতনারী চিত্রবাস,
রূপবান ক্রীতদাস,
রক্ত, নীল, পীত কাচ আনে সে কঙ্কণ-উপকূলে।

শীতশান্ত নদীজলে চলে তরী গ্রামে গ্রামান্তরে,
ত্বরাহীন, শ্রান্তগতি; কর্ণধার গাহে ক্লান্তস্বরে।
এ পারের শস্যভার
বহে সে অপর পার;
দিগন্তে অন্তিম সূর্য্য কুহেলীরে আরক্তিম করে।

# যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গবিজয়ের পর মুসলমানগণ সহজে বাংলা দেশকে শাসন-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে পারে নাই। প্রথম দিকে হিন্দু জমিদারগণ ক্ষমতাশালী হইয়া শক্তি সংগ্রহ করিতে থাকে এবং পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহী হয়। হিন্দুদের হৃত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের এই চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে নবাগত মুসলমান রাজগণের অনেকদিনই লাগিয়াছিল।

কিন্তু বিশৃঙ্খলা এইখানেই শেষ হয় নাই। সুলতান রুকন্-উদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-৭৪) যে হাবশী ক্রীতদাস আনয়ন করিয়াছিলেন, ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে তাহারা গৌড়বঙ্গে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠে। ইহারা ক্রমে ক্রমে গৌড়ের সুলতানগণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদেরই অনুগ্রহে প্রধান প্রধান রাজপদ ও আভিজাত্য লাভ করিয়া বাদশাহ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। ইহাদের হঠাৎ পাওয়া আভিজাত্যের আড়ম্বরে ও অত্যাচারে প্রাচীন ওমরাহগণ ধীরে ধীরে প্রাসাদ-সীমা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন আত্মসম্মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলেন।

গৌড়ীয় বাদশাহগণের অন্ধ হাবশীপ্রীতি তাঁহাদের পতনের পথ প্রশস্তই করিয়াছিল। এই হাবশী ক্রীতদাসগণ সাধারণত ক্লীব ;—মুসলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধ-প্রথার জন্য জগতের সর্ব্বত্র অন্তঃপুরের প্রয়োজন ও রক্ষার জন্য ইহাদের নিয়োগ করা হইত। কাজেই, নিজ নিজ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সুলতান বাদশাহগণ ইহাদের কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেন। অধিকতর বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া অনেক সময়েই এই ক্রীতদাসগণ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা প্রভুহত্যা করিয়া রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইত। "আহমদ শাহকে হত্যা করিয়া ক্রীতদাস নাসির খাঁ যখন তাহার কলুষিত পাদস্পর্শে পবিত্র গৌড়-সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিল, তখন গৌড়-রাষ্ট্রের আভিজাত্যাভিমানী ওমরাহগণ ও আহমদ শাহের প্রভুভক্ত সেনানিগণ সেই দিবসই তাহার রক্তে গৌড়-সিংহাসনের কলঙ্ককালিমা ধৌত করিয়াছিলেন। কিন্তু আহমদ শাহের হত্যার অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ইলিয়াস শাহের বংশের শেষ সুলতান জলাল-উদ্দীন ফতে শাহ অপর একজন ক্রীতদাস কর্ত্তৃক নিহত হইলে, গৌড়-রাজ্যে কেহ তাহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে নাই।" এইরূপ অবস্থার একমাত্র কারণ এই যে, এই সকল অশিক্ষিত, অসভ্য হাবশীগণের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আত্মরক্ষার জন্য অভিজাত ওমরাহগণ দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন ; কাজেই, এই দুরাত্মাদের দমন করিয়া দুর্গতদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার মত কোনও শক্তি তখন বাংলা দেশে ছিল না। সমসাময়িক সাহিত্যে এই সময়ের গৌড়-বঙ্গের সুন্দর বিবরণ আছে। বাংলার হাবশী-ক্রীতদাস সম্বন্ধে গোলাম হোসেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, বার্বগ কর্ত্তৃক জলাল-উদ্দীন ফতে শাহ নিহত হইলে, যে কেহ রাজাকে হত্যা করিত, সেই দেশের সর্ব্বত্র সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারীরূপে সম্মানিত হইত। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ফরিয়া-ই-সুজা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গৌড় দেশে পুত্র পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করে না, সময়ে সময়ে

ক্রীতদাসগণ প্রভুহত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করে। ফেরেশ্‌তা বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রভুহত্যা না করিলে কেহ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিতে পারিত না।

সুলতান জলাল-উদ্দীন ফতে শাহ নিহত হইবার পর গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লইয়া ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ-বিদ্রোহ ও হত্যাকার্য্য কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতে লাগিল। একজন অপর একজনকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর অন্য একজন তাহাকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল।

এই সময়ে সিদী বদর দেওয়ানা শমস-উদ্দীন মজঃফর শাহ নাম গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিল। এই সকল হাবশীগণ যেরূপ ভাবে সিংহাসন অধিকার করিত, তাহাতে তাহাদের মনে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারীদিগের অবস্থা প্রাপ্তির শঙ্কা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিত। এইজন্য মজঃফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শক্তি এবং অর্থের প্রতি সন্দিহান হইল। ইহার ফলে অভিজাতবংশজ বহু বিদ্বান, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি নিহত হইল। যে সকল হিন্দুরাজা এই হাবশী সুলতানদের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও বিনষ্ট হইলেন। মজঃফর শাহ রাজস্ব-সংগ্রহকালে প্রজাপীড়ন করিতেন। প্রজাগণ তাঁহার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইল এবং তাঁহাকে গৌড়ে রাখিয়া নগর পরিত্যাগ করিল। পরিশেষে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩ সনে মজঃফর শাহকে নিহত করিল।

মজঃফর শাহ নিহত হইলে তাঁহার উজির সৈয়দ হোসেন আলা-উদ্দীন হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। হোসেন শাহ বাংলা দেশকে সুশাসনে আনিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া গৌড় লুণ্ঠনের জন্য দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের প্রাণদণ্ড হয়। হোসেন শাহ বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি প্রাসাদরক্ষক পদাতিক সেনাদের কর্ম্মচ্যুত করেন এবং বিশ্বাসঘাতক হাবশী ক্রীতদাসদিগকে গৌড়রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সৈয়দ বংশীয় এবং মোগল ও আফগান জাতীয় মুসলমানদিগকে গৌড়ের প্রধান প্রধান রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি বহু হিন্দুকে প্রধান এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বহুবর্ষব্যাপী যে অরাজকতা এবং নৈরাজ্য বাংলা দেশে বিরাজ করিতেছিল, তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেশে সুশাসন প্রবর্ত্তন করা অল্পদিনের কাজ নয়। হোসেন শাহ হিন্দু এবং মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার করিলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ প্রজাপীড়ন করিত। এই প্রজাপীড়কদিগের মধ্যে আবার অনেকেই হিন্দু। অনেক ধর্ম্মান্ধ মুসলমান রাজকর্ম্মচারী হিন্দুজাতির প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। তাহারা হিন্দু-মন্দির ধ্বংস অথবা অপবিত্র করিত। হোসেন শাহ এই সমস্ত অনাচার কখনই অনুমোদন করেন নাই। বরং নিজে ইহার জন্য আক্ষেপ করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের কথা সেই সময়ের সাহিত্যে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থে এইরূপ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘরদ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥"

হৃতবল হিন্দুগণ রাজকর্ম্মচারীদের এই নির্ম্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা ছাড়া আর উপায় ছিল না। অবতারবাদে বিশ্বাসী হিন্দুগণ আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের পূজা করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে তাঁহাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। পরম ভাগবত, "জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর" অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার ইষ্ট-গোষ্ঠী লইয়া প্রতিদিন নারায়ণ-শিলায় তুলসীমঞ্জরী দিয়া জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত নারায়ণকে অবতীর্ণ হইবার জন্য নিভৃতে, গোপনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন।

বাংলা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ১৪০৭ শকে ( খ্রীঃ ১৪৮৫ ) ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নান করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে গৃহে ফিরিবার পথে নবদ্বীপবাসী নরনারী জগন্নাথ মিশ্র নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে নবজাত শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া দেখিল, মিশ্রপত্নী শচীদেবী একটি অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই শিশুটিই কালে শ্রীচৈতন্যদেব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

এই শিশু যে অসাধারণ, তাহা বাল্যকাল হইতে বুঝা গিয়াছিল। শিক্ষা-ব্যাপারে ইনি অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত সেযুগের নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ্। নিমাই তাঁহার নিকট শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন শিক্ষালাভ করিবার পর শিষ্য গুরুর সকল ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পুনরায় সেই সকলই স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই গঙ্গাদাস তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সেই দাম্ভিক, উদ্ধত-স্বভাব বালক নবদ্বীপের পণ্ডিতদের পথেঘাটে ধরিয়া কূট ও জটিল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের লাঞ্ছিত করিতেন এবং উত্তরের কোনও গোলমাল হইলে অপমান করিতেন। একদা মুরারি গুপ্তকে বলিয়াছিলেন, হে বৈদ্য, গৃহে যাইয়া ঔষধের বটিকা প্রস্তুত কর; বিদ্যা-ব্যাপারে তোমাদ্বারা কাজ চলিবে না। ধর্ম্ম অথবা ভগবান-বিষয়ক কোনও কথা কেহ বলিবার প্রয়াস করিলে নিমাই তাহার কথায় ব্যাকরণের ভুল ধরিয়া অথবা সংস্কৃত শ্লোকের ধাতু-প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেন।

ষোল বৎসর বয়সে নিমাই টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপকতা আরম্ভ করিলেন। এত অল্প বয়সে এই কার্য্য করা নবদ্বীপের মত স্থানেও এই প্রথম।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যজীবনের এই সকল ঘটনা আলোচনা করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা ছিল অসাধারণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল—দুর্জ্জয় সাহস ও দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ। এই অমানুষিক তেজস্বীতা অন্যায়ের প্রতিকার করিতে তাঁহাকে কখনও পশ্চাৎপদ করে নাই। দুই একটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

জগাই মাধাই নামক ভ্রাতৃদ্বয় স্বেচ্ছাচার দ্বারা নবদ্বীপের অধিবাসীদিগকে বিশেষ উত্যক্ত করিতেছিল। অথচ নানা কারণেই তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিবার সাহস কাহারও ছিল না। এই পাষণ্ডদ্বয় করে নাই এমন কাজ নাই; একদিন মাতাল অবস্থায় এই দুই ভাই নিত্যানন্দকে প্রচণ্ড প্রহার করিয়া তাঁহাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিল। নিত্যানন্দ ছিলেন 'অক্রোধ পরমানন্দ'। এইরূপ অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনেও তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন না; বরং পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সংবাদ চৈতন্যদেবের নিকট পৌঁছিল। প্রিয় সহচরের নিগ্রহের সংবাদ শুনিয়া তিনি সাঙ্গোপাঙ্গসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। 'রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে'—তাঁহার সেই গৌরকান্তি ক্রোধে রক্তাভ হইয়া উঠিল। তিনি এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদ্বয়ের ক্ষমতার কথা, নৃশংসতার কথা, সমস্তই ভুলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন, "এই পশুদ্বয়কে হত্যা করিব। তাঁহার এই ক্রোধ দেখিয়া অনুচরগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে প্রমাদ গণিল; এমন কি জগাই-মাধাইও ভীত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু চৈতন্যদেব কিছুতেই শান্ত হইলেন না। শেষে নিত্যানন্দের সানুনয় অনুরোধে ইহাদের ক্ষমা করিলেন। *

শ্রীনিবাসের গৃহাঙ্গনে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে অনেকে একত্র হইয়া হরিনামসংকীর্ত্তন করিতেন। মৃদঙ্গ, করতাল এবং সমবেত কণ্ঠের ঐক্যতানে শাক্তগণ বিরক্ত হইয়া কাজীর নিকট অনুযোগ করিল। কাজী তদন্তে বাহির হইয়া কীর্ত্তনের ধ্বনি স্বকর্ণে শুনিয়া হিন্দুয়ানির এতটা বাড়াবাড়ি অনুমোদন করিল না। গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছ প্রহার আরম্ভ করিল। সকলে ভয়ে পলায়ন করিল। শৃঙ্খলা স্থাপনে কৃতকার্য্য হওয়ার আনন্দে কাজী তাহাদের পরিত্যক্ত মৃদঙ্গ প্রভৃতি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল।

সংবাদ চৈতন্যদেবের নিকট পৌঁছিল। তিনি কাজীর স্পর্দ্ধায় ক্রোধান্বিত হইলেন। গৃহাঙ্গনে বসিয়া স্বধর্ম্ম পালনে এরূপ বাধা দিবার অধিকার কাজীর নাই। তিনি বলিলেন, আমি আজ সমগ্র নবদ্বীপের পথে পথে কীর্ত্তন করিব। তোমরা আমার সহিত নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিও। দেখিব, কে আমার কি করিতে পারে!

সেই রাত্রে সংকীর্ত্তনদল পথে বাহির হইল। সকলে নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে নাম-গান আরম্ভ করিল।

---

* বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্যভাগবত' মধ্য ১২শ।

নগরবাসী সকলে আপন আপন গৃহ সজ্জিত ও আলোকিত করিয়া পথ সুগম করিল। দল যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই লোকবৃদ্ধি হইল। শেষে কাজীর গৃহের নিকটে গিয়া চৈতন্যদেব হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন, ওরে কাজী, তুই কোথা, শীঘ্র আয়, তোর মাথা কাটিয়া ফেলি। *

কাজী বুঝিতে পারে নাই যে, এই ব্যাপার এতদূর গড়াইবে। তাহার কার্য্যাবলীর এইরূপ প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারও থাকিতে পারে, সে ধারণা তাহার ছিল না। গৌড়েশ্বরের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি উদারতার কথা তাহার অবিদিত নহে; সে জানিত, গৌড়েশ্বরের নিকট এই ঘটনার সংবাদ পেঁৗছিলে তিনি তাহাকে স্বধর্ম্মী বলিয়া রেহাই দিবেন না। কাজেই সে ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু চৈতন্যদেব ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার আদেশে কাজীর গৃহের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া, গাছপালা উপড়াইয়া নষ্ট করা হইল। অবশেষে তাহার গৃহে অগ্নি-সংযোগ করা হইল। কাজী সমস্তই সহ্য করিয়া আপোষের জন্য ব্যস্ত হইল। এইরূপে নবদ্বীপে প্রকাশ্যভাবে হিন্দুগণ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

এই ঘটনার পর হইতে চৈতন্যদেবের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কাহারও কোনও অবকাশ রহিল না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, তিনি একজন অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ।

অদ্বৈত প্রভৃতি অবতারবাদীগণ এইরূপ একজন তেজস্বী পুরুষকে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পাইল। যিনি প্রবলপরাক্রান্ত কাজীকে দমন করিতে পারেন, তিনি সেই ভগবান ছাড়া আর কেহ নহেন, যিনি যুগে যুগে দুষ্কৃতির বিনাশ ও অধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। চৈতন্যদেবের অসামান্য রূপলাবণ্য এবং অসাধারণ বুদ্ধি-প্রতিভার মধ্যে তাঁহারা অবতারের লক্ষণ-চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে, চৈতন্যদেবই স্বয়ং ভগবান—পতিত হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এই মহৎ আবিষ্কারটিকে প্রচার করিবার যথারীতি ব্যবস্থা করা হইল। অদ্বৈতাচার্য্যের জ্ঞানী সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাতি ছিল। এই বৃদ্ধটি যখন চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রণাম-প্রদক্ষিণ দ্বারা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেরই চৈতন্যদেবকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস হইতে আরম্ভ হইল। বয়স-গণনায় চৈতন্যদেব অদ্বৈতের পুত্রস্থানীয়; যখন সেই অদ্বৈত চৈতন্যদেবকে তাঁহার মস্তকে পদস্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন, তখন সকলেই চৈতন্যদেবের অবতারত্বে নিঃসন্দেহ হইল। চৈতন্যদেবের স্তবস্তুতি আরম্ভ হইল;—লোকে তাঁহার দেহ-পূজা প্রবর্ত্তন করিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া সকাল-সন্ধ্যায় নরনারী প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। চৈতন্যদেবের সহপাঠী, বন্ধু এবং স্তাবকগণ তাঁহার যে জীবনী রচনা করিলেন, তাহাতে বিশেষভাবে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, স্বয়ং কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি যে 'লীলা' করিতেছেন, তাহা কৃষ্ণ-লীলারই অনুরূপ।

এইরূপে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত স্তবস্তুতি শুনিতে শুনিতে ক্রমে চৈতন্যদেবেরও মনে হইতে লাগিল যে, তিনিই ভগবান। এই ভাব, এই মোহ যেদিন হইতে চৈতন্যদেবকে আশ্রয়

* বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্যভাগবত' মধ্য ২৩শ

করিল, সেদিন হইতে তাঁহার জীবনে দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেই নির্ভীক, তেজস্বী, শক্তিমান পুরুষ কেমন যেন উদাস আকুল কবিত্বময় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই অবস্থায়ও বেশিদিন থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। মাতা-স্ত্রী-আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবপূর্ণ মায়াময় এই সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বনে বাধ্য হইলেন।

তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

তথাপি চৈতন্যদেবকে আমরা যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। তিনি যে যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগে শক্তিমানের যথেচ্ছ অত্যাচারে মানুষ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিল। বাদশাহের নামে তাঁহার নিম্নতন কর্ম্মচারী প্রজাপীড়নের তাণ্ডবে বাঙালী জাতিকে পেষণ করিতেছিল; মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, অর্থ বা মত বলিয়া কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। এই যুগে চৈতন্যদেব স্বীয় তেজবীর্য্য দ্বারা ইহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যে, দেশের শাসক যেই হোক না কেন, প্রত্যেক প্রজার কতকগুলি ব্যক্তিগত অধিকার আছে; ইহাতে শাসক হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই সকল ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেই নৃশংস বর্ব্বরতার যুগে 'সত্যাগ্রহ' দ্বারা এই সত্য প্রচার এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা সাধারণ মানুষের নাই। যিনি এই কাজ ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত সমাধান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে চৈতন্যচরিত আলোচনা করিতে হইলে, এই ভাবেই করিতে হইবে। *

* ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙলার ইতিহাস' হইতে ঐতিহাসিক উপাদান গৃহীত।

# শিশুশিক্ষা

সম্বুদ্ধ

১৯১৫ সন।

সন্ধ্যাবেলা। বৃদ্ধ হরিধন ভট্টাচার্য্য বারান্দায় বসিয়া মালা জপিতেছিলেন। ঘরের মধ্যে দশমবর্ষীয়া নাতিনী রাধারাণী তারস্বরে অধ্যয়ন করিতেছিল।

সহসা ভট্টাচার্য্যের জপে বিঘ্ন ঘটিল। উৎকর্ণ হইয়া তিনি শুনিলেন, রাধারাণী পড়িতেছে—Everyone loves a good girl—একটি উত্তম বালিকাকে প্রত্যেকে ভালবাসে।

ভট্টাচার্য্য ইংরেজী জানেন না। বাংলাটা শুনিলেন—একবার দুইবার তিনবার। তারপর গর্জ্জন করিয়া ডাকিলেন, রাধি!

রাধারাণী কহিল, যাই।

দ্বারের কাছে আসিতেই বৃদ্ধ পুনরায় গর্জ্জিলেন, ও কি বলছিলি?

রাধারাণী সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল, বলছিলাম কই, পড়ছিলাম তো।

—কি পড়ছিলি?

—আমাদের পড়ার বই।

—কই, নিয়ে আয় বই।

রাধারাণী বই আনিল। বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বইয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, কোন্ জায়গায় পড়ছিলি?

রাধারাণী দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধ দেখিলেন, খালি ইংরেজী লেখা। কহিলেন, সে কথা কই?

—কি কথা?

—এক্ষুনি যা ব'লে চেঁচাচ্ছিলি—উত্তম বালিকাকে প্রত্যেকে তোর মুণ্ডু করে?

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রাধারাণী কহিল, ও মানে। সে তো খাতায় লেখা আছে।

—কোথায় সে খাতা?

রাধারাণী তটস্থ হইয়া খাতা আনিয়া দিল। বৃদ্ধ কহিলেন, আগে খাতা আনিস নি কেন? বিদ্যে বাড়ছে, না?

খাতা তিনি আনিতে বলেন নাই। কিন্তু রাধারাণী অত তর্ক করিতে পারিল না, নীরবে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু একটা অপরাধ হইয়াছে—সে আন্দাজ করিতেছিল; কিন্তু তাহার স্বরূপটা সে ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না।

বৃদ্ধ খাতা দেখিলেন। কলিযুগ না হইলে খাতা জ্বলিয়া উঠিত। শেষে কহিলেন, এ কে লিখে দিয়েছে?

—ইংরিজী দিদিমণি।

—বাংলা ক'রে বল। কি নাম তার?

রাধারাণীর চক্ষে জল আসিতেছিল। ঢোঁক গিলিয়া কহিল, শক্—শকু—

—শকুন ?

—শকুন্তলা দিদি।

—হুঁ! বৃদ্ধের মুখ ভয়ানক হইয়া উঠিল।

হাঁকডাকে ভাট্টাচার্য্যজায়া আসিয়া পড়িলেন। স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সাতঙ্কে কহিলেন, কি হয়েছে ?

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তখুনি বলেছি, মেয়ে ধাড়ি ক'রে রাখা কিছু নয়। নাঃ, আবার সখ ক'রে মেয়েকে ইংরিজী পড়তে পাঠানো হ'ল। নাও এখন বোঝ।

গৃহিণী আরও উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, কি হয়েছে, বলই না ছাই। কি করেছে রাধি ?

—কিছু করে নি, খালি একটুখানি লবের কথা শিখছেন। আর এ হতচ্ছাড়া ইস্কুলও হয়েছে তেমনই—মাস্টারণী রেখেছে, তার নাম শকুন্তলা। আরে নামই যার শকুন্তলা, সে কখনও সোজা মেয়ে হয়! শেখাচ্ছেনও তেমনই।

—কি বলছ তুমি ? কি শেখাচ্ছে ?

—কতবার বলব! ভালবাসা ভালবাসা—প্রেম—পিরীত, বুঝলে ? তারই কথা শেখানো হচ্ছে ইস্কুলে। ফের যদি কখনও ও ইস্কুলে যাবার নাম করবি—

রাধারাণী অজ্ঞাতেই কখন আসিয়া ঠাকুরমার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিল। তিনি তাহার মাথায় অভয়-হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, ক্ষেপলে নাকি তুমি! অতটুকু মেয়ে, ভালবাসার ও বোঝে কি ?

—অতটুকু! বয়েস যে এদিকে দশ পেরিয়ে এগারোয় পড়ল, তার খেয়াল রাখ ? তোমার ক বছরে বিয়ে হয়েছিল, মনে আছে ?

গৃহিণী আর তর্ক করিলেন না। রাধারাণীকে কহিলেন, হ্যাঁ রে, সত্যি ইস্কুলে ঐ কথা শিখিয়েছে ?

রাধারাণী কাঁদিয়া কহিল, পড়ার বইয়েতে আছে।

ভট্টাচার্য্য আর এক দফা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, আর এই এক হয়েছে বই। দেখ না, মলাটের ওপরেই এক ছবি দিয়েছে—ধিঙ্গি মেয়ে খালি এক গাউন প'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রূপ দেখাচ্ছেন! নির্লজ্জ বেহায়া, ওর বয়েস পনরোর কম হবে ? কক্ষনও নয়। পনরো কি, ষোল—আঠারো—বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের খুন চাপিয়া গেল। বইটাকে এক টানে তিনি ধিঙ্গি মেয়েটার গলা বরাবর ফাঁড়িয়া দুই খণ্ড করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

সবে দিন কয়েক আগে নূতন বইটা কেনা হইয়াছে; রাধারাণীর চক্ষে জল আসিল। নির্নিমেষ চক্ষে সে সেই ছিন্ন বইয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু ওদিকে ভট্টাচার্য্য-পত্নী একেবারে থ হইয়া গেলেন। যে স্বামীকে তিনি এই তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে কখনও অপব্যয়ের ভয়ে রাত্রে উঠিতে আলো জ্বালিতে দেখেন নাই, কতখানি দুঃখে ও ক্ষোভেই যে তিনি আজ এমনই করিয়া এক টানে নগদ ছয় আনা পয়সা লোকসান করিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার ব্যথার আর অবধি

রহিল না। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আগাইয়া আসিয়া স্বামীর হাত স্পর্শ করিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, ছি, এ কি করলে?

হঠাৎ কাজটা করিয়া ফেলিয়া ভট্টাচার্য্যও বোধ করি একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, এই স্পর্শ তাঁহাকে সহজেই শান্ত করিয়া আনিল। অনেকখানি নরম সুরে কহিলেন, রাগ করি কি আর সাধে! যত সব খেষ্টান্‌নী মাস্টারণীর কাছে মেয়েটাকে দুই মা-বেটায় মিলে পাঠালে, সেও বলি—যাক যাক। কিন্তু এই যে এদের ধ'রে ধ'রে তারা ভালবাসা শেখাচ্ছে, এতে রাগ না হয় কার শুনি! একে তো ঐ ধিঙ্গি মেয়ে—ও জাতকে কখনও বিশ্বাস আছে!

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ব্রাহ্মণ আর একবার মনে মনে জিভ কাটিলেন, স্মরণ হইল, যাঁহাকে কথাগুলা বলা হইতেছে, তিনিও উক্ত জাতটার সম্বন্ধে ঠিক নিঃস্বার্থ নির্ব্বিকার নন।

কিন্তু ব্রাহ্মণীর বুদ্ধি ছিল, তিনি রাগ করিলেন না। অন্তত উষ্মা প্রকাশ করিলেন না। কহিলেন, তখন কি ছাই অত জানি! সব বাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, ইস্কুলে যাচ্ছে, বউমা দুঃখ ক'রে বলে, বাজার-হিসেবটাও লিখতে জানি না, তাই বললাম, যাক ও ইস্কুলে, সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ওই এক মেয়ে।

ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া রহিলেন। গৃহিণী রাধারাণীকে টানিয়া কহিলেন, থাক, আজ আর প'ড়ে কাজ নেই। খাবি চল।

রাধারাণী ভয়ে ভয়ে কহিল, আমার খাতা! খাতাটাকে এখানে ফেলিয়া যাইতে তাহার ভরসা হইতেছিল না।

গৃহিণী খাতাটা হাতে করিতেই ভট্টাচার্য্য হাত বাড়াইয়া কহিলেন, দেখি।

এবার আর তাঁহার স্বরে ক্রোধ প্রকাশ পাইল না। গৃহিণী খাতা দিলেন। ভট্টাচার্য্য উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া কলম দোয়াতদান পাড়িয়া আনিলেন, খাতার উক্ত লেখা কাটিয়া লিখিলেন, 'উত্তম বালিকাদিগকে কেহ দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা অসূর্য্যম্পশ্যা।' রাধারাণীকে খাতা ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, এখন থেকে এই পড়বি। মাস্টারণী যদি কিছু বলে, বলবি, দাদু ব'লে দিয়েছেন। বুঝলি?

রাধারাণী খাতাটাকে সযত্নে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

রাত্রে শুইয়া ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ রে রাধি, সত্যি মাস্টারণী ঐ কথা শিখিয়ে দিয়েছিল?

রাধারাণী ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, হ্যাঁ, বইয়েতে আছে।

—কি আছে বইয়ে?

রাধারাণী উঠিয়া গিয়া বই লইয়া আসিল। দাদু খাইতে বসিলে সেই ফাঁকে সে গিয়া বইয়ের টুকরা দুইটি তুলিয়া আনিয়াছিল। সন্তর্পণে পাতা খুলিয়া কহিল, এই দেখ।

ঠাকুরমা সস্নেহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, আমি কি তোর মত ইংরিজী পড়তে জানি? পড় না কি লিখেছে।

রাধারাণী কহিল, এই যে বইয়েতে আছে—Be a good boy, মানে—একটি উত্তম বালক হও।

Everyone loves a good boy, মানে—একটি উত্তম বালককে প্রত্যেকে ভালবাসে। দিদিমণি boy কেটে girl ব'লে লিখে দিলে, আমরা সবাই তো বালিকা কিনা, তাই। girl মানে হচ্ছে বালিকা, আর boy মানে হচ্ছে বালক।—বলিয়া সে পরম স্নেহে বইয়ের পাতা গুছাইতে লাগিল।

ঠাকুরমা কহিলেন, থাক, ও আর ব'ল না। তোমার দাছু যে মানে ব'লে দিয়েছেন, তাই ব'ল, কেমন ?

রাধারাণী কহিল, আচ্ছা। কিন্তু দিদিমণি যদি বকে ? আচ্ছা ঠাকুমা, এক কাজ করব ? girl না ব'লে boy ব'লেই পড়ব—একটি উত্তম বালককে প্রত্যেকে ভালবাসে ?

ঠাকুরমা কথাটা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। কিন্তু সে যাহা হউক এবং যত উত্তমই হউক, কোন বালককে ভালবাসিবার প্রস্তাব স্বামীর মনঃপূত হইবে কি না সহসা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কহিলেন, থাক। ও ঐ উনি যেমন ব'লে দিলেন, তেমনই ব'ল, কেমন ? মাস্টারণীকে ব'ল, দাছু ব'লে দিয়েছেন, তা হ'লেই আর কিছু বলবে না।

রাধারাণী ঠাকুরমার আঙুলগুলা নিজের দুই হাতের মধ্যে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, আচ্ছা ঠাকুমা, দর্শন করা মানে কি ?

—দেখা।

—আর সক্ষম হয় না মানে ?

—পারে না।

রাধারাণী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিল। তারপর কহিল, দাছু খুব অনেক অনেক বই পড়েছে, না ঠাকুমা ? দিদিমণির চাইতেও, হেড-দিদিমণির চাইতেও ?

ঠাকুরমা কহিলেন, হ্যাঁ, তবে সে তো ইংরিজী নয়, সংস্কৃত।

তারপর ঠাকুরমা ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবে কোথায় কাহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন ; রাধারাণী বইয়ের ছিন্নগ্রীবা মেমকে বুকে চাপিয়া গল্পের ফাঁকে কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া রাধারাণী ঠাকুরমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একেবারে দারুণ কান্না জুড়িয়া দিল। অনেক সান্ত্বনাবাক্য ও প্রশ্নের পরে জানা গেল, আজ স্কুলে দিদিমণি ঠিক ঐ কথাটাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং সে দাছুর বলিয়া দেওয়া মানে বলিয়া বকুনি তো খাইয়াছেই, তার উপর দিদিমণি এবং মেয়েরা মিলিয়া হাসিয়া টিপ্পনী কাটিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া দিয়াছে।

ঠাকুরমা কহিলেন, তুই সব ঠিক ঠিক বলেছিলি তো ?

—হ্যাঁ। আমি বললাম, উত্তম মানে ভাল বালিকাদের কেউ দেখতে পারে না, তারা অসুর যম—কি যেন ঠাকুমা ?

—অসূর্য্যম্পশ্যা। তা তারা কি বললে ?

—দিদিমণি খুব হাসলে, বললে, এ মানে কে ব'লে দিয়েছে ? আমি বললাম, দাছু। তাকে খাতাও দেখালাম। দিদিমণি আরও হাসলে, আবার খাতা নিয়ে গিয়ে অন্য দিদিদের দেখালে।

তারাও আমাকে কি সব যা তা কথা বললে। বললে, দাদু নাকি কিছু জানে না। আর মেয়েগুলোও আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভ্যাংচালে অস্—য্যম্প—শ্যা ব'লে। আমি আর কক্ষনো ও স্কুলে যাব না।

ঠাকুরমার স্বামী-গর্ব্বে আঘাত লাগিল, বলিলেন, আচ্ছা।

রাধারাণীর বুদ্ধি বেশি থাকিলে হয়তো দুইয়ের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিত, বলিত, উত্তম বালিকাকে প্রত্যেকে দিদিমণির সামনে ভালবাসে, দাদুর সামনে দেখিতে পারে না।

কিন্তু সে অত ইংরেজী পড়ে নাই।

১৯৩৫ সন।

মিঃ এস. সি. চকর্‌ভার্টি, বার-অ্যাট-ল'র বাড়ি।

সন্ধ্যাবেলা। গৃহকর্ত্রী রাধারাণী সোফায় বসিয়া একখানা বিলাতী মাসিকপত্র দেখিতেছেন, তাহার মলাটে একটি প্রায়বস্ত্রহীনা মেমের ছবি। ঘরের ওদিকে আর একটা সোফায় উপুড় হইয়া তাঁহার দশ বছরের মেয়ে শীলা পড়িতেছে।

রাধারাণীর কানে সহসা এক সময়ে শীলার স্বর প্রবেশ করিল—Everyone loves a good girl, মানে—ভাল মেয়েকে সব্বাই ভালবাসে।

রাধারাণী চমকাইয়া উঠিলেন। কুড়ি বছর আগেকার এমনই আর একটি সন্ধ্যা তাঁহার মনে পড়িল। ডাকিলেন, এই, দেখি কি পড়ছিস।

শীলা বই লইয়া আসিল। সেই পুরাতন First Reader, তাহারই স্ত্রী-সংস্করণ। বইয়েই ছাপা আছে Be a good girl। Everyone loves a good girl।

এখন আর দিদিমণির boy-কে কাটিয়া girl বানাইতে হয় না।

রাধারাণী কথাটি আর একবার পড়িলেন। চকিতে এই কথার অযৌক্তিকত্ব ও পিতামহের দূরদর্শিতার কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের শান্ত মেয়ে, বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার স্বামীর সহিত তাল মিলাইতে তাঁহাকে কম ঝক্কি পোহাইতে হয় নাই। স্বামী বহু ইংরেজী পড়িয়াছেন; good কথাটাকে তিনি টানিয়া উচ্চারণ করেন goody-goody, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাগ্র কুঞ্চিত হইয়া যায়, এ দৃশ্য রাধারাণীর সুপরিচিত। বুড়া দাদু ঠিকই বলিয়াছিল, Everyone loves a good girl—এ কথা মিথ্যা। জগতে নিছক good girl-এর স্থান নাই।

হায়, সেই মিথ্যা কথা আজ তাঁহার সন্তানকেও শিখানো হইতেছে! রাধারাণীর নিশ্বাস পড়িল।

শীলা কহিল, মা, বই দাও।

মা চমকিয়া জাগিয়া কহিলেন, দিই। তোমার বইয়ে ভুল লেখা আছে, ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শীলা দুই চক্ষু ডাগর করিয়া কহিল, টীচার তো কিচ্ছু ব'লে দেন নি।

—তা হোক।

রাধারাণী ফাউন্টেন্‌পেন খুলিলেন, good কাটিয়া লিখিলেন—smart।

শীলা কহিল, মানে কি মা? তারপর বানান করিয়া পড়িল S M A R T স্মারেট।

রাধারাণী মনে মনে smart-এর বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজিতেছিলেন। বলিলেন, স্মারেট নয়, স্মার্ট। এর মানে হচ্ছে—

শীলা কহিল, ও স্মার্ট। সে তো আমি জানি।

বই লইয়া আবার সে গিয়া পড়িতে বসিল।

রাধারাণী আনমনে কন্যার পাঠাভ্যাস শুনিতে লাগিলেন—Everyone loves a smart girl।

---

# প্রিয়া ও সাগর

শ্রীগণেশ

সাগরে করি যে ভয়,—
সেই অবিরাম গর্জ্জন আর সীমাহীন বিশালতা,
শক্তি ও দুর্জ্জয়—
বিস্ময়ে ভয়ে মুখেতে ফোটে না কথা,
আপনারে মনে হয়—
অতি অসহায় অতীব ক্ষুদ্র শিশু।
ভয় করি, তবু ভালবাসি তারে, ভক্তিশ্রদ্ধা করি,
কূলে দাঁড়াইয়া ঢেউয়ের পরশ লভি'
পারি না কেবল ঝাঁপায়ে পড়িতে বুকে।
ভিজা বালুতটে দাঁড়াইয়া তাই বিস্ময়ে চেয়ে দেখি—
তটের বাঁধনে ক্রুদ্ধ ও অস্থির
বিশাল সিন্ধু দিগন্তপ্রসারিত,
আলো ও আকাশ রঙের খেলা যে খেলিছে তাহার বুকে,
আর খেলিতেছে ভয়াবহ সব তরঙ্গ চঞ্চল,
ফুঁসিতেছে আর ভীষণ শব্দে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে অনুখন,
ফেনা ভাঙিতেছে শুভ্র সে রাশি রাশি।

* * *

তোমারেও প্রিয়া, সাগরের মত ভেবেছিনু কূলহীন,
রূপের তোমার কখনো পাই নি শেষ,
দৃষ্টিতে তব আভাস পেতাম সীমাহীন শক্তির,
খালি মনে হ'ত, দেহের বাঁধন মানিছে না আর তোমার সাগর বুঝি
ভালবাসিতাম, থাকিতাম দূরে দূরে,
নির্ব্বাক শুধু রহিতাম চেয়ে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে।
পতঙ্গসম পারি নি ঝাঁপায়ে পড়িতে অগ্নিবুকে,
ভয় হ'ত, পাছে তোমার অসীমে নিজেরে হারায়ে ফেলি।

# ব্রতী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

## প্রথম দৃশ্য

সেনায়নী গ্রামে মহাসেনের প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান। নন্দা গাহিতেছিল—

| | | | |
|---|---|---|---|
| কাঁদে | মম হিয়া মাগিয়া তোমারে, | ওগো | সুদূর মধুর মরু-মায়া ! |
| মম | উষর ধূসর পথপারে | ওগো | সজল শ্যামল বন-ছায়া ! |
| তব | পৌরুষ-যশ-কল্লোলে | মম | পিপাসী তরুণ মন ভোলে, |
| তব | স্মরণে কি সুর-হিন্দোলে | দোলে | গোপন স্বপন ধরি কায়া ! |
| ওগো | নিঠুর, কঠিন দিন-শেষে | মোরে | কবে তুমি দেখা দিবে এসে ? |
| মম | শিথিল শরীরে ভালবেসে | দিবে | বিথারি শীতল স্নেহ-ছায়া ? |
| | | মম | সুদূর মধুর মরু-মায়া ! |

নন্দা গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। মহাসেন ও বিশাখার প্রবেশ

বিশাখা। আচ্ছা, তুমি কি বল তো ? যার ঘরে বাইশ তেইশ বছর বয়সের দু দুটো আইবুড়ো মেয়ে ব'সে, সে যে কেমন ক'রে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে, তা তো বাপু আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না। আর তাও যদি তারা আর পাঁচটা মেয়ের মত হ'ত। আজ বারো—বারো বছর হতে চলল, কে কোথায় রাজার ছেলে বর হয়ে আসবে, তারই প্রত্যাশায় ব'সে আছে! সাজ নেই, সজ্জা নেই, আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই! বিধবার মত এক সন্ধ্যে স্বপাক আহার! তাও আবার সারাদিন উপোস ক'রে রাজ্যের রুগীর সেবা ক'রে তারপর!

মহাসেন। আমি তো দেখি বিশাখা, ওরা বেশ আনন্দেই আছে।

বিশাখা। তা দেখবে বইকি! দেখ, তুমি আমায় আর রাগিও না বলছি। আমি শুধু তোমাদের মুখ চেয়ে অনেকদিন লোকের কথা সহ্য করেছি, কিন্তু আর করব না। অমন ফুলের মত সুন্দর মেয়ে দুটো আমার, চোখের ওপর দিন দিন পোড়া কাঠের মূর্ত্তি হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি বল কিনা, ওরা বেশ আনন্দেই আছে! মেয়ে দুটোর মুখের পানে চাইলে আমার বুক শুকিয়ে যায়। তোমার কি একটু দয়াও হয় না ? বিধাতা কি তোমাকে পাষাণ দিয়ে গড়েছেন ?

---

### পরিচয়

গৌতম—কপিলাবস্তুর রাজপুত্র। অপর নাম সিদ্ধার্থ।

মহাসেন—মগধের অন্তর্গত সেনায়নী গ্রামের ভূম্যধিকারী।

বসুমিত্র—ঐ আত্মীয়, শ্রেষ্ঠীযুবক।

সুদর্শন—মহাসেনের কর্ম্মচারী।

সুদত্ত—ব্রাহ্মণযুবক। গয়াশির মন্দিরের অন্যতম পূজারী।

সুব্রত—ক্ষত্রিয়যুবক। ঐ বন্ধু।

বিশাখা—মহাসেনের স্ত্রী।

নন্দা, নন্দবলা } মহাসেনের কন্যা।

কস্তুরী—বিশাখার ভাগিনেয়ী। নন্দা-নন্দবলার বান্ধবী। বসুমিত্রের পত্নী।

রুচি—নন্দার আশ্রিতা ব্রাহ্মণকন্যা।

মহাসেন। বিধাতা কি দিয়ে গড়েছেন তা বিধাতাই জানেন বিশাখা, কিন্তু অবস্থাচক্রে আমাকে পাষাণই হতে হয়েছে বটে। আজ বারো বছর হতে চলল, যেদিন আমার নন্দা-নন্দবলা বিষ্ণুপাদ-মন্দিরে মহর্ষি অসিত-দেবলের কাছে সিদ্ধার্থের গুণবর্ণনা শুনে এসে তাঁকে পতিরূপে পাবার জন্য সঙ্কল্প নিয়ে ব্রত আরম্ভ করে, সেদিনের কথা তোমার মনে পড়ে বিশাখা ?

বিশাখা। পড়ে না আবার ? সেদিনের কথা ভুলব আমি ? আজ দেখে দেখে চোখে কড়া প'ড়ে গেছে। প্রথম যখন দশ এগারো বছরের কচি মেয়ে দুটো সারাদিন উপোস করতে আরম্ভ করলে, সে যে আমার কি দিন গেছে, তা তুমি কি জানবে! আমিও তাদের সঙ্গে উপোস ক'রে দিনরাত কেঁদে কেঁদে মরতুম। তুমি বললে, আচার্য্য কৌণ্ডিন্য ওদের কুষ্ঠী দেখে বলেছেন, মেয়েদের বিবাহযোগ নেই। আবার এদিকে মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করেছেন, বারো বছর তাঁর নির্দ্দেশমত ব্রত পালন করলে সিদ্ধার্থকে ওরা পতিরূপে পাবেই পাবে। তুমি যখন বললে, এ হচ্ছে ভাগ্যের বিরুদ্ধে পুরুষকারের যুদ্ধ। ওরা যখন নিজেরা সাহস করছে, তখন আমরা কেন বাদী হই ? তা এতদিন তো বাদী হতে চাই নি আমি। ব'সে তো ছিলাম পাষাণে বুক বেঁধে। কিন্তু আর যে সহ্য হয় না গো! বারো বছর যে কাটতে চলল! এমনিই যদি সুপাত্র সে, যে তাকে না হ'লে চলবে না, তবে তাকে ধ'রে আনবার চেষ্টা কর। হাতে পায়ে গিয়ে ধর, না হয় মেয়ে দুটোকে নিয়ে গিয়ে তার পায়ে ফেলে দিয়ে এস, যা ওদের অদৃষ্টে আছে হোক।

মহাসেন। তুমি তো জান বিশাখা, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। যেদিন মেয়েরা তাদের সঙ্কল্পের কথা আমায় বললে, তার পরদিনই ওদের ব্রতের আয়োজন ক'রে দিয়ে আমি যাত্রা করেছি কপিলাবস্তুতে। মহারাজ শুদ্ধোদনের পায়ে ধ'রে অনুরোধ করেছি, আমার মেয়ে দুটিকে তাঁর পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবার জন্য। বলেছি, আমার আর কেউ নেই। আমার পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি, আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ঐ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ আমি কুমার সিদ্ধার্থকে দান করতে প্রস্তুত। তাতে তিনি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, আমি তোমার কাছে পুত্রবিক্রয়ের জন্য ব্যস্ত নই। তা ছাড়া কুমার সিদ্ধার্থ বিবাহিত; সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারাকে সে আজ দুবৎসর হ'ল স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছে। পত্নীকে সে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে; তার বিবাহের কথা আর উঠতেই পারে না।

বিশাখা। আর তুমি সেই অন্যগতচিত্ত বিগতযৌবন পাত্রের জন্য তোমার ঐ সরলপ্রাণা মেয়ে দুটোকে চিরজন্মের মত কুমারী ক'রে বসিয়ে রেখে দিলে! নির্ব্বোধ!

মহাসেন। নির্ব্বোধ নয় বিশাখা, নিরুপায়। তারপর যা বলছিলাম। সন্থাগারের সভ্যেরা আমাকে উপহাস ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। বললেন, তাঁদের বাতুলের প্রলাপ শোনবার মত অবসর নেই। এরূপ বিবাহে তাঁদের নাকি কুলমর্য্যাদায় আঘাত লাগবে। আমিও হীনকুলে জন্মগ্রহণ করি নি বিশাখা। মগধের রাজসিংহাসনে একদিন আমার পূর্ব্বপুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ কথার পর তাঁদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে আমার আর প্রবৃত্তি হ'ল না। মাথা হেঁট ক'রে ফিরে এলাম। মেয়েদের বললাম, মা, তোরা বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার

আশা ত্যাগ কর। একবার মুখ ফুটে বল, শাক্যরাজকুমারের চেয়ে ধনে মানে কুলগৌরবে শ্রেষ্ঠতর পাত্র যদি তোদের জন্য সংগ্রহ ক'রে না আনতে পারি, তা হ'লে আমি মানুষ নই। মগধে রাজাধিরাজ বিম্বিসার, কোশলে সূর্য্যবংশাবতংশ প্রসেনজিৎ, কৌশাম্বীতে কন্দর্পকান্তি উদয়ন, উজ্জয়িনীতে জয়লক্ষ্মীর বরপুত্র প্রদ্যোৎ,—এঁদের মধ্যে যে কেউ তোদের সম্রাজ্ঞীর আসন দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। নিজের মেয়ে ব'লে বলছি না বিশাখা, আমার নন্দা-নন্দবলা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

বিশাখা। তা হ'লে ঐসব দিকেই কোথাও চেষ্টা ক'রে দেখলে না কেন এতদিন? কি হতে পারত তাই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, কি হতে পারে তার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

মহাসেন। চেষ্টা দেখব কোথা থেকে? তোমার মেয়ে দুটি কি সহজ মেয়ে? তারা সব কথা শুনে বললে, বাবা, তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট অপমানিত হয়েছ; আর না। আর কোনও দিন আমাদের হয়ে কোনও ভিক্ষা তুমি সেখানে চাইতে যাবে না, প্রতিজ্ঞা কর। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বললাম, আমি তোদের কথা তো রেখেছি, এইবার তোরা আমার মুখরক্ষা কর। দুর্লভ যা, অসম্ভব যা—তার আশা ছেড়ে দিয়ে—সুলভ যা, সম্ভব যা—তাই কামনা কর তোরা। তারা কি বললে জান?

বিশাখা। কি ক'রে জানব? তোমাদের প্রাণের কথা তোমরাই জান। আমি কোথাকার কে? পেটে ধরেছিলাম, এই পর্য্যন্ত যা সম্পর্ক। কাজের কথা তো কিছু হয় না আমার সঙ্গে। তুমিও কিছু বল না, তোমার মেয়েরাও কিছু বলে না।

মহাসেন। তারা বললে, বাবা, সুলভ যে, তাকে লাভ করার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। দুর্লভকে লাভ করার জন্য, অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনা আমরা করতে চাই বাবা। বারো বৎসর কঠিন ব্রত পালন করব আমরা, তুমি আমাদের সহায় হও। প্রশ্ন করলাম, আমায় কি করতে হবে? তারা বললে, বারো বৎসর প্রতিদিন আমাদের অতিথিসৎকারের আয়োজন ক'রে দিতে হবে, এবং প্রতিদিন দানের জন্য একখানি ক'রে স্বর্ণপাত্র দিতে হবে। আর তা ছাড়া প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের জীবনে কখনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে বাধ্য করবে না। সেদিন ভগবান বিষ্ণুকে সাক্ষী ক'রে সেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। নারায়ণ জানেন, আজ বারো বৎসর কি ভাবে, কত বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সেই প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে এসেছি আমি। মেয়েদের মুখের দিকে চাইতে কষ্ট কেবল তোমারই হয় বিশাখা, আমার হয় না? ওদের এই বয়সে ঐ নিরাভরণ যোগিনীবেশ আমার চোখে খুব ভাল লাগে? হু-হু ক'রে ওঠে না বুকের মধ্যে, ওদের কথা যখন ভাবি? তুমি মা, আমি কি বাপ নয়? কিন্তু কি করব? আমারই মেয়ে যে ওরা। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চিন্তামাত্র যে ওদের মনে স্থান পায় না। কতদিন বুঝিয়েছি, কতদিন চোখের জল ফেলেছি, কিন্তু টলাতে কি পারলাম? আজ বারো বৎসর ধ'রে নন্দা-নন্দবলার প্রত্যেক আচরণ প্রতিদিন আমি লক্ষ্য ক'রে এসেছি। তোমার মেয়েরা মানুষ নয় বিশাখা, ওরা দেবী।

ওদের ব্রত ভঙ্গ করতে আর যে সাহস করে করুক, আমি করি না। আর তুমি ওদের মা হয়ে সে অনুরোধ আমায় ক'র না ; কথা থাকবে না।

মহাসেনের প্রস্থান

বিশাখা। বেশ আছে এঁরা বাপে মেয়েতে! হাসব, না কাঁদব? সত্যি, লোকের গঞ্জনা আর সহ্য হয় না। যে যা খুশি ব'লে যাচ্ছে। ধর্ম্মকীর্ত্তির বউ কম অপমানটা করলে আমায় সেদিন নিরঞ্জনার ঘাটে! সামনেই এত কথা, আড়ালে না জানি আরও কি বলছে সবাই! আর তাদেরই বা দোষ দেব কি? এত বড় বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে, লোকে বলবে না? যাক, কটা দিন দেখি আর। ওদের পোড়া বত্ত শেষ হোক। তারপর হয় ওদের ধ'রে বেঁধে বিয়ে দেব, না হয় নিজেই গলায় দড়ি দেব। সংসারে ঘেন্না ধ'রে গেল। ছিঃ!

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মহাসেনের প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান। সময়—সন্ধ্যা। নন্দা গাহিতেছিল—

হ'ল না তোর, পূজা সারা, ঘনাল আঁধার।
ওরে, বেলা নাহি আর।
আঁখিতে ঘুম জড়িয়ে আসে, ঠেকিয়ে তারে রাখা ভার।
দেউলে যার প্রসাদ মাগি নিশিদিবা রইলি জাগি
এ জীবনে, ও অভাগী,—এল না সে হয় তো আর!
হ'ল না তোর পূজা সারা, ঘনাল আঁধার।

নন্দবলার প্রবেশ

নন্দবলা। দিদি, কাঁদছ?

নন্দা। না রে, গান গাইছি।

নন্দবলা। গান গাইছ বইকি! চোখে জল, গলার স্বর ভারী। আচ্ছা দিদি, আমার কাছেও লুকোবে? কি হয়েছে দিদি? ভয় করছে?

নন্দা। দূর পাগলী, ভয় করবে কেন? বলা, পূর্ণিমার আর কদিন বাকি ভাই?

নন্দবলা। আজ নিয়ে আর বারো দিন। হ্যাঁ দিদি, যদি তিনি না আসেন? যদি আমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয়?

নন্দা। তপস্যা কখনও ব্যর্থ হয় না বোন; তপস্যাতেই তপস্যার সার্থকতা।

নন্দবলা। ওসব আধ্যাত্মিক সার্থকতার কথা ছেড়ে দাও দিদি, ওসব নিষ্কাম তপস্যার কথা আমি বুঝি না। যে সকাম ব্রতসাধনা ক'রে আসছি এতদিন আমরা, সেই সকাম সাধনার সিদ্ধির কথাই জানতে চাই আমি।

নন্দা। দেখ বলা, যেদিন প্রথম ব্রত গ্রহণ করেছিলাম, সেদিন সিদ্ধিটাই ছিল মুখ্য, সাধনাটা ছিল গৌণ। আজ বারো বছর পরে দেখছি, সিদ্ধি আর সাধনার মধ্যে ভেদটা যেন ক্রমশ কমতে কমতে ছুটো এক হয়ে এসেছে। আজ মনে হয়, সাধনার মধ্যে যে আনন্দ পাচ্ছি, সিদ্ধির আনন্দও বুঝি তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। নৈষ্ফল্যের আঘাতেও আর বিশেষ কোন হানি হবে না।

নন্দবলা। কি জানি দিদি, নৈষ্ফল্যের কথা আমি ভাবতেও পারি না। কুমার সিদ্ধার্থ যদি—( কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ) আচ্ছা দিদি, বহুদিন তো তাঁর কোনও সংবাদ পাই না! পাবার মত সংবাদ থাকলে নিশ্চয় পেতাম। একটা নারীর রূপমুগ্ধ হয়ে যে ঘরে ব'সে দীর্ঘ যৌবন কাটিয়ে দিচ্ছে, সে আর কবে কি করবে? মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় দিদি, আমাদের এই একাগ্র প্রার্থনার উপযুক্ত কি তিনি—কুমার সিদ্ধার্থ?

কস্তুরীর প্রবেশ

কস্তুরী। দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই, কেবল কুমার সিদ্ধার্থ, আর কুমার সিদ্ধার্থ! কানে শুনেই এই, তবু যদি চোখে দেখতিস তাকে! ধন্যি বেহায়া মেয়ে বাবা তোরা! বিয়ে আমাদেরও হয়েছিল, ভালবাসা-টাসা আমরাও একটু আধটু বুঝি; কিন্তু এমন বেহায়াপনা আমাদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও দেখে নি।

নন্দবলা। দেখে নি হয়তো কস্তুরীদি, কিন্তু শুনেছিল নিশ্চয়। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, এঁরা কেউ বা স্বামীকে পাবার জন্য, কেউ বা স্বামীর সঙ্গের সাথী হবার জন্য এমন বেহায়াপনা করেছিলেন যে, আজকালকার মেয়ে হ'লে তোমরা তাঁদের কান কেটে ছেড়ে দিতে।

কস্তুরী। দেখ বলা, ভাল হবে না কিন্তু। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তাঁরা হলেন আমাদের নমস্যা, তাঁদের সঙ্গে তুলনা করতে চাস নিজেদের?

নন্দবলা। আমি কি তাই বলছি কস্তুরীদি? আমি শুধু এই কথাই বলছিলাম যে, বেহায়া হ'লেই সব সময়ে মন্দ হয় না মেয়েরা; আর নিজেদের আদর্শরক্ষার জন্য তথাকথিত বেহায়াপনাটাও অনেক সময়ে ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।

নন্দা। ওসব কথা যাক। কস্তুরী, একটা গান কর না ভাই। অনেকদিন তোর গান শুনি নি।

কস্তুরী। গাইতে পারি, যদি তোরা রাগ না করিস। বল, রাগ করবি না।

নন্দা। কথা শোন মেয়ের। গান গাইলে কখনও মানুষ রাগ করে? তুই গা না।

কস্তুরী। বেশ। আমার কিন্তু দোষ নেই।

ওগো জীবননদীর পারের পাটনী!
মোরা ব'সে আছি হেথা আজি হে, ভরা যৌবন-ডালি সাজিয়ে;
আছি ছুই বোনে তব আশাতে, আর কত দেরি তরী ভাসাতে?
ওগো, কখন মিটিবে দিনের খাটনি?
ঘাটে ব'সে আছি মোরা ছুজনে, দেখে কত কথা বলে কুজনে;
দেহে রূপের দীপালী জ্বলিছে, হেরি মুনিজনমন টলিছে,—

নন্দবলা। ছিঃ কস্তুরীদি, তুমি ভারী অসভ্য।

কস্তুরী। এখন আর সে কথা বললে কি হবে দিদি, গোড়ায় ভাবা উচিত ছিল। বেশ, আমি আরও আধ্যাত্মিক ক'রে গাইছি—

ঘাটে বসিয়া কঠিন মাটিতে,—ওগো, বেলা যে চলিল কাটিতে,
আজো দয়া কি তোমার হবে না? তব তরীতে তুলিয়া লবে না?
তবে আশা-তরু কেন মুকুলে কাটো নি?
শেষে তোমারি আশায় থাকিয়া সব চুলগুলি যাবে পাকিয়া,
মোরা হয়ে গেলে বুড়ো বৃদ্ধ হবে কি কামনা তব সিদ্ধ?
হ'লে নড়বড়ে চারু অঙ্গ তুমি দেখিতে আসিবে রঙ্গ?
এ তো ফন্দিটি তুমি মন্দ আঁটো নি!
ওগো উদ্বাহ-খেয়াপারের পাটনী!

নন্দবলা। চমৎকার! এ গানটি বুঝি তোমার নিজের রচনা, কস্তুরীদি?

কস্তুরী। নিশ্চয়। তা সত্যি কথা বলব ভাই, পরের রচনার চেয়ে নিজের রচনা আমার ঢের মিষ্টি লাগে। হ্যাঁ রে নন্দা, তোদের আতুরাগারের কাজ চুকেছে? একবার চল না ভাই, আমাদের বাড়ি। তোরা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিস, কোথাও বেরুতেই চাস না! আমাদের কাছে আগে দু একবার যেতিস তবু, এখন তো তাও বন্ধ। যাস না কেন ভাই?

নন্দবলা। তোমরা ভাই যত্ন-আত্তি কর না। গেলে পাদ্য-অর্ঘ্য পাই না, গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, আচমনীয় কিছুই যোগাড় ক'রে রাখ না, তাই ভাই, আমরা আর যাই না।

কস্তুরী। তা বটে। অনুষ্ঠানের বড় ত্রুটি হয়ে যায়। বসলে শুতে বলি না, শুলে পা টেপবার লোক ডেকে দিই না।

নন্দবলা। দেখ কস্তুরীদি, ভাল হবে না কিন্তু। তুমি দিন দিন ভারী অসভ্য হচ্ছ।

কস্তুরী। আহা, কি আমার সভ্য বোন দুটি রে! কথায় বলে, পেটে রাখলেই গুণ, আর মুখে বললেই খুন। তোমাদের দেখছি তাই। আমি সাদাসিধে লোক, অত ভণ্ডামি ভালবাসি না বাপু। যা বলব, খোলাখুলি বলব। তাতে রাগই কর আর গোসাই কর।

নন্দা। তুই বুঝি আজ কোমর বেঁধে এসেছিস কস্তুরী, খালি ঝগড়া করবার ছুতো খুঁজছিস?

কস্তুরী। শুধু ঝগড়া? আমার ইচ্ছে করছে, তোদের দুটোকে ধ'রে পিটি। কি সর্ব্বনাশ যে করছিস তোরা নিজেদের, তা তোরা নিজেরাই জানিস না। বাইশ তেইশ বছর বয়স হতে চলল, আইবুড়ো থুবড়ো হয়ে ঘরে ব'সে আছিস। লোকের কথা না হয় কানে না তুললি, কিন্তু বুড়ো হয়ে গেলে আর কি কখনও তোদের বিয়ে হবে মনে করেছিস?

নন্দবলা। বড় চিন্তার কথা কস্তুরীদি। ( দূরের দিকে চাহিয়া ) চুপ চুপ, বাবা আসছেন এদিকে, কি যেন গান গাইতে গাইতে আসছেন, না? ওমা, বাবা আবার গান গান! কখনও শুনি নি তো! লক্ষ্মীটি কস্তুরীদি! এই চাঁপাগাছটার আড়ালে একটু স'রে এস না ভাই, কি গাইছেন শুনি। আমাদের দেখলেই গান থেমে যাবে।

সকলে লুকাইল। সাজিহস্তে মহাসেনের প্রবেশ। গান গাহিতে গাহিতে ফুল তুলিতে লাগিলেন

কেন ভগ্নকুটীরে উঠিল ফুটি রে ভুবন-ভুলানো ফুল এ ?
ভয়ে ভয়ে থাকি, সযতনে রাখি, কে কবে লইবে তুলে !
যদি ব্যথা পায়, কি জানি নিমেষে মিশে যাবে বুঝি কোন অসীমে সে,
সে যে অমরার আলো, মরতের কূলে আসিয়াছে পথ ভুলে।

নন্দবলা সহসা সম্মুখে আসিয়া কহিল—

নন্দবলা। কে বাবা ? আমি, না ? ভুবন-ভুলানো ফুল, অমরার আলো ! কে বাবা ? আমি, না ?

নন্দা। ( সহসা সম্মুখে আসিয়া ) না বাবা, আমি। বলা দুষ্টু মেয়ে, বলা নয় বাবা।

মহাসেন। ( লজ্জিতভাবে ) ওমা, তোরা কোথায় লুকিয়ে ছিলি ? সব শুনে ফেলেছিস ? যাঃ !

নন্দবলা। হ্যাঁ বাবা, বল না বাবা। আমি, না ? আমি তোমার পাকা চুল তুলে দিই, আমাকে তুমি—

নন্দা। না বাবা, আমি। আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াই। আজ কি খেতে ইচ্ছে করছে বাবা ?

নন্দবলা। আমাকে তুমি বেশি ভালবাস, না বাবা ? আমি ছোট মেয়ে কিনা।

মহাসেন। ( বিব্রতভাবে হাসিয়া ) আমি দুজনকেই ভালবাসি।

কস্তুরী। ( সম্মুখে আসিয়া ) সেইজন্যে অসম্মানে এক বচন ক'রে দিয়েছেন বুঝি মেসোমশাই ? তা বেশ। কিন্তু ফুল ফুটল ব'লে আপনি যে ভেবে অস্থির হচ্ছেন, কে কখন তুলে নেয় ; কিন্তু যে নেবে তুলে, তার তো কোনও গরজ দেখছি না।

নন্দা। কস্তুরী আজ খালি যা তা বলছে বাবা। তুমি ওকে ব'কে দাও তো।

মহাসেন। ও তো আর তোদের মত আপনার নয় মা, ও এখন পরের বউ। ওকে বকতে গেলে ওর শ্বশুর যদি আমাকে মারতে আসে ?

নন্দবলা। মারলেই হ'ল ? তা হ'লে আমরা তাঁর ছেলেকে আস্ত রাখব ? মেরে শেষ ক'রে দেব না ?

কস্তুরী। তা তোমরা পার। তখন দিব্যি তিন বোনে মিলে হবিষ্যি করা যাবে, কি বল ? নিজেদের লেজ কাটা গেছে তো, কাটো অন্যের লেজ। যুক্তি ভাল।

মহাসেন। মা, আমার সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হ'ল, আমি যাই। তোমরাও স্নান দান ক'রে মুখে কিছু দাও। আর কদিন বাকি মা ?

নন্দা। বারো দিন, বাবা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহাসেনের প্রস্থান

কস্তুরী। তারপর ? যদি তিনি না আসেন ?

নন্দা। আমাদের বাবা আছেন, মা আছেন।

কস্তুরী। তারপর ? যখন তাঁরাও থাকবেন না ?

নন্দবলা। তখন তাঁদের টাকা থাকবে কস্তুরীদি। ( কস্তুরী আহতভাবে মুখ ফিরাইল ). তুমি তো ভণ্ডামি ভালবাস না কস্তুরীদি। সত্যি কথা শুনলে তোমার অন্তত রাগ করা উচিত নয়।

সকলের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

বসুমিত্রের প্রাসাদের দ্বিতলে একটি কক্ষ। বসুমিত্র একটি বেদীর উপর বসিয়া আছেন। কস্তুরী পাশে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গাহিতেছে—

সখি, বাজিছে বাঁশরী ঐ লো, আমার পরাণ কেমন করে।
আমি কেমনে যাব যমুনায় লো? দারুণ ননদী ঘরে!
বাঁশরী ডাকে বারবার, অসহ গৃহকারাগার,
বুঝি রহে না কুল মান আর, মরি ডরে!

বসুমিত্র। ও, আমি ফিরে এসে তা হ'লে তোমার বড় অসুবিধে হয়েছে বল? তা গৃহকারাগার যদি এতই অসহ্য হয়ে থাকে, তবে যাও না বাঁশী শুনতে। আমি তো আর তোমার ননদিনী নই, আমাকে ভয় কিসের?

কস্তুরী মুখে হাত চাপা দিল

কস্তুরী। চুপ! বাঁশী শুনেই তো এসেছিলাম, এখন দেখছি, ভুল করেছি। তুমি বড় অরসিক। (হাসিয়া) গান শুনতে চেয়েছিলে, আমি তোমার কথা রেখেছি, এইবার তোমাকে আমার কথা রাখতে হবে। তোমার পথের গল্প এইবার সব বল। কোথায় কোথায় গেলে, কি কি দেখলে, কি কি শুনলে? এক বৎসরের মধ্যে কত কি ঘ'টে গেল জগতে, আমরা তো কিছুই জানি না।

বসুমিত্র। তবেই হয়েছে। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন কস্তুরী? কথাবার্ত্তা আমার বেশি আসে না, তা তুমি জান, তবু সেই আমাকে নিয়ে টানাটানি? তার চেয়ে তুমি গান কর, আমি শুনি।

কস্তুরীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইলেন

কস্তুরী। বড় মজা! আমি ব'কে মরি, আর উনি চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন। তুমি বেশি কথা কও না ব'লেই তো তোমার কথা শুনতে বেশি ইচ্ছে করে, তাও বোঝ না? আচ্ছা, আমি একে একে প্রশ্ন করি, তুমি শুধু উত্তর দিয়ে যাও। তা হ'লে তোমায় বেশি ভাবতে হবে না। প্রথমে এখান থেকে কোথায় গেলে? কি দেখলে সেখানে?

বসুমিত্র। প্রথমে গেলাম রাজধানী রাজগৃহে। অঙ্গদেশের ভদ্রঙ্কর নগর থেকে শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় এসেছিলেন সেখানে। তাঁর সঙ্গে বৈষয়িক প্রয়োজন ছিল। অতীতের দেনাপাওনা মিটল, ভবিষ্যতের বাণিজ্যবিষয়ক পরামর্শ হ'ল। এ বৎসর ব্রীহি এবং যবের মূল্য—

কস্তুরী। তোমার দেনাপাওনার কথা আমি শুনতে চাই না। ক্ষত্রিয়ের ছেলে, দুটো মানুষ খুন করতে পারলে পরকালের কাজ হ'ত। তা না, খালি যব আর ব্রীহি! আর কি দেখলে তাই বল।

বসুমিত্র। কি আর দেখলাম! বাড়িঘর, পথঘাট, পঞ্চগিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ,—

কস্তুরী। আঃ, তুমি বড় বাজে বকো। মগধের রাজবাড়িতে গেছলে? রাজগৃহের কাছে কত সন্ন্যাসীদের আশ্রম আছে শুনেছি, সেখানে কোথাও গেছলে? কিছু দেখলে না বলবার মত?

বসুমিত্র। (উঠিয়া বসিয়া) মনে পড়েছে কস্তুরী, মনে পড়েছে। রাজপ্রাসাদে গেছলাম একদিন উৎসব দেখতে। সেদিন মহারাজ বিম্বিসার যজ্ঞ করছেন শত্রুজয়কামনায়। প্রশস্ত অঙ্গনে শত শত মহিষ, মেষ, হরিণ, ছাগের কবন্ধ আর ছিন্নমুণ্ড গড়াগড়ি যাচ্ছে, রক্তস্রোতে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দ্দিক। দেখে ভক্তি হ'ল না কস্তুরী, ঘৃণা হ'ল। একজনের অহেতুক ঐশ্বর্য্যলিপ্সা, অন্যায় জিগীষার পাদমূলে সহস্র সহস্র নিরীহ নিরপরাধ জীবের এই পৈশাচিক বলিদান যদি ধর্ম্ম হয়, অধর্ম্ম কি তা জানি না। মনে পড়ল, মহাভারতে ভীষ্মদেবের কথা, 'যূপঃ ছিত্বা, পশূন্ হত্বা, কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্। যদ্যেব গম্যতে স্বর্গং, নরকং কেন গম্যতে॥'

কস্তুরী। আচ্ছা, এ রক্তস্রোত কি বন্ধ হবে না কোনও দিন? যুগযুগান্তর ধ'রে এই যে ভাই ভাইকে হত্যা ক'রে চলেছে দেবতার নামে, এ পাপ রোধ করবার ব্রত নিয়ে একজন মানুষও কি জন্মাল না জগতে?

বসুমিত্র। জন্মেছে কস্তুরী, জন্মেছে। বারবার এই চেষ্টা হয়ে গেছে জগতে, যুগে যুগে। কিন্তু স্থায়ী ফল কিছু হয় নি। মানুষের মধ্যে মহামানব যাঁরা জন্মান, তাঁরা কিছুদিনের জন্য অতিমানুষী সাধনার দ্বারা মানুষের মনের সুপ্ত সদ্‌বৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তোলেন। ভুলিয়ে রাখেন তাদের স্বাভাবিক পশুত্বকে। তারা তখন নিজেদের অমৃতের সন্তান ব'লে মনে করে; সমস্ত ক্ষুদ্রতা, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠে দাঁড়ায়। মন্ত্রমুগ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত তখন নিখিলের শুভকামনায় প্রার্থনা করে—

'সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।'

বলে, 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।'

এই যে জগতের মঙ্গলকামনা, এর মধ্যে শুধু মানুষের নয়, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সবারই মঙ্গলকামনা নিহিত আছে।

কস্তুরী। তারপর?

বসুমিত্র। তারপর ঐন্দ্রজালিকের বাঁশী থেমে যায়; মহাপুরুষের প্রভাব ক'মে যায় সমাজের ওপর; তখন চিরন্তন পশু জেগে ওঠে আবার মানুষের মনে। মন্ত্রৌষধিবিমুক্ত সাপের মত ফণা ধ'রে দাঁড়ায় তার চাপা পড়া দুষ্প্রবৃত্তিগুলো। সে পুণ্যের পথে যতখানি আগ্রহে এগিয়েছিল, পাপের পথে ততখানি আগ্রহেই পেছিয়ে চলে। একে বলে প্রকৃতির পরিশোধ, সভ্যতার ওপর জৈব প্রবৃত্তির জয়। তখন হিংসা বীভৎসতর হয়ে ওঠে, মানুষ ভুলে যায় মহামানবের শিক্ষা। নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাঁর, মন্দিরে কেবল একজন নিরুপায় দেবতা বেড়ে যায় মাত্র। (হাসিয়া) কত বুদ্ধ, কত তীর্থঙ্কর চ'লে গেছে কস্তুরী, আমরা যা ছিলাম তাই আছি।

কস্তুরী। তবু কিছু তো উপকার হয় সেই মহামানবদের দ্বারা? মিথ্যাচার করুক, কিন্তু সত্য কি, তা জানতে পারে তো? দশ বৎসরের জন্যই হোক, আর সহস্র বৎসরের জন্যই হোক, বাধা

পড়ে তো রক্তস্রোতে? সমাজের বুকে ভবিষ্যতের জন্য একটা উচ্চ আদর্শের ছাপ তো থেকে যায়? আচ্ছা, সে রকম মানুষ দেখেছ তুমি?

বসুমিত্র। হয়তো দেখেছি, হয়তো দেখি নি। তবে একজনের আসবার সময় হয়েছে মনে হচ্ছে।

কস্তুরী। কি ক'রে বুঝলে?

বসুমিত্র। ভগবান গীতায় বলেছেন, তিনি আসবেন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি আসবে জগতে, যখনই অধর্ম্মের অভ্যুদয় চরমে উঠবে। তা আজকের দিনে মানুষের পাপপ্রবৃত্তি যেখানে এসে পৌঁছেছে, তাতেও যদি তাঁর টনক না ন'ড়ে থাকে, তা হ'লে আর কখনও নড়বে না। হিংসা, দ্বেষ, পরস্বাপহরণ, ব্যভিচার মিথ্যাচার, এ সমস্ত আজ ভদ্রতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আজ আকাশ। রাজপ্রাসাদ থেকে আরম্ভ ক'রে দীনতম দরিদ্রের কুটীরে আজ চলেছে ইন্দ্রিয়বিলাসের প্রেততাণ্ডব। মগধ, বৎস, বিদেহ, কাশী, কোশল, মালব—এত দেশ তো ঘুরে এলাম কস্তুরী, কিন্তু কোথাও মানুষের মত মানুষ দেখলাম না।

কস্তুরী। দুর্ভাগ্য তোমার। আমি গাঁয়ে ব'সে দেখছি, তুমি দেশে দেশে ঘুরেও দেখতে পেলে না? সত্যি বলছ? একজনও দেখতে পাও নি মানুষের মত মানুষ?

বসুমিত্র। ভুলে গেছলাম কস্তুরী, দেখেছি বটে একজনকে। কিন্তু সে কি মানুষ? না, সে আমারই মনের কল্পনা মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দিয়েছিল? রাজগৃহের কাছে আচার্য্য আরাড় কালামের আশ্রমে গেছলাম সেদিন। ফেরবার পথে গাছতলায় দেখা হ'ল এক তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কি তোমায় বলব কস্তুরী, এত রূপ বুঝি মানুষের হয় না! শ্রাবস্তীতে প্রসেনজিৎকে দেখেছি, কৌশাম্বীতে উদয়নকে দেখেছি, লোকে বলে, তাঁরা সুপুরুষ। তাঁদের মুখলাবণ্যের তুলনা হয় না এই নবীন সন্ন্যাসীর একটি পদাঙ্গুলির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে। কি ব'লে বোঝাব কস্তুরী, সেই প্রশান্ত সুন্দর অনির্ব্বচনীয় পুরুষের মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তি ভাষায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই। আমি তাঁকে কিছু পারমার্থিক প্রশ্ন করেছিলাম, অধিকাংশ কথারই কোন উত্তর পাই নি। তিনি হেসে বললেন, জিজ্ঞাসা যার অন্তরে জাগে নি, তার কাছ থেকে ওসব প্রশ্ন নিরর্থক। তিনি যোগ অভ্যাস করেছেন, অথচ ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামান না। আশ্চর্য্য মানুষ! বললেন, ত্রিতাপদগ্ধজীবকে কর্ম্মচক্র থেকে মুক্তি দেবার পথ খুঁজছি আমি, ঈশ্বরকে আমি বুঝি না। রোগের জন্য ঔষধের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে, রোগ সারলে ঔষধকর্ত্তার সন্ধান নেবার অবসর মিলবে। আর না মিললেও জগতের বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না তাতে।

কস্তুরী। নাস্তিক! চার্ব্বাকপন্থী বোধ হয়? তোমার খুব ভক্তি হ'ল তার কথা শুনে?

বসুমিত্র। ভক্তি হওয়া হয়তো উচিত ছিল না কস্তুরী, কিন্তু হ'ল। তাঁকে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে প্রণাম করেছিলাম সেদিন, যখন তিনি বললেন, রোগশোক, জরামৃত্যুর মধ্যে নির্ব্বোধের মত নিশ্চিন্ত আলস্যে জীবন্মৃত হ'য়ে আছে যারা, তাদের আমি বাঁচাতে চাই অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে। অদৃষ্ট কোনও দেবতার পূজার চেয়ে দৃষ্ট জীবের আর্ত্তি দূর করার চেষ্টাকে আমি মহত্তর মনে করি। তারপর যখন বৈশালীতে গিয়ে পেলাম তাঁর পরিচয়, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার প্রণাম করেছিলাম সর্ব্বান্তঃকরণে।

কস্তুরী। কি পরিচয় পেলে তাঁর? কার কাছে পেলে তাঁর পরিচয়? কে তিনি?

বসুমিত্র। কপিলাবস্তুর এক বণিক মগধে এসেছিলেন বাণিজ্যসূত্রে। ফেরবার পথে তাঁর সঙ্গে বৈশালীতে আমার দেখা। তিনি বললেন, কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ কয়েকমাস পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করেছেন, সমস্ত জীবের মুক্তি-কামনায়। সেই পরম কারুণিক রাজকুমারের সন্ধান তিনি পেয়েছেন রাজগৃহে আচার্য্য আরাড় কালামের আশ্রমে। সিদ্ধার্থের সংবাদ মহারাজ শুদ্ধোদনকে দেবার জন্য বণিক দ্রুত ফিরে চলেছেন নিজদেশে, নিজের বাণিজ্যের ক্ষতি ক'রে।

কস্তুরী। তুমি কি বলছ? সিদ্ধার্থ? কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ?

বসুমিত্র। হ্যাঁ কস্তুরী, কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ—সেই নাস্তিক তরুণ সন্ন্যাসী, সেই মায়াবী অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষসিংহ! রাজার ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রাণীর মত রূপলাবণ্যবতী পত্নীর একনিষ্ঠ প্রেম, পিতৃস্নেহের নৈশ্চিন্ত্য, সমস্ত ছেড়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি পথে পথে, আর্ত্ত জীবের মুক্তি-কামনায়! প্রণাম করবে না তাকে তুমি কস্তুরী?

কস্তুরী। প্রণাম করব? সেই নিষ্ঠুর নারীনিপীড়ককে প্রণাম করব? কেন সে বিবাহ করেছিল তবে? কেন সে ঐ দেবদুর্লভ রূপ, ঐ অপরিমেয় পৌরুষ নিয়ে জন্মেছিল জগতে, যদি পথে পথে ভিক্ষাবৃত্তি ক'রে তার দিন কাটবে? অরণ্যে রোদন করবার জন্য দুর্ব্বল ভীরুচিত্ত ভিক্ষুকের কি কিছু অভাব ছিল ভারতবর্ষে?

বসুমিত্র। তুমি এত অধীর হয়ে উঠলে কেন কস্তুরী? ভেবে দেখ, বড় কর্ত্তব্য যখন মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আর ছোটখাটো কর্ত্তব্যের দিকে চাইবার অবসর থাকে না তার। সর্ব্বজীবের মুক্তির পথ যদি তিনি খুঁজে বার করতে পারেন, তা হ'লে তখন নারী কি তার গণ্ডি থেকে বাদ যাবে? তোমরা কি মানুষ নও? তোমরা কি চাও না মুক্তি? যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যিনি আসেন, হয়তো তাঁর আর আসবার বিলম্ব নেই কস্তুরী। আমার মন বলছে, তিনি এসেছেন। আমি দেখেছি তাঁকে, আমি শুনেছি তাঁর বাণী। সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মের গ্লানি দূর করবার জন্য যাঁর আবির্ভাব, তাঁর চরিত্র তোমার আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে বিচার করা কি সঙ্গত হয় কস্তুরী?

কস্তুরী। ওগো, তুমি বুঝতে পারছ না। কুমার সিদ্ধার্থ যে নন্দা-নন্দবলার আকাঙ্ক্ষিত স্বামী। হতভাগীরা যে আজ বারো বছর কঠিন ব্রত করছে তাঁর পথ চেয়ে। যতক্ষণ তিনি রাজপ্রাসাদে ছিলেন, রাজভোগে স্পৃহা ছিল তাঁর, ততক্ষণ যত দুর্লভ হোন, যত দুষ্প্রাপ্য হোন, তবু তাদের আশা ছিল। কিন্তু এ কি হ'ল গো? কি সর্ব্বনাশ হ'ল তাদের?

বসুমিত্র। বৈশালীতে জনরব শুনে এসেছি, শাক্যকুমার সিদ্ধার্থের নামকরণ-দিবসে দৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্য গণনা ক'রে নাকি বলেছিলেন, হয় তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হবেন, না হয় তিনি যুগাবতার সম্যকসম্বুদ্ধ তাপসশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হবেন। নন্দা-নন্দবলা তো যোগ্যপাত্রেই মনসমর্পণ করেছে কস্তুরী, তাদের জন্য তুমি শোক ক'র না। অনন্তকালের অন্তহীন শোকপ্রবাহ যে রোধ করতে চায়, নির্ব্বাণের পরমপদ—

কস্তুরী। চুপ কর তুমি। চাই না আমি ওসব কথা শুনতে। তোমাদের নির্ব্বাণের পরমপদ তোমাদের থাক, আমি তাকে দূর থেকে নমস্কার করি। চাই না আমি নির্ব্বাণ।

বসুমিত্র। চাও না তুমি নির্ব্বাণ? (কস্তুরীর দুই হাত ধরিলেন) সত্য বলছ, চাও না তুমি এই রোগশোক, জরামৃত্যু, এই স্বামীর আধিপত্য, এই সংসারের সহস্র কর্ম্মক্লেশ, আঘাত, বিপদবিড়ম্বনা, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি?

কস্তুরী। সত্যি বলছি, চাই না। চাই না আমি।

বসুমিত্র। কি চাও তুমি তবে?

কস্তুরী। আমি চাই বারে বারে ফিরে আসতে এই সুখদুঃখতরঙ্গিত পৃথিবীর এই আলো-অন্ধকারে, এই স্বামীর প্রেমে, এই সংসারের হাসিকান্নায়, এই অন্তহীন কর্ম্মপ্রবাহে।

বসুমিত্র। (কাছে টানিয়া) অয়ি মুগ্ধে, তোমার মত অল্পবুদ্ধি জীবের ছোট ছোট আঘাতেই যুগে যুগে মহামানবের মহাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তোমাদের মধুর মমতামোহে মিথ্যা হয়ে গেছে তাঁদের মহাবাণী। যতদিন তোমরা আছ, ততদিন সহস্র বুদ্ধের সাধ্য নেই, এই পৃথিবীর অশ্রুসায়র বুজিয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে হাসির পদ্ম ফোটার পথ বন্ধ করে। দেখা যাক, কে জেতে; সন্ন্যাসী গৌতম, না সন্ন্যাসিনী নন্দা-নন্দবলা।

ক্রমশ

# তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

দাদার টেবিল গোছাতে এসে চারুলতা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন সাংঘাতিক কাণ্ড যে ঘটতে পারে, বেচারার স্বপ্নেরও অগোচর।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে কিছুক্ষণ যেন সে অনড় হয়ে তাকিয়ে রইল।

টেবিলের ওপর সাপ দেখল না কি চারু!

সাপ! তা নয় বটে, তবে তার চেয়ে কমও কিছু নয়। দাদার টেবিলে প্রেমপত্র!

ফিকে বেগুনী কাগজের উপর নীল কালিতে লেখা লাইনগুলি যেন সাপের মতই ছোবল মারতে এল চারুকে। অসমাপ্ত চিঠি।

কলেজের বেলা হয়ে যাওয়ায় হয়তো চিঠিটা শেষ হয়ে ওঠে নি, প্যাডের ভিতর চাপা দিয়ে রেখেই, যথেষ্ট সাবধান হওয়া গেছে ভেবে নিশ্চিন্ত মনে চ'লে গেছে অমল। তা চারুর আসবার কথা নয়; যেমন হয়ে থাকে, বিয়ে হয়ে ইস্তক দাদার ঘরদোর তদারক করা চারু এক রকম ছেড়েই দিয়েছে।

অবস্থাটা এখন এই রকম; শ্বশুরবাড়িটা পরের বাড়ি ব'লেই মনে হয়; মার কাছে ব'সে তাদের খুঁটিনাটি নিন্দে করতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, অথচ এ বাড়িটাকেও ঠিক আপনার মনে করতে পারে না। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি—এমনিতর একটা ভাব মনের মধ্যে লেগেই থাকে। এদের সম্বন্ধে তার কোন দায় নেই, এটা ধাতস্থ হয়ে গেছে।

তবু কি জানি কি মতি হ'ল, দুপুরবেলার নিশ্চিন্ত অবসরে দাদার ঘরটা গুছিয়ে দিতে এসেছিল চারু।

দাদাকে অবশ্য সে অবিশ্বাস করে না কোনদিন; তথাপি স্ত্রীস্বভাববশত টেবিলের ড্রয়ার, শেল্‌ফের পাশ, আলমারির মাথা, বইয়ের থাকের পিছন (ছেলেরা যে জায়গাটা সব চেয়ে গোপনীয় মনে করে) ইত্যাদি সার্চ করতে ত্রুটি করে নি। কিন্তু সেটা নিতান্তই মেয়েলী কৌতূহল।

সামান্য আশা ছিল, গান লেখা দু-একটা পাতা, কি ছোটখাটো কবিতার খাতা একখানা, বড় জোর সিনেমা-অ্যাক্‌ট্রেসদের রঙিন ছবি-সম্বলিত সাপ্তাহিক কাগজ দুচারখানা পেতে পারে, যেমন সেদিন তার ছোট দেওরের অনুপস্থিতির সুযোগে ঘর সার্চ ক'রে পেয়েছিল। তা দাদার এখনও সে ছেলেমানুষী ভাব না থাকারই কথা।

সেই দাদার নিজের হাতের লেখা—চারু অবশ্য হাতের লেখা চিনতে ভুল করবে না—প্রেমপত্র! আকাশ থেকে পড়া ছাড়া আর কি করতে পারে বেচারা? যতটুকু লেখা হয়েছে, তাই দেখেই মেয়েটার হার্টফেল হয় আর কি! যা হয় নি সেটা কল্পনার পাখায় ভর ক'রে কোথায় গিয়ে যে ঠেকল! খুব সামনে নিলে, মূর্চ্ছা গেল না কি ভাগ্যি!

মা জানতে পারলে কি হবে, ভেবেই তার বুকের ভিতর হিম হয়ে এল।

পরের অবিবাহিতা মেয়েকে এ রকম চিঠি লেখা, আর চরিত্রহীন হওয়া একই কথা—চারুর ধারণা। কাজেই ব্যাপারটাকে সংসারের বড় বড় কেলেঙ্কারির পর্য্যায়ে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করলে না। তা এর জন্যে চারুকে দোষ দেওয়া যায় না, এই রকম শিক্ষাতেই তারা মানুষ হয়েছে—হেমলতার কঠোর নীতিজ্ঞানের প্রবল শাসনের আওতায়।

তাঁর মনের মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা, সুনীতির একটা মাপকাঠি আছে, তারই মাপে মাপে গড়তে চেয়েছেন ছেলেমেয়েদের।

নিজের বিশ্বাসে কৃতকার্য্যও হয়েছেন এতদিন। বারো বছরের সুলতাও জানে, কি ক'রে হাঁটতে হয়, কেমন ক'রে তাকাতে হয়, কতটুকু হাসলে আর কতটুকু কাসলে সভ্যতার হানি হয় না। কার সামনে বেরুনো উচিত, কার সামনে নয়।

চারু তো জানবেই, এখন তো সে নিজেকেই প্রায় মাস্টার-শ্রেণীভুক্ত ভাবতে শিখেছে।

আধুনিক মেয়েদের চালচলন, পোষাকপরিচ্ছদ, অথবা ব্লাউসের কাটছাঁট সম্বন্ধে এমন মন্তব্য সে করে—শোনবার মত।

হেমলতা তার জন্য গর্ব্ববোধই করেন। সন্তানকে মনের মত ক'রে গড়ে তোলা সহজ নয়, কত দিক দেখতে হয়; এই ছেলেমেয়েদের ছোটবেলায় একখানি গল্পের বই তিনি কখনও পড়তে দেন নি। পয়সা খরচ ক'রে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা গেলা আর ফাজলামি শেখা—তিনি অপরাধ ব'লেই গণ্য করেন।

তাই ব'লে কি ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা সম্বন্ধে কার্পণ্য করেছেন? কখনই না।

ছোটদের উপযুক্ত ভাল ভাল নীতি-উপদেশের বই, পৌরাণিক কাহিনী, জীবনী-পুস্তক যথেষ্ট কিনে দিয়েছেন তাদের। লুকিয়ে একখানা বাজে বই পড়বে, এমন কথা চারুরা কল্পনায়ও আনতে পারত না।

আর অমল? তার জন্যে বিশেষ কিছু চিন্তাই করতে হয় না, আদর্শ ছেলে অমল, সোনার ছেলে অমল, নাম রাখা সার্থক হয়েছে হেমলতার।

হঠাৎ একটা বিজাতীয় আনন্দে চারুর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। কেমন, মার বড্ড ভাল ছেলে যে! ছেলের গুণের তুলনা দিয়ে মেয়েদের যখন তখন অপদস্থের একশেষ করেন একেবারে, দেখুন এখন আদর্শ ছেলের কীর্ত্তি!

'প্রেমে পড়া' ব্যাপারটা দারুণ অধঃপাতগোছের একটা কিছু মনে করলেও, অন্য কোন অপরিচিতা সুন্দরীর সঙ্গে হ'লে দাদাকে চারু বরং ক্ষমা করতে পারত; কিন্তু নীলি?

ছি ছি, রুচির পায়ে নমস্কার! সেদিনও যে রাস্তার ধারে ফ্রক প'রে হৈ হৈ ক'রে লাট্টু ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে, তাকেই কিনা! গলায় দড়ি!

নীলিমার উপর চারুর বরাবরই একটু ঈর্ষা। একে তো নিজের চাইতে সুন্দরী মেয়েদের মেয়েরা কখনও ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না। তার ওপর, তার অন্যায় রকম ভাল গানের গলা।

নীলিমার বয়স চারুর চাইতে একটু বেশি বই কম হবে না, দুজনে একই স্কুলে পড়েছে ছেলেবেলায়। চারুর অবশ্য স্কুলজীবনের ইতি হয়ে গেছে অনেককাল। ইস্কুলে পড়া ধাড়ী মেয়ে হেমলতার দুচোখের বিষ।

এখন তো চারু শ্বশুরঘর ক'রে রীতিমত সংসারীই হয়ে উঠল; আর নীলিমাসুন্দরী নাকি পাস ক'রে আবার কলেজে ঢুকেছেন।

এতে চারুর মত ছেলেমানুষের হিংসে একটু হতেই পারে, দোষ দেবার কিছু নেই।

সেদিনের ছেলে দাদা এত সব শিখলে কি ক'রে? চারুর না হয় বিয়ে হয়েছে, তার কথা আলাদা। সব কিছু জানবার, শেখবার দস্তুরমত অধিকার জন্মেছে। কিন্তু অমল? আইবুড়ো ছেলে—ছিঃ! আবার লেখা হয়েছে দেখ—

"নীল দুষ্টু মেয়ে, ছুটি হ'লেই মামার বাড়ি আদর খেতে যাওয়া হয়! আচ্ছা, এস না এবার। কি ভীষণ শাস্তি দিই দেখো!"

কি রকম শাস্তি? নিখিল চারুকে যে শাস্তির ভয় দেখায়, তাই নাকি? সর্ব্বনাশ!

নাঃ, এত বড় ব্যাপারটা নিজের দায়িত্বে চেপে রাখা চারুর পক্ষে সম্ভব নয়; মাকে জানানো দরকার। দাদার মুখ মনে ক'রে মনটা একবার দ'মে গেল সত্যি। দাদা হয়তো চারুকে স্পাই বলবে, ঘৃণা করবে, জন্মের মত আড়িই ক'রে দেবে, যখন তখন চারুর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখা ক'রে আসবে না, যেটা চারুর কাছে মর্ম্মান্তিক; কিন্তু, ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি ঘ'টে গেলে? লোক-জানাজানি হয়ে গেলে?

আর যে যা বলে বলুক, ওর বর যে মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলবে, এই তোমার দাদার গুণ? এঁরই আবার এত বড়াই কর তুমি? বাপ রে, সে চারু ম'রে গেলেও সহ্য করতে পারবে না। মোট কথা, মাকে না জানিয়ে চারুর উপায় নেই। অগত্যা বামাল সমেত হাজির হ'ল মার কাছে।

হেমলতা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'খানি সবে খুলে বসেছেন; চারুকে ওরকম রক্তমুখী হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, দুপুরবেলা হৈ হৈ ক'রে বেড়াস কেন চারু, একটা সেলাই নিয়ে বসতে পারিস না? নয় তো একটু ঘুমুলেও হয়! শ্বশুরবাড়ি থেকে যা ছিরি-ছাঁদ ক'রে আস বাছা! কি ক'রে যে শরীরটা একটু সারবে, তাই ভেবে মরি!

চারু ধুপ ক'রে ব'সে প'ড়ে হাতের চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, মা, দাদার কীর্ত্তি দেখ। যেসব ভূমিকা মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল, কার্য্যক্ষেত্রে গোলমাল হয়ে গেল।

হেমলতা তুলে নিয়ে পড়লেন; প্রথমটা যেন বুঝতেই পারলেন না। আবার পড়লেন, স্তম্ভিত হলেন, হতবুদ্ধি হলেন, শেষ পর্য্যন্ত আগুনের মত তেতে উঠলেন।

মার রক্ত-রাঙা কঠোর গম্ভীর মুখ দেখে চারুর সমস্ত সাহস লোপ পেয়ে গেল।

ছেলের বিদ্যে নিয়ে মাকে একটু খোঁটা দেবে, আজকালকার মেয়েদের বেহায়াপনা নিয়ে কিছু মুখরোচক সমালোচনা করবে; নীলি মুখপুড়ীর বাপমার অসাবধানতাকে ধিক্কার দিয়ে দুচারটে পাকা পাকা কথা বলবে—এমনই একটা আশা মনের ভিতর উঁকি দিচ্ছিল। মার মুখ দেখে হতাশ্বাস হ'ল। বুঝলে, ব্যাপার সুবিধের নয়।

বাস্তবিকই, একটা রূঢ় আঘাত পেলেন হেমলতা। অমল? তাঁর সোনার অমল, এখনও

যে তার চোখে শৈশবের সারল্য, ব্যবহারে বালকের চঞ্চলতা! মার কাছে সকল কথা গল্প না করলে যে তার ঘুম হয় না, সেই ছেলের এই কাজ! আশ্চর্য্য, নিজের পেটের ছেলেকেও চেনবার জো নেই।

কিন্তু না, এ চলবে না, চলতে পারে না, হেমলতা বেঁচে থাকতে নয়।

আজীবন অপ্রতিহত প্রতাপে সংসার ক'রে এসেছেন হেমলতা, কখনও এতটুকু অন্যায় বরদাস্ত করেন নি। গুরুজনেরা পর্য্যন্ত তাঁর রাশভারী স্বভাবকে সমীহ ক'রে চলেছেন চিরকাল।

আজও তার ব্যতিক্রম হবে না, বুঝিয়ে দেবেন ছেলেকে, মা শুধু স্নেহশীলা নয়, প্রয়োজন হ'লে কঠোরও হতে পারে।

না, মায়া নয়, মমতা নয়, ঘৃণা লজ্জা আর অপমানে জর্জ্জরিত ক'রে বুঝিয়ে দেবেন তাকে, ভদ্রলোকের ছেলের এ কাজ নয়—আরও নয় হেমলতার ছেলের, সাত মাসের মেয়ে কোলে নিয়ে তেইশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে যিনি কৃচ্ছ্র সাধনায় অনায়াসে বয়স্থাদের উপর টেক্কা দিয়ে এসেছেন।

দাঁতে দাঁত চেপে চিঠিখানা মুঠোর মধ্যে চেপে হেমলতা উঠে গেলেন তিনতলায়। ছাদের ওপর একখানি মাত্র ঘর, অমলের পড়বার ঘর, বিশেষ ক'রে তার জন্যেই তৈরি। রুদ্ধদ্বার ঘরখানার পানে চেয়ে ব্রহ্মাণ্ড জ্ব'লে যেতে চায়। উঁহু, সঙ্কোচ নয়, স্পষ্টই বলবেন তিনি, বাপু হে, নিরিবিলি ঘর দেওয়া হয়েছে লুকিয়ে প্রেমপত্র লিখতে নয়, আর পাড়াপড়শীর বউ-ঝির ওপর কুনজর দেবার জন্যে তো নয়ই। লেখাপড়া শিখলেই শুধু হয় না, চরিত্র ঠিক রাখা চাই।

শুধু তাই নয়, নীলি হতচ্ছাড়ীকে ডেকে এনে দুজনের নাকের সামনে এই চিঠি ধ'রে দিয়ে তাদের প্রেম করা বের করবেন তিনি।

প্রখর রৌদ্রে খোলা ছাদে পায়চারি করতে করতে হেমলতা বাছা বাছা বাক্যবাণ সংগ্রহ ক'রে তূণে সঞ্চিত করতে লাগলেন।

তিনটে কখন বেজে গেছে, চারটে বাজে, আসবার সময় হয়ে গেছে অমলের; বাঘিনীর মত ওৎ পেতে দাঁড়ালেন আলসের ধারে। অনেক কাজের সময় ব'য়ে যাচ্ছে। তা যাক, এর চেয়ে দরকারী সে নয়।

ওই যে আসছে! অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাতের খাতাখানা লুফতে লুফতে পায়ের চটিটা পা থেকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে সেই স্কুলের ছেলের মত।

আশ্চর্য্য, কোনখানে এতটুকু অপরাধের চিহ্ন নেই, কে বলবে এই ছেলের মনে এত পাপ!

এর একটু পরেই নীচের তলায় চারু আর অমলের কথা-কাটাকাটির আওয়াজ পাওয়া গেল, চারুর স্বরই বেশি উত্তেজিত। ব্যাপারটা অবশ্য নিত্যনৈমিত্তিক। তবু হেমলতার মনে হ'ল, নিশ্চয়ই সেই চিঠির কথা, বোকা মেয়েটা হয়তো আসামাত্রই ব'লে বসেছে। কিন্তু এতদূর? লজ্জা-সম্ভ্রমের মাথা একেবারে খেয়েছে? কিন্তু না, অমলের কলকণ্ঠের হাস্য তার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে; আর কিছু না, কলেজ থেকে এসেই অমল চারুকে বিশদভাবে বোঝাতে বসেছে, জীব-জগতে উকিল জাতি কোন্ শ্রেণীভুক্ত।

বলা বাহুল্য, চারুর আঁতে ঘা লাগবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান, কাজেই উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়ে ওঠবার মানে রয়েছে।

তা হোক, এসব ছলনায় ভোলবার মেয়ে হেমলতা নয়। আসুক সে। দেখি, মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস হয় কি না।

চিঠিখানা সামনে খুলে ধ'রে সতেজ ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

ছুটো সিঁড়ি একসঙ্গে টপকাতে টপকাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে এল অমল, ঘরের সামনে মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে কিছু বলতে উদ্যত হ'ল, দৃষ্টি পড়ল চিঠিখানার ওপর—বেগুনী-আভা কাগজে নীল কালিতে লেখা, পরিষ্কার অক্ষর। কিন্তু কই, মুখে চোখে কোথায় তার ভয়ের লেশ ?

পড়া হয়ে থাকে তো দিও।—ব'লে অনায়াস অবহেলায় ঘরে ঢুকে গেল।

আর হেমলতা ?

কোথা থেকে একটা আকস্মিক ভয় এসে যেন তাঁর সর্ব্বশরীর পাথর ক'রে দিয়ে গেল।

নীচে চারু কিন্তু তখনও চেঁচাচ্ছে।

স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্ত কে. সি. রায় চৌধুরী

[ 'কলিকাতা কলা-পরিষদের প্রদর্শনী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ]

# সৌরজগতের বাস্তব দশা

শ্রীনীলরতন কর

জ্যোতির্বিদ্যার বয়স অন্তত পক্ষে তিন হাজার বৎসর।

বিস্তৃত অর্থে বলতে গেলে এই শাস্ত্রের আলোচনা-কাল মানবসভ্যতার সহব্যাপী। কিন্তু দূরবীক্ষণযোগে জ্যোতিষচর্চার সূচনা হয়েছে কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্বে।

খ্রীষ্টীয় ১৬০৯ অব্দে গ্যালিলিও সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ-সাহায্যে আকাশচারী জ্যোতিষ্ক ও গ্রহাদির অবয়ব পর্যবেক্ষণ করেন। পৌরাণিক যুগে সুরনদী, মন্দাকিনী, আকাশগঙ্গা প্রভৃতি নামে অভিহিত ছায়াপথকে তিনি বহুসংখ্যক তারকার পুঞ্জ ব'লে জানতে পারেন। রজতশুভ্র আলোকবর্ষী বিতস্তি-পরিমিত থালি আকারে দৃশ্যমান চন্দ্রকে তিনি পার্থিব উপাদানের তুল্য বস্তুতে রচিত বৃহৎ বর্তুলরূপে জেনেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিপথের সম্মুখে বৃহস্পতির আকাশে চারিটি চন্দ্রের উদয়াস্ত এবং শুক্রগ্রহে চন্দ্রকলার তুল্য কলার হ্রাসবৃদ্ধি প্রকাশ পেয়েছিল। গ্যালিলিওর পরে দূরবীক্ষণযন্ত্র বহুগুণ উন্নতিলাভ করেছে এবং বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবনার ফলে পর্যবেক্ষণের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা হওয়ায় মহাকাশে বিচরণশীল পথিকদের সম্পর্কে তথ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে আমাদের ধারণা সংশোধিত, বিস্তারিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে।

এক্ষণে এ কথা সুপরিজ্ঞাত যে, সৌরজগত—নয়টি গ্রহ, ছাব্বিশটি উপগ্রহ, ( প্রায় ) বারো শত গ্রহিকা (asteroids), কয়েকটি ধূমকেতু ও অসংখ্য উল্কা সমন্বিত। এদের সকলকে তাপ প্রদানের মূল উৎস সূর্য। সূর্যের শরীর প্রায় দশ লক্ষ পৃথিবীর জায়গা জুড়ে রয়েছে। গুরুত্বে সে ৩৩২,০০০ পৃথিবীর সমকক্ষ, অর্থাৎ তার ওজন ১৯৯২ × ১০$^{২৪}$ টন। আমাদের পৃথিবী আয়তনে কিংবা গুরুত্বে গ্রহদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ নয়। প্রধান গ্রহ হ'ল বৃহস্পতি, শনি, ইউরানাস ও নেপ্‌চুন; আর ক্ষুদ্র গ্রহ হল প্লুটো, পৃথিবী, শুক্র, মঙ্গল এবং বুধ। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। পৃথিবীর ওজন যদি এক সের ধরা যায়, তবে চাঁদের ওজন হবে এক তোলা; পক্ষান্তরে সেই তুলনায় বৃহস্পতির ওজন হবে পৌনে আট মণ। সূর্য ও গ্রহদের ব্যাস, ওজন এবং সূর্য্য থেকে তাদের দূরত্বের পরিমাপ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

গ্রহদের বাহিরের ও ভিতরের অবস্থা সকলের সমান নয়। কেউ নরম ও গরম, কেউ বা কঠিন এবং শীতল। কারও অন্তরীক্ষে মেঘের দল ভেসে চলেছে, বিদ্যুৎ শিউরে উঠছে, বাতাসের ঝড় বইছে; কারও ভূমির উপর নিশ্বাস গ্রহণের পর্যন্ত উপায় নেই, জলবায়ুশূন্য মহাদেশে শুধু ঊষর শিলারাশি পরতে পরতে বিন্যস্ত রয়েছে।

এই প্রকার প্রভেদ হওয়ার যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান। সূর্যই যখন সৌরজগতে তাপ প্রদানের মূল উৎস, তখন সূর্য থেকে দূরত্বের সহিত তাপমাত্রা ক'মে যাওয়া সঙ্গত। সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রী সেন্‌টিগ্রেড। গণিতের হিসাব দ্বারা জানা যায় যে, গ্রহদের নিজস্ব কোনও আভ্যন্তরীণ তাপ না থাকলে সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের তাপমাত্রা হ'ত ২০০° সেন্‌টিগ্রেড এবং দূরবর্তী গ্রহ

নেপ্‌চুনের তাপমাত্রা হ'ত −২০০° সেন্‌টিগ্রেড; এদের অন্তর্বর্তী গ্রহদের তাপমাত্রা এই দুই সীমার মাঝামাঝি হ'ত; যথা—শুক্রের তাপমাত্রা হ'ত প্রায় ৭০ ডিগ্রী, মঙ্গলের হ'ত প্রায় ৪০ ডিগ্রী ইত্যাদি।

**সূর্য ও গ্রহদের ব্যাস, ওজন ও দূরত্বের পরিমাপ**

| | সূর্য থেকে দূরত্ব—মাইল | অবয়বের ব্যাস—মাইল | ওজন—টন |
|---|---|---|---|
| সূর্য | ০ | ৪৩১,০৮৬ | ১৯৯·২ × ১০$^{২৫}$ |
| বুধ | ৩৫·৩ × ১০$^{৬}$ | ১,৫৫০ | ২·৮৮ × ১০$^{২০}$ |
| শুক্র | ৬৭·২ × ১০$^{৬}$ | ৩,৮৪৪ | ৪৯·২ × ১০$^{২০}$ |
| পৃথিবী | ৯২·৯ × ১০$^{৬}$ | ৩,৯৫০ | ৬০ × ১০$^{২০}$ |
| মঙ্গল | ১৪১·৪ × ১০$^{৬}$ | ২,০৯৮ | ৬·৪২ × ১০$^{২০}$ |
| বৃহস্পতি | ৪৮৩·২ × ১০$^{৬}$ | ৪৩,২৬৩ | ১৯০৬২ × ১০$^{২০}$ |
| শনি | ৮৮৬ × ১০$^{৬}$ | ৩৫,৬৮১ | ৫৬৮৮ × ১০$^{২০}$ |
| ইউরানাস | ১৭৮২ × ১০$^{৬}$ | ১৫,৮১০ | ৮৭৬ × ১০$^{২০}$ |
| নেপ্‌চুন | ২৭৮৯ × ১০$^{৬}$ | ১৫,৫০০ | ১০২০ × ১০$^{২০}$ |
| প্লুটো | ৩৭১২ × ১০$^{৬}$ | ৩,৯৫০ | ৬০ × ১০$^{২০}$ |

সৌরজগতের অবয়বসমূহে অণুপরমাণুর ঘনিষ্ঠতা সকলের সমান নয়। কোন বস্তুর ঘনত্ব (density) তার উপাদানীভূত অণুসমূহের ওজন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে। আবার তাপমাত্রা অনুযায়ী অণুদের ঘনিষ্ঠতার কমবেশি হয়। পৃথিবীর সমান জায়গা জুড়ে কেবল তরল জল থাকলে যে ওজন হ'ত, পৃথিবীর ভার তার ৫·৫ গুণ, অপর কথায় পৃথিবীর আপেক্ষিক ঘনত্ব গড়ে জলের তুলনায় ৫·৫। ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রাভিমুখে ভূপঞ্জরের ঘনত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে; প্রথম ছয় শত মাইলের স্তরের মধ্যে ভূমির আপেক্ষিক ঘনত্ব গড়ে ৪·৫; ১৮০০ মাইল গভীরতায় যে ভূস্তর আছে, তার ঘনত্ব ১০·০; আর চার হাজার মাইল গভীরতায় অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বস্তুর ঘনত্ব ১২·৫। জলের তুলনায় সূর্যের আপেক্ষিক ঘনত্ব গড়ে ১·৪১। সূর্যের তাপমাত্রা এত অধিক যে, সেখানে বস্তুসমূহ কঠিন কিংবা তরল আকারে থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও সূর্যপৃষ্ঠের মত তাপমাত্রা হ'লে যে কোনও বস্তু বাষ্পীয় অবস্থা লাভ করত।

সূর্য একটি বিরাট গ্যাসময় গোলক। তার কেন্দ্রের চারিদিকে প্রায় পাঁচ লক্ষ মাইল পুরু গ্যাসের স্তর ঘিরে আছে। কাজেই, সূর্যের কেন্দ্রবর্তী বস্তুসমূহের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হচ্ছে।

কোনও প্রকোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ করলে তার অভ্যন্তরে যে চাপ বিরাজ করে, সেটি কেবল বায়ু-পরিমাণ বা বায়ুর অণুসংখ্যার উপর নির্ভর করে না; তার তাপমাত্রাও চাপের তীব্রতার অন্যতম কারণ।

ফুটবলের ব্লাডার অথবা মোটর-টিউবকে খুব বেশি চাপে বায়ুপূর্ণ ক'রে প্রখর রৌদ্রে অধিকক্ষণ ফেলে রাখলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা, কারণ উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের বায়ুচাপও বর্ধিত হয়।

সূর্যের কেন্দ্রীয় প্রদেশের প্রতি বর্গ-ইঞ্চে ষাট লক্ষ টন চাপ বিরাজ করছে; আর ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ-ইঞ্চে বায়ুচাপ মাত্র ১৪·৭ পাউণ্ড। অথচ সূর্যের কেন্দ্রস্থলের বস্তু জলের অপেক্ষা মাত্র ত্রিশগুণ ঘনত্বসম্পন্ন। এত চাপ ধারণ ক'রেও সূর্যের কেন্দ্রবর্তী বস্তুসকল যে নিজের এই অল্প ঘনত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, তার কারণ সেখানকার তাপমাত্রা অতিশয় অধিক। সার্ আর্থার এডিংটনের হিসাব অনুসারে সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা দুই কোটি সেন্‌টিগ্রেড ডিগ্রীর কম নয়। এত বেশি তাপমাত্রায় বিস্ময়ের কিছু নেই। কোনও স্থানে তাপমাত্রা অধিক হওয়ার অর্থ সেখানে বস্তুর অণুপরমাণু অধিকতর ক্ষিপ্রবেগে ছুটছে। রেডিয়ম-নিঃসৃত আল্‌ফা-কণিকা এর একটি দৃষ্টান্ত। রেডিয়ম থেকে যে আল্‌ফা-কণিকা বর্ষিত হয়, সেগুলি সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল বেগে ছোটে। এই প্রকার ধাবমান বহু আল্‌ফা-কণিকা যদি অল্প পরিসরের মধ্য দিয়ে যেত, তবে সেখানকার তাপমাত্রা হত ৫০,০০০,০০০,০০০° সেন্‌টিগ্রেড। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক রেডিয়মরঞ্জিত ঘড়িতে খুব সামান্য পরিমাণের বস্তু পাঁচ হাজার কোটি সেন্‌টিগ্রেড ডিগ্রী তাপমাত্রায় রয়েছে। কিন্তু এই আল্‌ফা-কণিকা আমাদের পোড়ায় না, কারণ খুব অল্পসংখ্যক আল্‌ফা-কণিকাই একত্রে গমন করে।

আমাদের পার্থিব বায়ুতে সাধারণ অণুগুলি সেকেণ্ডে পাঁচ শত গজ বেগে দৌড়চ্ছে, আর সূর্যের কেন্দ্রস্থলে গ্যাসের পরমাণু সেকেণ্ডে এক শত মাইল বেগে ছুটছে; উভয়ের মধ্যে বেগের তফাৎ তিন চার শত গুণ।

যে সকল রাসায়নিক মৌলিক দ্বারা সূর্য গঠিত, তাদের সবগুলিই পৃথিবীতে পাওয়া যায় এবং প্রায় এক অনুপাতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে বস্তুসমূহ এরূপ চূড়ান্ত দশায় পোঁছেছে যে, পার্থিব কোনও দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো যায় না। পৃথিবীতে বস্তু যেরূপ কঠিন তরল ও বায়বীয় অবস্থায় রয়েছে, সূর্যমণ্ডলে বস্তুর অবস্থা তা থেকে পৃথক। সূর্যের কেন্দ্রস্থল থেকে বাহিরের দিকে প্রথম যে অনচ্ছ (opaque) স্তরটি রয়েছে, তার নাম তেজোমণ্ডল (photosphere); এই স্তর থেকে আমরা সূর্যের তেজ পাই। সূর্যের অভ্যন্তরে তেজের যে তাণ্ডবনৃত্য চলেছে, তার ওপরে এই তেজোমণ্ডলটি আবরণী-সদৃশ।

সূর্যের মহাকর্ষ পৃথিবীর অপেক্ষা আটাশ গুণ অধিক। পৃথিবীতে সূর্যের সমান মহাকর্ষ হ'লে আমরা খুব ঘনসন্নিবিষ্ট বায়ুমণ্ডল পেতাম; কিন্তু মহাকর্ষ-প্রভাবে সূর্যের গ্যাসীয় আবরণের যতটা ঘনত্ব হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি; তদপেক্ষা তনুতা লাভ করেছে; কারণ বহির্গামী তেজের চাপ সূর্যের মহাকর্ষ-প্রভাবের বিরোধিতা করছে।

আলোক বস্তুর উপর চাপ প্রদান করে। আলো যত উজ্জ্বল হয়, চাপও তত বৃদ্ধি পায়। সূর্যের কেন্দ্র থেকে নিঃসৃত অত্যুজ্জ্বল তেজ প্রতি বর্গ-ইঞ্চে বহু সহস্র টন হারে বহির্মুখে চাপ প্রদান করছে। বাস্তব-আকারবর্জিত এই তেজতরঙ্গগুলিই সূর্যপৃষ্ঠের বস্তুসমূহের বিরাট ওজনের অনেকখানি ধারণ ক'রে আছে। সূর্যাভ্যন্তরস্থ এই তেজতরঙ্গের দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোকের সমান নয়; কতকটা এক্স-রশ্মির তুল্য। প্রতি বর্গ-ইঞ্চে বহু লক্ষ টন চাপ প্রদানশীল এবং কয়েক কোটি সেন্‌টিগ্রেড ডিগ্রী

উত্তাপে বিরাজমান বস্তুর অভ্যন্তরে যদি এক্সরশ্মি বর্ষিত হয়, তবে অণুপরমাণু নিজেদের সহজ অবস্থা রক্ষা করতে পারে না, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থায় বস্তুসকল তরল বা কঠিন দশা প্রাপ্ত না হয়েও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরের মধ্যে থাকতে পারে। এই কারণে সূর্যের কেন্দ্রস্থিত বস্তু জলের অপেক্ষা ত্রিশগুণ ঘনত্বসম্পন্ন হয়েও গ্যাসের ন্যায় আচরণ করতে সমর্থ।

পৃথিবীর উষ্ণতায় অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন পুড়িয়ে জল পাওয়া যায়, কিন্তু সূর্যমণ্ডলে উত্তাপ এমনই প্রচণ্ড যে, সেখানে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সম্মিলনে জল হওয়া অসম্ভব। কলঙ্ক-প্রদেশ ব্যতীত সূর্যের অন্যত্র কোথাও রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ তো নাইই, এমন কি সেখানকার উত্তাপে প'ড়ে পরমাণুদেরও অনেকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ইলেক্‌ট্রনের বলয়বিহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

ইলেক্‌ট্রন-বিচ্ছিন্ন পরমাণুকে আয়ন বলে। আমরা যে সূর্যের অন্তর পর্যন্ত দেখতে পাই না, তন্মধ্যে আয়নাইজ্‌ড গ্যাসের অস্তিত্বই তার কারণ। আয়নাইজ্‌ড গ্যাসেরা যেন তেজ ধরার ফাঁদ, সূর্যের অভ্যন্তর থেকে যে তেজ নির্গত হয়, আয়নাইজ্‌ড গ্যাসেরা তা ধ'রে ফেলে, কাজেই সেই তেজ আমাদের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছোতে পারে না। আয়নাইজ্‌ড গ্যাসের কাছে সূর্যতেজের অধিকাংশই আটকা প'ড়ে আছে; শুধু যেটুকু ওর মধ্যে মধ্যে অবকাশ পেয়ে বেরিয়ে আসে, আমাদের কাছে ততটুকুই প্রচণ্ড রৌদ্র। সূর্য যে তেজ বিকীরণ করছে, তার বহু কোটি ভাগের একাংশ মাত্র আমাদের কাছে আসে।

দৃশ্য আলো ও তাপ ব্যতীত আরও অনেক কিছু সূর্য থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়। সূর্য-প্রেরিত বিদ্যুৎকণার স্রোত পৃথিবীর ঊর্ধ্বতন স্তরে চুম্বকীয় মেরুতে গিয়ে অরোরা বোরেলিস বা মেরু-জ্যোতির প্রকাশ ঘটায় এবং পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। সূর্য নিজে চুম্বকযুক্ত এবং তার কলঙ্কপ্রদেশসমূহে চুম্বকত্বের তীব্রতা অধিক। সূর্যের যে স্তরে সৌরকলঙ্কপ্রদেশ বিরাজিত, সেই সকল স্থানে তাপমাত্রা প্রায় চার হাজার ডিগ্রী। সেখানে টাইটেনিয়ম-অক্সাইড, সায়ানোজেন, ও হাইড্রক্সিল আদি যৌগিকবস্তুর প্রাধান্য দেখা যায়। সূর্যের কলঙ্কপ্রদেশগুলি সম্ভবত বস্তুসমূহের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণির মধ্যে যে সকল চূর্ণিকৃত পরমাণু আছে, তারা তীব্র চুম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

সূর্যের কলঙ্কপ্রদেশ এক স্থানে স্থির হয়ে নেই, পরিবর্তিত হচ্ছে; প্রায় এগারো বৎসর অন্তর এই কলঙ্কগুলিকে পূর্বেকার অবস্থা পুনরাবৃত্তি করতে দেখা যায়। সৌরকলঙ্কের এই একাদশবার্ষিক পুনরাবৃত্তির একবারে যে চুম্বকীয় ক্ষেত্র থাকে, পরের বারে তার বিপরীত চুম্বকীয় ক্ষেত্র আবির্ভূত হয়।

সূর্যের অভ্যন্তর অপেক্ষা বাহিরের দিকে তাপমাত্রা ও ঘনত্ব অনেক কম। ঊর্ধ্বতন স্তরে লঘু মৌলিকগুলি তন্নিম্নবর্তী উষ্ণতর তেজের শোষণ দ্বারা কিরণচ্ছত্রীয় রেখায় নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। তন্মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম গ্যাস প্রধান; তা ছাড়া ইলেক্‌ট্রনবর্জিত ক্যাল্‌সিয়ম-পরমাণুও বিদ্যমান আছে। সূর্যের উপরিভাগে ক্যাল্‌সিয়ম-গ্যাস রাশি রাশি মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছে; বিশেষত সূর্যের কলঙ্কপ্রদেশে এদের প্রাচুর্য দেখা যায়। সূর্যের অপেক্ষাকৃত কম দ্যুতিসম্পন্ন স্তরের চারিদিকে হাইড্রোজেন গ্যাস অতিকায় ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। সূর্য-

গ্রহণের সময় তার বাহিরে যে কিরীটিকা (corona) দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে হিলিয়ম গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

আইন্‌স্টাইনের গণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনও বস্তুর তেজ বিকীরণকালে তার বস্তুত্বের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। উত্তপ্ত লৌহশলাকা কিংবা সূর্য অথবা অপর যে কোনও দ্যুতিমান বস্তু তেজ বিকীরণকালে খুব সামান্য অনুপাতে বস্তু হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু সূর্যের তুলনায় লৌহশলাকার দ্যুতি মৃদু এবং ওজনও নিতান্ত কম; কাজেই তাপোজ্জ্বল লৌহশলাকা থেকে যে বস্তুটুকু ক্ষয় পায়, রসায়নীর নিক্তিতেও তা ধরা পড়ে না। কিন্তু বিরাটকায় সূর্য তার তেজ বিকীরণকালে প্রতি মিনিটে ত্রিশ কোটি টন বস্তু হারিয়ে ফেলছে। এইভাবে নিরন্তর বস্তুক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও ওজনে ও তেজপ্রদান-ক্ষমতায় কোটি বর্ষ পূর্বেকার সূর্যের সঙ্গে এখনকার সূর্যের বিশেষ কোনও পার্থক্য হয় নি। এই থেকেই অনুমিত হতে পারে সূর্য কত প্রকাণ্ড।

ক্রমশ

---

## ভাষারহস্য

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহু লক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি-মুহূর্তের বোঝা পড়া, আলাপ পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ ক'রে চললে কালের কোন্ দুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর এক যুগের বাতির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদি যাত্রীরা চ'লে এসেছে তারি প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ-আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চ'লে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রং মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজো আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।…

নদী যেমন অতি দূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝ'রে ঝ'রে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌছয় তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় ব'য়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হ'ল না তার প্রকাশ-লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিত্তের সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতি পুরাতন এবং এই অতি আধুনিক বাক্যস্রোত এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হয়ে আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

## গ্রন্থ-পরিচয়

### সাহিত্য-কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

[ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৵+২৯৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০ ]

পোয়েটিক্‌স, এস্‌থেটিক্‌স বা লিটারারি ক্রিটিসিজ্‌ম্ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে মাত্র গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে যে কোনও দেশের সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নির্ণয় অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছে; কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-গল্পের মত ইহাও সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ত্তমানে সভ্য দেশ সমূহে স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশেও প্রাচীন-কালে সাহিত্য-বিচারের একটা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রধানত বহিরঙ্গ বা বাহ্যরূপ লইয়া—অলঙ্কার লইয়া; তাহাও শেষ পর্য্যন্ত গতানুগতিকতার দৈন্যে এমন একটা বাঁধিগতের মত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, বক্তব্য বস্তু ও শিল্পসুষমা নিরঙ্কুশভাবে বর্জ্জন করিয়াও অলঙ্কার-রীতি বজায় রাখাটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ফলে কাব্য-বিচারে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কালিদাস নিন্দিত এবং মাঘ পূজিত হইতেছিলেন। দণ্ডী-ভামহ প্রভৃতি অলঙ্কার-ব্যাকরণবিদ্‌দের অত্যাচারে সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি এ দেশে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল কি না, পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করিবেন; আমরা দেখিতেছি, রীতি প্রধান হইয়া উঠিবার পর সাহিত্য-সৃষ্টি আর হয় নাই।

ইংলণ্ডে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যবন্যার পর নানা দিক দিয়া একটা নিষ্ফলা যুগ সুরু হয়, কিন্তু এই যুগ প্রকৃতপক্ষে নিষ্ফল যায় নাই; সাহিত্য-সমালোচনার নূতন একটা ধারা গড়িয়া উঠিয়া স্রষ্টাকে সাবধান এবং সাহিত্যরসরসিককে রসানুভূতির একটা সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই যুগে সাহিত্য-ব্যাপারে এই যে অঘটন ঘটিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল হয়তো ফলিতে এখনও বিলম্ব আছে, কিন্তু তাহা যে একদিন ফলিবে তাহা নিঃসন্দেহ। বাহিরের অপ্রত্যাশিত নানা আঘাতে সে দেশের সাহিত্যে যে ভাঙন ধরিয়া চিন্তাশীলকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিতেছে, এই সমালোচনার প্রভাবেই একদিন তাহা স্বস্থ ও সুস্থ হইয়া উঠিবে, এবং বিচারের আগুনে আবর্জ্জনা পুড়িয়া ছাই হইবে। কারণ, ইংলণ্ডের যে নূতন পদ্ধতির সূত্রপাত হইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভারতীয় রীতি-বিচারের মত বাঁধনের পদ্ধতি নয়, মুক্তির পদ্ধতি। এ দেশের সমালোচনার রীতির ইহাই পার্থক্য। উহারা বাহিরকে লইয়া মাতামাতি করে না, রসবস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার সুষমা ও অসঙ্গতির কথা স্মরণ করিয়াই সাহিত্য-বিচার করে।

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপের এই নূতন রীতির সহিত আমাদের পরিচয়ের চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষে আধুনিক সমালোচনা-রীতির তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। এই দিক দিয়া বাংলা দেশকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। সত্য বটে, দুই একজন প্রধানকে বাদ দিলে বাংলা দেশের সাহিত্য এখনও যথার্থ রূপপরিগ্রহ করে নাই, কিন্তু সূত্রপাতেই এমন একজন শক্তিশালী সমালোচকের সাহায্যও যে পাওয়া যাইতেছে, তাহাও কম আশার কথা নয়। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা-পদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তন করেন মনস্বী রাজেন্দ্র-লাল মিত্র—তাঁহার 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভে'। 'সংবাদ প্রভাকরে' কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "আহা মরি" জাতীয় এক প্রকার আলোচনার প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু তাহাতে বিচার-বুদ্ধির বালাই ছিল না; নাচগানের আসরের পেলা দিবার প্রবৃত্তিই প্রধান ছিল। রাজেন্দ্রলালই সর্ব্বপ্রথম বিষয়-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা বিচার-পদ্ধতি খাড়া

করিবার চেষ্টা করেন ; তাঁহার দেখাদেখি 'সোমপ্রকাশ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রিকায় এই রীতি অনুসৃত হইতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' অপেক্ষাকৃত অধিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করেন ; তাঁহাকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ সমালোচক বলা চলে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারের পদ্ধতি ছিল নিজস্ব, নিজের ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগার দ্বারাই তিনি চরম নিষ্পত্তি করিয়া বসিতেন। রবীন্দ্রনাথ আর একটু ব্যাপকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পদ্ধতি অনুসরণ করেন, সাহিত্য-আলোচনাকে তুলনামূলক করিয়া তিনি তত্ত্ব ও তথ্যের দুরূহতা এড়াইয়া চলেন। সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ যাহা করিতে পারিয়াছেন, তাহা সাধারণের আয়ত্তের বস্তু নহে, সুতরাং তাঁহাদের বিচারকে পদ্ধতির গৌরব দেওয়া চলে না।

বঙ্কিমের সময়ে এবং পরবর্ত্তী কালে বাংলা দেশে আর এক শ্রেণীর সমালোচকের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহারা মূলত বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন ; রীতি-বিচারে তাঁহাদের প্রায় সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সমগোত্রীয়। মিরান্দা-শকুন্তলা-দেস্‌দেমনা-আয়েষা-সূর্য্যমুখী-বিনোদিনী প্রভৃতিকে লইয়া তাঁহারা যে ভাবে আলোচনা-মিকশ্চার প্রস্তুত করিতেন, আজিকার দিনে তাহা আমাদের কৌতুকোদ্রেক করে।

বিংশ শতাব্দীতে যে তিন জন সাহিত্যিক সমালোচনা বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, মোহিতলাল তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে 'সবুজপত্র' ও 'নব্য ভারতে' প্রাচীন ও আধুনিক রীতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। মোহিতলালই দুই রীতির সমন্বয়ে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত করিয়াছেন। 'ভারতী'র "মাসকাবারী"তে, 'নব্য ভারতে' ও 'প্রবাসী'তে তিনি যখন লিখিতেন, তখন এই সমন্বয়-চেষ্টার পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষায় তিনি যে সফলতা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, আমরা তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। 'সাহিত্য-কথা' এই সাধনার পরিণত ফল।

"মুখবন্ধ" ছাড়া এই পুস্তকে যথাক্রমে (১) সাহিত্যের আদর্শ, (২) নিত্য ও সাহিত্য, (৩) সাহিত্য-বিচার ও সাহিত্যের আয়ুষ্কাল, (৪) কাব্য ও জীবন, (৫) সাহিত্যের ছোট ও বড়, (৬) রস ও রূপ, (৭) কবিতা ও বৈরাগ্য, (৮) সাহিত্যের স্বরাজ, (৯) সাহিত্যে সমস্যা, (১০) সাহিত্যে সুনীতি, (১১) সমাজ ও সাহিত্য, (১২) সাহিত্যে অশ্লীলতা, (১৩) কাব্য-পাঠ ও (১৪) সাহিত্যের স্টাইল এই চৌদ্দটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে। স্বতন্ত্র হইলেও ভাব-সামঞ্জস্যের দিক দিয়া এগুলি এক—চিরন্তন সাহিত্যের কথা।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কোল্‌রিজ, ম্যাথু আর্নল্ড, সুইন্‌বার্ন, থিওডোর, ওয়াট্‌স, ডান্টন এবং আধুনিক যুগে অ্যাবারক্রম্বি, মিড্‌ল্‌টন মারী প্রভৃতির সাহিত্য ও কাব্য-বিচারের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, মোহিতলালের উপরোক্ত নিবন্ধগুলি পাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তিনি ভাষা-পরিভাষা-দীন মাতৃভাষাতেই কি দুরূহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন ; উপরিলিখিত পণ্ডিত-সমাজও যেখানে দিশা হারাইয়াছেন, মোহিতলাল ভারতীয় সংস্কার-অর্জ্জিত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সেখানেও পথ করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ পৃথিবীর সমালোচনা-সাহিত্যেও তাঁহার দান অস্বীকার করা চলিবে না। আজিকার দিনে সাহিত্য-সমালোচনার যে ভাষা বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিয়া অব্যক্তকে ব্যক্ত এবং দুর্জ্ঞেয়কে ক্রমশ জ্ঞাত করিয়া তুলিতেছে, সে ভাষার অনেকখানি মোহিতলালের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিককে এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

"সাহিত্যে অশ্লীলতা" ও "সাহিত্যের স্টাইল" সম্পর্কে মোহিতলাল সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে আলোচনা করিয়াছেন, এ ভাবে বিচার করিতে ইতিপূর্ব্বে বাংলা দেশে আর কেহ সাহসী হন নাই। ইহাতে তিনি যে রসানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলে তাহা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময়ের উদ্রেক করিত।

'সাহিত্য-কথা'র পরিচয় সমগ্র পুস্তকের মধ্যে ছড়াইয়া আছে, অল্প পরিসরে এই পুস্তকের স্বরূপ কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নয় ; যাহা প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টা এবং সাহিত্য-রসিকের নিত্যকার সঙ্গী হইবার দাবি রাখে, দুই চারিটি বিশেষণের দ্বারা তাহাকে ধরাইয়া দেওয়া শক্ত, আমাদের কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমরা তাহাই করিতেছি।

"কাব্য-পাঠ" শীর্ষক একটি অপূর্ব্ব আলোচনা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধটির সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠককে মোহিতলালের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিচয় দিতেছি—

"কাব্যরসের আস্বাদনে ব্যক্তিগত রুচি ও রসবোধই যেমন প্রধান সহায়—সে রস যেমন একটি সরল সহজ অনুভূতির বিষয়, এবং সে অনুভূতির মূলে আছে একটি স্বতঃপ্রণোদিত অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি —তেমনই, রসবস্তুটি কেবল ব্যক্তির রুচির দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়, তাহার একটি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তাও আছে। যে ব্যক্তি তাহাকে আপন রুচির দ্বারা যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারে তাহার ততটুকু রসবোধ আছে বলিতে হইবে। ব্যক্তিগত রুচি যখন আপন পথেই রসের সন্ধান পায়, তখন সেই রুচিকে আমরা রসবোধের প্রমাণ বলিয়া মনে করি। সকলেই সেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে কাব্যকে সরস বা নীরস মনে করিতে পারেন, তাহাতে ব্যক্তির সেই আত্মসন্তোষ যেমন আপত্তিজনক নয়; তেমনই কাব্যেরও কোনও গৌরবহানি হয় না; কারণ, সকলেই রসিক নহেন, সকলেই কবিতারসমাধুর্য্যের প্রমাতা নহেন। রুচি যেখানে আপনা হইতেই সহজাত রসবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানেই সত্যকার কাব্যপ্রীতির উদ্ভব হয়। এই কাব্যপ্রীতির একটা লক্ষণ এই যে, কবিতা ভাল লাগিলে একা পড়িয়াই তৃপ্তি হয় না, সে রস রসিকসঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। ইহা হইতেই, শুধু রসসৃষ্টি নয়, রসনিবেদনও সাহিত্যের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রস যে ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতির মধ্যে অতিশয় বিলক্ষণ হইয়া প্রকাশ পায় না, তাহা যে সকল সহৃদয়-সংবেদ্য, এবং রসিকতা যে সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকারের বস্তু নয়, বরং তাহা প্রাক্তন পুণ্যফলের মতই মানুষের একটা সৌভাগ্য—ইহা চিরকালের অভিজ্ঞতায় স্বীকৃত হইয়াছে। এই রসের স্বরূপ-নির্ণয়ে সর্ব্বকালের রসিকমণ্ডলীর কৌতূহলের অবধি নাই। এই রসকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করা যায় না। যাহারা রসিক তাহারা সে প্রমাণ তাহাদের অন্তরেই পাইয়া থাকে, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যাহারা অরসিক তাহারা তাহাদের সেই অরসিকতা সমর্থন করিবার জন্যই এইরূপ প্রমাণ দাবী করে। ইহাতে এ পর্য্যন্ত কাব্যের মর্য্যাদাহানি হয় নাই। কিন্তু আধুনিক কালে বিজ্ঞান-বিদ্যার বিকৃত প্রভাবে মানুষকে নিয়মযন্ত্রে নির্ম্মিত একটি জড়সৃষ্টি কল্পনা করিয়া সকলকে সমান অধিকার দেওয়ার একটা ধুয়া উঠিয়াছে; তাহার ফলে 'রস' বা 'রসিক' বলিয়া কোনও অসাধারণ পৃথক সংজ্ঞা স্বীকার করিতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন। ইহাদের মতে মানুষমাত্রেই রসিক, কাব্যের মধ্যে সেইটুকু গ্রাহ্য যাহা সকলের মনোরঞ্জন করে; অথবা, কাব্যরস-আস্বাদনে ব্যক্তির রুচিই একমাত্র প্রমাণ। অর্থাৎ 'রস'-রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়, হয়, সর্ব্বসাধারণকে ভোটের অধিকার দাও, নয়, রসের পরিবর্ত্তে ব্যক্তির নিজস্ব রুচিকে স্বীকার কর—কাব্যের রসগ্রহণে সকলে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া পরস্পরের প্রতি পিছন ফিরিয়া থাকুক, যাহার যাহা খুসি তাহাকে শিরোধার্য্য করুক। ইহার ফলে, কাব্যের আদর্শ কি দাঁড়াইয়াছে তাহা কোনও প্রকৃত রসিকের অবিদিত নাই। এখন রাম শ্যাম হরির রাজত্ব; ভোটের সংখ্যাধিক্যই কাব্যরসের প্রমাণ, তাই সাহিত্য এখন ব্যবসায়ীর গুদাম ভরিয়া তুলিতেছে। এই অতিশয় সস্তা পাণ্ডিত্যের যুগে, স্বাধীন চিন্তার দোহাই দিয়া সকলেই পণ্ডিত, এবং পণ্ডিতমাত্রেই রসিক।"

**সংবাদপত্রে সেকালের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

[ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৭+৫৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪॥০ ]

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে আমি 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম—

বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানে যে-বাংলাদেশে অনুষ্ঠানকারী কাহার পুত্র, কাহার

পৌত্র বা কাহার প্রপৌত্র ইত্যাদি সংবাদ না হইলে অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া যায়, নিতান্ত আশ্চর্য্যের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, জাতিগত ভাবে সেই দেশই, কাহার প্রপৌত্র বা পৌত্র সে সংবাদ দূরে থাকুক, কাহার পুত্র তাহাই বিস্মৃত হইয়াছে; গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসও যথাযথ স্মরণ নাই। রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথম বেলুনে চড়িয়াছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এসকল কথাও যদি কেহ বলিয়া বসে, যে-নজিরের জোরে তাহাকে প্রতিবাদ করিতে পারি সে-নজির পর্য্যন্ত আমাদের ছিল না।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেশের ও জাতির ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিস্মৃত পূরা একটি শতাব্দীর—ঠিক বিগত শতাব্দীর—মালমশলা সংগ্রহ করিয়া সেই ইতিহাসের একটি অধ্যায় লিখিবার কার্য্যে আত্মনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার বিপুল অধ্যবসায়ের প্রমাণ লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অর্থে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।... নাম বা যশের প্রলোভনও ইহাতে যৎসামান্য। ভবিষ্যতে যাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস লিখিতে বসিবেন, ব্রজেন্দ্রবাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত উপকরণগুলি তাঁহাদের এতই নিতান্ত আপনার মনে হইবে যে ব্রজেন্দ্রবাবু হিসাব হইতে বাদ পড়িবেন।

তাহার পর মাত্র ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে, ব্রজেন্দ্রবাবু অসুস্থ দেহেই অবাঙালীসুলভ অধ্যবসায়ের গুণে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' ১ম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার সক্ষম সম্পাদনায় বিস্তৃত ভূমিকাসহ 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র নয়খানি মূল্যবান গ্রন্থও বাহির হইয়াছে। তাঁহার দিক দিয়া ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কিন্তু বাংলা দেশের পাঠক-সম্প্রদায় আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা যে এই ধরণের পুস্তকেরও সমাদর করিতে শিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গল্প-উপন্যাস-কবিতাপ্লাবিত বঙ্গদেশে সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত নীরস বিভাগগুলিতেও আমাদের আসক্তি বাড়িতেছে, আমাদের একপেশে সাহিত্য ক্রমশ চৌকস হইয়া উঠিবে, তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, দ্বিতীয় সংস্করণে ব্রজেন্দ্রবাবু এই পুস্তকের আশাতীত রকম উন্নতি বিধান করিয়াছেন; বহু মূল্যবান সম্পাদকীয়-অংশ এবং অধুনা-অপ্রচলিত শব্দের সূচী-অংশ ইহাতে নূতন যোজিত হইয়াছে; তাহা ছাড়া পুস্তকের মূল সংগ্রহ-অংশও অনেক বাড়ানো হইয়াছে, বিষয়-বিভাগও অপেক্ষাকৃত অধিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে করা হইয়াছে। এই পুস্তকের "বিজ্ঞপ্তিতে" পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছেন যে,

> বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিশেষজ্ঞ-কর্ত্তৃক বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে এই পুস্তকখানি ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত-স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহাও কম আনন্দের সংবাদ নয়।

"দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে" সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,

> 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য সঙ্কলিত করিয়া আমি তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করি। ইহাতে বহু নূতন ঐতিহাসিক সংবাদ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত হইলেও একই যুগ সম্বন্ধে দুই জায়গায় অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদের অসুবিধা হইত। নূতন সংস্করণ প্রকাশকালে পরিশিষ্ট ও মূল পুস্তকের এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার কোনও কারণ ছিল না। সুতরাং প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণে ও তৃতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধে যে-সকল সংবাদ ছিল তাহা একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া

পাঠকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে তাঁহারা ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের মধ্যবর্ত্তী যুগ সংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র পাইবেন।

সম্পাদকীয় টীকা-টিপ্পনী সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা দেশের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "সম্পাদকীয়" ৯২ পৃষ্ঠার মধ্যে (৪০১-৪৯২ পৃষ্ঠা) যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং প্রত্যেক সংবাদের নজির অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, গৌড়ীয় সমাজ, কলিকাতা মাদ্রাসা, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অথবা তারিণীচরণ মিত্র, রামজয় তর্কালঙ্কার, ডেভিড হেয়ার, হটী বিদ্যালঙ্কার, ডিরোজিও, জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং সেকালের স্ত্রীশিক্ষা, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি বিষয়ে যাঁহারা সঠিক সংবাদ অবগত হইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই টীকা-টিপ্পনীগুলি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইবে। এই সংবাদগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই ১ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ২য় সংস্করণ সংগ্রহ করিতেও এই ভাবে সম্পাদক মহাশয় বাধ্য করিয়াছেন—এইটুকুই আমাদের অনুযোগ।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম, ব্রজেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত উপকরণগুলি অপরের এতই আপনার মনে হইবে যে, তিনি হিসাব হইতে বাদ পড়িবেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই মারাত্মক উক্তির সত্যতা বারম্বার প্রমাণিত হইতেছে। যে সকল ঐতিহাসিক 'সমাচার দর্পণ' কখনও চোখেও দেখেন নাই, তাঁহারাই ব্রজেন্দ্রবাবুর পুস্তক হইতে বেমালুম টুকিয়া দিয়া অবলীলাক্রমে 'সমাচার দর্পণে'র প্রতি ঋণ স্বীকার করিতেছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু হিসাব হইতে বাদ পড়িতেছেন। গবেষণা-ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রবাবুর অকপট সাধুতার ইহাই শাস্তি; বাংলা দেশে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি যদি হাতে রাখিয়া ঐতিহাসিক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে এই ভাবে তাঁহাকে উপেক্ষার অনাদর সহ্য করিতে হইত না।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' অত্যাবশ্যক 'রেফারেন্স বহি' হিসাবে যে বাঙালী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মাত্রেই ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

---

## ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

মানুষের ব্যক্তিত্বের আছে দুইটা দিক্, দুইটা ভাগ, দুইটা জগৎ। বাহিরের বস্তু বা "বিষয়" চিত্তে যে বিচিত্র ইন্দ্রিয়-অনুভূতির (sensations) মেলা মিলাইতেছে, তাহাদিগকে লইয়া তাহার একটা জগৎ। আবার ইহা ছাড়া রহিয়াছে আরো একটা জগৎ—যেখানে ভিতরের গুহাতল হইতে তাহার বিচিত্রতর অনুভূতির ফুলঝুরি অহরহ উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। প্রথমটা মানুষের consciousnessএর জগৎ—তাহার আর এক স্তর নীচে রহিয়াছে তাহার subconsciousএর জগৎ। সে আছে নিরালায় ঘুমাইয়া। সেখানে দিবালোকের প্রবেশ নাই। চেতনের নীচে যে অচেতন নিদ্রিত আছে, ইহা আজ ভালো করিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে বিশেষতঃ মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে। অবচেতন মানুষের consciousএরই আর এক পিঠ। একদিকে যাহা চেতন, অন্যদিকে তাহাই subconscious হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু এই চেতন, অবচেতনের ওপারে আরেকটা অতি সূক্ষ্ম, নিভৃত লোক আছে—যাহাকে বলা যায় superconscious—অরবিন্দের ভাষায়—supramental, বা পরা-চেতন স্তর; যেটা আরো গভীর, আরো সুদূর, আরো সূক্ষ্ম। সেই অতি সূক্ষ্ম, নিভৃত লোকে মানুষের সত্যিকার স্বরূপের আবাস।

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়, জয়শ্রী, মাঘ ১৩৪৫

# সম্পাদকীয়

## ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা

রাষ্ট্রনৈতিক নানা আন্দোলনে আমরা দিনে দিনে ক্রমশ যেরূপ গভীরভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে কেবলমাত্র পরাধীনতা সমস্যা সমাধানে ইতরভদ্রনির্বিশেষে দেশের আপামরসাধারণকে চেষ্টিত হইতে হইবে; স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকেও অপেক্ষাকৃত উত্তেজনাকর ব্যাপারের জন্য আপাতত বিসর্জ্জন না দিয়া উপায় থাকিবে না। ইতিমধ্যেই দৈনিক সংবাদপত্রাদির পৃষ্ঠায় এই আশঙ্কাজনক অবস্থার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় গত ২১এ ও ২২এ জানুয়ারি তারিখে ফেণীতে অনুষ্ঠিত নোয়াখালি জিলা শিক্ষক-সম্মিলনীর সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে দেশের বর্ত্তমান শিক্ষানীতির যে আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক, প্রমাণসহ তাহা বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু দেশের নেতাদের দৃষ্টি পলিটিকাল কারণে অন্যত্র নিবদ্ধ, ফলে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে গলদ থাকিয়া যাইতেছে। বৃহত্তর উত্তেজনার মুখে তরলমতি যুবকেরা অতি সহজেই ভাসিয়া যায়, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যভাবে দল বাঁধিয়া চলিবার বিপদও খুব বেশি নয়—সমস্তটা তাল সামলাইতে হয় বেচারা শিক্ষকদের। তাঁহারা জানেন, এই দেশের ভাগ্যে অভাবনীয় যদি কিছু ঘটেই, তাহা মন্ত্রবলে ঘটিবে না, কঠোর শিক্ষার মধ্য দিয়া সমস্ত জাতিকে সেইজন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সকল শিক্ষার মূল শিক্ষাই হইতেছে সাধারণ জ্ঞান বিস্তার। বারম্বার আন্দোলন ও উত্তেজনার ফলে এ দেশে এই সাধারণ শিক্ষা বিপজ্জনকভাবে ব্যাহত হইতেছে, অথচ যাঁহাদের উপর এই শিক্ষার ভার, তাঁহাদিগকে নিরুপায়ভাবে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে অথবা নিঃস্বার্থ কিম্বা স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় নেতার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে। দায়িত্বটা তাঁহাদের পুরাপুরি আছে, অথচ নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁহাদিগকে কিছু করিতে দেওয়া হইতেছে না। এক দিকে গভর্মেণ্টের চাপ, অন্য দিকে উচ্ছৃঙ্খলের আবদার—এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া শিক্ষকেরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন—

> কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবল বন্যা যখন দেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছিল, তখন বন্ধনহীন এবং ভাবপ্রবণ তরুণদল দলে দলে সেই বন্যার প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমশ তাঁহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ—জাতীয়তার ভাব—জাগিয়া উঠিল।... এ সময়ে শিক্ষকগণের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতির বাণী, তাঁহাদের নবজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনরূপ উপদেশ বা প্রেরণা তাঁহারা সাধারণত পান নাই। তাই দেশনায়কদিগের আনুগত্যে দেশমাতৃকার সেবার উন্মাদনায় তৎকালীন অসহযোগ-আন্দোলন, সাময়িক ধর্ম্মঘট, নানাবিধ ধ্বনি উচ্চারণপূর্ব্বক হাটে বাটে নগরে পল্লীতে নেতৃবৃন্দের অনুগমনাদি কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়া ধন্য হইতেছেন বলিয়া নিজেরাও গর্ব্ব অনুভব করিতেন, জনগণের নির্ব্বাক বিস্ময় এবং নেতৃবৃন্দের অনর্গল স্তোকবাক্যও তাঁহাদের সেই গর্ব্বের অনুমোদন করিত।...এ সময়ে শিক্ষকগণ অবস্থা-বৈগুণ্যে ছাত্রদের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেন না, তাহার সুযোগও তাঁহাদের বড় ছিল না। ফলে শিক্ষকগণের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল; পরীক্ষার জন্য পঠন-পাঠনের সম্বন্ধ ব্যতীত ছাত্র ও শিক্ষকের অন্য সম্বন্ধ প্রায় লুপ্ত হইতে লাগিল। এ সময়ে শিক্ষকদের অবস্থা একটু শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; ছাত্রগণও তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না, শাসন-

কর্ত্তারাও না। শাসনকর্ত্তারা মনে করিতেন—শিক্ষকগণ ভিতরে ভিতরে ছাত্রদিগের আনুকূল্য করিতেছে; আর ছাত্রগণ মনে করিতেন—চাকুরীর খাতিরে শিক্ষকগণ শাসনকর্ত্তাদের আনুগত্য করিতেছেন। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দের মধুর সম্বন্ধ এইরূপে বিনষ্ট হইতে লাগিল। নানাবিধ আন্দোলনে যোগদান করিয়া সময়ক্ষেপ করার ফলে, বিশেষত জীবিকার্জ্জন ব্যাপারে বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যর্থতার কথা পুনঃ পুনঃ বক্তাদের মুখে শ্রবণ করার ফলে পূর্ব্ব হইতেই অধ্যয়নে ছাত্রদের শৈথিল্য জন্মিতেছিল; এক্ষণে শিক্ষকদের প্রতি তাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় সেই শৈথিল্য আরও নিবিড় ও ব্যাপক হইতে লাগিল।

ক্রমশ তাঁহাদের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠিল; দেশনায়কগণের পরিচালনা বা নির্দ্দেশ ব্যতীতও স্বতন্ত্রভাবে দেশমাতৃকার সেবার যোগ্যতা এবং অধিকার তাঁদের আছে বলিয়া ছাত্রগণ মনে করিতে লাগিলেন। সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তির পরিচয় তাঁহারা পূর্ব্বেই পাইয়াছেন; তাই নিজেদের ইচ্ছানুরূপ ভাবে স্বদেশ-সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।...কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এ জাতীয় ছাত্র-জাগরণ দৃষ্ট হইতেছে এবং সমগ্র পৃথিবীর ছাত্রসমূহকে একই ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বছাত্রসঙ্ঘও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তরুণদের এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি অতুলনীয়; যে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীতে একটা আন্দোলনের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, সে সময়ের মধ্যে প্রবীণদের কোনও রাজনৈতিক সঙ্ঘ একটা প্রদেশের মধ্যেও অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। তরুণদের এই শক্তিকে উপেক্ষা করিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনার চেষ্টা মাত্র। নূতন শক্তির উন্মাদনায় তাঁহারা এখন বিভোর। তাই discipline বা নিয়মানুবর্ত্তিতাকে তাঁহাদের অনেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবমাননা বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই আত্মশক্তির বোধ পরিণামে যে উগ্রতার জনক হইল, তাহারই ফলস্বরূপ ঘন ঘন ধর্ম্মঘট সর্ব্বত্র সংঘটিত হইতে লাগিল।

ধর্ম্মঘটাদি দ্বারা শিক্ষকের বা কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষতি কিছু হয় না। ক্ষতি হয় ছাত্রদের—অধ্যয়নের ক্ষতি, চরিত্রগঠনের ক্ষতি—যাহার পরিণাম দেশের ও জাতির পঙ্গুতা। কেবল ধর্ম্মঘটে নহে, ছাত্রদের এই অননুবর্ত্তিতার ভাব বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাহিরে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহা যে তাহাদের নবজাগ্রত শক্তির আত্মঘাতী অপপ্রয়োগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার আবশ্যক। ছাত্র-আন্দোলনের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অধ্যাপক শেষাদ্রি প্রমুখ শিক্ষাব্রতীগণও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।... ভারতীয় ছাত্রদের এই প্রগতির এই ভীষণ দ্রুততার পরিণাম কি হইবে, কে বলিবে?

## গান্ধীজীর রহস্যপ্রিয়তা ও নারীপ্রগতি

নারীপ্রগতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে নিতান্তই সেকেলে নন, ভারতের রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নানা আন্দোলনের স্বরূপ দেখিলেই তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। কোনও ব্যাপারেই তিনি নারীজাতিকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সুখসুবিধা শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার সতত দৃষ্টি আছে। এসকল সত্ত্বেও ভারতের নারী-সমাজে ইদানীং প্রগতির নামে যে সকল ভ্রান্তি অনুষ্ঠিত হইতেছে, স্বাধীনতার দাবিতে তাঁহারা যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় এখানে ওখানে দিতেছেন—মহাত্মা গান্ধীর নজরেও যে তাহা পড়িয়াছে, সম্প্রতি আধুনিকদের সম্বন্ধে রোমিও-জুলিয়েট সম্পর্কিত তাঁহার রহস্যোক্তি হইতেই তাহা অনুমান করা যায়। চিন্তাশীল সমাজে ইহাতে আতঙ্কের উদ্রেকই স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু দেখিতেছি, একদল শিক্ষিতা নারী এই উক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধীর কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। তিনি যে অকারণে কঠোর হইয়াছেন—এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। রহস্যের ছলে যে সর্ব্বনাশা ব্যাপারের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, আমরা প্রত্যহ আমাদের আশেপাশে তাহার অস্তিত্বের আভাস পাইতেছি। সুতরাং অকারণে রাগ না করিয়া আত্মশুদ্ধির দিকেই ইঁহারা দৃষ্টি দিলে সদ্বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

## 'নারীহরণ ও তাহার প্রতিকার'

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ নারীহরণ ও নারীনির্যাতন পাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, কিন্তু বাংলা দেশে এই পাপের পরিমাণ ভয়াবহ। প্রত্যহ ইহা বাংলা দেশের সর্ব্বত্র যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে জাতিহিসাবে আমাদের কিছুমাত্র লজ্জা থাকিলে আমরা আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম। সুতরাং কুমিল্লা জিলার চুণ্টা নারী-কল্যাণ-সমিতি 'নারীহরণ ও তাহার প্রতিকার'-শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে আমাদিগকে যে

অবহিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সময়োপযোগী হইয়াছে। বাংলা দেশের স্বভাবত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু-সমাজ নারীহরণের জন্য ধীরে ধীরে কি ভাবে দ্রুত বিলুপ্তির দিকে যাইতেছে, এ বিষয়ে যাঁহারা বিন্দুমাত্র খবর রাখেন, তাঁহারা তাহা জানেন। এই পুস্তিকার লেখক সকল দিক দিয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রতিকার যে আমাদের নিজেদের হাতেই অনেকখানি রহিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

## রেল-দুর্ঘটনা ও যাত্রীর প্রাণ

ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথে ঘন ঘন দুর্ঘটনার ফলে নিরীহ যাত্রীদের প্রাণ যে ভাবে বিপন্ন হইতেছে, অজ্ঞানিত দুর্ব্বৃত্তদের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া নিজেদের অব্যবস্থা ঢাকা দিলেও কোম্পানি আমাদিগকে নিঃশঙ্ক করিতে পারিবেন না। যেখানে দুর্ব্বৃত্তগণের আপাতলাভের কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না; অকারণে নিরীহ যাত্রীদের প্রাণ-হনন করিয়া রেলকোম্পানির উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার যুক্তিও যে অকাট্য, সহজবুদ্ধিতে তাহাও মনে হয় না। এই সকল দুর্ঘটনায় যাঁহারা হতাহত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণের মূল্য যথাযথ নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে এবং তাহার জন্য রেলকোম্পানিকে দায়ী করিলেই কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়িবে; অল্প ব্যয় করিয়া অধিক ব্যয়ের হাত হইতে সহজে নিস্তার পাইলেই তাঁহাদের গদাই-লস্করী চাল চিরকাল সমানে চলিবে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ট্রেনে চড়িবার পূর্ব্বে থানায় ডায়ারি করিয়া না গেলে না-পাত্তা হইবারও আশঙ্কা আছে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের যতগুলি দোষ, ভারতের রেলকোম্পানিগুলিতে ক্রমশই তাহা প্রকট হইতেছে। সাবধান হইবার এই সময়।

## রোজার ভূতভয়

রাষ্ট্রনৈতিক নির্ব্বাচন-ব্যাপারে ভারতের সর্ব্বত্র যে উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে চিন্তাহীন জনসাধারণের সহজেই এই বিশ্বাস জন্মিতে পারে যে, আমাদের স্বাধীনতা-লাভের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের মনে হতাশাই জাগাইতেছেন; এ যুগে ভারতীয় মনের সর্ব্বপ্রকার মোহ-মুক্তির যিনি অন্যতম গুরু, তাঁহার মনই ক্ষণে ক্ষণে সংশয়াকুল হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহাতে সংশয় নাই। মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন—

> লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে এখনও আমাদের বহু বিলম্ব আছে। উপায় এবং তাহাদের অর্থ ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারিলে আমরা লক্ষ্যস্থলের কাছেও পৌঁছিতে পারিব না। প্রকৃতই যখন সময় আসিবে তখন আমরা দেখিব, আমাদের শক্তি পর্য্যাপ্ত নহে। আমাকে যদি এখন আইন-অমান্যকারী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তাহার দায়িত্ব লইতে সমর্থ হইব না। আমি একথা স্বীকার করিতেছি দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু স্বীকার না করিলে আমি কাপুরুষের অধম বলিয়া গণ্য হইব। জনগণের মধ্যে অহিংস ভাব থাকিলেও যাঁহারা জনগণের সংগঠনকারী তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট অহিংস ভাব নাই। সিন্দুকে টাকা না থাকিলে ব্যাঙ্কারের পক্ষে যেমন ব্যাঙ্ক পরিচালন অসম্ভব, সেইরূপ একান্ত বিশ্বস্ত সৈনিকের অভাবে কোনও সেনাপতি কি সংগ্রাম পরিচালনা করিতে পারেন?

আস্ফালন এবং বহ্বাড়ম্বরই অত্যন্ত উগ্রভাবে সর্ব্বত্র প্রকট হইতেছে; অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বার্থবুদ্ধিই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছে; দ্বাদশটি শতাব্দীর নিদারুণ লাঞ্ছনাভোগের দ্বারাও যে এই কলঙ্ক স্খালন হইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

## মৃত্যু

বিগত মাসে বঙ্গবাসী বিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন উপযুক্ত শিক্ষক হারাইল। বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অর্দ্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরিভাষা সৃষ্টি করিয়া ও নানা পুস্তক লিখিয়া তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সিউড়ি রতন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা শিবরতন মিত্র মহাশয় বাংলা দেশের সাহিত্যিক-সমাজে প্রথিতযশা ছিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' পুস্তক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের সবিশেষে ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৩৩।১ এল্গিন রোড হইতে প্রকাশিত

## 'অলকা'র পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

**'অলকা' পড়িয়া যদি আপনার ভাল লাগে,
তাহা হইলে অন্তত পাঁচজন বন্ধুর নিকট
'অলকা'র কথা বলিবেন।**

গ্রেহাউণ্ড রেসিং
দি ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত
আজকালকার সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য আমোদ।
স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না—তাঁহারা আরও
অধিক আনন্দ পাইবেন।
উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনাকারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আনন্দ!
প্রবেশ মুল্য এনক্লোজার "এ" ১৷০ স্পেশাল এনক্লোজার (বক্স) ৪৲
" "বি" ॥৵০ ঐ মহিলাদের জন্য ২৲

## 'অলকা'র পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

'অলকা' পড়িয়া যদি আপনার ভাল লাগে, তাহা হইলে অন্তত পাঁচজন বন্ধুর নিকট 'অলকা'র কথা বলিবেন।

# 'অলকা'র নিয়মাবলী

১। আশ্বিন হইতে 'অলকা'র বর্ষ আরম্ভ।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে 'অলকা' বাহির হইবে।

৩। 'অলকা'র মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সহ বার্ষিক চারি টাকা চৌদ্দ আনা; ষান্মাসিক দুই টাকা সাত আনা। ব্রহ্মদেশে বার্ষিক পাঁচ টাকা চার আনা; ষান্মাষিক দুই টাকা দশ আনা। ভারতের বাহিরে ছয় টাকা বারো আনা; ষান্মাষিক তিন টাকা ছয় আনা।

৪। প্রত্যেক মাসের ২০ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের উত্তর-সহ আমাদের জানাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইতে পারি।

৫। 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আবশ্যক; সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে ডাক-খরচা দিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের কপি বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়।

৭। আমাদের যথেষ্ট যত্ন লওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ব্লক নষ্ট হইলে আমরা দায়ী হইব না।

৮। বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের প্রুফ নিজেদের দেখা উচিত। সময়াভাবে দেখিয়া না দিলে এবং তাহাতে ভুল থাকিলে আমরা দায়ী হইব না।

## বিজ্ঞাপনের হার

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ | ১ | পৃষ্ঠা | প্রতি মাসে | ২০৲ |
| " | ½ | " | " | ১১৲ |
| " | ¼ | " | " | ৬৲ |
| কভার | ৪র্থ | " | " | ৬০৲ |
| " | ২য় | " | " | ৫০৲ |
| " | ৩য় | " | " | ৪৫৲ |

( বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র )

**ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চ কমিশনে এজেন্ট আবশ্যক।**

৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: কলিকাতা ৬৩৫৫

পরিচালক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

# সূচী

ফাল্গুন ১৩৪৫

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
তোমার না আমার?
LILY BRAND BARLEY
TRADE MARK
FOR INFA S & INVALIDS
গঠন করে
স্বাস্থ্যবান
হৃষ্টপুষ্ট
ছেলেপুলে

GOVERNMENT PRODUCTS.

বাংলা গভর্ণমেণ্টের

# কুইনাইন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

জয়েণ্ট এজেণ্টস্‌—

শা, ওয়ালেস এণ্ড কোং

পোষ্ট বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং
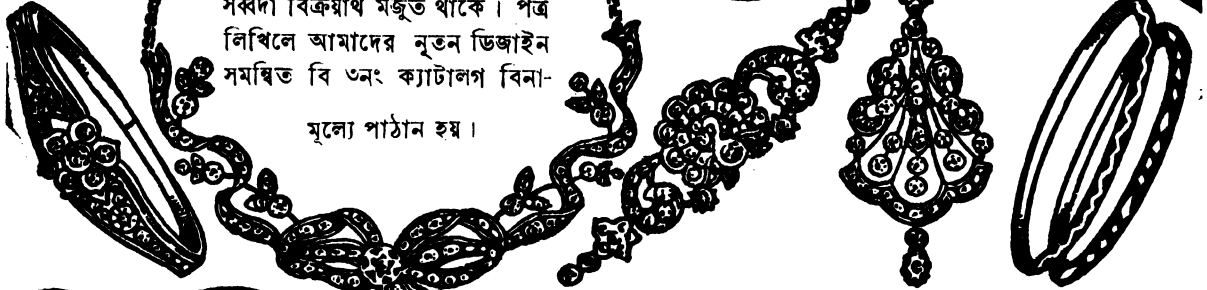
৪ নং ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অলকা –



কলাভবন

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৫ | ষষ্ঠ সংখ্যা

# বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ।
অতিশয়িতপদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ ॥

পদ ও পদার্থের অতিরিক্ত ধ্বনিনামক বস্তু যেমন সাহিত্য-জগতে সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জক, তেমনই বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দপদার্থ হইতেও সর্ব্বোৎকর্ষশালী যে ধ্বনি, যাহার প্রভাবে সুদর্শনা গোপললনাগণের নয়নে আনন্দাশ্রু বহিয়া যায় এবং তজ্জন্য অঞ্জনরেখার বিলোপে ব্যঞ্জনাবৃত্তি সঞ্জাত হয়, মুরারির সেই মুরলীধ্বনির জয় হউক।

এইরূপে ধ্বনিপ্রাধান্য প্রখ্যাপনপূর্ব্বক আচার্য্য কবি কর্ণপূর বলিতেছেন,—"কবিবাঙ্‌নির্ম্মিতিঃ কাব্যং" অর্থাৎ কবির বাক্যনির্ম্মিতিই কাব্য। অসাধারণ চমৎকৃতিজনক রচনাকেই তিনি নির্ম্মিতি বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্যশব্দটি আমরা সাহিত্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মতে—

রস যার আত্মা, ধ্বনি যার প্রাণ, ভাব যার শক্তি, শব্দার্থ যার আকৃতি এবং প্রকৃতি, রীতি যার অঙ্গসৌষ্ঠব, ছন্দ যার গতি এবং অলঙ্কার যার ভূষণ, সাধারণত তাহাকেই সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। রসের অর্থ কি ?—'রস্যতে ইতি রসঃ'। অর্থাৎ যাহা আস্বাদনীয়, যাহা আস্বাদনযোগ্য, তাহাই রস। লৌকিক জগতে যেমন কটুতিক্তকষায়াদি, সাহিত্য-জগতে তেমনই আদি-বীর-করুণাদি রস নামে পরিচিত।

স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ।

কাব্যার্থের সম্ভেদে যে আত্মানন্দ উদ্ভূত হয়, তাহারই স্বাদ বা অনুভূতির নামই রস। এই রসই সাহিত্যের আত্মা। ধ্বনি অর্থে 'অতিশয়িতপদপদার্থ'—অর্থাৎ পদ এবং পদের অর্থের অতিরিক্ত যে

ব্যঞ্জনা, তাহাই ধ্বনি ; এই ধ্বনিই সাহিত্যের প্রাণ। ভাব শব্দের অর্থ হওয়া,—'ভবতীতি ভাবঃ'। যাহা হইয়াছে, তাহাই তাহার ভাব। 'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া'। নীরবে বসিয়া ছিলাম, চিত্ত প্রায় নিস্তরঙ্গ ছিল, হঠাৎ একটি ফুল দেখিয়া কিম্বা কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিয়া মন চঞ্চল হইল, এই চাঞ্চল্যই ভাব। তরু-আলবালে জল ঢালিয়া, তপোবন-তরুলতাকে ভালবাসিয়া অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার সঙ্গে ধুলাখেলা করিয়া তাপসপালিতা শকুন্তলা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিল, অকস্মাৎ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অতিথিকে দেখিয়া হৃদয় তাহার অভিনব আবেগে দুলিয়া উঠিল—ইহাই ভাব। উৎসাহ, উদ্বেগ, ক্রোধ, চিন্তা প্রভৃতি মনোবৃত্তিনিচয়ের নামই ভাব। মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন,—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।" আচার্য্যগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেন,—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের মিলনে স্থায়ী ভাব রসরূপে পরিণত হয়। ভাবকে রসের শক্তি বলিয়াছি। কথাটা নূতন, এবং আমিই প্রথম ইহার ব্যবহার করিতেছি। সুতরাং ইহাকে আরও একটু যাচাই করিয়া লইতে হইবে। স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়—এই কথাটিতে আমার একটু আপত্তি আছে। যদিও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরিণামবাদী, বিবর্ত্তবাদ তাঁহারা একেবারেই পছন্দ করেন না ; তথাপি আমি বলিব—স্থায়ী ভাব রসরূপে বিবর্ত্তিত হয়, পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। আরও পরিষ্কাররূপে বলিতে হইলে বলিব,—রূপান্তরিত হয়। শক্তি এবং শক্তিমানে যে ভেদ, ভাব ও রসে সেইরূপ প্রভেদ। রসে ও ভাবে ভেদও আছে, অভেদও আছে, এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

উপরে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের নাম করিয়াছি। সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা বলিতেছেন,—

কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যান্যপি।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ॥

স্থায়ী ভাবের কারণ বিভাব, কার্য্য অনুভাব, এবং সহকারীর নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়াছে, এই রতি বা অনুরাগ স্থায়ী ভাব। ভালবাসার কারণ দুষ্মন্তকে দেখা—এইটি বিভাব। বিভাব দুই রকম—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। দুষ্মন্ত এখানে আলম্বন বা ভালবাসার অবলম্বন। দুষ্মন্তপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক, বনস্থলী, ভ্রমরগুঞ্জন, কুহুধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। দূতী-প্রেরণ, প্রণয়লিপিলিখন আদি অনুভাব, অর্থাৎ এইগুলি অনুরাগের কার্য্য। আর বিষাদ, চিন্তা, মালিন্য প্রভৃতি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। নয়টি রসেরই এইরূপ স্থায়ী ভাব ও বিভাবাদি আছে। আচার্য্যগণ বলেন, আদিরসের স্থায়ী ভাব অনুরাগ। এখন দেখিতে হইবে, আদিরস বা শৃঙ্গাররসের সঙ্গে অনুরাগের পার্থক্য কি। দুষ্মন্তকে দেখিবার পূর্ব্বে কি শকুন্তলার হৃদয়ে আদিরসের বসতি ছিল না? ছিল, তবে সুপ্ত ছিল ; দুষ্মন্তকে দেখিয়া হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইল, সেই ভাবই ধীরে ধীরে আদিরসকে উদ্বোধিত করিল, জাগাইয়া তুলিল, এবং ক্রমে সেই ভাবরাশিও আদিরসে রূপান্তরিত হইল। রসজলনিধির তরঙ্গের নামই ভাব এবং ভাবের প্রগাঢ় অবস্থার নামই রস। রসের মধ্যে ভাব এবং ভাবের মধ্যে রস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, অথচ দৃশ্যত দুইটি পৃথক্ স্বরূপও আছে। এই স্বরূপ তত্ত্বত অভিন্ন হইলেও দৃশ্যত ভিন্ন। তাই আমি পূর্ব্বেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের কথা তুলিয়া রাখিয়াছি।

এইবার শব্দার্থের কথা। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

তিনি প্রচুররূপে শব্দ ও অর্থসম্পত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের মত নিত্যসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট জগতের জনকজননীস্বরূপ শিব-শিবানীর বন্দনা করিয়াছেন। আমিও তাই শব্দ এবং অর্থকে সাহিত্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি বলিয়াছি। রীতি অর্থে রচনার শৈলী। সংস্কৃত সাহিত্যের রচনাশৈলী গৌড়ী মাগধী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে রাঢ়ীয় রীতিই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের রচনাবৈশিষ্ট্যও স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে রীতির গৌরব লাভ করে। আর ছন্দ—শাস্ত্র বলেন, "ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি," এই বিশ্ব ছন্দে প্রতিষ্ঠিত, ছন্দেই পরিচালিত। সৃষ্টিতে ছন্দ, স্থিতিতে ছন্দ, লয়েরও একটা ছন্দ আছে। সুতরাং যাহার ছন্দ নাই, সে রচনাকে স্বচ্ছন্দ বলিতে পারি না। ছন্দ বিষয়বস্তুর অনুরূপ না হইলে সাহিত্যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটে। উপমা প্রভৃতিকে সাহিত্যের অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কারই সাহিত্যের ভূষণ।

সাহিত্য বুঝিলাম, এইবার সাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ বুঝিবার চেষ্টা করিব। রসভাবের অনুরূপ যথাযথ শব্দার্থ প্রয়োগে, উপযোগী রীতি এবং ছন্দ সহযোগে কবির যে রচনাসম্ভার, তাহাই যে সাহিত্যপদবাচ্য—এ কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু সে রচনা সাধারণের হৃদয়ে রসোদ্রেক করিবে কিরূপে, তাহাই এইবার দেখিতে হইবে। অনেকের পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে দেখিয়াছি, অনেকে ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়াছে শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে কেহ কেহ হয় তো দুই চারিটা ভাল কথাও বলিয়াছে, তথাপি তাহা সাহিত্য হয় নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইন্দুমতী লোকান্তরিতা হইলেন, অজের শোকাভিভূত হৃদয় কালিদাসের লেখনীমুখে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, অমনই সেই শোকগাথা স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের পথে এক অমূল্য সম্পদ্‌রূপে সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিল। রামের বা শ্যামের পত্নীশোকে আমার তেমন দুঃখ হয় নাই। আবার নিজ পত্নীবিয়োগে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই পাইয়াছি, কিন্তু অজবিলাপ পড়িয়া দুঃখের মধ্যে এত আনন্দ আসিল কোথা হইতে? পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়াছি, কিন্তু ছাড়িতে তো পারি নাই, বার বার পড়িয়াছি। যত বার পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে, কে এমন নিপুণ শিল্পী, বিশ্বের হাহাকারকে আকার দিয়াছে! আমারই প্রাণের কথা, যাহা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বক্ষে গুমরিয়া মরিয়াছে, প্রকাশ করিয়া ব্যথার ভার লাঘব করিতে পারি নাই, কে তুমি দরদী বন্ধু, আজ এতদিন পরে সে কথাকে এমন মাধুর্য্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিলে! এ যে তোমার ক্রন্দনে আমি সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলাম! অলঙ্কার-কৌস্তুভ-প্রণেতা ইহারই নাম দিয়াছেন 'কবিবাঙ্‌নির্ম্মিতি'। কেহ কৃষিজীবী, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ শিল্পী, কিন্তু রসগ্রাহী হইলে অভিনয়দর্শনে অথবা কাব্যপাঠে স্থানকালপাত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া—এমন কি, আপনা ভুলিয়া ক্ষণেকের জন্যও যে রসানুভূতি ঘটে, যে আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, ইহাতেই সাহিত্যের সার্থকতা। বিভাবাদিযোগে রসনিষ্পত্তি যেমন কবিকর্ম্ম, বিভাবাদি যোগে রসাস্বাদনও তেমনই সাধারণের ধর্ম্ম। সাহিত্যদর্পণকার ইহারই নাম দিয়াছেন,—

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।"

কবির সৃষ্টি আমাদিগকে রসাস্বাদনের এমন এক সাধারণ অধিষ্ঠানভূমিতে দাঁড় করাইয়া দেয়, যেখানে দাঁড়াইয়া—

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥

বিভাবাদির সাহায্যে রসাস্বাদসময়ে ইহা পরের বা পরের নহে, ইহা আমার বা আমার নহে—এইরূপ কোন পরিচ্ছেদের অস্তিত্বও অনুভূত হয় না। এই জন্যই সাহিত্যদর্পণকার সাহিত্যের রসের সঙ্গে ব্রহ্মাস্বাদের তুলনা করিয়াছেন।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্ব-প্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।" দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ রসকে 'স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়' বলিয়াও তৃপ্ত হন নাই—বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাস্বাদসহোদর"। পরিপূর্ণ আনন্দই ইহার স্বরূপ। এ আনন্দ ক্ষণিকের নহে, এ আনন্দ পরিণামবিরস বা অবসাদদায়কও নহে। এই জন্যই আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকি যে, সাহিত্যের রস এবং যোগী, জ্ঞানী বা ভক্তসম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্তপ্রতিপাদিত রস মূলে এক। সাহিত্যের সাধনা রসভাবের সাধনা। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ।" শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ। বৈষ্ণবকবি বলিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ"। তিনি রসস্বরূপ এবং শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী ভাবময়ী, মহাভাবস্বরূপিণী। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে এই কথা কয়টি বার বার মনে করিয়া রাখিতে হইবে।

সাহিত্যের প্রাচীন নবীন ভেদ কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। শুনিতে পাই, মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ইহারই মধ্যে প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমি কিন্তু শকুন্তলাকে প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। শ্রীগীতগোবিন্দ আমার চক্ষে চিরনূতন। তবে ইহার আর একটা দিক্‌ও আছে। সাহিত্য যুগধর্ম্মের অভিব্যক্তি। যুগের প্রয়োজনে কখনও সাহিত্য জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে, কখনও জাতি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। জাতির সঙ্গে সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে আবদ্ধ। অখণ্ড কালের বক্ষে সীমারেখা টানিয়া আমরা যেমন তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখি, জাতির জীবনস্রোতের বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গকেও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি। তথাপি ইহারই মধ্যে পারম্পর্য্যের যে ফল্গুধারা, আমরা যেন তাহার অনুসন্ধানে অবহেলা না করি। কখনও দেখিতে পাই, কালপ্রবাহের চলোর্ম্মিসংঘাতে অবসন্ন মোহমূর্চ্ছিত জাতি সুবিস্তীর্ণ বালুবেলায় অন্ধকার যবনিকা অঙ্গে টানিয়া অসাড় নিস্পন্দের মত পড়িয়া আছে। সাহিত্যে সেই শয়নচিহ্ন আজিও সুপরিস্ফুট। কখনও দেখিতেছি, অসংখ্য বাহুপ্রক্ষেপে মহাকালবক্ষ মথিত বিপর্য্যস্ত করিয়া জাতি অভিনব উদ্যমে কালপ্রবাহে উজানে চলিয়াছে। সাহিত্যে সেই উদ্দাম আলোড়নের মহোচ্চ রোল যুগান্তরের পরিধি পার হইয়া আজিও কর্ণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জাতীয় চৈতন্যে সেই অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের ক্ষীয়মান গ্রন্থিটি আমাদিগকে সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইবে। অতীতের আলোকে বর্ত্তমানের পথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সংগঠনে প্রাচীন সাহিত্য

আলোচনার যে বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে, এ কথা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার নাম করিতে হয়। বঙ্গের বরেণ্য পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ নেপাল হইতে এই গান এবং দোহাগুলির আবিষ্কারপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যকে সহস্রাব্দের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণ চিরকাল স্মরণে রাখিবে। সাধারণের পক্ষে দুষ্পাচ্য এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলেও আলোচনার অভাবে বিশেষ বোধগম্য হইতেছে না। আমরা এ বিষয়ে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র, ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি মনীষিবর্গের আলোচনার প্রতীক্ষা করিতেছি।

অতঃপর আমরা কবিরাজগোস্বামী শ্রীজয়দেবের নাম স্মরণ করিব। সংস্কৃত সাহিত্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী গীতিকবি বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। অজয়ের জলকলধ্বনি সেই অমৃতনিস্যন্দি সঙ্গীতের চিরন্তনী প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। শ্রীগীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার আলোচনা অপরিহার্য্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি বিভাগই সর্ব্বপ্রধান—একটি মঙ্গলকাব্য, অপরটি পদাবলী। এই দুইটি বিভাগেই বাঙ্গালী শ্রীজয়দেবের নিকট বিশেষ ঋণে ঋণী। শ্রীগীতগোবিন্দ একাধারে মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলী। কবি বলিতেছেন, "শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি।" আবার বলিয়াছেন, "যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং। মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥" পরবর্ত্তী কবিগণ এই মঙ্গলগান ও পদাবলী কথা দুইটি জয়দেবের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ সঙ্গীতজগতেও জয়দেবের প্রধান্য একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ জয়দেবের নিকট হইতেই গৃহীত। পরবর্ত্তী বহু কবির অবলম্বিত বিষয়-বস্তুতেও শ্রীজয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট। কেন্দুবিল্বের বিজন কুঞ্জকুটীরে ঝঙ্কৃত হইয়া শ্রীগীতগোবিন্দের গীতলহরী কবি জয়দেবের জীবিতকালেই উড়িষ্যার সমুদ্রসৈকত হইতে রাজপুতানার মরুবক্ষ পর্য্যন্ত অভিষিক্ত করিয়াছিল। অনতিকালমধ্যেই শ্রীগীতগোবিন্দের বহু টীকা রচিত হইয়াছিল। এবং গীতগোবিন্দের অনুকরণে বহু কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এক কথায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শতাব্দীকাল কবিরাজগোস্বামী জয়দেবের যুগ নামে অভিহিত হইতে পারে।

কবি জয়দেবের পর দুই শত বৎসরের পথ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সময় আমরা কয়েকজন মঙ্গলকাব্য-প্রণেতার সাক্ষাৎ পাই। ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্টের নাম সাহিত্যে সুপরিচিত। মনসামঙ্গল-প্রণেতা কানা হরিদত্ত এবং চণ্ডীমঙ্গল-প্রণেতা মাণিকরামকে প্রায় সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। যুগের প্রয়োজনেই এই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেকালে জাতিগঠনে এই মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে। বিদেশী তুর্কী আসিয়া বাঙ্গালার নানা স্থান অধিকার করিয়াছে। লোহার, খয়রা, ভল্ল, ডোম, বাগ্দী, মল্ল প্রভৃতি জাতি, যাহারা সৈন্যবিভাগে কার্য্য করিত, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাজা নাই,

রাজ্যরক্ষার প্রয়োজন নাই, সৈন্য রাখিবে কে ? তাহাদের জীবিকার্জ্জনের পন্থায় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। সমাজ তাহাদের নূতনতর বৃত্তির উপায় খুঁজিতে লাগিলেন, সুতরাং নূতন করিয়া জাতিগঠনের, পরস্পর ঐক্যবন্ধনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইল, তাহারা দেবানুগৃহীত জাতি, কালুবীর ডোম ধর্ম্মের পরম ভক্ত, লোহাটা বজ্জর জাতিতে লোহার—দেবী ভবানীর প্রিয় সাধক। ইছাই ঘোষ গোয়ালা। ধনপতি ও চাঁদ জাতিতে বণিক্। কালকেতু ব্যাধ। ইহাদিগকে বুঝাইতে হইল, স্বয়ং ভগবতী বাগ্দিনীর বেশে মাছ ধরিয়াছেন। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিয়াছেন। জীবিকার্জ্জনে বংশানুগত বৃত্তি অবলম্বনে কোন লজ্জা নাই। বুঝাইতে হইল, দৈহিক বল অপেক্ষা নৈতিক বল কোন অংশে হীন নহে, পার্থিব সম্পদ্ অপেক্ষা চরিত্রসম্পদের মূল্য অনেক অধিক। মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মনুষ্যত্ব দেবত্বেরই রূপান্তররূপে পূজা লাভ করিল। ধর্ম্মরাজ, মনসা, চণ্ডী, মহাদেব প্রভৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া জাতির ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় হইল, গ্রাম্যদেবতার আশ্রয়প্রাঙ্গণে উচ্চনীচ ভেদ বহুল পরিমাণে তিরোহিত হইয়া আসিল। মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্ম্মমূলক সাহিত্য হইলেও কবিগণ রসভাবের সাধনায় কিয়দংশে সাফল্য লাভ করিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গলের তুইটি ধারা। এক ধারায় এক দেবতার ভক্ত অপর দেবতার ভক্তকে বধ করিয়া সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, যেমন ধর্ম্মমঙ্গল। আর এক ধারায় এক দেবতার ভক্ত অন্য দেবতাকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, বহু নিগ্রহ সহিয়া, শেষে সেই দেবতার ভক্তরূপে জীবনে সাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল। মঙ্গলকাব্যের এই তুই ধারাকে আয়ত্ত করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের লোকগীতি ঝুমুর অবলম্বনে অভিনব কৃষ্ণায়ন বা কৃষ্ণমঙ্গল হস্তে একদিন বীরভূমে এক মহাকবির অভ্যুদয় ঘটিল। সুদূরশ্রুত বাঁশরীনিঃস্বনের মত এক অশ্রুতপূর্ব্ব সুর-তরঙ্গে জাগিয়া বাঙ্গালী বিস্ময়চকিত নেত্রে দেখিল, তুর্দ্দিন অপসারিত হয় নাই। নিকষকালো নিবিড় মেঘে এখনও বাঙ্গালার আকাশ মৃত্তিকা একাকার হইয়া আছে। কিন্তু নবজাগরণের অরুণোদয়েরও আর বিলম্ব নাই। পূর্ব্বদিগন্তভালে দূর চক্রবালের নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া জবাকুসুমসঙ্কাশ বালসূর্য্য নবাভ্যুদয়ের পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর সেই শ্যামল মেঘের মেতুর সমারোহে পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক এক প্রেমকরুণকণ্ঠ পাপিয়া আকাশ বাতাস প্লাবিত করিয়া গাহিতেছেন—

ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।  
পাখী হইয়া উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি॥  
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।  
কলসে কলসে সেঁচো না টুটে পাথার॥  
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।  
সাধ লাগে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥  
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।  
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥  
আগুনেতে দেউ ঝাঁপ আগুনি নিভায়।  
পাষাণেতে দেউ কোল পাষাণ মিলায়॥

তরুতলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুঞি মরো সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীর বরে।
ছটফট করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে॥

কোন্ দূর আকাঙ্ক্ষিত পুণ্যলোকে কামনার পরপারে বসতি তোমার, প্রিয় দয়িত আমার! মধ্যে দীর্ঘ পরাধীনতার বিপুল ব্যবধান। পায়ে ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খলভার। কালপ্রবাহের তীরে বসিয়া কলসে কলসে সেচিয়া যে এই অপার অনন্ত বারিরাশি ফুরায় না বন্ধু! তোমার করুণাস্পর্শে আজিকার এই শ্রীহীন বাঙ্গালা একদিন সোনার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছিল। সত্যই, সে পরশমণি আমরা হেলায় হারাইয়াছি। সম্মুখে সে আদর্শ নাই, হৃদয়ে সে ভালবাসা নাই, চরিত্রে সে দৃঢ়তা নাই, মানুষে মানুষে সৌহৃদ্য নাই। কোন্ পাপে, কাহার অভিশাপে অধঃপতনের এই অন্ধতম কূপে ডুবিতে বসিয়াছি, কে বলিয়া দিবে? আগুনে গিয়া ঝাঁপ দেই, নয়নের জলে আগুন নিভিয়া যায়। অসহ্য দুঃখে বক্ষে পাষাণভার চাপাই, হৃদয়ের তাপে পাষাণ গলিয়া মিলাইয়া যায়। আমার অদৃষ্টে শতশাখ তরুও ছায়াহীন হইয়াছে। তোমার করুণার অমৃত পানে অমর জাতি তাই আজ মৃত্যু কামনা করিতেছে। তুমি নিদয় হইয়াছ বলিয়াই ঘরে পরে আজ গঞ্জনা দেয়, লাঞ্ছনা করে। কিন্তু তোমার অভাবে সত্য সত্যই প্রাণ আমার অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীদাসের অন্তর্লোকের এই অকপট আকুলতা জাতিকে জাগাইয়া তুলিল। যে ভাবধারা গিরিবক্ষবিলম্বিত নির্ঝরিণীর ন্যায়, কোথাও বা সিকতাতলবাহী ফল্গুধারার মত সমাজের বক্ষে প্রবাহিত হইতেছিল, কবি চণ্ডীদাসের সাধনা ও সঙ্গীতে কলনাদিনী তটিনীর নটনভঙ্গিতে তাহা এক আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই সঞ্জীবন বারি বাঙ্গালীর প্রাণকে অপরূপ রূপে রসে সৌন্দর্য্যে সুগন্ধে পরিপূর্ণ শতদলে বিকশিত করিয়া তুলিল। অভিনব রসভাবে উজ্জীবিত প্রাণপঙ্কজের পুঞ্জিত প্রতিরূপ প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন।

যে ভগবান্ যোগী, জ্ঞানী বা ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, চণ্ডীদাসের প্রেমে তিনি তরণী বাহিয়াছেন, দানী সাজিয়াছেন, এমন কি, শেষে দধিদুগ্ধের ভার পর্য্যন্ত বহন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণমঙ্গল বা কৃষ্ণায়ন বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করিল। মহাকবি কৃত্তিবাস রামমঙ্গল রচনা করিলেন। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হইল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, চতুর্ভুজের হরিচরিত প্রভৃতি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্য, সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিল। তাহার পরই নববসন্তসমাগমে বাঙ্গালার জলে স্থলে সে কি সমারোহ, আকাশে বাতাসে সে কি সঙ্গীত, সে কি সুগন্ধ, সে কি আবেগ, সে কি মত্ততা! কেদারকান্তারে সে কি শ্যামলিমা, সে কি শোভা! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণাকিরণে কত তরুলতা তৃণগুল্ম মঞ্জরিত হইল, কত পুণ্যস্মৃতি ভগবৎপ্রেমিক বিহগকণ্ঠে মোহন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তুলিল। কত সাধু, কত মহাজন আবির্ভূত হইলেন। দেশ ধন্য হইয়া গেল।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকথা লইয়া বাঙ্গালী বিশেষরূপ আলোচনা করে নাই। তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এক সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁহাকে মন্দিরে

প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিকে ব্যবসায়বিশেষে বিনিয়োগ করিয়াছে। আর এক সম্প্রদায়ের অহম্মন্য ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৈষ্ণবধর্ম্মকে দুর্ব্বলের ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালার খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ সংবাদ রাখেন না। কেন রাজা গণেশের সাধনা সফল হইল না, কেন তিনি বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন, আমরা আজিও সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি নাই, কিন্তু সেকালের একজন সন্ন্যাসী তাহা বুঝিয়া অন্য পথে জাতিগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বুঝিয়াছিলেন, যুগান্তের সঞ্চিত গ্লানি অপনোদনের জন্য সমগ্র জাতির সমবেতভাবে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছে। জাতির আত্মশুদ্ধির জন্য ইহা ভিন্ন অন্য পথ সে দিন ছিল না। তাই এক দিকে তিনি যেমন আচণ্ডালে আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তেমনই জাতির চিত্তে দৈন্যবোধও জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদর্শ যেমন সাধারণের অবশ্য গ্রহণীয়, তেমনই অসাধারণেরও অবশ্য অবলম্বনীয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যের সাধনা রসভাবের সাধনা। বৈষ্ণবকবিগণ বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই রসভাবেরই মিলিত মূর্ত্তি। পদাবলী এই রসভাব সাধনার মহামন্ত্র। সাহিত্যের সাধনা কেমন করিয়া জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয়, আর জীবনের সাধনা কেমন করিয়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠে, মহাপ্রভু তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বহু বৈষ্ণব সাধক এবং কবি তাহার সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী ভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের আরও দুইটি দিক্ আছে। আমি শ্যামা-সঙ্গীত ও প্রণয়সঙ্গীতের কথা বলিতেছি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালায় আর একজন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি প্রচলিত কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রামাণ্য পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। উত্তরকালে ইঁহারই উত্তরাধিকারিরূপে আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে পাইয়াছি। সঙ্গীত-সাহিত্যে প্রসাদের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজনবিদিত। এই সাহিত্যে তিনি গোষ্ঠীপতির সম্মানে সম্মানিত। সাধক কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ প্রভৃতি কবিগণ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রণয়সঙ্গীতে নিধুবাবু এবং শ্রীধর কথক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নিধুবাবুই বলিয়াছিলেন,—"নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।" নিধুবাবুর তুলনা নিধুবাবু। রামপ্রসাদকে মঙ্গলকাব্যের এবং নিধুবাবুকে পদাবলীর অলৌকিক এবং লৌকিক সংস্করণ বলিতে পারি। কবির গান এই প্রভাবেই পরিপুষ্ট ; কবির গানে দুইটি শাখা, একটি সখীসংবাদ—অর্থাৎ রাধকৃষ্ণের লীলাগান। অপরটি ভবানীবিষয়—অর্থাৎ হরগৌরীর লীলা-গান। লালুনন্দলাল, রামজীদাস, রঘুনাথ দাস, হারু ঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি কবিওয়ালার বহু গান রসভাবে সমুজ্জ্বল। বাঙ্গালার আগমনী-গান এই কবিওয়ালাগণেরই নিজস্ব সৃষ্টি। দাশুরায় এই কবিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার শক্তির অনুরূপ প্রতিষ্ঠাও ছিল অসাধারণ। দাশুরায়ের রচনা সাহিত্যের সম্পদ্।

উপসংহারে আমি মহাকবি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি। তিনি মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি হইলেও তাঁহাকে মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত এবং প্রণয়সঙ্গীতের সমন্বয়মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। উজ্জ্বল ভাষায়, নিপুণ ছন্দে, মনোহারী অলঙ্কারে, এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ঝঙ্কারে তিনি যে সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা বহুমূল্য রত্নরূপে অক্ষয় হইয়া আছে। মঙ্গলকাব্য-প্রণেতৃগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী কবি কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচিত—

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব
কংসদানবঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকাননরঞ্জন॥

অথবা জয় শিব শঙ্কর
বৃষধ্বজেশ্বর।
মৃগাঙ্কশেখর মহেশ্বর
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক দিগম্বর॥

প্রভৃতি কবিতা স্তোত্রের মত শুনায়।

বিদ্যাসুন্দরের মধ্য হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু শিখিপিচ্ছ ইন্দ্রধনু।
পীতধরা বিজলীতে ময়ুরে নাচাও হে॥
নয়নচকোর মোর হেরিয়া হয়েছে ভোর।
মুখসুধাকর হাসি হাসিয়া বিলাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে॥
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও।
ভারত যেমন চাহে সেই মত চাও হে॥

# সৌরজগতের বাস্তব দশা

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীনীলরতন কর

সৌরজগতের অবয়বসমূহের ওজন ও আয়তনের বৃহত্ত্ব অনুসারে গণনা করলে সূর্যের পরেই প্রধান হ'ল বৃহস্পতি। বৃহস্পতির ঘনত্ব জলের ১·৩৪ গুণ, অর্থাৎ সূর্যের গড় ঘনত্বের প্রায় অনুরূপ ( সূর্যের গড় ঘনত্বের ১·৪১ )। অপরাপর গ্রহাপেক্ষা এই গ্রহটি দ্রুত ঘূর্ণনশীল; একবার সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে প্রায় নয় ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট সময় লাগে। এজন্য এর নিরক্ষীয় প্রদেশ (equatorial region) অতিশয় দ্রুতবেগবিশিষ্ট। বিভিন্ন অক্ষাংশে (latitude) গ্রহটির ঘূর্ণন-হার নিরূপণ দ্বারা জানা যায় যে, তার বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড ঝড় বইছে; ঝড়ের বেগ কোথাও ঘণ্টায় দুই শত মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

জ্যোতিষীগণ দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে পর্যবেক্ষণকালে বৃহস্পতির উপরিভাগে বহু সহস্র মাইল বিস্তৃত মেঘসদৃশ পদার্থের দ্রুত রূপপরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব অনুমানের প্রথম সুযোগ পান। বৃহস্পতির অন্তরীক্ষে যে সকল বিচিত্র চিত্র লক্ষিত হয়, সেগুলি এক বৎসর যেরূপ থাকে পরবৎসর তদপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে; সময়ে সময়ে মাত্র কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই তাদের আকৃতি বদলায়। গ্রহরাজের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান মেঘের দলই এই প্রকার অদ্ভুতভাবে নব নব রূপ পরিগ্রহ করে।

রেডিওমিটর-যন্ত্র সাহায্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিমাপ করলে বৃহস্পতির তাপমাত্রা −১৩৫ সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী পাওয়া যায়। কিন্তু এই পরিমাপের পথে পৃথিবী ও বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল কর্তৃক লাল উজানী আলোর (infra red radiations) শোষণ হয়; সেজন্য রেডিওমিটর যে তাপমাত্রা নির্দেশ করে, তা ঐ গ্রহের প্রকৃত তাপমাত্রার একেবারে নিখুঁত হিসাব দেয় না। বৃহস্পতির ন্যায় দূরত্বে অবস্থিত তেজ শোষণ ও বিকীরণের পক্ষে আদর্শস্থানীয় কোনও বস্তুপিণ্ড কেবল সূর্যোত্তাপে উত্তপ্ত হ'লে তার তাপমাত্রা হ'ত −১৫১° সেন্টিগ্রেড।

প্রকৃত তাপমাত্রা এতদপেক্ষা অধিক হওয়ার একটি কারণ এই যে, জ্যোতিষীগণ গ্রহটির সূর্যালোকিত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য স্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না; তা ছাড়া বায়বীয় আবরণ সূর্যপ্রেরিত ক্ষুদ্র তরঙ্গের তেজকে গ্রহটির ভূমি অভিমুখে সহজে প্রবেশ করতে দেয় না, আবার তার পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকীরিত দীর্ঘতর তরঙ্গের তেজ বায়ুমণ্ডল অতিক্রম ক'রে সহজে বাইরে যেতে পারে না। এতদ্ব্যতীত গ্রহটির মধ্যে তার নিজস্ব কিছু আভ্যন্তরীণ তাপ এখনও সঞ্চিত আছে। বৃহস্পতির মেঘরাশি ক্রমাগত যেভাবে আকার পরিবর্তন করে, তা দেখলে মনে হয়, তারা যেন তাপের ঠেলনে ওপরে উঠছে; গ্রহটির আভ্যন্তরীণ তাপের অস্তিত্বে বিশ্বাসের এটিও অন্যতম হেতু। সকল দিক বিবেচনা ক'রে বৃহস্পতির তাপমাত্রা এক্ষণে প্রায় −১৪০° সেন্টিগ্রেড ব'লে ধরা হয়েছে।

কিন্তু গ্রহটিতে শ্বেত লোহিত পাটল ও কৃষ্ণাভ যে সকল বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ লক্ষিত হয়, তার কারণ এখনও ব্যাখ্যা করা যায় নি।

কিঞ্চিদধিক ষাট বৎসর পূর্বে জার্মান জ্যোতিষী ট্‌সোল্‌নার (Zollner) মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রধান গ্রহগণের অবস্থা সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থার মাঝামাঝি। তাঁর মতে বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুভার গ্রহসমূহ শীতল হতে বিলম্ব হচ্ছে; অভ্যন্তর খুব উত্তপ্ত থাকায় এদের উপরিভাগে কঠিন আস্তরণ তৈরি হয় নি; উপাদনীভূত বস্তুসমূহ এখনও গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। কিন্তু এক্ষণে তাঁর এই অভিমত অগ্রাহ্য হয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে ডক্টর হ্বিল্‌ট (Dr. Wildt) বৃহস্পতির কিরণচ্ছত্রে কতকগুলি রেখা পর্যবেক্ষণ ক'রে সেগুলি অ্যামোনিয়ার নির্দেশক ব'লে স্থির করেন। ডক্টর ডান্‌হ্যাম মাউন্ট-উইল্‌সন-মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ-সংলগ্ন কিরণচ্ছত্র-যন্ত্র দ্বারা বৃহস্পতি থেকে প্রাপ্ত আলোক পরীক্ষা ক'রে সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন; এতদ্ব্যতীত তিনি প্রধান গ্রহসমূহের অন্তরীক্ষে মিথেন গ্যাসের অস্তিত্ব জানতে পারেন। অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস উচ্চ তাপমাত্রায় থাকতে পারে না, এইজন্য ট্‌সোল্‌নারের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়েছে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে ভাসমান মেঘমালা এরূপ গ্যাসে নির্মিত, যা অত্যধিক মাত্রায় শৈত্য পেলে তবে তরল ও কঠিন আকার লাভ করে। কঠিন কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড-কণিকা ও জমাট-বাঁধা অ্যামোনিয়ার স্ফটিক দিয়ে সেই মেঘ রচিত হয়েছে অনুমিত হয়। জ্যোতিষী জেফ্রিস-(Jeffreys)-এর অনুমান বৃহস্পতির মধ্যপিণ্ডটি লৌহাদি ধাতু নির্মিত; তার চারিদিকে পুরু বরফের আচ্ছাদন ও তদুপরি অত্যন্ত শীতল গ্যাসের আবরণ আছে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী বৃহস্পতির শক্ত পঞ্জরটির ব্যাস ৫৭,০০০ মাইল, তার উপর যথাক্রমে ১১,০০০ মাইল পুরু বরফের আস্তরণ ও ৩৫,০০০ মাইল গভীর বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান।

বৃহস্পতির চন্দ্রসমূহের ছায়ামধ্যে গ্রহণ-ঘটনার কালবৈষম্য থেকে জানা যায় যে, তার ভূমিভাগ অসমতল। বৃহস্পতি-পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা থেকে মেঘসমূহ সময়ে সময়ে শত মাইল ঊর্ধ্বে বিচরণ করে। পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির যে সকল প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হয়, সে সকল স্থানে আলেয়া গ্যাসের পরিমাণ প্রায় এক মাইল অ্যাট্‌মস্ফিয়ার। (এক মাইল অ্যাট্‌মস্ফিয়ার শব্দের অর্থ পার্থিব সাগরপৃষ্ঠের প্রমাণ বায়ুচাপে এক মাইল পুরু হয়ে যতখানি গ্যাস গ্রহকে ঘিরে থাকতে পারে, সেই পরিমিত গ্যাস)। ডান্‌হ্যামের হিসাব অনুসারে দৃশ্যযোগ্য বৃহস্পতির ওপরে যে অ্যামোনিয়া গ্যাস আছে, পার্থিব বায়ুমণ্ডলের প্রমাণ চাপ ও উত্তাপাবস্থায় (standard conditions) তা প্রায় এগারো গজ পুরু হয়ে থাকতে পারে। জেফ্রিস মন্তব্য করেছেন বৃহস্পতি শনি প্রভৃতির বায়ুমণ্ডলে এরূপ চাপ বিরাজ করছে যে, সেখানে গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তরল হয়ে গিয়েছে; এমন কি, কোন কোন গ্যাস কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। হ্বিল্‌টের বিশ্বাস, তথাকথিত স্থায়ী গ্যাসও সেই প্রচণ্ড চাপে কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাঁর গণনা অনুসারে বৃহস্পতির উপর জমাট-বাঁধা গ্যাসের ঘনত্ব ০·৭৮। এই প্রকার ঘনত্ব হ'লে বায়বীয় কয়েকটি পদার্থ ব্যতীত প্রায় সকলগুলিকে বাদ দিতে হয়। জমাট বাঁধলে অক্সিজেনের ঘনত্ব হয় ১·৪৫; নাইট্রোজেনের হয় ১·০২; অ্যামোনিয়ার হয় ০·৮২; কেবল হাইড্রোকার্বনসমূহ, যথা—মিথেন (ঘনত্ব = ০·৪২), ইথেন (ঘনত্ব = ০·৫৫), হিলিয়ম (ঘনত্ব = ০·১৯)

এবং হাইড্রোজেন ( ঘনত্ব=০.০৮ ) বৃহস্পতির ভাগে পড়ে। মাত্র ঘনত্বের আলোচনা থেকেই এই মন্তব্যে পৌঁছানো যায় যে, বৃহস্পতির অন্তরীক্ষে প্রচুর পরিমাণে মৌলিক আকারে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম আছে।

বৃহৎকায় গুরুভার গ্রহসমূহে বহুল পরিমাণে হাইড্রোজেন বিরাজমান। এই গ্যাসের কিয়দংশ পূর্বকালে প্রাপ্তব্য অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হয়ে জলের আকারে পরিণত হয়েছিল। সূর্য থেকে দূরত্ব অনেক হওয়ার জন্য উত্তাপ কম পাওয়ায় সেই জল কেবল বরফ অবস্থাতেই থাকতে পারে।

শনিগ্রহে যে জমাট বরফ-সমুদ্র আস্তীর্ণ রয়েছে, সেটি ৬,০০০ মাইল পুরু। এই হিমানীস্তরের তলদেশে কঠিন মধ্যপিণ্ডটির ব্যাস প্রায় ২৮,০০০ মাইল। শনির উপরিভাগে মাঝে মাঝে কতকগুলি সাদা দাগ দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি আকার পরিবর্তন করে এবং স'রে যেতে যেতে দৃষ্টিসীমার অন্তরালে গমন করে। এই মেঘসদৃশ বস্তু শনিতে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। শনির বায়বীয় আবরণ বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। সেই বায়ুমণ্ডলমধ্যে অ্যামোনিয়া অপেক্ষা মিথেন বা আলেয়া গ্যাসের পরিমাণ অধিক। কিরণচ্ছত্র-যন্ত্রে পরীক্ষা করলে শনিগ্রহ থেকে যে অ্যামোনিয়া-নির্দেশক সমান্তরালবিস্তৃত রেখাসমূহ পাওয়া যায়, সেগুলি বৃহস্পতি থেকে প্রাপ্ত ঈদৃশ রেখাসমূহ অপেক্ষা অনুজ্জ্বল। এই গ্রহের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা বৃহস্পতি অপেক্ষা দশ-পনরো ডিগ্রী কম। কোব্লেন্ট্স (Coblentz) রেডিওমিটর-যন্ত্রে পরীক্ষা ক'রে শনির তাপমাত্রা গড়ে প্রায় $-১৫০^\circ$ সেন্টিগ্রেড পেয়েছেন।

শনিগ্রহকে যে বলয়ে বেষ্টিত দেখা যায়, সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি অখণ্ড অবয়ব নয়, বহুসংখ্যক প্রদক্ষিণশীল প্রস্তরশিলা ও ধূলিরাশির সমষ্টি। গ্রহদিগের মধ্যে কেবল শনিগ্রহই এই প্রকার ধূলিপ্রস্তরময় বলয়বেষ্টিত, কেন তা এখনও জ্যোতিষের এক অমীমাংসিত সমস্যা।

শনির ঘনত্ব মাত্র ০.৭১৫; অর্থাৎ পৃথিবীর ঘনত্বের প্রায় এক সপ্তমাংশ। ঘনত্বের এই ন্যূনতা হেতু বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, তার অন্তরীক্ষে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম মুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

ইউরানাসের ঘনত্ব জলের ১.২৭ গুণ। এটি আর একটি বিরাট হিমাবৃত গ্রহ। এর শীতলতা শনি অপেক্ষাও অধিক, প্রায় $-১৮০^\circ$ সেন্টিগ্রেড। ইউরানাসের বায়ুমণ্ডল থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস জমাট বেঁধে গ্রহপৃষ্ঠে থিতিয়ে পড়েছে।

নেপ্চুন প্রায় ইউরানাসের সমপর্যায়ের। তার ঘনত্ব ১.৬ এবং তাপমাত্রা $-২০^\circ$ ডিগ্রীরও কম। নেপ্চুনের এই শৈত্যে আলেয়া গ্যাস নিশ্চয়ই জমাট বাঁধবার উপক্রম করছে। স্লিফার (Slipher) এবং অ্যাডেল-(Adel)-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে নেপ্চুনে প্রায় পঁচিশ মাইল অ্যাট্মস্ফিয়ার মিথেন আছে।

নেপ্চুন গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে জ্যোতিষীগণ তারও চেয়ে দূরবর্তী স্থানে অন্য গ্রহের অস্তিত্ব বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করছিলেন। ডক্টর পার্সিভাল লাওয়েল এ সম্পর্কে বহু হিসাবনিকাশ ক'রে নেপ্চুন ও ইউরানাসের গতিবৈষম্য দৃষ্টে সুদূরবর্তী নবম গ্রহটির অস্তিত্বের সম্ভাবনা ঘোষিত করেন। তাঁর মৃত্যুর বারো বৎসর পরে ১৯৩০ অব্দে প্লুটো আবিষ্কৃত হয়। অধ্যাপক ডবলু. এইচ.

পিকারিংও প্লুটো আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব থেকে তার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ ছিলেন। প্লুটোর বিষয়ে এখনও নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা চলে না; কারণ তার আয়তন ও ওজন বিষয়ে অনেক কথা অজানা রয়েছে। মার্কিন জ্যোতিষী এইচ. এন. রাসেল বলেন যে, খ্রীষ্টীয় ১৯৬৫ অব্দে নেপ্‌চুন ও প্লুটোর মধ্যে বর্তমান অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা হবে, তখন তাদের পরস্পরের উপর প্রভাব দৃষ্টে প্লুটোর ওজন ভালভাবে জানবার সুযোগ ঘটবে। এখনকার হিসাব অনুসারে প্লুটো পৃথিবীরই ন্যায় একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। সার্ জেম্‌স জীন্‌স মনে করেন, প্লুটোর উপর তরল বায়ুর (liquid air) সমুদ্র রয়েছে; সেই শীতল বায়ু-সমুদ্র আলোক-প্রতিফলনের দর্পণসদৃশ। প্লুটোস্থিত তরল বায়ুর সমুদ্র-দর্পণে সূর্যের যে ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ছে এক্ষণে জ্যোতিষীরা হয়তো তাকেই প্লুটো ব'লে ভাবছেন। জীন্‌সের এই সিদ্ধান্ত সত্য হ'লে প্লুটো পৃথিবী অপেক্ষা নিশ্চয়ই বড় হবে এবং নেপ্‌চুন ও ইউরানাসের গতিবিধির উপর তার প্রভাব পৃথিবীর জ্যোতিষীগণের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না।

গ্রহিকাদের কথা বাদ দিলে বুধ সৌরজগতের গ্রহসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। বুধগ্রহ সূর্যের খুব নিকটে রয়েছে, তা সত্ত্বেও প্রাচীনগণ যে তার অস্তিত্ব জ্ঞাত হয়েছিলেন এইটাই আশ্চর্য। বুধ নিজ কক্ষপথে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু তার আহ্নিক গতি নেই। খুব সম্ভব এই গ্রহটি একেবারে বায়ুশূন্য। তার এক পৃষ্ঠে সূর্যের প্রখর তেজপ্লাবিত অবিরাম দিবা, এবং অপর পৃষ্ঠে গহন-আঁধারে-ঢাকা চিরস্থায়ী রাত্রি বিরাজ করছে। বুধের উপরিভাগের তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ৩৫০ ডিগ্রী; এই প্রকার উষ্ণতায় সীসকধাতু গলন্ত অবস্থা লাভ করে। যে পরিমাণ আলো সূর্য থেকে বুধগ্রহে গিয়ে পৌঁছয়, তার খুব সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়ে থাকে; এজন্য বুধের ভূমিভাগ অসমতল ব'লে অনুমিত হয়।

পৃথিবী থেকে লক্ষ্য করলে সূর্য-চন্দ্রের পরে শুকতারাকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু শুকতারা তারকা নহে,—শুক্রগ্রহ। রবির নিকট ধার-করা দীপ্তিতেই তার গৌরব। সন্ধ্যা ও ভোরের আকাশের শোভাস্বরূপ এই সুন্দর গ্রহটি যখন পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে আসে, তখন তার দূরত্ব হয় মাত্র দু কোটি ষাট লক্ষ মাইল। এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমরা বোধ হয় বুধের ভূমি অপেক্ষা শুক্রের ক্ষেত্রের সংবাদ বিষয়ে বেশি অজ্ঞ। শুক্রগ্রহের অন্তরীক্ষ অতি নিবিড় বায়বীয় আবরণে আবৃত। এই কারণে শুক্রগ্রহকে এত উজ্জ্বল দেখায়। হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছে যে, এই গ্রহের আলোক-প্রতিফলন-ক্ষমতা চোখ-ঝলসানো সাদা মেঘের তুল্য।

জ্যোতিষীগণ প্রায় তিন শত বৎসরকাল শুক্রকে দূরবীক্ষণ সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ক'রেও তার ঘূর্ণন-কাল নির্ণয় করতে পারেন নি। ইতালীয় জ্যোতিষী শিয়াপারেলী (Schiaparelli) শুক্রের অর্ধেক গোলার্ধ বুধগ্রহের ন্যায় সর্বদা সূর্যের দিকে ফিরে আছে বলেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যাপক পিকারিং বলেছেন, শুক্রগ্রহ পৃথিবীরই মত নিজ অক্ষদণ্ডে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় সূর্যপ্রদক্ষিণ করছে; তার এক অহোরাত্র প্রায় ৬৮ ঘণ্টার সমান। তবে তাঁর এই উক্তি খুব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, এমন বলা চলে না।

শুক্র যখন সূর্যাপেক্ষা পৃথিবীর নিকট আসে, তখন তার চন্দ্রকলার ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়; যে কারণে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেই কারণে শুক্রকলারও পরিবর্তন ঘটে। শুক্রগ্রহ সূর্য ও পৃথিবীর সহিত প্রায় এক সরল রেখায় পৌঁছিলে শুক্রের কলা সরু ফালির আকার ধারণ করে এবং তার

শৃঙ্গদ্বয় সচরাচর পরিদৃষ্ট আকৃতি অপেক্ষা বর্ধিত দেখায়। তৎকালে শুক্রের কলা বৃত্তের প্রান্তভাগের প্রায় তিন চতুর্থাংশ আবৃত করে। এমন কি, কোন কোন সময়ে বৃত্তের সমগ্র প্রান্তদেশ অঙ্গুরিসদৃশ আকারে আলোকিত হয়ে ওঠে; কেবল মধ্যভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। সূর্য থেকে শুক্র যখন মাত্র এক ডিগ্রীর মধ্যে থাকে, তখনই এই অদ্ভুত ঘটনা লক্ষিত হয়; পূর্বকালের বহু বিখ্যাত জ্যোতিষী এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; বর্তমান শতকের শেষভাগে পুনরায় এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হবে।

শুক্রের পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে সূর্যালোক প'ড়ে তার বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত আলোকিত করায় অন্ধকার প্রদেশের আড়াল থেকে প্রদোষের যে অস্পষ্ট আলো (twilight) দেখা যায়, শুক্রকলার শৃঙ্গদ্বয়ের বিস্তার ও অঙ্গুরীয় আকারপ্রাপ্তি তারই জন্য হয়ে থাকে। শুক্রে যে বায়ুমণ্ডল আছে, এই ঘটনাটি তার একটি মুখ্য প্রমাণ। আল্‌ট্রাভায়লেট রশ্মি সাহায্যে ফোটো তুললে শুক্রের যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে বহু অদ্ভুত দাগ দেখা যায়; এক দিবসের সন্ধ্যায় তোলা শুক্রের এই প্রকার আলোক-চিত্রের সহিত অপর কোনও সন্ধ্যায় গৃহীত আলোকচিত্রের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য দেখলে শুক্রে মেঘ আছে মনে হয়।

পূর্বতন পর্যবেক্ষকগণ শুক্রগ্রহে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প আছে ব'লে অনুমান করেছিলেন। ১৮৯৪ অব্দে ক্যাম্প্‌বেল বিস্তারিত গবেষণার ফলে এই মন্তব্যে উপনীত হন যে, গ্রহটির পরিলক্ষণ-যোগ্য স্থানসমূহে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব পার্থিব অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের এক-চতুর্থাংশের অধিক হবে না। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে বর্তমানে অ্যাডেল এবং স্লিফার এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শুক্রের দৃশ্য ভূম্যংশের উপর অন্ততপক্ষে দুই মাইল অ্যাট্‌মস্ফিয়ার কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড আছে। শুক্রগ্রহের জমির ওপরেও সম্ভবত কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইডের কতক অংশ মিশে আছে; কাজেই সেদিক থেকে গণনা করতে গেলে শুক্রে কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইডের পরিমাণ আরও বেশি হয়। শুক্রের তুলনায় পৃথিবীতে কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইডের পরিমাণ খুব অল্প; পৃথিবীর সমগ্র বায়ুমণ্ডল পাঁচ মাইল অ্যাট্‌মস্ফিয়ারের সমান, তন্মধ্যে অক্সিজেন মাত্র ১$\frac{1}{8}$ মাইল অ্যাট্‌মস্ফিয়ার। প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে সমস্ত পার্থিব কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইড জমা করলে ত্রিশ ফিটের অধিক উচ্চ হবে না। হ্বিল্‌ট মন্তব্য করেছেন যে, শুক্রের বায়ুমণ্ডলস্থিত কার্বন্‌ডায়ক্‌সাইডের আবরণী গ্রহটির তাপ সংরক্ষণ-কার্যে বিশেষ সহায়তা করছে এবং তদুপরি তীব্র সৌরকর বর্ষিত হওয়ায় তার ভূমির তাপমাত্রা এক শত সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী অথবা তারও অধিক। এইরূপ উষ্ণতা হ'লে সেখানে জীবের আবির্ভাব না হওয়ারই সম্ভাবনা।

আকার ওজন এবং ঘনত্বের দিক থেকে বিচার করলে শুক্রকে পৃথিবীর সহিত তুলনীয় মনে হয়। কাজেই অনেকে হয়তো সেখানে পার্থিব মহাসাগরের ন্যায় সমুদ্রের অস্তিত্ব আশা করতে পারেন। কিন্তু হ্বিল্‌ট বলেন, শুক্রের ভূমিতে জল নেই; তার জল খনিজ দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক সংযোগে hydrated minerals প্রস্তুত করেছে; কিন্তু কি ক'রে এ ঘটল তা বোঝা যায় না। শুক্রগ্রহে জীবের অস্তিত্ব না থাকার সম্ভাবনা অধিক হ'লেও এ কথা একেবারে নিঃসন্দেহে বলা চলে না যে, শুক্রে জীবের বসতি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কারণ, শুক্রগ্রহের মেঘাবরণ তার ভূমিকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রেখেছে। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রময় দিনের সঙ্গে মেঘলা দিনের উত্তাপে যে তফাৎ হয়, তা আমরা সহজেই অনুভব করি। কাজেই হয়তো এমনও সম্ভব হতে পারে, সূর্যের নিকটে থাকা হেতু শুক্রগ্রহের উত্তাপবৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল, স্থায়ী মেঘের ঘন আবরণ. তাকে অনেকাংশে প্রতিরোধ ক'রে জীবের আবাসযোগ্য করেছে। ক্রমশ

# বিপিনের সংসার

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ি ফিরিয়া বিপিন ভাইকে বলিল, যা, শুয়ে পড়্‌গে যা। বড্ড কষ্ট হয়েছে ঠায় সেই কাদার ওপর ব'সে থেকে। ঠাণ্ডা লাগাস নি আর।

বিপিনের মন কয়দিন যেমন হাল্কা ছিল, সর্ব্বদা যেমন কি এক ধরণের আনন্দে ভরপুর ছিল, আজ আর তেমন অনুভব করিল না। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল লাগিল না, সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া-সারিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিল।

পৈতৃক আমলের কুঠুরির মেঝেতে সিমেণ্ট চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে বহুকাল, জানালার কবাট আলগা, ছেঁড়া নেকড়া ও কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দিয়া উত্তরের জানালাটা আটকানো। জানালায় ঠেসানো আছে এক গাদা শাবল, কুড়ুল, গোটা দুই পুরনো হুঁকো, একটা পুরনো টিনের তোরঙ্গ, সেজন্য ওদিকের জানালা খোলাই যায় না।

ঘরে খাট নাই, যে কয়খানা খাট ছিল, পূর্ব্ববৎসর দারিদ্র্যের দায়ে বিপিন সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। মায়ের ঘরে একখানা মাত্র জাম কাঠের সেকেলে তক্তাপোষ ছিল, সম্প্রতি বলাইয়ের অসুখ বাড়িবার পর হইতে সেখানা বলাইয়ের জন্য দালানে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিপিন নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতিয়াই শোয় আজ তিন বৎসর।

এক দিকে মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করা, মনোরমা সেখানে খোকাখুকীকে লইয়া শোয়। ঘরের অন্য দিকে একখানা পুরনো তুলো-বার-হওয়া তোষক পাতিয়া বিপিনের জন্য বিছানা করা হইয়াছে। মশারি নাই, এতদিন অর্থাভাবে কেনা যায় নাই, চাকুরি হওয়ার পর হইতেও এমন কিছু বিপিন থোক টাকা কোনদিন হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, যাহা হইতে সংসার-খরচ চালাইয়া আবার মশারি কেনা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রি মশায় ছিঁড়িয়া খায় বলিয়া মনোরমা সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘুঁটের ও তুষের ধোঁয়ার সামাল দেয়, যেমন গোহালে দেওয়া হয় তেমনই। আজও দিয়াছিল, এখনও ঘুঁটের মালসা ঘরের মেঝেতে বসানো, অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

বিপিন সৌখিন মেজাজের লোক, ঘরে ঢুকিয়া ঘুঁটের মালসা দেখিয়াই চটিয়া গেল। অপর বিছানায় ভানু শুইয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মনোরমা ঘরে ঢুকিতেই বিরক্তির সুরে বলিল, এত রাত পর্য্যন্ত ঘুঁটের মালসা ঘরে? বলি এখানে মানুষ শোবে, না এটা গোয়াল? নিয়ে যাও সরিয়ে।

মনোরমা বলিল, তা কি করব বল। ও দিলে তবুও মশা একটু কমে, নইলে শোয়া যায়! একদিন ধোঁয়া না দিলে মশায় টেনে নিয়ে যায় যে! অন্য কি উপায় আছে, দেখিয়ে দাও না।

স্ত্রীর এই কথার মধ্যে তাহার মশারি কিনিবার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের অস্তিত্ব

অনুমান করিয়া বিপিন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, উপায় কি আছে, না আছে, এখন দেখবার সময় নয়। তুমি দয়া ক'রে মালসাটা সরিয়ে নিয়ে যাবে?

মনোরমা আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিবাদের হেতুভূত দ্রব্যটিকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সে একটা ব্যাপার আজ কয়েকদিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশপুরে চাকুরি হইবার পর হইতেই স্বামীর কেমন যেন রুক্ষ মেজাজ, আগে তাহার নানা রকম বদখেয়াল ছিল, নেশাভাঙ করিত; বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু মনোরমা যখন তিরস্কার করিত, তখন সে শুনিয়া যাইত, মৃদু প্রতিবাদ করিত, দোষক্ষালনের চেষ্টা করিত, কিন্তু রাগিত না, বরং ভয়ে ভয়ে থাকিত।

আজকাল হইয়াছে উল্টা। মনোরমা কিছু করিলেও দোষ, না করিলেও দোষ। বিপিন যেন তাহার সব কিছুতেই দোষ দেখে। সামান্য ছুতা ধরিয়া যা তা বলে। কেন যে এমন হইল, তাহা মনোরমা ভাবিয়া পায় না। মনোরমা আর এক বিপদে পড়িয়াছে।

বীণা-ঠাকুরঝি বয়সে তাহার অপেক্ষা দুই বছরের ছোট। বিধবা হওয়ার পরে এই সংসারেই আছে, শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ শ্বশুরবাড়িতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে, তাহাকে লইয়া যায়। উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়, এখন বছর একুশ-বাইশ বয়স। মনোরমার নিজের বয়স চব্বিশ।

সে কথা যাক।

এখন বিপদ হইয়াছে এই, আজ প্রায় ছয় সাত মাস ধরিয়া মনোরমা লক্ষ্য করিতেছে, গ্রামের তারক চাটুজ্জের ছেলে পটল যখন তখন ছুতা-নাতায় এ বাড়িতে যাতায়াত করে এবং বীণার সঙ্গে মেলামেশা করে।

ইহাতে মনোরমা প্রথমে কিছু মনে করে নাই, সে শহর-বাজারের মেয়ে, তাহার বাপের বাড়িতেও বিশেষ গোঁড়ামি নাই ও বিষয়ে। ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে মিশিলেই যে খারাপ হইয়া যাইবে, সে বিশ্বাস তাহার জ্যাঠামশায়ের নাই সে জানে। মনোরমা বাবাকে দেখে নাই, জ্যাঠামশায়ই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু এ ঠিক সে রকমের নয়।

সন্দেহ একদিনে হয় নাই। একটু একটু করিয়া বহুদিনে হইয়াছে।

বিবাহ হইবার পরে এ বাড়িতে আসিয়া মনোরমা পটলকে এ বাড়িতে তত আসিতে দেখিত না, যত সে দেখিতেছে আজ প্রায় বছরখানেক। তাহার মধ্যে ছয় সাত মাস বড় বাড়াবাড়ি। বীণা-ঠাকুরঝিও আজকাল যেন পটল আসিলে কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠে। রাঁধিতে বসিয়াছে, হয়তো পটলের গলার স্বর শোনা গেল দালানে, শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এদিকে বীণা হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যে রান্নাঘর হইতে বাহির হয় নাই, কোনও না কোনও ছুতা খুঁজিয়া সে রান্নাঘর হইতে বাহির হইবেই। দালানে যাইয়া পটলের সঙ্গে খানিকটা কথা কহিয়া আসিবেই। এ মাত্র একটা উদাহরণ, এ রকম অনেক আছে।

ইহাও না হয় মনোরমা না ধরিল।

একদিন সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়াইয়া সে দুইজনকে চুপি চুপি কি কথাবার্তা

বলিতে দেখিয়াছে। শাশুড়ী সন্ধ্যার পর ভাল চোখে দেখেন না, নিজের ঘরে খিল দিয়া জপ-আহ্নিক করেন ঘণ্টাখানেক কি তাহারও বেশি, সে নিজেও এই সময়টা ছেলেমেয়ের তদারক করিতে, রাত্রের রান্নার যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকে, আর ঠিক কিনা সেই সময়েই আসিবে ওই পোড়ারমুখো পটল চাটুজ্জে!

বীণা-ঠাকুরঝিও যেন লুকাইয়া দেখা করিতে আগ্রহ দেখায়, ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। অথচ পটলের বয়স ত্রিশ বত্রিশ কি তারও বেশি; পটল বিবাহিত, তার ছেলেমেয়ে চার পাঁচটি। তাহার কেন এত ঘন ঘন যাওয়া-আসা এখানে, একজন অল্পবয়সী বিধবার সঙ্গে এত কথাবার্ত্তাই বা তাহার কিসের? বিশেষ যখন বাড়িতে কোন পুরুষমানুষ আজকাল থাকে না, বলাই তো এতদিন হাসপাতালেই ছিল, শাশুড়ী চোখে দেখেন না, তাঁহার থাকা না থাকা দুই সমান।

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে এ কথা কহিয়া কোন লাভ নাই। মেয়েমানুষের মন দিয়া মনোরমা তাহা বুঝিয়াছে। বীণা কথাটা উড়াইয়া দিবে, অস্বীকার করিবে, পরে রাগ করিবে, ঝগড়া করিবে।

শাশুড়ীকে বলিয়াও কোন লাভ নাই। তিনি অত্যন্ত সরল, কিছু বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষ করিয়া তিনি নিপাট ভালমানুষ, তাঁহার কথা ঠাকুরঝি শুনিবেও না। বরং বউদিদির কথা শুনিলেও শুনিতে পারে, কিন্তু মার কথা সে গায়ে মাখিবে না।

অতিরিক্ত আদর দিয়া শাশুড়ী বীণা-ঠাকুরঝির মাথাটি খাইয়াছেন।

মনোরমার ইচ্ছা ছিল বিপিনকে কথাটা বলিবার। কিন্তু স্বামীর মেজাজ আজকাল যেন সর্ব্বদাই চটা, এ কথা বলিলে যদি আরও চটিয়া যায়, মনোরমাকেই গালাগালি করে, এজন্য তাহার ভয় করে কথাটা পাড়িতে।

মনোরমা সংসারী ধরণের মেয়ে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ সংসারে পড়িয়া থাকে। জ্যাঠামশায় যখন তাহার বিবাহ দেন এ বাড়িতে, তখন ইহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। শ্বশুর চোখ বুজিতেই সব গেল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিবার বয়স তখন হয় নাই মনোরমার। স্বামী বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়া এমন অবস্থা করিল সংসারের যে, অমন দুর্দ্দশার অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়ে মনোরমার। তাহার জ্যাঠামশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, জাঠতুতো ভাইয়েরা কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার। জ্যাঠামশায় যখন বারাসতের মুন্সেফ তখন এখানে তাহার বিবাহ দেন। সে শুধু বিনোদ চাটুজ্জের নামডাকের জোরে। তখন ভাবিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের সচ্ছল গৃহস্থের ঘর, ভাইঝি সুখেই থাকিবে। মনোরমার গায়ে গহনা কম দেন নাই জ্যাঠামশায় বিবাহের সময়, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই, দুইগাছা রুলি ছাড়া। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া মনোরমা বাপের বাড়ি যাওয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। এত করিয়াও স্বামীর মন পাইবার জো নাই। সবই তাহার অদৃষ্ট।

শাশুড়ীর বাতের বেদনা আছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে শাশুড়ীর ঘরে তাপ-সেক করিতে লাগিল। বিপিনের মা পুত্রবধূকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মনোরমা যে ভাবে শাশুড়ীর সেবা করে, বীণার নিকট হইতেও তিনি তাহা পান না; যদিও এ কথা বলা চলে না যে, বীণা মায়ের সম্বন্ধে উদাসীন। বীণা নিজের ধরণে মায়ের যত্ন করে। সে সংসার তেমন করিয়া কখনও করে নাই, অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, ছেলেপুলে নাই; মনেপ্রাণে সে যেন এখনও অবিবাহিতা বালিকা। তাহার

ধরণধারণ বালিকার মতই, গোছালো-গাছালো সংসারী ধরণের মেয়ে সে কোনও কালেই নয়, হইবেও না। মেয়ের উপর বিপিনের মায়ের অত্যন্ত দরদ—ছোট্ট মেয়ের উপর মায়ের যেমন স্নেহ থাকে তেমনই। বিপিনের মা বোঝেন, বীণার জীবনের শূন্যস্থান তিনি কোন কিছু দিয়াই পুরাইতে পারিবেন না; এখনও সে ছেলেমানুষ, ঠিকমত হয়তো বোঝে না তাহার কি হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স বাড়িবে, মা চলিয়া যাইবে, মুখের দিকে চাহিবার কেহ থাকিবে না, তখন সে নিজের স্বামী-পুত্রহীন জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিবে, তারপর যতদিন বাঁচিবে, সম্মুখে আশাহীন, আনন্দহীন, ধূ ধূ মরুভূমি। তাহার মধ্যবয়সের সে শূন্যতা পুরিবে কিসে? তবুও যে দুইদিন হতভাগী নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারে, সে দুইদিনই ভাল। তা ছাড়া কি সুখের মধ্যেই বা সে এখন আছে?

মা মধ্যে মধ্যে তাহাও ভাবেন।

বীণা শ্বশুরবাড়ি হইতে আনিয়াছিল খানকতক সোনার গহনা ও নগদ দেড় শো টাকা। বিপিন ব্যবসা করিবে বলিয়া বোনের টাকাগুলি চাহিয়া লইল, অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু টাকা বাকি পড়িয়া ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান ডুবিয়া গেল। বীণার টাকাগুলিও ডুবিল সেই সঙ্গে।

ইহার পরও বীণার দুইখানা গহনা বিপিন চাহিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বলাইকে লাঙল গরু কিনিয়া দিয়াছিল চাষবাসের জন্য। তখন সংসারের ভয়ানক দুরবস্থা যাইতেছিল, সকলে পরামর্শ দিল, জমি এখনও যাহা আছে, নিজেরা লাঙল রাখিয়া চাষ করিলে ভাতের ভাবনা হইবে না। বলাইও ধরিল, দাদা আমাকে লাঙল গরু ক'রে দাও, সংসারের ভার আমি নিচ্ছি।

বিপিন স্ত্রীকে বলিল, ওগো, শোন একটা কথা। বীণাকে বল না ওর হারগাছটা দিতে। আমি এখন বেচে বলাইকে গরু কিনে দিই, তারপর বীণাকে আবার গড়িয়ে দোব।

মনোরমা বলিল, তুমি বেশ মজার মানুষ তো! একবার ওর দেড় শো টাকা নিলে আর উপুড় হাত করলে না, আবার চাইছ গলার হার! ওর ওই সামান্য ব্যাঙের আধুলি পুঁজি, শেষে ওকে কি পথে দাঁড় করাবে? আমি ও কথা বলতে পারব না।

অগত্যা বিপিনই গিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—তোর কোনও ভাবনা নেই আমি যতদিন আছি। বলাইকে লাঙল গরু কিনে দিই ওই হারগাছটা বেচে, তারপর তোকে গড়িয়ে দোব এর পরে। তোর আগের টাকাও আস্তে আস্তে শোধ দোব। কিছু ভাবিস নি তুই।

বীণা বলিল, আমার আবার ভাবাভাবি কি, হার দরকার হয় নাও না, তবে ব'লে দিচ্ছি, বাবার আমলে যেমন গোলা ছিল, অমনই গোলা তুলতে হবে কিন্তু বাইরের উঠোনে। গোলা চ'লে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। আর আমি, বউদি, মা, তুমি, বলাই—সবাই মিলে নৌকো ক'রে একদিন কালীতলায় বেড়াতে যাব। কেমন তো?

দিনকতক চাষবাস চলিয়াছিল ভাল। বলাই নিজে দেখিত শুনিত, গরুর গাড়ি নিজে হাঁকাইত। হঠাৎ বলাইয়ের অসুখ হইয়া সে সব গেল। চিকিৎসার জন্য গরু-জোড়া বিক্রয় করিতে হইল। সুতরাং বীণার হারছড়াটাও গেল।

তারপর এই দুর্দশার সংসারে বীণা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া

পরে, রাত্রে এক মুঠা চালভাজা চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়। ছেলেমানুষ একটা সাধ নাই, আহ্লাদ নাই, মা হইয়া তিনি সবই তো দেখিতেছেন।

বীণা টাকা বা গহনার জন্য কখনও দাদাকে কিছু বলে নাই, তেমন মেয়ে সে নয়। এখনও গাছকতক চুড়ি অবশিষ্ট আছে, দাদা চাহিলে সে দিতে আপত্তি করিত না, কিন্তু বিপিন লজ্জায় পড়িয়াই বোধ হয় চাহিতে পারে নাই।

বীণার কি হইবে ভাবিয়া তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি নিজের ঘরে নিজের বিছানায় বীণাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকেন। বীণা যে এখনও কত ছেলেমানুষ আছে, ইহা তিনি ভিন্ন আর কে বোঝে? স্বামীর ঘর কয়দিন করিয়াছিল সে? তখন তাহার বয়সই বা কত?

এক এক দিন তিনি একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত শুনিতে চান। নিজে চোখে আজকাল তেমন দেখিতে পান না রাত্রে, মনোরমা যদি অবসর পায়, সেই আসিয়া পড়িয়া শোনায়, নয় তো বীণাকে বলেন, বউমা আজ ব্যস্ত আছে, একটুখানি বই পড় তো বীণা।

বীণা একটু অনিচ্ছার সহিত বই লইয়া বসে। সে পড়িতে পারে ভালই, কিন্তু পড়িয়া শুনাইতে তাহার ভাল লাগে না। মনে মনে নিজে পড়িতে ভালবাসে। আধ ঘণ্টাটাক পড়িয়া শুনাইবার পরে বই হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করিয়া বলে, আজ থাক মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আজকাল, বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্য্যন্ত, রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য। আগে এমন একদিনও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে, আটা ময়দা কিনিবার পয়সা তো দূরের কথা, বাড়তি এক মুঠো চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এ বন্দোবস্ত করিয়াছে, একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়ী রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমা তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্ট পায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ হইয়া মুস্কিল বাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয় রাত্রে। অথচ বেশি করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায়, তাহাতে সব দিকে সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর। বেশি পয়সা চাহিলেও বিপিন দিতে পারে না।

মনোরমা যে ভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাকুক, মনোরমার সে দিকে অত্যন্ত নজর। পটলের সহিত বীণার মেলামেশা ঠিক এই কারণেই তাহার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। কি হইতে কি হইবে, সংসারটি ওলটপালট হইয়া যাইবে মাঝে পড়িয়া, এসব পাড়াগাঁয়ে একটুখানি কোন কথা লোকের কানে গেলে টি টি পড়িয়া যাইবে, সে তাহা খুব ভালই বোঝে। এখন কি করা যায়, তাহাই হইয়া উঠিয়াছে মনোরমার মস্ত সমস্যা। আজ সাহস করিয়া মনোরমা কথাটা বিপিনের কাছে পাড়িবে ভাবিয়া বলিল, শোন, একটা কথা বলি।

বিপিনের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তির সুরে বলিল, কি কথা?

মনোরমা ভয় পাইল। বিপিনের মেজাজ সে খুব ভালই বোঝে। আজ এইমাত্র সন্ধ্যাবেলা

তো আগুনের মালসা লইয়া একপালা হইয়া গিয়াছে, থাকগে, কাল কি পরশু কি আর একদিন—, এত তাড়াতাড়ি কথাটা স্বামীকে শুনাইবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। আজ অন্তত দরকার নাই।

কিন্তু পরদিনই একটা ঘটনায় মনোরমার সন্দেহ বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, ছাদে একখানা কাঁথা রোদে দিয়াছিল, তুলিতে ভুলিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়ে সিঁড়ির পাশের ঘুলঘুলি দিয়া দেখিল, বাড়ির পাশে কাঁঠালতলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। চোখের ভুল ভাবিয়া সে সরাসরি উপরে উঠিয়া গেল এবং ছাদের আলিসা হইতে কাঁথাখানা লইয়া যখন নীচে নামিতেছে, তখন মনে হইল, চিলে কোঠার আড়ালে যেন কিসের শব্দ হইল। মনোরমা ঘুরিয়া গিয়া দেখিল, চিলে কোঠার আড়ালে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বীণা, এবং যেন নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া আছে। বউদিদির পায়ের শব্দে বীণা চমকিয়া পিছন দিকে চাহিল। মনোরমা বলিল, বীণা-ঠাকুরঝি, এখানে দাঁড়িয়ে একলাটি ?

বীণা নীরস স্বরে বলিল, হ্যাঁ, এমনই দাঁড়িয়ে আছি।

এস নীচে নেমে। অন্ধকার সিঁড়ি, এর পর নামতে পারবে না।

—খুব পারব। তুমি যাও, বড্ড অন্ধকার এখনও হয় নি। যাচ্ছি আমি।

মনোরমা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ঘুলঘুলি দিয়া কি জানি কেন একবার চাহিয়া দেখিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে পড়িল, বাড়ির বাহিরের দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কে একজন আসশেওড়ার ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

মনোরমার ভয় হইল। চোর বা কোন বদমাইস লোক নিশ্চয়ই। সে কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোরমা দেখিল, সে পটল চাটুজ্জে। পটল টের পায় নাই যে মনোরমা ঘুলঘুলি দিয়া চাহিয়া আছে, সে ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া একবার হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, চললাম আজ, সন্ধ্যে হয়ে গেল। কাল যেন দেখা পাই, কথা আছে।

মনোরমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ সব কি কাণ্ড! পটল চাটুজ্জের এ রকম লুকাইয়া দেখা করিবার হেতু কি ? সন্ধ্যার অন্ধকারে মশার কামড়ের মধ্যে শেওড়াবনে গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা বলিবার কোন কারণ নাই, যখন সে সোজা বাড়ির মধ্যে আসিয়া প্রকাশ্য-ভাবেই বীণার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে, তাহাকে তো কেউ বাড়ি ঢুকিতে নিষেধ করে নাই!

সেই রাত্রেই মনোরমা বিপিনকে কথাটা বলিবে ঠিক করিল। কিন্তু হঠাৎ রাত দশটার সময় বলাইয়ের অসুখ বড় বাড়িল। ঠিক যখন সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে যাইবে, সেই সময়। বলাই রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল আর কেবলই বলিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেল দাদা! সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেল, ও মা! পাড়ার প্রবীণ লোক গোবর্দ্ধন চাটুজ্জে আসিলেন। পাশের বিপিনদের জ্ঞাতি ও সরিক ধনপতি চাটুজ্জে আসিলেন। পাড়ার ছেলেছোকরা এবং মেয়েরা কেহ কেহ আসিল। প্রকৃত সাহায্য পাওয়া গেল গোবর্দ্ধন চাটুজ্জের কাছে। তিনি পুরনো তেঁতুলের সঙ্গে কি একটা মিশাইয়া বলাইয়ের সারা গায়ে লেপিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতেই দেখা গেল,

যন্ত্রণার কিছু উপশম ঘটিল। সারারাত বিপিনের মা রোগীর বিছানায় বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন। বীণা রাত একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া রোগীর কাছে বসিয়া ছিল, তাহার মায়ের বারবার অনুরোধে অবশেষে সে শুইতে গেল।

মনোরমা প্রথমটা এ ঘরে বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মায়ের কাছছাড়া হইলেই রাত্রে কাঁদে, বিশেষ করিয়া ভানুটা। বিপিনের মা বলিলেন, বউমা, তুমি ছেলেদের নিয়ে শোও গে, তবুও ওরা একটু চুপ ক'রে থাক। সবাই মিলে চেঁচালে বাড়িতে তিষ্ঠুনো যাবে না। তুমি উঠে যাও।

বিপিন একবার করিয়া একটু শোয়, আবার একটু রোগীর কাছে বসে; এই ভাবে রাত কাটিয়া গেল।

দিন দুই পরে বলাই একটু সুস্থ হইলে বিপিন বাড়ি হইতে রওনা হইয়া পলাশপুরে আসিল। জমিদার অনাদিবাবু বেশ বিরক্ত হইয়াছেন মনে হইল; কারণ প্রায় পনরো দিন কামাই হইয়া গিয়াছে বিপিনের। বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি বিপিনকে জমিদারি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রজাদের নিকট হইতে কিস্তিখেলাপী সুদ আদায় কি ভাবে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বলিলেন, নালিশ মামলা করতে পিছুলে চলবে না। এবার গিয়ে কয়েক নম্বর মামলা রুজু ক'রে দাও, দেখি টাকা আদায় হয় কি না।

বিপিন বলিল, নালিশ করতে গেলেই তো টাকার দরকার। এখন মহলের যেমন অবস্থা, তাতে আপনাদের খরচের টাকাই দিয়ে উঠতে পারি না, তার ওপর মামলার টাকা—

অনাদিবাবু কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। বলিলেন, তা বললে জমিদারির কাজ চলে না। টাকা যেখান থেকে পাবে যোগাড় করবে। তোমাকে তবে গোমস্তা রেখেছি কি মুখ দেখতে? সে সব আমি জানি না। টাকা চাই।

বিপিনও বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে। সে কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নয়; বলিল, আজ্ঞে, আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ওভাবে টাকা আদায় আমায় দিয়ে হবে না। এতে যদি আপনার অসুবিধে হয়, তা হ'লে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ভাবিল, এই সংসারের দুরবস্থায়, বলাইয়ের অসুখের সময়, এ কি কাজ করিল সে? ইহার ফলে এখনই চাকুরি যাইবে।

অনাদিবাবু কিন্তু তখনই তেমন কোন কথা বলিলেন না। নিঃশব্দে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিপিন সেখানে বসিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রাগটা কাটিয়া গিয়া তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইল। অনাদিবাবুর মুখে মুখে অমনতর জবাব দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। চাকুরি গেলে বাড়ি গিয়া খাইবে কি? তবে ইহাও ঠিক, সে সুর নরম করিয়া ছোট হইতে পারিবে না, ইহাতে চাকুরি যায় আর থাকে। এদিকে আর এক মুস্কিল। বেলা এগারোটা বাজে। স্নান-আহারের সময় উপস্থিত। যাহাদের চাকুরি একরূপ ছাড়িয়াই দিল এখনই, তাহাদের বাড়ি আহারাদি করিবেই বা কি করিয়া? না, তাহা আর চলে না।

খাওয়ায় দরকার নাই। এখনই সে রাণাঘাট হইয়া বাড়ি চলিয়া যাইবে। বাহিরে বসিয়া থাকিলে অনাদিবাবু ভাবিতে পারেন যে, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

বিপিন উঠিয়া পড়িল। যাইবার আগে একবার মানীর সঙ্গে দেখা হইলে ভাল হইত, কিন্তু সে বাড়ির মধ্যে যাইবে কি করিয়া? থাক, দরকার নাই। এখান হইতে যখন চলিয়াই যাইতেছে, তখন আর দেখা করিয়াই বা কি হইবে?

নিজের ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া বিপিন বৈঠকখানা-ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। অল্পদূর গিয়া পথের মোড় ঘুরিতেই হঠাৎ অনাদিবাবুদের খিড়কি-দোর হইতে যে ছোট পথটা আসিয়া এই পথের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই পথের মাথায় গাবগাছটার তলায় মানীকে তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল।

মানীদের খিড়কি-দোর খোলা। এইমাত্র সে যেন দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বিপিন কিছু বলিবার আগেই মানী বলিল, কোথায় যাচ্ছ বিপিনদা?

তারপর আগাইয়া আসিয়া বিপিনের সামনে দাঁড়াইয়া আদেশের সুরে বলিল, যাও, গিয়ে বৈঠকখানায় ব'স। আমি তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেলা হয়েছে বারোটা। নাওয়া-খাওয়া করতে হবে, না কতক্ষণ হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে লোকে?

প্রায় পনরো দিন পরে মানীর সঙ্গে এই প্রথম দেখা। মানীর কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি যোগাইল না তাহার। সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না, শুধু চুপ করিয়া মানীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মানী বলিল, আবার দাঁড়িয়ে কেন, বেলা হয় নি?

এতক্ষণে বিপিন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল। অপ্রতিভের সুরে আমতা আমতা করিয়া বলিল, কিন্তু—আমি গিয়ে—বাড়ি যাচ্ছি যে।

মানী পূর্ব্ববৎ সুরেই বলিল, তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে খুনোখুনি হব এই দুপুরবেলা বিপিনদা? জ্ঞান বুদ্ধি আর কবে হবে তোমার? যাও ফিরে বৈঠকখানায়।

বিপিন অবাক হইল মানীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া। কতটা টান থাকিলে মেয়েরা এমন জোরের সঙ্গে কথা বলিতে পারে, বিপিনের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সে দেখিল, খিড়কি-দোরের দিকের প্রকাশ্য পথের উপর দাঁড়াইয়া মানীর সঙ্গে বেশি কিছু কথাবার্ত্তা বলা উচিত হইবে না এই সব পল্লীগ্রাম জায়গায়। দ্বিরুক্তি না করিয়া সে ব্যাগ হাতে আবার আসিয়া অনাদিবাবুদের বৈঠকখানায় উঠিল।

বৈঠকখানায় কেহই নাই। অনাদিবাবু সম্ভবত বাড়ির মধ্যে স্নান করিতেছেন। সে যে বৈঠকখানা হইতে ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইহা মানী কি করিয়া জানিল বিপিন ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরে চাকর এক বাটি তেল ও একখানা গামছা আনিয়া বলিল, নায়েববাবু, নেয়ে নিন, মা ব'লে দিলেন।

বিপিন বলিল, কে তোকে তেল আনতে বললে?

—মা বললেন, নায়েববাবুর জন্যে তেল দিয়ে আয় বাইরে। দিদিমণি গিয়ে রান্নাঘরে মাকে বললেন, আপনি বাইরে ব'সে আছেন, তেল পাঠিয়ে দিতে। আমি মাছ কুটছেলাম, আমায় বললেন, দিয়ে আয়। আপনি যে কখন এয়েলেন, তা দেখি নি কিনা তাই জানি নে, নইলে আমি নিজেই তেল দিয়ে যাতাম। নায়েববাবু কি আজ আলেন? ভাল তো সব বাড়ির?

এই একমাত্র চাকর জমিদার-বাড়ির, সে তো তাহার যাতায়াতের কোন খবরই রাখে না, তবে মানী কি করিয়া জানিল, সে ব্যাগ হাতে চলিয়া যাইতেছে এবং রাগ করিয়াই যাইতেছে?

খাইবার সময় মানীর আঁচলের ডগাও দেখা গেল না কোন দিকে, কারণ রান্নাঘরের বারান্দায় অনাদিবাবুর সঙ্গেই তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। অনাদিবাবু উপস্থিত থাকিলে মানী বিপিনের সামনে বড় একটা বাহির হয়না।

অনাদিবাবু খাইতে বসিয়া এমন ভাব দেখাইলেন যে, বিপিনের সঙ্গে তাঁহার যেন কোনও অপ্রীতিকর কথাবার্ত্তা হয় নাই। জমিদারি সংক্রান্ত কোন কথাই উঠাইলেন না।—বিপিনের দেশে মাছের দর আজকাল কি, ম্যালেরিয়া কমিয়াছে না বাড়িয়াছে, রাণাঘাটের বাজারে কাহার একখানা দোকান আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠাইয়া তাহাদের আলোচনার মধ্যেই আহার শেষ করিলেন।

রাণাঘাট হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বিপিনের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনাদিবাবু বেলা তিনটার আগে বৈঠকখানায় আসিবেন না, মধ্যাহ্নে উপরের ঘরে খানিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়া তাঁর অভ্যাস, বিপিন জানে; সুতরাং সে নিজেও এই অবসরে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল, শ্যামহরি, ও শ্যামহরি, বাবু নামবার আগে আমায় ডেকে দিস যদি ঘুমিয়ে পড়ি, বুঝলি? আর একটু তামাক সেজে নিয়ে আয়।

ক্রমশ

# চোর

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

গভীর রাত্রে ঘরে কিসের যেন আওয়াজ শুনিয়া অনন্তবাবু ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, আল্‌মারির কাছে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। অনেকটা ছায়ার মত দেখা যাইতেছে। অনন্তবাবু কহিলেন, কে ?

লোকটা কহিল, আজ্ঞে আমি চোর।

—চোর ? তা এত রাত্রে কেন ?

—আজ্ঞে, চোর তো সাধারণত রাত্রেই এসে থাকে। দিনে এলে ধরা পড়বার ভয় আছে কিনা।

—তা বটে। কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে ঘুট ঘুট ক'রে কি করছিলে বল তো ?

—তালাটা ভাঙবার কোন উপায় করা যায় কিনা তাই দেখছিলুম। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও চাবি পেলুম না।

—ওঃ। তা দেখ, চাবি সম্বন্ধে আমার বড্ড ভোলা মন। কখন কোথায় হারিয়ে ফেলি তার ঠিক থাকে না। এই ধর না গেল বছরের কথা। এক সাহেব ব্যাটার সঙ্গে দেখা করতে যাব। কোট প্যাণ্টালুন সব যে ট্রাঙ্কের ভেতরে ছিল, তার চাবি কোথাও রেখেছি, না ফেলে দিয়েছি স্রেফ কিচ্ছু মনে নেই। নেই তো নেই, অথচ সময় ব'য়ে যাচ্ছে হু হু ক'রে পাঞ্জাব মেলের মতন। কি অবস্থা আমার তখন, বুঝতেই তো পার।

চোর প্রশ্ন করিল, তারপর কি হ'ল ?

অনন্তবাবু কহিলেন, তারপর সময় পেরিয়ে গেল, চাবি পেলুম না। দেখা করতে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। দু তিন দিন বাদে বারান্দার এক কোণে চাবিটাকে কুড়িয়ে পাওয়া গেল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দেখলে তো কি ভোলা মন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার এক জ্যাঠামশায়েরও ঐ রকম ছিল। অবশ্য বাবা ছিলেন ঠিক তাঁর উল্টো। এ আল্‌মারির চাবিটা ?

—পাছে হারিয়ে ফেলি এই জন্যে মেজদা নিয়ে রেখে দিয়েছে। ঐ ওধারের ঘরে মেজদা শোয়। ডেকে দোব নাকি মেজদাকে ?

—না না, দরকার নেই। এত রাত্রের পাকা ঘুম ভাঙানো ভাল হবে না।

চোরের বুদ্ধি দেখিয়া খুশি হইয়া অনন্তবাবু কহিলেন, তা একরকম মন্দ বল নি হে। ঘুমের ব্যাপারে মেজদার মেজাজটা বরাবরই একটু তিরিক্ষি ধরণের। একবার তো কি একটা জরুরি কাজে রাত পৌনে এগারোটায় বাবা ঠেলে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন। মেজদা করেছে কি, 'ধুত্তোর' ব'লে তেড়ে উঠেই চড়াৎ ক'রে কষেছে এক চড়। তারপর চেয়েই দেখে বাবা। সে এক ভারী মজার ব্যাপার। অবশ্য মজার চেয়ে বাবা ব্যথাই পেয়েছিলেন বেশি। মেজদার হাতের আঙুলগুলো যা ভয়ানক কড়া! তবলা পাখোয়াজ খুব পেটে কিনা! বাজায় কিন্তু একেবারে ফেলনা নয়।

অনন্তবাবু আর একবার হাসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় চোর বলিল, আপনি বেশি জোরে হাসলে হয়তো আপনার মেজদারই ঘুম ভেঙে যাবে। তার চেয়ে আপনি বরং একটা লোহার শিক-টিক কিছু থাকলে দিন না। তালাটা ভাঙতে না পারা গেলেও আল্‌মারির একটা কড়া বরং ছুটিয়ে ফেলবার চেষ্টা দেখি।

—লোহার শিক-টিক তো এ ঘরে কিছু নেই হে। কিন্তু চোররা তো শুনি নানারকম যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়েই চুরি করতে বেরোয়। তোমার সঙ্গে কিছু নেই? কেমন চোর তুমি হে?

চোর কহিল, নতুন ব্যবসা সুরু করেছি বাবু। যন্ত্রপাতির এখনও যোগাড় হয়ে ওঠে নি। কাজেই যন্ত্রপাতি ছাড়াই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হ'ল।

—কিন্তু আমার ঘরে ঢুকলে কি ক'রে? এত রাত্রে?

—আজ্ঞে এত রাত্রে তো ঢুকি নি। সন্ধ্যাবেলায় একদল লোক যখন বন্যার চাঁদা চাইতে এসেছিল হার্‌মোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে, তখন সেই ভিড়ের মধ্যে আমিও ছিলুম। তারপর তারা চ'লে গেল, আমি এক ফাঁকে আপনার ঘরে ঢুকে প'ড়ে আপনার খাটের তলায় লুকিয়ে রইলুম।

—উঃ, তোমার সাহস তো কম নয়!

—আজ্ঞে পেটের দায়ে ওরকম সাহস আপনি এসে যায়। ও কিছু অবাক হবার কথা নয়।

—খাটের তলায় তা হ'লে অনেকক্ষণ ধ'রে তোমার মশার কামড় খেতে হয়েছিল তো?

—আজ্ঞে, তা হয়েছিল বটে। তারপর যখন দেখলুম, আপনার নাক দিব্বি ডাকতে সুরু করেছে, তখন বেরিয়ে পড়লুম খাটের তলা ছেড়ে। এত সহজে যে আপনার ঘুম ভেঙে যাবে, তা ভাবি নি। আপনার ঘুম খুব পাতলা বুঝি?

—ঘুম আমার খুব যে পাতলা তা নয়। বরং তুমি আওয়াজটা করছিলে একটু বিশ্রীরকম ভারী, চুরি করতে এসে অমন বিশ্রীরকম আওয়াজ করলে চলে? নেহাৎই আনাড়ী তুমি, যাই বল না কেন।

—প্রথম প্রথম একটু ওরকম হয়ে থাকে। তারপর ভাল রকম পেরাক্‌টিস হয়ে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে, দেখে নেবেন আপনি। আমার মেজকাকাকে আপনি তো চেনেন না—দিগম্বর ওঝা তাঁর নাম। যেমন নাম তেমনই কাজ বাবু। আপনার কানের গোড়ায় ব'সে সিন্দুক ভাঙলেও আপনি আওয়াজটুকু পাবেন না। এমনই হাত সাফাই।

—বল কি হে?

—সত্যি বাবু। এক বর্ণও যদি এর মিছে হয়, তা হ'লে লাগাবেন আমার গালে দু চড়। মেজকাকার নাম রাখতে এ জন্মে পেরে উঠব কি না ভগবান জানেন।

—তোমার হাত সাফাইয়ের নমুনা দেখে তো মনে হচ্ছে, পারবে না। ভাল কথা, তোমার নামটা কি হে?

—আজ্ঞে, আমার নাম পীতাম্বর। বাবা ডাকত পীতু পীতু ব'লে। সেই থেকে ঐ পীতু নামেই সবাই ডাকে।

অনন্তবাবু কহিলেন, তুমি এ ঘরে এসে বড় ভুল করেছ পীতু। আমি যে ঘরে থাকি, সে ঘরে তো দামী জিনিস এমন কিছু থাকে না যা চুরি করলে মেহনৎ পোষায়। অথবা এও বলতে পার যে, যে ঘরে তেমন দামী পদার্থ কিছু থাকে সে ঘরে আমি থাকি না। ভয় করে থাকতে। আমার আবার জিনিসপত্র নষ্ট করার ধাত কিনা। কখন যে কি নষ্ট ক'রে ফেলি তার কোন ঠিক নেই।

চোর কহিল, সেই জন্যেই বোধ হয় আপনার মেজদা এ আল্‌মারির চাবি নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

—তা একরকম মন্দ বল নি পীতু। কিন্তু আল্‌মারি না খুললে তো আর সেটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। তুমি আসবে আগে জানলে না হয় চাবিটা মেজদার কাছ থেকে রেখে দেওয়া যেত।

চোর দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কি করা যায় এইবার? এতক্ষণ খাটের তলায় মশার কামড় খাওয়া কি ব্যর্থই হইবে? এ কথা ভাবিয়া অনন্তবাবুরও লজ্জা করিতে লাগিল। বেচারা এত হাঙ্গামা করিয়া শেষকালে কি শুধু হাতে ফিরিয়া যাইবে? মনে করিবে কি লোকটা? ছি ছি! লজ্জায় অনন্তবাবুর সারাটা মন রাঙা হইয়া উঠিল।

নাঃ, মেজদার কাছ হইতে চাবিটা যে প্রকারে হউক আনিতেই হইবে। দেখিতেই হইবে, উহার ভিতরে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা, যাহা দিয়া চোর পীতাম্বরের পরিশ্রমকে সার্থক করানো যায়। চাবি আনার হাঙ্গামা কম নহে, তবু—

কিন্তু চাবি আনার হাঙ্গামা আবার অনর্থক না হয়। তাই আগে হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। বালিশের তলা হইতে ম্যাচ-বাক্স লইয়া চোরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া অনন্তবাবু কহিলেন, আল্‌মারিটার কড়া ধ'রে টানলেই দরজা ছুটোর মাঝখানে অনেকটা ফাঁক হবে। তারপর দেশলাই জ্বেলে দেখ তো, আল্‌মারির ভেতরে কি আছে। ভাল জিনিস থাকলে পর যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে 'খন।

পীতাম্বর তাহাই করিল এবং করিয়া হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, শুধু কতকগুলো বই আছে বাবু। এক গাদা বই। আর কিছু না।

অনন্তবাবু কহিলেন, তাই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে হে পীতাম্বর। ওগুলো সব মেজদার উপন্যাস 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'। মেজদা গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এক হাজার ছেপেছিল। এক কপিও বিক্রি হয় নি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

অনন্তবাবুর হাসির বহর দেখিয়া চোর পীতাম্বর ভীত হইয়া কহিল, অত জোরে হাসবেন না বাবু।

হাসির রেলগাড়িতে ব্রেক কষিতে কষিতে অনন্তবাবু কহিলেন, হাসব না, বল কি হে? না হেসে থাকে কার সাধ্যি? পই পই ক'রে মানা করলুম মেজদাকে ও বই ছাপতে. তা শুনলে না। তার ফল তো দেখলে নিজের চোখে? আজ বুঝলুম, মেজদা আল্‌মারিটাকে সব সময় তালা বন্ধ ক'রে রাখে কেন।

আল্‌মারির ভিতরের রহস্য ভেদ হইতেই চোর যেন নিরাশায় মুষড়াইয়া পড়িল। মনের যে বীণায় সুন্দর রাগিণী বাজিতেছিল, তাহার তার ছিঁড়িয়া সে রাগিণী সহসা থামিয়া গেল। চোরের বুকের ভিতরে কান্না জমিতে লাগিল। রাত্রিও প্রভাতের দিকে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

অনন্তবাবু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা পীতু, তোমরা চুরি কর কেন বলতে পার ?

পীতাম্বর কহিল, নিজের যা নেই অথচ অন্যের আছে, তাই নিজের ক'রে ফেলতে চাই ব'লে।

—কিন্তু এ রকম ইচ্ছা করাটা যে মস্ত অন্যায় পীতু।

—সবারই ও রকম ইচ্ছে হয় বাবু, যার যা ইচ্ছে তাই যদি সে করতে পারত, তা হ'লে দুনিয়ায় সবাই চুরি করতে বেরুত দেখতে পেতেন। আজকাল যারা চোর ধরে, তারাই চোরের চাইতে বেশি চুরি করে বাবু।

নিজে যে চোর ধরেন না, এ কথা মনে করিয়া মনে মনে খুশি হইয়া অনন্তবাবু কহিলেন, তা এক রকম মন্দ বল নি পীতু। কিন্তু সবচাইতে বেশি যারা চুরি করে, তাদের চোর বলার জো নেই। এ কথাও ঠিক।

পীতাম্বর কহিল, আমার এক মনিব বলতেন, সভ্যতা যত বাড়ছে, চুরিও নাকি ততই বাড়ছে। চুরি না থাকলে সভ্যতাই হতে পারে না। বিশেষ ক'রে —

—কিন্তু রাত যে ভোর হতে চলেছে হে পীতু। শেষকালে ভোর হয়ে পড়লে আবার ফ্যাসাদে না প'ড়ে যাও। গুপে কিন্তু ভারী গোঁয়ার।

—গুপে কে ?

—আমার ছোট ভাই। গোপীনাথ তার ভাল নাম। তার কি এক উদ্ভট খেয়াল, চোর পেলেই বেদম পিটতে সুরু করে।

—কি অন্যায় বলুন তো! চুরি না করলে চোরেরা খাবে কি ?—পীতাম্বর কহিল, তা হ'লে এইবার স'রে পড়ি বাবু। কি বলেন ?

অনন্তবাবু কহিলেন, কিছু না সরিয়েই স'রে পড়বে, সেটা কি ভাল দেখাবে পিতু ?

চোর পীতাম্বর কহিল, শেষকালে ধরা প'ড়ে আপনার ছোট ভায়ের হাতে মার খেয়ে মরা তার চাইতে খারাপ দেখাবে বাবু। তাই ভাবছি এই বেলা বরং স'রেই পড়ি। আপনার কথা আমার মনে থাকবে বাবু। বড় ভালমানুষ আপনি।

—আরে রাম রাম, কি যে বল পীতাম্বর। কিন্তু চোরদের আমার বড় ভাল লাগে, ডাকাতদেরও তেমনই। দেশে চুরি-ডাকাতি বেড়ে উঠলে আমি বড় খুশি হয়ে উঠি।

—কেন বলুন তো বাবু।

—আমার তালা আর সিন্দুকের ফ্যাক্টরির নাম শোন নি,—ন্যাশনাল লক অ্যাণ্ড সেফ ওয়ার্কস ? ঐ জন্যেই। এই গেল বছর জানুয়ারি মাসে চুরি-ডাকাতির হিড়িক পড়েছিল জান হয়তো ? একটি মাসে দশ হাজার টাকার কারবার হয়েছিল হে। ও রকম হিড়িক ঘন ঘন লাগলে তো লাল হয়ে যেতে পারি।

—ব্যাঙ্ক ক'রে কিন্তু টাকা লোটবার আর জো রাখে নি আমাদের।

—তা রাখবে কি হে, ব্যাঙ্কগুলো নিজেরাই যে টাকা লুটছে! তা লুটুক গে। তুমি বরং আর একদিন এস পীতু, যদি পার। কিন্তু আর পারবে কিনা কে জানে!

—কেন বাবু ?

—আগেই সাবধান হয়ে গেলাম কিনা। কাজেই আর তোমার মাথা গলাবার পথ রাখব না হয়তো।

—কিন্তু আগেই না বললেন, চোরদের আপনি ভালবাসেন?

—তা বাসি, কিন্তু যখন তারা অন্যের বাড়িতে চুরি করে। আচ্ছা, এবারে তা হ'লে স'রেই পড় পীতু, সরাবার যখন কিছু নেই। কিন্তু খুব সাবধানে পা টিপে টিপে বেরিয়ে যেও। গুপের যেন কোন রকমেই ঘুম না ভাঙে। ওর ঘুম ভাঙলেই কিন্তু তোমার ঘাড় ভাঙবার সম্ভাবনা আছে।

চোর ইতস্তত করিতে করিতে দরজার কাছে গিয়াও আবার ইতস্তত করিতে লাগিল। অনন্তবাবু চোরের মনের অবস্থাটা আন্দাজ করিয়া লইলেন। বুঝিলেন, চোর হয়তো ভয় পাইয়াই ইতস্তত করিতেছে। কহিলেন, ভয় পেও না পীতু। আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। তুমি ধরা না পড়লেই আমার লাভ।

—কেন?

—এ পাড়ায় দু এক বাড়িতে যদি তোমার কাজ হাঁসিল করতে পার, তা হ'লে সে সব বাড়িতে আমার ফ্যাক্টরির ক্যাটালগ পাঠালে আমার কিছু কাজ হতে পারে।

চোর কহিল, আচ্ছা, তা হ'লে আসি বাবু।

অনন্তবাবু কহিলেন, এস।

দরজা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া চোর বাহিরের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

---

# পুরাতন ভক্ত

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

( Yeats-এর "The lover pleads with his friend for old friends" কবিতার অনুবাদ )

অধিষ্ঠিত তুমি আজি মহিমার উচ্চ সিংহাসনে,
তোমারে ঘিরিয়া রাজে রূপ-লুব্ধ উৎসুক জনতা,
নব নব ভক্তকণ্ঠে স্তুতিগান বাজে ক্ষণে ক্ষণে,
পুরাতন দাসে বুঝি তাই হেলা, তাই কৃপণতা!

হায়, রূপ-গরবিনি, স্ফুট ওই যৌবন-সম্ভার
কালের নিঃশ্বাস-তাপে হবে যবে বিশীর্ণ, মলিন,
সতৃষ্ণ নয়নকোণ তোমা পানে চাহিবে না আর,
শুধু এই দুটি আঁখি চেয়ে রবে এমনি সেদিন।

# ব্রতী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

## চতুর্থ দৃশ্য

নৈরঞ্জনাতীর। নন্দা ও নন্দবলা স্নানে আসিয়াছে। রাত্রি শেষ। দূরে উল্কাহস্তে দাসী দাঁড়াইয়া আছে। নন্দা উর্দ্ধমুখী হইয়া প্রার্থনারত। নন্দবলা গাহিতেছিল—

মধু রজনী কাটিল জাগরণে, বিফলা এ বিহ্বলা রজনী!
আজি যে কথা নিভৃতে জাগে মনে, আমি কেমনে কাহারে কব সজনি?
হের এখনও দখিন সমীরণে ফুল-মুকুল জাগে নি বনে বনে;
উষা আসে নি ধরার অঙ্গনে ল'য়ে সুরভি-আকুল ফুল-ব্যজনী!
শুক-তারকা চাহিছে অনিমিখে, সুখ-স্বপন ভাসিছে দিকে দিকে,
সখি, করুণ নয়নে শুনিবি কে আজি আমার সরম-কথা সজনি?
আমার মরম-ব্যথা সজনি?
ফুল-শয়নে একাকী জাগিবি কে বিফলা এ বিহ্বলা রজনী?

নন্দা। ( সিক্ত বস্ত্রগুলি নিঙড়াইয়া সোপানে রাখিল ) বলা!

নন্দবলা। কি দিদি?

নন্দা। আজ আমাদের জীবনের চিরস্মরণীয় দিন আসছে বোন। এখন শোকের গান গাইতে নেই, হতাশার কথা বলতে নেই। আজ কেবল দেহে মনে শুদ্ধ শুচি হয়ে প্রার্থনা করবার দিন।

নন্দবলা। বড় ভয় করছে দিদি। মনে হচ্ছে, আজ বুঝি আমাদের তপস্যার শেষ দিন নয়, আজ বুঝি আরম্ভ।

নন্দা। তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বোন, তাই যেন সত্য হয়।

নন্দবলা। কি বলছ তুমি দিদি? সহ্য করতে পারবে? আমার মন যে বড় দুর্ব্বল ভাই।

নন্দা। নিজেকে তুই এখনও চিনিস নি তা হ'লে বোন। আমার নিজের ওপর তত বিশ্বাস নেই, যত বিশ্বাস তোর ওপরে আমার আছে। কিন্তু আজকের দিনে ওসব কথা কেন ভাবব? তেমন প্রয়োজন হ'লে ভাববার অবসরও তো যথেষ্ট পাওয়া যাবে বোন।

নন্দবলা। মহর্ষি যে ব্রতের বিধান দিয়েছিলেন, তা আমরা নিয়মিত পালন করতে পেরেছি কি দিদি? কোনও ত্রুটি ঘটে নি তো?

নন্দা। জ্ঞাতসারে তো ঘটতে দিই নি বোন, অজ্ঞাতে যদি কিছু ঘ'টে থাকে, তা তো বলতে পারি না।

নন্দবলা। দেখ দিদি, কি সুন্দর!

নন্দা। কি সুন্দর রে?

নন্দবলা। ঐ পূবদিকের আকাশ দেখতে দেখতে কেমন রাঙা হয়ে উঠল! চারিদিকে গাছে গাছে কত পাখী ডেকে উঠছে! এমন চমৎকার এই বাইরের জগৎটা, আর আমরা কেবল ঘরের কোণে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকি! আজও কি আসতে দিতেন মা? শুধু বাবা আমাদের হয়ে অত ক'রে বললেন ব'লেই না! তাও কত আয়োজন—রথ রে, দাসী রে, প্রহরী রে! জ্বালাতন! এটুকু পথ কি হেঁটে আসা যেত না?

নন্দা। শুভাকাঙ্ক্ষী যাঁরা, তাঁরা আমাদের অশুভ থেকে বাঁচাবার জন্য কারণে অকারণে সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁদের সংসারের অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি, কেন যে কি করেন, তা তাঁরা বুঝেই করেন। আমাদের তাতে বিরক্ত হওয়া উচিত নয় বলা। বাইরের জগৎটা কেবল ঐ সূর্য্যোদয়ের আকাশ নিয়েই সৃষ্ট নয় বোন, অনেক অমানিশা, অনেক রৌদ্রদাহ ঝঞ্ঝা বজ্রপাত, অনেক বীভৎসতা ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে সেখানে সকল সৌন্দর্য্যের সঙ্গে। বাইরের মানুষও সবাই আমাদের ঘরের মানুষের মত—আমাদের বাপ, মা, বন্ধুবান্ধবের মত সরল সদয় সজ্জন নয়। বন্য জন্তুর চেয়ে হিংস্র, বাঘ-ভালুকের চেয়ে ক্রূর, মারের মূর্ত্তিমান প্রতিচ্ছবি অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে অক্ষমের সর্ব্বনাশ করবার জন্য। তাদের পৈশাচিক কবল থেকে প্রিয়জনকে রক্ষা করতে প্রিয়জন চাইবেন বইকি। অবশ্য যার শক্তি নেই, তার কথা আলাদা; যার শক্তি আছে, তার পক্ষে এটা তো স্বাভাবিক।

নন্দবলা। স্বাভাবিক হতে পারে; কিন্তু যা কিছু স্বাভাবিক, তাই কি ভাল দিদি? এই অতি-সাবধানতার ফলে আমরা মেয়েজাতটা কি দিনে দিনে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছি না? সংসারের নিছক ভাল দিকটা দেখিয়ে, তার নিছক মন্দ দিকটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা যাঁরা করেন, তাঁরা আমাদের শুভার্থী হতে পারেন, কিন্তু আমাদের জাতটাকে দেহে মনে দুর্ব্বল পরাশ্রিত পরপ্রসাদজীবী ক'রে রাখবার জন্য তাঁরা দায়ী। যে স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার,—

নন্দা। মানুষের জন্মগত অধিকার ব'লে কিছু নেই বলা, ওটা হ'ল একটা মন বোঝানো কথা, উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলবার কথা। আমরা আমাদের পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য যে পরিমাণে পালন করব, সেই পরিমাণে আমরা লাভ করব অধিকার তা সে ঘরের মধ্যে মা-বাপের, স্বামী-স্ত্রীর স্নেহ-মমতার অধিকারই বল, আর সিংহাসনে ব'সে রাজদণ্ড চালনা করবার অধিকারই বল। যে কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ, তার বেঁচে থাকবারই অধিকার, নেই, অন্য অধিকার তো দূরের কথা। সে কু-আদর্শ সৃষ্টি ক'রে সমাজকে বিষাক্ত ক'রে তোলে। অধিকার যদি চাও বলা, তবে কাজে তার যোগ্যতা প্রমাণ কর, কেউ তোমায় বঞ্চিত করতে সাহস করবে না।

নন্দবলা। তা হ'লেই তো সেই পূর্ব্বের কথা এসে পড়ল। আমাদের অতি-স্নেহের নামে যে পঙ্গু ক'রে রাখার চেষ্টা চলেছে, তার বিরুদ্ধে যদি আমরা বিদ্রোহ না করি,—

নন্দা। দেখ বলা, সকালবেলা বার বার গুরুনিন্দা করিস নি বলছি। এতই যদি তোর বিক্রম, তবে সেই কোথাকার কে একজন রাজার ছেলের জন্যে বারো বছর হেদিয়ে মরছিস কেন? যা না

স্বাধীন হয়ে দেশ-বিদেশে লড়াই করতে? বাবাকে ব'লে আজই তোকে একটা ঘোড়া যোগাড় ক'রে দোব এখন। আর কি কি চাস বলিস, সব দোব তোকে।

নন্দবলা। তুমি কি মনে কর দিদি, আমি তোমার সেই শাক্যরাজকুমারের রূপবর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়েছি, না সে কবে কোন্ শরাহত পাখীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তাই শুনে গ'লে গেছি? মোটেই তা ভেব না। আমি সেদিন মহর্ষির মুখে যখন শুনলাম তার অমিত বীর্য্যের কথা, যখন শুনলাম, একা সহস্র বৃজি, লিচ্ছবি, কোলীয়, শাক্যবীরবৃন্দের মধ্যে অসিযুদ্ধে, ভল্লযুদ্ধে, মল্লযুদ্ধে, অশ্বচালনায় এবং শরক্ষেপে জয়ী হয়ে সে কোলীয় রাজকুমারীকে লাভ করেছে, তখনই আমি তাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করলাম। আমি বীর ললনা, আমি চাই বীরের সহধর্ম্মিণী হতে। আমি ক্ষত্রিয় নারী, এ কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে চাই না।

নন্দা। বীর্য্যের পরিচয় কি শুধু রণক্ষেত্রেই মেলে বলা? যে আসুরিক বীর্য্য সংসারের ক্ষতি বই লাভ করে না, তা সহজে লোকের মনকে সম্ভ্রমে ভয়ে অভিভূত করতে পারে, কিন্তু তাই কি সবচেয়ে বড় বীরত্বের পরিচয়? যে বীরত্ব নিঃশব্দে কাজ ক'রে চলেছে প্রতিদিন লোকলোচনের অন্তরালে জননীর স্নেহে, প্রেমে, আর্ত্তের সেবায়, প্রিয়জনের জন্য প্রিয়জনের আত্মত্যাগে,—যে বীরত্বে নারী-পুরুষের সমান অধিকার কোনও দিন কেউ অস্বীকার ক'রে নি—

নন্দবলা। ও বড় মিন্‌মিনে বীরত্ব দিদি, ও আমার কেমন ভাল লাগে না। আমি কি স্বপ্ন দেখি জান? দেখি, আমরা যেন সসৈন্যে সসাগরা পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছি। প্রবল শত্রু পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, তারাও হারবে না, আমরাও ছাড়ব না। সারাদিন চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে আমরা অশ্রান্তভাবে আক্রমণ চালিয়েছি, কিছুতেই কিছু হয় না। আমার স্বামী গজপৃষ্ঠে আহত; সন্ধ্যা হয়ে আসছে; পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এমন সময় আমি নিজে নিলাম আক্রমণের ভার। বুকে বর্ম্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে উলঙ্গ তরবারি। সাদা ঘোড়ার পিঠে ছুটে চললাম আমার বাহিনীর আগে, মাথায় এলোচুল উড়ছে, সান্ধ্যসূর্য্যের কিরণে ঝলমল করছে কবচ-কুণ্ডল। সিংহিনীর মত হুঙ্কার দিয়ে উল্কার মত বেগে গিয়ে পড়লাম আমি শত্রুব্যূহের ওপর, আমার পরিশ্রান্ত আহত সৈন্যদল নূতন উৎসাহে উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সঙ্গে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শত্রুবাহিনী, আকাশ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি উঠল, 'জয় পরম ভট্টারিকা পরম মহেশ্বরী রাজরাজেন্দ্রাণী'—( লজ্জিত ভাবে থামিল )।

নন্দা। নাটকের মত শোনাচ্ছে বটে। বেদের বিশ্‌পলার কথা মনে পড়ছে বুঝি?

নন্দবলা। হ্যাঁ দিদি। তাঁকে আমি কত দিন স্বপ্নে দেখেছি। যেন তিনি শত্রুব্যূহ ভেদ ক'রে ছুটে চলেছেন উন্মুক্ত তরবারি হাতে। শত্রুর আঘাতে জানু পর্য্যন্ত পাখানাই উড়ে গেল, গ্রাহ্য নেই। যুদ্ধ জয় হ'ল, তারপর হ'ল চিকিৎসার ব্যবস্থা। দিদি, অতীতের সেই সব দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসত? যদি আমার স্থান থাকত সেই জয়যাত্রায়?

নন্দা। বিশ্‌পলা বীর রমণী, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ভেবে দেখ তো বোন, তাঁর জয়যাত্রার পথে যে মানুষগুলোর কাঁচা মাথা ঘোড়ার ক্ষুরে রথের চাচূর্ণকায় হয়ে গেল, তাদের মা

বাপ স্ত্রী সন্তানদের কথা। একটা জয়ের পিছনে যেখানে শত সহস্র অনাথ-আতুরের হাহাকার, যার সামনে রক্তস্রোত, লুণ্ঠন, দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার, আর পিছনে অশ্রুস্রোত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, তাকে আমি কি ক'রে বড় বলব বোন? ইন্দ্র সম্বরাসুরের সহস্রপুরী ধ্বংস করেছিলেন ব'লে বেদ তাঁর জয়গান করছে, কিন্তু সেই সহস্রপুরীর অধিবাসী যারা ছিল, তাদের কথা একবার ভেবে দেখ তো। তারা তো সবাই অপরাধী নয়। আর এই অসুরদের পুরী! কি অপূর্ব্ব রূপসৃষ্টি সে ছিল। বাস্তুশিল্পের, ভাস্কর্য্যের কত অমূল্য রত্ন যে নষ্ট হয়ে গেল ঐ সহস্র নগরীর এক একটির মধ্যে, কে তার উদ্দেশ রাখে! রইল শুধু ঐ পশুশক্তির এক পংক্তি স্তবগান। ধিক!

নন্দবলা। তোমার কথা শুনলে আমার যেন কেমন নিজেকে বড্ড ছোট, বড্ড অপরাধী ব'লে মনে হয়। আচ্ছা দিদি, তুমি কোন স্বপ্ন দেখতে ভালবাস না? তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখ, তপোবনে সামগান হচ্ছে,—

নন্দ। যে সামগানে দ্বিজ ভিন্ন, আর্য্য ভিন্ন আর কারও অধিকার নেই, যে সামগান করবার সময় হৃতসর্ব্বস্ব অনার্য্যের প্রতিহিংসা থেকে বাঁচবার জন্য ব্রাহ্মণ-ঋষি ক্ষত্রিয়-রাজার অস্ত্র-সাহায্য প্রার্থনা করতেন, সে সামগানের স্বপ্ন আমি দেখি না বোন, আমি দেখি ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভেদজ্ঞান বিরহিত হয়ে এক পরম চেষ্টায় সম্মিলিত হয়েছে। হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, যুদ্ধ নেই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মানুষ চেষ্টা করছে, কি ক'রে অপরকে সুখী করবে। যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, পথের ধারে ধারে বিশ্রামাগার, আতুরাগার, জলসত্র, অন্নসত্র, ধর্ম্মগৃহ। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আমাদের দেশ যেন পাঠিয়েছে তার কোনও মহাবাণী। সসাগরা পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন আমিও দেখেছি বোন, কিন্তু সে ঘোড়ার পিঠে খোলা তলোয়ার হাতে নয়। শূন্যহস্তে একবস্ত্রে মুণ্ডিতশিরে আমরা নারী পুরুষ দলে দলে যেন চলেছি দেশে দেশে, তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা অতিক্রম ক'রে, সিন্ধু-সরিৎ মরু-কান্তার পার হয়ে। যে দেশে যাচ্ছি সেইখানেই হচ্ছে আমাদের জয়, আমাদের মাতৃভূমির জয়। প্রেমের মন্ত্রে, ত্যাগের মন্ত্রে আমরা জয় করছি অনন্ত বিদেশী শত্রু-রাজ্যের উদ্যত জিঘাংসাকে। বিধর্ম্মীর দেশে আকাশ ফাটিয়ে উঠছে আমাদের সত্যধর্ম্মের জয়ধ্বনি। কোটি কোটি অন্ধকার নিরাশচিত্তে জ্বলে উঠছে নূতন আশার দীপ্তি। এই স্বপ্নই আমি দেখি বোন। নারায়ণ জানেন, এ স্বপ্ন কোনও দিন বাস্তবে পরিণত হবে কি না। আমার মন তো বলে, হবে।

নন্দবলা। দোহাই দিদি, অপরাধ হয়েছে আমার। আর আমি তর্ক করব না। আঃ, কে আবার এল দেখ। মার চর নিশ্চয়। (দাসী অগ্রসর হইয়া আসিল) সাধে কি গুরুনিন্দা করতে হয়। এক প্রহর হয় নি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এর মধ্যে লোক পাঠিয়েছেন খোঁজ নিতে।

নন্দা। কি সংবাদ সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়া। আর্য্য সুদর্শন এসেছেন প্রাসাদ থেকে। কর্ত্রী ভট্টারিকা আজ গয়শিরে যাবেন বিষ্ণুপাদ-

মন্দিরে আপনাদের কল্যাণকামনায় পূজা দিতে। তিনি বিলম্ব দেখে সংবাদ নিতে পাঠিয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে নিতে চান তিনি।

নন্দবলা। তাঁকে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করতে বল। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিই। দিদি দেখ, কি অপরূপ সূর্য্যোদয়!

নন্দা। এমনই মহিমোজ্জ্বল একটি সূর্য্যোদয় তোমার আমার জীবনে আজ আসছে বোন। এস, প্রণাম করি তার উদ্দেশ্যে। (উভয়ে নতজানু অঞ্জলিবদ্ধহস্তে জবা লইয়া প্রণাম করিল। রুচি আসিয়া দাঁড়াইল, পরে তাহাদের সঙ্গে প্রণামে যোগ দিল) নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ (জলে ফুল ফেলিয়া দিল)।

রুচি। মা তোমাদের ডাকতে পাঠালেন নন্দাদি। বড্ড নাকি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নন্দবলা। আঃ, মার সব তাতে বাড়াবাড়ি।

নন্দা। (হাসিয়া) চল রুচি, সত্যই বড় দেরি হয়ে গেছে।

সকলের প্রস্থান

## পঞ্চম দৃশ্য

গয়া, বিষ্ণুপাদমন্দির। প্রশস্ত অঙ্গনের এক প্রান্তে নন্দা নন্দবলা দাঁড়াইয়া আছে। নাটমন্দির দেখা যাইতেছে। শ্রাদ্ধ এবং পূজার উপচার লইয়া লোক আসিতেছে, যাইতেছে।

পূর্ব্বদিকে নেপথ্য হইতে শব্দ আসিতেছে—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥
ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্নৈবান্নসিদ্ধি র্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়ে ঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥



পশ্চিমে নেপথ্য হইতে শব্দ—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।
ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।
ওঁ যে ঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

পূর্ব্বদিকে নেপথ্য হইতে শব্দ—

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপেঽধর্ম্মে রতাশ্চ যে
তেষাম্ আপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

নন্দবলা। কি চমৎকার মন্ত্র দিদি! স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেউ কোথাও বাকি রইল না! শত্রু মিত্র, আত্মীয় অনাত্মীয়, সাধু অসাধু,—সবার কল্যাণ কামনা হয়ে গেল! এই মন্ত্র মানুষ যদি অন্তর থেকে উচ্চারণ করতে পারত, তা হ'লে বোধ হয় দুঃখকষ্ট ব'লে কিছু থাকত না জগতে।

নন্দা। একদিন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তো অন্তর থেকেই উচ্চারণ করেছিলেন এ মন্ত্র বলা। আজ যদি আমাদের ক্ষুদ্রতা তাঁদের মহাবাক্য উচ্চারণকে প্রাণহীন একটা লৌকিক আচারপালনের প্রথাতে দাঁড় করিয়ে থাকে, তবে সে দোষ তো তাঁদের নয়। তবে সহস্রবার সহস্র জনে ঐ মন্ত্র যন্ত্রের মত উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে যে, তার মধ্যে দু চার জনের মনেও দু এক বার যদি বিশ্বহিতের ঐ কামনা জাগে, তা হ'লে সেই পরিমাণে সার্থক হবে মন্ত্র, সেই পরিমাণে পবিত্রতর হবে জগতের ধর্ম্মধারা।

দুইজন নাগরিকের প্রবেশ

প্রথম। শিখাবন্ধন যে করিস, শিখাবন্ধনের মন্ত্র কি বল দেখি?

দ্বিতীয়। হ্যাঃ, শিখাবন্ধন করব, তার আবার মন্ত্র! তুই যে তালগাছে উঠিস, তার মন্ত্র কি বল দেখি?

প্রথম। দূর মূর্খ, শিখাবন্ধন আর তালগাছে ওঠা এক হ'ল?

দ্বিতীয়। নিশ্চয় হ'ল। শিখাটা মাত্র আধ হাত লম্বা, তালগাছটা বিশ হাত লম্বা। বল, এইবার কত মন্তর বলবি বল।

নাগরিকদ্বয়ের প্রস্থান, দুইজন পূজার্থিনীর প্রবেশ

প্রথমা। দেখলি তো আমার বউয়ের আক্কেলখানা? শুনলে বাবার মন্দিরে আসছি, তবু কিনা তুলসীপাতা না দিয়ে বেলপাতা দিয়ে মরেছে? আমিও তখন চোখের মাথা খেয়ে ভাল ক'রে দেখে নিলুম না, এখন কি বিপদে পড়লুম বল দেখি?

দ্বিতীয়া। তার জন্যে তোমার অত ভাবনা কেন মন্থরা-পিসী? শাস্ত্রে বলেছে, মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। তা যখন চলে, তখন তুলসীপাতার অভাবে বেলপাতায় চলবে না কেন?

প্রথমা। তুই আর জ্বালাস নি বাপু। রোস না, আজ একবার বাড়ি যাই, চ্যালাকাঠ তার পিঠে ভাঙব, তবে আমার নাম মন্থরা-বামনী। এতদিন ধ'রে পাখী-পড়া ক'রে শেখালুম, বুড়ো হয়ে মরতে চলল, এখনও কোন্ পুজোয় কি পাতা লাগে তা শিখল না!

দ্বিতীয়া। ঘাট হয়ে গেছে মন্থরা-পিসী। তোমার বউকে একেই তো না খাইয়ে আধমরা ক'রে রেখেছ, এর ওপর বেশি মারধোর করলে যদি ম'রে যায় তো বিপদ হবে তোমারই।

ও বেলপাতা তুলসীপাতা থেকে সুরু ক'রে তোমার রান্নার জন্যে তেঁতুলপাতা, সজনেপাতা এমন কি বিছানা পাতা পর্য্যন্ত তোমায় একলাকেই তখন তুলতে হবে। ও কাজ ক'র না পিসী, ক'র না। আর বউকেই বা কি দোষ দোব? তুমি বলেছ তো বাবার মন্দির? তা বাবার কি তোমার কূলকিনারা আছে, না বাবা তোমার একটি? কোন্ বাবার কথা বললে সে কি ক'রে জানবে? ও গণেশও বাবা, সূর্য্যও বাবা, শিবও বাবা, বিষ্ণুও বাবা, আবার রাস্তার ধারের নুড়িনোড়াগুলোও বাবা। চেপে যাও পিসী, চেপে যাও। দোষ তোমার বউয়ের নয়, দোষ তোমার। গঙ্গাজল দিয়ে কাজ সারবে চল।

প্রথমা। তা যা বলেছিস মা! কোন্ বাবা তা তো খুলে বলি নি! বুড়ো হয়ে আমারই ভীমরতি ধরেছে।

উভয়ের প্রস্থান

সুব্রত ও সুদত্তের প্রবেশ

সুদত্ত। স্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকা প্রয়োজন, সুব্রত। তোমরা সেই সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছ। মঙ্গল হবে না তাতে। তুমি মনে ক'র না, তোমাদের বাহুবল আছে ব'লে তোমরা আমাদের অবজ্ঞা করবার অধিকারী। ঘোর কলি ঘনিয়ে এসেছে সত্য, কিন্তু এখনও ধর্ম্ম আছে, ব্রাহ্মণ আছে। জান, বেদ বলছেন, 'ব্রাহ্মণ এব পতিঃ, ন রাজন্যো, ন বৈশ্যঃ'। মনু ব'লে গেছেন, 'আনৃশংস্যাৎ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হ্বিতরে জনাঃ'। শাতাতপ বলছেন—

জপচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি।
সর্ব্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং যস্য চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ॥

তোমরা আজকাল না প'ড়ে পণ্ডিত হয়েছ, মানবে না তো কিছু। কিন্তু এসব ঋষিবাক্য হে, মিথ্যা নয়।— ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে মন্যন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা।'

কি, চুপ ক'রে রইলে যে? জান হে,

ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জলং সার্ব্বকালিকম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ।

কি ভাবছ কি?

সুব্রত। ভাবছি মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা কত দূর যেতে পারে! যে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ঋষিবচন উদ্ধৃত করলে, তোমরা কি সেই ব্রাহ্মণ আছ সুদত্ত? যে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ঋষি বলছেন,

'সম্মানাৎ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
প্রতিষ্ঠা শৌকরী বিষ্ঠা গৌরবং ঘোররৌরবং॥

তুমি কি সেই ব্রাহ্মণ? সত্য, দান, শীল, আনৃশংস্য, তপ, ঘৃণা, সমস্ত ঋষিনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে তোমার? ব্রহ্মকে জেনেছ তুমি? বেদের শিক্ষা গ্রহণ করেছ তুমি কায়মনোবাক্যে? যদি ক'রে থাক—

সুদত্ত। এ কখনও কেউ পারে! আমি অল্পায়ু মানুষ, সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করবারই সুযোগ হয়তো আমার জীবনে ঘ'টে উঠবে না। গুরুগৃহে তো গরু চরিয়েই অর্দ্ধেক দিন কেটেছে, সংসারাশ্রমে প্রবেশ ক'রে পর্য্যন্ত তো দেখছ, ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল বস্ত্রেন্ধন চিন্তায় বিব্রত। স্বাধীনভাবে যজনযাজনে কিছু হ'ল না, শেষে রাজদ্বারে পুরোহিতের বৃত্তি নিয়েছি। আমরা কি আর ব্রাহ্মণের আদর্শ?

সুব্রত। তা যদি স্বীকার কর, তবে পূর্ব্বপুরুষের নাম ভাঙিয়ে খেও না, প্রণাম দাবি করতে এস না আমার কাছে। শাস্ত্র আমিও একটু আধটু পড়েছি সুদত্ত। শাস্ত্র যে বলছেন,

বাল্মিথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমে নৃণাম্।
তাবচ্ছুদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥

সে কথা মান, কি মান না? মহাভারত বলছেন—

স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি—

সুদত্ত। দেখ সুব্রত, যাই বল আর যাই কর, তোমায় স্বীকার করতেই হবে ব্রাহ্মণের জন্মগত আভিজাত্যকে। রক্তের গুণ একটা আছে তো?

সুব্রত। একটু ভেবে কথা বল সুদত্ত। ক্ষত্রিয় মনু থেকে মানব সৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। অবশ্য পিতাকে যে পুত্র আভিজাত্যে ছাড়িয়ে যেতে পারে না, তা আমি বলছি না, রক্তের গুণ নিয়ে কথা হচ্ছিল কিনা, তাই বলছি। তার পরের কথাই ধর। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বর্ণের কথা শিশুতেও জানে, তিনি রচনা করলেন গায়ত্রীমন্ত্র, সমস্ত বেদের, সমস্ত আর্য্যসভ্যতার প্রাণমন্ত্র। তা ছাড়া পুরাণ বলে, ধাষ্ট্র, গার্গ্য, তর্য্যারুণি, কবি এবং পুষ্করারুণি ক্ষত্রিয়েরা তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পড়েছ বোধ হয়? দাসীপুত্র কবষকে শ্রেষ্ঠতম ঋষিরা কি সম্মানের আসন দিয়েছেন, তা তুমি জান। সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ চ'লে আসছে, মসীবর্ণ ব্রাহ্মণ এবং তপ্তকাঞ্চন বর্ণ শূদ্র আজ পথে ঘাটে দেখতে পাবে। অনার্য্যপুত্র কণাদ, বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরীপুত্র ব্যাস, ম্লেচ্ছকন্যাপুত্র শুক,—এঁদের কার রক্তমাহাত্ম্য নিয়ে গর্ব্ব করবে সুদত্ত? অথচ পাণ্ডিত্যে মহত্ত্বে সত্যই এঁরা প্রণম্য প্রাতঃস্মরণীয়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্তের গর্ব্ব আমিও করি না সুদত্ত, শ্রীকৃষ্ণ-জাম্বুবতী, অনিরুদ্ধ-উষা, ভীম-হিড়িম্বা, অর্জ্জুন-উলুপীর উপাখ্যান ছেড়ে দিয়েও আজ চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি, ক্ষত্রিয় রাজার ঘরে ঘরে অক্ষত্রিয়া পত্নীদের। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা থেকে মালাকারকন্যা কেউ বাদ যান না। শূদ্র আজ বাহুবলে, বুদ্ধিবলে, অর্থবলে ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করছে, ব্রাহ্মণত্বই বা তারা পাবে না কেন? মনু বলেছেন, শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। মহাভারত বলছেন, শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ। শাস্ত্র যখন বলেন, ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিগচ্ছতি॥ তখন সেখানে জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করছেন না ঋষিরা। সকল বর্ণের গুণী জ্ঞানীকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবার

সাহস ছিল তাঁদের। পরকে তাঁরা সম্মান দিয়েছিলেন, তাই পেয়েছিলেন তাঁরা সম্মান পরের কাছে। যেদিন থেকে সে উদারতা তোমাদের গেছে, সেদিন থেকে সাধারণের কাছে সম্মানের দাবি গেছে তোমাদের। ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে সুদত্ত। সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মণ, বেদবিরোধী দার্শনিক, এবং অব্রাহ্মণ তীর্থিকেরা আজ ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্ছেন অজ্ঞ জনসাধারণকে। আজও গণ-সংযোগের যে সুযোগ তোমরা হেলায় হারাচ্ছ, সে সুযোগ আর আসবে না। ভারতবর্ষের সভ্যতা লুপ্ত হবে আত্মকলহের বিপ্লবে, তুমিও মরবে, আমিও মরব।

সুদত্ত। তা হ'লে কি করতে বল? যাগ যজ্ঞ পূজা হোম সমস্ত অনধিকারী শূদ্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের ক্রীড়াপুত্তলি হয়ে থাকব?

সুব্রত। নিজের অধিকারের মধ্যে থাকলে, অপরের অধিকার হরণ না করলেই যথেষ্ট হবে সুদত্ত। তার বেশি কিছু করতে বলি না। এই যে অসুররাজের মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজাধিকার নিয়ে তুমি বসেছ, এ মন্দিরে তোমার কিসের অধিকার সুদত্ত? এখানে আজ তুমি শূদ্রকে সেই মূর্ত্তিস্পর্শ করতে বাধা দেবে, যে মূর্ত্তি তার পূর্ব্বপুরুষ স্থাপন করেছেন, রচনা করেছেন, পূজা করেছেন। তোমার বেদে যার উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই, সেই মূর্ত্তিপূজার আসুরিক রীতি সমর্থন করছ নিছক স্বার্থের জন্য। অনধিকারী হয়ে চোখ রাঙাবে অধিকারীকে? এ পাপ পাথরের ঠাকুর সইতে পারেন, বিশ্বের জাগ্রত দেবতা যদি কেউ থাকেন, তিনি সহ্য করবেন না বেশি দিন, জেনে রেখো।

সুদত্ত। তা হ'লে কি করতে বল?

সুব্রত। বেদেরই বাক্য স্মরণ করতে বলি। বেদ বলছেন, উত্থাপয় সীদতো বধ্ন এনান্ অদ্ভিরাত্মানম্ অভিসংস্পৃশন্তাম্। যারা নীচে আছে, তাদের তুলে নাও তোমার প্রাণমন্ত্রে, প্রাণরসে অভিষিক্ত করুক তারা নিজেদের। যে বাণী অপৌরুষেয় ব'লে তোমরা বিশ্বাস কর, তা থেকে বঞ্চিত ক'র না কাউকে জন্মগত ত্রুটির জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে। মনে রেখো, এই পাপের জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে তোমাদের একদিন। বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলছেন, যথেমাং বাচং কল্যাণীং আবদাণিজনেভ্যঃ, ব্রহ্মরাজনাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়-চারণায়। যেমন আমি সকল মানুষের জন্য এই কল্যাণময়ী বেদবাণী উপদেশ করছি, তেমনই তোমরাও কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, আর্য্য, স্ত্রী, ভৃত্য, অরণ্যবাসী সবার জন্যই এই বেদবাণী। আজ যে ছোট আছে, কাল সে যাতে বড় হতে পারে, সেই চেষ্টাই কর সুদত্ত, যে বড় আছে, স্বার্থের জন্য তাকে ছোট ক'রে এনো না।

সুদত্ত। অধিকারী অনধিকারী বিচার না ক'রে যাকে তাকে দিতে বল বেদবিদ্যা? তাতে ঘটবে না অমঙ্গল? অনধিকারীর হাতে অস্ত্র দিলে সে যে নিজের নাসিকাচ্ছেদন ক'রে বসবে সুব্রত।

সুব্রত। আর তা না দিলেও যে তোমার নাসিকাচ্ছেদন করবে সে, নখদন্তের বলে। তবে ভয়ে আমি কিছু করতে বলি না তোমায়, কর্ত্তব্যবোধেই করতে বলি। বিচার করবার শক্তি থাকে

তো নির্ব্বিচারে দিতেও বলি না, কিন্তু জন্মগত দ্বিজত্বই যেন মাপকাঠি না হয় বিচারের। আর দেখ সুদত্ত, অনধিকারী অস্ত্র হাতে পেলে প্রথমত তার অপব্যবহার হবেই তা জানি, কিন্তু অস্ত্রজ্ঞ শিক্ষকের অনুকম্পা থাকলে সুব্যবহার শিখতে অনেকেরই বিলম্ব হবে না। অধিকার না পেলে অনধিকারীরা যে চিরদিনই অনধিকারী থেকে যাবে ভাই। অধিকার না পেয়ে কেউ কোনদিন তার দায়িত্ব বোঝে নি সুদত্ত, তুমিও না, আমিও না। আমাদের অতি-সাবধানতার ফলে কৃপণের মত যে জ্ঞানভাণ্ডার আমরা লুকিয়ে রেখেছি আজ অজ্ঞ জনসাধারণের কাছ থেকে, অব্যবহারে তার মূল্য একদিন আমরা নিজেরাই ভুলে যাব। সেদিন নিকৃষ্টতর জ্ঞান নিয়ে বিধর্ম্ম আসবে, বিদেশী সভ্যতা আসবে আমাদের বঞ্চিত ভাইয়েদের আশা দিতে, আশ্রয় দিতে। তারা দলে দলে ছুটে যাবে সেই আশ্রয়ে, অকুণ্ঠিতচিত্তে আঘাত করবে তাদের স্বদেশের অপৌরুষেয় প্রাচীন সভ্যতাকে। মৃত্যুবাণ তৈরি হচ্ছে সুদত্ত, এখনও সাবধান।

উভয়ের প্রস্থান

বিশাখার প্রবেশ

বিশাখা। হ্যাঁলা নন্দা, তোরা কি মনে করেছিস, বল দেখি? আমি মরছি ওদিকে পূজো ক'রে তোদের জন্যে, আর তোরা এদিকে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? যত গরজ আমার, না?

নন্দবলা। সবটা না হোক, খানিকটা তো বটে মা। আমরা বিদায় হ'লে যে তুমি বাঁচ, এটা তো ঠিক।

বিশাখা। দেখ বলা, বড় হয়েছিস ব'লে কিছু বলি না, আজ কিন্তু তুই মার খাবি। ( হাত তুলিলেন )

নন্দবলা। ( হাত ধরিয়া ফেলিয়া ) না মা, রাগ ক'র না মা, লক্ষ্মীটি। এখানে আমাকে ধ'রে মারলে লোকে তোমাকেই নিন্দে করবে। বলবে, ওমা, মহাসেনের গিন্নীটা কি মেয়েকাঁটকী! অত বড় বড় মেয়েগুলোকে পথের মধ্যে ধ'রে ঠেঙায়!

নন্দা। ছিঃ বলা, তুই কি আরম্ভ করেছিস? যত বুড়ো হচ্ছিস, তত যেন তোর ছেলেমানুষী বাড়ছে। চল মা, চল। পূজোর আর কি বাকি মা?

বিশাখা। পুরোহিত তোদের সাবিত্রীস্তোত্র পাঠ করিয়ে শান্তিজল দেবেন।

সকলের প্রস্থান

একজন রুক্ষমূর্ত্তি বৃদ্ধ এবং একটি পাচ বৎসরের বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ঐ লোকগুলোর কি হয়েছে বাবা? মাথা কামিয়েছে কেন বাবা? কাঁদছে কেন?

বৃদ্ধ। ওদের বাবা ম'রে গেছে। শ্রাদ্ধ করতে এসেছে।

বালিকা। বাবা ম'রে গেল কেন বাবা? কি হয়েছিল বাবা?

বৃদ্ধ। কি হয়েছিল কি ক'রে জানব? বুড়ো হয়েছিল, তাই ম'রে গেছে। ( চমকিয়া ) চুপ কর, বলতে নেই ওসব কথা।

বালিকা। আর ঐ মেয়েটার কি হয়েছে বাবা? ঐ যে লাল কাপড় প'রে কপালে সিঁদুর দিয়ে, গয়নাগাটি গায়ে দিয়ে যাচ্ছে ঐ ছেলেটার সঙ্গে?

বৃদ্ধ। ওর বিয়ে হয়েছে। বিষ্ণুমন্দিরে প্রণাম করতে এসেছিল।

নেপথ্যে নারীকণ্ঠোত্থিত শব্দ

যমোঽসি ত্বং মহাকায়ঃ সর্ব্বভূতাপহারকঃ।
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ॥

বালিকা। বিয়ে খুব ভাল, না বাবা?

বৃদ্ধ। বিয়ে ভাল না, অনেক খরচ। আমি দোব না তোর বিয়ে। তুই আমার কাছে থাকবি।

বালিকা। না বাবা, আমার একটা বিয়ে দিও বাবা। আমি শ্বশুরবাড়ি যাব বাবা।

বৃদ্ধ। না, ছিঃ, বিয়ের কথা বলতে নেই। বিয়ে ভাল না।

বালিকা। হ্যাঁ বাবা, বিয়ে খুব ভাল বাবা। আমার একটা বিয়ে দিও বাবা।

উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্য হইতে শব্দ

ওঁ দেবমাতর্নমস্তুভ্যং মাধব্যৈ চ নমো নমঃ।
পতিব্রতে মহাভাগে ব্রহ্মযোনে শুচিস্মিতে॥
দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্ত্তুঃ সৎপ্রিয়বাদিনি।
অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সুব্রতে॥
গৌরী শচী রুক্মিণী চ দ্রৌপদী চ রতির্যথা।
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগন্মাতর্ভবেয়ং পতিবল্লভা॥

ক্রমশ

---

# আকাশ-আস্তরণ

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

( Yeats-এর "He wishes for the clothes of Heaven" কবিতার অনুবাদ )

পাইতাম যদি কারু কাজ করা ওই নভ-মখমল
সোনালি-রূপোলি আলোর সুতোয় টানা ও পোড়েন যার,
আধ-আলো-ছায়া কোথাও, কোথা বা আলোকেতে ঝলমল,
কোথা ঘন নীল, কোথাও বা ফিকে, কোথাও অন্ধকার ;

পাতিয়া দিতাম সে আস্তরণ তব পদতলে আনি।
কিন্তু কাঙাল কোথা পাবে! তার স্বপ্নই সম্বল ;
চরণের নীচে বিছায়ে দিলাম তাই সে স্বপ্নখানি ;
ভেঙো না স্বপন, লঘু ক'রে ফেল ও চরণ-শতদল।

# দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

১

প্রায় প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই এমন কতকগুলি গ্রন্থ আছে, যাহাদের গৌরব কখনও ম্লান হইবার নহে। অনন্ত মহাসাগর বা হিমাচলের মত তাহারা চিরনূতন, বিভিন্ন যুগ বা বিভিন্ন পাঠকের চক্ষে তাহাদের সৌন্দর্য্য একটা নূতনরূপে উদ্ভাসিত হয়। বারংবার পাঠ করিলেও তৃপ্তি হয় না, বরং নূতন রকমের রসের আস্বাদ বা মাধুর্য্যের পরিচয় প্রতিবারেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থ যেন ক্ষণজন্মা, দৈবক্রমে একটা first fine careless raptureএর মত অনন্ত সৌন্দর্য্য ও তাৎপর্য্যের বিভূতি লইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। সমালোচনার বাক্‌জালে তাহারা ধরা দেয় না, যতই ব্যাখ্যা করা যাক, তবু মনে হয়, অনেক কথা বাকি রহিয়া গেল। ইহাদের বলা হয় 'ক্ল্যাসিক্‌স', ইহাদিগকে বাংলায় অমর গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে খুব কম গ্রন্থই এই ক্ল্যাসিক্‌সের পর্য্যায়ে উঠিতে পারিয়াছে। 'গৌড়জন' বা বিশ্বজন 'যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' এই ধরণের গ্রন্থ বেশি নাই। আগেকার যুগে যাহাতে লোকে রসে ডগমগ হইত, তাহা এখনকার রুচিতে নীরস; যাহা এক দলের কাছে অতি উপাদেয়, তাহা আর এক দলের কাছে কৃত্রিম মনে হয়। শতাব্দীর পরিবর্ত্তনে যাহার সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ হয় না, অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও যাহার অনন্ত বৈচিত্র্য অটুট থাকে, এ ধরণের গ্রন্থ খুব বেশি নাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, যাহাদের ক্লাসিক্‌সের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে না পারিলেও আমরা দীর্ঘকাল আদর করিয়া থাকি, যে পুস্তক পড়িতে বসিলেই কালগত রুচির পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আমাদের মানবীয় রস-প্রকৃতি পরিতৃপ্ত হয়। এ শ্রেণীর পুস্তকও বাংলায় খুব বেশি নাই। যে কয়খানি আছে, তাহার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানে'র নাম করা যাইতে পারে।

২

হাসির বা হাস্যরসের স্বরূপ বা উপাদান কি, তাহা এখানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করিব না। সে চেষ্টা অনেক মনীষী করিয়াছেন, কিন্তু হাসির কোন 'ফর্‌মুলা' বা সূত্র এখন পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না। সুতরাং আর একবার সে চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ যাহাতে না হই, সে বিষয়ে সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে। জীবতত্ত্ববিদ্ বলেন, হাসিতে জানে কেবল মানুষ, অন্য কোন জীব হাসিতে পারে না। স্মরণশক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনার পরিচয় ইতর প্রাণীর মধ্যেও পাওয়া যায়, কিন্তু হাসিই মানুষের নিজস্ব গৌরব। রসপিপাসু মানবহৃদয়ও সেই মতে সায় দেয়। ক্লাটন ব্রক প্রভৃতি রসিক সমালোচকদের মতে হাস্যরস স্বর্গেও নাই, বিধাতাপুরুষের কাছেও ইহা অভিনব ও অদ্ভুত। ভোল্‌টেয়ারের ন্যায় হাস্যরসিক স্বর্গে গেলে স্বর্গবাসী সকলেই বিমূঢ় ও আশঙ্কিত হইয়া উঠিবে, স্বর্গের প্রকৃতি বদলাইয়া তাহা মানব-সুলভ রসে সঞ্জীবিত হইবে। এই পোড়া পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, বহু বিচিত্র রূপে হাস্যরস মানুষের জীবনে সংক্রামিত হইয়া আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; হাসির জ্যোতি যখন বিজলির মত জ্বলিয়া উঠে, তখন "আঁধার হইবে আলা",

তখনই মাটির পৃথিবী সোনার সংসার হইবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে, রোজ এক ঘণ্টা করিয়া হাসিতে পারিলে কোন রোগ হইতে পারে না। আমরা সকলেই তাহা বুঝি; হাসিতে পারিলে মনেরও যে কোন কালিমা থাকিতে পারে না, সমস্ত গ্লানি সমস্ত পাপ যে ধৌত হইয়া অন্তঃকরণ "আলো-ঝলমল" হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানুষ যখন হাসে তখনই সে সুন্দর—মহৎ। শিশু হাসে বলিয়াই সে সুন্দর ও নিষ্পাপ, ফল্‌স্টাফ হাসির জন্যই কাপুরুষোচিত বা পাষণ্ডোচিত আচরণ করিয়াও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া নৈতিক বিচারের বহু উর্দ্ধে রহিয়া গিয়াছে।

হাস্যরসের যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কেন যে অদ্যাপি হয় নাই, তাহার একটা কারণ মনে হইতেছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা যে মনোভাব লইয়া করিতে যাই, হাসি তাহারই প্রতিবাদ। যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহার ধারণা যে সর্ব্ব জিনিসেরই "তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" নহে, বিশ্বপ্রকৃতির লীলা-পারম্পর্য্যের মধ্যেই সব তত্ত্ব রহিয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুমাত্রেরই লক্ষ্য—সত্য, এবং সত্য মানেই—যাহা আছে। যাহা আছে তাহার, কিম্বা প্রকৃতির, কিম্বা তথাকথিত সত্যের দাসত্ব হইতে আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় হাসি। সত্যময় জগৎ বিধাতার, আর হাস্যময় জগৎ মানুষের সৃষ্টি। ইহার মধ্যে হাস্যময় জগৎ যে উপাদেয় ও শ্রেষ্ঠ, সে মতে প্রতি মানবের অন্তরাত্মাই সায় দেয়। সেজন্যই কোন কোন ভক্ত বিধাতার গৌরব বাড়াইবার জন্য তাঁহাকেও হাস্যরসিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও বিধাতার হাস্য বা Irony of fate খুব উঁচু দরের জিনিস নয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে, বিধাতা নিজের নিয়মে নিজেই শৃঙ্খলিত, কোন রকম হাসিই তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। হাস্যরস স্বভাবের বা প্রকৃতির নিয়মানুগ নহে, প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও নিয়মকে ইহা তুচ্ছজ্ঞান করে বলিয়াই ইহার গৌরব। যাহা স্বাভাবিক বা নিয়মিত তাহা হাস্যকর নহে, সত্যকে অবলীলাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে বলিয়াই হাস্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব। ফল্‌স্টাফ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "as a truth-crusher he was unrivalled"—সত্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না, সেই জন্যই তাঁহার গৌরব। হাস্যরস সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথাই বলা যাইতে পারে। মানুষের আত্মার স্বাধীনতা, অনন্ত সৃষ্টির ক্ষমতা, তাহার ঐশ্বর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে সত্য বলিয়া একটা নিষ্ঠুর সংস্কার। "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" "কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার" বলিয়া আমরা হা-হুতাশ করি কেবলমাত্র সত্যের সংকীর্ণতার জন্য। এই বৈচিত্র্যহীন, অরুচিকর, সংকীর্ণ সত্যের হাত হইতে বাস্তবজীবনে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—হাসি। যাহা হাস্যকর তাহাতে দেখি, স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, স্বভাবকে তাহা অতিক্রম করে বলিয়াই তাহাকে আমরা ভালবাসি। বাস্তবকে যখন মানুষের মুক্ত আত্মা পদদলিত করে, তখনই সে হাসিতে পারে। অবাস্তব কল্পনাই হাস্যরসের বাহন, হাস্যরসের মধ্যে আমরা পাই বাস্তবের বন্ধন হইতে একটা যথার্থ মুক্তির আস্বাদ। কবির ভাষা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি, "হাস্যে তোমার মুক্তির রূপ হাস্যে তোমার মায়া, বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে হাস্যের ছায়া।" সুতরাং হাসির গান যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

৩

'হাসির গানে'র হাসির কথা আলোচনা করার আগে ইহার গানের দিকটা একটু উল্লেখ করিতে চাই। এই কবিতাগুলি শুধু যে বাস্তবিক সঙ্গীতের ছাঁচেই রচিত এবং সুর তাল যোগে আবৃত্তির সম্পূর্ণ উপযোগী তাহা নয়। ইহাদের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের রূপ ও রসের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। সাহিত্যে গীতিকবিতার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, যে উপলব্ধি গীতিকবিতায় প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা অন্যবিধ রচনায় প্রকাশ করা যায় না। গীতিকবিতার আবেগ-বাহুল্য, উচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে একান্ত তীব্রতা, ভাবের ঐক্য ও নিবিড়তা, অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত গুণই এই কবিতায় বর্ত্তমান। 'হাসির গানে'র মধ্যে ঘর-সংসারের সমাজের কথা অনেক আছে, কিন্তু ইহার আসল রস ইহার ব্যঞ্জনার মধ্যে, সকল কথার পিছনে ইহার সুগভীর ও নিবিড় আবেগের মধ্যে। চারুকলার মধ্যে সঙ্গীতেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, যে উপলব্ধি সঙ্গীতে প্রকাশ পায়, তাহা অন্য কলায় ব্যক্ত হইবার নহে। অনেকে বলেন যে, সঙ্গীত শুদ্ধ অনুভূতির ভাষা, এইজন্য ইহার আবেদন এত বহুবিস্তৃত। 'হাসির গানে'র মধ্যেও সঙ্গীতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়; সকল সাংসারিকতা, সকল তর্কের পিছনে যে মানবপ্রাণ রহিয়াছে, তাহারই অস্ফুট বাণী এই সব গানের ধ্বনি-লোক সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার রস বিশেষরূপে ইহার সুরে, ইহার মূর্চ্ছনায়। "হো—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কার্ত্তিক গণপতি", "জীবনটা কিছু নাঃ" "সন্দেশ গজা বোঁদে মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া" প্রভৃতির আ-কার, ও-কার, বিসর্গের টান ও সুরের ভিতরেই ইহাদের ভিতরকার অনুভূতি ও আবেগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহাদের দিগন্ত-লক্ষ্য ইঙ্গিত সূচিত হইতেছে।

৪

এইবার ইহার হাসির কথা। বাল্যকাল হইতে অনেকবার এই হাসির গানগুলি পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, কিন্তু কোনবারই এই হাসির দীপ্তি অনুজ্জ্বল মনে হয় নাই, প্রতিবারই যেন নূতন করিয়া মনের ও প্রাণের মধ্যে সাড়া আনিয়াছে। অন্য সকলের কাছে ঠিক কি ভাবে এই হাসি আবেদন করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; আমার নিজের কাছে এই হাসির সৌন্দর্য্য কি কি রূপে ধরা দিয়াছে, তাহাই এখানে বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম অল্পবয়সে যখন 'হাসির গান' পড়িয়াছি, তখন ইহার স্থূল রসটা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। হাস্যরসের নানা প্রকার ভেদ, নানা উপাদান আছে। অট্টহাস্য হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তের অতি সামান্য আকুঞ্চন পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত। এক রকমের হাস্যরস আছে, তাহা অতি সূক্ষ্ম, মস্‌লিন বস্ত্রের ন্যায়; তাহাকে ধরা ছোঁওয়া বা অনুভব করাই শক্ত। তাহা অনেক সময় যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোটেই নহে, কেবলমাত্র চিন্তা বা প্রণিধান সাপেক্ষ। লেখক ঠিক হাস্যরসের ইঙ্গিত করিতেছেন কিনা, তাহাও বিশেষ বিবেচনা না করিলে বলা যায় না। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ন্যায়

ইহা প্রায় চর্ম্মচক্ষের অগোচর থাকিয়াও অনেক সময় সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্যের বর্ণবিলাস সৃষ্টি করে। এই জাতীয় হাস্যরসের সৃষ্টির মধ্যে যথেষ্ট কলা-নৈপুণ্য থাকিলেও এক হিসাবে ইহাতে যেন একটু দুর্ব্বলতা আছে বলিয়া মনে হয়। এই ধরণের হাসির আত্মা আছে, কিন্তু দেহ নাই; অশরীরী বাণীর মত ইহা ভাবুকের মনে অপূর্ব্ব স্পন্দন আনিতে পারে, কিন্তু ইহাকে লইয়া ঘর করা চলে না। ইহা "ক্ষণিকের অতিথির" মত "পথ বাহিয়া" "আলোক-যানে" চলিয়া যায়; ইহা সর্ব্বদার জন্য নহে, এবং সকলের জন্যও নহে। ইহা বুদ্ধিকে স্পর্শ করে, কিন্তু প্রাণ মাতাইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের উপকরণ এরূপ সূক্ষ্ম বা প্রণিধানসাপেক্ষ নয়। তাঁহার হাসি স্পষ্ট, উজ্জ্বল, গালভরা ও প্রাণখোলা। তাঁহার নিজের কথায় বলা যায় যে, তিনি হাসেন "জোরে, গুম্ফ ভোরে, ছেড়ে প্রাণের মায়া।" ইহার মধ্যে এমন সব উপাদান রহিয়াছে, যাহা শিশু বৃদ্ধ, সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মনেই অবিলম্বে একটা সাড়া আনিতে পারে। ইহাতে ভাষা ও কল্পনার চটুলতা, রঙ-তামাসা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মস্‌করা, প্রহসন, এমন কি সঙ ও ভাঁড়ামির যোগ্য উপকরণ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। তিনি রামবনবাসের পালায় "সকাল-সন্ধ্যা চা-বিস্কুটে"র কথা অবতারণা করিতে, কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদে "সাবান মাখা"র কথা তুলিতে কিংবা তান্‌সেনের কথা উপলক্ষে "তাধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি···মেঁও এঁও এঁও" করিয়া কোরাস গাহিতে সঙ্কুচিত নহেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অতি শক্তিমান শিল্পীর হাতে পড়িয়া এই সমস্তই উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার উপাদানীভূত হইয়া গিয়াছে। যদিও চার্লস ল্যাম্ব ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার রস ঠিক এক নয়, তবুও ল্যাম্বের রচনাতেও স্থূল রসিকতার উপাদানকে উচ্চ শিল্পকলার অবলম্বনস্বরূপে ব্যবহার করার অনুরূপ কৌশল দেখা যায়। একটা প্রবল বিচার-শক্তি এবং একটা উদার সহানুভূতির যাদুস্পর্শে এই সমস্ত স্থূল উপাদানই উচ্চ-সাহিত্যের অলঙ্কার হইয়াছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও একটা নিজস্ব গুণ ইহার মধ্যে আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের স্থূল-রসিকতার মধ্যেই যে একটা বেপরোয়া ভাব, একটা অসঙ্কুচিত প্রাণবন্ত স্ফূর্ত্তির রস আছে, তাহা তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর এমন করিয়া প্রাণভরা মজার কাব্য লিখিতে কেহ সাহস করেন নাই। মজা বা আমোদ জিনিসটাই বাঙালীর জীবনে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আরও দুঃখের বিষয়, এই জিনিসটাই যেন মার্জ্জিত সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া উঠিয়াছে; হো-হো করিয়া হাসার ক্ষমতাই কমিয়া গিয়াছে। জীবনে সহজ ও সরস আমোদ কি ভাবে পাইতে হয়, ইতরতা হইতে একান্ত দূরে থাকিয়াও কি ভাবে জীবনে রঙদার স্ফূর্ত্তি ও মজা করা যায়, তাহা সাহিত্যে ফুটাইতে দ্বিজেন্দ্রলালের মতন আর কোন আধুনিক কবি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের জগতে একটা প্রাণমাতানো নিত্য উৎসব লাগিয়া আছে, তাহা Walpurgis Night-র স্ফূর্ত্তির আবিলতা হইতে মুক্ত অথচ প্রোজ্জ্বল। সে জগতে আমরা সাংসারিকতার দীনতা হীনতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তির আনন্দ পাই, Puck-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচার-বুদ্ধি লইয়াও Puck-এর ন্যায় আনন্দে বিচরণ করি। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার ইহা সামান্য দান নয়।

৫

তাহার পর আর একটু বেশি বয়সে ভাল লাগিত এই হাসির গানগুলির মহৎ, উদার, নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠা। ইহাদের সমস্ত রঙ-তামাসার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের একটা দীপ্ত আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং এই গানগুলিকে সাহিত্যের উচ্চ আসনে স্থান দিয়াছে। সমাজে ও চরিত্রে যেখানে যেখানে যে গলদ আছে, যে ন্যাকামি ও ভণ্ডামি সত্যের মুখোস পরিয়া সত্যের অপলাপ করিতেছে, যে মোহ ও আত্মবঞ্চনা একান্তভাবে আমাদের চিত্তকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই দ্বিজেন্দ্রলালের উজ্জ্বল হাস্যে প্রকট হইয়া ধরা পড়িয়াছে। বিলাতফেরতার দল, Reformed Hindoos, চম্পটির দল, নবকুলকামিনী সম্প্রদায়—কেহই তাঁহার বিদ্রূপের কশাঘাত হইতে রক্ষা পায় নাই; সৌখিন দেশসেবক, আত্মম্ভরী কবি, ধর্ম্মত্যাগী ভোগী, কপট ধর্ম্মব্যবসায়ী, অত্যাচারী শাসক, চতুর বিজ্ঞাপন-দাতা—সকলেই তাঁহার ব্যঙ্গের লক্ষ্যীভূত হইয়াছে। অনেক সময়ই দেখা যায়, তিনি সমাজের নূতন পন্থীদের মধ্যে যে সমস্ত চাল, ফাঁকি, ধাপ্পাবাজি, অসঙ্গতি আছে তাহাই বিশেষ করিয়া প্রকট করিয়াছেন; কিন্তু পুরাতনও বাদ যায় নাই, তাহাদের অন্তর্নিহিত মিথ্যা, অন্যায়ও তিনি বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। কখন কখন তিনি আধুনিক বাঙালী সমাজের দুর্ব্বলতা নয়, মনুষ্য-প্রকৃতির অনেক মজ্জাগত দোষ—যেমন বৃথা দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদির উপর শাণিত ব্যঙ্গের আঘাত করিয়াছেন। কাপুরুষতা এবং সাংসারিক সুবিধাবাদ মানুষকে কত হীন করিতে পারে (১), এবং এই হীনতা কিরূপে তথাকথিত ধার্ম্মিকতার মুখোস পরিয়া মানুষকে আত্মবঞ্চনায় প্রতারিত করিতে পারে (২), তাহাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। এক জায়গায় (৩) তিনি সামাজিক ভণ্ডামি ও আত্মবঞ্চনা উভয়কেই একযোগে বিদ্রূপবিদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কবিতায় তিনি তাঁহার কলাকৌশলের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেক সময় তিনি আজগুবি ভাবপ্রবণতার বিপক্ষে বিদ্রূপের কশা ধারণ করিয়াছেন। প্রেম (৪), প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য (৫), বিদেশ (৬) ইত্যাদি সম্পর্কে যে মিথ্যা ও অলীক ভাবপ্রবণতা সচরাচর চলতি আছে, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে অসহ্য ছিল।

এই সমস্ত কবিতায় শুধু সংস্কারকে কশাঘাত নহে, যথার্থ সাহিত্যস্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্প আছে। নন্দলালকে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া সহানুভূতি দিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে আমাদের প্রায় প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিদ্রূপে তীক্ষ্ণতা আছে, জ্বালাও আছে, কিন্তু তাহার চেয়েও আছে একটা অপরূপ শিল্প, যাহার ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানব-আত্মার ও বিশ্বের রহস্যের একটা তরঙ্গ। হাসিতে হাসিতে মাথা-ধরার একটা কথা আছে; দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে সমস্ত বিদ্রূপ ও সমালোচনার ভিতর দিয়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে একটা অনন্ত রহস্যের আভাস ও বিশ্বনৃত্যের একটা অনির্ব্বচনীয় ছন্দের স্পন্দন। হঠাৎ যেন মনে হয়, গণ্ডুষ-জলমাত্রে ফরফর করিতে করিতে আমাদের অজ্ঞাতে গভীর জলে আসিয়া পড়িয়াছি, সেখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আর আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইতেছে না।

যে আদর্শনিষ্ঠা এই গানগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য রচনার

---

(১) জিজিয়া, খুস্রোজ। (২) গীতা। (৩) চণ্ডীচরণ। (৪) বিরহযাপন। (৫) বসন্তবর্ণনা। (৬) বিলেত।

আদর্শবাদের ঐক্য আছে। একান্ত সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রের ঋজুতা ও দৃঢ়তা, মানুষের সাধারণ সুখদুঃখের জন্য একান্ত দরদ—এইগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের মতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি কল্পনাপ্রবণতা, ভাববিলাস মাত্রকে পছন্দ করিতেন না, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ করিয়া পুরুষের মত সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করা—ইহাই ছিল তাঁহার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই আদর্শকে আপাতত অতি সাধারণ মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবুকতা ও উচ্ছ্বাসের চেয়ে এই আদর্শই চরিত্রে ফুটাইয়া তোলা বোধ হয় শক্ত। ন্যায়বিচার, সত্য, সহানুভূতি ও কাণ্ডজ্ঞান—এই চারিটি স্তম্ভের উপর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার আদর্শ জগৎ গড়িয়া তুলিতে চাহিতেন; কিন্তু বাস্তব সংসার ও এই জগতের মধ্যে কত পার্থক্য! সংসারের দিকে চাহিলে মনে হয়, এ যেন দুর্লক্ষ্য একটা লক্ষ্য, তাহার জন্য একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, তাহার অভাবের জন্য বিষাদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই আদর্শ এত দুর্লভ বলিয়াই অনেক সময় দরদী দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপের সহিত একটা সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, এমন কি প্রশ্রয়শীলতা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই যে সব "ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে", তাহাতে তিনি আত্মহারা পাগলপারা না হইয়া শুধু প্রাণ ভরিয়া হাসেন। তাঁহার তীব্র অনুভূতি ও ঐকান্তিক আদর্শপ্রীতির সহিত একটা স্থিরমতিত্ব এবং সুবিবেচনা আনিয়াছে তাঁহার হাসি।

৬

ইহার পর মনে হইত, যেন এই হাসির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছে, কণ্ঠ বাষ্পনিরুদ্ধ হইতেছে। প্রথম বিয়ে হওয়ার পর যে প্রণয়ী খাম্বাজের সঙ্গে বেহাগ মিশাইয়া 'বাহা বাহা রে' বলিয়া গাহিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মোহভঙ্গের ইতিহাস পড়িয়া হাসিয়াছি। কিন্তু হাসিতে হাসিতে যখন শেষটায় পড়ি, "বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন, রচেছিলাম যাহারে", তখন হঠাৎ হাসি বন্ধ হইয়া যায়, চমকিয়া উঠিয়া ভাবি, কি ভুলই করিয়াছি! এ যে বাইবেলের কাহিনীর মত করুণ, 'প্যারাডাইস লস্টে'র ইতিহাস, এ যে মানব-হৃদয়ের নিত্য ও সনাতন ট্র্যাজেডির বৃত্তান্ত। তখন মনে হইল, এগুলি হাসির গান, না কান্নার গান? তখন দেখিলাম যে, এই হাসির তাৎপর্য্য অতি গভীর করুণরস। 'বিষ্যুৎবারের বারবেলায়' যে হতভাগ্য জন্মিয়াছিল, তাহার দুর্ভাগ্যের কারণ নির্দ্দেশটা হাস্যকর হইতে পারে, কিন্তু সে হাসিটুকু দিয়া শুধু অকারণে জীবন ভরিয়া অসহায়ভাবে লাঞ্ছনাভোগের যে অবিচ্ছিন্ন তিক্ততা আছে, তাহা একটু চাপা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই লাঞ্ছনা মানব-জীবনের করুণতম রহস্য, ইহাই বহু কবি ও ঔপন্যাসিকের লেখনীকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে, সত্য সত্যই এ সংসারে "প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত" হইতেছে ও হইবেই; মনে হয়, "হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহা চুক্" এবং এখানে যে "কুমীর ধর্লে ছাড়ে তবু ধর্লে ছাড়ে না স্ত্রী"—ইহা জীবনের অন্যতম করুণ সত্য। জীবনে যেটুকু সৌন্দর্য্য ছিল, তাহাও "যায় যায় যায়"; "ভোলানাথও" আজ "চিৎ" হইয়া পড়িয়া গেছেন, "চৌরাশী নরকের, সপ্ত স্বরগের" সঙ্গে "গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা"ও চলিয়া গিয়াছে, এখন "ডারুইন মিল", "জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া" প্রভৃতি অসুন্দর গন্ধময় আবর্জ্জনায় জীবন ভরিয়া উঠিতেছে। যে ধর্ম্মভণ্ড সুবিধামত মত বদলাইতে বদলাইতে

শেষটা "Theosophyর গর্ত্তে" পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি বিদ্রূপটা খুবই উপভোগ করিতাম, কিন্তু শেষে যখন দেখি বেচারা "Anne ও বেদাঙ্গ" প্রায় মিশাইয়া আনিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ "ভবলীলা সাঙ্গ" হওয়াতে তাহার সমস্ত পরিকল্পনা ভস্মসাৎ হইয়া গেল, তখন মনে হয় যে, বিদ্রূপের বাণ আমার এবং প্রতি মানবের বক্ষে আসিয়া বিদ্ধ হইতেছে। আমরা সকলেই কি ঠিক ঐ কাজই জীবন ভরিয়া করি না? ঐ ভাবেই ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া জীবনের পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটা সুখের স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করি না? এবং ঠিক ঐ ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া, জীবনের সমস্ত আশা অপূর্ণ রাখিয়া, জগৎ-রহস্যের কোন কূলকিনারা না পাইয়া হঠাৎ একদিন বুদ্বুদের ন্যায় শূন্যে মিশিয়া যাই না? মতামত সমস্তই জীবনের খোসার মত, নির্ম্মোকের মত মানুষ সর্ব্বদাই তাহাকে ত্যাগ করিতেছে এবং নূতন মত গজাইতেছে, এই মত-পরিবর্ত্তন মানুষের প্রাণশক্তির লীলারই পরিচয় মাত্র। অবস্থাচক্রে পড়িয়া আমরা এ দলে সে দলে ঢুকি, এ মত সে মত গ্রহণ করি, কিন্তু এ সমস্তই "বাহ্য"। আমরা সকলেই মানুষ, "নন্দলালে"র মত আমরা সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাই—এইটাই জীবনের প্রধান কথা। "এ ভবে রাজা প্রজা সবাই সমান, দেখলে একটু ভিতর ঢুকে", আসলে প্রবৃত্তির দিক দিয়া মানুষে মানুষে প্রভেদ খুব কম। তখন দেখি ভণ্ডামি ও বোকামির পিছনে রহিয়াছে চিরন্তন মানবাত্মা, সে আত্মা শিশুর মত অসহায় ও সরল, একটু কৃত্রিম বা খাঁটি আনন্দ, সৌন্দর্য্য, উল্লাস দিয়া খেলাঘর সাজাইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেই খেলাঘর বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া যাইতেছে, সেই জন্য মানুষের চিরন্তন ক্রন্দন। এই ক্রন্দনের রোল 'হাসির গানে'র প্রতি মূর্চ্ছনায় ও ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে।

৭

অনেক সাহিত্যশিল্পী এইখানেই আসিয়া থামিয়া যান, মানব-জীবনে ব্যর্থতার ক্রন্দনই তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টির শেষ কথা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যে ইহাই চরম তত্ত্ব নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হাসি ও কান্না পরস্পর জড়িত, একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। সংসারে যাহা করুণ তাহাই হাস্যাস্পদ, কিন্তু তাহাই মানবসুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক দার্শনিক ও সাহিত্যিকের মত একেবারেই দুঃখবাদী বা অবিশ্বাসী হইয়া যান নাই। 'হাসির গানে'র মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের যে বাণী ধ্বনিত হইতেছে, সে বাণী আমাদের আশ্বাস দেয় যে, মানুষের জীবন একেবারে নিরর্থক নহে, যদিও সেই অর্থ ব্যাখ্যা করা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে মানুষ এই ভাবেই চিরদিন চলিয়াছে ও চলিবে, তাহাতেই মানব-জীবনের যাহা কিছু বৈচিত্র্য, আনন্দ ও সার্থকতা। উঠিতে পড়িতে আঘাত খাইয়া ভুল করিতে করিতে চলাই মানব-জীবনে একমাত্র সম্ভব। এই জন্য জীবনযাত্রার রীতিতে তিনি একটা উৎকট আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন, ওমর খৈয়ামের মত সব ভাঙিয়া চুরিয়া হৃদয়ের ছাপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী নহেন। মোটের উপর তাঁহার কাছে "বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙীন"। দুনিয়ায় যে নানা বৈচিত্র্য, নানা রঙ ও রঙ্গ আছে, এবং সেই জন্য এখানে দুশো মজা আছে, তাহাই যথেষ্ট। বরং

অনেক হিসাবে তিনি রক্ষণশীল, আপোষে কাজ চালাইবার পক্ষপাতী। "যেমনটি চাই, তেমন হয় না" তাহা তিনি জানেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার "আসে যায় নাক অধিক"; বাস্তবের সহিত রফায় রাজি না হইলে যে জীবন চলে না, তাহা তিনি বেশ জানেন, এবং তদনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই জন্যই তিনি জীবনের সব ত্রুটি জানিয়াও প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রায়-নির্ব্বিকার মনোভাব খুব উদ্দীপক মনে না হইতে পারে। অবশ্য সিদ্ধপুরুষের সে উৎসাহ-দীপ্ত বাণী 'On to the city of God'—তাহা এখানে নাই। মানব-হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যথা আকাঙ্ক্ষা লইয়াই কবির কারবার, তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা খুবই শক্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল গোঁজামিল কোথাও ভালবাসিতেন না, গালভরা তত্ত্বকথা শুনাইবার লোভে তাঁহার কাব্যের খাঁটি সত্যে জল মিশাইতেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে করিয়াছিল দুর্জ্ঞেয়বাদী। জীবনের রহস্যের তিনি কূল-কিনারা পান নাই, জীবন তাঁহার কাছে সুখ-দুঃখের একটা সংমিশ্রণ মাত্র, "শুধু একটা ইঃ, আর একটা উঃ, আর একটা আঃ"। ফলে তাঁহার কাব্যে পাই একটা higher Epicureanism। তাই তাঁহার উপদেশ—

"খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙে ফুঁকে॥
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক না কেটে।
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে॥
আছিস তুই পেঁচার মতন বসে কেটা।
যাচ্ছিস কে উড়িয়ে ধূলো? যা না বেটা॥
দুদিনে ভবের মজা ভবের লেঠা যাবে চুকে,
বাহাবা! মজাদারি! বলিহারি!
বোম্ ভোলানাথ কপাল ঠুকে।

কপাল ঠুকিয়া বোম্ ভোলানাথ করিয়া জীবন যাপন করাই একমাত্র সদ্বুদ্ধি বুঝিয়া তিনি বলেন—

"মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের করো নাক কেউ মানা;
আমরা খাব নাকো চুরি করে দুগ্ধ, ননী, ছানা;
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার;
শুধু নাচিব একটু, গাইব একটু আমরা পাঁচটি এয়ার।

Ecclesiastes-এর বাণীর প্রতিধ্বনি যেন এখানে পাওয়া যায়।

৮

'হাসির গানে' যে criticism of life—জীবনের যে নিকষণ বা পর্য্যালোচনা আছে, তাহার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আর এক দিক দিয়াও ইহার বিশেষত্ব আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে 'হাসির গানে'র হাস্যরস মানুষের সুগোপন ব্যথা ও নৈরাশ্যকে রূপান্তরিত করিয়া বিশুদ্ধ রঙ্গরসে পরিণত করিয়াছে। এই রসানুভূতি আমাদের সুখ-দুঃখের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বন্ধন হইতে আমাদের

মুক্তি দেয়। যেমন অহৈতুকী প্রীতি আছে, তদ্রূপ একটা অহৈতুক রসের আস্বাদ দেয়; মনোজগৎ হইতে বুদ্ধিজগতে আমাদের উন্নয়ন করে; বৈষম্য ও অসঙ্গতি দেখিলেই তাহার উপর অট্টহাস্যের বাণবর্ষণ করিতে শিক্ষা দেয়, হউক না সেই বৈষম্য ও অসঙ্গতি আমাদের জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। "শুদ্ধা ভক্তি"র ন্যায় ইহা একপ্রকার "শুদ্ধা" রসিকতা। ইহার কাছে "নাচের সঙ্গে তবলার চাটি। আর টপ্পার সুরে হরিনাম" হইতে "জ্বরের সঙ্গে বিসুচিকা" ও "গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম" প্রভৃতি তুল্যমূল্য ও উপাদেয়। কখনও কখনও এই "শুদ্ধা" রসিকতা জীবন ও সৃষ্টির অসঙ্গতির সমালোচনা হইতে বিরত থাকিয়া বরং এই অসঙ্গতির মধ্যেও আনন্দ পায়। "বিলাতফের্ত্তা টানছে হুক্কা, সিগ্রেট টানছে ভশ্চায্যি" কিম্বা "আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্থলের চাইতে সিন্ধু" ইত্যাদি অসঙ্গতিই কৌতুক উৎপাদন করে।

কখনও কখনও এই রসিকতা কেবলমাত্র জীবনের তরঙ্গদোলাতেই আনন্দ পায়; ইহার কাছে একের পিঠে দুই বারো, দুই আর একে তিন, এবং "হাতির উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন" সবই সমান বিস্ময়কর ও পুলকবহ, আবার কোন কোন সময়ে ইহা বাস্তব ও সৃষ্টিকে ছাড়াইয়া উঠিতে চায়, "নতুন কিছু করো" বলিয়া লাফাইয়া উঠে; অসম্ভব অকল্পিতপূর্ব্ব এবং আমাদের হিসাবে অসঙ্গত অবস্থা-সমাবেশ কল্পনা করিয়া সৃষ্টিছাড়া একটা নূতন রসলোক সৃষ্টি করে। এই শুদ্ধা রসিকতা এবং এই অভিনব রসসৃষ্টির ক্ষমতাতেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

৯

'হাসির গানে'র ছন্দ, ভাষা ও রচনারীতির মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের একটা নিজস্ব গৌরব ও শক্তিমত্তার প্রকাশ দেখা যায়। সকল বড় কাব্যই বোধ হয় মিনার্ভা দেবীর মত সহজাত আভরণ লইয়া জন্মায়, একটা বিশিষ্ট ছন্দ ও রীতির মধ্যে ইহার ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করে। হাসির গানের মধ্যেও এই বিশেষত্ব আছে। একটা অসঙ্কুচিত দুঃসাহস, সনাতন প্রথাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া লঘু গুরুর যথেচ্ছ সংমিশ্রণ, একটা স্বেচ্ছাবিহারী মুক্ত লঘুতা সব দিক দিয়া এখানে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার ভাষার এবং অর্থের অলঙ্কার অনেক দিক দিয়া অপূর্ব্ব। বিলাতী অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে condensed sentence—যথা "চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে" ( গীতা )—anticlimax [ যথা—শশধর, Huxley & goose ] প্রভৃতি অনেকগুলি অলঙ্কার আমদানি করিয়াছেন। যেখানে উপমা প্রভৃতি প্রাচীন অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানেও একটা দুঃসাহসিকতা দেখা যায়, যথা, "যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে। যেমন গরু টানে গরুর গাড়ী"। গুম্ফ ভরিয়া হাসা প্রভৃতিতেও একটা চমৎকারিত্ব আছে। মাঝে মাঝে তিনি সাময়িক প্রয়োজনার্থ একটা অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে হাস্যের তরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়াছেন, যেমন "রঙ্গালয়ে ছাত্রগুলো কর্চ্ছে কোকেন চর্ব্বনাশ।" গুরুচণ্ডালত্ব পরিহারের সমস্ত নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া সাধু শব্দের সহিত গ্রাম্য শব্দ, সুপ্রচলিতের সহিত অপ্রচলিত, সহজের সহিত উৎকট, বাংলার সহিত ইংরেজী মিশাইয়া তিনি অপূর্ব্ব এক ভুনি-খিচুড়ি

সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার স্বাদ ও গন্ধ সাহিত্যের ভোজে অতুলনীয়। ‘হাসির গানে’র রচনা-রীতিতে মাধুর্য্য, প্রসাদ, লালিত্য, সারল্য প্রভৃতি চিরাচরিত কোন গুণ নাই। কিন্তু নির্গুণ মহাদেবের মত নিজের বিভূতিতে ইহা সব গুণের উপর উঠিয়াছে। ইহার ছন্দও লঘু ও ক্ষিপ্র; বরাবর স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে ইহা রচিত, এই হাল্কা ছন্দের ভিতর দিয়া তিনি অতি গভীর অনুভূতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, “টপ্পার সুরে হরিনাম” গাহিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার দাবি তিনি করিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এই ছন্দের নিয়মও রক্ষা করেন নাই; দুই চারিটা “স্খলন, পতন, ত্রুটি”, মাত্রাধিক্য ইত্যাদি এখানে সেখানে আছে, কিন্তু তাহাতে কাব্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বর্ষায় বেগবতী নদী যেমন কূল ছাপাইয়া ছড়াইয়া পড়ে, দুই তীরের শাসন মানে না, অথচ তাহার গতির তাল ভঙ্গ হয় না, দ্বিজেন্দ্রলালের ‘হাসির গানে’ যেন ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে।

১০

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা যে একেবারে সর্ব্বতোমুখী ছিল, তাহা বলা যায় না। তিনি বাংলা নাটকে ও বাংলা গানে একটা নূতন স্রোত আনিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিক দিয়া তাঁহার প্রভাব সাময়িক মাত্র। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হইতে গেলে যে ব্যাপকভাবে জীবনের উপলব্ধি থাকার এবং তাহাকে সুস্পষ্টভাবে ঘটনা-পারম্পর্য্যের মধ্যে জীবনের ছন্দ বজায় রাখিয়া নানা বিচিত্র কথায় ও কাজে ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা থাকা দরকার, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল না। আসলে তাঁহার প্রতিভা ছিল গীতিকাব্যের উপযুক্ত প্রতিভা, আকুল মানবচিত্তের ঝঙ্কার প্রকাশের প্রতিভা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল শুদ্ধ ভাবের আকাশে উড্ডীন হইতে পারিতেন না। যেখানে তিনি সে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার গান যেন ফাঁপা বলিয়া মনে হয়। জীবনের স্থূল সত্য সম্বন্ধে তিনি একান্ত সচেতন ছিলেন। এই স্থূল সত্যের কোথায় কোন্ ফাঁক আছে, ইহার ওপারে কি অতলস্পর্শ গহ্বর আছে, তাহা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। আকুল অনুভূতি লইয়া কঠোর সত্যের সমস্ত ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়া—এই বিষয়ে ছিল তাঁহার যথার্থ প্রতিভা; অন্যান্য রচনায় তাঁহার এই প্রতিভার কোন কোন দিক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যথার্থ পরিচয় পাই ‘হাসির গানে’।

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, এই প্রতিভার দান বঙ্গদেশ সম্যক গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রত্যেক বড় সাহিত্যিক তাঁহার দেশকে ও যুগকে একটা নূতন সম্পদ দান করিয়া যান, সেই দেশের ও যুগের চিন্তাধারা ও ভাবস্রোতের সহিত তাহারা অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের, মধুসূদনের, রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের দান বাঙালীর মনোজগতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সস্তা উচ্ছ্বাস-সর্ব্বস্ব নাটক ও গানের প্রভাব বাংলা দেশে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু এই অমূল্য হাসির গানগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ইহারা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহাদের যোগ্য বা অযোগ্য অনুকরণ বিশেষ কিছু হয় নাই, ইহা বাংলা সাহিত্যে বা বাঙালীর জীবনে একটা রচনা বা অনুভূতির পদ্ধতি বা ধারা আনিতে পারে নাই। কেন? আমরা কি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ভাববিলাসী? আমরা কি কাঁদিতে জানি, হাসিতে জানি না? স্থূল সত্যের স্থূলতা

কি আমাদের পীড়িত করে? জগৎরহস্যকে রহস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কি আমাদের বাধে, একটা সস্তা সমাধান না হইলে কি আমাদের চলে না? অপ্রীতিকর সত্যের ধারণা করার মত পৌরুষ, আধ্যাত্মিক বলিষ্ঠতা কি আমাদের নাই? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখানে শক্ত। কিন্তু মনে হয়, 'হাসির গানে'র দান যদি বাঙালী গ্রহণ করিতে পারিত, তবে সে অনেক বিড়ম্বনা ও মিথ্যা হইতে রক্ষা পাইত; তাহা হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির রুচি ও প্রকৃতি অনেক দিক দিয়া বদলাইয়া যাইত।

---

# প্রেতদের গান

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

আমরা থাকি পাতাল-তলে বৈতরণীর আর এক পারে;
জীবন কাটাই নরক-পুরীর দিবসবিহীন অন্ধকারে।
রক্ত-নদীর ফেনিল জলে
আমরা ডুবি গাহন ছলে,
মরণ-নেশায় মাতাল হয়ে
মাদল বাজাই মড়ার হাড়ে।
—বৈতরণীর আর এক পারে।

আর্দ্র ক্লেদের গন্ধ-ভরা নিকষ-কালো আকাশ-তলে
আমরা কাঁদি আর্ত্তনাদে অর্থবিহীন গানের ছলে।
অগ্নি-তরল লৌহ-পাতে
নৃত্য করি নিত্য রাতে,
অঙ্গ সাজাই ভস্ম-ভূষায়
কঙ্কালেরি অলঙ্কারে।
—বৈতরণীর আর এক পারে।

আমরা ঘুরি কবর মাঝে শবের পচা মাংস লাগি,
মড়ার কালো রক্তে মোরা তৃষ্ণা মিটাই রাত্রি জাগি।
তন্দ্রা-ছাওয়া আবছা চোখে
অন্ধকারে হঠাৎ শোকে
আমরা হাসি কাঁদার ঝোঁকে
সদ্য চিতায় শ্মশান-ধারে।
—বৈতরণীর আর এক পারে।

মৃত্যু-দূতের আজ্ঞা বহি আমরা যমের অযুত সেনা
মিটিয়ে কবে এলেম জানি আর জীবনের সকল দেনা।
এখন মোরা রুদ্র-রূপে
ভয়ঙ্করের আঁধার-স্তূপে
আপনি খুলি আপন কপাল
প্রদীপ জ্বালাই বুকের ধারে।
—বৈতরণীর আর এক পারে।

ঊর্দ্ধে মোদের পৃথ্বী জাগে জমাট মাটির সীমার শেষে,
ওই তো তারি কলধ্বনি আলগা হাওয়ায় যায় যে ভেসে!
সেথায় মানুষ আলোর কোলে
বসন্তেরি স্বপ্নে দোলে,
আমরা হেথায় বিস্মরণের
মন্ত্র জপি নরক-দ্বারে।
—বৈতরণীর আর এক পারে।

# আকাশ ও নীড়

শ্রীস্বর্ণকমল রায়

—মাস্টারবাবু, ও মাস্টারবাবু!

ছোট স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার রাজেনবাবু একটু সচকিত হইয়া বসিলেন। টিকিট কিনিবার জানালার ওখান দিয়া একটা লোক কথা কহিতেছে। এখানকার সকলেই তাঁহাকে মাস্টারবাবু বলিয়াই ডাকে। ঘাড়টা সেদিকে একটু হেলাইয়া রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে? হীরু? কি বলছিস?

—বলছি কি মাস্টারবাবু, আমেদপুরের গাড়িটা কখন আসবে গো?

—এখনও দেরি আছে। রাত্রি নটার সময়।

ইহাদের ট্রেনের সময় বলিয়া দিতে হইলে মিনিটের উল্লেখ না করিলেও চলে। একটা মোটামুটি বলিয়া দিলেই বেশ কাজ চালাইয়া লয়।

—সেই রাত লটায়!—একটু ভাবিয়া হীরু আবার বলিতে লাগিল, লাঃ, জ্বালাল দেখছি, কোথায় ভেবেছিলুম কাজকর্ম্ম সেরে লিয়ে একটু গড়াল দিব, তা আর হতে দিলে না দেখছি। বড় মেয়েটা আজ আবার কাচ্চা-বাচ্চা লিয়ে আসছে কিনা, তাই। দেখ তো মাস্টারবাবু, এখন কয়টা বাজতে লেগেছে।

ঘড়ির দিকে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাস্টারবাবু নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, সাতটা বেজে গেছে।

—যাই, ততক্ষণ রাধুর ওখানটা একবার ঘুরে লিই গে।—বলিয়া লোকটা একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রাজেনবাবু তেমনই বসিয়া রহিলেন।

মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল সেই গৃহিণীর লক্ষ্মী-প্রতিমার মত স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিখানি, যিনি তাঁহাকে বাল্যকালে মানুষ করিয়াছিলেন, যাঁহার মমতাময় স্নিগ্ধ দৃষ্টির শীতল ছায়ায় রাজেন একটি পরম তৃপ্তিকর মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়াছিল। জীবনের সেই অসহায় সময়ে ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মনের যে গভীর শূন্যতা ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার তুলনা আজ আর সে খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু স্টেশনের এই কামরাটিতে বসিয়া ইঁহাদের কথা মনে করিয়া যে ব্যথা সে পাইতেছিল, তাহার মধ্যেও ছিল একটি করুণ মাধুর্য্য, কৃতজ্ঞচিত্তের একটি বিনীত শ্রদ্ধানুভূতি।

—ওগো, ও মাস্টারবাবু!

রাজেনবাবু ঘুরিয়া দেখিলেন, টিকিটের জানালায় একটি বৃদ্ধা কথা কহিতেছে। ল্যাম্পের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়া গালের কুঞ্চিত চামড়ার গভীর রেখাগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

—কি চাই বুড়ী?

—একটা টিকিস দাও বাবা, ছেলেটার বড্ড অসুখ। পরাণ আজকে এসে বললে, বেদম জ্বরে

আজ চারটা দিন বেহুঁস হয়ে প'ড়ে আছে, ঐ তো একটা ছেলে।—বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—কোথায়, যাবি কোথায়?

সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া দেওয়ালে হাতটা পুঁছিতে পুঁছিতে বৃদ্ধা করুণ কণ্ঠে কহিল, নতুনগঞ্জে গো, ছেলেটা ঐখানেই চালের আড়তে কাজ করে কিনা।

—হুঁ, একটু পরে টিকিট কিনিস, এখনও দেরি আছে, যা।

—একটু ভাল দেখে দিও বাবা, যেন আজ রাতেই পেঁাছে যেতে পারি।

—আচ্ছা দোব 'খন, এখন যা।

বৃদ্ধা চলিয়া গেল। এখান হইতে নতুনগঞ্জ কাল বেলা নয়টার আগে পৌঁছানো যায় না। কিন্তু এ রকম দুই একটা মিথ্যা কথা না বলিলে চলে না।

বাহিরে চাঁদের আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ঝিঁঝির ডাকটা থামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাজেনবাবুর বাড়ির সামনে দুইটা রাস্তার কুকুর বিকট চীৎকার করিয়া ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জগুয়া ও তাহার সঙ্গীর আর সাড়া পাওয়া যাইতেছে না, হয়তো অন্য কোথাও গিয়াছে। ওদিকে প্ল্যাটফর্মের এক পাশে ইটের উনানের উপর ভাত রাঁধিতে রাঁধিতে জমাদার রঘুনাথ যে গান জুড়িয়াছে, তাহাই কানে আসিতেছে।

তাহার শৈশবের লীলাভূমি আনন্দপুরকে মনে পড়িতে লাগিল। এমনই এক রাত্রে যখন জ্যোৎস্নাধারায় আনন্দপুরের সমস্ত পথ-ঘাট বন দীঘির পাড় প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন জমিদার-বাড়ির বাহিরের মহলের একটা কোঠায় রাজেন তাহার লণ্ঠনটা জ্বালিয়া পাঠ তৈয়ারি করিতেছিল, অতু আসিয়া তখন তাহাকে জোর করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার পুতুলের বিবাহ-উৎসবে যোগ দিবার জন্য। সেই কতদিন আগেকার এই একটি রাতের কথা আজ আবার মনে পড়িতেছে। অন্দরের চক-মিলানো বাঁধানো উঠানের এক পাশটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বিবাহের আসর বসানো হইয়াছে, অপর পাশে শতরঞ্জি মাদুর ইত্যাদি বিছাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গও বাদ যায় নাই। বাঁশে বাঁধিয়া দুই তিনটা গ্যাসের আলো ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও তাহারই আলোকে সমস্ত উঠানটা ভরিয়া গিয়াছে। ছাঁদনাতলায় মাকে ধরিয়া পিঠালি দিয়া সুন্দর করিয়া আলপনাও দেওয়া হইয়াছে। ওদিকে কনেকে দিবার জন্য খাট, বিছানা, বাসন ও গহনাপত্র সবই সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, যাহাতে নিমন্ত্রিতেরা দানসামগ্রী সবগুলিই ভাল করিয়া দেখিতে পায়। বাহিরে এক দল বাজনদার সানাইয়ে করুণ রাগিণী ধরিয়াছে। রান্নাঘরে লুচি-ভাজার ঘিয়ের গন্ধে সমস্ত উঠানটা আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে, পিসীমা রান্নাঘরে দেখাশুনা করিতেছেন, আর মা এদিকে বিবাহের খুঁটিনাটি সমস্ত যোগাড় করিতে বসিয়াছেন। অতু আজ বড় ব্যস্ত, এক মুহূর্ত্ত বসিবার অবকাশ নাই, বাসন্তী রঙের একটা শাড়ি পরিয়া আঁচলে একটা চাবির থোকা বাঁধিয়া সে ব্যস্তসমস্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর ব্যস্তই বা হইবে না কেন? তাহারই তো পুতুলের বিবাহ। রাজেনকে টানিয়া আনিয়া উঠানে

একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিতে দিয়া অতু কহিল, তুমি ব'স রাজুদা, পালিও না কিন্তু, আমি এক্ষুনি আসছি। একবার দেখে আসি পিসীমা মাছের কালিয়াটা নামাল কি না। দেখছ, মেয়ের বিয়ে দেওয়া কত মুস্কিল! রাজেনকে বসাইয়া দিয়া ও সে যাহাতে চলিয়া না যায় এরূপ একটা কড়ার করিয়া অতসী রান্নাঘরের তদারকে চলিয়া গেল। সেদিনের সেই এগারো বছরের অতসীর মুখে এই সব কথা শুনিয়া ও তাহার হাবভাব দেখিয়া রাজেনের সত্যই হাসি পাইয়াছিল। রাজেন পিঁড়িতে বসিয়া রহিল, অতসীর আজ দম লইবার অবসর কোথায়? গ্রামের যত বন্ধু ও সমবয়স্ক মেয়েরা আসিয়া ভিড় করিয়াছে, তাহাদের কলরবে ও সানাইয়ের সুরে মনে হইতেছে, সত্যই যেন একটা বিবাহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে।

মা আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, এই যে রাজু এসেছ। ওদিকে অতুটা তো তোমাকে খুঁজে খুঁজে মরছিল। সকালে আমাকে বললে, আজ যদি রাজুদা না আসে, তা হ'লে রাজুদার সঙ্গে আর কখনও খেলব না, কথাও বলব না। তারপর একটু হাসিয়া কহিলেন, উঃ, মেয়েটা এই তিন দিন ধ'রে যে কি কাণ্ডটাই করছে এই পুতুলের বিয়ে নিয়ে!

রাজেন কহিল, হ্যাঁ মা, সেই জন্যই তো ওর সঙ্গে আজ দু তিন দিন ধ'রে আমার দেখাই হয় নি।

মা কহিলেন, অথচ ও তোমাকে রোজই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাকে বললে, রাজুদাকে নেমতন্ন করব কি, তার তো দেখাই পাই না! এর আগে কি তুমি ওর সঙ্গে দেখা কর নি রাজু?

মাটির দিকে চাহিয়া রাজেন কহিল, না।

মা একটু হাসিয়া কহিলেন, ও বুঝেছি, দুজনের বুঝি ফের ঝগড়া হয়েছে? নইলে তোমাদের দুজনের যে দু তিন দিন দেখা হয় নি, এটাও তো বড় আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে! তা তোমাদের যে কখন ভাব হয়, কখন রাগ হয়, তাও বুঝতে পারি না।—বলিয়া মা আবার একটু হাসিলেন।

মা ঠিকই বলিয়াছেন। তিন দিন আগে অতসী ও রাজেনের মধ্যে ঠিক হইয়াছিল যে, বাগানের ঐ দীঘিতে দুপুরবেলা মাছ ধরিতে হইবে। কিন্তু পুতুলের এই আসন্ন বিবাহের দিনটা ঠিক করিতে ও জিনিসপত্রের যোগাড় করিতে সে এতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেদিন সে মোটেই আসিতে পারে নাই। ইহাতে রাজেনের হইয়াছিল অভিমান ও সেই জন্যই সে এই কয়টা দিন কেবলই অতসীকে এড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা অতসী যখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, লক্ষ্মী রাজুদা, সেদিন দুপুরে আসতে পারি নি ব'লে রাগ ক'র না। জান তো, পুতুলের বিয়ে দেবার জন্যে অনেক কাজ করতে হয়েছে। আজ পুতুলের বিয়ে; চল, তোমাকে যেতেই হবে, নইলে আমি কিচ্ছু করব না। তখন রাজেনের মন হইতে অভিমানের বোঝাটা আপনা হইতেই নামিয়া গেল। এরূপ মান-অভিমানের পালা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, তাহাতে বরং একটু মাধুর্য্য পাওয়া যায়।

অতসী তখন বালিকা। কৈশোরের অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল তাহার সমস্ত দেহ-মনকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। লজ্জা, সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার ছায়া তখনও মনে রেখাপাত করিতে পারে নাই; একটা নিঃসঙ্কোচ সজীবতা তাহার চিত্তের চপলতাকে যেন আরও মধুর করিয়া তুলিত। মাথায় [illegible]রাশ

ঘন কালো চুল, অনুন্নত মসৃণ কপালের উপর তাহারই দুই চারিটা গুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছে; ঘনপক্ষ্ম-সন্নিবিষ্ট আয়ত চোখ দুইটির নির্ভীক চাহনি—এই মুখখানা আজ উজ্জ্বল হইয়া মনে পড়িতেছে। এই কিশোরীই কি একদিন তাহার খেলার সাথী ছিল না? হ্যাঁ, সেই অতসী, যাহার সহিত সুদীর্ঘ বারো বৎসর দেখা-শুনা নাই, সেই তাহার গ্রাম্য-জীবনের কয়টা বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সাথী ছিল। তাহাকে গল্প শুনাইয়া, তাহার খেলায় যোগ দিয়া ও তাহার নানা আবদার রক্ষা করিয়া সেও তো তাহার কাছে পরম প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। নিষুতি দ্বিপ্রহরে মার আচারের বয়াম হইতে অপহৃত আচারের এক অংশ রাজুদাকে না দিলে তাহার যেন কোন তৃপ্তিই হইত না। আমের বাগানে যখন রাজুদা তাহারই জন্য পাখী ধরিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিত, তখনও সে ছিল তাহার পার্শ্বচরী, দীঘির পাড়ে ছিপ ফেলিয়া রাজুদা যখন একদৃষ্টে জলের দিকে চাহিয়া থাকিত, তখনও সে হাত দুইখানির উপর মাথাটা রাখিয়া গভীর মনোযোগের সহিত ফাতনার দিকে চাহিয়া থাকিত। রাজুদার সকল কাজের, সকল খেলার সেই ছিল একমাত্র স্বার্থহীন সঙ্গী।

একটা দিনের কথা। আগে সামান্য একটা কারণে রাজুদার অভিমান হইয়াছে, সে তাই মুখখানা গম্ভীর করিয়া নিজের ঘরটিতে বসিয়া আছে। অতসী আসিয়া কহিল, শিগ্‌গির দেখবে এস রাজুদা, বেড়ালটার কেমন সুন্দর তিনটে ছানা হয়েছে। এই এত্তটুকু-টুকু, এখনও চোখ ফোটে নি।

বিরক্ত হইয়া রাজেন কহিল, তুই দেখগে যা, আমি যাব না।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অতসী অপ্রস্তুতের মত মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজেনও বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। যে আনন্দ লইয়া সে বিড়ালছানার খবরটা রাজেনকে দিতে আসিয়াছিল, তাহা যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে উপেক্ষিত হইবে, অতসী ভাবে নাই। কখন যে অতসীর চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছিল, রাজেন তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়িতেই একটা অপরিসীম বেদনায় তাহার মনটা ভরিয়া উঠিল। আহা, অতু কি সব সময় তাহারই খেলায়, তাহারই আনন্দে আসিয়া যোগ দেয় নাই? তবে আজ কেন সে তাহাকে এমন একটা নির্ম্মম আঘাত দিয়া বসিল? উঠিয়া আসিয়া অতসীর হাত দুইখানি ধরিয়া কহিল, কাঁদিস নি অতু, তোর সঙ্গে নিশ্চয় খেলব। চল, বেড়ালছানা দেখে আসি, আয়। এতটুকুতেই অতু খুশি। রাজেনের কাছে সে যে কোন কটু কথাই শুনিতে পারে না। পরমুহূর্ত্তেই রাজুদাকে লইয়া বিড়ালছানা দেখিতে দেখিতে উচ্চহাস্যে মনের সমস্ত ভার হাল্কা করিয়া তুলিল।

বড় মেয়ে লক্ষ্মী কখন আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়াছে, রাজেনবাবুর খেয়াল নাই। হঠাৎ চোখ ঘুরাইতেই দেখিলেন, একটা অত্যন্ত ময়লা জামা গায়ে দিয়া মেয়েটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটার চেহারাতে কোথাও এতটুকু শ্রী নাই; সামনের দাঁতগুলি যেন উপরের ঠোঁটটাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঠোঁটটা যেন হার মানিয়া উপরে সরিয়া গিয়াছে। মাথার চুলগুলি রুক্ষ, বহুদিন বোধ হয় তেল পড়ে নাই। গলার নীচে একপুরু ময়লা যেন কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে। হাত-পাগুলিতে খড়ি উঠিয়াছে, তাহার উপর সমস্ত দিন ধুলা-বালি লইয়া খেলার পর সেগুলিকে আর ধোয়াও হয় নাই। জামাটাতে সরিষার তেলের

একটা উৎকট গন্ধ। মুহূর্ত্তে রাজেনবাবুর মনটা বিষাইয়া উঠিল। এই দৈন্যের মধ্যে এগুলি আসেই বা কেন? কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই তোর?

মেয়েটা মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া মাটির দিকে দৃষ্টি নামাইল, যেন এখানে আসিয়া বাবার কাছে সে একটা মস্ত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। বাবার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। রাজেনবাবু আরও একটু জোরে কহিলেন, বল না, কি বলবি! খোকা মেরেছে বুঝি?

—না।

—তবে আবার কি?

—মার আজ আবার হাঁপানি হয়েছে। তোমার খাবার ঢাকা দিয়ে মা শুয়ে পড়বে, তাই—

—আচ্ছা।

মেয়েটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কখন যে সেই কিশোরী অতসীর মধ্যে যৌবনের রূপলাবণ্য কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাহারও চোখে পড়ে নাই। সেই চপল চোখ দুইটির উপর নামিয়া আসিয়াছে একটি সলজ্জ স্নিগ্ধ দৃষ্টি; কথার মধ্যে আসিয়াছে একটা সংযত ভাব, আর সমস্ত দেহকে আশ্রয় করিয়াছে একটি রমণীয় কুণ্ঠা। অকারণে কলহাস্য আর নাই, তাহার বদলে ঠোঁটের কোণে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে। রাজেনের সঙ্গে তাহার দেখা হয়, কথাও হয়, কিন্তু পূর্ব্বেকার সে প্রগল্‌ভতা যে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। সেই যে খেলিবার জন্য বালিকাসুলভ একটি সকরুণ মিনতি তাহার অনুরোধের মধ্য দিয়া বাজিত, সেটিও থামিয়া গিয়াছে। অকারণে আজ আর তাহার দেখা মিলে না। যে অতু কিছুদিন আগেও তাহার পিছুপিছু ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ কিসের ইঙ্গিতে সে ধীরে ধীরে তাহার কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর নিজেরই অগোচরে কখন যে তাহার মন সেই উদ্ভিন্নযৌবনা অতসীর দিকে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহা সে টেরও পায় নাই। সেদিনের সে কিশোরীর প্রতি তাহার যে স্নেহ ছিল, সেটা কেমন ধীরে ধীরে একটা অন্য রূপে আসিয়া দেখা দিল, যেন একটা বহুরূপী আর একটা রূপ ধরিয়া তাহাকে ভুলাইতেছে। কিন্তু এ রূপে আর সে রূপে কত পার্থক্য! তখন তাহার মধ্যে যে নির্ম্মল সরলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারই মধ্যে একটা সঙ্কোচ ও ভীরুতা আসিয়া জুটিয়াছে। অতসী আর তাহার কাছে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না; দাঁড়াইলেও সহজভাবে মুখ তুলিয়া কথা বলে না। বয়সের সহিত অতসীর যেমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, ঠিক সেই সঙ্গেই রাজেনের স্নেহেরও একটা রূপান্তর ঘটিয়াছে। অতসীকে সে সত্যই ভালবাসিয়াছিল। অতসীও টের পাইয়াছিল যে, তাহাদের দুইজনের মধ্যে সেই শৈশবের সরলতায় কোথায় একটা বক্রতা আসিয়াছে। অন্তরের এই এত বড় একটা অনুভূতি দুইজনের কাছেই ধরা পড়িয়া গেল।

তারপর চাকরির উমেদারিতে রাজেনকে গ্রাম ছাড়িয়া আসিতে হইল শহরে, পিছনে পড়িয়া রহিল তাহার আনন্দপুর ও অতসী। তারপরই চলিয়াছে জীবনের এই অভিনয়; কঠিন বাস্তবের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া সেও নিজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে—এই স্টেশন, এই হাঁপানি-রোগগ্রস্তা

স্ত্রী ও অপোগণ্ডগুলি লইয়া। এরই মাঝে কোথায় মিশাইয়া গেল অতসী, কোথায় মিশাইয়া গেল সে। কোন্ এক বিরাট চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে ঘুরপাক খাইয়া কে কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই।

হ্যাঁ, অতসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে কলিকাতার কোন এক নামজাদা ইঞ্জিনীয়ারের সহিত। সেও তো আজ বছর দশ এগারো আগেকার খবর; তাহার পর আর কোনও খবর রাজেন পায় নাই। কেবল দিনের পর দিন কাটিয়া ষোল বৎসর আগেকার জীবনের সেই অধ্যায়টার শেষে একটা গভীর পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে।

টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা বাজিয়া উঠিল, আগের স্টেশন হইতে ট্রেন ছাড়িয়াছে তাহারই সংবাদ। হীরুর বড় মেয়ে আসিবে কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া, অসুস্থ ছেলেটাকে দেখিতে সেই বুড়ীকে নতুনগঞ্জে যাইতে হইবে। বাহিরে আরও কয়েকটি যাত্রী টিকিটের জন্য কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জগুয়া আসিয়া সিগন্যাল-বক্সের চাবি লইয়া গেল। রঘুনাথ আহারের পর ঢেঁকুর তুলিতে তুলিতে আসিয়া দুইটা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া গেল।

—পাঁচহাটির তিনটা টিকিট দিবেন।

—আমাকে রতনগঞ্জের দুইটা টিকিট মাস্টারবাবু, কত লাগবে?

—দশ আনা।

—আমারে রসুলপুরের দুইটা ছ্যান মাস্টারবাবু, একটু জলদি দিবেন, পোলাটা আবার কাঁইদবার লাইগছে।

বৃদ্ধা আবার আসিয়াছে, রাজেনবাবু তাহাকে টিকিট দিয়া দিলেন, সে দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। এমনই আরও গোটা কয়েক যাত্রী। বাস্, আর কেহ নাই। রাজেনবাবু আবার টেবিলের কাছে আসিলেন। লাইন ক্লিয়ারেন্সের রসিদটা লিখিয়া জগুয়ার হাতে দিয়া দিলেন, গেটের কাছে না হয় রঘুনাথটাই দাঁড়াইবে। বহুদিন ট্রেন আসার সময়টা বাহিরে গিয়া দাঁড়ানো হয় নাই। চেয়ারের হাতল হইতে সাদা জিনের কোটটা গায়ে দিয়া রাজেনবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে, তাহারই মাঝে অল্প কয়েকটি যাত্রী এখানে ওখানে বসিয়া আছে। সামনে দিয়া রেলের লাইনটা আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরের ঐ আবছা বনানীর মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে, ইহার এক পাশে ডিস্ট্যান্স-সিগন্যালের লাল আলোটা একটা রক্তচক্ষুর মত জ্বলিতেছে। মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশের গায়ে তারাগুলি এক একটা ছোট ছোট দীপের মত দেখাইতেছে, মাঝে মাঝে দুই একটা নিশাচর পাখী ছুটিয়া পলাইতেছে। অপেক্ষারত যাত্রীদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ছাড়া প্রকৃতির এই গভীর মৌনতায় বাধা দিবার আর কিছু নাই। খানিকটা দাঁড়াইয়া রাজেনবাবু পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলেন। মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এই চঞ্চলতার মধ্যে কোথায় যেন একটু মাধুর্য্যও লুকানো ছিল, আর সেইটার অনুভূতিই তাঁহাকে বাহিরের এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে বারবার টানিয়া আনিতেছিল।

ঐ ল্যাম্প-পোস্টটার নীচে একটা কুকুর সামনের দুই পায়ের উপর মাথাটা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে, বোধ হয় ট্রেনের যাত্রীদের উচ্ছিষ্টের লোভেই তাহার এই সহিষ্ণুতা। আরও একটু দূরে ছোট ছোট ছেলেপিলে লইয়া গোটা কয়েক স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কে একজন একটা স্তন্যপানলোভী শিশুকে বারবার মিথ্যা ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েক হাত ব্যবধানে দুইটা লোক একটা তোরঙ্গের উপর বসিয়া গল্প করিতেছে, যেটুকু কানে আসিতেছে তাহাতে বোঝা যায় যে, গ্রামটার লুপ্ত সম্পদই তাহাদের আলোচ্য বিষয়। ওখানে ঠিক লাইনের ধারে বসিয়া একটা লোক প্রবলবেগে কাসিতেছে, ও একবার কাসিটা থামিতে না থামিতেই কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা আবার ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম করিতেছে। মাত্র এই দশ পনরো মিনিটের জন্য এই সকল যাত্রীদের কথাবার্ত্তায় স্টেশনটা একটু সজীব হইয়া উঠিয়াছে। এর পরেই ট্রেন আসিবে, তিন মিনিট দাঁড়াইবে, তখন হয়তো আরও একটু কলরব শোনা যাইবে, তারপরই তো ট্রেন ছাড়িয়া দিবে, পিছনে পড়িয়া থাকিবে এই জনশূন্য স্টেশনটা। তারপর সমস্ত রাত্রির স্তব্ধ মৌনতার মধ্যে সিগ্‌ন্যাল-পোস্টটা নিত্যকার সজাগ প্রহরীর মত ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, ধীরে ধীরে তেল ফুরাইয়া আলোটাও কখন নিভিয়া যাইবে।

ঠং-ঠং-ঠং-ঠং।—জগুয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। ট্রেন আসিতেছে। হ্যাঁ, ঐ তো একটা প্রখর আলোর ঝলক লাইনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ঐ তো তালগাছটার পাশ দিয়া ট্রেনটা একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মত হু-হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই আসিল, আসিয়া পড়িল বলিয়া। যেন একট নিষ্ফল আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল। রাজেনবাবু হাত দুইটা পিছন দিকে মুঠি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইঞ্জিনটা চলিয়া গেল, পিছনের গাড়িগুলা একের পর এক ঘট-ঘটাং-ঘটাং শব্দ করিয়া আগাইতেছে। এই একটা, এই দুইটা, তিনটা, সবগুলাতেই লোক। আবার একটা কামরা। স্টেশনে বেশ একটু তাড়াহুড়া লাগিয়া গিয়াছে। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। রাজেনবাবুর সম্মুখে একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা আসিয়া লাগিল। কিন্তু একি! কামরার জানালা দিয়া যে মুখটি বাহিরের প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া আছে, একি সেই ষোল বৎসর আগেকার পরিচিত মুখখানি নহে? রাজেনবাবু আরও ভাল করিয়া দেখিলেন। হ্যাঁ, সেই মুখই বটে, নূতনত্বের মধ্যে কেবল এই যে মাথায় খানিকটা কাপড় দেওয়া রহিয়াছে। অতসী ছাড়া এ মুখ কাহারও হইতে পারে না। জীবনের এই একটা শুভ মুহূর্ত্তে যদি তাহার দেখা ক্ষণেকের জন্যও মিলে, তাহা হইলে সেইটাই তো ভবিষ্যৎ জীবনের একটা মূল্যবান সঞ্চয় হইয়া থাকিবে। চট করিয়া হাতল ধরিয়া রাজেনবাবু কামরাটায় উঠিয়া পড়িলেন। ভিতরে ঢুকিয়া মুখটা আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন, কে, অতু না?

মুহূর্ত্তে অতসী চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, ওমা, রাজুদা যে, তুমি এখানে কোত্থেকে?—বলিতে বলিতে আগাইয়া আসিয়া গলায় আঁচলটা জড়াইয়া প্রণাম করিল। মুখে একটা ম্লান হাসি টানিয়া রাজেনবাবু কহিলেন, এই তো এই স্টেশনেই স্টেশনমাস্টার, চার বছর ধ'রে রয়েছি। অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মাঝের বেঞ্চে একটি বছর ছয় সাতের সুন্দর ছেলে ঘুমাইতেছে, ধবধবে সাদা বিছানা, বুক পর্য্যন্ত একটা বিলাতী কম্বলে

ঢাকা। তাহার উপর ঘুমন্ত শিশুর মুখটি একটা ফুলের কুঁড়ির মতই দেখাইতেছে। একসঙ্গে মনে পড়িল, লক্ষ্মীর সেই ময়লা জামাটা, মেজ ছেলেটার নীলরঙের জীর্ণ প্যাণ্টটা, বিছানার সেই তুলা-বাহির-করা তোষক আর তেলচিটা বালিশগুলা, রাজেনবাবুর ছেলেমেয়েরা তাহাতেই রাতের পর রাত ঘুমাইয়া কাটাইতেছে; আর এই সুকোমল শিশু—সেও ঘুমাইতেছে। কিন্তু—

ওদিকে গাড়ির মেঝেতে একটা বয়স্থা ঝি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। কামরাটা নানান দামী জিনিসে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে। অতসী মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই রাজেনবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বিশ বৎসর আগেকার সেই খেলার সাথী আজ তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া, কিন্তু সেদিনকার সেই অতসীর সহিত আজিকার এ অতসীর কত প্রভেদ! যে ছিল একদিন তাঁহার খেলার সাথী, যে তাঁহার প্রথম যৌবনের সকল স্বপ্নকে ঘিরিয়া ছিল, আজ সেই অতসী বিবাহিত জীবনের স্বচ্ছন্দ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। আজ তাহার দৃষ্টিতে ফিরিয়া আসিয়াছে সেই নির্ভীকতা, অহেতুক সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি সহজ লৌকিকতা, ও দেহের কমনীয়তায় প্রকাশ পাইয়াছে গৃহলক্ষ্মীর অপরূপ শ্রী। বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই খেলাঘর ছাড়িয়া সে আজ আর একটা খেলাঘরে ঢুকিয়াছে, কিন্তু সেখানে রাজুদার স্থান কই?

অতসীর পরণে একটা লালপাড় সিল্কের শাড়ি, গায়ের উপর একটা ছোট চাদর, মাথার সিঁথিতে সিঁদুর, সেই অনুন্নত কপালের মাঝখানে বড় রকমের একটা সিঁদুরের টিপ, তাহার উপর আজও তেমনই দুই একটা অলকগুচ্ছ আসিয়া দোল খাইতেছে। হাসিয়া রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তা তুই হঠাৎ এ পথে একলা চলেছিস?

অতসী কহিল, এই তো মাসখানেক হ'ল ওঁর সঙ্গে ভরতপুরে গিয়েছিলুম, উনি আজকাল ওখানেই আছেন কিনা, কিন্তু খোকনটার শরীর ভাল রইল না, তাই ওকে নিয়ে আজ কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। উনি কাজ সেরে পরে আসবেন।

—ও, ওটি বুঝি তোর ছেলে? তা, এই একটিই নাকি?

হাসিয়া অতসী কহিল, না, বড় আর একটি ছেলে আছে, সে কলকাতায় তার ঠাকুমার কাছেই থাকে।

যে অতসী একদিন খেলার পুতুলের বিবাহ দিয়াছিল, আজ সে মাতৃত্বের গৌরবে দীপ্তিমতী। রাজেনবাবু একটু আগাইয়া আসিয়া খোকনের নরম গাল দুইটিতে একটু হাত বুলাইয়া দিলেন। অতসী কহিল, আজ কি ভাগ্য বল তো রাজুদা? কত বছর পরে তোমার সঙ্গে যে এমন হঠাৎ দেখা হবে, তা একেবারে ভাবতেই পারি নি।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজেনবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, হুঁ, কতকাল পরে যে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল!

অতসী কহিল, কিন্তু তোমার চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে রাজুদা, খুব খাটুনি বুঝি?

—হ্যাঁ, খাটুনি তো বটেই। অতসীর কণ্ঠস্বরে মনে হইল, সে যেন দীর্ঘকাল পরের এই সাক্ষাৎটাকে খুব সহজ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। রাজেনবাবু আবার একটু হাসিলেন।

অতসী আবার হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার বউ কোথায়? ছেলেপিলে কটি হয়েছে?

—এখানেই আছে। ছেলে দুটো, আর মেয়ে একটা, মেয়েটাই বড়।

হুইস্‌ল বাজিয়া উঠিল। রাজেনবাবু উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা, চলি তা হ'লে অতু, অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল, আবার কবে—

অতসী আবার একটা প্রণাম করিয়া কহিল, কলকাতায় গেলে-টেলে দেখা ক'র কিন্তু রাজুদা।

—আচ্ছা, করব।

ট্রেনটা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, রাজেনবাবু নামিয়া পড়িলেন। ঐ জানালা দিয়া অতসী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, কামরাটা সরিয়া যাইতেছে। আবার ঘট-ঘটাং-ঘটাৎ শব্দ করিয়া পিছনের গাড়িগুলি আগাইতেছে, অতসীকে আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। চোখের সামনে দিয়া সমস্ত ট্রেনটা চলিয়া গেল, শেষ গাড়িটার পিছনের তীব্র লাল আলোটা দেখা যাইতেছে; মনে হইল, কোন একটা অপরাধের জন্য সেটা তাঁহাকে শাসাইয়া গেল।

ট্রেনটা চলিয়া গিয়াছে। স্টেশনটা আবার নির্জীবের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাজেনবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া নিজের কামরাটায় ঢুকিলেন। হ্যাঁ, পরের স্টেশনে আবার গাড়ি ছাড়িবার সংবাদটা পাঠাইতে হইবে তো, নয়টা বিশ হইয়া গিয়াছে। লম্বা টেবিলটার সামনে দাঁড়াইয়া রাজেনবাবু টেলিগ্রাফের যন্ত্রের উপর আরম্ভ করিলেন, টরে-টক্কা-টক্কা-টক্কা।

রাজেনবাবু যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। গিয়া দেখিলেন, স্ত্রী তখনও হাঁপাইতেছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জানালা দিয়া এক ফালি চাঁদের আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়া বড় মেয়েটার শ্রীহীন মুখখানাকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ক্লান্তকণ্ঠে স্ত্রী বলিলেন, বড় রাত হয়ে গেল আজ, ভাতগুলো বড্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দাঁড়াও, একটু গরম ক'রে দিই।

—না, থাক।

—অত ঠাণ্ডা ভাত খেতে বড্ড কষ্ট হবে যে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্ত্রী উঠিয়া ভাতগুলি গরম করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজেনবাবু একদৃষ্টে তাঁহার ঘুমন্ত পুত্রকন্যাগুলির পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। অসহায় নিরীহ শিশুগুলি। তিনিই উহাদের পৃথিবীতে আনিয়াছেন, উহারাই তাঁহার শূন্য জীবনে সার্থকতা আনিয়াছে, উহারা তাঁহারই, আর কাহারও নহে। কুৎসিত? কে ব'লে উহারা কুৎসিত? অমন নিষ্পাপ নিরীহ মুখশ্রী কখনও কুৎসিত হইতে পারে? মেজ ছেলেটার মাথা হইতে বালিশটা সরিয়া গিয়াছিল, পরম স্নেহভরে রাজেনবাবু তাহা ঠিক করিয়া দিলেন।

—এস, ভাত বেড়েছি।

রাজেনবাবু স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। চিরকাল রোগে ভুগিতেছে, কিন্তু চিরকাল সেবাপরায়ণা। এত দৈন্যের মধ্যে, এত অসচ্ছলতার মধ্যে, এত অসুবিধার মধ্যে নিজের নিদারুণ ব্যাধিসত্ত্বেও অক্লান্তভাবে সেবা করিয়া চলিয়াছে। অকস্মাৎ রাজেনবাবু তাঁহার চিররুগ্না স্ত্রীর মধ্যে মহিমময়ী নারীকে প্রত্যক্ষ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অতসী তাঁহার কে? সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে ঐশ্বর্য্যের আবেষ্টনীতে ক্ষণিকের জন্য যে নারী আসিয়া চলিয়া গেল, সে তাঁহার কেহ নয়। আকাশের ঐ সুদূর নক্ষত্রটার মতই সে কখনও কাছে আসিবে না। তাঁহার এই স্ত্রী, তাঁহার সন্তানের জননী, তাঁহার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী—এই তাঁহার সব, এই তাঁহার জগৎ; নক্ষত্রের মোহে যে মাটিতে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাকে ভুলিলে চলিবে কেন? মাটি মলিন হউক, কিন্তু মাটিই তাঁহার নির্ভর।

রাজেনবাবুর আকাশবিলাসী মন নীড়ের স্বপ্নে মধুর হইয়া উঠিল।

# ভাষা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

হে আমার ভাষা,
অসম্পূর্ণ এখনো প্রত্যাশা—
তৃপ্তিহীন রহিল এখনো।
কেন,
কেন তুমি হতে নাহি পার
আরো তীক্ষ্ণ, আরো দীপ্ত, তীব্রতর আরো,
তোমার শাণিত-দীপ্তি বিদ্যুতের মত
কেন চক্ষু করে না আহত ?

বল, বল কবে
স্পর্শে তব তীব্রতম তড়িতের সঞ্চালন হবে ?
কবে তব বৈদ্যুতিক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি আসি
অন্তরের অন্ধতম কক্ষগুলি তুলিবে উদ্ভাসি ?
কবে তব কলহাস্যধারা
দীর্ণ করি বাহিরিবে পর্ব্বতের কারা—
তীক্ষ্ণ-স্রোতে ভেসে যাবে যার
গভীর নৈরাশ্য যত, উর্দ্ধোত্থিত কর্ণভেদী যত হাহাকার ?
বাসনার বহ্নিদীপ্ত জ্বালাময় আশ্লেষের আকর্ষণে কবে
রোমকূপে রোমকূপে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ যত সঞ্চালিত হবে,
মাধুর্য্যের তীব্রতায় পরিপূর্ণ, কিংবা কালকূটে
তোমার চুম্বন-রস আজও নহে উৎসারিত তব রক্ত ওষ্ঠাধরপুটে,
খরস্রোতা রসনির্ঝরিণী
কবে হবে উদ্বেলিত আজও যাহা গুপ্ত তব উৎসমূলে অন্তরচারিণী,
রুদ্রনৃত্যে উন্মত্ত প্লাবনে
ছুটিয়া চলিবে কবে ভাবের অতলগর্ভ প্রশান্তির সমুদ্রের পানে ?

# পাথরের কথা

ডক্টর শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন ),
টি. ডি. ( লণ্ডন ), ডি. লিট. ( প্যারিস ), এফ.জি.এস.

পাথরের নাম করতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন একটা কিছু, যা খুবই কঠিন ও নীরস। কিন্তু সব পাথরই যে কঠিন নয়, আর পাথরের বুকে অফুরন্ত রস সঞ্চিত থাকে, এ কথা আমাদের অনেকের জানা নেই। পাথরের দান মাথা পেতে না নিলে, আমাদের চারপাশের অনেক কিছুই আজ দেখতে পেতাম না। তা ছাড়া দধীচি যেমন নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে দেবতাদের বাঁচিয়েছিলেন, তেমনই পাথরেরাও নিজেদের জীবন দিয়ে আবহমান কাল থেকে আমাদের বাঁচিয়ে আসছে।
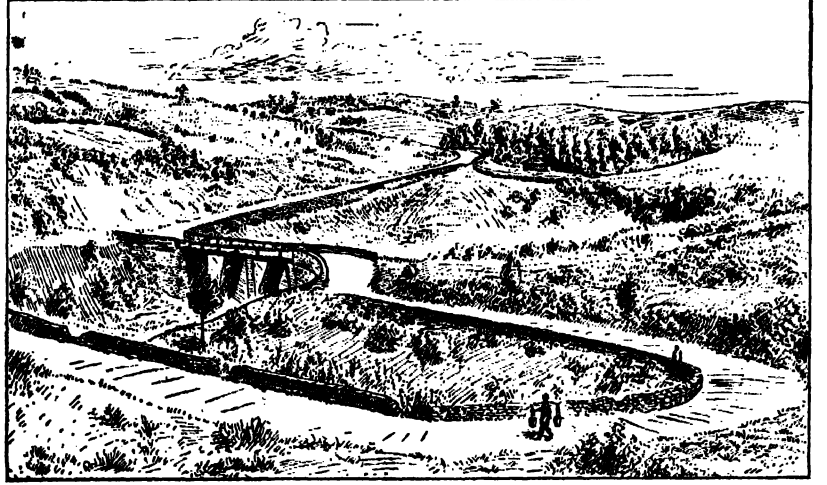
গৌহাটি-শিলং পথ। রূপান্তরিত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে

পাথরের অধিক পরিচয় না জানার একটা প্রধান কারণ, আমাদের দেশে পাহাড় বড় একটা দেখা যায় না; এখানে হাজার হাজার হাত মাটির নীচে পাথর লুকিয়ে রয়েছে। কাজেই এদের সঙ্গে পরিচয় করতে হ'লে শিলং, দার্জ্জিলিং বা ছোটনাগপুরের পাহাড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রথমে ধরা যাক, শিলঙের খাসিয়া পাহাড়। গৌহাটি থেকে শিলঙের পথ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে, গাছে ঢাকা ছোট ছোট গ্রামগুলি দেখতে ছবির মত; কাছেই হয়তো কোন পাহাড়ী নদী ব'য়ে যাচ্ছে, আর তারই জল নিয়ে গ্রামের লোকেরা পাহাড়ের গায়ে চাষ-আবাদ করছে। এখানেও পাথরের নগ্ন মূর্ত্তিকে মাটির আড়ালে ঢেকে রাখার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু মাটির স্তরের গভীরতা আমাদের দেশের মাটির চেয়ে অনেক কম ব'লে যেখানেই বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে গেছে, সেখানেই পাথর বের হয়ে এসেছে।
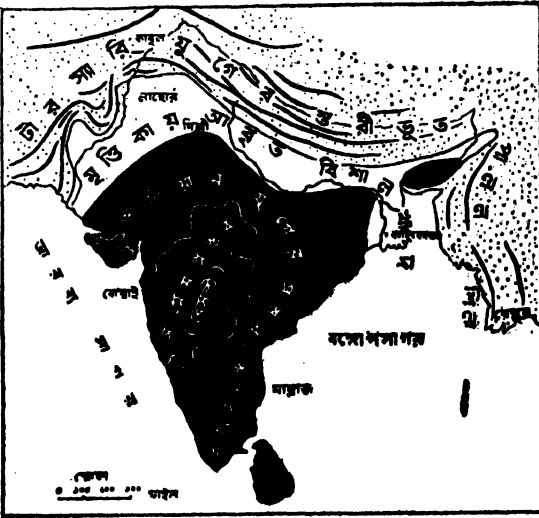
ভারতের পাথর। উত্তরে পালল শিলা হিমালয়, দক্ষিণে রূপান্তরিত ও আগ্নেয় বেসল্টের অধিত্যকা এবং মধ্যে মৃত্তিকায় আবৃত উত্তর ভারতের সমতল প্রদেশ

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, হিমালয়ের জন্মের কোটি কোটি বৎসর আগে, আর্কিয়ান যুগে এই পাথরের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং যুগযুগান্ত ধ'রে প্রকৃতির বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হ'লেও রূপের পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। এই জিনিসটাই এখন আমাদের কাছে রূপান্তরিত

(metamorphic) পাথর নামে পরিচিত। কেবলমাত্র খাসিয়া পাহাড়ে নয়, ছোটনাগপুর মধ্যপ্রদেশ রাজপুতানা এবং দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই পাথর পাওয়া যায়।

জোন্‌হা জলপ্রপাত, রাঁচি

রূপান্তরিত পাথরদের মধ্যে অন্তত মার্বল ও স্লেট, এই দুইটির নাম আমরা সকলেই শুনেছি।

যোধপুর রাজ্যের মেক্রানা খনির নিখুঁত মার্বল পাথর না পেলে জগৎপ্রসিদ্ধ তাজমহলের সৃষ্টি সম্ভবপর হ'ত না। জব্বলপুরের মার্বল পাহাড়ের মধ্যে একরকম পাথর পাওয়া যায়, তা এত নরম যে নখ দিয়ে তার ওপর অতি সহজে দাগ কাটা যায়। এর নাম ষ্টিয়েটাইট (steatite) বা সাবান-পাথর (soapstone)। নদী কখনও শক্ত আবার কখনও নরম পাথরের মধ্য দিয়েও ব'য়ে যায় ব'লে কোথাও কোথাও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়; রাঁচির জোন্‌হা আর হুন্‌ড্রু ফল্‌স এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। রূপান্তরিত পাথরের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক খনিজ পদার্থ (mineral) পাওয়া যায়, যেমন সিংহলের গ্র্যাফাইট, দাক্ষিণাত্যের ম্যাঙ্গানিজ, সিংভূমের লোহা ও তামা, বর্ম্মার চুনি ও নীলা ইত্যাদি।

'আগ্নেয়' ( igneous ) ও 'স্তরীভূত পালল' (sedimentary) পাথরই ঘটনাচক্রে 'রূপান্তরিত' (metamorphic) পাথরে পরিণত হয়, যদিও পৃথিবীর বড় বড় পাহাড়ে আগ্নেয় ও পালল পাথর ছাড়া অন্য কোন পাথর বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের দেশে পালল পাথর হিমালয়ের প্রধান উপাদান, এবং গুজরাট, কাঠিওয়ার, দাক্ষিণাত্য, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় ২ লক্ষ বর্গ-মাইল স্থান অধিকার ক'রে আগ্নেয় পাথরের পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে আগ্নেয় পাথর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক, কারণ প্রথমত সব পাথরের উপাদান কোন না কোন কালে আগ্নেয় পাথরের মধ্যে ছিল, আর দ্বিতীয়ত মাটির স্তর যেমন নীচেকার পাথরকে ঢেকে থাকে, তেমনই পালল বা রূপান্তরিত পাথর নীচেকার আগ্নেয় পাথরকে ঢেকে আছে। এই পাথরের নামকরণ দেখে সহজে অনুমান করা যেতে পারে যে, আগুনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বাস্তবিক জাম্‌সেদপুর বা কুল্‌টির লোহার কারখানায় আগুনে গলানো লোহার মতই আগ্নেয় পাথর উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় ছিল; এবং গলানো লোহা যেমন ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন লোহায় (pig iron) পরিণত হয়, তেমনই গলা-পাথর ঠাণ্ডা হওয়ার সময় জমাট বেঁধে শক্ত পাথরে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরে ব্যারেন দ্বীপ এই ভাবেই সৃষ্ট হয়। এখনও প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে গলা-পাথর কি ক'রে শক্ত পাথরে পরিণত হচ্ছে, তা দেখতে পাওয়া যায়।

এই পাথরের নাম বেসল্ট (Basalt)। কলকাতায় ট্রামওয়ে কোম্পানি কালো রঙের বেসল্ট পাথরের ইটের
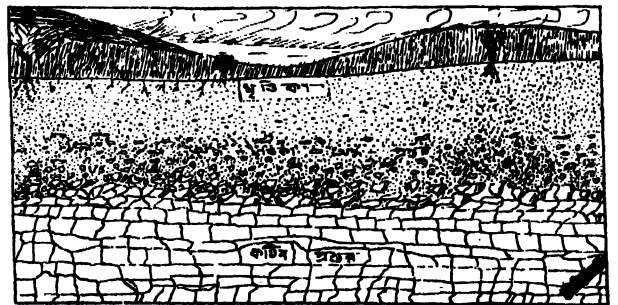
কঠিন পাথরের মাটিতে পরিণতি

ব্লক ব্যবহার করেন। কলকাতার রাস্তায় বেসল্ট স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে ধারণা করা শক্ত যে, এই পাথরের বয়স হিমালয়ের চেয়েও বেশি, এবং ক্রিটেসস (cretaceous) যুগের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যে এই জিনিসটা কতই না

অনর্থের সৃষ্টি করেছিল। গত উত্তর-বিহার ভূমিকম্পের সময় পাটনা ও মজঃফরপুরের অনেক রাস্তা ফেটে চৌচির হয়ে দেশের অনেক ক্ষতি করে, কিন্তু ক্রিটেসস যুগে দাক্ষিণাত্যের ভূপৃষ্ঠ যে ভাবে ফেটেছিল, তার তুলনায় ভূমিকম্পের ফাটা কিছুই নয়। হাজার হাজার মাইল লম্বা সুগভীর ফাটলের ভেতর থেকে রাশি রাশি গরম গলা-পাথর বের হয়ে আসে, ও বন্যার জলের মত চারিদিক ভাসিয়ে দেয়। সুখের বিষয়, তখন মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে হয় নি, তা না হ'লে ইউরোপের বিখ্যাত পম্পিয়াই শহরের ধ্বংসের মত বহু শহর ও গ্রামের সকল চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যেত।

বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রতটের কাছে বেসল্ট পাথরের পাহাড় দশ হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু উত্তরে সিন্ধুপ্রদেশে বা পূর্ব্বদিকে অমরকণ্টকের কাছাকাছি বেসল্টের পাহাড় খুব বেশি উঁচু হয় না। বেসল্টের পাহাড় দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন খুব চওড়া কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে নেমে আসছে। এই জন্যই ভূতত্ত্ববিদেরা এর নাম রেখেছেন দাক্ষিণাত্যের ধাপ (Deccan trap)। বেসল্ট পাহাড়ের ওপর দিকটা

রাক্ষসতাল হ্রদের মধ্যে হংসদ্বীপ

এক রকম লাল মাটি বা পাথরে ঢাকা প্রায়ই দেখা যায়, কারণ পাহাড়ের বেসল্ট ধীরে ধীরে ক্ষয় পেয়ে আমাদের দেশে ল্যাটেরাইট নামে এক রকম পাথরে পরিণত হয়। ল্যাটেরাইটের রং লাল, এবং এ প্রথমে এত নরম থাকে যে, অতি সহজে পাহাড় থেকে কেটে বার করা হয়, কিন্তু কাটা ল্যাটেরাইট কিছুদিন ফেলে রাখলে খুব শক্ত হয়ে যায়। এই গুণের জন্য ল্যাটেরাইট পাথর দিয়ে খুব কম খরচে বাড়ি রাস্তা তৈরি করতে পারা যায়। লাল ল্যাটেরাইট ছাড়া এক রকম কালো মাটি বোম্বাই অঞ্চলে দেখা
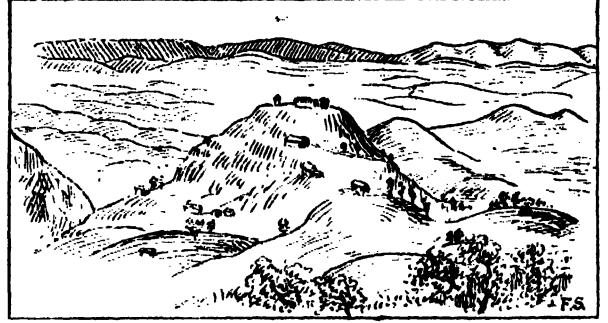
গ্রানাইটের ঢেউ খেলানো ছোট ছোট পাহাড়

যায়, ইহারও উৎপত্তি বেসল্ট পাথর থেকে। শুধু বেসল্ট কেন, পাথরমাত্রেই রোদ জল বাতাসের প্রভাবে মাটিতে পরিণত হয়; তা না হ'লে পৃথিবীতে গাছপালা জন্মাবার সুযোগ পেত না, আর গাছপালা না জন্মালে আমরাও বাঁচতে পারতাম না। কাজেই আমরা বলতে পারি, পাথরেরা নিজেদের জীবন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

কোন কোন পাহাড়ে আর এক রকম আগ্নেয় পাথর পাওয়া যায়, তার নাম গ্রানাইট। গ্রানাইট বেসল্টের চেয়ে হাল্কা এবং এর মধ্যে চকচকে অভ্র, ছোট ছোট স্ফটিকের দানা, আর সাদা বা গোলাপী রঙের ফেল্‌স্পারকে সহজে চিনতে পারা যায়। গৌহাটি থেকে শিলঙের পাহাড়ের মাথায় গ্রানাইটের বড় বড় গোল টুকরোগুলি দেখলে মনে হয়, যেন একটি একটি ক'রে কেউ সাজিয়ে রেখেছে। শিলং ছাড়িয়ে চেরাপুঞ্জি যেতে আরও বেশি গ্রানাইট দেখা যায়, এখানকার ঢেউ খেলানো ছোট ছোট পাহাড় দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এবার গ্রানাইটের পাহাড়ের মধ্যে আসা গেছে। ভারতের অন্যান্য জায়গায়

বিন্ধ্যপর্ব্বতে বেলে পাথরে জলের স্রোতের দাগ

রূপান্তরিত পাথরের মধ্যে আগ্নেয় পাথরের অনেক 'শিরা', 'উপশিরা' দেখা যায়। এমনই একটি শিরা থেকে গয়া বা হাজারিবাগ অঞ্চলে অভ্র, এবং মহীশূরে সোনা পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এক সময় আসবে, যখন হিমালয়ের মত অভ্রভেদী পাহাড়ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ভারতের সব চেয়ে উঁচু পাহাড় ছিল আঁরাবল্লী; এর বয়সের তুলনায় হিমালয়কে শিশু বললেই চলে। কিন্তু আজ পৃথিবীর উঁচু পাহাড়দের মধ্যে আরাবল্লীর কোন স্থান নেই। যুগযুগান্ত ধ'রে রোদ জল ও বাতাসের সঙ্গে একে যুদ্ধ করতে হয়েছে; কাজেই, এর অধিকাংশ পাথর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাথরের ভাঙা টুকরাগুলি পাহাড়ের ওপর থেকে নদীবক্ষে এসে পড়ে ও স্রোতের বেগে অন্য
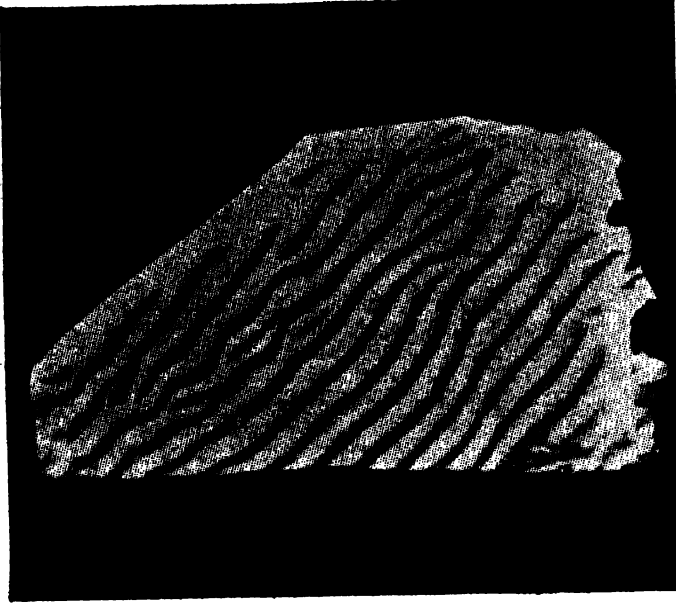
রূপান্তরিত পাথরের সঙ্গে মিলে মিশে গ্রানাইট থাকে। এই পাথর শুধু ছোট ছোট পাহাড় সৃষ্টি ক'রেই সন্তুষ্ট থাকে না, হিমালয়ের খুব উঁচু শিখরগুলি—গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি গ্রানাইট পাথরের তৈরি।

বেসল্ট বা গ্রানাইটের বড় বড় পাহাড় ছাড়াও একটু আধটু জায়গা অধিকার ক'রে বহু জায়গায় আগ্নেয় পাথর বাস করে। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি কয়লা-খনির মধ্যে এমন দেখা যায় যে, কয়লাস্তর ফেটে গেছে, আর সেই ফাটলের মধ্যে আগ্নেয় পাথর রয়েছে। আগ্নেয় পাথরের দুপাশের কয়লা পুড়ে একেবারে ঝামা হয়ে যাওয়ায় কোন কাজেই আসে না।

আগ্নেয় পাথর কেবল যে মানুষের অপকারই করে, তা নয়। একবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে এ আমাদের অনেক কাজে লাগে। বিপদের আশঙ্কা সব সময় থাকা সত্ত্বেও বিসুবিয়সের চারদিক ঘিরে লোকেরা বাস করে, কারণ আগ্নেয় পাথর ক্ষয় পেয়ে যে মাটির সৃষ্টি হয়, তার উর্ব্বরতাশক্তি খুব বেশি। তা ছাড়া দক্ষিণ' আফ্রিকায় বিখ্যাত হীরা আগ্নেয় পাথর থেকে সংগ্রহ করা হয়। আমাদের দেশে

আমেরিকায় একটি আর্ত্রিক কূপ

জায়গায় ভেসে যায়। ভাসবার সময় পরস্পরের ঠোকাঠুকি লেগে পাথরের টুকরাগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে শেষ পর্য্যন্ত বালির কণায় পরিণত হয়। বালিরাশি সাগরের বুকে আশ্রয় পেলে ধীরে ধীরে চাপ বাঁধে। একেই আমরা পালল পাথর বলি। পালল পাথরদের মধ্যে 'বেলে পাথর' (sandstone) ও চুনপাথর বা পাথুরে চুন (limestone) আমরা সকলেই দেখেছি। কলকাতার অধিকাংশ পাথুরে চুন সিলেট থেকে আসে। সিলেট থেকে রপ্তানি হয় ব'লেই একে আমরা সিলেটী পাথর বলি, কিন্তু এ পাথরের আদি বাড়ি চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে। কাশীর গঙ্গার ঘাট, আগ্রা ও দিল্লীতে মোগল সম্রাটদের আমলের ফোর্টগুলি বেলে পাথরের তৈরি।

রাঁচির হুনড্রু জলপ্রপাতের উপরে নদীগর্ভের দৃশ্য

পালল পাথরের স্তর পাহাড়ের গায়ে বেশ সাজানো থাকে, এই জন্যই আমরা একে স্তরীভূত (stratified) পাথর বলি। এই পাথর জন্মাবার সময় খুব নরম থাকে, তখন জলের ঢেউ বা বৃষ্টির ফোঁটার দাগ সহজেই এর ওপর পড়ে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের অনেক পাথরে এই প্রকারের দাগ এখনও দেখতে পাওয়া যায়, এবং পাথর যে জলতলেই সৃষ্ট হয়েছিল, তা দাগগুলি ভাল ভাবেই প্রমাণ ক'রে দেয়। দার্জ্জিলিং বা সিমলায় দাঁড়িয়ে কে ভাবতে পারে যে, এই বিরাট হিমালয় পাহাড় প্রাচীন টেথিস মহাসাগরের মধ্যে জন্মলাভ করেছিল? কিন্তু কাছেই কোন এক পাথরের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল (fossil) দেখলে হিমালয়ের সমুদ্রে জন্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাস করবার আর কোন কারণ থাকে না। শুধু হিমালয় কেন, পৃথিবীর অন্যান্য উঁচু পাহাড়, যেমন—আল্পস, রকি, অ্যাণ্ডিস ইত্যাদি সমুদ্রতলেই সৃষ্ট হয়েছিল।

কৈলাস পর্ব্বত

পাহাড়ে অনেক ঝরণা আমরা দেখতে পাই, কারণ পাললিক পাথরের ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্যে বৃষ্টির জল জ'মে থাকে এবং সুযোগ পেলেই ঝরণা হয়ে বাইরে আসে। অনেক জায়গায় একটু খুঁড়ে দিলে পাথরে সঞ্চিত জল সবেগে ওপরে ওঠে, তখন আর কষ্ট ক'রে জল তুলতে হয় না। ফ্রান্সে আর্ত্তোয়া প্রদেশে এই ধরণের কুয়া প্রথম পাওয়া যায় ব'লে এর নাম রাখা হয়েছে—আর্ত্রিক কূপ (artesian well)।

পালল পাথরের মধ্যেও অনেক খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তার মধ্যে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের নাম বিশেষ ক'রে উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা এই দুটিকে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠছে।

# গাজন-গীতি

শ্রীসুনীলকুমার বসু

বাংলার পল্লীজীবনের সহিত যে দেবদেবীদের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রহিয়াছে, তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ এবং হরগৌরীর কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদেরই লীলার ইতিহাস লইয়া যে মধুর কাব্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বহু শত বৎসর ধরিয়া বহু পল্লীবাসীর বোধের ও আত্মার ক্ষুধা মিটাইয়া আসিতেছে এবং আজও যে মিটাইতেছে না, তাহাও নহে। আজও পল্লীর সবুজ মাঠ, শ্যামল ঘাট, গোময়লিপ্ত তুলসী-প্রাঙ্গণ, পল্লীবাসীদের সরল হৃদয় সেই রসে অভিষিক্ত। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলির লোকপ্রিয়তা ও প্রসার অসাধারণ, ইহাদের আওতায় পড়িয়া শৈব সঙ্গীতগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছিল ; লোকে বলিত, কানু ছাড়া গান নাই। কিন্তু কানু ছাড়াও গান আছে এবং তাহা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়, যদিও উভয়ের ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যাইতে পারে যে, রাধাকৃষ্ণের গান সৌন্দর্য্যের এবং শৈব সঙ্গীত সমাজের গান। চৈত্র মাসের শেষে চড়কপূজার সময় কয়েকদিন ধরিয়া গাজনের উৎসব চলে। শিবভক্ত গ্রামবাসীরা সঙ সাজিয়া দল বাঁধিয়া বাহির হন এবং বাড়ি বাড়ি গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ান। এই উপলক্ষে এই হরগৌরী-বিষয়ক গানগুলি গীত হইয়া থাকে। গ্রামে গাজন-গীতির সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর। এমন অনেক গান আছে, যাহা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। রচয়িতার পরিচয় পাওয়া কঠিন ব্যাপার। অনেক গানের ভণিতায় লেখকের নাম আছে বটে, কিন্তু পরিচয় নাই, এবং গায়কেরাও কোন তথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। বহুদিন ধরিয়া এগুলি গ্রামবাসীদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের শিক্ষার ও অনুপ্রাণনার একমাত্র উপায়স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সমালোচকেরা বলেন, মহাকাব্য দুই প্রকার, epic of growth এবং epic of art বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—একলা কবির কথা। প্রথমোক্ত মহাকাব্য কোন একলা কবির রচনা নহে, বহু কবির রচিত অনেকগুলি কথা ও কাহিনী আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হইতে হইতে, হঠাৎ একদিন কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির প্রতিভার স্পর্শে সমগ্রতা প্রাপ্ত হয়। হোমারের ইলিয়াড ও অডিসি এই ধরণের মহাকাব্য বলিয়া অনেকের অনুমান। মনে হয়, গাজন-গীতিগুলিও কোন অলিখিত মহাকাব্যের খণ্ডিত অংশমাত্র। হয়তো কোন দিন কোন সুরসিক পল্লীকবি ইহাদের একত্রে গ্রথিত করিয়া একটা বিরাট মহাকাব্যের রূপ দিতে পারিতেন। ইহা বাংলার জাতীয় সম্পত্তি, বাংলার প্রাণের জিনিস। ইহাকে শুধু শৈব সঙ্গীত বলিলে ভুল করা হইবে, ইহা গ্রাম্য জীবনের একটি নিখুঁত ছবি। পল্লীর বিষাদ-মধুর গার্হস্থ্য-জীবনের কথা স্মরণ করিয়া যখনই নামহারা পল্লীকবিদের চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই ইহাদের সৃষ্টি।

আমরা জানি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যেরই বেশি প্রচলন ছিল। অবশ্য মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট টেক্‌নিকের আভাস ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা ও ছন্দের দিক হইতে

দেখিলে গাজন-গীতির সহিত ইহার একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বৈষম্য টেক্‌নিকের দিক হইতে। ইহাও অবশ্য দেবদেবীর পূজা-প্রচারের জন্যই রচিত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের স্বপ্নাদেশ, অশেষ দুঃখযন্ত্রণার দ্বারা অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস জাগাইয়া তোলা প্রভৃতি কতকগুলি যে ধরাবাঁধা নিয়ম আছে, গাজন-গীতিতে তাহার অনুসরণ করা হয় না। ইহাতে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের বুকের উপর দেবকীর্ত্তির স্তম্ভ স্থাপিত হয় না, এখানে দেবতা আপন মাধুর্য্যে, আপন সরলতায় মানুষের মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চিরস্থায়ী আসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তবু উভয়ের বিষয়বস্তু অনেক স্থলে এক, সেই দুই সতীনের কলহ, সেই কন্যাদায়, দাম্পত্যজীবনের দুই একটি ছোটখাটো মান-অভিমানের ব্যাপার। এক কথায় দরিদ্র বাঙালী ঘরের একখানি ছবি। তাই ভাবের অকৃত্রিমতায়, ছন্দের স্বাভাবিকতায় গাজন-গীতিগুলি মঙ্গলকাব্যের কথা, বিশেষ করিয়া মুকুন্দরামের কথা, মনে করাইয়া দেয়। গঠন-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া পৃথক হইলেও মনে হয়, ইহাদের অন্তরে যেন একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতার সুর বাজে। পল্লীর যে খোলা হাওয়া এবং খোলা প্রাণের পরিচয় এই গাজন-গীতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই ছিল।

মনে হয়, পল্লীকবিরা অন্তত মুকুন্দরাম এবং বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের প্রভাব ধরা পড়িয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোচ-রমণীর বেশে দুর্গা শিবকে স্বীয় পরিচয় দিতেছেন—

আমার দুটি ছেলে দুটি মেয়ে তাদের আমি এলাম থুয়ে,
আমি ফিরি মৎস্যের অন্বেষণে।
ঐ আর মা বাপের চক্ষু খেয়ে মা বাপ দিল বিয়ে,
আরও মরি সেই অভিমানে।
তবে স্বামী আমার সিদ্ধি খায়, যেখানে সেখানে রয়,
গৃহে এলে খরদর মুখ।
... ... ... ...
জাতে আমি বাগ্‌দীর মেয়ে মথুরার থে এলাম বেয়ে,
হিমালয় পর্ব্বতে আমার ধাম।
তবে, চিনিলে চিনিতে পার, তোমারে কহিলাম দঢ়
দুর্গা বাগ্‌দিনী আমার নাম॥

আবার

পরিচয় কি দিব বল ওহে গুণমণি।
দুই সতীনের ঘরে হই জনমদুখিনী॥
রূপবতী বলে স্বামী তারই ঘরে থাকে।
আমায় হীনরূপা বলে ফিরে চায় না আমার দিকে॥

এখানে ভবানন্দের নিকট অন্নদার আত্মপরিচয়ের কথা এবং মগরার নিকট খুলনার করুণ চিত্রখানি মনে আসিয়া যায়। আবার,

কিবা রামরম্ভা উরু ধনীর, কামধনু ভুরু,
তিলফুল জিনি নাসা, নয়ন সুচারু।

... ... ... ...

খঞ্জন নয়নে কিবা অঞ্জন পরেছে,
কিবা গলদেশে গজমতী শোভা করিতেছে।

... ... ... ...

যদি বল চাঁদে কেন তুলনা না হয়ে,
পদনখে কোটী চন্দ্র উদিত সদয়ে।

এখানে অন্নদার রূপবর্ণনার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে ; পার্থক্য এই যে, ভাষার চাতুরীতে নিপুণ সভাকবির সহিত পল্লীকবি আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। আবার যেখানে শিব ও দুর্গার কোন্দল হইতেছে, সেখানে ব্যাস এবং গঙ্গার কলহের কথা ভোলা যায় না, এমন কি কুরুচির পরিচয়ও সমানভাবে বর্ত্তমান। এদিকে মেনকার সাধভক্ষণের দিন ষোড়শোপচারে রান্না হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে আমাদের পল্লীকবি সম্ভব অসম্ভব, প্রাচীন আধুনিক সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের এক বিরাট ও বিরক্তিকর তালিকা দিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের ইহাও একটা বিশিষ্ট ধরণ বটে, উদাহরণস্বরূপ শ্রীমন্তের বাণিজ্য-সম্ভারের কথা বলা যাইতে পারে।

গাজন-গীতির মধ্যে পল্লীর একখানি নিখুঁত ও জ্বলন্ত চিত্র পাওয়া যায়। পল্লীজীবনের যেখানে যত মাধুর্য্য আছে, সবটুকু আহরণ করিয়া যেন ইহার মধ্যে সঞ্চিত করা হইয়াছে। গোময়লিপ্ত পল্লীর আঙিনায় যে সুখদুঃখের পালা প্রতিনিয়তই অভিনীত হইতেছে, ইহা তাহারই একটা বিশ্বস্ত বিবরণ। আবার গ্রাম-জীবনের কুৎসিত দিকটাও ঠিক সমানভাবে ইহার উপর ম্লান ছায়াপাত করিয়াছে। মানুষ স্বভাবতই anthropomorphic, নিজেদের জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া দেবদেবীর জীবন গড়িয়া তুলিতে চায়, নিজেদের সমস্ত দোষ এবং সমস্ত গুণ তাহাদের উপর আরোপ করে। তাই গ্রামবাসীদের হাতে পড়িয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছে, পল্লীকবির সরল অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত কল্পনা তাহাকে কোন রোমান্টিক ভাবরাজ্যের নায়ক করিয়া তোলে নাই, একেবারে দরিদ্র পল্লীপরিবারের হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া স্থান দিয়াছে এবং 'বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ'দের মত পার্ব্বতীকেও শেষ পর্য্যন্ত রান্নাঘরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। ইতিমধ্যে নারদমুনি কোথা হইতে আসিয়া বুড়া শিবের সহিত মামা-ভাগ্নে সম্বন্ধটা বেশ জমাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু শিব বুড়া হইলে কি হইবে, 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল' দিনগুলির কথা এখনও ভুলিতে পারেন নাই, বন্দী যৌবনের দিন বুঝি আবার শৃঙ্খলাহীন হইয়া উঠে। নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন, মামার হইয়া ভাগ্নে চলিলেন পাত্রী খুঁজিতে।

বেশি দূর যাইতে হইল না ; নিকটেই নগাধিরাজ হিমালয়। তাঁহার রাজকীয় মহিমা বোধ হয় বর্ত্তমান যুগে অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছে, অথবা হয়তো কন্যাদায়ের চিন্তা হইতে রাজাদেরও মুক্তি নাই। অনূঢ়া উমাকে লইয়া গিরিরাজ আর মেনকার দুশ্চিন্তার সীমা নাই। কন্যাভারগ্রস্ত

পিতামাতার যে করুণ ছবি এখানে আঁকা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। এহেন সময়ে ঢেঁকি-বাহনে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন পার্ব্বতী খেলায় মত্ত।

দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিতেছেন রঙ্গে,
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশে সঙ্গে।
আর, মৃত্তিকার হরগৌরী পুত্তলি গড়িয়া
সহচরিগণ মিলি দিতেছেন বিয়া।

নারদ মহামায়ার এই অপূর্ব্ব মায়ারূপ দেখিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। তখন গৌরী গর্ব্বিত ভৎর্সনায় বলিতেছে,

বলেন, শুন শুন ওগো ঠাকুর মহাশয়,
আমারে প্রণাম করা উপযুক্ত নয়।

হাজার হোক নারদ বয়োবৃদ্ধ তো!

তখন মুনি বলেন, এ ভয় দেখাও তুমি কারে,
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে।
আজ, আমারে বলিলা বৃদ্ধ, বালিকা আপনি,
ভেবে দেখ তুমি মোর বাপের জননী।
আজ, নাতিজ্ঞানে বুড়া বলি হাসালে আমারে,
পাকা দাড়ি বুড়া বর জুটাব তোমারে।

উপরি-উক্ত ছত্রগুলির মধ্যে যে গভীর আধ্যাত্মিকতার সহিত নির্ম্মল হাস্যরসের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, মনে হয়, তাহা কোন নিপুণ শিল্পীর কাজ। তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। যাহা হউক, বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

কিন্তু মুস্কিল হইল শিবকে লইয়া। বিবাহের দিন ছাঁদনাতলায় বুড়া বরকে দেখিয়া মেয়ে-মহলে ঘোর আপত্তি উঠিল। পুরমহিলারা একবাক্যে কহিলেন যে, ইহার সহিত বিবাহ দেওয়া মানে হাতপা বাঁধিয়া উমাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া। তখন মামার হইয়া নারদ কহিলেন,

তবে কেন কর কানাঘুষি মামার নয়ক বয়স বেশী,
অল্প বয়সে পাকে মাথার চুল।
ঐ আর মামা আমার ভোলানাথ, সান্নিকে পড়েছে দাঁত,
বুড়া কেন বলিস নামাকুল ( বেয়াকুব )।

এখানে তপরত ব্যাসদেবের নিকট অন্নদার আত্মবর্ণনার কথা মনে পড়ে। যাহা হউক, সুযোগ বুঝিয়া শিব মায়ারূপ ত্যাগ করিলেন এবং মোহন বেশে আবির্ভূত হইলেন, বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার পর দাম্পত্যজীবনের মহারঙ্গভূমিতে অমিত বিরহ-দুঃখ সৌহার্দ্দ্য-মিলনের মধুর অভিনয়। পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান সরিয়া গিয়াছে, রূঢ় বাস্তবের সহিত মুখোমুখি হইতেছে। ভাঙ বাটিতে বাটিতে পার্ব্বতী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও দুঃখ নাই; দুঃখ এই যে, নীচজাতীয়া কোচ-কামিনীদের প্রতি শিবের এক অবিনীত দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে। পার্ব্বতীর সংসারে তাই শান্তি

নাই। একদিন হর ভিক্ষার ছলে পার্ব্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কোচ-পল্লীর অভিমুখে রওনা হইলেন। পার্ব্বতী স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মায়াবলে হীরা-কুচনী সাজিলেন এবং পথের মধ্যে এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভুবনমোহিনী তাহে সাজিলেন মোহিনী,
ভবকে ভুলাবেন বলে সাজিলেন ভবানী।
কি দিব তুলনা রূপের মনে অনুমানি,
শির পরে শোভে বেণী বিনিন্দিত ফণী।

শিব আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে মায়ারূপিণী পার্ব্বতী কহিলেন যে, তিনি দুই সতীনের ঘর করেন, স্বামী তাহাকে ভালবাসেন না। তাই,

আমি তব প্রেম আশে বসে আছি পথের পাশে,
তুমি কি গো যাবে নৈরাশ করি!

ইহার পর শিব যাহা করিলেন, তাহা দেব-চরিত্রের সহিত খাপ না খাইলেও পল্লীসমাজের আদর্শ অনুসারে নিতান্ত অন্যায় নহে। তিনি ছদ্মবেশিনী পার্ব্বতীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

অনঙ্গমোহন তবে অনঙ্গে মাতিল,
তখন হস্তে ধরি কোচের নারী পুরে প্রবেশিল,
পুর মধ্যে নিয়ে ভোলায় পালঙ্কে বসাল।

কিন্তু পার্ব্বতী হঠাৎ নিজরূপে আবির্ভূতা হইলেন এবং শিব নিজের দুর্ব্বলতায় অত্যন্ত বেশি লজ্জিত হইয়া অধোমুখে প্রস্থান করিলেন।

আর একটা ঘটনার উল্লেখ না করিলে দাম্পত্যজীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু বোধ হয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; ইহা এক মানভঞ্জনের ব্যাপার, পার্ব্বতী হঠাৎ একদিন আবদার করিয়া বসিলেন যে, তিনি শাঁখা পরিবেন। কিন্তু উদাসীন শিব তাঁহাকে মোটেই আমল দিলেন না।

পশুপতি বলে সতি শুনে হাসি পায়,
ভিখারীর গৃহিণীর কেন শঙ্খের হাউস হয়।

কিন্তু পার্ব্বতী ছাড়িবার পাত্র নহেন, কহিলেন,

শুন বলি তাই,
অন্যের বেলায় দাতা তুমি আমার বেলায় ছাই।
হীরা-কুচুনী চাহিত যদি স্বর্ণের অলঙ্কার,
সেই বেলায় হইতে তুমি রাজরাজ্যেশ্বর।
আমি যদি লোহার আংটি তোমার কাছে চাই,
সেই বেলায় ভিখারী তুমি, কিছুমাত্র নাই।

কথায় কথায় কোন্দল বাড়িয়া গেল। পার্ব্বতী রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

মেনকা এদিকে জামাইয়ের নিন্দা করিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াই থাকেন। পার্ব্বতীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন।—

কি বলিব তোমার পিতা চোখের মাথা খেয়ে,
তোমা হেন সোনার পুতুল ভাঁওড়ারে ( ভাঙড়ে ) দিল বিয়ে।

পার্ব্বতীর আবার ঠিক সেইখানেই ব্যথা, পতিনিন্দা সতীর সহ্য হয় না। আজ বহু শত বৎসর ধরিয়া যে মহান আদর্শে তিনি বাংলার মেয়েদের অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছেন, আজ নিজে কি করিয়া সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবেন? হাজার হোক, অভিমানটা তো একটা ছল মাত্র। সুতরাং,

এ কথা শুনিয়া উমার দু নয়ন ঝরে,
দক্ষযজ্ঞের কথা উমার মনে পড়ে।
আর কিছু কর্ত্তে নিন্দা উদ্যত হইল,
গৌরী বলে, শঙ্খ কিনে দিবা কিনা বল।

...　　...

রাণী বলে আজকার দিনটা থাক আমার ঘরে,
কাল দিব কিনিয়া শঙ্খ যত হাতে ধরে।

পরদিন দাসী আসিয়া খবর দিল, বাজারে একজন ভাল শঙ্খবিক্রেতা আসিয়াছে। তখনই তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। শাঁখারী পার্ব্বতীর কোমল হস্তে শাঁখা পরাইয়া দিলেন। পার্ব্বতীর শাঁখা পরিয়া খুব পছন্দ হইল, কহিলেন,

সত্য করে বল শাঁখার মূল্য নিবে কত।

শাঁখারী এখানে একটু রসিকতা করিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না, কহিলেন,

শাঁখা বেচে কোন খানে মূল্য নাহি হয়,
কুচুনীরা শাঁখা পরে আলিঙ্গন দেয়।
গৌরী— কি বলিব ও শাঁখারী বাবা নেই যে বাড়ী,
নৈলে, মুখে চূণ কালি দিতাম ছিঁড়ে গোঁফ দাড়ি।

শেষ পর্য্যন্ত রাণী আসিলেন, শাঁখা লইয়া একটা ভীষণ গোলযোগ বাধে আর কি! এমন সময়,

শাঁখা পরা হ'ল সারা ঘুচিল বালাই,
রাণী চেয়ে দেখে আমার সেই বুড়ো জামাই।

শিবদুর্গার এই মান-অভিমানের কাহিনীর মধ্যে একটা জিনিস আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, স্ত্রীর কাছে স্বামী চিরকালই দেবতাস্বরূপ। এত অনাদর সত্ত্বেও শিব পার্ব্বতীর চির-আরাধ্য এবং অভিমান যতই তীব্র হউক না কেন, প্রেমের নিকট তাহাকে হার মানিতেই হইয়াছে। শিবও তেমনই শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সতীগতপ্রাণ। কিন্তু শুধু তাই নয়। গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সহিত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফুর্ত্ত কবিত্ব এবং প্রাণ-খোলা হাস্যরস মিশিয়া গাজন-গীতিগুলিকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

---

* যে গাজন-গানগুলি হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যশোহর ও খুলনা জেলা হইতে সংগৃহীত।

# কাটাকোম্বের কথা

শ্রীপ্রমথনাথ রায়

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে পালেস্টাইনে উদ্ভূত খ্রীষ্টানধর্ম্ম এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের প্রায় অর্দ্ধেকাধিক লোকের ভিতর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল, সেখান হইতে এই ধর্ম্ম ক্রমে সিরিয়া ও ইজিপ্টে বিস্তৃত হইয়া অবশেষে রোমে, দক্ষিণ ও মধ্য ইতালীতে প্রবেশ করে।

ভূমধ্যসাগরের প্রাচ্যাংশে অবস্থিত দেশগুলি তখন গ্রীক-সংস্কৃতিদ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে সব দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রসারে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই কিংবা বাধা ঘটে নাই। বস্তুত, এ কথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, গ্রীক সংস্কৃতি ও গ্রীক ভাষার সাহায্যে এই নবধর্ম্মের প্রসার আরও সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মদ্বারা অনুপ্রাণিত আর্টের প্রথম বিকাশ হয় সম্ভবত আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় ও সিরিয়া দেশের রাজধানী আন্তিয়োকাতে। সেখান হইতে গ্রীক সংস্কৃতির আনুকূল্যে এই আর্ট ক্রমে ভূমধ্যসাগরবেলাস্থিত দেশগুলিতে, বিশেষত রোমে, ছড়াইয়া পড়ে।

রোম তখন সভ্যতার কেন্দ্র; শিক্ষায় দীক্ষায় কীর্ত্তিময়ী নগরী। চতুর্থ শতাব্দীতে অবশ্য রোমের পতন সুরু হইয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অমর নগরীর যশ-জ্যোতি অম্লান ছিল। মনোবৃত্তির চর্চ্চায়, সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে, ধর্ম্মালোচনা ও কারুকলায় এই নগরী তখন পর্য্যন্ত সকলের অগ্রণী ছিল। এইরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম্মের বীজ যখন প্রথম উপ্ত হইল, তখন শীঘ্রই যে তাহা সুবৃহৎ বনস্পতির পরিণতি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথম প্রথম খ্রীষ্টানুচরদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই নগরীতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের বহু লোক, এমন কি রাজপরিবারেরও কেহ কেহ, এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিল।

অতি প্রথম হইতেই খ্রীষ্টানুচরেরা, স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য, অখ্রীষ্টানদের সমাধিভূমি হইতে দূরে পৃথক স্থানে নিজেদের মৃতের গোর দিত। কিন্তু ইহুদীদের অনুকরণে তাহারাও, উন্মুক্ত আকাশের তলে গোর না দিয়া, মাটি খুঁড়িয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে, খিলান কাটিয়া সমাধি রচনা করিতে পছন্দ করিত। রোমে যখন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার হয়, তখন সেখানকার খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও এই প্রথার ব্যতিক্রম হয় নাই। রোমের চারিদিকের এই সকল ভূগর্ভস্থ প্রাচীন খ্রীষ্টান সমাধির নামই কাটাকোম্ব।

এই সপ্তাদ্রিনগরীর চারিদিকে একাধিক মাইল ব্যাপিয়া আন্তর্ভৌম সমাধি বিস্তৃত। অনেকে বলেন, রোমান সম্রাটদের অত্যাচারে উৎপীড়িত খ্রীষ্টানগণ গোপনে মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনা করিবার জন্যই এই সকল ধরণী-জঠরস্থ প্রকোষ্ঠ খনন করিয়াছিল। বোধ হয় এরূপ অনুমানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই সকল সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করিতে গিয়া যে পরিমাণ মাটি উঠাইতে হইয়াছিল, তাহা কিরূপে সরাইয়া ফেলা ও অত্যাচারীদের চক্ষুর

অগোচরে রাখা সম্ভব হইল ? কাজেই মনে হয়, রোমের তৎকালীন শাসনতন্ত্রের নিকট আন্তর্ভৌম খ্রীষ্টান সমাধির অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল না। বরং সরকারী অনুমোদনের ফলেই এগুলি খনিত হইতে পারিয়াছিল। ইহাদের আকার হইতেও মনে হয় যে, এগুলি গোপন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ একসঙ্গে অধিক লোক ধরিবার মত স্থান ইহাদের ভিতর বড় বেশি নাই। মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্যই এই সকল সুড়ঙ্গ খনন করা হইয়াছিল।

তাহা ছাড়া, তখনকার রোমান আইন অনুসারে কতকগুলি বিশেষ জন-সমষ্টি, যেমন ক্রীতদাস সম্প্রদায়, দরিদ্র অথবা দস্তকার শ্রেণীর লোক, মাসিক কিছু কিছু কর দিয়া, নিজেদের সমাজান্তর্ভুক্ত মৃত ব্যক্তিকে সাধারণ গোরস্থানে সমাধি না দিয়া, পৃথকভাবে গোর দিতে পারিত। বোধ হয় তদানীন্তন খ্রীষ্টানরাও, এই সব জন-সমষ্টির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, নিজেদের পৃথক গোরস্থান রাখিবার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিয়া লইয়াছিল। সে যাহা হউক, অতি প্রথম হইতেই ও পরে খ্রীষ্টানদিগের উপর অতিরিক্ত উৎপীড়নের কালে, অনেক বিত্তশালী খ্রীষ্টান সহধর্ম্মীদিগকে গোর দিবার নিমিত্ত তাহাদের খাস জমিও দান করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত এই সব জমির মালিকের নাম হইতে কতকগুলি সমাধিভূমির নাম রহিয়া গিয়াছে—যেমন, প্রিসিল্লার কাটাকোম্ব, প্রেতেস্তাতোর কাটাকোম্ব, দমিতিল্লার কাটাকোম্ব।

দমিতিল্লার সমাধিভূমি এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান। ভিয়া আপ্পিয়া ও আর্দ্দেয়াতিনার এক মোড়ের মাথায় এই সমাধিভূমির প্রবেশদ্বার অবস্থিত। দ্বারের পিছনেই একটি প্রকোষ্ঠ, এক্ষণে ভগ্নাবস্থায়। বোধ হয় এখানে প্রতি বৎসর মৃতের স্মৃতি-দিবসে ভোজনোৎসব সম্পন্ন করা হইত। ইহার এক পাশে আর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একটি কুয়া এবং পানীয় জল রাখিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা। প্রবেশপথের উপর প্রস্তরখণ্ডে ফ্লাভি পরিবারের নাম লেখা। এই ফ্লাভি পরিবারেই খ্রীষ্টান-উৎপীড়ক দমিৎসিয়ান ও খ্রীষ্টানুরক্তা ফ্লাভিয়া দমিতিল্লার জন্ম হয়। এই মহিলার নাম হইতেই এই কাটাকোম্বের দমিতিল্লা নাম হইয়াছে।

এখানে সবগুলি কাটাকোম্বের নাম করা সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকটির নাম করিতেছি। ভিয়া পর্ত্তুয়েন্সের উপর অবস্থিত পন্তসিয়ানো, জেনেরোজা ও সেণ্ট ফেলিসের কাটাকোম্ব, ভিয়া ফ্লামিনিয়ার উপর সেণ্ট ভালেন্‌টিনোর কাটাকোম্ব, ভিয়া সালারিয়ার উপর প্রিসিল্লার কাটাকোম্ব; ভিয়া নোমেন্তানার উপর সেণ্ট আনিয়েন্দের কাটাকোম্ব; ভিয়া আপ্পিয়ার উপর প্রেতেস্তাতো, সেণ্ট সেবাস্তিয়ান ও কাল্লিস্তোর কাটাকোম্ব। এইগুলির মধ্যে কাল্লিস্তোর কাটাকোম্বই সকলের চেয়ে বড়। ইহা প্রথমে এত বড় ছিল না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই ইহার বিশেষ বিস্তার হয়। তখন অবশ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম রোমের শাসক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। লোকের মধ্যেও তখন গির্জ্জার চারিদিকে মৃতদেহ সমাহিত করিবার প্রথা প্রচলিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে সময় অনেকেই কাটাকোম্বের ভিতর ধর্ম্মের জন্য আত্মবলিদাতা মহাপুরুষদের পাশে সমাধিস্থ হইবার বাসনা প্রকাশ করিত। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে সারাদেশ যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন সমাধিস্থান হিসাবে কাটাকোম্বের প্রতি লোকের আকর্ষণ কমিয়া যায়। তথাপি পুণ্যস্থান হিসাবে লোকে এই সকল কাটাকোম্ব পরিদর্শন করিতে একেবারে বিরত হয় নাই।

তখন পর্য্যন্ত মহাপুরুষদের কবরের সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিত, ও লোকে এই প্রদীপের তৈল অভিজ্ঞানরূপে সযত্নে রক্ষা করিত এবং দেশদেশান্তরে লইয়া যাইত। অষ্টম শতাব্দীতে লঙ্গোবার্ডদিগের আক্রমণের সময় বহু সাধু মহাপুরুষদের দেহাবশেষ কাটাকোম্ব হইতে রোমের বিভিন্ন গির্জ্জায় স্থানান্তরিত করা হয়। তখন হইতেই ইহাদের প্রতি লোকের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ও কালক্রমে ইহাদের স্মৃতি লোকের মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দৈবক্রমে প্রিসিল্লার সমাধির একাংশ আবিষ্কৃত হয় ও আবার কাটাকোম্বগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়ে।

চারিদিকের প্রান্তরের শ্যামল প্রশান্তি পরিত্যাগ করিয়া যখন কাটাকোম্বের ভিতরে প্রবেশ করা যায়, তখন দেহে ও মনে যে অপূর্ব্ব ও গভীর ভাব অনুভূত হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। দরজা পার হইতে না হইতেই একেবারে নীচে নামিয়া যাইতে হয়। সিঁড়িগুলি স্তরে স্তরে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেকখানি পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সিঁড়ির শেষে একটি করিয়া সুড়ঙ্গ। বাহিরের ক্ষীণ আলোক ধীরে ধীরে নিবিয়া যায়। চারিদিকে অন্ধকার ঘিরিতে থাকে। সঙ্কীর্ণ গ্যালারিগুলি অন্ধকারের মধ্যে আরও গভীরতায় নামিয়া যায়, মনে হয়, যেন অতিশয় জটিল এক চক্রব্যূহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ কখনও বা অন্ধকার ভেদ করিয়া ধসিয়া যাওয়া মাটির ফাঁকের ভিতর দিয়া, অথবা আলোকের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত রন্ধ্রপথে, উপর হইতে খানিকটা আলোক প্রবেশ করিতেছে। চারিদিকের উচ্চ দেওয়ালগুলি এক সময় মৃতদেহে পূর্ণ ছিল। দেওয়ালের ভিতর লম্বালম্বিভাবে সমচতুষ্কোণ গর্ত্ত কাটিয়া তাহার ভিতর মৃতদেহ রাখা হইত ও ইতালীয়ান ভাষায় এইরূপ গর্ত্তের নাম "লকুলো" (loculo)।

গ্যালারিগুলির দুই পাশে ছোট ছোট শবাগার। এগুলির ইতালীয়ান নাম কুবিকুলো (cubiculo)। অনেক সময় ইহাদের ভিতর পাথরের শবাধারে অথবা মাটিতে গর্ত্ত খনন করিয়া মৃতদেহ সমাহিত করা হইত। এই শবাগারগুলির আকার অত্যন্ত সাদাসিধা। অধিকাংশই দেখিতে চতুষ্কোণ ও উপরে খিলান দেওয়া। ইহাদের দেওয়াল পূর্ব্বে চিত্র-শোভিত ছিল, এখন তাহা বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোন কোন শবাগারের দেওয়াল মার্বল দ্বারা আবৃত। আবার কতকগুলির ভিতর স্তম্ভও দেখা যায়।

কখনও কখনও কতকগুলি শবাগার মিলিত হইয়া গুহার সৃষ্টি করিয়াছে। কাল্লিস্তোর কাটাকোম্বে এইরূপ একটি গুহা আছে। ইহার নাম ক্রিপ্তা দেই পাপি (Crypta dei papi), কারণ এক সময় ( তৃতীয় শতাব্দীতে ) ইহাতে অনেক পোপের মৃতদেহ সমাহিত করা হইয়াছিল। এইরূপ গুহার মধ্যে বহু লোক ধারণ করিবার মত স্থান নাই বটে, তবু প্রিসিল্লার কাটাকোম্বে গ্রীক ভজনালয়, সেন্ত এরমেতের কাটাকোম্বে ভূগর্ভস্থ গির্জ্জা ও পন্তসিয়ানোর কাটাকোম্বের দীক্ষাগৃহ হইতে মনে হয়, এগুলি হয়তো মাঝে মাঝে খ্রীষ্টানুচরদের দ্বারা মিলন-ক্ষেত্র ও উপাসনার স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রোমের কাটাকোম্বগুলির দেওয়ালে নানা চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পাথর দ্বারা লকুলোগুলি বন্ধ করা হইত, তাহাদের গাত্রে বিভিন্ন শিলালেখও বিদ্যমান। যেমন—"anima dulcis", "in deo vivas", "depositus in pace", "dulcis in bono"।

পারলৌকিক শান্তির আশার আলোকে উদ্ভাসিত এই সকল স্নেহ-মেদুর শব্দের পাশে নানা রূপক-চিত্র খোদিত ; যেমন—নঙ্গর, বিজয়জ্ঞাপক তালপত্র, ময়ূর, কবুতর।

দেওয়াল-চিত্রগুলি চূর্ণকামের উপর অঙ্কিত। কাটাকোম্বের ভিতর আলোকের অভাব, সুতরাং পটভূমি খুব সাদা ; অথবা খুব বেশি পরিষ্কার। কখনও কখনও পম্পেয়াইয়ের অনুকরণে লাল অথবা কমলা রঙের চিত্রও চোখে পড়ে। চিত্রগুলি দ্রুত ও তাচ্ছিল্যের সহিত আঁকা। খুঁটিনাটির দিকে চিত্রকরের লক্ষ্য নাই। রঙের সমাবেশের মধ্যেও সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হয় না। অনেকের মতে কাটাকোম্বের ভিতরকার অন্ধকারই এজন্য দায়ী ; কারণ প্রদীপের আলোকে চিত্রকরের পক্ষে সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব নয়। এরূপ অনুমান একেবারে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এই জন্যই চিত্রকরগণ দায় সারা ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি কাটাকোম্ব ব্যতীত তদানীন্তন রোমের অন্যান্য দেওয়াল-চিত্রেও দেখা যায়। এই পদ্ধতি তখন সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা বর্ত্তমান যুগের ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম-পদ্ধতির অনুরূপ।

প্রাচীন যুগে সর্ব্বপ্রথম কোথায় এরূপ পদ্ধতির উদ্ভব হয়, তাহা সঠিক বলা কঠিন। তবে বোধ হয় গ্রীসীয় ইজিপ্টেই ইহার জন্মস্থান। সেখান হইতে পেট্রোলিয়ুসের আমলে এই পদ্ধতি রোমে আনীত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই সম্ভবত ইহা ইতালীতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, কারণ ঐ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পম্পেয়াইয়ে ইহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। পরে ইহা শুধু প্রাচীর-চিত্রেই নয়, এমন কি মিনিয়েচার চিত্রাঙ্কণেও প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

কাটাকোম্বের চিত্রের বিষয়গুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। কতকগুলি চিত্রে আমরা খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব যুগের বিষয়বস্তু দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে দমিতিল্লার কাটাকোম্বই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রাচীন। ইহার খিলানের সাদা অস্তরের উপর দ্রাক্ষাগুচ্ছ ও পত্রসহ একটি আঙুরলতা অঙ্কিত। এই চিত্র হইতে কিছু দূরে কয়েকটি পক্ষযুক্ত ও নগ্নকায় দেবযোনির মূর্ত্তি। আর এক পাশে, আলোক-রন্ধ্রের কাছে মনুষ্যমূর্ত্তিপূর্ণ কতকগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই কাটাকোম্বেরই আরও একটি দেওয়াল-চিত্রে আমরা দেখিতে পাই মদন ও রতির মূর্ত্তি। এই চিত্রে নগ্নকায় শিশু কামদেব একটি সাজির ভিতর ফুল ঢালিতেছে এবং বালিকা রতি, প্রজাপতির ন্যায় পাখা মেলিয়া, আর একটি ফুলের সাজি বহন করিয়া তাহার নিকটে আসিতেছে। ক্ল্যাসিক্যাল পদ্ধতি অনুসারে চিত্রে ঋতু-বর্ণনাও কাটাকোম্বের চিত্রকরদের একটি প্রিয় বিষয় ছিল। প্রথম যুগের এই খ্রীষ্টান শিল্পে গ্রীক পুরাকাহিনীর অর্ফিয়ুসের মূর্ত্তিও দেখা যায়। কিন্তু কাটাকোম্বের অর্ফিয়ুসের মূর্ত্তির চারিদিকে বন্যপশুর পরিবর্ত্তে আমরা দেখিতে পাই মেষের দল। এই পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহা খ্রীষ্ট ও তাহার চারিদিকে একত্রিত বিশ্বাসী অনুচরদিগের প্রতীক।

বাইবেলের ঘটনা সম্বন্ধে চিত্র-সংখ্যা খুব বেশি নয়। যে কয়টি চিত্র আছে, তাহাও খুব সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন। অধিকন্তু সবগুলিই পুনরাবৃত্তি-দোষে দুষ্ট। একটি চিত্রে নোয়া তাহার আর্কের ভিতর একা বসিয়া আছে। আর্কটি দেখিতে বাক্সের মত। আর একটি চিত্রে মোজেস প্রস্তরে আঘাত করিয়া জল বাহির করিতেছে। কিন্তু এই জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিবার কেহ নাই। অপর একটি চিত্রে সিংহ-বেষ্টিত নগ্ন দানিয়েল প্রাচীন প্রথায় প্রার্থনা করিবার ভঙ্গিতে হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া

রাখিয়াছে। আরও একটি চিত্রে একজন পক্ষাঘাত-মুক্ত লোক কাঁধের উপর বিছানা বহন করিয়া চলিয়াছে। অনুরূপ আরও কয়েকটি চিত্র আছে, কিন্তু সবগুলিতেই খুঁটিনাটির অভাব এবং সবগুলিই অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাদ দিয়া অতি দ্রুত টানে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রত্যেক কাটাকোম্বেই এই সব বাইবেলোক্ত ঘটনার এত পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যে মনে হয়, বাইবেলের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে, কোন বিশেষ কারণবশতই, মাত্র এইগুলি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। আবার ইহাও স্পষ্ট যে, শাস্ত্রোক্ত ঘটনাগুলির হুবহু অঙ্কনই চিত্রকরদের উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ অনেক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়িয়াছে। চিত্রগুলির অনাড়ম্বর রূপ দেখিয়া মনে হয়, এগুলি ভাবের অথবা অনুভূতির প্রতীকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। যেমন মেষপালকের একটি চিত্র। এই চিত্রে মেষপালক একটি মেষশাবককে কাঁধের উপর তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা দ্বারা আত্মার মুক্তি সূচিত হইতেছে। অথবা যেমন ভোজোৎসবের চিত্র। অতি প্রাচীনকাল হইতেই একাধিক জাতির ভিতর এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুর পরে মুক্ত আত্মা ভোজোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানুচরদিগের কল্পনা ভাবী জীবনের প্রশান্তি ও আনন্দের কথা চিন্তা করিয়া তৃপ্তি পাইত। কাটাকোম্বের ভোজোৎসবের চিত্রগুলি এই তৃপ্তিরই প্রকাশ। অথবা অনেক সময় চিত্রকর হয়তো খ্রীষ্টের শেষ-ভোজের স্মারক হিসাবে এগুলি অঙ্কিত করিয়াছিল। কাল্লিস্তোর কাটাকোম্বে একটি পুষ্পিত কাননের চিত্র আছে। এই কাননের বৃক্ষের শাখায় ময়ূর নাচিতেছে, কতকগুলি পায়রা কয়েকটি গহ্বরের কিনারায় বসিয়া জলের উপর নিজেদের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া আছে। বাগানের মাঝখানে পাঁচ জন খ্রীষ্টানুচর হাত উর্দ্ধে তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে। ইহাদের ধ্যানমগ্ন মুখের উপর প্রশান্তির ছাপ। এই চিত্রটি বোধ হয় স্বর্গের শান্তি ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক।

অতি প্রথম হইতেই খ্রীষ্টানরা মনে করিত, ধ্যান ও প্রার্থনাই পরলোকের সুখ। কাজেই কাটাকোম্বের চিত্রগুলির মধ্যে প্রার্থনারত মূর্ত্তির চিত্র প্রায়ই চোখে পড়ে। কাল্লিস্তোর কাটাকোম্বে এইরূপ একটি প্রার্থনারত মূর্ত্তি আছে। এই চিত্রটিতে আত্মার যে উন্নত অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক। সাধারণত এইরূপ চিত্রের সহিত বাস্তবের কোন সংস্রব নাই। অর্থাৎ এগুলি নিতান্তই একটি ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস। কিন্তু কোন কোন মূর্ত্তি বাস্তব জীবন হইতে অঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। যেমন, উপরোক্ত বাগানে যে পাঁচটি মূর্ত্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় যে কুবিকুলোতে এই ছবিটি আছে, সেই কুবিকুলোতে সমাহিত পাঁচ জন সেন্টের প্রতিমূর্ত্তি। কখনও বা বাস্তবের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মাস্‌সিমোর কাটাকোম্বে একটি প্রার্থনারতা নারীমূর্ত্তি আছে। সাদা পটভূমির উপর ইহা অঙ্কিত। কিন্তু চিত্রকর এমন তাচ্ছিল্যের সহিত ইহাকে রঞ্জিত করিয়াছে যে, ইহার মুখ ও চোখ দেখিয়া মনে অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়। মূর্ত্তিটির মুখে কেমন যেন আতঙ্কের ভাব। একটি পাতলা অবগুণ্ঠন দ্বারা এই নারীমূর্ত্তির চুলগুলি আবৃত। ইহার কানের দুল, হাতের বলয় ও বস্ত্রাঞ্চল সমগ্র মূর্ত্তিটিকে বাস্তবতার ছাপ দিয়াছে।

এই সকল চিত্র ছাড়া আরও কতকগুলি রূপকাত্মক চিত্র আছে, কিন্তু এগুলির সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত ভাষণের প্রয়োজন নাই। তবে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রোমের প্রথম চার

শতাব্দীর কাটাকোম্বগুলিতে শুধু খ্রীষ্টের মূর্ত্তি খুব কম। দমিতিল্লার কাটাকোম্বে একটি মূর্ত্তি আছে। অপরপক্ষে বাইবেলোক্ত অলৌকিক ঘটনাগুলির অঙ্কনে অথবা প্রচারকদের চিত্রের মধ্যে ইহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, বিশেষত চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে। প্রচারকদিগের মধ্যে, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে, আমরা পিটার ও পলের সাক্ষাৎ পাই। প্রিসিল্লার কাটাকোম্বে মাদোন্নার মাতৃমূর্ত্তির একটি দেওয়াল-চিত্র আছে। এই চিত্রে মাদোন্না শিশু কোলে করিয়া আসীনা, ক্ষুদ্র নগ্ন শিশুটি তাহার বক্ষলীন। এই স্নেহ-করুণ চিত্রটি এখন অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবু ইহা এমনই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও জীবন্ত যে রেনাসাঁসের যুগের সুন্দরতম মাতৃমূর্ত্তিগুলির কথা মনে করাইয়া দেয়। আসীনা মাদোন্নার পাশে আর একটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি একটি নক্ষত্রের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। বোধ হয় প্রফেট ইজাইয়া তারকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া খ্রীষ্টের জন্মরাশি দেখাইয়া দিতেছে। অস্ত্রিয়ান (Ostrian) কাটাকোম্বে আর একটি মাতৃমূর্ত্তি আছে। এই চিত্রে দুই দিকে খ্রীষ্টের দুইটি একাক্ষরিক নামের মধ্যে মাদোন্নার হাত দুইটি প্রার্থনার ভঙ্গিতে উত্তোলিত। শিশুটি তাহার সম্মুখে দোদুল্যমান। পরবর্ত্তীকালের বহু মধ্যযুগীয় চিত্রে এই ভঙ্গি দেখা যায়।

রোমের কাটাকোম্বের চিত্রের এইগুলিই প্রধান বিষয়। কিন্তু সকল বিষয়ই এক সময়ে অঙ্কিত হয় নাই। যতদূর জানা যায়, প্রথম শতাব্দীতে বাইবেলোক্ত ঘটনার চিত্র নিতান্তই বিরল। এই সময় শাস্ত্রোক্ত মাত্র তিনটি ঘটনার ছবি আমরা পাই—নোয়ার আর্ক, সিংহ-বেষ্টিত দানিয়েল ও রাখাল বালকের ছবি। দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাওয়া যায় আইজাক, জোনা, সুসানা ও লাজারাসের চিত্র। আরও পাওয়া যায় জন্ম-নক্ষত্রের ছবি, মাজির উপাসনার ছবি, খ্রীষ্টের অলৌকিক ঘটনাবলীর ছবি এবং শেষ-ভোজের ছবি। তৃতীয় শতাব্দীতে আমরা পাই প্রচারক-বেষ্টিত খ্রীষ্টের মূর্ত্তি।

অঙ্কন-রীতির দিক দিয়া এই চিত্রগুলি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ক্ল্যাসিক্যাল চিত্র-ধারারই ক্রম বলা চলে। বহু মূর্ত্তিতে আমরা প্রাচীনকালের প্রার্থনার হস্তভঙ্গি দেখিতে পাই। ভোজনোৎসবের চিত্র ও পল্লী-দৃশ্যগুলিও পেগ্যান-রীতির জ্ঞাপক। আবার কোন কোন দিক দিয়া আমরা পরবর্ত্তীকালের মধ্য-যুগীয় চিত্রের সূচনাও দেখিতে পাই। এই চিত্রে আমরা যে অনাড়ম্বর-প্রীতি ও খুঁটিনাটির অভাব দেখি, পরে মধ্যযুগীয় চিত্রেও আমরা তাহা দেখিব। বিশেষত এই চিত্রে রূপকের যে প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, পরবর্ত্তীকালে ইহার আরও প্রবলতর বিকাশ ঘটিবে.
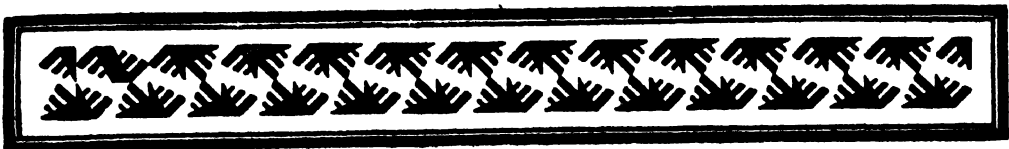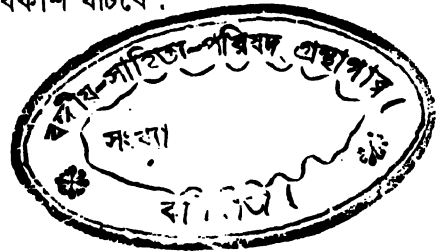
# জীবনের খরস্রোতে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

অতি সাধারণ একটি বস্তি।

যে সকল অভাব-অভিযোগ জীবনকে দুর্বিষহ ক'রে তোলে, বেঁচে থাকবার অধিকার থেকে নিজেদের প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করে, হাজার নিষ্পেষণের মধ্যে প্রতিবেশীদের অমানুষ ক'রে ফেলে, এখানে সে সব কিছুই নেই। পালেদের দীঘি ছাড়াও সরকারী জলের কল আছে। পাকা রাস্তা আছে। রাস্তায় আলো জ্বলে; ঝাঁট পড়ে নিয়মিত। কেউ কারুর কথায় থাকে না। সকলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

বাস করে এর মধ্যে অনেক লোক। বাঙালী থেকে আরম্ভ ক'রে বিহারী উড়িয়া কেউই বাদ পড়ে না। আমাদের গল্প কিন্তু সকলকে নিয়ে নয়। দুটি পাশাপাশি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা এত ঘনিষ্ঠভাবে ঘনিয়ে উঠেছে যে, একটির কথা বলতে গেলে অপরটি আপনা হতেই এসে পড়ে, শুধু তারাই থাকবে এই গল্পের মধ্যে। প্রথম পরিবারটি—স্বামী ও স্ত্রী, পাঁচু আর নলিনী, এবং দ্বিতীয়টি—মা ও ছেলে, নিস্তারিণী আর নারাণ।

গল্পের যবনিকা যখন উঠল, আমরা দেখতে পেলুম পাঁচু রোগশয্যায় শুয়ে। মাথার শিয়রে নলিনী অসহায়ভাবে ব'সে রয়েছে।

পাঁচু বলছে, আমাকে বাঁচাও নলিনী, আমি মরতে চাই না।

নলিনী উত্তরে জানালে, অত ভেব না, ভাবলে অসুখ কমবে না।

পাঁচু বললে, কোন দিন ভাবি নি নিজের জন্যে, আজও যদি না ভাবব, আর কি দিন পাব?

নলিনী বললে, পাবে।

নারাণ পরনের কাপড়খানার অর্দ্ধেকটা গায়ে জড়িয়ে ঘরে ঢুকল। মুখে তার দারুণ উদ্বিগ্নতা, চোখে তার ব্যস্ত ব্যাকুলতা।

নলিনী তাকে দেখতে পেয়ে সহসা প্রশ্ন ক'রে বসল, আজ কোথায় গেছলে নারাণ? মাসীমাকে জিজ্ঞেস করলুম, তিনিও কিছু বলতে পারলেন না।

সে তেমনই বিমর্ষ হয়ে বললে, চাকরির সন্ধানে বউদি। কতদিন আর ব'সে থাকব, তুমিই বল না। বুড়ো মা পরের বাড়ি ঝিগিরি ক'রে কি চিরদিনই খাওয়াবে?

এত দুঃখের মধ্যেও নলিনীর মুখখানা আনন্দে রাঙা হয়ে উঠল।

নারাণ পাঁচুর কপালে হাত দিয়ে উত্তাপটা আন্দাজে অনুমান ক'রে নিয়ে বললে, আজ আর বোধ হয় জ্বর আসে নি, না বউদি?

নলিনী জবাব দিলে, কি ক'রে জানব বল। থার্মিটার দিয়ে তো আমি দেখতে জানি না।

—না না, সে কথা বলছি না বউদি। গায়ে হাত দিয়ে তোমার কি মনে হয়?

—হ্যাঁ, আজ যেন ওরই মধ্যে একটু কম আছে ব'লেই মনে হচ্ছে।

—ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন, একুশ দিনের পর জ্বর ছেড়ে যাবে। আজ কত দিন বউদি?

—ঠিক সতরো দিন।

—দেখবে, আর জ্বর আসবে না, আমি বলছি।

নলিনী বুকে বল পেলে। আনন্দের আতিশয্যে তার ভগ্ন অন্তর একটুখানি দুলে উঠল, স্বামীকে এবারও সে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

পাঁচু এতক্ষণ নিঝুম হয়ে প'ড়ে ছিল। অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে ব'লে উঠল, মাথার ভেতরটা যেন জ্ব'লে যাচ্ছে ভাই।

—জলপটি দিলে এখুনি ক'মে যাবে পাঁচুদা। সেদিন তো দেখলে?

পাঁচু চুপ করলে। নলিনী উঠে গিয়ে ন্যাকড়ার ফালি ছিঁড়ে এনে জলে ভিজিয়ে স্বামীর কপালে লাগিয়ে দিলে।

নারাণ বললে, আমি এখন বসছি। এই বেলা তুমি নিজের কাজ সেরে নাওগে বউদি।

সে সর্ব্বক্ষণ এই অন্ধকার স্থানটিতে থেকে থেকে আলোর দিকে যেতে চায় না। আজ দুদিন সে রান্নাঘরে ঢোকে নি। খেতেও তার প্রবৃত্তি হয় নি। স্বামীকে আজ অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখে সে রান্নার সন্ধানে গেল।

পাঁচু বললে, ওও বাঁচবে না নারাণ। না খেয়ে মানুষ কদ্দিন বাঁচে! আমার কথা তো ও কিছুতেই শুনবে না। তুই যদি বলিস, ও তোর কথা ঠেলে দিতে পারবে না।

নারাণ হাঁক দিয়ে তাকে ডাকলে। সে আস্তে আস্তে তার পাশটিতে এসে দাঁড়াল।

—তুমি নাকি দুদিন কিছু খাও নি?

নলিনী চুপ ক'রে রইল।

—তুমিও দেখছি শেষ পর্য্যন্ত রোগে পড়বে। উপোস ক'রে কদিন কাটাবে? তুমি যাও বউদি, এই বেলা দুমুঠো ফুটিয়ে নাওগে। যতক্ষণ না তোমার রান্না হচ্ছে, আমি এখান থেকে উঠব না।

স্নেহের শাসন নলিনী কোন দিন অগ্রাহ্য করে নি, আজও করলে না। ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আকাশে চাঁদ উঠল। ঘরে প্রদীপ জ্বলল। বস্তিতে কোলাহলের রব উঠল। দিন-মজুরের দল এরা। সারাদিনের কাজের পর বাড়ি ফিরে এসেছে সবাই।

নলিনী ঘরে ঢুকতেই নারাণ শুধালে, এরই মধ্যে রাঁধলেই বা কখন আর খেলেই বা কখন?

সে হাঁ বা না কিছুই বললে না। শুধু স্বামীর শয্যাপ্রান্তে এসে ব'সে পড়ল। নারাণের অনুমান মিথ্যা হ'ল না। ঘরে চাল নেই। ঠোঙায় যে কটি ছিল, ইঁদুরে তা নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

—তোমার দেখছি কোন দিনই হুঁস হবে না। সেদিনও তো ঠিক এমনই ধারা হয়েছিল।

নলিনী নীরব হয়ে রইল।

—কি খাবে এখন? একটু সাবধান হ'লে তো আর ইঁদুরে নিয়ে যেতে পারত না।

সে তবুও নিরুত্তর।

নারাণ আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত রইল না। বাসায় গিয়ে সে দেখলে, মা ইতিমধ্যে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসেছে। দাওয়ায় সে মার পাশে গিয়ে বসল।

নিস্তারিণী জিজ্ঞেস করলে, পাঁচু কেমন আছে রে নারাণ?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে, ভালই আছে। আজ আর জ্বর আসে নি।

—আহা-হা, বেঁচে উঠুক। নইলে নলিনী কি নিয়ে থাকবে?

উনানের ধোঁয়া ক'মে আসতে দেখে নিস্তারিণী সেদিকে এগিয়ে গেল।

নারাণ বললে, বউদি, মা, আজ দুদিন কিছু খায় নি। তার জন্যে দুমুঠো নিও তো। না খেয়ে খেয়ে শেষ পর্য্যন্ত ওও দেখছি রোগে না প'ড়ে ছাড়বে না। বল তো মা, ওর ওপর রাগ ধরে কি না? খুব ব'কে দিয়েছি আজ।

নিস্তারিণী বললে, আহা-হা বকতে গেলি কেন বাপু! ওর দুঃখু শুধু ওই জানে।

সে নিজেকে অপরাধী ঠাওরালে।

* * *

নিস্তারিণী আজ আর রাঁধলে না।

চাটুজ্জেদের মোহিতের আজ পাকাদেখা। ছোটগিন্নী তাকে কিছুতেই ছাড়লেন না না খাইয়ে। অবেলায় খেয়ে এ বেলা তার আর খেতে রুচি নেই। দাওয়ায় মাদুরখানা বিছিয়ে সে পুত্রের অপেক্ষায় ব'সে ছিল। আজ তার খাটুনি গেছে প্রচুর। শরীরও কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। অবসন্নতা তাকে পেড়ে ফেলেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে শুয়ে পড়ল। নারাণ যে কখন এসে খেতে বসেছে, তা সে টের পায় নি। ক্রমাগত তার ডাকে নিস্তারিণীর তন্দ্রা ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বাবা। এই বয়সে কি অত খাটা-খাটনি সয়!

নারাণের মন ব্যথায় ভ'রে উঠল। যে জন্যে সে মাকে জাগিয়ে তুললে, সে কথা আর শোনানো হ'ল না। আঁচিয়ে সে মার পাশে এসে বসল।

নিস্তারিণী বললে, পাঁচুর ওখানে এখন আর যাবি না তো?

—যেতে আজ আর ভাল লাগছে না।

—তবে শুয়ে পড়। কাল থেকে তো আবার কাজে বেরুতে হবে।

নারাণ নিরুত্তর।

—সেখানে একটু সাবধানে কাজ ক'র বাবা। যন্তর-পাতি নিয়ে কাজ। হাবলার হাতখানাই তো বাদ দিতে হ'ল। মনিব ভাল, তাই পাঁচ টাকা ক'রে মাসোহারা পায়। নইলে শুকিয়ে মরতে হ'ত।

—আমাকে সে কাজ করতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থেক।

—তবে যে লালবেহারী বলছিল, ঐ কাজই তোকে করতে হবে?

নারাণ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে সে বললে, লালবিহারীদা তোমায় ভয় দেখিয়েছে মা।

এমন সময় শশব্যস্তে নলিনী এসে হাজির।

উৎসুক দৃষ্টি তুলে নারাণ তাকে জিজ্ঞেস করলে, কি মনে ক'রে বউদি ?

—একবার শিগ্‌গির চল। কেমন যেন হয়ে গেছে।

সে তখনই ছুটে বেরিয়ে গেল। নলিনীর পিছন পিছন নিস্তারিণীও এগিয়ে চলল। সমস্ত অবসাদ তার মন থেকে মুছে গেল নিমেষে। পাঁচু একদিন তাকে বাঁচিয়েছিল, সে কথা সে কোনদিন ভুলবে না।

সে রোগীর বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে বাবা ?

নারাণ তার হয়ে উত্তর দিলে, কিছু নয়। জ্বরটা হঠাৎ বেড়ে গেছে, তাই বেহুঁস হয়ে পড়েছে।

ভুঁয়ে ব'সে সে বাতাস করতে লাগল। নলিনী তার পাশে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

এক ফালি ন্যাকড়ায় ওডিকলোন লাগিয়ে নারাণ বললে, তুমি শোওগে মা। আমি হাওয়া করছি।

সে তবুও নড়ল না। পাঁচুকে সে পেটে ধরে নি বটে, কিন্তু নারাণের চেয়ে কোন অংশে তাকে কম ভালবাসে না। তার কাছে সে ঋণী, সে ঋণ কোনদিন শুধতে পারবে না।

পুজোর সময়—বেলু আর ছুলোকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেল, সার্ব্বজনীন-তলায় কোন্ মেয়ের গলা থেকে হার চুরির অপরাধে। নারাণও গেছল তাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে। পুলিস তাকেও ছাড়লে না। নিস্তারিণী তখন চাটুজ্জেদের কলতলায় প'ড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা নিয়ে শয্যা আশ্রয় করেছে। শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া তার দ্বারা তখন আর কিছু সম্ভব হয় নি। সেই অসময়ে, যেমন ক'রেই হোক না কেন, সেই তো বাঁচিয়ে দিয়েছিল তাকে। আজও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সেই কথা ভেবে।

পাড়া ঝিমিয়ে পড়েছে। ফগুয়ার মাদল থেমে গেছে। তাড়ির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে কখন।

নারাণ আস্তে আস্তে ডাকলে, পাঁচুদা, ও পাঁচুদা !

সে তার পানে দৃষ্টি তুলে তাকালে।

—কষ্ট হচ্ছে বুঝি খুব ?

হাত নেড়ে সে জানিয়ে দিলে যে, তার কিছুই হচ্ছে না।

—এবার তুমি ঘুমোও পাঁচুদা।

পাঁচু চোখ বুজলে।

আর খানিকক্ষণ কেটে যাবার পর নলিনী বললে, এইবার তুমি শুতে যাও নারাণ। মাসীমা তোমার জন্যে শুতে পারছেন না। ওঁকে তো আবার সেই রাত থাকতে উঠতে হবে। আমি তো রয়েছি। ঘুম পেলে তোমায় ডেকে আনব 'খন।

নারাণ মার হাত ধ'রে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে তার ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। বাকি রাতটুকু তার দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

ভোরেই সে উঠে পড়ল। দুহাতে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। পাঁচু তখন

অকাতরে ঘুমুচ্ছে। থার্মোমিটার দিয়ে সে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে বললে, একশোরও কম আছে এখন।

নলিনী বললে, রাত্রে কিন্তু খুব ভুল বকেছে।

—জ্বরের মুখে সবাই ওরকম বকে। ও কিছু নয়।

নলিনীর চোখে নারাণ—নারায়ণ।

বস্তি জেগে ওঠবার পুর্ব্বেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই বেলা জল তুলে না রাখলে পরে কল পাওয়া দুরূহ।

হৃদয় তার মহোল্লাসে দুলে উঠল। এতদিনকার বেকার জীবনের অবসান ঘটবে আজ। লেখাপড়া সে তেমন কিছু শিখতে পায় নি, স্বল্পবুদ্ধিতার জন্যে নয়, অভাবের তাড়নায়। সাংসারিক আবর্ত্তে প'ড়ে এদিকে দৃষ্টি ফেরাবারও তার অবসর হয় নি। সমস্ত ঝক্কি বইতে হবে এবার থেকে তাকে একা। এ কথা ভাবতেও একটা পুলকের শিহরণ তার সারা মনে খেলে গেল! সবচেয়ে বড় আনন্দ তার, মাকে এবার সে মুক্তি দিতে পারবে। পাঁচুদাকে সে না-খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে। এতদিনকার জীবনের ওপর তার যতখানি ধিক্কার এসেছিল, সব সে কুয়াশায় ঢেকে দিলে। তার চলাফেরার মধ্যে ছিল না একটুও আনন্দ, নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল তার মন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ ক'রে সে আজ থেকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ ক'রে নিতে পারবে নিজের আয়ু। নানান চিন্তা তার মগজে পাক খেতে লাগল। এবার থেকে আর কেউ তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না। নির্দ্ধারিত পরিধির বেষ্টনী থেকে এবার সে তফাতে যাবার অধিকার পাবে। কিন্তু এ সব ভাবতেও তার ভাল লাগল না। আজ সারাদিন সে পাঁচুর কাছে যেতে পারবে না, সেই ব্যথাই তাকে বারংবার আঘাত দিতে লাগল। মনকে সে কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারলে না।

ঘরে ঢুকে সে পাঁচুকে জেগে থাকতে দেখে বললে, আজ থেকে কাজে ঢুকলুম পাঁচুদা।

পাঁচুর বিবর্ণ মুখখানা আনন্দে ভ'রে উঠল। তার একখানা হাত চেপে ধ'রে বললে, মাইনে পেলে খাইয়ে দিবি তো?

—দোব না? আমার আর আছে কে পাঁচুদা, তোমরা ছাড়া। আচ্ছা পাঁচুদা, তুমিও না এক ছাপাখানায় কাজ করতে?

—হ্যাঁ, কম্পোজ করতুম। সে ছাপাখানা যদি টিকে থাকত, এতদিনে চল্লিশ টাকা মাইনে হ'ত।

সে চমকে উঠল। একদিন তা হ'লে তারও মাইনে চল্লিশ টাকা হতে পারে।

নলিনী পাশের বাড়ি বার্লি করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে নারাণকে দেখে বললে, আটটা বেজে গেছে, সে খেয়াল আছে?

সে ঘাড় নাড়লে।

—নটার মধ্যে তো আবার বেরুতে হবে। কখন যাবে শুনি? তুমি যাও। আজ তো ও ভালই রয়েছে।

নলিনীর তাড়ায় তাকে উঠতে হ'ল। নিস্তারিণী রাত থাকতে উঠে ছেলের জন্যে ভাত রেঁধে রেখে কাজে বেরিয়ে গেছে।

সে হেঁসেলে গিয়ে নিজেই বেড়ে নিলে, নিজেই আবার নিকিয়ে রাখলে। খাবার পর সে আর এক মিনিটও বাড়িতে রইল না। তাড়াতাড়ি শার্টটা গলার মধ্যে ঢুকিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত রাস্তার তুচ্ছ যা কিছু সবই আজ নতুনরূপে তার চোখের সামনে ধরা পড়ল। যে সব জিনিস তার মনে হ'ত কুৎসিত জঘন্য, যারা একদিন তার মনে এতটুকুও রঙ ধরাতে পারে নি, তারাই আজ অপূর্ব্ব শ্রীতে বিমোহিত ক'রে দিতে চায়। অন্তরের রিক্ততাকে আজ সে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে আলোর উৎসে স্নান করিয়ে নিয়ে সে বেকার জীবনের অবসান ঘটাবে। আজ তার কোন গ্লানি নেই—সংস্থানের সহায় তাকে বাঁচবার অধিকারী ক'রে তুলবে।

সে জোরে পা চালিয়ে দিলে।

প্রেসের মধ্যে ঢুকতেই লালবিহারী তাকে সাদরে মেশিন-ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সে ভেতরটা দেখে দস্তুরমত ভড়কে গেল। সভয়ে বললে, আমি তো কিছুই জানি না লালবিহারীদা।

—দেখ না, আমরা কি ভাবে কাজ করি। দেখতে দেখতে তুইও একদিন পাকা হয়ে উঠবি। সেদিন আর এই বুড়ো লালবিহারীকে মনেও থাকবে না।

—না লালবিহারীদা, তোমার দয়া কোনদিন ভুলতে পারব না।

—নে, জামা ছাড়; গেঞ্জি আছে তো? বাবুয়ানির এ কাজ নয়; কুলির কাজ।

নারাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে জামা খুলে ফেললে।

—ঐ যে পেরেক রয়েছে, ঐখানে ঝুলিয়ে রাখ।

লালবিহারী মেশিনের সুইচ টেনে দিলে।

—বেশ মন দিয়ে দেখ, কি ভাবে আমি করছি। এইটা হচ্ছে ব্রেক, এইটে দিয়ে স্পীড মাপা যায়, ওটাকে বলে সুইজ—টেনে দিলেই চলবে।

নারাণ একাগ্র মনে দেখে যেতে লাগল।

* * *

যতদিন না নারাণ মেশিন চালাতে পারদর্শিতা লাভ করছে, ততদিন দশ টাকা ক'রে পাবে, তারপর আরও পাঁচ টাকা দেওয়া হবে। এ কথা শুনে পর্য্যন্ত তার মন খুশিতে ভ'রে আছে। সারাদিনের পরিশ্রম তাকে এতটুকু বিবশ করতে পারে না। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তার এর ওর ফাই-ফরমাস খাটতেও নিতান্ত কম হয় না। এ সমস্ত কিছুই সে গায়ে মাখে না। প্রথম সপ্তাহেই কাজ শিখতে গিয়ে ডানহাতের দুটো আঙুল একেবারে থেঁতলে ফিরে এল। তার পরও যখনই সে সময় পেয়েছে, নিজেকে সফলতায় ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে জগতের চোখে সে যতখানি ছোট হয়ে পড়েছে, এবার থেকে সে সব ফিরিয়ে নেবে। বাঁচবার অধিকার তাকে বেঁচে থাকবার মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে—মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসল।

সব তার গুলিয়ে গেল ছুটির ঘণ্টা পড়তেই। আনন্দে শিস দিতে দিতে সে রাস্তায় বেরুল।

রাতের কলকাতা সে রোজই দেখে—বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক। এত সৌন্দর্য্য যে এর অন্তরালে লুকিয়ে ছিল, সে এই প্রথম উপলব্ধি করলে। জনতার স্রোত ব'য়ে চলেছে। সেও গা ভাসিয়ে দিলে।

বাড়িতে জামা কাপড় ছেড়েই সে পাঁচুর ঘরে ঢুকল।

নলিনী বললে, আচ্ছা নারাণ, তোমার কি অন্য কাজ নেই এখানে ছাড়া? একটুখানি ফাঁক পেয়েছ কি অমনই এসে জুটেছ? নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখেছ কোনদিন? সত্যি বলছি, এমনই করলে তোমায় আর আসতে দোব না।

—তুমি বড় হিংসুটে, যাই বল বউদি।

—না নারাণ, তা নয়। এই রুগীর ঘরে সারাক্ষণ ব'সে থাকলে নিজেরও তো শরীর খারাপ হতে পারে। তোমার ভালবাসা, তোমার দয়া তুমি না এলেও আমাদের মনে থাকবে।

—তুমি ব'সে থাক, তোমার বুঝি হবে না বউদি, জানতে পেরেছ?

—তা কেন? আমার যে উপায় নেই ভাই।

সে চুপ ক'রে রইল।

—লোকে ছুটি পেলে কত আনন্দ করে। তোমার কি কিছুই ইচ্ছে যায় না?

—তুমি হাসালে বউদি। আনন্দকে খুঁজলে পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে মনের জিনিস। তুমি যাও এখন, ক রাত জেগে জেগে তোমার চোখ দুটো করমচার মত লাল হয়ে উঠেছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাওগে। কাল তো আমার ছুটি।

—তুমি কি যে বল!

—আমার কথা শোন বউদি। এখন তুমিও যদি রোগে পড়, কি হবে একবার ভেবে দেখেছ?

নলিনী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পাঁচু জেগেই ছিল, উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনে সে বললে, তোমাকেই শুধু ও ভয় করে নারাণ। আমি কতবার যে ওকে ঘুমোবার কথা বলেছি, কানও দেয় না। বলতে গেলেই বলে, ঘুম আসে না। আচ্ছা নারাণ, আমি ভাল হয়ে উঠব তো?

—নিশ্চয় উঠবে পাঁচুদা। ভগবান কি এমনিই হবেন!

এমন সময় নলিনী এল।

—মাসীমার যে ওদিকে হাঁক পেড়ে পেড়ে গলা চিরে যাবার যোগাড়। আর তুমি দিব্যি ব'সে রয়েছ। আচ্ছা ছেলে যা হোক তুমি। যাও শুনে এস।

সে তখনই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

পাঁচু বললে, নারাণ বলছে, আমি বাঁচব নলিনী।

নলিনী এ কথার কোন জবাব দিতে পারলে না।

পাঁচু বললে, আর তো কিছুই নেই। তোমার হাতের রুলিদুটো, তাও তো গেছে শুনেছি। সেরে উঠেই বা খাব কি? এই শরীর নিয়ে তো আর কাজে বেরুতে পারব না।

—সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি মাসীমাকে ব'লে রেখেছি কোথাও কাজ দেখতে। মন্দ কি, যদি তিন চার টাকা পাওয়া যায়! দু বাড়ি করলে যা হোক ক'রে চ'লে যাবে 'খন।

কথাটা শুনে পাঁচু চুপ ক'রে গেল।

স্বামীর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পেরে সে বললে, মাসীমা যখন করতে পেরেছে, আমিই বা পারব না কেন?

—না, সে কথা ভাবছি না নলিনী। আমাদের আবার মান-অপমান! ভাবছি, আমার জন্যে তোমায় আরও কত দুঃখু সইতে হবে!

—এতে আবার দুঃখু কি? বস্তিতে যারা বাস করে, তাদের দুঃখু ব'লে কিছু নেই। ফগুয়ার ছেলে ম'লো, বউও গেল একই দিনে কলেরায়। দুঃখু তার কি করতে পারলে? সে তাড়ি খাওয়া ছেড়েছে? মাদল বাজানো বন্ধ করেছে? দুঃখু নেই এখানে। দুঃখু থাকলে সে অমন ক'রে নিজেকে ভুলতে পারত না। ও সব ছেড়ে দাও তুমি। বার্লি আনব?

ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানাল।

নলিনী তখনই বার্লি নিয়ে এল। ঝিনুকে ক'রে অতি সন্তর্পণে খাইয়ে দেবার পর সে নিজের শাড়ির একাংশ দিয়ে সযত্নে মুখ মুছিয়ে দিলে।

পাঁচু বললে, ও ঝিনুকটা খোকার ছিল না নলিনী?

উদাস স্বরে সে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

—ওটা দিয়ে তুমি আর কোনদিন আমায় খাইও না। আমি তাকে ভুলে যেতে চাই। তার কোন জিনিস আমার সামনে এনো না।

—আচ্ছা, আর আনব না। আমায় ভুল হয়ে গেছে।

পাঁচুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

* * *

নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল একটা মাস একটানা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। নারাণ এই তিরিশটা দিনের মধ্যে নিজেকে যথেষ্ট উপযোগী ক'রে নিয়েছে। অবহেলার দানকে সে মাথা পেতে নিতে পেরেছিল ব'লেই আজ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তি তার কপালে জুটেছে। নইলে যে নারাণ, সেই নারাণই থাকত।

আজ তাদের মাইনের দিন। সকাল থেকে সকলের মুখে একটা প্রফুল্লতার দীপ্তি—তারও। একে একে সবাই মাইনে আনতে গেল, ফিরে এল সবাই, সে দেখলে। অন্তর তার খুশিতে ভ'রে উঠল এই ভেবে যে, সেও আজ পাবে। মনের অস্থিরতাকে সে কিছুতেই দমন করতে পারলে না, হাজার কাজের মধ্যেও। তার অপ্রতিহত দৃষ্টি নিজের গণ্ডির ভেতর থাকতে চাইল না। সমুদ্রের বিক্ষোভ তাকে সচেতন ক'রে দিয়ে গেল। সে মন থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আবার মন বসালে কাজে। এখনও তাকে এতগুলো কাগজ ছাপতে হবে। কপালের ঘামটুকু মলিন একখণ্ড ন্যাকড়া দিয়ে মুছে সে পুনরায় কাজে মন দিলে।

লালবিহারী তার পাশে এসে দাঁড়াল।

—কেমন হচ্ছে লালবিহারীদা?

একখানা ছাপা কাগজ তুলে নিয়ে সে পরীক্ষা করবার পর বললে, বেশ হচ্ছে। হাত পাকিয়ে ফেলেছিস দেখছি এর মধ্যে। সেই কাগজখানা মুঠোর মধ্যে চেপে সে দূরে নিক্ষেপ করলে।

নারাণ পিছন ফিরে দাঁড়াল।

—এইবেলা গিয়ে মাইনেটা নিয়ে আয়। পরে আপিসের বাবুরা এসে পড়লে ভিড়ে আর নিতে পারবি না।

মেশিন বন্ধ ক'রে সে কালিমাখা দেহ পরিষ্কার করতে গেল।

লালবিহারী বললে, চট ক'রে আসিস। এবারটা না হয় তোকে সঙ্গে নিয়েই যাই।

নারাণ ফিলে এল।

—জামা পরবার আর দরকার নেই, চ।

লালবিহারীর পিছন পিছন সে চলল।

ক্যাশিয়ারবাবুর সামনে গিয়ে সে বললে, এর নাম নারাণ পান। নতুন অ্যাপয়েন্ট হয়েছে সার্।

কথাগুলো ব'লে সে বিদায় নিলে।

মোটা পে-বুকখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে ক্যাশিয়ারবাবু বললে, এইখানটায় সই কর।

নারাণ সই করলে। হাত তার কিন্তু কেঁপে উঠল।

জীবনের একটি পাতা তার স্মরণীয় হয়ে রইল। নামের পাশে সে দেখতে পেলে, লেখা রয়েছে—কেবলমাত্র দশ টাকা। টেবিলের ওপর থেকে নোটখানা তুলে নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সেখানা ভাঁজ করতে করতে স'রে এল। নিজের পরিচিত স্থানটিতে গিয়ে সে অতি সাবধানে বুকপকেটে বন্দী ক'রে রাখলে তার উপার্জ্জিত রত্নটিকে। এই কাগজখানাই তার জীবনের এক মাসের মূল্য।

আবার সে কাজে মন দিলে। সবগুলো শেষ না করতে পারলে তার নিষ্কৃতি মিলবে না।

ছুটির ঘণ্টা পড়ল।

সবাই আনন্দে দিশাহারা হয়ে বেরিয়ে পড়ল। নারাণও বেরুল। পথ চলার আনন্দ আজ তাকে মাতিয়ে তুলল। বার বার পকেটে হাত দিয়ে তার এই কথাই মনে হতে লাগল যে, ওদের কাছে দশ টাকা হতে পারে সামান্য, তার কাছে একটা রাজ্যের সামিল কিম্বা তার চেয়েও বড়। জীবনের দীনতাকে সে আজ সোনালী রঙে ছুপিয়ে নিতে পারবে। সে চলেছে তার পরিচিত পথ ধ'রে। মার নিরানন্দ মুখখানি সে আজ ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ ক'রে দেবে। চিন্তার হাত থেকে এবার সে রেহাই পাবে। বাড়িওয়ালার মৃদু তিরস্কার তাকে আর সইতে হবে না। অনির্দ্দিষ্টের মুখ চেয়ে তার দিন কাটাবার আর দরকার নেই। কৃতজ্ঞতায় সে তাঁর কাছে মাথা নোয়ালে, যাঁর প্রতি সে বিশ্বাস হারিয়েছিল একদিন।

বউবাজারের মোড়ে আসতেই তার সহসা মনে প'ড়ে গেল, ডাক্তারবাবু কমলালেবুর রস খেতে বলেছেন পাঁচুদাকে। ফলের দোকান সারি সারি তার নজরে পড়ল। সবচেয়ে বড় দু জোড়া নেবু নিয়ে সে নোটখানা দোকানদারের হাতে দিলে। আপেল, ডালিম, আঙুর আরও কত কি সাজানো

রয়েছে। সেদিন পাঁচুদা আঙুর খেতে চেয়েছিল, সে কথাও তার মনে পড়ল। দোকানীকে এক পোয়া আঙুর দেবার কথা জানালে।

দোকানদার প্রশ্ন করলে, আওর কুছ দেগা বাবুজি?

হাত নেড়ে নারাণ নিষেধ করলে, আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

টাকাগুলো বাজিয়ে নেবার পর্য্যন্ত তার সময় হ'ল না। আজ সে পাঁচুদার মুখে হাসি ফোটাবে, মাকে সে আজ ঋণমুক্ত করবে।

তার চিন্তার ধারা সহসা বাধা পেল করুণ আর্ত্তনাদের স্পর্শ পেয়ে। ক্ষণেকের জন্যে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নলিনীর গলার স্বর তার সুপরিচিত। অসহায় ঐ নারীটি চব্বিশ ঘণ্টা নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলেছে স্বামীর জীবনের বিনিময়ে। কত ক'রেও সে তাকে বিছানার পাশ থেকে ওঠাতে পারে নি। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার কঠোর ব্রত নিয়ে সে দিনের পর দিন ব্যয়িত করেছে। তবে কি সর্ব্বহারার গান গাইবার তার আজ দিন এসেছে? তাই কি সে কাঁদছে? আকুল আগ্রহে সে ঘরে ঢুকল।

নলিনী কাঁদছে। বন্যার স্রোত তার চোখে এসে নেমেছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধন হারিয়ে ফেলার ব্যথাই ওকে আকুল ক'রে তুলেছে। কাঁদুক, কাঁদুক ও; আর ওর কাঁদবার দিন আসবে না। মানুষের জীবন বলতে যদি একেই বোঝায়, বেঁচে থেকে মরণের আস্বাদ তাকে প্রতিনিয়ত পেতে হবে। অসম্ভব, নারাণের পক্ষে বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব। একটা মাসের আনন্দ তার মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। নীরবে সে শুধু ফলের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।
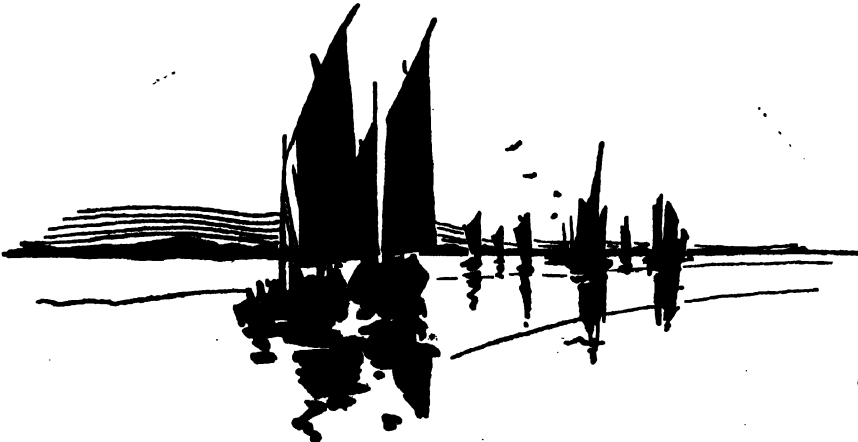
# ভীমরথী ও তাহার প্রতিকার

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দীর্ঘজীবন মানুষের যত কাম্যই হউক না কেন—বার্ধক্য ও আনুষঙ্গিক দুঃখকষ্ট আদৌ তাহার কামনার বিষয় নহে। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ তাহার দৈনিক উপাসনার সময় শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রার্থনার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বার্ধক্যের দৈন্য সে সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া চলিতে চায়; তাই সে স্পষ্টভাবেই বলে, আমি যেন এক শত বৎসর দেখিতে পাই, আমি যেন এক শত বৎসর শুনিতে পাই, আমি যেন এক শত বৎসর কথা বলিতে পারি, আমি যেন অদীন-ভাবে শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারি। চক্ষু, কর্ণ, বাক্য ও গতির শক্তি হারাইয়া স্থবিরভাবে দীর্ঘজীবন লাভ করিবার ইচ্ছা মানুষের কোনও সময়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানহীন শিশুর বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল; তবে সে বাবা-মা কাকা-কাকীর মত হইতে চাহে; দিদিমা-ঠাকুরমা দাদামহাশয়-ঠাকুরদাদার পক্ক কেশ ও গলিত দন্ত সে পছন্দ করে না।

এই কারণেই মানুষ চিরদিনই কালকে বঞ্চিত করিয়া নিজের যৌবনোচিত শক্তিসামর্থ্য অটুট রাখিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়া আসিতেছে—লৌকিক ও অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়া সে চিরদিনই বার্ধক্যকে দূরে রাখিবার জন্য যত্নপরায়ণ। দেশী বিদেশী নানারূপ রসায়ন পুষ্টিকর ঔষধের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনগুলি বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও মানুষের সেই চেষ্টা ও যত্নের সাক্ষ্য দান করে। কায়কল্প প্রভৃতি অনুষ্ঠান এই একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। পিণ্ডস্থৈর্যের জন্য—দেহপিণ্ডকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যোগশাস্ত্রের নানা প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বৃদ্ধবয়সেও অলৌকিক উপায়ে যৌবন লাভ করিবার বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অপরিজ্ঞাত নহে। স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনি ও কলিকে বৃদ্ধ বয়সে যৌবন দান করিয়াছিলেন। নৃপতি যযাতি পুত্রের যৌবন নিজে গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল সুখ ভোগ করিয়াছিলেন।

বার্ধক্যের বিষময় পরিণামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নানারূপ শান্তিস্বস্ত্যয়ন অনতিপ্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও এই জাতীয় অনুষ্ঠান কোন কোন প্রদেশে অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। ১৯২২-২৩ সালে নেপালের পরলোকগত মহামন্ত্রী মহারাজ সার্ চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর ষাট বৎসর বয়সে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত উগ্ররথশান্তি ও ষষ্টিপূর্তিশান্তি নামক দুইটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, থিয়সফিকাল সোসাইটির অধ্যক্ষ ডক্টর জে. এম. আরাণ্ডেল বিগত ডিসেম্বর মাসে এই ষষ্টিপূর্তিশান্তির[১] অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বস্তুত,

[১] কোন কোন প্রাদেশিক ভাষায় বর্তমান কালে ষষ্টিপূর্তি উৎসব, সপ্ততিপূর্তি উৎসব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। 'জয়ন্তী উৎসব' এই অবিশুদ্ধ ও আধুনিক ধার করা অশোভন শব্দের স্থলে এই শব্দগুলি ব্যবহার করা চলে কিনা বিবেচ্য।

ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে এই জাতীয় অনুষ্ঠান এখনও পরিচিত। অন্যত্র অপরিচিত এই অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই সকল অনুষ্ঠানের বর্ণনাপূর্ণ কয়েকখানি পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। এই পুঁথিগুলিই আমার অবলম্বন। সবসুদ্ধ তিনটি অনুষ্ঠানের নাম এই পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে উগ্ররথশান্তি ষাট বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেই সম্পন্ন করিতে হয়, ষষ্টিপূর্তিশান্তি ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে এবং ভীমরথশান্তি সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিলে অনুষ্ঠেয়। ষাট বৎসর বয়স বা তদধিপতি মৃত্যুদেবতার নাম উগ্ররথ এবং সত্তর বৎসর বয়সের অধিপতি মৃত্যুর নাম ভীমরথ[১]। বোধ হয় রথ বা বাহনের ভীষণতার জন্যই এই দুই নাম কল্পিত হইয়াছে। সাধারণ ধারণা—যম বা মৃত্যুর অধিপতির বাহন ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মহিষ। আর উগ্ররথের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—উগ্ররথ ব্যাঘ্রের উপরে সমাসীন; তিনি করালবদন, বিকৃতচক্ষু এবং উগ্র। ষাট এবং সত্তর বৎসর বয়সে এই দুই মৃত্যু-দেবতাকে সন্তুষ্ট না করিলে নানা অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। বার্ধক্য-জনিত কতকগুলি অশান্তির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। শারীরিক অস্বাস্থ্য, ধনহানি, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু—এই সমস্তই এই অশান্তির অন্তর্ভুক্ত[২]। বস্তুত দীর্ঘজীবন লাভ করিলে অনুষঙ্গত এই সকল দুঃখ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। পুঁথিতে উপদিষ্ট শান্তিকর্মের দ্বারা এই অশান্তি কিয়ৎ-পরিমাণে উপশমিত হইতে পারে। তবে এই অনুষ্ঠানও একেবারে সুসাধ্য নহে। শুভদিনে পবিত্র স্থানে গৃহে বা বাহিরে স্বতন্ত্রনির্মিত মণ্ডপে এই অনুষ্ঠান বিধেয়। অনুষ্ঠাতা বা যজমানের সামর্থ্যানুযায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃত্তিকা নির্মিত বিগ্রহে বিবিধ দেবতার পূজা এই উপলক্ষে করিতে হয়। এই উপলক্ষে অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম—এই কয়জন পুরাণপ্রসিদ্ধ চিরজীবীর পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকট দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করিবার বিধান আছে। পূজার সময় বিবিধ বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পূজার পর নানা দ্রব্য সাহায্যে পূজিত দেবতার হোম কর্তব্য। তৎপরে শতচ্ছিদ্রসমন্বিত কলসীস্থিত পবিত্র জলে যজমানকে স্নান করাইতে হয়। শত ছিদ্র বোধ হয় শত বর্ষ পরমায়ুর প্রতীক। পূজা অন্তে যথাশক্তি দীন দুঃখী ও ব্রাহ্মণকে বিবিধ সামগ্রী দান করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতে হয়। পুঁথিতে ফলশ্রুতিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই অনুষ্ঠানের ফলে মৃত্যুভয় বিদূরিত হয়, বার্ধক্যজনিত দুঃখকষ্টের লাঘব হয় এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়। উল্লিখিত তিনটি শান্তিকর্মেই এই জাতীয় অনুষ্ঠান, পরস্পর পার্থক্য সামান্য মাত্র।

এই সকল শান্তিকর্মের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের জন্য ইহাদের সহিত দেবতা ও বৈদিক মনীষীদের সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য পুঁথির মতে উগ্ররথশান্তি শৈবাগমে উক্ত হইয়াছে ইহা কার্তিকেয় ও শিবের কথোপকথনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক মনীষী শৌনিক কর্তৃক

[১] শব্দকল্পদ্রুম নামক প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থে উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে সাতাত্তর বৎসর বয়সের সপ্তম মাসের সপ্তম নাম ভীমরথী। বার্ধক্য বা বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশাদিকে বাংলা দেশে সাধারণভাবে ভীমরথী বলা হয়। বা বাহাত্তর বৎসরে বার্ধক্যের পূর্ণ পরিণতি, এইরূপ মনে করা হয়। মৃত্যুর দেবতা ভীমরথের নাম হইতেই মরথী শব্দের উৎপত্তি বা ভীমরথী হইতেই ভীমরথের কল্পনা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

[২] ঋগ্বেদের মত প্রাচীন গ্রন্থেও বার্ধক্যের ক্লেশ বর্ণিত হইয়াছে ( ১।৭১।১০, ১।১৭৯।১ )। ভাগবতে জরাকে ভগিনী বলা হইয়াছে।

ষষ্টিপূর্তিশান্তির বিধান সংকলিত হইয়াছিল বলা হয়। আর ভৈমীরথীশান্তি বা ভীমরথশান্তির যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাকে বৃহচ্ছৌনকীয় নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে ষষ্টিপূর্তিশান্তির অনুষ্ঠান স্থানীয় পণ্ডিতদের মতে চতুবর্গচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত শৌনককথিত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে।

অবশ্য কেবল এই সব উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের প্রাচীনতা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। তবে ইহাদের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজনই বা কি? অনাদিকাল হইতে সকল দেশের সকল মানুষের যে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাহারই ইঙ্গিত অধুনা স্বল্পপ্রচার এই সকল অনতিপ্রাচীন ও অনতিনবীন অনুষ্ঠানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই এগুলি অবিশ্বাসীরও উপেক্ষার যোগ্য নহে—নৃতত্ত্বালোচীর পক্ষে এগুলি অমূল্য—সাধারণ পাঠকের চিত্তে এগুলির বর্ণনা কৌতুকের সৃষ্টি করিবে। যিনি যে দিক্ দিয়াই ইহাদের মূল্য বিচার করুন না কেন—প্রাচীন পুঁথির আলোচনা-প্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত যে দুই চারিটি কথা আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহা সাধারণকে জানাইয়াই আমি খালাস।

---

# মিলন-তীর্থ

( Shelley's—"Love's Philosophy" কবিতা অবলম্বনে )

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে,
তটিনী মিশিছে সাগর সনে,
হিয়ার গোপন ভবনে পশিয়া
দখিনা পবন মিশিছে মনে ;
বিধির বিধানে একা কেহ নাই,
এ ভুবন মহামিলন-মেলা,
মিলিবে না প্রেম মিলন-তীর্থে
শুধু আমাদেরই জীবন-ভেলা ?

শৈল-শিখর চুমিছে আকাশ,
লহরী লুটিছে লহরী বুকে,
কুসুমের রেণু পরাগ-পিয়াসে
মিশে মধুলোভী অলির মুখে ;
রবিকর হাসি চুমিছে ধরায়,
চাঁদিনী চুমিছে সাগর-জল,
তুমি যদি মোরে না চুম, এসব
চুম্বনে তবে বল কি ফল ?

## গ্রন্থ-পরিচয়

### রসকলি—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস—২০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০ ]

বাংলা দেশের সাহিত্য-প্রতিভা ছোটগল্প এবং গীতি-কবিতাকে আশ্রয় করিয়া যতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে ঠিক ততখানি সার্থক হয় নাই। তাহার কারণ, বাঙালীর মন স্বভাবত গীতিপ্রবণ, ছোট কথা এবং ছোট সুরের মধ্যেই গুঞ্জন তুলিয়া শিল্প-সুষমায় রচনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে তাহাকে বেগ পাইতে হয় না। বাংলা ছোটগল্পের অন্তঃপ্রকৃতিও মূলত গীতিধর্ম্মী। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকথিত ভারতী-যুগের শেষ পর্য্যন্ত কবিতায় এবং গল্পে আমরা প্রধানত এই ইতিহাসটাই দেখিতে পাই—

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্ণে পড়ে তরুচ্ছায়া,
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়-দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়।
ভেদ করি মোর প্রাণ, জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।
এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের পরে।

প্রভাতকুমারই সর্ব্বপ্রথম "কল্পনার ধনগুলি"কে অপেক্ষাকৃত আড়ালে রাখিয়া "ছায়াপ্রায় আর সব"কে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলা দেশে তারাশঙ্করই এই কার্য্যে যথার্থ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ভূমিকায় সত্যই লেখা হইয়াছে—

"তারাশঙ্করের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন তাঁহার অকৃত্রিমতা; গল্প লেখাটা তাঁহার আত্মপ্রকাশের একটা ভঙ্গিমাত্র নয়। তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু বাংলা দেশের বৃহত্তম সমাজকে কেন্দ্র করিয়া—পল্লীগ্রাম লইয়া। বাংলার পল্লীর সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, নীচতা-দীনতা তিনি নিজে পল্লীবাসীর মতই অনুভব করেন, এবং যাহা অনুভব করেন, তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই। তাঁহার সৃষ্টির অন্তরালে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজ করিতেছে বলিয়া বর্ত্তমানে বাংলা দেশের গল্পলেখকদের মধ্যে তিনিই সকলের চাইতে বেশি টাইপ-চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

যাঁহারা তারাশঙ্করের 'রাইকমল', 'ছলনাময়ী', 'জলসাঘর' ও 'আগুন' পড়িয়াছেন, তাঁহারাই উপরে উদ্ধৃত উক্তির সমর্থন করিবেন, আলোচ্য গ্রন্থেও এই প্রমাণ যথেষ্ট মিলিবে।

'রসকলি'—কালাপাহাড়, তাসের ঘর, মতিলাল, মুসাফির-খানা, শ্মশান-বৈরাগ্য, মুটু মোক্তারের সওয়াল, অগ্রদানী, প্রতিমা ও রসকলি এই নয়টি গল্পের সমষ্টি। প্রত্যেকটি গল্পে প্রত্যক্ষ বাস্তব দৃশ্য ও ঘটনার সহিত লেখকের গভীর সহানুভূতির পরিচয় আছে; বিস্মৃত এবং অকিঞ্চিৎকরও এই দরদের গুণে বিচিত্র রসমহিমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তারাশঙ্করের রচনা পড়িতে পড়িতে Modern Fiction সম্বন্ধে Virginia Woolf-এর কথাগুলিই আমাদের মনে পড়ে।—

Is it not the task of the novelist to convey this varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display, with as little mixture of the alien and external as possible?

তারাশঙ্করের সৃষ্ট প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই এই aberration এবং complexity সুদ্ধই আমাদের রসপ্রকৃতিকে নাড়া দেয়, অকারণ প্রলেপে সেগুলিকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা বড় একটা দেখা যায় না। ইহাই তারাশঙ্করের বিশেষত্ব এবং এই গুণেই তিনি বাংলা দেশের লেখকসমাজে বরাবরই একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন।

### জলের লিখন—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

[এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲]

লেখক স্বভাবসুলভ বিনয় সহকারে এই কাব্যগ্রন্থ-

খানিকে 'জলের লিখন' নাম দিয়া ভবিষ্যৎ কালের উপর দাবি পরিহার করিলেও কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, সাহিত্যরসিক-সম্প্রদায় এগুলিকে স্বীকার করিয়া লইবেন এবং বাংলা গীতিকবিতার বহু বিচিত্র ভঙ্গির মধ্যে কবি সুধীরকুমারের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি স্থায়ী হইবে। তিনি স্বয়ং দীর্ঘকাল কাব্যসাধনা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও বর্ত্তমানেও দেখিতে পাই, তাঁহার এই ভঙ্গি বহু অনুকরণের দ্বারা মর্য্যাদালাভ করিয়াছে; বাহিরের দৃশ্য পদার্থকে কেন্দ্র করিয়া কবির মনে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের সংগ্রাম নিরন্তর চলিতেছে, 'জলের লিখন' সেই ভাব-সংগ্রামের কাব্য, প্রেমের পাত্রও উপলক্ষ মাত্র, কবির সত্যকার প্রেম নিজের মনের সহিত। এই অন্তর্মুখী রসধারার মধ্যে অতি সঙ্গোপনে একটা বৈরাগ্যের খেলা দেখিতে পাই, কবিমনের প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় মাঝে মাঝে মন বেদনাহত হইয়া পড়ে। বস্তুত এই ভঙ্গি দিয়াই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছে; যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল যে বিদ্রোহ সুরু করিয়াছেন, সুধীরকুমারেও তাহার পর্য্যাপ্ত প্রকাশ দেখিতে পাই। এই দিক দিয়া এই তিনজনের মনের গঠন ঠিক বাঙালী ধাঁচের নয়।

এই কাব্যগ্রন্থে ৪৫টি কবিতা স্থান পাইয়াছে; প্রায় সকলগুলিই ১৩২৭ হইতে ১৩৩৩ সালের রচনা, তাহার পর কবি, যে কারণেই হউক, প্রকাশ্য কাব্যসাধনা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যে অপূর্ব্ব সম্ভাবনা এই কবিতা কয়টির মধ্যে লুকাইয়া আছে, কবি অন্যমনা হইয়া স্বহস্তে তাহা খণ্ডিত করিয়াছেন—এই সত্য কাব্যরসিককে পীড়া দিবে।

কবি সুধীরকুমার আধুনিক হইলেও ফর্ম্মের দিক দিয়া প্রাচীনপন্থী, তাঁহার ভাষাও কঠোরভাবে ক্লাসিকাল।

কাব্যের পরিচয় কবিতাপাঠে। যাঁহারা কবিতা ভালবাসেন, 'জলের লিখন' পড়িয়া তাঁহারা খুশি হইবেন। আমরা তাঁহার "ফলের ফসল" কবিতা হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া সমালোচকের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি।—

ফুলের জীবন বিফল যাহার লাগি',
ফলের ফসল, কে জানে কি ফল তাহে?
শ্যামলের বুকে কোন্ তৃষা আছে লাগি',
বনের বাসনা কাহারে লভিতে চাহে!
জীবনের ধারা টেনে টেনে পলে পলে
যুগযুগান্ত তাহারই সাধনা চলে,
ঝড়ের পেষণে, বাদল-অশ্রুজলে,
জ্বলি' রবিকরে, দহিয়া বাড়ব-দাহে!

ভালবেসে যারে বুকে টেনে নিতে চাহি,
সে কি জানে ওগো, সে কি জানে, সে কি জানে,
মোর প্রেমে কিছু মোর যে বলিতে নাহি,
জীবনেরই ধারা অন্ধ আবেগে টানে?
কোটী কোটী প্রেম, কোটী কোটী বেদনাতে
যুগের সাধনা চলেছে দিবস-রাতে,
অনাহার-মারী-যক্ষ্মা-পক্ষাঘাতে
যতিহীন গতি কোন্ অলক্ষ্য পানে!

## যৌন-বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ

[ স্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরি, ঢাকা, ৫৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৷৷০ ]

গত কয়েক বৎসরে বাংলা দেশে এবং বাংলা ভাষায় যৌন-বিজ্ঞানের আলোচনার কিছু বাহুল্য দেখা যাইতেছে; অনধিকারীদের উৎসাহই বেশি। বিদেশী সস্তা পুস্তকের কুৎসিত অনুবাদ করিয়া পাঁচবার বাৎস্যায়ন ও বার কয়েক এলিস আওড়াইয়া জরায়ু ও শুক্রকীটের ছবি সহযোগে বাংলা দেশের সরল পাঠককে যে বস্তু যৌন-শাস্ত্রের নামে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সন্ত্রাসবাদের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টিপরায়ণ না হইলে বাংলা দেশের পুলিসই এগুলির সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন। এই সকল কদর্য্য পুস্তকের বহুলপ্রচারে দেশের ভাবী ভরসা তরুণ-তরুণীরা কি ভাবে প্রতারিত হয়, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহার ইতিহাস জানেন।

'যৌন-বিজ্ঞান' এই শ্রেণীর পুস্তক নহে, ইহাতে সত্যকার বিজ্ঞানের স্পর্শ আছে। গ্রন্থকার স্বয়ং পুলিসের লোক এবং ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় পুস্তকটিকে পাসমার্কা দিয়াছেন; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও ইহাকে আপত্তিকর মনে করেন নাই।

যৌনবিষয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিখিত হইয়া এদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে যে বিশেষ উপকার দর্শিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আমাদের ছেলেমেয়েরা এ বিষয়ে এতই অজ্ঞ যে, ফলে অনেকের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে দেখা যায়। ভাল বইয়ের সাহায্যে সহজেই এই অজ্ঞতা দূর করা যায়। 'যৌন-বিজ্ঞান' এইরূপ একটি ভাল বই। গিরীন্দ্রবাবুর উক্তিই এই পুস্তক সম্বন্ধে চরম প্রশংসাপত্র। তিনি বলিয়াছেন—

"ইহাতে যৌন-বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা আছে। গ্রন্থকার অশেষ পরিশ্রম করিয়া বহু বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কামশাস্ত্র, আরবীয় কামবিদ্যা সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত পুথি ও পুস্তক, ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি নানা প্রাচ্য জ্ঞান-ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিয়া তিনি জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থকারের 'যৌন-বিজ্ঞান'কে কামসংহিতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি কামবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ না হইয়াও বহু আয়াসলব্ধ তথ্যগুলির আলোচনায় যে নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।... গ্রন্থকারের লিখন-ভঙ্গী মার্জিত ও সুরুচিসঙ্গত।"
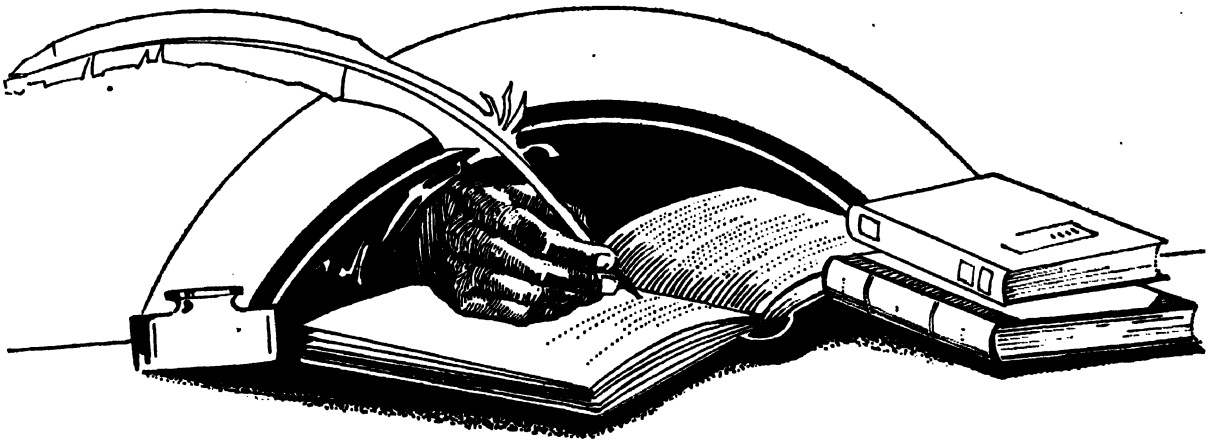
# সম্পাদকীয়

**বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন**

জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিভাগে পরাজিত বাঙালী এখন পর্য্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পকলার গৌরবে ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশের উপর প্রাধান্যের দাবি করিয়া থাকে। যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাঙালী এতদিন নেতৃত্ব করিয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির প্রতিপক্ষতা ভেদ করিয়া রাষ্ট্রপতিপদে বাঙালী সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচন সত্ত্বেও তাহাতে যে তাহারা প্রদেশবিশেষ হইতে পিছাইয়া পড়িয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; বাংলা দেশের রাষ্ট্র-নেতাগণ এখন গুজরাট ও যুক্তপ্রদেশের প্রবলতর শক্তির মুখ চাহিয়া থাকেন, অর্থ-নৈতিক সংগ্রামে অর্থাৎ ব্যবসায়ে বাঙালী যে বাংলা দেশেই পরাজিত, ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মনের ক্ষেত্রে এই পরাজিত এবং নিগৃহীত জাতিই এমন একটা সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, যাহার শাসন এখনও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশকে মানিয়া চলিতে হইবে। এই প্রাধান্যের নানাবিধ কারণ নানা জনে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম সংঘর্ষ বাংলা দেশে সংঘটিত হওয়াতেই এরূপ হইয়াছে, অনেকের ইহাই ধারণা। কারণ যাহাই হউক, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে বাঙালী প্রতিভাই যে উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছে, ফলের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিলোপের অপূর্ব্ব প্রবণতা সত্ত্বেও, নদীমাতৃক শস্যশ্যামলা ভূমির গুণেই হউক, অথবা আর্য্য ও আর্য্যেতর, পার্ব্বত্য ও মঙ্গোল নানা রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই হউক, কৃশ ও খর্ব্বকায় বাঙালী মানস-সৃষ্টির যে বিস্ময়কর প্রতিভা অর্জ্জন করিয়াছে, নিতান্ত দেবানুগ্রহ বলা ছাড়া তাহার পক্ষে অন্য যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত বিবিধ লাঞ্ছনার পঙ্কসমুদ্রের উর্দ্ধে পঙ্কজ-শোভায় বিকশিত হইয়া অন্যথা-প্রধান ভারতবর্ষের অপর প্রদেশ-বাসীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া থাকে; সুতরাং বাঙালীকে যদি এই অবস্থাতেও লেন-দেনের কারবার করিতে হয়, এই মূলধনের উপরেই করিতে হইবে।

সুতরাং বাঙালীর জীবনে এই বাৎসরিক সাহিত্য-সম্মেলনগুলি একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। প্রবাসে এবং নিজবাসে আত্মমর্য্যাদাবোধের ইহাই তাহার অবলম্বন এবং সহস্র বন্ধন ও নিপীড়নের মধ্যে এখানেই তাহার মুক্তি। এই মুক্তির ক্ষেত্রকে আবর্জ্জনাশূন্য রাখিয়া সহস্র-বর্ষের বাঙালী-সাধনার ইতিহাস পর্য্যালোচনা দল বাঁধিয়া করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় দাসত্ব হইতেও যে মুক্তি ঘটিতে পারে, ফ্রান্স এবং রুশিয়ার ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সাহিত্য-সম্মেলনগুলিকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত রাখিতে পারিলে অদূরভবিষ্যতে সম্প্রদায়গত বহু বিরোধ এবং দীর্ঘ দাসত্বের অনেক বাধা যে অপসারিত করিতে পারিব, এই বিশ্বাস আমরা যেন না হারাই।

এই বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন কুমিল্লায় সংঘটিত হইতেছে; আয়োজন সুরু হইয়াছে, মূল ও বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিদের নামও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। মূল

সভাপতি হইবেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কাজি আবদুল ওদুদ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, পঞ্চানন নিয়োগী, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ধূর্জ্জটিকুমার মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সঙ্গীত-শাখার পৌরোহিত্য করিবেন।

এই সম্পর্কে আমাদের দুইটি বক্তব্য আছে, ভবিষ্যতে সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। যে সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া এই সম্মেলন, তাহাকে শাখার মর্য্যাদা দিয়া অপমান করার আমরা বিরুদ্ধে; সাহিত্যই মূল—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি শাখা হইতে পারে।

সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্যিকরাই প্রধান, অন্য সকলে অপ্রধান। কার্য্যত দেখিতে পাই, অপ্রধানদের লইয়াই সম্মেলন পরিচালিত হয়। প্রধানেরা থাকিলেন কি না থাকিলেন, তাহার হিসাব রাখারও প্রয়োজন কর্ত্তৃপক্ষ বোধ করেন না। ভলান্টিয়ারদের রাইবেঁশে নৃত্য, বিচিত্র কণ্ঠ-সঙ্গীত, বালিকা ও নাবালিকাদের লীলায়িত দেহভঙ্গি প্রদর্শন এবং স্থানীয় গৃহিণীদের সূচীশিল্পের সভয়-সমাদর, এই-গুলিই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। আই-সি-এস ছড়াবিদ অথবা ইন্‌সিওরেন্স দালালদের কৃপাপরবশ উপস্থিতিতেই সম্মেলন এমন সার্থক হইয়া উঠে যে, দরিদ্র সাহিত্যিকরা পলাইবার পথ পান না। ফলে প্রায় সকল সাহিত্য-সম্মেলনই শিবহীন হইয়া দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়। ইহাতে সাহিত্য-সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

এখন পর্য্যন্ত সম্মেলনগুলিতে তরুণ সাহিত্যিকদিগকে যথাযোগ্য সম্মান এবং মর্য্যাদা দেওয়া হয় না—ইহাই আমাদের দ্বিতীয় আপত্তি। জীবন্মৃত ও মৃতপ্রায় সাহিত্যিকদের লইয়া যে পরিমাণ ঘটা হইয়া থাকে, তাহার সামান্য অংশও যদি সমর্থদের ভাগ্যে জুটিত, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মেলনগুলির চেহারা ফিরিয়া যাইত। উৎসাহের অভাবে যৌবনধর্ম্মী সাহিত্যিকরা সম্মেলনগুলিকে এড়াইয়া চলিতেছেন, সম্মেলনের মাধুর্য্য নাই, সভাপতিরা পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি ও মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন এবং দৈনিক সংবাদপত্রে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদলের ফোটোগ্রাফ ছাপিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন।—এইরূপ হইতে থাকিলে সাহিত্য-সম্মেলনের 'সাহিত্য'-বিশেষণটি তুলিয়া দিবার জন্য আমরা দাবি করিব। আশা করি, কুমিল্লা-সাহিত্য-সম্মেলন সাহিত্য-সম্মেলনই হইবে।

## উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েট্‌স

গত ২৮এ জানুয়ারি আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েট্‌সের মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার কাব্যের সহিত বাংলা দেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবার পূর্ব্বে তিনি (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া বাংলা দেশে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে ভারতীয় সাধনার পরিচয় পাইয়া তিনি সেদিন যে শ্রদ্ধার সহিত লিখিতে পারিয়াছিলেন—

These lyrics—......display in their thought a world I have dreamed of all my life long. The work of a supreme culture, they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the rushes. A tradition, where poetry and religion are the same thing, has passed through the centuries, gathering from learned and unlearned metaphor and emotion, and carried back again to the multitude the thought of the scholar and the noble.

তাহাতেই আমাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার কাব্য ও নাটকের রসাস্বাদন করিয়া আমরা বুঝিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় সাধনার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন একজন বৈদেশিক কবি মাত্র নন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারের তিরোধান ঘটিয়াছে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাব্লিনে ইয়েট্‌সের জন্ম হয়। তিনি হ্যামার্‌স্মিথের গোডোল্‌ফিন বিদ্যালয় ও ডাব্লিনের ইরাস্‌মাস বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া মাত্র একুশ বৎসর বয়সেই সাহিত্যকে উপজীবিকা-স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডে গেলিক আন্দোলন সুরু হইয়াছিল, তিনি ইহাতে যোগদান করিয়া লণ্ডনে ও ডাব্লিনে দুইটি আইরিশ সাহিত্য-সমিতি স্থাপন করেন; পরে তিনি প্রধানত লেডী গ্রেগরির সহায়তায় (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) আইরিশ ন্যাশনাল থিয়েটার গঠনে সক্ষম হন—এখানেই তাঁহার 'দি কাউণ্টেস ক্যাথ্‌লীন' নাটক অভিনীত হয়। 'দি ল্যাণ্ড অব হার্টস ডিজায়ার' তাঁহার

আর একটি প্রসিদ্ধ নাটক। কিন্তু প্রধানত লিরিক-কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'দি উইণ্ড অ্যামঙ্গ দি রীড্‌স' ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা কম নয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি ভারতীয় উপনিষৎ লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতেন এবং পুরোহিত স্বামীর সহিত একযোগে দশখানি উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিখ্যাত কবির মৃত্যুপ্রসঙ্গে ইংলণ্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—

...through his verses and plays and his prose memories he brought a world of the spirit, detached from the intellect, unoccupied with materialism, almost unaware of commerce, and never fretful in the bonds of a mechanical morality. From his own ever-vivid experience he had discovered that "faith is the only gift man can make to God, and therefore it must be offered in sincerity" and that "true love is a discipline in which each divines the secret self of the other and refuses to believe in the mere daily self"... he proclaimed with a more certain voice than any writer since Shelley the poets' place in the world.

বর্ত্তমান সংখ্যা 'অলকা'য় তাঁহার দুইটি ক্ষুদ্র কবিতার শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাজপেয়ীকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

## প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ও বাংলা দেশ

যদিও রাষ্ট্রনীতি আমাদের আলোচনার বিষয় নহে, তথাপি গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে জলপাইগুড়িতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে "বাংলার বৈশিষ্ট্য" ও "ভাষার ভিত্তিতে বাংলা দেশ গঠন" শীর্ষক যে দুইটি অভিমত আছে, বাঙালীর সমাজ-জীবনে সেগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকার করিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীযুক্ত বসু বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে ঐক্যের দিকে চলিয়াছে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভকালে যে ঐক্যের সূচনা হইয়াছিল, যে ঐক্য যুগে যুগে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমাদের উপর।...বাঙালী অবাঙালী নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য বাঙালীর যে নিজস্বতা বা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, উহার মধ্যে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব খুবই স্বাভাবিক। এই বিভেদকে আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের হিসাবে বাদ দেওয়া হয় নাই।...কিন্তু তেমনই বলা আবশ্যক, কংগ্রেস কর্ত্তৃক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের সমগ্রতাবোধ ও ঐক্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেষ্ট থাকিবার দায়িত্ব আমাদের বেশী। আমরা নিজেদের বিশেষত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে যতই সচেতন হই না কেন, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষের মূল ঐক্য প্রাদেশিক বিশিষ্টতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, একথাও ভুলিলে চলিবে না যে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে আমাদের ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অন্য কোনও রূপ ধরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। আজিকার দিনে শুধু বাঙালী জাতীয়তা লইয়া থাকিবার চেষ্টা করিলে, যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা হইবে। উহা সম্ভবও নহে, উচিতও নহে। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে বাঙালীকে নিখিল ভারতের সহিত সংহতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেই হইবে।"

শ্রীযুক্ত বসু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, সকল বাঙালী এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এখনও বাংলা ভাষাভাষী ও বাঙালী অধিবাসী (?) কয়েকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাংলার বাহিরে অন্য প্রদেশের অংশরূপে রহিয়াছে। ইহাদিগকে অচিরে বাংলার মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা হওয়া উচিত।

ভাষা ও প্রদেশগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত ঐক্য সম্ভব কি না তাহার পরীক্ষা আজিও হয় নাই। সংস্কৃতি-গৌরবে বাঙালী এখনও সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্যের দাবি করিয়া থাকে, তাহার অহমিকাই মিলনের প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই অহমিকাকে জাগ্রত রাখিয়া মিলন কদাচ সংঘটিত হইবে কি না তাহাও

সন্দেহের বিষয়। সেদিন নবপর্য্যায় বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বিশ্বমানবীয়তার কবি রবীন্দ্রনাথও যে ভাবে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন ভারতের অন্যপ্রদেশবাসী তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এও আমরা দেখিয়াছি।

### ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বাঙালীর দান

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> আমি জানি সৃষ্টিপ্রবণ কল্পনাপ্রবৃত্তি একমাত্র বাঙালীর আছে।...নিজের ভিতর থেকে, হৃদয়ের ভিতর থেকে, বাঙালীর প্রবৃত্তি থেকে এটা হয়েছে—আর ত কোথাও তা দেখা গেল না।... এই যে কল্পনাশক্তি এ অসাধারণ। আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, স্বর্গলোক থেকে এর প্রেরণা এসেছে। এটা বাঙালীর লক্ষণ। আজকের দিনে সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যত বিদ্যালয় আছে তার ভিতর একজনকে পাই না বাঙালীর মত যে সৃষ্টি করতে পারে, কল্পনা করতে পারে। এ জায়গায় বাংলা বড় পথ দেখিয়েছে।...বাংলা দেশ একমাত্র দেশ যেখানে সাহিত্য ভদ্র-সমাজের উপযুক্ত, ছেলেমানুষী সাহিত্য নয়।...আনন্দের বিষয় বাঙালীর চিন্তা আপনাকে প্রকাশ করবার একটা পথ পেয়েছে। সে পথ সে অবলম্বন করেছে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, কাব্যকলা—বাংলা দেশের ভিতর থেকে ত্রিবেণীসঙ্গমে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

বাঙালী যতদিন এই অভারতীয় সৃজন-প্রতিভার গৌরব মনে মনেও অনুভব করিবে, অন্য প্রদেশের লোকেরা ততদিনই তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে; রাষ্ট্রে, ব্যবসায়ে এবং চাকুরির বাজারে এই মনোবৃত্তি প্রতিদিনই প্রকট হইয়া উঠিতে দেখিতেছি। সুতরাং এই জাতীয় সংস্কৃতিগত ঐক্যের সম্ভাবনা এখনও সুদূর-পরাহত।

### বিনায়ক দামোদর সাভারকর

সম্প্রতি কিছুকাল হিন্দু ভারতবর্ষকে যে ঐক্য অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, তাহা প্রতিক্রিয়ামূলক। বিশেষ কারণে ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায় যে হিন্দুবিরোধী আন্দোলন সুরু করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার যুক্তিতে এক হওয়া বরং কিছুটা সম্ভব। তিনিও হিন্দুর সহস্রবর্ষব্যাপী ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির নজির দেখাইতেছেন। খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি আমাদিগকে যে কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং ইতিপূর্ব্বে পুনায় যাহা বলিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহিত যাঁহাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আছে, তাঁহারা তাহাতে সায় দিতে পারিবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমস্যা-সমাধান-চেষ্টায় তাহা প্রতিদিনই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। লক্ষ্য হয়তো সকলেরই এক, কিন্তু স্বতন্ত্র মার্গের সসমারোহ শোভাযাত্রা চৌমাথায় সম্মিলিত হইয়া লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারিতেছে না, পথি-মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষে দীর্ঘ দিনে গড়িয়া তোলা সংস্কৃতিকে যতদিন পর্য্যন্ত না হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বীকার করিয়া লইবেন, ততদিন ভারতবর্ষ নামীয় এক স্বতন্ত্র দেশের গৌরব করা চলিবে না। হিন্দু হিন্দু থাকিবে, মুসলমান মুসলমান থাকিবে এবং বিভিন্ন প্রদেশও পরস্পরকে সন্দেহ ও ঈর্ষা করিয়া পরাধীনতায় গৌরব বোধ করিবে।

### লর্ড ব্রাবোর্ণ

বাংলার সুযোগ্য গবর্নর লর্ড ব্রাবোর্নের আকস্মিক মৃত্যুতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসী মাত্রেই আঘাত পাইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি সত্ত্বেও ইংরেজোচিত সহজ ভদ্রতায় তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কোনও প্রত্যাশা না করিয়াও তাঁহার শাসন-নেতৃত্বে সকলেই একরূপ আশ্বস্ত ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা সেই আশ্বাস হারাইলাম।

### অন্যান্য ক্ষতি

নির্দ্দয় মৃত্যু প্রতি মাসেই বাংলা দেশ হইতে নিয়মিত কর আদায় করিয়া চলিয়াছে। এ মাসেও উল্লেখযোগ্য একজন বাঙালীর মৃত্যুতে বাংলা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 'উৎসব'-পত্রের প্রতিষ্ঠাতা রামদয়াল মজুমদার মহাশয় গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত এই সাধু ব্যক্তি ভারতের ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি একজন চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন। তাঁহার 'গীতা-পরিচয়' ও 'বিচার-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পু[illegible] পাঠে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও

৩৩।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত

# অলকা

সচিত্র মাসিকপত্র

প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড

আশ্বিন—ফাল্গুন

১৩৪৮

সম্পাদক ঃ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বার্ষিক মূল্য চারি টাকা চৌদ্দ আনা